আহমদ শরীফ রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ শরীফ রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

আহমদ শরীফ

AMARBOI.COM

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১ ১৩৩২, ৭১১ ০০২১
প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী
বর্ণ বিন্যাস কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ঢাকা
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা
মূল্য : ১০০০.০০ টাকা

Ahmed Sharif Rachanavali–6 : (Collected Works of Ahmed Sharif)
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com
First Edition : February 2014

Price : Tk 1000.00 only

ISBN 978 984 04 1645 5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ কথা

ড. আহমদ শরীফ সম্বন্ধে তাঁর প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মী প্রখ্যাত প্রথাবিরোধী লেখক ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, "একটি শব্দ ধ্রুপদের মত ফিরে ফিরে তাঁর সম্পর্কে ব্যবহার করেন পরিচিত ও অন্তরঙ্গরা। শব্দটি ছোট কিন্তু তার অর্থ আয়তন অভিধানের বড় বড় শব্দের থেকে অনেক ব্যাপক, শব্দটি– 'অনন্য'। তাঁরা বলেন ডক্টর আহমদ শরীফ অনন্য। এমন আর নেই, আর পাওয়া যাবে না পলিমাটির এই ছোট্ট বদ্বীপে। দ্বিতীয় নেই, তৃতীয় নেই, চতুর্থ-নেই তাঁর"। বাংলাদেশের মুক্তচিন্তার অগ্রসর একজন– মধ্যযুগের সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাসের বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ একগুচ্ছ অসামান্য তীব্র বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ দশক থেকে নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেছিলেন— মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা চলমান ছিল। তাঁর রচিত মৌলিক রচনা সম্বলিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৫টি, যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ১৩৮৪৪ অর্থাৎ ছাপাকৃত প্রতি পৃষ্ঠাকে হাতের লেখায় ২.৫ (আড়াই) পৃষ্ঠা করে ধরলে তাতে ৩৪৬১১ পৃষ্ঠা হয়। অবশ্য এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র তাঁর মৌলিক রচনার হিসেব এবং সম্পাদিত মৌলিক গবেষণার উপর গ্রন্থগুলোর পৃষ্ঠার সংখ্যা হিসেব করা হয়। তবে মুদ্রিত পৃষ্ঠার সংখ্যা সব মিলিয়ে লক্ষের অধিক হবে। নিজস্ব দর্শন চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বোদ্ধা সমাজের কাছে তিনি ছিলেন বহুল আলোচিত, সমালোচিত ও বিতর্কিত এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও এ ধারা বহমান।

বাংলাদেশের মতন একটি অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে লেখাপড়া জানা মানুষের মাঝে না পড়া এবং না জানার প্রবণতা গড়ে উঠেছে। তাই কেউ নিজে থেকে কোন বইয়ের বা পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে দেখার গরজ অনুভব করে না। আবার যে কোন ব্যক্তিকে বা বিষয়কে সমাজে পরিচিত করতে প্রচার হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে বা বিভিন্ন জাতীয় পর্ষদগুলোতে কিংবা জাতীয় বা স্থানীয় প্রচার মাধ্যমে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে যারা ঘুরে ফিরে সব সময় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন তারাই কেবল দেশে শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন। সরকারি বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের রচনাশৈলী যাই হোক না কেন, তার গুণগত মান প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবে সঠিক মূল্যায়ন শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর গবেষকগণই করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ড. আহমদ শরীফ-এর মতন হাতেগোনা চার থেকে পাঁচজন লিখিয়ে পাওয়া যাবে যাঁরা কোন অবস্থাতেই সরকারি বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বেড়াজালে নিজেদেরকে জড়ান নি, তাই তারা মননশীল লেখক হিসেবে বা তাঁদের চিন্তা সমৃদ্ধ গ্রন্থগুলো লেখা-পড়া জানা মানুষের কাছে অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও অপঠিত থেকে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই ভাবে ড. আহমদ শরীফ-এর রচিত সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-দর্শন এবং ইতিহাসের উপর শতের অধিক মননশীল গ্রন্থগুলো শুধু অপঠিতই নয়, অগোচরেও থেকে গেছে।

ভাববাদ মানবতাবাদ ও মার্কসবাদের যৌগিক সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর চিন্তা-চেতনা ধ্যান–ধারণা, আচার আচরণে বক্তব্যে ও লেখনীতে। তাঁর রচিত শতেরও অধিক গ্রন্থের প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বিশ্বাস সংস্কার পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য। পঞ্চাশ দশক থেকে নব্বই দশকের শেষ অবধি সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাসসহ প্রায় সব বিষয়ে অজস্র লিখেছেন। দ্রোহী সমাজ-পরিবর্তনকামীদের কাছে তাঁর পুস্তকরাশির জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়, তাঁর রচিত পুস্তকরাশির মধ্যে 'বিচিত চিন্তা', 'স্বদেশ অন্বেষা', 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', 'বাঙলার সুফী সাহিত্য', 'বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা', 'বাঙলার বিপ্লবী পটভূমী', 'এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা', 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা' এবং বিশেষ করে দু'খণ্ডে রচিত 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' তাঁর অসামান্য কীর্তি। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রখ্যাত গবেষক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর মানসপুত্র হিসেবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে পাহাড়সম গবেষণাকর্ম তাঁকে কিংবদন্তী পণ্ডিত হিসেবে উভয়বঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিতি দিয়েছে। সমগ্র বঙ্গে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং অদ্যাবধি স্থানটি শূন্য রয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি মধ্যযুগের সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাস রচনা করে গেছেন। বিশ্লেষণাত্মক তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তিসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকার মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস বাঙলা ভাষাভাষী মানুষকে দিয়ে গেছেন যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমর গাঁথা হয়ে থাকবে।

এ পর্যন্ত 'আহমদ শরীফ রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান খণ্ডটি ষষ্ঠখণ্ড যা ড. আহমদ শরীফ-এর প্রকাশিত পাঁচটি গ্রন্থের সমন্বয়ে সংকলিত হয়েছে :

১. বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি (১৯৮৯)
২. একালে নজরুল (১৯৯০)
৩. বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র (১৯৯০)
৪. মানবতা ও গণমুক্তি (১৯৯০)
৫. সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা (১৯৯১)
৬. গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা (১৯৯১)।

অত্র খণ্ডে ড. আহমদ শরীফ-এর যে কয়টি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তা প্রকাশ কাল অনুসারে গ্রন্থিত হয়েছে। সে হিসেবে প্রথম সংকলিত গ্রন্থ হচ্ছে 'বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি': এই গ্রন্থটিতে তিনটি পর্ব আছে। প্রথমটি বৃটিশ পর্ব, দ্বিতীয়টি পাকিস্তান পর্ব এবং– তৃতীয়টি বাংলাদেশ পর্ব। প্রতিটি পর্বেই সেই সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা মূল্যায়ন করে বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি 'একালে নজরুল', অত্র গ্রন্থটিতে ছয়টি অধ্যায় আছে। প্রথমটি : নজরুল ইসলাম : কবির মনোজগৎ, দ্বিতীয়টি : পাঠক সমালোচকদের চোখে নজরুল সাহিত্য, তৃতীয়টি : কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ, চতুর্থটি : কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলামের কবি স্বভাব: প্রেম–তৃষ্ণা, ষষ্ঠটি : নজরুলের কবি ভাষা : পুরাণ ও প্রকৃতি। এক কথায় বলা যায় যে গ্রন্থটি সামগ্রিকভাবে কবি নজরুল ইসলামের কবি জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র।

তৃতীয় গ্রন্থটি হচ্ছে 'বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র'। অত্র গ্রন্থে ষোলটি বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ আছে। সেকুল্যারিজম, সাম্প্রদায়িকতা, যৌতুকসহ বিদ্যাসাগর। বঙ্কিম সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলো লেখকের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

চতুর্থ গ্রন্থটি হচ্ছে 'মানবতা ও গণমুক্তি', অত্র গ্রন্থটিতে একুশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বইয়ের নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রবন্ধগুলো আমাদের মন-মনন, সমাজ-সংস্কৃতি এবং আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসার দর্পণ।

পঞ্চম গ্রন্থটি হচ্ছে, 'সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা'। এই গ্রন্থে তেইশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের শিরোনামের কারণে সহজেই অনুমেয় যে, গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলো মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাসহ বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উপর আলোচনা আছে।

ষষ্ঠ গ্রন্থটি হচ্ছে, 'গণতন্ত্র সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা '। এই গ্রন্থে মোট ৫৮টি কলাম গ্রন্থিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থিত কলামগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অত্র গ্রন্থে সংকলিত কলামগুলো মূলত সমাজ, জীবন, রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র নিয়ে লেখা।

পরিশেষে যে কথা না বললেই নয়, বর্তমান খণ্ডটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে জনাব মাহমুদ করিম-এর উৎসাহ, এ্যাডভোকেট যাহেদ করিম-এর সার্বিক সহযোগিতা এবং সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা আগামী প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী জনাব ওসমান গনিকে ধন্যবাদ।

AMARBOI.COM

ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা
অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি ১১-৮৮

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র

সেক্যুলারিজম ৯১ বিচ্ছিন্নতার ও সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব সম্বন্ধে ১১ বাঙলার ১১ ইতিহাসের কিছু তথ্যের সূত্রায়ণ ৯৫ দেশের শিক্ষাতত্ত্বের সূত্রায়ণ ৯৯ বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র ১০৪ পণ ও যৌতুকম ১১৫ অসুস্থ-অস্থির বাঙালী ১১৭ শেকড় সন্ধানে ১১৮ পরিবেষ্টনীজাত সংস্কার ও তার প্রভাব ১২১ মুক্তি বৈরাগ্যে নয়, সুখ নেই আলস্যে ১২২ তিনটি আবশ্যিক সাংবিধানিক অঙ্গীকার ১২৪ অনুভব কণিকা ১২৬ বিদ্যাসাগর–চরিত্রে, চেতনায় ও কৃতিত্বে ১২৯ বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ ১৩৭ বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৯ মানববাদী বঙ্কিম

একালে নজরুল

নজরুল ইসলাম ঃ কবির মনোজগৎ ১৫৯ পাঠক সমালোচকদের চোখে নজরুল সাহিত্য ১৭৮ কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ ২২৮ নজরুল ইসলামের কবিস্বভাব ঃ শক্তিপূজা ২৪৪ নজরুলের কবি স্বভাব ঃ প্রেম-তৃষ্ণা ২৬৯ নজরুলের কবি ভাষা ঃ পুরাণ ও প্রকৃতি ২৮৬ পরিশিষ্ট–১ ৩০৮ পরিশিষ্ট–২ ৩১০

AMARBOI.COM

মানবতা ও গণমুক্তি

মানবতা ও গণমুক্তি ৩১৫ আবর্তিত সমাজের আজকের সঙ্কট ৩৩৩ যুগান্ত লক্ষণ ঃ চেতনার রূপান্তর ৩৩৯ সংস্কৃতির রূপান্তর প্রসঙ্গে ৩৪৬ ম্যাজিক ও লজিক ৩৫২ ভয় ও ভরসা ৩৫৫ যাদু, যুক্তি ও আধিমুক্তি ৩৫৭ এ আধিমুক্তির উপায় কি ৩৬২ শাস্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতা ৩৬৭ মানুষের বোধে বিরোধ ও অসঙ্গতি ৩৬৯ ঐতিহ্য বনাম প্রগতিশীলতা ৩৭৩ বিশ্ব যখন এগিয়ে চলে, আমরা তখন ৩৭৫ বাঙলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান ৩৮১ বিকৃত ইতিহাস পাঠ প্রসূত জাতিদ্বেষণার পরিণাম ৪০৩ মহামানব নয়-ভালো মানুষ চাই ৪০৬ ভালো হও, ভালোবাস এবং ভালো কর ৪১২ জিগীষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ৪১৪ গণমুক্তির পথ ও পদ্ধতি ৪১৬ রাজনীতির খেলা ৪১৯ ভাস্কর মূর্তি ও বিকৃতচেতনা ৪২১ পঞ্চ প্রসঙ্গ ঃ ৪২২

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র

বিদ্বিষ্ট সম্প্রদায়চেতনার গোড়ার কথা ৪৩৫ সাম্প্রদায়িকতা : বীজ–অঙ্কুর ও ফল ৪৩৭ উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে জাতিদ্বেষণা ৪৪৩ তমদ্দুন-সংস্কৃতি-কালচার ৪৫২ নামেও দেখি কাম হয় ৪৫৭ দেশের অনির্দেশ্য বেতাল বেঢক হালচাল ৪৬০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি-মানুষের স্বার্থে একটি সেক্যুলার দল আবশ্যিক ও জরুরী ৪৬৮ কম্যুনিস্ট বিশ্বের হুজুগে দ্রোহ, বিপর্যয় ও মার্কসবাদ ৪৭২ জীবন কি এবং কেন? ৪৭৯ নামের শিক্ষা ও কামের শিক্ষা ৪৮৩ প্রগতির একটি তাত্ত্বিক সংজ্ঞা ৪৮৬ একুশে ফেব্রুয়ারী : একটি চেতনা ৪৮৮ লড়াকু চাষী মজুর পেশাজীবী এক হও ৪৯০ নারী নির্যাতন : এর শেকড়ের সন্ধানে ৪৯১ রমজান : সমাজ ও সরকার ৪৯৬ ছদ্মাবরণের বিড়ম্বনা ৪৯৯ সুখের অন্তরায় ৫০২ আবেগের আধিক্যে ৫০৫ বাঙলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের দান ৫০৮ শিখার প্রাণপুরুষ প্রগতিবাদী আবুল হোসেন [১৮৯৬–১৯৩৮] ৫১৫ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যুগ ও জীবন [১৮৮৫-১৯৬৯] ৫১৯ মুক্তমনের ঔচিত্যবাদী আবুল ফজল [১৯০৩ – ৮৩] ৫২৮ মাটিলগ্ন মানুষের দরদী কবি : জসীম উদদীন [১৯০৩–৭৬] ৫৩৩

গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা

শাস্ত্রে ও সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্যগৌরব কি? ৫৪১ বাঙালীত্ব ও সংস্কৃতি ৫৪৪ মানুষের নিয়ন্তা কে : রাশি না ঈশ্বর? ৫৪৬ সমাজে শাস্ত্রের প্রভাবের স্বরূপ ৫৪৭ জনগণের চিৎপ্রকর্ষের মুখ্য অন্তরায় ৫৫১ ব্যক্তি মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অসঙ্গতির কারণ ৫৫৩ জীবনতত্ত্ব ৫৫৪ অলস মুহূর্তের তত্ত্বচিন্তা ৫৫৬ আপেক্ষিক ও প্রাতিভাসিক সত্যচালিত জীবন ৫৫৭ অমৃত নেই ৫৫৯ নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার ৫৬১ দাঙ্গা-হাঙ্গামার গোড়ার কথা ৫৬৩ সারমেয় স্বভাব ৫৬৭ অনুমান বনাম বিজ্ঞান ৫৬৮ জরুরী ভাবনার কথা : জাতীয়তা ৫৭০ লোভ না জিগীষা ৫৭৩ জ্ঞান ৫৭৪ ঋণ ৫৭৫ মনের খোরাকের মূল্য ৫৭৭ মন ৫৭৯ দাসত্ব ও আনুগত্য ৫৮০ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লিপ্সা ৫৮১ দেহ-প্রাণ-মনের মুক্তি ৫৮৩ সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতা ৫৮৪ সঙ্কট-সমস্যা সঙ্কুল জীবন ৫৮৬ শ্রী ও ছাঁদ ৫৮৮ দেয়াল ভাঙা শাস্ত্র-সমাজ দুর্গ ৫৯০ প্রতিক্রিয়াশীলতার শৃঙ্খলে বদ্ধ শিক্ষা ৫৯১ আত্মকথা ও স্মৃতিকথা ৫৯৪ ভাষাগোষ্ঠী চেতনা ৫৯৬ দরিদ্র রাষ্ট্র ধনীর স্বর্গ ৫৯৮ বাবু ও ভদ্রলোক ৫৯৯ যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন ৬০১ অনক্ষরতাদুষ্ট দেশে গণতন্ত্র ৬০২ সহস্র ফুল ফুটুক ৬০৪ ভদ্রলোক ও ভালোমানুষ ৬০৬ কলঙ্ক ৬০৭ জন্মদিনে স্মৃতি বুদ্বুদ ৬০৯ সময় ও জীবন ৬১৩ বাঙলাদেশে গণতন্ত্র ও ভোট ৬১৫ বার্ধক্যে অবসর জীবনে ৬১৭ বার্ধক্যে দাম্পত্য আত্মীয়তা ৬১৮ বিদ্যাসাগরজীবনের পুঁজি ও পাথেয় : জেদ ও নাস্তিক্য ৬২০ শ্রমজীবী মানুষ ৬২৭ গ্লানির স্মৃতি ৬২৯ উপদ্রব ৬৩০ 'শোভা' ৬৩২ রক্তেই যদি ফুটে জীবনের ফুল, ফুটুক না ৬৩৩ যন্ত্র নির্ভরতায় অভিন্ন বৈশ্বিক জীবনাচার ৬৩৫ ইতিহাস কি? ৬৩৬ শ্রম ও স্বেদ ৬৩৮ অনুকৃত জীবনের গ্লানি ও ক্ষতি ৬৩৯ 'দাসত্ব'-এর শেকড় সন্ধানে ৬৪১ চাল-চুলো ৬৪২ গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র ৬৪৩ বুদ্ধির মুক্তি ৬৪৪ কঠিন লোহার খাঁচায় বদ্ধ মানব চৈতন্য ৪৪৫ বিচিত্র প্রাণী প্রজাতির মানুষ ৬৪৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ পর্ব

১. প্রাক কথন

কিংবদন্তী দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে, কেননা, আমাদের ইতিহাস নেই। আড়াই হাজার বছরের ধর্ম-সংস্কৃতির ও বিদেশীর রাজত্বের যেসব কথা শ্রুতিস্মৃতি রূপে প্রচল রয়েছে, তাকে ইতিহাসের কায়া তো নয়ই, কঙ্কালও বলা চলে না। কেননা, তা বিচ্ছিন্ন, খণ্ড, ক্ষুদ্র তথ্য মাত্র। ওতে ইতিহাসের ছায়া আছে, প্রাবাদিক তথ্য আছে, পল্লবিত কিংবদন্তী আছে, কিন্তু সঙ্গতি, সামঞ্জস্য কিংবা ধারাবাহিকতা নেই।

আমরা ঢালওভাবে বলি বটে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় [ভেডিড] আর্যভাষী আলপাইনীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মঙ্গোলরাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ দেশের অধিবাসী, কিন্তু এদের আবয়বিক ও গৌত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপক কিংবা বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ সম্পৃক্ত স্বাতন্ত্র্য বা ভিন্নতা নির্দেশক কোন তথ্য পাথুরে প্রমাণ যোগে সুনিশ্চিত করা আজ আর সম্ভব নয়।

এদের বুনো বর্বর সুলভ ধর্ম-সংস্কৃতি যে সর্বপ্রাণবাদ, যাদুতত্ত্ব, টোটেম-ট্যাবু তত্ত্ব ভিত্তিক ছিল, তার রেশ ও লেশ দেখে তা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু কোন অংশ কার, তা আজ আর নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তাদের জগৎ-চেতনার ও জীবন-ভাবনার ওই নিম্নমান তাদের কাঙ্ক্ষার প্রসার ঘটায়নি।

তরঙ্গে তরঙ্গে দলে দলে আসা ও নিবসিত হওয়া ও গোত্রগুলোর রক্ত-সাঙ্কর্য এত বেশি যে তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-অবয়ব-বর্ণ-রক্তের ভিন্নতা ও উৎস নিরূপণ যেমন অসম্ভব, তেমনি দৈহিক মানসিক শক্তির তারতম্য রক্তজ কিনা বলা বা বিশ্বাস করার কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায় নেই।

তবে যখন সভ্য উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির ও ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটল, তখন থেকেই তাদের প্যাগান জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি ক্রমে অপসৃত হতে থাকে। 'শূদ্র নামে অভিহিত ও অবজ্ঞাত রাঢ়, পুণ্ড্রের বৃত্তিজীবী অনুন্নত অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষও শাসিত ও শোষিত হতে থাকে সভ্য মানুষের পাটলীপুত্রস্থ শাসকগোষ্ঠীর কবলিত হয়ে। ক্রমে এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চলের মানুষ বঙ্গবহির্ভূত শক্তির শিশুনাগ-মৌর্য-শুঙ্গ-কণ্ব-গুপ্ত-পাল-চন্দ্র-বর্মণ-খড়্গ-দেব-কোচ- সেন-তুর্কী-মুঘল-ইংরেজ প্রভৃতির আঞ্চলিক বা সামগ্রিক শাসনে-শোষণে-পীড়নে আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে দাসসত্তার নিরাকাঙ্ক্ষা নিরুদ্যম গ্লানির মধ্যে প্রাজন্মিক আবর্তন পেয়েছে মাত্র প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে।

বাঙলার আদি বাসিন্দারা আজো নির্বিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন ও অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী মুচি-মেথর-বাগদী-চাঁড়াল-কামার-কুমার-নাপিত-ধোপা-কৈবর্ত-হাড়ি-ডোম-নিকারী-কোল-মুণ্ডা-সাঁওতালাদি অরণ্যবাসী প্রভৃতি বৃহদ্ধর্মপুরাণে ও মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র বর্ণিত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছত্রিশজাত। রাজশক্তি এদেশের মানুষের কখনো হাতে ছিল না বলে এদেশে ক্ষত্রিয় নেই। কিন্তু মানুষ সুযোগ-সুবিধা নেয়ার জন্যে রাজশক্তির বা শাসকগোষ্ঠীর অনুগত সহযোগী-সেবাদাস হয়ে যায়। শাসকদেরও স্থানীয় সমর্থক-সহযোগীর প্রয়োজন হয়। এমনি চাহিদা-সরবরাহের চিরন্তন নিয়মে চালাক-চতুর-ধূর্ত-বুদ্ধিমান অনুগৃহীত জনেরা সৎশূদ্র এমনকি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য স্তরেও উন্নীত হয় বিশেষ করে গুপ্ত আমলে, বৌদ্ধপাল আমলেও। বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে ব্রাহ্মণ সমাজের নববিন্যাস কালে আদিশূর-বল্লালী ঐতিহ্যে বিত্তবান বুদ্ধিমানের এমনি বর্ণ-উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির প্রাবাদিক প্রমাণ ও সাক্ষ্য রয়েছে কৌলিন্য প্রথায়, দৈবকীঘটক, নুলু পঞ্চানন, ধ্রুবানন্দ প্রমুখ রচিত কুলপঞ্জীতে, জাতিমালা কাছারীর মামলার ঐতিহ্যে ও বল্লালচরিতে। আজ অবধি চোখ-চুল-চোয়াল-নাক-শিরের এবং রক্তের সাধারণ ও স্থূল পরীক্ষায় জানা বোঝা গেছে যে বাঙলাভাষী অঞ্চলে নিষাদ ও কিরাত রক্তের মিশ্রণই ঘটেছে বেশি। এখনকার পরিচিতিতে সমতল বাঙলায় কৈবর্ত্য-রক্তের মানুষের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। আর্যভাষী বেদবাদী সুন্দর মানুষের কিংবা নিগ্রোগোষ্ঠীর রক্ত-সাংকর্য বাঙালীর মধ্যে দুর্লক্ষ্য। আর শক-হূন-গ্রীক-তুর্কী-মুঘল-ফরাসী-দিনেমার-ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-ইংরেজ রক্তের মিশ্রণ 'লাখেও না মিলে এক'।

অতএব, প্রাচীনকালে-মধ্যযুগে বাঙলাদেশের রাজকীয় শিল্পে-সাহিত্যে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-দর্শনে-শাস্ত্রে যা কৃতি ও কীর্তি তা বহিরাগত উচ্চবিত্তের, রুচির, সংস্কৃতির ও মানের মানুষের প্রয়োজনে, অভিপ্রায়ে ও প্রভাবে হয়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কেননা সেকালে জীবন ছিল শস্ত্রীয় আচার-আচরণ-পালা-পার্বণ প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। এবং শাস্ত্রমাত্রই বহিরাগত, ভাষাও উত্তর ভারতীয় আর্য নামের ভাষাজাত তথা সে-ভাষার বিবর্তিত রূপ। কালক্রমে আদি অধিবাসী থেকে গড়ে ওঠা সৎশূদ্র কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণেরাই ছিল উত্তর ভারতীয় জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-আচার-সংস্কৃতির অনুগত অনুকারক ও আনুসারক। অজ্ঞ-অনক্ষর-অস্পৃশ্য নিম্নবৃত্তির নির্বিত্ত অবক্ষেয় মানুষেরা তাদের আদি বিশ্বাস-সংস্কার আচার-আচরণ ধরে রেখেছিল। তাদেরই সংখ্যাধিক্যের ফলে তুর্কী-মুঘল আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদী কায়স্থ-বৈদ্য-ব্রাহ্মণরা তাদের লৌকিক দেবতাদের ষষ্ঠী-শীতলা-মনসা-যক্ষ প্রভৃতি বহু-দেবতা-উপদেবতার ও অপদেবতার শক্তি-গুণ-মান-মাহাত্ম্য স্বীকার করতে এবং পূজা অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়। বিশ্বাস করতে থাকে লৌকিক বাণ-উচ্চাটন-তুক-তাক, মন্ত্র-মাদুলী তাবিজ-কবচ প্রভৃতির শক্তিতে ও প্রভাবে। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলাম বহির্বঙ্গীয় ধর্ম ও শাস্ত্র। আমাদের ভাষা, প্রশাসন ব্যবস্থা, শাস্ত্র সম্পৃক্ত আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি, মনন-চিন্তন সবটাই বহির্বঙ্গীয়। সেখানে আমরা নিজেদের খুঁজে পাব না। সে কারণেই দ্রোহাত্মক নব্য ন্যায়-স্মৃতি প্রতিষ্ঠায়, কিংবা ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনে অথবা চৈতন্য-রামমোহন-রামকৃষ্ণ মতবাদে আমরা বাঙালীর নিজেদের ভাব-চিন্তা তথা মৌলিক খনন-চিন্তন-দৃষ্টি-দর্শন সামান্যই পাই।

রাজনীতি ক্ষেত্রে পাল আমলে পাই বগুড়া-বরেন্দ্রবিদ্রোহী কৈবর্ত দিব্যক-রুদ্রক-ভীমকে বাহুবলে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শাসন করতে। প্রতাপাদিত্যই ছিলেন বারভূঁইয়ার মধ্যে একমাত্র বাঙালী। এ ছাড়া সম্পদ রক্ষার ও ভাত-কাপড় যোগাড়ের গরজে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও নিষ্ঠুর শোষণ প্রতিরোধে প্রাণপণ দ্রোহে সংগ্রামে কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না কখনো আঞ্চলিকভাবে যূথবদ্ধ মানুষকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও সাম্প্রতিক কালে। আর স্ব স্ব স্বার্থে কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানিতে কিংবা দাঙ্গায়-মামলায় নির্ভীক মানুষ সেকালে-একালে সর্বত্রই মেলে।

তবু রক্তসঙ্কর নির্জিত বাঙালী কখনো বহির্বঙ্গীয় শাস্ত্র-সংস্কৃতি-দর্শনের কাছে পুরো আত্মসমর্পণ করেনি, তার স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনার, মনন-চিন্তনের সাক্ষ্য রয়েছে সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-তুক-তাক প্রভৃতিতে, বৌদ্ধমতের তান্ত্রিক বজ্রযানিক, সহজযানিক, মন্ত্রযানিক ও কালচক্রযানিক বিকৃতি-বিস্তারে ও দেহতত্ত্বে। ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত ও বিকৃত হয়েছে লৌকিক দেবতা-অপদেবতার স্বীকৃতিতে-পূজায়-পার্বণে। ইসলামও এখানে বিকৃতি পেয়েছে বৌদ্ধজ যোগের, দেহতত্ত্বের, সহজিয়া বাউলতত্ত্বের প্রভাবে। খানকাহ্-দরগাহ্-মাজার-পীর-ফকির পূজা এবং অদ্বৈততত্ত্ব ও নির্বাণবাদ প্রসূত ফানা, বাকা ও শূন্য তত্ত্বে বিশ্বাসীও গড়ে উঠেছে।

আড়াই হাজার বছর ধরে বিদেশী ও বিজাতি বিভাষী শাসিত-শোষিত বলেই বাঙালী স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ও বিকাশ সাধনের অবাধ সুযোগ পায়নি। দারিদ্র্য মানুষের মানবিক গুণ নষ্ট করে, তাকে কেবল প্রবৃত্তিচালিত প্রাণী করেই রাখে। আড়াই হাজার বছর ধরে পরশাসিত ও পরিশোষিত মানুষ দাসসত্তায় বেঁচে ছিল। তাই ভীরুতা, স্বার্থপরতা, আত্মরতি, হরণস্পৃহা, নিঃসঙ্গ-প্রয়াস, অসূয়া ও কলহ প্রবণতা তার নিত্যসঙ্গী ছিল। অন্নের কাঙাল মানুষ ছলচাতুরী-প্রতারণা আশ্রয়ী না হয়েই পারে না। এমন মানুষ ধনী হয়েও মনে কাঙাল থেকে যায়। তাই দু'হাজার বছর ধরে বিদেশী বণিক-পর্যটক-প্রচারক-প্রশাসকের চোখে বাঙালী ভীরু, মিথ্যাভাষী, প্রতারক, ধূর্ত, কলহপ্রিয়, দরিদ্র, চোর ও ভিক্ষাজীবী, কর্মকুণ্ঠ, বৈরাগ্যবাদী কিন্তু ভোগলিপ্সু। আমাদের অতীত আস্ফালন করবার মতো তেমন উজ্জ্বল নয়। কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষ্য ভবিষ্যৎ অবশ্যই আছে।

AMARBOI.COM

আমরা বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু আর সব মানুষ অতীতে এবং ঐতিহ্যে গুরুত্ব দেন। অতীত ও ঐতিহ্য তাঁদের চোখে সম্মুখ যাত্রার প্রেরণার উৎস। কিন্তু ইতিহাস বলে, পিতৃ-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রচল নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি দ্রোহী তথা অতীত ও ঐতিহ্য বিরোধী নব-অবতারেরাই মানবসমাজকে দেশ-কালের প্রয়োজনে নতুন ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণের সন্ধান দিয়েছেন, এগিয়ে দিয়েছেন মনন-চিন্তন-সংস্কৃতি-সভ্যতা। অতীত ও ঐতিহ্য চেতনা যদি জীবনে এগিয়ে চলার, সম্মুখগতির প্রণোদক হয়, তা হলে গ্রীস-রোম-মিশর-ব্যাবিলনের পতন হল কেন, চেঙ্গিস-হালাকু-কুবলাই-ই বা কোন ঐতিহ্যের ধারক ছিল! ঐতিহ্যহীন পরিবারের, আফ্রিকার ও লাতিন আমেরিকার মানুষের কিংবা রাষ্ট্রের কি কোন ভবিষ্যৎ নেই। পিতৃ-সমাজের বিশ্বাস-সংস্কার এবং অতীত ও ঐতিহ্য পরিহারকারী ধর্মান্তরিত পৃথিবীর খ্রীস্টান ও মুসলিমদের উন্নতিরই বা কারণ কি! আবার দেশান্তরিত ও ধর্মান্তরিত হয়েও লোকে ঐতিহ্য বদল করছে। ছিন্নমূল পাচ্ছে নতুন কৃত্রিম শেকড়।

ঐতিহ্য [লজ্জাকর কুকৃতি নয়, গৌরবময় কৃতি-কীর্তিই ঐতিহ্য] প্রেরণার উৎস কথাটা বিশ্বাসরূপে সর্বত্র চালু থাকলেও আজ অবধি তা অযোগ্য অক্ষমের আস্ফালনের ও নিষ্ক্রিয় গর্বের বিষয় হলেও বাস্তবে সাহস-সঙ্কল্প-উদ্যম-উদ্যোগই অগ্রগতির প্রত্যক্ষ প্রেরণা। আর অতীত ও ঐতিহ্যমাত্রই প্রগতিবিরোধী। কেননা প্রগতি মানে অতীতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যের বন্ধন অস্বীকার করে মননে-চিন্তনে আচারে-আচরণে সমাজে-সম্পদে নতুন কিছু করা। অতীত-ঐতিহ্য প্রীতিমাত্রই তাই রক্ষণশীলতা, চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে স্থবিরতা মাত্র। মানুষসহ প্রাণীমাত্রেরই প্রত্যঙ্গ সংস্থান অর্থাৎ দেহই সাক্ষ্য দেয় যে তার আবয়বিক গঠন কেবল সম্মুখগতি নির্বিঘ্ন করার জন্যেই, পিছু হঠবার জন্যে নয়। যেমন মানুষের সঙ্গে হাত-পা-চোখের সংস্থান কেবল সম্মুখগতির নির্দেশক। তাৎপর্য চেতনাবিরহী অতীত ও ঐতিহ্য চেতনা ক্ষতিকর। আমাদের ধারণায় প্রত্যেক মানুষই স্বসৃষ্ট। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে স্বরচিত।

বাঙলার হিন্দু-বৌদ্ধজ মুসলিম সমাজের কালিক বয়স হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত'শ বছর, হিন্দুজ খ্রীস্টানরা হচ্ছে এক থেকে চারশ বছরের পুরোনো। ইতোপূর্বে তারা ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ শাস্ত্রে সংস্কৃতিতে ও ঐতিহ্যে লালিত। ধর্মান্তরিত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই তারা ইসলামী আরবের ও যিশুউত্তর পশ্চিম এশিয়ার অতীতের ও ঐতিহ্যের গৌরবগর্বী। ইসলাম বা জামাত পন্থী দেশজ মুসলিমরা বাঙলাদেশে যে অতীতের ও ঐতিহ্যের, যে জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার রূপায়ণ কামনা করছে, তা কি বাঙলার না বাঙালীর গোত্রীয় কৃতি বা মানবসম্পদ? অতএব ঐতিহ্যেরও গ্রহণ বর্জন ঘটে। ঐতিহ্যচেতনাও স্থানে, কালে, মনে, মতে ও প্রয়োজনে কৃত্রিম অনুশীলনজাত। আসলে অতীতের অভিজ্ঞতা তথা ইতিহাসধৃত অভিজ্ঞতা জ্ঞানরূপে আমাদের শক্তি ও বুদ্ধি বাড়ায় এবং এ অভিজ্ঞতা ঐতিহ্য নয়। তা ছাড়া একজন প্রগতিবাদীর পক্ষে ঐতিহ্যচেতনা তো পরিহার্য বর্বর, অভব্য, সামন্ত-বুর্জোয়া ঐতিহ্যপ্রীতি মাত্র।

আমাদের বিশ্বাস না থাকলেও চালিকাশক্তি হিসেবে অতীতে, ঐতিহ্যে রক্তধারার প্রাজন্মিক বা বংশানুক্রমিক গুণ-মান-মাহাত্ম্যে বা বংশগতিতে, উত্তরাধিকারে ও প্রাতিবেশিক প্রভাবে আস্থাবানদের জন্যেই আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করার আগে এ উপক্রম বা 'প্রাক-কথন' আবশ্যিক হল।

ব্রিটিশ আমল

১৭৫৭ সনের পলাশীর প্রান্তরে আকস্মিক পরাজয়ের পরে মুর্শিদাবাদেও সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র কোন সৈন্যবাহিনী অবশিষ্ট ছিল না বলে সিরাজ পালালেন, মীর জাফর কোম্পানীর পুতুল নওয়াব হলেন। জামাতা মীর কাশিম কোম্পানী কর্তাদের ঘুষ দিয়ে কৌশলে কেড়ে নিলেন শ্বশুরের নওয়াবী। অতএব কেন্দ্রীয় মুঘলশক্তির দুর্বলতার সুযোগে বাঙলার শাসনক্ষমতা গেল উচ্চাভিলাষী প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দী-মীরজাফর-মীর কাসিমের হাতে, কোম্পানীও বিশ্বাসঘাতক এবং প্রতারক। এ কাল শহরে, সরকারে ও জনজীবনে সর্বপ্রকার অবক্ষয়ের কাল, যে-অবক্ষয় ছিল নৈতিক আর্থিক বাণিজ্যিক প্রশাসনিক ও সামাজিক।

খরার আভাস পেয়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ী লোকেরা ও দেশী ব্যবসায়ীরা ধান-চাল মৌজুত করতে থাকে। ধান-চাল দুষ্প্রাপ্য ছিল না। অর্থাভাবে ক্রয়মূল্য যোগাড় করা সম্ভব ছিল না বলে বাঙলার কোটি লোক মারা গেল [জন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ]। ১৭৬৫ সনে দরিদ্র দুর্বল দিল্লীসম্রাট সামান্য ছাব্বিশ লাখ টাকা প্রাপ্তির নিশ্চিত আশ্বাসে প্রায় হস্তচ্যুত সুবেহ বাঙলার দিওয়ানী দিয়েছিলেন কোম্পানীকে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগে মীর জাফর-পুত্র নাজিমুদ্দৌলাহকে ভাতা-নির্ভর নামসার নওয়াব রেখে নওয়াবের সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেয়া হল। সেদিনও বাঙালীর সিপাহী হবার আগ্রহ ছিল না। তাই মুর্শিদাবাদের বাহিনীর অধিকাংশই ছিল বিহার-অযোধ্যার হিন্দু-মুসলিম। চাকুরীচ্যুত এ বেকার বিক্ষুব্ধ সৈন্যরাই হিন্দু নাগাসন্ন্যাসী ও মুসলিম বুরহান [নাগা] ফকিররূপে [তাদের স্বদেশে নয়] কোম্পানীর বাঙলাদেশে দিনাজপুর-রংপুর-জামালপুর-মধুপুর অবধি লুটতরাজ চালাত, লুটের সময়ে স্থানীয় লোকও তাদের সঙ্গে জুটে যেত।

এদের নেতা ছিল ভবানী পাঠক ও মজনু শাহ। পরবর্তীকালে এসব সন্ন্যাসী ফকিরকে যথাক্রমে হিন্দুরা ও মুসলিমরা সাহিত্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরূপে চিত্রিত করে নন্দিত ও বন্দিত করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে নওয়াবী আমলে মুর্শিদকুলি খান নিযুক্ত রাজস্ব আদায়ের বড় ইজরাদার জমিদার ছিল হিন্দু। ১৫টি বড় জমিদারির মধ্যে দুটো ছিল মুসলিমের এবং কর্মচারীও ছিল হিন্দু।[1] ১৭৯৩ সনের জমিদার-সরকারের স্থায়ীচুক্তি তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও বহু বই রয়েছে। আমাদের এখানে যা স্মরণীয় তা হচ্ছে এই, মুঘল আমলে নির্ধারিত চিরস্থির খাজনার বা ফসলের বিনিময়ে জমি ভোগদখল করতে পারত প্রজা। চাকুরের বেতন বাবদ জায়গীরদারি ঘন ঘন হাত বদল হত, মুর্শিদকুলি খান প্রবর্তিত ইজরাদারীতেও খাজনা বৃদ্ধি চলত না, তবে স্বৈরশাসনের পীড়ন লঘুগুরুভাবে কিছু কিছু ছিল। জমিদারেরা যে কেবল জমির মালিকানা, খাজনাবৃদ্ধির ও নানা পালা পার্বণে নজরানা ও আবওয়াব আদায়ের অধিকার পেয়েছিল, তা নয়, রায়তের জান-মালের মালিকও হয়েছিল জমিদার, ইচ্ছেমতো হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর এবং তাদের দৈহিক-মানসিক জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকারও ছিল জমিদারের। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তকে দাসসত্তায় অবনমিত করেছিল, মানুষকে নামিয়ে দিয়েছিল ক্রীতদাসের স্তরে।[2]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাষী-মজুরের মন-মননের বিকাশ করেছিল রুদ্ধ। শিক্ষিত সচ্ছল মানুষেও সংক্রমিত হয়েছিল সত্তার গুরুত্ব অচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ শূন্যতা, হীনমন্যতা আর চাটুকারিতা। তাই জমিদারবিরোধী সত্যসন্ধসাহসী অপ্রিয়ভাষী ও স্পষ্টভাষী শিক্ষিত শহুরে ব্যক্তি গোটা উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে ছিল দুর্লভ। উনিশ শতকের বাঙলাগল্প-উপন্যাসে নায়করা সাধারণভাবে জমিদারই। কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজার আর্থিক ক্ষতি যত তীব্র ও গভীরই হোক, তার কোন স্থায়ী প্রভাব ছিল না বৈষয়িক জীবনেও। মানস জীবনে ব্যক্তিসত্তা যেভাবে বিক্ষত হয়েছে, তা নিরাময়ের জন্যে আরো কয়েক প্রজন্মের সচেতন সতর্ক প্রয়াস প্রয়োজন। ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সনে আইন সামান্য সংশোধিত হলেও প্রজা শোষণে ইতর-বিশেষ ঘটেনি, তবে ১৯২৭ সনের আইনে প্রজাস্বত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল বটে।

এরপর উনিশ শতক। ব্রিটিশ ও বাঙালী হিন্দুর সর্বপ্রকারে ও সর্বক্ষেত্রে সোনার যুগ। কিন্তু তার আগে একটি সাধারণ ভুল ধারণার নিরসন দরকার। কিছু ব্রাহ্মণ, কিছু বৈদ্য [চিকিৎসক] এবং কিছু সংখ্যক সৎশূদ্র তথা কায়স্থ চিরকালই থাকত শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত। এরাই যুগে যগে দরবারে ও নগরে-বন্দরে-গাঁয়ে-গঞ্জে, প্রশাসনে, শিক্ষাদানে, জমি-জমার হিসাব রক্ষায়, রাজস্ব আদায়ে, গাঁয়ের মোড়লিতে, শাস্ত্র প্রচারে, সামাজিক নীতি-নিয়ম সংরক্ষণে, নালিশ-সালিশে, বিপদে-আপদে-সম্পদে, রোগে-শোকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ-উৎসবে সহযোগিতা ও নেতৃত্ব দিত। কাজেই এরা প্রজন্মক্রমে গোটা দেশে এ কালের ভাষায় এলিটের ভূমিকাই পালন করেছে। পীড়িতের-দলিতের নালিশ শোনার এবং সালিশ করার জন্যে গ্রাম-প্রধানের এবং স্থান বিশেষে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব সুপ্রাচীন কালেও ছিল, দেখতে পাই। কাজেই তুলনায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত যুগোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সংস্কৃতিবান গ্রামীণ ও নগুরে প্রভাবশালী শাস্ত্র, সমাজ ও আর্থিক জীবন নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক বর্ণহিন্দু ছিল অর্থে বিত্তে বিদ্যায় বুদ্ধিতে গুণে মানে মাহাত্ম্যে প্রভাবে প্রতাপে ও খ্যাতি-ক্ষমতায় অনন্য ও শ্রেষ্ঠ। সে-ধারা ব্রিটিশ ভারতেও চালু ছিল, আজো রয়েছে স্বাধীন ভারতে।

বাঙলায় তুর্কী বিজয় ঘটে ১২০৪ সনে। তখন থেকেই রাজধানীতে সৈনিক ও প্রশাসক হিসেবে বিদেশী বিভাষী মুসলিম দেখা গেলেও গাঁয়ে গঞ্জে তখনই মুসলিম লভ্য হয়নি। তেরো-চৌদ্দ শতকেও গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিম ছিল নগণ্য সংখ্যক, পর্তুগীজ-যূরোপীয়দের হাতে দীক্ষিত বাঙালী খ্রীস্টানের মতোই ছিল বলে অনুমান করি। পনেরো শতকে প্রায় গাঁয়েই মুসলিম পাড়া ও দীক্ষিত মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ষোল শতকে আমরা কেবল প্রায় কাহিনীই নয় —শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও নবীকাহিনীও পাই। তখন দেশে আরবী ও শাস্ত্রশিক্ষা বাঞ্ছিত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাঙালী মুসলিমরা যে নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য হিন্দু-বৌদ্ধজ তা আজকাল আর কেউ অস্বীকার করে না। সে-যুগে শিল্পবিপ্লবের মতো কিছু ঘটেনি। কাজেই ধর্মান্তরের ফলে তাদের বৃত্তি-বেসাতে তেমন বিপ্লবাত্মক কোন আর্থিক পরিবর্তন ঘটেনি, শিক্ষার ঐতিহ্য এবং চাকরীগত চাহিদা বা প্রয়োজন ছিল না বলে, তাদের মধ্যে ক্বচিৎ কারো ঘরে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ পেশান্তরে সম্পদশালী হয়েছিল, হয়েছিল প্রান্তিক বা সচ্ছল মধ্যমানের চাষী। এরাই অন্যদের [নিঃস্বদের, নিম্ন বিত্তদের, নিম্ন বৃত্তিজীবীদের] আতরাফ ও আজলাফ নামে অভিহিত ও অবজ্ঞেয় করে নিজেরা হিন্দুদের আদলে [স্পৃশ্য উচ্চবর্ণের] খানদানী হয়ে ওঠে। বিত্ত পরিচায়ক ভূঁইয়া [ভৌমিক], চৌধুরীর যেমন হয়, তেমনি পদ ও পদবী পরিচায়ক ছিল কাজী, খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি, শেখ, সৈয়দ, খান।

সাধারণভাবে আজো বৈষয়িক জীবনে লেখাপড়ার ঐতিহ্যহীন কোন কোন পরিবারে এমনকি শিক্ষিত পরিবারেও ছেলেমেয়েদের ঘরে মক্তবে-মসজিদে আরবী হরফ কোরআন পাঠ শেখানো হয়, ভাষা শেখানো তো হয়ই না, লেখানোও হয় না। এদের কেউ কেউ লেখাপড়া শিখে মোল্লা-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-উকিল-হেকিম প্রাথমিক শিক্ষক [খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি], দারোগা, গোমস্তা, নায়েব, পীর এবং সর্বোচ্চ কাজী ও ফৌজদার হতেন। এর উপরে কোন দেশজ মুসলিম কোন পদে নিযুক্ত হয়নি তুর্কী-মুঘল আমলে। বাঙালী তথা ভারতীয় [বিশেষত নিম্নবর্ণজ] কোন মুসলিম তুর্কী-মুঘল আমলে প্রশাসক কিংবা দরবারে আমির ছিলেন বলে জানা যায় না, কেবল দিল্লীতে মালিক কাফূর আর রূপকথার কালাপাহাড়ই ব্যতিক্রম। অথচ দেশজ বর্ণ হিন্দুরা চিরকালই তুর্কী-মুঘল সেনাবাহিনীতে ও দরবারে উচ্চ পদ পেয়েছেন। কাজেই তুর্কী-মুঘল ও ইংরেজ আমলে [উনিশ শতকের তৃতীয়পাদ অবধি] গাঁয়ে গঞ্জে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগুরু বা অধিজন। স্বধর্মী-তুর্কী-মুঘলদের সঙ্গে দেশজ মুসলিমদের কোন সূত্রেই কোন সামাজিক যোগ ছিল না, যেমন ছিল না দেশজ খ্রীস্টানের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের। অতএব সেই স্বৈর সামন্ত শাসক-শাসিত স্থবির ও গ্রামে বদ্ধ গ্রামীণ সমাজে উনজন, নির্বিত্ত, নিম্নবিত্ত নিম্নআয়ের পেশাজীবী মুসলিমরা ইংরেজ আমলেও [বিশ শতকের প্রথম পাদ প্রজাস্বত্ব আইন ১৯২৮ সন অবধি] ছিল গাঁয়ের হিন্দু ধনী-মানী-সর্দারদের অর্থাৎ বিদ্যায় বিত্তে শ্রেষ্ঠ অর্থ-সম্পদশালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ শাসিত ও শোষিত। স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত অবধি জমিদার-মহাজন-ডেপুটি-মুন্সেফ-উকিল-ডাক্তার, কেরানী-পুলিশ, দোকানদার, শিক্ষিত ও শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক নাপিত-ধোপা, কামার-কুমার, স্বর্ণকার প্রভৃতি এবং উঁচু মানের পেশাজীবী মাত্রই ছিল হিন্দু। কাজেই গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ শাসনকালে দেশজ মুসলিমরা সাধারণভাবে অজ্ঞ অনক্ষর এবং নির্বিত্ত ও স্বল্পবিত্তশ্রেণীর মানুষ ছিল, আর বর্ণহিন্দুরা ছিল প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগে সর্বত্র ও সবসময়ে 'এলিট'। উল্লেখ্য যে পলাশীর ও বকসারের পরাজয়ের পরে বিদেশাগত বিভাষী সব সৈনিক-প্রশাসকেরা বাঙলা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ক্বচিৎ কেউ কেউ সম্পত্তি, আয়মা সম্পত্তি ও মদদই মাস সম্পৃক্ত নানা সুবিধা অসুবিধার দরুন থেকে গিয়েছিল। আর মুর্শিদাবাদে, কোলকাতায়, হাওড়ায়, হুগলীতে, ঢাকায়, চাটগাঁয় থেকে গেছে উর্দুভাষী নিম্ন পেশার লোকেরা। লাখরাজ আয়মা-ওয়াক্ফ সম্পত্তি ১৮২৮ সনের আইন সত্ত্বেও মুসলমানেরা ১৮৪৬ সন অবধি ভোগ করেছে।

কোম্পানী আমলে চাকরী হারিয়েছে বিভাষী সৈনিক-প্রশাসকরা এবং বাঙালী কাজীরা। মুন্শী উকিলরা মোটামুটি ১৮৬০ সন অবধি আদালতে ফারসী মাধ্যমে ওকালতি করেছেন। এরপর ইংরেজী পুরোপুরি চালু হয়ে গেল বলে অফিস আদালত ১৮৬০-১৯০০ সন অবধি মুসলিমশূন্য হয়ে গেল। তবু এ সময়ে পূর্বতন শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের ১৯৮ জন বি-এ ও কিছু বি-এল ছিলেন এবং ১৮৮১ সন থেকে মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। W. W. Hunter প্রভৃতি ব্রিটিশ প্রশাসক-লেখকদের গ্রন্থে, রিপোর্টে ও মন্তব্যে বিভাষী মুঘল-মুসলিমদের পদচ্যুতি, তজ্জাত দারিদ্র্য ও অশিক্ষা প্রভৃতির যে বর্ণনা রয়েছে, তা বাঙলাভাষী মুসলমানদের ক্ষেত্রে কখনো প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু তথ্য জানা ছিল না বলে দেশজ মুসলিমরাও স্বধর্মী সুবাদে নিজেদের তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি ভেবেছে। আর উনিশ-বিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম মাত্রই ইংরেজ প্ররোচনায় হিন্দুদের ভেবেছে তাদের সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের কারণ। এই ভুল ধারণাবশে বিদ্বিষ্ট মনে হিন্দুদের তারা দেখতে শিখেছে মুসলিমদের শোষক, শাসক এবং শত্রুকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী রূপে। এ চেতনাকে উনিশ শতকে প্রথম উদ্দীপিত করে ইসলামের ও মুসলিমের পুনরুজ্জীবনবাদী ওয়াহাবীরা, পরে পরোক্ষ ফরায়েজীরা [ফরজে অনুগতরা] এবং বিশ্বমুসলিম সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববাদী সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী এবং স্যার সৈয়দ আহমদ। আসলে বর্ণ হিন্দুর চরিত্রে পেশায় আনুগত্যে ও লক্ষ্যে গত দু'হাজার বছর ধরে কোন অসঙ্গতি ছিল না, মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল আমলে তারা দরবারে-প্রশাসনে ও নানা পেশায় একইভাবে উপস্থিত ছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছিল মানুষের প্রায়স্থির নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতিবদ্ধ নিস্তরঙ্গ মৃদু-মন্দগতি জীবন-যাত্রা। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা যখন ষোল-সতেরো শতকে ভারতে প্রবেশ করল, তখন বাণিজ্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বায়ু হল প্রবহমান, ইংরেজ আমাদের প্রভু হয়ে বসার আগেই আমাদের নগরে বন্দরে য়ুরোপীয় নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্রসর জীবনপদ্ধতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য, কোলকাতা, হুগলী, মাদ্রাজ, দামন, দিউ, কারিকল, মাহে, বোম্বাই, গোয়া কোনটাই ভারতের রাজধানীগুলোর তথা শাসনকেন্দ্রগুলোর কাছে ছিল না। ফলে এগুলো প্রায় স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্নে গড়ে উঠতে পেরেছিল। সুবেহ বাঙলা মুঘলশাসনে থাকায় বোধ হয় কোলকাতা-হুগলীর ইংরেজ-ফরাসীর বেনে ফড়ে গোমস্তা দেওয়ান, কেরানী, কুলি-দারোয়ান এমনকি সেবন্দী পর্যন্ত প্রায় সবাই থাকত হিন্দু। কোলকাতা বন্দর তাই প্রধানত হিন্দু নিয়েই গড়ে উঠেছিল, কোলকাতা রাজধানী হলে ভাঙাহাট মুর্শিদাবাদ থেকে উর্দুভাষী বৃত্তিজীবী মুসলিমরা কোলকাতায় এসে পেশা চালু রাখে।

কোলকাতার কোম্পানীর চাকুরে ও সহযোগীরা পূর্ব থেকেই কেজো কথা ইংরেজী শিখতে থাকে। ইংরেজ শাসক হয়ে বসার মুহূর্ত থেকে 'এলিট' শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হিন্দুরা সন্তানদের ইংরেজী শেখাতে থাকে। ফারসীর বদলে যে ইংরেজী প্রশাসনের ভাষা হবে তা কল্পনায়ও আসার আগেই কোলকাতার ইংরেজরা ঘরে ঘরে স্কুল খুলে বসে এ কালের গৃহগত কিন্ডার গার্টেনের মতোই।

বন্দরে বন্দরে হিন্দুদের আর্থিক সোনার যুগ এবং মানসিক আধুনিক কাল শুরু হয়েছিল সতেরো শতকের প্রায় গোড়া থেকেই। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের সহযোগিতা ছাড়া বাঙলাদেশ প্রাচীন-মধ্যযুগেও কখনো সরকার-প্রশাসন চলেনি। ইংরেজ আমলেও তারাই হল ব্যবসায়-প্রশাসনাদি সব কাজে নির্ভর। ইংরেজের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ে, গোটা-ভারতব্যাপী রাজ্যের বিস্তার ঘটে, আর বাঙালী বাবুদেরও বিত্তে ও বিদ্যার প্রসার ঘটে এবং বাবুরা ইংরেজী বিদ্যার জোরে গোটা ভারতের সর্বত্র উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-কেরানী রূপে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ আমলে গাঁয়ে গঞ্জেও পণ্যবিনিময় মাধ্যম কমতে থাকে, টাকায় লেন-দেন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোলকাতায় কোম্পানীর সহযোগী ও অনুসারক হিন্দুর ব্যবসা বাণিজ্য চাকরী ও ঘুষ-দুর্নীতিজাত অর্থ-সম্পদ আকস্মিকভাবে স্ফীত হতে থাকে। কোলকাতা শহরে তখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কাঁচা টাকার ধনী হিন্দু অনেকতায় বহু। কর্নওয়ালিস প্রমুখ শাসক-প্রশাসকেরা এসব টাকার মালিকদের উৎসাহ দিয়ে জমিদার বানিয়ে মান-সম্মানের সামন্ত সহযোগী করে তোলেন, এতে ইংরেজরা এক ঢিলে দুই পাখি মারল, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্ছেদ করল, আর ব্রিটিশ শাসন স্থিত ও স্থায়ী রাখবার জন্যে কায়েমী স্বার্থসচেতন বিশ্বস্ত মুৎসুদ্দী ও আঞ্চলিক সহযোগী পেয়ে গেল। এরা সাধারণভাবে ১৭৯৩ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ব্রিটিশ অনুগত ছিলই।

প্রতীচ্য বিদ্যায়, বাণিজ্যিক অর্থে, চাকরীর আয়ে, ভূসম্পদে ও অন্যান্য বিত্তে-বেসাতে ঋদ্ধ কোলকাতার বর্ণ-হিন্দু সমাজ হয়ে উঠল কাঙ্খ্য প্রণোদিত বৃহৎ ও মহৎ জীবনের সঙ্কিৎসু, জিজ্ঞাসু হল জগতের ও জীবনের তাৎপর্যের, অম্বিষ্ট হল তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস ও শাস্ত্র। জাগল তাদের মনে কোলকাতাকে সর্বপ্রকারে 'লন্ডন' বানাবার সুখস্বপ্ন। রামমোহন, ডিরোজিও, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন ঠাকুর, মধুসূদন, বঙ্কিম, কেশব সেন, বিবেকানন্দ প্রমুখ আস্তিক, নাস্তিক, সংস্কারক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিক, দার্শনিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং হিতবাদ, উপযোগবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, ব্রহ্মবাদ, অজ্ঞেয়বাদ অনুশীলক তখনকার সুদীর্ঘ কয়েক সারি প্রখ্যাত ও মহৎ নাম। বাঙালী হিন্দুর এ মানস জাগরণকে, এ মনীষার ও মনস্বিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মেষ-বিকাশকে বিদ্বানেরা হিন্দুর পুনরুজ্জীবন বা রেনেসাঁস নামে আখ্যাত এবং হিন্দুর জাতীয় চেতনার ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভবকাল বলেও অভিহিত করেন। কিন্তু তখনো তারা ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতার অনুগ্রহ বলে জানত এবং মানত। বলেছি, সতেরো শতকে কোম্পানীগুলোর সান্নিধ্যে বাঙালী বর্ণ-হিন্দু অর্থে বিত্তে প্রভাবে প্রতাপে এবং কিছুটা পরিবেষ্টনীজাত চেতনায় সৌভাগ্যের শুরু। তখন থেকেই ১৮৬০-৭০ সন অবধি তারা ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক। ওয়াহাবী আন্দোলনের ও সিপাহী বিপ্লবের পরে ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন ঘটে। তারা মুসলিম-তোষণ নীতি গ্রহণ করে। আগ থেকেই বর্ণ হিন্দু সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে। কাজেই আঠারো ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মতো হিন্দুদের মধ্যে উদারভাবে বিতরণ করার মতো সুযোগ বা চাকরী ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে কিংবা সরকারি অফিসে ছিল না। ফলে অর্থে-বিত্তে বিদ্যায় পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট শ্রেণীর মধ্যেও অর্থাগমের ও চাকরীর অবাধ উপায় আর রইল না। কাজেই তাদের মধ্যকার ওই ক্ষোভ ও অনুপায় তাদেরকে আত্মমর্যাদা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সচেতন করে তোলে। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে ও ১৮৬৭ সনে 'হিন্দু মেলা' অনুষ্ঠানে। এর পরেই যুগান্তর ও অনুশীলন (১৯০২) নামে আইরিশ দ্রোহ ও ম্যাটিসিনি অনুপ্রাণিত গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে, উনিশ শতকের শেষ দশকে বিপ্লব বা সন্ত্রাস কর্ম শুরুও হয়, ১৮৮৫ সনে কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের অসন্তোষের বৃদ্ধি রোধ করার ও তীব্রতা কমানোর জন্যেই। পাঞ্জাবে মহারাষ্ট্রেও এ সময়ে ব্রিটিশবিরোধী দল ও দ্রোহ দেখা দেয়।

এর পরে সিপাহী যুদ্ধে পরাজয়ের এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতার গ্লানি মুসলিমদের হতোদ্যম ও আপোসবাদী করে তোলে। স্যার সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ও নেতৃত্বে বাঙলার ও ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিমরা ব্রিটিশের আনুগত্য অঙ্গীকার করে এবং ১৯৪৭ সন অবধি সে-আনুগত্য রক্ষা করে। ভেদনীতির প্রয়োগ সাফল্যে বিশ্বাসী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত প্ররোচনায় ইংরেজীশিক্ষিত কিন্তু তুর্কী-মুঘল আমলের আত্ম-বৃত্তান্ত বিস্মৃত, অর্থাৎ দেশে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ও অবস্থানের কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ মুসলিমরা মনে করেছে, বুঝি ব্রিটিশ আনুকূল্যে হিন্দুরা তাদের পূর্বতন অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাজেই তারা ক্ষোভ ও বিদ্বেষ নিয়ে হিন্দুদের দেখেছে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রেই প্রজন্মক্রমে শত্রু, প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে।

ইসলাম ও মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী ওয়াহাবী-ফরায়েজীরা কেউ প্রতীচ্য বিদ্যায় ও জীবন ধারণায় প্রাজ্ঞ ছিলেন না। মধ্যযুগীয় জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা নিয়ে অর্থাৎ মৌলবাদী সংস্কারকরূপে সর্বপ্রকার ও সর্বক্ষেত্রে প্রাগ্রসর জীবন চেতনা সম্পন্ন ও উন্নততর কৌশল-প্রযুক্তি কুশল সমকালীন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো বুদ্ধির, শিক্ষার ও পদ্ধতির সমতা ও যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। ফলে তাদের প্রয়াস বৃথা ও ব্যর্থ হওয়া ছিল স্বাভাবিক। যদিও গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষ তাঁদের প্রচারে প্রণোদিত হয়ে তাঁদের আহ্বানে সাগ্রহে জানে মালে সাড়া দিয়েছিল বিপুল সংখ্যায়। এ ব্যর্থতার গ্লানি থেকেই নিরক্ষর গ্রামীণ মুসলিমরাও সম্বিৎ ফিরে পায় এবং ভাতে-কাপড়ে, গুণে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে ও প্রভাবে প্রতিপত্তিতে বাঁচার এবং মুসলিম সমাজকে বাঁচানোর জন্যে ইংরেজী শিক্ষা যে আবশ্যিক, তা উপলব্ধি করে। তাই ১৮৮০ সনের পর থেকে শিক্ষার ঐতিহ্যবিরহী মুসলিম সমাজেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। উল্লেখ্য যে, কোলকাতার হিন্দুদের জীবিকার প্রয়োজনে ইংরেজী ভাষা শেখা উনিশ শতকের উষাকাল থেকেই তাদের সমাজে সোৎসাহে শুরু করলেও ১৮১৭ সনে তাদের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলেও, প্রশাসনের ভাষারূপে ইংরেজী আইনগত হয় ১৮৩৮ সনে, আবশ্যিক প্রয়োগের নির্দেশ দেন লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ সনে। উর্দুভাষী মুসলিমরা কোলকাতায় মুর্শিদাবাদে [১৮২৪ সন] থেকেই উর্দুভাষী মুসলিমরা বি.এ-ও পাশ করতে থাকে। তখন থেকেই দেশজ গ্রামীণ শিক্ষিত পরিবারে ইংরেজী শেখানোর চেষ্টা শুরু হয় বটে, কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতায় ওদের শিক্ষা অসমাপ্তই থেকে যায়।

উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে কোলকাতায় মুসলিমরাও মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করতে থাকে, অর্থ-কৃচ্ছতা সত্ত্বেও, সমাজে চেতনা সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশে। এভাবে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং আধুনিক চিন্তা-চেতনা-মনন প্রকাশের ক্ষেত্রে শহুরে মুসলিমরা ছিল প্রায় অনুপস্থিত। সাধারণভাবে গ্রামবাসী অনক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত বা সাক্ষর দেশজ মুসলিমরা বাস্তবে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ছিল প্রশাসনে-আদালতে-বাণিজ্যে অনুপস্থিত। স্বাধীনতা উত্তরকালেও আজ অবধি সে-ক্ষতি পূরণ হয়নি। বলতে গেলে ১৭৬৫ বা ১৭৭০ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি [বহিরাগত] শহুরে উর্দুভাষীরা ছিল দেশজ মুসলিমের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি।

উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে মুসলিমরাও সরকারি অফিসে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীতে তথা বেয়ারা-কেরানীর চাকরি খুঁজতে গিয়ে বড়বাবুর কৃপাবঞ্চিত হতে থাকে। তখন থেকেই হিন্দুরা এতকালের নির্বিঘ্ন অধিকারে এ মুসলিম-উপদ্রবে হচ্ছিল বিরক্ত। ব্রিটিশের অসংশয় আদর-কাড়ার পাট কিছু আগেই চুকে গিয়েছিল শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে। কাজেই এখন থেকে বর্ণহিন্দুর স্বার্থ-বিরোধী দুই শক্তির উপস্থিতি অনুভব করছিল হিন্দুরা ঃ একটি জীবিকাক্ষেত্রে মুসলিমের, অপরটি শাসক-শোষক হিসেবে বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের। ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানেরা হিন্দুদের জানল জীবিকাক্ষেত্রে জমিদার-মহাজন-চাকুরেরূপে জানি দুশমন হিসেবে। ব্রিটিশ সরকারও হিন্দুর ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ-রোষ সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক ছিল। তাই জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস গঠন করিয়েই তারা নিশ্চিন্ত ছিল না। অবশ্য সুবেহ বাঙলার তথা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিশালতার দরুন প্রশাসনে নানা সমস্যা অনুভব করছিল সরকার। সেজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বিযুক্তির কথা মাঝে মধ্যে কমিশনার শ্রেণীর বড় বড় প্রশাসকরা ভেবেছেন এবং বিযুক্তি-বিভক্তির জন্যে চিঠি এবং লিখিত সুপারিশও পাঠিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। তবু তখন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু যখন দেখল যে তরুণ হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনবিরোধী হয়ে উঠেছে, শিক্ষিত সমাজনেতারা ক্রমে সর্বভারতীয় নেতা হয়ে উঠেছেন এবং ব্রিটিশের কাছে নানা দাবি-দাওয়া পেশ করছেন, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদেরও এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্যে অনুপ্রাণিত বা প্ররোচিত করছেন, বিশেষ করে পাঞ্জাবে মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাস-পন্থী দেখা দিয়েছে, তখন লর্ড কার্জন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি দৃশ্যত প্রশাসনিক প্রয়োজনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনভাবে বিভক্ত করলেন যাতে বাঙলাভাষী হিন্দুরা সর্বত্র পূর্ববঙ্গে, বিহারে, উড়িশায় উনজন হয়ে পড়ে। এভাবে বাঙালী হিন্দুর নেতৃত্ব, গুরুত্ব ও অস্তিত্ব বিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে তারা সায় দিতে পারে না। ফলে এই প্রথম বাঙালী বর্ণহিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়। তখন হিন্দুদের যুক্তি ছিল দেশমাতা বঙ্গজননীকে দ্বিখণ্ডিত করা চলবে না। বঙ্গমাতার সন্তানেরা কিছুতেই মেনে নেবে না। ছয় বছর পর ১৯১১ সনে ইংরেজরা এদের দাবি মেনেই নিল। ১৯০৫-১১ সনের আন্দোলনকারীদের প্রায় চল্লিশ শতাংশ উনিশ শ' সাতচল্লিশ সনেও বেঁচেছিল, কিন্তু এরাও বঙ্গমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবিতে ছিল মুখর। কেবল শরৎবসু ও কিরণশঙ্কর রায়কেই সেদিন প্রকাশ্যে অখণ্ড বঙ্গ রক্ষার চেষ্টায় নিরত দেখি। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় মুসলিমরা-নেতারা মর্মাহত হয়েছিল, যদিও বাস্তবে নতুন প্রদেশে নিরক্ষর মুসলিমদের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা ছিল না বলে যখন প্রাগ্রসর হিন্দুদের হাতে চাকরী ও ব্যবসা রয়েই গেল, তখন কি লাভ হত তা স্পষ্ট নয়।

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ গোড়ায় বঙ্গবিভক্তির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু জমিদারীর ঋণ শোধ বাবদ না চাইতেই সরকার থেকে দশ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়ে তিনি লর্ড কার্জনের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাঁর শেখানো বুলি মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রিটিশ সৃষ্ট নতুন প্রদেশে [৬০% মুসলিম] নাকি পঞ্চাশ লক্ষে অধিজন নিরক্ষরতাদুষ্ট গ্রামীণ মুসলিমদের সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকার উন্নতি দ্রুততর হবে। বাস্তবে দেখা গেল, অর্থে-বিত্তে-বৃত্তিতে-বেসাতে একটুও অগ্রসর হয়নি, বিদ্যালয়ে হিন্দু, অফিসে হিন্দু, ব্যবসায়ে হিন্দু, জমিদারী-মহাজনীতেও হিন্দু পূর্ববৎ রয়ে গেল এমনকি আবাসিক ওয়ারীর সব বাড়িই ছিল হিন্দুর। এ ছিল প্রাশাসনিক বিভাগ মাত্র। কাজেই পরবর্তী কালের মতো ভিন্ন রাষ্ট্র ছিল না যে দাঙ্গা করে বিধর্মী তাড়িয়ে বিত্ত-বৃত্তি-বেসাতের মালিক হবে। নাওয়াব সলিমুল্লাহর অনুরোধে প্রতিষ্ঠিত এমনকি ১৯২১-৪৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী-ফারসী বিভাগেও সব শিক্ষক বাঙালী এবং মুসলমান ছিল না। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষক ছিল বিরল বা করগণ্য। আর বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ১৯৪০ সন অবধি ঢাকা জেলা থেকে আসা হিন্দু ছাত্রদের চেয়ে কম।

এদিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে ১৯০৫ সনের পরে বিক্ষুব্ধ বাঙালী নেতাদের প্ররোচনায়, প্রেরণায় ও নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধীদের নানা দাবি ও আন্দোলন সারাভারত ব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এমনি সময়ে ১৯০৬ সনের অক্টোবর মাসে লর্ড মিন্টোর প্ররোচনায় ও পরামর্শে* উদ্যোগী জমিদার, বিত্তবান উচ্চশিক্ষিত, অর্থবান উকিল ব্যারিস্টার ও প্রাক্তন উচ্চপদস্থ অফিসারেরা স্যার সলিমুল্লাহর আহ্বানে ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ লক্ষ্যে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য বিত্তের ও বিদ্যার জোরে ব্রিটিশ সরকারের এসব অনুগত জনেরা অনক্ষরতা ও দারিদ্র্যদুষ্ট মুসলিম সমাজেরও আঞ্চলিক নেতা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ব্রিটিশ সরকারের

* হিন্দু-মুসলিমে স্থায়ী দ্বন্দ্বের ব্যবস্থা তজ্জাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দীর্ঘায়ু হল বলে ১ অক্টোবরের এক পত্রে লেডি মিন্টো আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।–আমলেশ ত্রিপাঠী, কংগ্রেসের ইতিহাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরির যোগ্যতা ও প্রত্যাশা ছিল না বলে মুঘল রাজত্বের গৌরবগর্বী স্বাধীনতাকামী ইংরেজী না-জানা মৌলবী-মোল্লারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস সমর্থকই ছিলেন, যদিও জামায়েত-ই-ওলেমায়ে হিন্দ/ইসলাম নামে পৃথক সংঘ-সমিতি ছিল। বাঙালী হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের ও সর্বভারতীয় হিন্দু অসন্তোষের মুখে ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হল সরকার। ইতিহাসের দুটো স্মরণীয় বছরের আকস্মিক সাদৃশ্য এখানে উল্লেখ্য। ১৮১৫ সনে রামমোহনের কোলকাতায় স্থায়ী বসবাসের পরে পরেই চিন্তা-চেতনা-মননের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসধর্মী আলোড়ন-আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ১৯১৫ সনে গান্ধীর কংগ্রেসে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস পরিপূর্ণভাবে সরকারবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দুটোই বাঙলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা বাঙলা ও ভারতবর্ষ এ দুই যুগন্ধর পুরুষের অনন্য-অসামান্য মনীষায় ও কীর্তিতে ঋদ্ধ হয়েছিল।

বলেছি, ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের ও ব্রিটিশবিরোধিতার অবসানে ব্রিটিশ সরকার মুসলিম তোষণনীতি গ্রহণ করেন। অধিজন হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাভীরু মুসলিমরাও নানা সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ পাবার দাবি বা আবদার করে। আগা খানের নেতৃত্বে ১৯০৬ সনের পয়লা অক্টোবর মুসলিমদের জন্যে স্বতন্ত্র হিন্দু-মুসলিমে স্থায়ী দ্বন্দ্বের ব্যবস্থা তজ্জাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দীর্ঘায়ু হল বলে ১লা অক্টোবরের এক পত্রে লেডি মিন্টো আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। [অমলেশ ত্রিপাঠী, কংগ্রেসের ইতিহাস]। নির্বাচন ও অতিরিক্ত আসন দাবি করা হয়। বড়লাট মিন্টো এবং ভারতে সচিব মর্লে মুসলিমদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিতে নীতিগতভাবে তৈরিই ছিলেন। তাই ১৯০৭ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে হাউস অব লর্ডসে ঘোষণা করা হয়: " The Muhamadan demand of election of their own representatives to the Councils in all stages and the grant of number of seats in excess of their actual numerical proportion of the population would be met to the full."

এ ঘোষণায় আন্তরিকতা কতটুকু ছিল, জানার উপায় নেই, কেননা ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে চার বছর সময় পেয়েও এর বাস্তবায়নের কোন ব্যবস্থা হয়নি। তবে ১৯১৬ সনে কংগ্রেস-লীগের মধ্যে আপোস মিলনমুখী একটা সমঝোতা হয়েছিল। স্বতন্ত্র নির্বাচনের স্বীকৃতিতে ও ভিত্তিতে পাঞ্জাবে ৫০%, যুক্ত প্রদেশে ৩০%, বাঙলায় ৪০%, বিহার-উড়িশায় ২৫%, মধ্যপ্রদেশে ১৫%, মাদ্রাজে ১৫%, এবং বোম্বাইয়ে ৩৩% আসন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার করা হল। তা ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক-তৃতীয়াংশের আপত্তি থাকলে কোন বেসরকারি প্রস্তাব কাউন্সিলে উত্থাপিত হতে পারবে না, আর কেন্দ্রেও মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মুসলিমদের দেয়া হবে বলে প্রস্তাব গৃহীত হল। এটির নাম লক্ষ্ণৌচুক্তি। ১৯১৭ সনে মনট্যাগু-কমিশন ভারতে এসে ২০শে আগস্ট ভারতকে শর্তসাপেক্ষে স্বরাজ দেয়ার অঙ্গীকার করেন। তাতে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কেজো সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব, স্বতন্ত্র নির্বাচন, সংখ্যাগুরুকে প্রাপ্য আসনদান এবং তিন-চতুর্থাংশের আপত্তি থাকলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পৃক্ত কোন প্রস্তাব উত্থাপন না করার কথা ছিল। ১৯১৬ সনের লীগ-কংগ্রেস চুক্তির সঙ্গে মনট্যাগু- চেমসফোর্ড রিপোর্টের (১৯১৯) পার্থক্য ও সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আবার রওলাট বিলও [১৯১৯] হিন্দু-মুসলিমকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মর্তব্য। কিন্তু এর মধ্যেই অতুষ্ট গান্ধী করলেন অসহযোগ আন্দোলন। বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বমনস্ক স্বদেশে বহির্মুখো মুসলিমরাও তখন আবেগবশে তুরস্কে খলিফা-উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে মুখর। অসহযোগকালে কংগ্রেস-নেতা গান্ধী মুসলিমদের কৃতজ্ঞ ও সহযোগী করার লক্ষ্যে সদলে খেলাফত সংগ্রামে [১৯২০ সনে] যোগ দিলেন। কিছু কালের জন্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের লক্ষ্য হল অভিন্ন। সাময়িক উত্তেজনা ও সাময়িক বিষয় বা ইস্যুভিত্তিক এ মিলন অনতিকালেই [১৯২৬] রক্তক্ষরা দাঙ্গায় অবসিত হল। অবশ্য ১৯২১ সনের মোফলা বিদ্রোহেও এর সূচনা বলা যেতে পারে। ১৯২৩ সনে মহাসভাপন্থীরা আর্যসমাজের শুদ্ধি আন্দোলনের সমর্থনে ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। এদিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল দেখেই ১৯২৩ সনে মুসলিম লীগ সুপ্তি পরিহার করে জাগ্রত হল।

মধ্যপন্থী চিত্তরঞ্জন দাসের দলের সঙ্গে (১৯২৩ সনে) এদের একটা বাংলাদেশে সীমিত রাজনীতিক স্বার্থ বিষয়ক চুক্তিও হয়েছিল, নাম Bengal-Pact. মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, মোফলা বিদ্রোহ ও হিন্দুপীড়ন, হিন্দু মহাসভার সমকালীন ভূমিকা, আর্যসমাজীর শুদ্ধি ও প্রচার, ১৯২৫ সনে খিদিরপুর ডকে কোরবানীর গো-হত্যা নিয়ে উগ্রহিন্দুর বাধানো দাঙ্গা, রাওয়ালপিণ্ডির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা [১৯২৬ সনের জুন] কোলকাতার দাঙ্গা [১৯২৬ সনের এপ্রিল ও জুলাই], স্বতন্ত্র নির্বাচন ও হিন্দু নারীর মুসলিম প্রেম বা মুসলিমের হিন্দু নারীর প্রতি আসক্তি ও হরণ, গো-হত্যা, ১৯২৬ সনে শুদ্ধিনেতা শ্রদ্ধানন্দ হত্যা ও দিল্লীদাঙ্গা, ধর্মভেদ প্রভৃতি অনেক প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, মানসিক ও ঐতিহাসিক লঘু-গুরু স্থায়ী-ও সাময়িক কারণে হিন্দু-মুসলিম মিলন অবাস্তব-অসম্ভব হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে ১৯২৬ সন ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসের গতি নির্ধারণ ও প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অব স্টেটের কয়েকজন মুসলিম নেতা সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে প্রদেশে পরিণত করলে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে যৌথ নির্বাচনে মুসলিমরা রাজি হবে বলে এ সময় (১৯২৬ সনে) এক বিবৃতি প্রচার করেন। অবশ্য সংখ্যালঘুদেরও কিছু সুবিধে দেয়া হবে। এসব প্রস্তাব বিবেচনার কাল তখন অতিক্রান্ত । এর পর থেকে ১৯৪৭ সন অবধি চলছে কেবল ত্রিপক্ষীয় দরকষাকষি, প্রকাশ্যে নিরাবরণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে মুসলিম লীগের ভরসা ছিল ব্রিটিশ আনুকূল্যে ও সমর্থনে, বলা যায় মুসলিম লীগের শক্তির উৎসই ছিল ব্রিটিশ ভেদনীতি ও সমর্থন। ১৯৩১-৩২-৩৩ সনের রাউন্ড টেবিল বৈঠক আপাতত ব্যর্থ হলেও মুসলিম লীগের তথা জিন্নাহর চৌদ্দ দফার অন্তর্গত সিন্ধু-বালুচিস্তান-সীমান্ত অঞ্চল ও আসাম প্রদেশের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং ১৯৩৫ সনের আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার মেলে, যদিও কেন্দ্রীয় ফেডারেশন সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হল না। এমনকি কংগ্রেস-লীগের যুক্ত মধ্যবর্তী সরকারও টিকল না—দুই দলের স্বেচ্ছাকৃত অসহযোগ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রেষারেষির ফলে। অবশেষে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে লাহোর সম্মেলনে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাদের অন্তরে আস্থা ছিল যে এ দাবির চরমতার আলোকে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে শুভবুদ্ধি ও শ্রেয়োবোধ জাগবে এবং কংগ্রেস-লীগ একটা সমঝোতায় ও সিদ্ধান্তে পৌছাবে। আসলে কংগ্রেস-লীগের দূরত্ব বাড়ল ১৯৩৪ সনে জিন্নাহর স্থায়ীভাবে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিমলীগের কর্ণধার হওয়ার ফলে। আগে ব্রিটিশ অনুগত ক্ষমতালোভী জমিদার-ব্যারিস্টার নিয়ন্ত্রিত লীগের তেমন কোন দৃঢ় ও স্পষ্ট রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল না। কেবল সুবিধা ও পদপ্রাপ্তিই ছিল লক্ষ্য।

বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ লীগের নেতৃত্ব নিয়ে ১৯৩৪ সনে দেশে ফেরেন। জিন্নাহ্ ছিলেন একজন শাস্ত্রে আচারে উদাসীন, জন্মসূত্রে আগাখানী বা ইসমাইলী। তাঁর পরিবারিক জীবনও ছিল পার্সীঘেঁষা। তাঁর ও তাঁর গোষ্ঠীর স্বার্থ আর মুসলিম স্বার্থ সে-অর্থে অভিন্ন ছিল না। যদিও সুলতান আগা খান যুগের নিয়মে মুসলিম নেতাই ছিলেন। কাজেই যথার্থ তাৎপর্যে তাঁর কোন ইসলাম-মুসলিম প্রীতি থাকার কথা নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাই তিনি ছিলেন মুসলিমপক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্যনিষ্ঠ কৌসুলী বা এ্যাডভোকেট এবং মানতেই হবে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করে সমকালের মুসলিমদের আবেগানুগ দাবি পূরণে সফল হয়েছেন, আসকান-পাজামা ও টুপি পরেই তিনি মুসলিম ও মুসলিম লীগের অবিসম্বাদিত নেতা হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সনের নির্বাচনে এ, কে, ফজলুল হকের কৃষক পার্টি বেশি সংখ্যক (৩৬) মুসলিম আসন লাভ করে, মুসলিম লীগ আশানুরূপ আসন পেল না। ফজলুল হক পরিণামে [১৯৩৭ অক্টোবর] লীগে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হলেন বাঙলায়। এ সময়ে সব বিভাগে পূর্বে বঞ্চিত মুসলিমদের বেশি চাকরি দেয়ার নীতি গ্রহণ [৬০%]* করলেও বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তি-প্রকৌশল ক্ষেত্রে নিয়োগ করার মতো যোগ্য মুসলিমের তখন অভাব থাকায় উক্ত বিভাগগুলোতে পূর্বের মতো হিন্দুর হাতেই মুসলিমদের প্রাপ্য পদগুলো ছেড়ে দিতে হল। এদিকে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হল ১৯৪০ সনের মার্চে। ১৯৪২ সনের আগস্ট মাসে কংগ্রেস গান্ধীর প্রবর্তনায় ব্রিটিশ সরকারকে 'ভারত ছাড়' বলে হুমকি দিল। কোথাও কোথাও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হল তরুণেরা। গান্ধীসহ সব কংগ্রেস নেতা বন্দী রইলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান অবধি। এদিকে পূর্বানুমতি না নিয়ে ফজলুল হক বড়লাটের National Defence Council-এ যোগ দিলেন। জিন্নাহ্-ফজলুল হকের এ দ্বন্দ্বে ফজলুল হক ১৯৪১ সনে হিন্দু মহাসভানেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সদলে জুটে শ্যামা-হক [Progressive coalition] মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তা বেশি কাল টিকল না। ১৯৪৩ সনের ১৩ই এপ্রিল নাজিমউদ্দিন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৫ সনের মার্চে নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভারও পতন ঘটল বাজেট সেশনে আকস্মিক ভোটে। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে প্রায় সব আসনে লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হল। সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বে গঠিত হল মন্ত্রিসভা। ১৯০৬ সন থেকে প্রভা-প্রভাবহীন লীগ আজো অবিলুপ্ত। কিন্তু এ বিরাশি বছরের মধ্যে ওই একবারই অর্থাৎ ১৯৪৬ সনেই বাঙলায় নির্বাচনে জয়ী হয়ে [১২১ আসনের মধ্যে ১১৩ টায়] পাকিস্তান বানানোর সহায়ক হয়েছিল।

---

* ১৯৩৮ সনের ২৫ আগস্টে অনুমোদিত আইন অনুসারে। ১৯৩৯ সনে আবার নতুন নিয়োগে ৫০% মুসলিম এবং পুলিশ বিভাগেও ৫০% মুসলিম নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য বাবৎ কিছু নতুন পদে মুসলিম নিয়োগের "Until parity is reached" নীতিগ্রহণ করা হয়। এতে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩৭ সনে ফজলুল হক লীগ ছেড়ে হিন্দুদের সঙ্গে জোট বেঁধে আবার মুখ্যমন্ত্রী হন। এ সময় জাপানের ভারতমুখী অভিযানে আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে বাঙলার গভর্নর মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভাকে না জানিয়েই বাঙলায় (Scorched earth) 'পোড়ামাটি' নীতি গ্রহণ করেন। ইংরেজ আমলাদের মাধ্যমে উপকূল অঞ্চল থেকে বাঙলার ধান-চাল বাঙলার বাইরে সরিয়ে ফেলেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। ত্রিশ হাজার দেশী নৌকা বাজেয়াপ্ত ও ফুটো অকেজো করে রাখা হয়। ফলে দুর্ভিক্ষ হয়, যার নাম 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' যাতে বাঙলার পঁয়ত্রিশ লক্ষ নির্বিত্ত-নিঃস্ব মানুষ খাদ্যাভাবে বীভৎসভাবে পথে-ঘাটে মরে। ফজলুল হক এ পরোক্ষ গণহত্যার জন্যে গভর্নরকে প্রকাশ্যে দায়ী করে বলেন, 'At the present moment we are faced with a rice famine in Bengal mainly in consequence of an uncalled for interference on your part and of hasty action on the part of the joint Secretary.[3] মুসলিম লীগ তথা জিন্নাহ্ তখন ফজলুল হককে for his treacherous betrayal of the league organization and the mussalmans generally [Dec. 26, 1941] বলে মন্তব্য করেন।

রুষ্ট ফজলুল হকও ক্ষমতাপ্রিয় জিন্নাহর স্বৈরস্বভাব সম্বন্ধে মন্তব্যে বললেন, This one man was more haughty and arrogant than the proudest of the pharaohs. To add to our miseries, this Superman has been allowed to exercise irresponsible powers which even the Czars in their wildest dreams might have envied.[4] [letter to the leaders, Hindusthan Standard, 21 June '42, as Quoted in Muslim politics in Bengal (1937-47)].

এর পর রুষ্ট ফজলুল হক হিন্দুদের সঙ্গে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন ১৯৪১ সনের ১১ই ডিসেম্বরে।

এ সময়ে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের তথা পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপায়ণ যে বাঙলার মানুষের স্বার্থবিরোধী তা বিশদভাবে যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে বর্ণনা করেন। ১৯৪২ সনে ২০ শে জুনে অনুষ্ঠিত 'Hindu-Muslim Unity Conference-F [Hindusthan Standard 21, June '42, Quoted by Seela Sen].[5] লাহোর [পাকিস্তান] প্রস্তাবটি ছিল এরূপ : "Resolved that it is the considered view of this session of the All India Musim League that: geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such teritorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslim are numerically in a majority as in the North Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent Units should be autonomous and sovereign.-এ সম্বন্ধে ফজলুল হকের টীকাভাষ্য ছিল এরূপ: We have to remember that the provinces geographically adjacent to Bengal are Assam, Bihar and Orissa. In Assam the Muslims are only 35% in Bihar 10% and in Orissa barely 4%. It is, therefore, evident the Bengal, as constituted can not form an autonomous state with the geographically adjacent provinces. If however, Bengal hasa got to be divided into two, the result will be that the Eastern Zone which will be a predominently Muslim area will be surrounded by four provinces in which Hindus will be in a majority.[6]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজলুল হকের এ তথ্য-প্রমাণ সব রাজনীতিকেরই দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং বুদ্ধি পরিচ্ছন্ন করেছিল। এ তথ্যই জিন্নাহ্-সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাসেমকে বাঙলা অবিভক্ত রাখার প্রয়াসে প্রবর্তনা দিয়েছিল, বড় দলুইকে আসামের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবি দৃঢ় রাখার শক্তি দিয়েছিল, শরৎবসু-কিরণশঙ্কর রায়কে পূর্ব বাঙলার হিন্দুর স্বার্থে বাঙলা অখণ্ড রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিল আর গান্ধী উৎসাহিত হয়েছিলেন বড়দলুইকে প্ররোচিত করতে এবং শরৎবসুকে বাঙলা অখণ্ড রাখার চেষ্টা থেকে বিরত করতে। এবং মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করেছিল আসাম ও পশ্চিম [বর্ধমান বিভাগ ব্যতীত] বঙ্গ ও পূর্ণিয়া দাবি করতে। আর মুসলিম লীগারদের সাধারণভাবে Truncated & moth eathen পাকিস্তান পেয়ে ঠকে যাওয়ার বেদনা ও ক্ষোভগ্রস্ত করেছিল।

১৯৪০-৪৬ সন ছিল বাঙলার তথা ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ কাল। এ সময়েই লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়, বিপ্লবাত্মক 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়, চলমান যুদ্ধে সহযোগিতায় কংগ্রেসের অসম্মতি, বোম্বাই উপকূলে নৌ-সৈন্যের বিদ্রোহ, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র নির্মাণে জটিলতা, কংগ্রেস-লীগ দেশীয় রাজন্য-ব্রিটিশের মধ্যে তীব্র দরকষাকষি, ভারতীয় মুসলিমদের একক নেতৃত্বে ও প্রতিনিধিত্বে লীগের ও জিন্নাহ্‌র প্রায় অবিসম্বাদিত প্রতিষ্ঠা, চক্রবর্তী রাজা গোপাল আচারিয়ার প্রখ্যাত ফরমুলা (জুলাই ১৯৪৪), গান্ধী-জিন্নাহ্‌র আলাপ [সেপ্টেম্বর ১৯৪৪] সিমলা কনফারেন্স [১৯৪৫, জুন] কেন্দ্র ও প্রদেশে নির্বাচন [১৯৪৫-৪৬] এবং রাজনীতি-প্ররোচিত [১৬ই আগস্টের, Direct Action ১৯৪৬] কোলকাতার, নোয়াখালীর ও বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর ক্যাবিনেট মিশন।

AMARBOI.COM

১৯৪৫ সনের জুন মাসে বড় লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতে স্বায়ত্তশাসন দানের নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যে কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের নেতাদের সিমলায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ওতে কোন ফল হয়নি। ১৯৪৬ সনের মার্চে লর্ড পেথ্রিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস এবং এ. ভি. আলেকজান্ডার—এ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠালেন ব্রিটিশ সরকার। উদ্দেশ্য তিনটি: ১. অধিজন সমর্থিত একটি সংবিধান পদ্ধতি নির্ধারণ; ২. শাসনতন্ত্র নির্মাণ কমিটি তৈরি; ৩. এবং কেন্দ্রে প্রধান রাজনৈতিক দল সমর্থিত একটি Executive Council গঠন। ১৯৪৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকার তথা শ্রমিক দলের সরকার পাকিস্তান-হিন্দুস্তান রূপে ভারতবিভাগে নীতিগতভাবে রাজি হয়ে এক ঘোষণা দিল। ঘোষণা শোনা মাত্রই বাঙলার হিন্দুমহাসভা দাবি করল বাঙলার বিভক্তি। অখণ্ড বাঙলা রাখার জন্যে অখিল দত্ত প্যাটেলের ও গান্ধীর কাছে সযুক্তি আকুল আবেদন জানালেন।[7] এদিকে মূল প্রস্তাবের Independent States-এর 'S' বাদ দিলেন জিন্নাহ্।[8] বাঙালী নেতা সোহরাওয়ার্দীরা তা মেনেও নিলেন, হিন্দুবিদ্বেষ বশে ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের জোশে।

দেশের দখল পেয়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একবার মন্বন্তর ঘটিয়েছিল ১৭৬৯ সনে, ছিয়াত্তরের সে মন্বন্তরের বিভীষিকার প্রাজন্মক্রমিক শ্রুতিস্মৃতি আজো জনমনে প্রকট, আবার জাপানের ভারত বিজয়ের আশঙ্কায়-আতঙ্কে ব্রিটিশ সরকার ধান-চাল-সরিয়ে ফেলে যাতায়াত ও চালান ব্যবস্থা নষ্ট করে ১৯৪৩ সনে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে আবার নিঃস্ব বাঙালি হত্যা করে। পঞ্চাশের সেই মন্বন্তর এখনো স্বজন-হারানোর বেদনা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষোভ জাগায়। এ পোড়ামাটি নীতিগ্রহণ ছিল শঙ্কিত ও নিতান্ত বিকৃতবুদ্ধি অক্ষমের প্রতিহিংসাজাত। কেননা তখন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের জাপানী অভিযান ঠেকানোর মতো জনবল কিংবা অস্ত্রবল ছিলই না। জাপান এল না, খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাল পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাঙালি।

রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রেয়োবাদী উদারপন্থী হিন্দু-মুসলিমরা যতই এক জাতিত্বের বা একক জাতীয়তার কথা বলুন না কেন, বাস্তবে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু কেবল হিন্দু হয়েছিলেন, হয়েছিলেন হিন্দু উজ্জীবনবাদী। আর মুসলমানরাও হয়েছিলেন বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বচেতনাপুষ্ট হয়ে স্বদেশে প্রবাসী। কাজেই সেদিন সে-অবস্থায়, দ্বেষ-দ্বন্দ্বদুষ্ট মানসিকতার প্রতিবেশে ভারত বিভক্ত হতই। কেননা মনের মিল কিংবা মতের অভিন্নতা ছিল না। হিন্দুরচিত মধ্যযুগের ও আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিমদের প্রতি ক্ষোভ, বিদ্বেষ, নিন্দা ও অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছিল। সেজন্য শিক্ষিত দেশজ মুসলমান বাঙলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকেই বরণ করতে চেয়েছিল। যেমন একই কারণে বিহারের ও উত্তর ভারতের হিন্দুরা উর্দু পরিহার করে হিন্দি বরণ করেছিল সাগ্রহে। তাই grouping or federal সরকারবদ্ধ হয়েও হয়তো শিথিল বন্ধনে টিকে থাকতে পারত না। এটা ছিল শিক্ষিত ও শহুরে সমাজের তৈরি বিদ্বেষ-বিভক্তি। সাধারণ চাষী-মজুর ও বৃত্তিজীবী মানুষেরা গোটা ব্রিটিশ ভারতে শোষণ-পীড়ন অসহ্য হলে প্রায়ই বিদ্রোহ করেছে, করেছে স্থানিকভাবে। অজ্ঞ অনক্ষর দরিদ্র বলে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে পারেনি। সে-বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেই ছিল না কেবল, জমিদার-মহাজন-নীলকুঠিয়াল প্রভৃতি সব শোষক-শাসকের বিরুদ্ধেই ছিল। পদচ্যুত ফকিরসন্ন্যাসী থেকে ওহাবী-ফরায়েজী, নীলচাষী অবধি কে বিদ্রোহ করেনি? তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার[৭] কোন কোন সংখ্যায়, প্রজাশোষণ ও প্রজাপীড়নের যেসব বর্ণনা রয়েছে তা ধর্মনির্বিশেষে সব নির্যাতিত চাষীরই জীবন কথা। ব্রিটিশ শাসন কালে নতুন পরিবেশে ব্রিটিশ ইতিহাসকারদের ও শাসকদের কারসাজিতে হিন্দুর ও মুসলিমের পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে বিষাক্ত। স্থূল কারণগুলো এই :

১. তুর্কী-মুঘলের মিথ্যা জ্ঞাতিত্বচেতনা বাঙালী মুসলমানদের বিভ্রান্ত বিড়ম্বিত করেছে।
২. ভেদনীতির সাফল্য লক্ষ্যে ব্রিটিশরচিত ইতিহাস এবং সমকালীন ভুল তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার এবং তুর্কী-মুঘলকে 'মুসলিম'—এ সাধারণ নামে চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি শিক্ষিত হিন্দুদের মুসলিমদের প্রতি বিক্ষুব্ধ ও বিরূপ করে তোলে। তারই বাহ্য ও প্রকাশ্যরূপ ছিল মন্দির-মসজিদ, গোহত্যা, বাজনা ও মিছিল নিয়ে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে স্থানিক ও বার্ষিক দাঙ্গার পুনর্পৌনিকতা।
৩. প্রতীচ্য শিক্ষা হিন্দুকে স্বধর্মীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি শিক্ষিত মুসলিমরাও হিন্দুদের পূর্বের প্রজার এবং বর্তমানে জমিদার-মহাজন-চাকুরে রূপে শোষক, শাসক ও প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী ভাবতে থাকে।
৪. জাত যায় বলে, সমাজে ঠাঁই হয় না বলে হিন্দু তরুণেরা গাঁয়ে-গঞ্জে ও শহরে মুসলিম মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত না, কিন্তু মুসলিমদের সেরূপ কোন মাসনিক বা সামাজিক বাধা ছিল না বলে সহজেই হিন্দু মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। কাম-প্রেমের আবেগ অপ্রতিরোধ্য। কাজেই হরণ-পলায়ন বা রমণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। হিন্দুরা লাম্পট্যকে বর্বর মুসলিমদের জাতীয় স্বভাব বলেই জানত।

৫. বিদ্যা-বিত্ত-আভিজাত্যগর্বী-বর্ণহিন্দুরা স্বধর্মী নিম্নবর্ণের ও বৃত্তির লোকদেরই পুরো মানুষ বলে গণ্য করত না, সে অবস্থায় ওদের জ্ঞাতি ও সমশ্রেণীর, অবস্থার এবং অবস্থানের মুসলিমদের তাই মানসিক ও সামাজিকভাবে শ্রদ্ধায়-সৌজন্যে-সমাদরে গ্রহণ করতে পারেনি, পূর্বের বিধর্মী তুর্কী-মুঘল দুঃশাসনের শ্রুতি-স্মৃতিজাত বিদ্বেষ এবং বর্তমান অবস্থানজাত ঘৃণা অবজ্ঞা হিন্দু মনে ছিলই।

৬. শিক্ষিত হিন্দু স্বধর্মীয় জাতীয়তা ভিত্তি করে স্বধর্মীয় য়ুরোপীয় আদলে পুনরুজ্জীবন কামনা করে। ইতিহাসে অজ্ঞ অনক্ষর মুসলিমরাও স্বাধীনতা হরণে ব্রিটিশকে এবং সম্পদ হরণে হিন্দুকে দায়ী করে ক্ষুব্ধ হতে থাকে।

৭. অতএব, উনিশ বিশ শতকের ব্রিটিশ শাসন আমলে দুই প্রতিপক্ষ হিন্দু-মুসলিমের সমকক্ষ স্বভাষী রূপে মিলন ছিল অসম্ভব।

১৯৬০-উত্তর কালে হিন্দু-মুসলিমের পূর্ব সম্পর্কের বিস্মৃতি ঘটেছে, অন্তত তা আর্থিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুই ভিন্ন রাষ্ট্রে কেউ কারো প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বলে।

এখন হিন্দু-মুসলিমের পক্ষে পরস্পরকে কুটুম্বের মতো সৌজন্যে বরণ করাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এর ফলেই এখন ভারত বিভাগের তেমন কোন গুরুতর মানসিক কিংবা আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ খুঁজে পায় না এখনকার মুসলমান কিংবা হিন্দু। তাই শাস্ত্রের, বর্ণের, সংস্কৃতির, জগৎচেতনার ও জীবন-ভাবনার পার্থক্য ও বৈপরীত্যজাত বাধা-বন্ধনকে উদার ও যুক্তিপ্রবণ কিছু ভাবক-চিন্তক দৈশিক-ভাষিক-রাষ্ট্রিক অভিন্ন জাতিচেতনা নির্মাণে তুচ্ছ বলেই মানেন। ইতিহাসের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় বোঝা যায়, যে আস্তিক মানুষের পক্ষে স্বমতের, স্বধর্মের মানুষ ও জ্ঞাতি-আত্মীয়-কুটুম্ব ব্যতীত নির্বিশেষ মানুষকে নিঃশর্তে ও নির্বিচারে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব। অবশ্য এ-ও সত্য যে কামে-প্রেমে-ব্যবসায়-বাণিজ্যে, অনুরাগে-বন্ধুত্বে, লাভে-লোভে মানুষ যখন মেলে, তখন দেশ-জাত-বর্ণ, ধর্ম-বৃত্তি-বেসাত, ভাষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না ব্যক্তিগত জীবনে, কিন্তু শাস্ত্রিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনে সে বাধা কিছুতেই ঘোচে না।

আজ সময় এসেছে এবং দায়িত্ব পড়েছে উপমহাদেশবাসীর উপর নির্মোহ দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ভারতের অন্তিম পর্বের ভারতীয় রাজনীতি দেখা। তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তি প্রয়োগে তখনকার বিভিন্ন দলের মন, মত, আদর্শ ও লক্ষ্য জানা ও বোঝা। বিশেষ করে হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ—এ তিন দলে মতলব ও ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ করার শ্রেয়োচেতনাজাত ঐতিহাসিক দায়িত্ব রয়েছে আমাদের।

প্রথমেই ধরা যাক ভারতবর্ষের কথা, ব্রিটিশ সরকারের একচ্ছত্র শাসনে থেকে আমাদের মধ্যে জেগেছিল অখণ্ড ও অভিন্ন ভারত চেতনা। অথচ গোটা ভারত কখনো প্রত্যক্ষভাবে একক শাসনে ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক কালে কথাই ওঠে না, ইতিহাসের আলোকেও দেখি যে মৌর্য-শক-কুষাণ-পার্সী-গ্রাকী-গুপ্ত-পাল ও দাক্ষিণাত্যের পল্লব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌল-চালুক্য কিংবা মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘল কেউ গোটা ভারত শাসনের অধিকার ও গৌরব পায়নি। ব্রিটিশও পায়নি কখনো প্রত্যক্ষ শাসনের অধিকার। কাজেই অখণ্ড ভারতকে এক দেশ ভাবার কারণ ছিল না বাস্তবে। কংগ্রেস মাধ্যমেই ভারতীয় জাতিচেতনা জাগাবার ও প্রচার-প্রচারণার প্রয়াসও দেখা দেয় বিশ শতকে। ১৮৫৭ সনের আগে [সিন্ধু-১৮৪০ সনে, পাঞ্জাব ১৯৪৯ সনে, আসাম ১৮২৬ সনে] গোটা ভারতরূপ দেশচেতনার কারণও ঘটেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসগঠনকালে অখণ্ড ব্রিটিশ ভারত গড়ে ওঠেনি বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিচেতনা নিবদ্ধ ছিল সুবাহ-ই-বাঙ্গালার তথা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সীমায়। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আদিকাল থেকেই বিশাল ভারত রক্তে, বর্ণে, বর্গে, গোত্রে, ভাষায়, ভৌগোলিক অবস্থানে, দৈহিক গঠনে-অবয়বে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, পেশাকে, রুচিতে, খাদ্যে, পেশায় ছিল বিভিন্ন, বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন। সুপ্রাচীন-কাল থেকেই এশিয়া-য়ুরোপের মতোই ভারতবর্ষ বহুজাতিক উপমহাদেশ। [মধ্যে সামুদ্রিক বিচ্ছিন্নতা থাকলে এশিয়াভুক্ত না হয়ে এটিও একটি ভিন্ন মহাদেশ নামে অভিহিত হত।] মুঘল আমলে ভারতবর্ষে স্বাধীন, করদ ও তাঁবেদার রাজ্যের মোট সংখ্যা ছিল সাড়ে সাতশ'। এ সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পায়নি। ব্রিটিশ শাসনকালেও পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেন মুসলিমরাও! ব্রিটিশ বিতাড়ন লক্ষ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার গরজে উচ্চারণে অভিন্ন বা একক জাতিচেতনা ও একক জাতীয়তার অঙ্গীকার অভিব্যক্ত হলেও মানসিকভাবে তা কখনো আত্তীকৃত হয়নি। তার প্রমাণ জিন্নাহ্-উচ্চারিত দ্বিজাতিতত্ত্ব রাজনৈতিকভাবে অস্বীকৃত হলেও, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতের গৌত্রিক ও ভাষিক প্রদেশ বা রাজ্যগঠনের দাবি ওঠে সর্বত্র, পাকিস্তানেও ছিল লঘুভাবে স্বায়ত্ত শাসনের দাবি। রাষ্ট্রিক পরিচয়ে একক জাতি হলেও এ মুহূর্তেও ভারতের সর্বত্র গৌত্রিক, ভাষিক ও ভৌগোলিক জাতিসত্তা চেতনাই প্রবল ও বাস্তব। পাকিস্তানেও তাই। কাজেই জিন্নাহর 'দ্বিজাতি' দাবি তথ্য ও তত্ত্ব হিসেবে অসঙ্গত ছিল না, যদিও দাবিটা বাস্তবে সুষ্ঠু শ্রেয়োবোধজাত ছিল না। কেননা মুসলিমগরিষ্ঠ অঞ্চলে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে মুসলিমদের প্রতি কোনই জুলুম হতে পারত না, যেমন ১৯৩৭-৪৭ সনের বাঙলায় আসামে পাঞ্জাবে সিন্ধে-বালুচিস্তানে বা সীমান্ত প্রদেশে হয়নি বা এখনকার ভারতীয় কাশ্মীরে হয় না। চৌধুরী রহমত আলী, কবি ইকবাল বা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র কামনার মধ্যে ব্রিটিশের পরামর্শ ও প্ররোচনা ছিল কিনা জানি না, তবে ভেদনীতিনির্ভর কূট-কৌশল ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে মুসলিম লীগকে নিতান্ত অন্যায়-অযৌক্তিকভাবে মুসলিমদের একমাত্র মুখপাত্র বা প্রতিনিধিত্বের অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়ে কেবল যে নির্লজ্জ নির্বিবেক পক্ষপাতিত্ব দেখাল, তা নয়, রাজনীতির ধারাও গেল এতে বদলে এবং অবাঞ্ছিত পরিণামও করল ত্বরান্বিত। অথচ বাঙলা-বিহার- উত্তর প্রদেশ ছাড়া ব্রিটিশ ভারতের কোথাও মুসলিম লীগের গণভিত্তি, প্রভাব বা জনপ্রিয়তা ছিলই না। ব্রিটিশ স্বীকৃতির ফলেই তথা পাকিস্তান প্রাপ্তির পরোক্ষ আশ্বাস ব্রিটিশ সরকারের কথায়-কর্মে-আচরণে আভাসিত হওয়ার ফলেই ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে এবং ওই একবারই মুসলিম লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হল বাঙলায় বিহারে উত্তর প্রদেশে পাঞ্জাবে ও সিন্ধে।

তবু জিন্নাহর 'দ্বিজাতি' দাবি পরহার করতে হল লর্ড মাউন্টব্যাটনের চাপের মুখে। আগেও গ্রহণ করেছিলেন তিন ভাগে স্বায়ত্ত প্রশাসনিক ভারত বিভক্তি প্রস্তাব, সার্বভৌম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একক ভারতরাষ্ট্রের উপবিভাগ হিসেবে। কংগ্রেস সভাপতি জওহর লাল এ প্রস্তাব মেনে নিয়েও আকস্মিকভাবে বলে দিলেন মনের কথা, এ প্রস্তাব অবিকল গ্রহণ করব কি প্রয়োজনমতো-গ্রহণ-বর্জন-সংশোধন করব, তা প্রয়োগকালে বিবেচনার অধিকার রইল আমাদের। অমনি শঙ্কিত জিন্নাহ্ প্রত্যাখ্যান করলেন 'ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব' নামের এ প্রস্তাব। অবশেষে দ্বিজাতি দাবির ভিত্তিতে নয় 'মুসলিম প্রধান ও হিন্দু প্রধান অঞ্চল' নীতির ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হল পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র নামে। পরিণামে একক রাষ্ট্র হিসেবে এ প্রথম ৭৮১টি সামন্ত রাজ্য নিয়ে আরব সাগর থেকে চীন-বর্মা সীমান্ত অবধি বিশাল ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। কাজেই ইতিহাসের আলোকে দেখলে এ উপমহাদেশ প্রথম একটি সংহত জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হল। এ তাৎপর্যে বিযুক্ত পাকিস্তানকে কিংবা বিচ্ছিন্ন বাঙলাদেশকে উপেক্ষা করা চলে। অতএব ১৯৪৭ সনে বিভক্তি নয়, কার্যত এক ধরনের সংহতি সাধিতই হয়েছিল, আবহমান কালের বহু বিচিত্র জাতিসত্তা ও জাতি প্রথমে দুটো রাষ্ট্রিক জাতিতে, এ মুহূর্তে তিনটে রাষ্ট্রিক জাতিতে স্থিতি পেয়েছে। অতএব, ইতোপূর্বে ভারতবর্ষ কখনো এক জাতির এক দেশ ছিল না। পরেও হয়নি। কাজেই দেশ-বিভাগের জন্য দীর্ঘশ্বাস কিংবা ক্ষোভ অযৌক্তিক আবেগ প্রসূন। সরকার যখন ভারত বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল, তখন এ. কে. ফজলুল হক ব্যাখ্যাত বিচ্ছিন্ন পূর্ববঙ্গের বিপন্ন-অস্তিত্ব চেতনা বাঙালি মুসলিম নেতা আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দীকে বিচলিত করে। অথবা তাঁরা উভয়েই পশ্চিম বাঙলার বলে তাঁরা বাঙলা বিভক্তি রোধে প্রয়াসী হন। পূর্ববঙ্গে উনজন বর্ণহিন্দুর ভাবী ক্ষতির ও অস্বস্তির কথা ভেবে শরৎচন্দ্রবসু-কিরণশঙ্কর রায় প্রয়াসী হন বাঙলাকে অখণ্ড রাখতে। [ফিরোজ খান নুন প্রমুখও চাইলেন পাঞ্জাবকে অবিভক্ত রাখতে। [পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বিপন্নতা ঘোচানোর লক্ষ্যে জিন্নাহ্ তাঁর পূর্ব মতাদর্শ নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিয়ে বললেন, বাঙলায় [এবং পাঞ্জাবেও] রক্তে, গোত্রে, ভাষায়, ভৌগোলিক অবস্থানে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম বাঙালি অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে ধর্মভেদ এক্ষেত্রে তুচ্ছ। পূর্ববাঙলার ভাবী বিপন্ন অস্তিত্বের সুযোগ নিয়ে আসামের গোপীনাথ বড়দলুই এবং স্বয়ং গান্ধী যিনি সর্বপ্রকার বিভক্তির ও বিচ্ছিন্নতার প্রমূর্ত প্রতিবাদ, বাঙালির এ প্রয়াস অসমর্থনে ব্যর্থ করে দিলেন। ডিসরেলী প্রোক্ত 'There is no last word in politics'-কে গান্ধী-জিন্নাহ্ এভাবে সত্য ও বাস্তব করে তুললেন।

এ জিন্নাহই গভর্নর জেনারেলরূপে প্রথম বক্তৃতাতেই সেক্যুলার রাষ্ট্র করে দিলেন পাকিস্তানকে, বললেন 'রাষ্টে সরকারের চোখে নাগরিক মাত্রই সমান। হিন্দু থাকবে না হিন্দু, মুসলিম থাকবে না মুসলিম, ধর্মবিশ্বাস হবে ব্যক্তিগত, সবাই পরিচিত হবে 'পাকিস্তানী নাগরিক' আখ্যায়। তাহলে এত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-রক্তপাতের প্রয়োজন কি ছিল? পাকিস্তান কথা রাখেনি, ইসলামী রাষ্ট্র হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধী

মাহাত্মা নামে শ্রদ্ধেয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী [১৮৬৯-১৯৪৮] অনন্য ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। তাঁর সাহস, সঙ্কল্প ও লক্ষ্যনিষ্ঠা ছিল অতুল্য। তাঁর-রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ-পদ্ধতিও ছিল অভিনব। ভক্ত বা রাজনীতিকদের ছিলেন তিনি বাপুজি। সাধারণ ধর্মনিষ্ঠ তথা ধার্মিক ব্যক্তিরা স্বধর্মকেই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন শ্রেষ্ঠধর্ম বলে জানে ও মানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরধর্ম সহিষ্ণু হলেও তারা অন্তরে ওসব ধর্মে ও পথে আস্থা রাখে না। গান্ধী কিন্তু সব ধর্মের সারকথায় ও সত্যতায় আস্থা রাখতেন। এ অবশ্য যথার্থ স্বধর্মনিষ্ঠ আস্তিকের আচরণ নয়—অসামান্য আচরণ। এ আচরণ কি কেবলই রাজনীতিকের! লোকে তাঁকে 'A saint among politicians and a politician among saint' বলত। তা তারিফ কি বিদ্রূপ জানি না। গান্ধী অন্য সর্বপ্রকারে সনাতন মানবতাবাদী বুর্জোয়া নেতা। হরিজনেও ছিল তাঁর সহানুভূতি-কৃপা-করুণা। ওদের স্বাধিকার দানে ছিলেন আগ্রহী। আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলিম মিলনকামী বা ঐক্যবাদী ছিলেন তিনি। মুসলিমদের অতুষ্ট ও অতৃপ্ত রেখে তিনি কিছু করতে চাইতেন না। ভারত বিভাগকে তিনি জাতির আত্মহত্যারই নামান্তর ভাবতেন। তাই গভীর বেদনা ও ক্ষোভ নিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন এ বিভক্তির পরিণাম! It is a sin, it will burn Pakistan, it will burn India. বিভক্তির তথা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিনটি ছিল তাঁর কাছে শোকের দিন। রাজধানীর উৎসবে তিনি ছিলেন না, ছিলেন সুদূর রক্তাক্ত কোলকাতায়। নিহতও হলেন রাষ্ট্রিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করতে চেয়েই। এঁর ধৈর্য্য অধ্যবসায় সাহস সঙ্কল্প ও দার্ঢ্য ছিল অতুল্য। My experiments with truth : এসব গুণেরই অভিব্যক্তি। শেষ মুহূর্তেও জিন্নাহর প্রধান মন্ত্রিত্বে ভারত অবিভক্ত রাখতে আকুল করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন! কেউ কেউ কদর্থ করে, তারা বলে গান্ধী মুসলিমদের যোদ্ধাজাতি বলে জানতেন ও মানতেন, ভারতীয় মুসলিমদের বাদ দিয়ে অতুষ্ট রেখে ভারত কেবল হিন্দুর দাবি-বিদ্রোহ-সংগ্রামে স্বাধীন করলে তাদের আহ্বানে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার যোদ্ধা মুসলিমরা ভারত দখল করে নেবে পূর্বের মতোই— পরাক্রান্ত মারাঠার স্মৃতি জাগরূক থাকা সত্ত্বেও নাকি তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল। তাঁর মুসলিম তোষণনীতির মূলে নাকি এ মনস্তত্ত্ব সক্রিয় ছিল। সত্য কি মিথ্যা জানি না। তবে রবীন্দ্রনাথের যে এমনি আশঙ্কা ছিল তা রম্যা রঁলার সাক্ষ্যে প্রমাণিত। রঁল্যার দিনলিপিতে [২৪.৬.১৯২৬ সন] পাই, "রবীন্দ্রনাথ" বিশ্বাস করেন না যে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের পক্ষে নিজেকে শাসন করা সম্ভব। —এ [ইংরেজ] যদি চলে যায়, ভারতে তার স্থান নেবে আফগান অথবা জাপানী শাসন।[10] আর এ আশঙ্কা যে অমূলক তা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দুটো যুদ্ধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। আর একটি কথা। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিভক্ত পাঞ্জাবে পলায়নে, বিতাড়নে ও হত্যায় বিধর্মী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই নিষ্ঠুর দানবিক গণহত্যা আলোচনারও অযোগ্য। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ও উত্তর ভারতে [ভারতে এখনো] বিধর্মী হত্যা কয়েক কিস্তিতে ঘটেছে। মানবতার সে-অবমাননাও লোমহর্ষক। এখন মনে হয় এ অমানবিক গণহত্যা ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং ওই অবস্থায় স্বাভাবিক। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু যদি প্রাণ ভয়ে না পালাত কিংবা উত্তর ভারতে [বিহার, মধ্যপ্রদেশ] শিক্ষিত সম্পদশালী জমিদার মুসলিমরা থেকে যেত, তাহলে পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা অর্থসম্পদ-চাকরি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কি প্রসাদ পেত? উত্তর ভারতেও বা অনগ্রসর হিন্দুরা অর্থ-সম্পদ-চাকরি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কি প্রসাদ পেত? উত্তর ভারতেও বা অনগ্রসর হিন্দুরা অর্থ-সম্পদে জমি-জমায় ঋদ্ধ হত কি করে? পূর্ববঙ্গে প্রাগ্রসর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনো পেরে উঠত না মুসলিমরা, তেমনি উত্তর ভারতের জমিদার-রইস মুসলিমদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হত হিন্দুর পক্ষে। তাই সেদিনকার সে-অবস্থায় ও সে-অবস্থানে নরহত্যা বা দাঙ্গা ছিল প্রতিযোগী বিতাড়নের প্রায় একমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণ আয়। যেহেতু রাজনীতি করে শিক্ষিত শহুরে লোকেরাই, সেহেতু নিঃস্ব মূর্খ লোকদের স্বস্বার্থে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে দাঙ্গায় হত্যায় প্রবর্তন দেয় তারাই।

তথ্যপঞ্জি

1. Economic History of India, N. K. Sinha, Vol. 2. P. 229
2. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, নরসিংহ কবিরাজ, ১৯৫৭ সন, পৃঃ ৩৩
3. Letter to Governor, 2 August, 1942, Muslim Politics in Bengal, Seela Sen, P. 143.
4. Seela Sen, Musilm Politics in Bengal, [1937-47] P. 161.
5. Hindusthan Standard, 21 June 1942, Quoted by Seela Sen, P. 135
6. ibid, P. 135
7. Sardar Patel to K. G. Neogy, Seela Sen, PP. 225-26
8. Abul Hashem : In Retrosfection.
9. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৭২ শক, ৮১, ৮৪ তম সংখ্যা।
10. *Inde : Dairy,* Dated 25.6.1925 : রম্যাঁ রঁলার ভারতবর্ষ—অবনী সান্যাল অনূদিত।

AMARBOI.COM

প্রথম পর্ব

পরিশিষ্ট-১

ব্রিটিশ আমলে মুসলিমদের অনুগৃহীত করে অনুগত করার ও রাখার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্যে ইংরেজ সরকার সীমিত ও সামান্য অর্থব্যয়ে হলেও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট জ্ঞানের অভাবে তা কখনো সফল হয়নি।

দেশজ মুসলিম এবং বিদেশাগত প্রশাসক মুসলিমরা ছিল সব রকমে বিচ্ছিন্ন পৃথক দুটো সমাজ। অথচ কোম্পানী সরকার মুসলিমদের বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্যে যেসব মুসলিমের সাহায্য, সহায়তা ও পরামর্শ নিয়েছেন তাঁরা ছিলেন মুর্শিদাবাদের কোলকাতার উর্দুভাষী উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান, যাদের সঙ্গে বাঙলাভাষী মুসলিমদের কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ভাষিক সম্পর্ক তুর্কী-মুঘল আমলে এবং উনিশ শতকেও গড়ে ওঠেনি। ফলে দেশজ মুসলিম তথা বাঙলার মুসলিম সম্বন্ধে মুসলিমদের স্বয়ংসিদ্ধ স্বঘোষিত ও কোম্পানীনিযুক্ত প্রতিনিধিরা শিক্ষা কমিটি প্রভৃতিতে যে-সব বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের হয়ে যেসব দাবি করেছেন, তা বাস্তবে ভুল ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। দেশজ মুসলিমদের হীনম্মন্যতার সুযোগ নিয়ে ১৯৪৭ সাল অবধি বাঙালী মুসলিমদের চিন্তার, চেতনার ও রাজনীতির, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণভাবে কোলকাতার ও বিভিন্ন অঞ্চলের বিদেশগত মুসলিমদের উর্দুভাষী জমিদার মুসলিমরা। উনিশ শতকের সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ, খোন্দকার ফজলে রাব্বি থেকে ইস্পাহানি-নাজিমুদ্দীন-আবদুর রহমান সিদ্দিকী-সোহরাওয়ার্দী অবধি কে উর্দুভাষী নন? এমনকি এ. কে. ফজলুল হকও বিবাহ সূত্রে উর্দুভাষিতা লাভ করেছিলেন।

আরো একটি কথা, বাঙলার মুসলিমদের গোত্রগত বিভাগও তথ্যভিত্তিক নয় — অজ্ঞলোকের বানানো। যেমন শেখ-সৈয়দ-পাঠান-মুঘল। শেখ-সৈয়দ মাত্রই আরব হওয়ার কথা। পাঠান হলে কেবল আফগান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকার হবে, আর মুঘল হলেও মধ্য এশিয়ার একটি গোত্রভুক্ত হয় মাত্র। ইরান-ইরাক মধ্য এশিয়া থেকে আগত ও অভিবাসিত লোকেরা বাদ পড়ে যায়।

আসলে দেশী লোকদের ইসলাম বরণে উৎসাহিত করার জন্যেই গোড়ার দিকে আরবী শেখ-সৈয়দ যুক্ত হত তাদের নামের সঙ্গে, পরে তুর্কী-মুঘল আমলে দীক্ষিতদের নামের সঙ্গে একই উদ্দেশে যুক্ত হত খাঁ এবং এখনো হয়। এজন্যেই প্রায় সব আজলাফ শেখ, যারা অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায় বড় হয়েছে তারা চৌধুরী, ভুঁইয়া (ভৌমিক), খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি, কাজী, সৈয়দ, ফৌজদার, মীর, মল্লিক, পারমাণিক আর পেশাজীবীরূপে মুন্সী, কাগজী, জুলহা, নিকেরী, কুমার, তেলী প্রভৃতি শ্রেণী নামে অভিহিত হত, এখনো হয়তো হয়।

পরিশিষ্ট-২

দেশজ মুসলিমদের শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না এবং অর্থ-সম্পদও ছিল না বলেই তারা নব প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়নি, তাদেরই জ্ঞাতি বা স্বশ্রেণী নিম্নবর্ণের স্পৃশ্য-অসম্পৃশ্য শ্রেণীর মধ্যেও উনিশ শতকে শুধু ইংরেজি শিক্ষার নয়, শিক্ষারই প্রসার ঘটেনি—শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না বলেই।

বিদেশাগত প্রশাসক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা সামরিক ও প্রশাসনিক পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে নওয়াবী আমলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সপরিবারে বাঙলাদেশ ত্যাগ করেছিল, স্বল্প সংখ্যায় যারা থেকে গিয়েছিল, তারা সন্তানদের ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়িয়েছে, কারো উচ্চ শিক্ষা হয়েছে, কারো হয়নি।

দেশজ মুসলিমদের যাদের মধ্যে ফারসী লেখা-পড়া চালু হয়েছিল, তারাও সন্তানদের ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের চেষ্ট করেছে, প্রতিবেশ প্রতিকূলে বলে বিদ্যার বিস্তার ঘটেনি। আমাদের এ ধারণার সমর্থনও মেলেঃ

1. Robert Orme তাঁর Historical Fragments Mugal Empire গ্রন্থে বলেছেন, "The Moors of Indostan may be divided into two kinds of people differing in every respect... under the first are reckoned the descendants of the conquerors. The second rank of Moors comprehends all the descendants of converted —a miserable race as none but the most miserables of the gentoos castes are capable of changing their religion.

2. "The higher class very small in number consists of the descendants of the ancient aristocracy still retaining a portion of their ancestral property, or

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

of faculties who managed to acquire property at the time of first settlement made under the English Government. The Lower class consists of all other Muhammadans who possess no such property and have to depend entirely on their industry for livelihood." [Dina Nath Sen, the Headmaster of Dacca Normal school, as quoted in Hindu-Muslim Relation in Bengal, by Dr. Hussan Rahman, first edition P.6]

3. "The number of wealthy Muhamedans in few in the lower classes there in no race difference in Bengal between the Muhamedans and the Hindus, and the difference in relation is not absolate. The Muhamedans are converts often from no remote period and retain some semnants of Hinduism." [Observation of an Inspector of school during the session 1883-84, D, P. I's Report for 883-84, P 145]

এ মত ছিল ১৮৮৫ Government Revees Thomso-এরও। এ সব তথ্যে, মতে ও মন্তব্যে কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেয়নি বলে অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত কর্তৃপক্ষ তথা সরকার স্বাধীনতাক্ষুব্ধ মুসলিমদের অভিমান দূর করার ও ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে মুসলমান পাড়ার স্কুলে হিন্দুস্তানী ও ফারসী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার কথাও ভেবেছে।

[Hindu-Muslim Relations in Bengal সংখ্যক ৪-৬ সম্পাদিত পৃ. ১০]

আমার 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা' গ্রন্থে কোম্পানী আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালী নামের দীর্ঘ প্রবন্ধে তথ্যনির্ভর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে, এ পুস্তকেও দ্রষ্টব্য।

৪. দেশজ নিম্নবর্গের মুসলিমদের যে হিন্দুরা তুর্কী-মুঘলদের থেকে ভিন্ন করে দেখত না বা তা ভাবত না, তার একটা প্রমাণ ১২৮০ সনের পয়লা অগ্রহায়ণের অষ্টম সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'জাতিভেদ' নামের লেখায় [সম্ভবত সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত] মেলে ঃ

"আমরা দেখিয়াছি যে কৃতবিদ্যা যুবকই হউক, আর বিচক্ষণ ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপকই হউক, সকলেই মুসলমানের নামে খড়গহস্ত। কিন্তু মুসলমানদিগকে বাঙ্গালী জাতি হইতে বর্জন করিলে আমাদিগের দেহের অর্ধেক পরিত্যক্ত হইবেক। মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন।....কিন্তু এখনও কি সেই অতীতকালের কথা সম্মণ করিয়া পরস্পরের বৈরসাধন করিতে হইবেক।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণায়ও [১২৮৯/১৮৮২ সনের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শন] দেশজ মুসলিমরা নিম্নবর্গের অনার্য :

"নীচ জাতি বলিয়া আর্যদের কাছে তাহারা ঘৃণিত—মুসলমান নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিবে না। এই জন্যই মুসলমান জয়ের পর অর্ধেক অনার্য হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।..." ... তখন যেমন আর্যে অনার্যে অনৈক্য ছিল, এখন সেরূপ হিন্দু-মুসলমানে অনৈক্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

পাকিস্তান ও বাঙলাদেশ পর্ব
মুখ্য রাজনৈতিক ধারা

বৃষ্টি না হলেও বসন্তের আর্তব আবির্ভাব বাসন্তী হাওয়া প্রকৃতির জগতে প্রাণের সাড়া জাগায়, বিলুপ্তদেহ সুপ্তপ্রাণ প্রকৃতি আবার নবজীবন পেয়ে জেগে ওঠে। স্বাধীনতারও তেমনি একটা প্রসাদ আছে, যা কিনা অর্থ-সম্পদে ও চেতনায় মুক্তির ও ঋদ্ধির, শক্তির ও সৃষ্টির আনন্দ জাগায়। চির বিদেশী-বিভাষী শাসিত দাসত্ব ও দারিদ্র্য ক্লিষ্ট মানুষও একদিকে বর্বর রক্তস্নানে যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মোন্নয়ন পন্থা আবিষ্কার করতে চেয়েছে, তেমনি জীবনের ও জীবিকার ভাবী নিরাপত্তা ও ঋদ্ধি নিশ্চিত হয়ে উল্লাস বোধ করেছে। দুটোর মধ্যেই আবেগ ও হুজুগ ছিল যতটা, ততটা ছিল না যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা। ব্যক্তিক পারিবারিক সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে মানুষের প্রায়োজনিক, পারিবেশিক ও পরিবেষ্টনীগত একটা আবেগ থাকেই, যা আপাতযৌক্তিক ও স্থিরধীর চিন্তা-চেতনা এবং সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করে। তখন তা টের পাওয়া যায় না, পরে সহজেই উপলব্ধ হয়। এ জন্যেই পরবর্তীকালে ঘটনার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কখনো যথাযথ হয় না। বিজয়ী-বিজিত দৃষ্টির পার্থক্য ছাড়াও থাকে অনুভব-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা শক্তির মান-মাত্রা এবং স্থান-কাল-অবস্থানগত ভিন্নতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তারতম্যের প্রভাব। এ জন্যই বলা হয়, ইতিহাস কখনো সর্বসম্মত ও সর্বজন গ্রাহ্য মত-মন্তব্য সম্বলিত হয় না। ব্যক্তিক, গৌত্রিক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য এবং কালিক চেতনায় প্রভাবিত হয়ই। তাই History is a legend agreed upon, যে যার মতো করে এর সার ও শিক্ষা গ্রহণ করে। আমাদের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়।

স্বাধীনতা দানে অনিচ্ছুক উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, স্বাধীনতা ভারতে বৈনাশিক রক্তক্ষরা হবে। তাঁর বাক্যসিদ্ধির জন্যে যে বিধর্মী হত্যা চলল, তা নয়, নিস্তরঙ্গ স্ফীতিমান পানি যেমন বাঁধ ভাঙে, তেমনি সুযোগ-সুবিধার ও প্রয়োজনের তীব্রতায় প্ররোচিত হয়ে প্রবৃত্তিচালিত মানুষ চিরকালই অন্যের জান-মাল কাড়ে ছলে-বলে-কৌশলে। ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনে ও প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক—বিশেষত জীবিকার ও রাজনীতির ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিদ্বেষের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও প্রতিযোগিতার হয়ে উঠছিল ১৮৭০ সনের পর থেকেই। সে সম্পর্ক প্রায় মারামারি হানাহানির পর্যায়ে চলে যায় ১৯২০ সনের পরে। তখন বাস্তবে [অবশ্য শহরে শিক্ষিতদের মধ্যেই ছিল সীমিত] হিন্দু ও মুসলিম একে অপরের জানি-দুশমন। রাজনীতিও তখন কেবল ঠকাঠকির আশঙ্কার পর্যায়ে নেমেছে, চলছে প্রভু ব্রিটিশ মধ্যস্থতার দরকষাকষি, প্রাপ্য আদায়ের ও রক্ষাকবচের দাবি আর চলছে নিন্দা-গালির খেউড়। মনে রাখতে হবে হিন্দু মহাসভা কেবল হিন্দুর, মুসলিম লীগ কেবল মুসলিমের, কংগ্রেস দৈশিক জাতীয়তার প্রচারক-প্রতীক হলেও বাস্তবে মুসলিম-খ্রীস্টান বিরল হিন্দু-প্রতিষ্ঠান। কাজেই দ্বিজাতি তত্ত্বের রাজনীতিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিভক্ত প্রাক্তন ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু যদি অর্থ-সম্পদ-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যা-বুদ্ধি চাকরী নিয়ে পাকিস্তানের মুসলিমদের সঙ্গে নিরাপদে সহাবস্থান করে, মুসলিম যদি ধন-সম্পদ নিয়ে হিন্দুর নিঃশঙ্ক প্রতিবেশী থাকবে অর্থাৎ স্থিতাবস্থা থাকবে যদি, তা হলে ভারত বিভক্তি কেন? কাজেই প্রথম সুযোগেই জান-মাল-বৃত্তি-বিত্ত কাড়া শুরু হল। রক্তে রাঙা হল মাটি, সৃষ্টি হল নদী। মরল কয়েক লক্ষ, বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত ও আত্মীয় হারাল কয়েক কোটি পরিবার। কাজেই ১৯৪৭ সনে হত্যাকাণ্ড ও বিতাড়ন-পলায়ন ছিল স্বাভাবিক এমনকি বাস্তবে আবশ্যিক। নইলে পাকিস্তানে হিন্দু জমিদার-মহাজন-উকিল-ডাক্তার বেণে-চাকুরে থেকে গেলে এবং পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা উত্তর ভারতে মুসলিম জমিদার-চাকুরে প্রভৃতি বিত্তশালীরা থেকে গেলে স্বাধীনতার আশু ফল আর্থ-সম্পদ ও বৃত্তি-বেসাত লোভীরা কি পেত? কাজেই মানুষের প্রবৃত্তিগত কারণেই এবং ইতিহাসের আমোঘ নিয়মেই দাঙ্গায় হত্যায় বিধর্মী বিতাড়ন ঘটেছিল, অর্থ-সম্পদশালী বিত্তবান উনজন অধ্যুষিত অঞ্চলে, উত্তর ভারতে ও দুই বঙ্গে। বিত্তবান হিন্দুর অভাবে বাঙলাদেশে ১৯৬৪ সনের পরে কোন হিন্দুহত্যা চলেনি। কিন্তু ভারতে চলছে এবং দক্ষিণ ভারতেও তা ছড়িয়ে পড়ছে চল্লিশ বছর পরেও। আর পূর্ব পাঞ্জাবে ও পাকিস্তানে এ আপদ গোড়াতেই একবারেই চুকিয়েছিল। ভারতের এক হিসেবে ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল স্বাধীনতা ঘোষণার পরে পরেই।

বলেছি, স্বাধীনতার একটা প্রসাদ ও স্বতোলাবণ্য আছেই। মন্থর গতিতে হলেও শিক্ষায় মানসম্পদে, রুচি-সংস্কৃতিতে, মনন-চিন্তনে আমাদেরও উন্নয়ন ঘটেছে। আর বাড়ী-ঘরে, রাস্তা-ঘাটে, যান-বাহনে, কল-কারখানায় শিল্পে-বাণিজ্যে, পুঁজি-পণ্যে আমাদের উন্নতি ও আবয়বিক চাকচিক্য বেড়েছে, বাড়ছে, বাড়বে। বেণে বুদ্ধির লুটেরা শোষক ব্রিটিশ সরকার ভারতে তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষার বিস্তার চায়নি। শিক্ষার এবং প্রশাসনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের কার্পণ্যও ছিল নিন্দনীয়। শিক্ষিত হিন্দুদের প্রয়োজনে ও উদ্যোগে গাঁয়ে-গঞ্জে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে স্বাধীনতা-উত্তর এক দশকের তুলনায় যে-স্বল্পসংখ্যক ইংরেজিপড়া এবং প্রবেশিকা-স্নাতক উত্তীর্ণ লোক পাওয়া গিয়েছিল, তাও থাকত কল্পনাতীত। হিন্দু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েই বর্ণহিন্দু অধ্যুষিত গাঁয়ে মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজিশিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার ঘটেছিল। ১৯৪৭ সনের পূর্বে গোটা বাঙলায় মুসলিম প্রতিষ্ঠিত উচ্চবিদ্যালয়ও ছিল করগণ্য এবং কলেজ ছিল বিরল। ১৯৩৭ সনে পাকিস্তান হলে সম্ভবত প্রবেশিকা পাশ কেরানীরও অভাব ঘটত। পাটনা ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-পূর্ব কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্যালেণ্ডারেই আমার উক্তির সমর্থন মিলবে।

ব্রিটিশ সরকার এমন লুঠ-প্রবণ ছিল যে প্রশাসনিক ব্যয়ও রেখেছিল নিম্নতম। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-কমিশনার ব্যতীত আর সব ডেপুটি মুনসেফ বা কেরানীর আবাসের সরকারি ব্যবস্থা কোথাও কৃচিৎ দায়ে পড়ে করলেও তা পারতপক্ষে বেড়ার বাংলোর উপরে উঠত না। এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যেও থানার সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। মহকুমার এলাকার পরিধিও ছিল বড়।

সে তুলনায় একদল উচ্চ শিক্ষিতের হার বেড়েছে অতি দ্রুত। শিক্ষার প্রসার ঘটছে দ্রুততর। ধনীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত দালান কোঠা সেকালের বাঙলার আটাশখানা জিলায় যত ছিল তার শতগুণ বেড়েছে এক শহরে আর সরকারি প্রয়োজনে ও গণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্যোগে গড়ে উঠেছে নানা কাজের বিরাট বিরাট বিচিত্র ইমারত। এ সবই স্বাধীনতার দান।

সংখ্যালঘুরা উনজন বলেই সাধারণভাবে সুবিচার পায় না, বঞ্চিতই হয়, অন্যরা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং শঙ্কা-সন্দেহ বাতিক তাদেরকে মানসিকভাবে অস্বস্থ ও অসুস্থ রাখে। তা ছাড়া তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি আচার-আচরণ জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনুল্লেখে অপ্রদর্শনে অবহেলিত হয়, এর ফলে তার স্বদেশে ও স্বরাষ্ট্রে স্বাধিকাররিক্ত নিজেদের অধিজনের কৃপানির্ভর প্রবাসী বলে মনে করে কিংবা থাকে অনেকটা পরিবারের দূরসম্পর্কের পরিজন-পরিচারকের মতোই। অতএব দেশে দেশে বর্ণিক, গৌত্রিক, ভাষিক, শাস্ত্রিক উনজনেরা স্বঘরে, স্বরাষ্ট্রে সসংকোচে সশঙ্কায় সবিনয়ে ও সতর্ক আচরণে বাঁচে। এতে তাদের মন-মননের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় কিংবা সম্ভবই হয় না।

১৮৭০ সনের পরে তথা উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ব্রিটিশের ভেদনীতি ভিত্তিক প্ররোচনায় স্যার সৈয়দ আহমদের [১৮১৭-৯৮] পরামর্শে ও নেতৃত্বে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিমরা গোটা ভারতে বিপুল সংখ্যায় অধিজন হিন্দুর শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার আতঙ্কে ভুগছিল এবং ব্রিটিশ আশ্রয় ও সুবিচার প্রার্থনা করছিল। আর দাবি করছিল জীবন-জীবিকার ও শাস্ত্র-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে স্বাধিকার কিংবা দুর্বল বলে সংরক্ষণমূলক সুব্যবস্থা। হিন্দুরাও তাদের দখলীস্বত্ব ছাড়তে চায়নি, তাই লঘুগুরু দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই। নিতান্ত স্থানিক তুচ্ছ ব্যক্তিগত কাম-প্রেমজনিত ঘটনাও হিন্দুর ও মুসলিমের মধ্যে ঘটলেও তা প্রচারণায় ও প্ররোচনায় সর্বভারতীয় রাজনীতিক গুরুত্ব পেত।

১৯৩১ থেকে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে হিন্দু-মুসলিমের বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনে সমঝোতা ও সহাবস্থান অসম্ভব বলে মনে হত। ভারতবর্ষের মুসলিমদের সর্বাত্মক প্রতিনিধিত্বের একক অধিকার কেবল জিন্নাহ্ পরিচালিত মুসলিম লীগেরই—মতলববাজ ব্রিটিশ সরকারের এ স্বীকৃতিই ভারত বিভক্তি আমোঘ করে তুলেছিল। ব্রিটিশের এ স্বীকৃতির ফলেই এখনকার পকিস্তানে লীগ জনগ্রাহ্য হয়। তবু শেষ মুহূর্তেও দ্বিজাতি তত্ত্ব অবিসম্বাদিত ছিল না, তাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও সিলেটে মুসলিম জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোট প্রয়োজন হয়েছিল।

আজ এতকাল পরে দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল কি সত্য ছিল, এ নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে আলোচনা করা চলে, ইতিহাস লেখক তার দোষ-গুণ, লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ করতে পারেন। রাজনীতিকরা আর দেশ হিতৈষীরা ক্ষোভ-আফসোস কিংবা যুক্তিবুদ্ধি-বিবেক বিবেচনা প্রয়োগে সাফল্য সুখ ও গৌরবগর্ব অনুভব করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু পরবর্তীকালে মানুষ পূর্ববর্তীকালের মানুষের অবস্থা ও অবস্থান কালগত ব্যবধানের দরুন কখনো ঠিকমতো পরিমাপ বা অনুভব বা যাচাই করতে অসমর্থ, সেহেতু এসব দাবির ও সিদ্ধান্তের সর্বসম্মত মূল্যায়ন যথার্থ প্রয়োজন নিরূপণ সম্ভব হয় না, মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি ও প্রয়োজন চেতনার সঙ্গে সব সময়েই অনুভূতির একটা আবেগ জড়িত থাকেই, সে আবেগই মূলত উদ্যম ও উদ্যোগ রূপ-অভিব্যক্তি পায়। তাই বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় আবেগ-প্ররোচিত ক্রুদ্ধ উত্তেজনার আকস্মিক তীব্রতা চালিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপ-ভাইকে হত্যা করে বসে এবং নিমেষেই ক্রোধমুক্ত হয়ে ভয়ে অনুশোচনায় কাবু হয়ে যায়। ব্যক্তি মানুষেরও প্রায় সিদ্ধান্ত লঘু-গুরু আবেগ জড়িত কিংবা প্রসূত।

ব্রিটিশ বাঙলাদেশে মুসলিমরা অধিজন হয়েও নিঃস্ব অনক্ষরদুষ্ট বলে বিত্তে বিদ্যায় উন্নত হিন্দুদের ভয় পেত। আর অর্থ সম্পদ ও চাকরী ক্ষেত্রে ওদের আধিপত্যে ঈর্ষ ও প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত বলে ওদের প্রতি ছিল বিদ্বিষ্ট ও বিক্ষুব্ধ। উত্তর ভারতে প্রায় বাঙলাদেশের হিন্দুর মতোই অর্থসম্পদ ও বিদ্যার অধিকারী ছিল নিতান্ত উনজন মুসলিমরাই, ব্রিটিশ ভারত ছাড়লে তাদের এ সম্পদ-সুখের ও প্রভাব-প্রতাপের দিন অবসিত হবে আশঙ্কায় তারা খুঁজছিল একটা নিরাপদ আশ্রয়। তাদের নেতৃত্বে এবং বাঙালীর সমর্থনে মুসলিম লীগ ১৯৩০-উত্তরকালে প্রবল হয় এবং পরিণামে ভারতীয় মুসলিমদের ভাগ্যবিধাতা হল।

কথা ছিল বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়গুরু অঞ্চলগুলো হবে স্বাধীন-সার্বভৌম কিংবা ফেডারেল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল [যেমন ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত গুচ্ছ রাষ্ট্র]। লাহোর প্রস্তাবেও ছিল কিন্তু মুসলিম অধিজন নিবসিত States থেকে S কেটে দিলেন জিন্নাহ্ দিল্লী কনভেশনে। বাঙালী তখন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের জোশে আপ্লুত, তাই কেউ আপত্তি করলেন না।

নররক্তরঞ্জিত পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র হল। পাকিস্তানে গোড়া থেকেই কতগুলো সমস্যা দেখা দিল। সিন্ধি-বালুচি-পশতু-সারাওকী-মুলতানী কোন ভাষাইরাষ্ট্র ভাষা হবার মতো উন্নত ছিল না। বলতে গেলে লেখ্য গদ্য ভাষা হিসেবে তখন ওগুলো শৈশব অতিক্রম করেনি, ফলে উত্তরপ্রদেশের নেতা ও চাকুরে পরিচালিত পাকিস্তানে ইসলামী শাস্ত্র-তমুদ্দুন-তাহজিবগর্ভ ফারসী হরফে লেখ্য উর্দুই হল সর্বজন সমর্থিত, গ্রাহ্য ও বাঞ্ছিত ভাষা। পাকিস্তানের উন্নত মানের এবং অধিজনের ভাষা হিসেবে বাঙলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি ভিত্তিক পাকিস্তানে কেউ ভাবতে চায়নি। কাজেই উর্দুর দাবি ছিল তর্কাতীত। তবু আঞ্চলিক স্বার্থসচেতন জনহিতৈষী কোন কোন বাঙালীর মনে বাঙলার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্থান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল কোলকাতায় ও ঢাকায়—এঁরা কবি ফররুখ আহমদ, আবদুল হক, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ [ডক্টর জিয়াউদ্দীনের দাবির ও ১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে উচ্চারিত প্রস্তাবের প্রতিবাদে], ডক্টর মহম্মদ এনামুল হক, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোহাতার হোসেন, আবুল কাসেম প্রমুখ। আবদুল হকই কেবল বাঙলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁর প্রবন্ধে [৩০শে জুন, ১৯৪৭, দৈনিক আজাদে প্রকাশিত], এতে প্রবল যুক্তি ছিল এই "উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত হলে ইংরেজির স্থান নেবে উর্দু, ইংরেজি জানা-না-জানা দিয়ে যেমন চাকরীর যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়, তেমনি উর্দুর বেলায়ও করা হবে, তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারী চাকরীর অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।" [পৃঃ ৪, ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব]। ফররুখ আহমদ [১৩৫৪ সনের আশ্বিন সংখ্যা সওগাতে] ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার কল্পেই পূর্ব পাকিস্তানে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক [নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত কৃষ্টি পত্রিকায় ১৩৫৪ সনের কার্তিক সংখ্যায় ঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা প্রবন্ধে] বলেন, "উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলে বাংলা ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।" উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করলে "ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে। উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানের মরণ—রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু।"

ভাষার প্রশ্নে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের সতর্ক বাণী পরোক্ষ ও পরিণামে সত্য হয়ে উঠেছিল। তিনিও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'বাঙলা'কে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় "বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশীদিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।" [সওগাত, ১৯৪৭ অগ্রহায়ণ, রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা এবং আরবী-ইংরেজীকে অবশ্য শিক্ষনীয় ভাষারূপে গ্রহণ বাঞ্ছনীয় মনে করেন [১৯৪৭ সনের জুলাই মাসের শেষদিকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দীন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার পক্ষে মত দিলে তার প্রতিবাদে 'আজাদে' এ মত পরিব্যক্ত করেন]। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত পুস্তিকায় 'বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধে বলা হয়, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি, 'অশিক্ষিত ও সরকারী চাকুরীর আযোগ্য বনিয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত ও সরকারি কাজের অযোগ্য করিয়াছিল।' [আব্দুল হক, ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ৪৪]। এ ধারায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীর এক ক্ষুদ্র অংশ ভাবতে ও বলতে থাকেন। এঁদের অভিব্যক্ত মতই বাঙালী তরুণদের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার আত্যন্তিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে এবং যথাসময়ে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করতে থাকে ১৯৪৮ সনের মার্চ মাস থেকে, জিন্নাহর 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' এ ঘোষণার প্রতিবাদে।

এ সূত্রে দুটো বিষয় ভাববার রয়েছে। ভুললে চলবে না আমরা ইসলামী আদর্শে মুসলিমের স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি, আচার, রুচি, সংস্কৃতি এবং সে-কারণে অবাধে আত্মবিকাশের সুযোগ ও স্বাধীনতা পাবার জন্যেই পৃথক বাসভূমি চেয়েছিলাম। আমাদের ধারণার আরবী-ফারসী কেবল মুসলমানদের ভাষা, যদিও ওই দুটো ভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটেছে অমুসলিম সমাজে। আরব মুসলিমরা শাস্ত্রে আনুগত্যবশে গল্প-নাটক-উপন্যাস কবিতার চর্চা করেনি ইদানীং-পূর্ব তেরোশ' বছর ধরে। সে-অর্থে আরবী ভাষায় সৃষ্টিমূলক [যাতে ভাষার উৎকর্ষ ঘটে] কিছুই করেনি মুসলিমরা। আর ফারসী ভাষারও পনেরো শতকের পরে বিশেষ কোন বিকাশ-বিস্তার ঘটেনি। উর্দুর ভিত্তি ভারতীয় আর্যভাষা তথা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় কথ্য হিন্দুস্তানী, কেবল ফারসী শব্দবহুল ও ফারসী হরফে লিখিত। অবশ্য আরবী-ফারসীকে এবং মাদ্রাসায় শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় উর্দুকেও ইসলামী শাস্ত্র-তমদ্দুন-তাহজিবের বাহনরূপে জানত ও মানত। মুসলিমদের এ আবেগের সুযোগ নিয়েই বিহার-উত্তর প্রদেশ-পাঞ্জাবের নেতা চাকুরেরা উর্দুকে বিনা আলোচনায় পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা করার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর উনিশ শতক থেকেই বাঙালীর সব প্রধান নেতাই ছিলেন উর্দুভাষী, তাঁদের স্বাভাবিক মমতাই ছিল উর্দুর প্রতি। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীও ইসলাম আর পাকিস্তান প্রীতিবশে এবং হিন্দু বিদ্বেষজাত অবচেতন প্রেরণায় ছিল উর্দুর পক্ষে। দ্বিতীয় আর একটি অদৃশ্য কিন্তু গভীরতর কারণ এই, বাঙালী শিক্ষিতরা ছিল সাধারণভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ভুঁইফোঁড় এবং স্বশ্রেণী উদ্ভূত প্রধান নেতাশূন্য। উল্লেখ্য ফজলুল হকও ছিলেন বিবাহসূত্রে ঘরে উর্দুভাষী এবং তা ছাড়া এ সঙ্কট সময়ে তিনি ছিলেন রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্বচ্যুত নিঃসঙ্গ। পাকিস্তানের যাঁরা শাসক প্রশাসক ও নেতৃপদে আসীন তাঁরা ছিলেন উচ্চবিত্তের, বিদ্যার ও সামন্ত শ্রেণীর মানুষ। ওঁদের মোকাবেলায় আমাদের বাঙলাভাষী নেতারা এক রকমের হীনম্মন্যতায় ভুগতেন আর অনুগতের মতো ওঁদের প্রস্তাবে ও ব্যবস্থায় সায় দিতেন। স্মরণীয় যে প্রথম Constituent Assembly-তে বাঙালীর সংখ্যাধিক্য ছিল [৪৪ জন]। তবু রাজধানী হল করাচীতে, মন্ত্রিসভায় রইল ওদেরই প্রাধান্য, শাসক-প্রশাসক আর বড় চাকুরেও ছিল ওরাই, সেনাবাহিনীর সবাইও ছিল ওই এলাকার। এসব অসমতার জন্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বগর্বী এবং পাকিস্তান অর্জনে সুখী ও আনন্দাপ্লুত হিন্দুবিদ্বেষী বাঙালীর মনে কোন ক্ষোভ জাগেনি, বরং ঈমান, জাতিসত্তা, তমদ্দুন ও তাহজিব দৃঢ় ও বিশুদ্ধ করার জন্যে যা কিছু বাঙালীর, যা কিছু হিন্দুর সঙ্গে অভিন্ন, তা-ই পরিহার পরিবর্তন পরিমার্জন করতে চেয়েছে। এমনকি Constituent Assembly-তে বাঙালী নেতা নাজিমুদ্দীন বাঙালীর আসন পশ্চিম পাকিস্তানীদের ছেড়ে দিয়ে বাঙলার ক্ষতিই করলেন। স্বীকার করতেই হবে যে শিক্ষিত বাঙালী মুসলিমদের মননশক্তি আজো বাঞ্ছিত মানে-মাত্রায় বিকাশ পায়নি। তাই সেদিন কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ কেবল যে উর্দুর পক্ষে ছিলেন, তাই নয়, উর্দুভাষী নেতাদের সর্বাত্মক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারেও ছিলেন মুখর এবং সালওয়ার-পাঞ্জাবী প্রচল করার চেষ্টায় ছিলেন নিরত। ভক্ত আকবর উদ্দীন তো বিপুলকায় দুটো চরিত গ্রন্থ 'কায়েদে আজম' ও 'কায়েদে মিল্লাত' লিখে ধন্য হলেন। সব বাঙালী বিদ্বান-বুদ্ধিজীবীই ওই একই স্বাতন্ত্র্যচেতনা বশে হিন্দুর অবদান-ঐতিহ্যঋদ্ধ বাঙলা ভাষার বর্ণে, বানানে, শব্দে, বাক্যে বাগ্বিধিতে বা বাগভঙ্গিতে পরিবর্তন চাইলেন। আরবী বা রোমান হরফ গ্রহণের কিংবা ণ, ষ, স, জ, প্রভৃতি বর্ণ বর্জনের, মাত্রা ও যুক্তাক্ষর পরিহারের, আরবী-ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহারে সুপারিশ করা হল, যাতে কোলকাতার হিন্দুয়ানী ভাষার নাম-গন্ধ-আদল মুছে যায় ঢাকার মুসলিম-লিখিত বাঙলায়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-মুহাম্মদ এনামুল হকের মতো সরলপ্রাণ পণ্ডিতও মতলববাজ সরকারের প্ররোচনায় বর্ণ বর্জনের ও বানান সংস্কারের সুপারিশ করেছিলেন, ভাবেননি যে 'বাঙলাভাষা' দেশ-কাল-রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিশ কোটি মানুষের বাঙালী সত্তার উৎস ও বন্ধনসূত্র, ভাষিক জাতীয়তার ও ঐক্যের ভিত্তি। রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও মানুষের গৌত্রিক ও ভাষিক ঐক্যের একটা আত্মিক-মানসিক মূল্য রয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অভিসন্ধিদুষ্ট সরকারের নির্দেশে অপ্রয়োজনে বাঙলা সনের মাসগুলোর সম্পূরক তারিখ পরিবর্তন করেছিলেন। সেই ইসলাম ও মুসলিম তমদ্দুনপন্থী হিন্দুবিদ্বেষী লোকের পুনরাধিক্যে আজকের এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে মক্তবে মসজিদে আরবী শিক্ষাদান চালু করেছে, ইংরেজী প্রথম শ্রেণী থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালু করে শিক্ষার প্রসার রোধ করেছে, ধর্মশিক্ষা স্কুলে বাধ্যতামূলক করে ছাত্রদের মন-মননের স্বাধীন বিকাশ রুদ্ধ করেছে, দুই রাজ্যের বাঙলাভাষীর মধ্যে বিভ্রান্তি-ব্যবধান সৃষ্টির লক্ষ্যে শহীদুল্লাহ নির্মিত বাঙলাসনপঞ্জী চালু করেছে। এমন কি সরকার সম্প্রতি আমাদের ঘর-বাড়ির অবয়ব ও স্থাপনা কি রূপ নেবে, আমাদের নাচে-গানে-বাজনায়, নাটকে-সিনেমায় কি ধরনের বিষয় থাকবে, কি কি দেখানো বোঝানো হবে, তা নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্যে সৈয়দ আলী আহসান, দেওয়ান আজরফ প্রমুখ পূর্বতন ইসলাম ও তমদ্দুনপন্থীদের নিয়ে একটি সুপারিশ কমিটি গঠন করেছে, শিক্ষা কমিশন আগেই গঠিত হয়েছে।

দেখে শুনে মনে হয় কোলকাতার সঙ্গে সর্বপ্রকার মানসিক-সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য নষ্ট করার নতুন প্রয়াস সযত্নে শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে গত চার দশকের মধ্যে বাঙালীসত্তা ও সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করেও জান-মালপণ মুক্তিকামী হয়েও শতকরা আশিজন মুসলমানের কোন পরিবর্তন হয়নি। এখন তারা আগে মুসলমান এবং পরে বাঙলাদেশী এবং ক্বচিৎ কেউ বাঙালী। মনে-মানসে আমরা আবর্তিত, মোটেও পরিবর্তিত নই। সংস্কৃতি চেতনার অভাব, মননের দৈন্য এবং জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিপর্যয়, অর্থ-সম্পদের দুর্লভতা প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয়রিক্ত দিশেহারা মানুষকে নিয়তি ও ঐশশক্তি নির্ভর করে তোলার ফলেই গরীব ও ভীরু মানুষের শাস্ত্রানুগত্য, পারত্রিক সুখলিপ্সা বেড়ে চলেছে। কাকরাইল মসজিদেই তাই ঐহিক জীবনে হতাশ মধ্যবয়সী মানুষের ভীড় দেখা যায়। পার্থিব জীবনে বঞ্চনা ও হারই তাঁদের আসমানী কৃপাকামী করে তুলেছে। মননশক্তির স্বল্পতা হেতু কিছু আত্মপ্রত্যয়হীন ঐশ কৃপাকামী মানুষ এমনি অবস্থায় মৌলবাদী হয়। মনে রাখতে হবে ধার্মিকতা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় কাণ্ডারিক্ত, উদ্যম, সাহস ও সঙ্কল্পহীন নিরানন্দ মানুষের চারিত্র্য লক্ষণ। তারা ঐহিক জীবনে পরাভূত, পারত্রিক জীবনে প্রশান্তিভীরু ও সুখপ্রত্যয়ী দুর্বলচিত্ত মানুষ। উচ্চবিত্তে পাপভয় দুর্লভ। প্রলোভন প্রবল হলেই ওরা সব অপকর্ম করে, নিঃস্ব নিম্নবিত্ত মানুষ সমাজ-সরকারের হুকুম-হুমকী-হামলার ভয়ে প্রায়ই কাবু থাকে। কাঙ্ক্ষী মধ্যশ্রেণীর নাতিস্বল্পবিত্তের মানুষই জীবিকাক্ষেত্রে বেপরওয়া কর্ম-আচরণের ঝুঁকি নেয়। দরিদ্র দেশে এবং সমাজে এদের উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রব দুঃশাসনের, দুর্নীতির, দুর্জনতার ও দুষ্টামির আকারে বাড়ে এবং জনজীবন দুঃসহ করে তোলে।

কোলকাতার ও ঢাকার ভাষায় পার্থক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের হয়ে তমদ্দুনিক তরক্কীর ও স্বাতন্ত্র্যের জন্যে জাতির ও রাষ্ট্রের স্বার্থে কথায়, কাজে ও আচরণে লড়েছেন পূর্বেকার পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির ফজলুর রহমান, মিজানুর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, মুজিবুর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, ইব্রাহিম খান প্রমুখ। এঁরা ছাড়া ১৯৪৭ সনে ঢাকায় গঠিত তমদ্দুন মজলিশ 'বিশেষ উল্লেখ্য'। এক হিসেবে ১৯৪৭-৬০ সনের মধ্যেকার এঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের জন্যে এঁদের মোটেই দায়ী করা চলে না বরং ভাবে ও চিন্তায়, কথায় ও কাজে অঙ্গীকার অনুগ আদর্শানুসারী হিসেবে এঁদের বিবেচনা করতে হয়। কেননা, বিদ্যায়, বিত্তে ও সংখ্যায় অধিজন ও প্রাগ্রসর প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর শাসন-শোষণ-বঞ্চনা ভয়েই ওঁরা পৃথক ধর্মমত, জীবনাচার, জীবনদর্শনের ও সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে স্থান-কাল-জাত-বর্ণ-ভাষা নিরপেক্ষ কেবল বৈশ্বিক মুসলিম ভ্রাতৃত্ব চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে জীবনাচার রচনার স্বপ্ন নিয়েই পাকিস্তান বানিয়েছেন। কাজেই বিধর্মী-বিজাতি বিদ্বেষেই এ রাষ্ট্রের জন্ম। বাঙালীর এ ইসলামী আবেগের সুযোগ নিয়ে করাচি সরকার ও বেণেরা ভ্রাতৃত্বের ও সংহতির বুলি উচ্চারণ করে শাসন-শোষণ চালিয়ে যাচ্ছিল নির্বিঘ্নে। ভাষা আন্দোলন ও তার প্রভাব সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হবে। কাজেই এখানে এ প্রসঙ্গ শেষ করা হল।

মুঘল আমল থেকেই ১৯০৫ সন অবধি বাঙলা-বিহার-উড়িশা নিয়েই ছিল সুবেহ বাঙ্গালা-বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। এ বিশাল অঞ্চলের উড়িশায় মুসলিম সংখ্যা ছিল নগণ্য। বিহার ছিল হিন্দুস্তানী [হিন্দি-উর্দু] ভাষীর অঞ্চল, সে-কারণে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্কে উত্তর ভারতের অংশ। সিরাজুদ্দৌলা-মীর কাসিমের পরাজয়ে বাঙলাভাষী অঞ্চল থেকে উর্দু-ফারসীভাষী পূর্বতন শাসকগোষ্ঠী সাধারণভাবে উত্তর ভারতের দিকে চলে গেলেও ভাষিক ঐক্যের কারণে উত্তর ভারতলগ্ন বিহার থেকে পলায়ন করেনি। তাই বিহারে সংখ্যায় সামান্য [১২%] হয়েও বিদ্যায়-বিত্তে ঋদ্ধ মুসলিমরা প্রভাব-প্রতাপ নিয়ে থেকে গিয়েছিল। সেজন্যেই ব্রিটিশ আমলে আমরা ও অন্যরা কেবল বাঙলার দেশজ মুসলিমের নিঃস্বতার, নিরক্ষরতার ও দারিদ্র্যের কারণ সন্ধান করে বেড়িয়েছি। দেশজ বাঙালী মুসলিমের নিঃস্বতা, দারিদ্র্য প্রায় দু'আড়াই হাজার বছরের পুরোনো ও প্রাজন্মিক। স্বাধীন পাকিস্তানে এ প্রথম হিন্দুর মালিকানা ও প্রভুত্ব এবং জীবন জীবিকাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত হয়ে মুসলমানরা শহরে-বন্দরে অবাধে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে থাকে। যেহেতু বিধর্মীর পলায়ন ও বিতাড়ন পূর্বেই তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার এ সুযোগ ঘটে, সেহেতু ন্যায়-নীতি-নিয়মকে ছাপিয়ে কাড়া-মারা-হানা, ছল-চাতুরী-প্রতারণা, হুকুম-হুমকি-হামলাই বেশি প্রযুক্ত ও কেজো হয়েছে হিন্দুর অর্থ-সম্পদ-বৃদ্ধি-বেসাত হস্তগত করতে। সেদিন আড়াই হাজার বছরের ধনে-মনে কাঙাল মানুষ বাঘের ক্ষুধা, হায়েনার লোভ ও হাঙ্গর-কুমীরের উদ্যম ও হিংস্রতা নিয়ে শহরে বন্দরে এসেছিল সম্পদ আহরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

এভাবে যারা সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে শহরে বন্দরে এল, তাদের হারাবার ছিল না কিছুই। অর্জন করবার ছিল অর্থ-বিত্ত-মান-খ্যাতি ও ক্ষমতা। এ ভুঁইফোঁড় সমাজে নীতি-নিয়ম ও রীতি-রেওয়াজ কিংবা যুক্তি-বিবেক মেনে সহজে দ্রুত ধনী-মানী হতে পারে না। তখন সবাই লাভে-লোভে দুর্জন। তাই দুর্জনের দুঃশাসনের দুস্থ-দুষ্ট-দুস্কৃতী-দুর্নীতি-দুষ্কর্ম আশ্রয়ী হয়ে অর্থ-সম্পদ লুঠে-কেড়ে ঘুষে-ভেজালে-চালানে-পাচারে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ সন অবধি লঘু-গুরু ভাবে এ ছিল ধনে-মনে কাঙাল মুসলিমের সার্বভৌম রাষ্ট্রের এক অংশে আত্মপ্রতিষ্ঠার রীতি-পদ্ধতি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোলকাতায় বাপেখেদানো মায়েতাড়ানো এবং উদ্যমশীল বর্ণহিন্দুরা বিশেষ করে আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ এমনি দৌরাত্ম্য-দুর্নীতি-দুষ্কর্ম মাধ্যমে ধনী-মানী ও খ্যাতি-ক্ষমতাবান হতে দেখেছি। আবার তাদের সন্তানদেরেই কৃতী কীর্তিমান-হতে, গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে মহৎ হতে দেখা গেছে। কাজেই চির অশিক্ষাদুষ্ট ও চির দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং প্রায় প্রথম প্রজন্মের ইংরেজী জানা-না-জানা শিক্ষিত মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে এমনি ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অস্বাভাবিক অমানবিক কিছু নেই। তাই এর বাস্তবতা স্বীকার করে নিলে ক্ষোভ-ক্রোধ-বেদনা বোধের তেমন কারণ থাকে না। বলেছি দু'আড়াই হাজার বছর ধরে সাধারণভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশিক্ষা ও দারিদ্র্য ছিল এদের নিত্যসঙ্গী, প্রাজন্মক্রমিক নিঃস্বতায় এদের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু আবর্তিত হয়েছে। এদের ভাব-চিন্তা তথা মন-মনন-সাহস সংকল্প কখনো স্বাভাবিক বিকাশ-প্রকাশ পায়নি। আমাদের ধারণা আজকের বিদ্যায়-বিত্তে ভুঁইফোঁড় ধনী-মানীদের সন্তান পিতৃধনে ধনী-মানী থেকে তাদের তুষ্ট ও তৃপ্ত জীবনে তীক্ষ্ণ-তীব্র আত্মসম্মানবোধের প্রণোদনায় খ্যাতি-ক্ষমতাবান হবার জন্যেই কৃতী ও কীর্তিমান হবার প্রয়াস পাবে। উনিশ শতকী কোলকাতার ইতিহাস থেকে এ অনুমান সহজেই করা যায়।

কথায় বলে 'দারিদ্র্যদোষ সর্বগুণ নাশক'। আগেই বলেছি ১৯৬৫ সন থেকেই বাঙালীর স্বসিদ্ধ বা স্বঘোষিত কিংবা সরকার নিযুক্ত নেতা ছিলেন উর্দুভাষীরা। আমাদের বিশ শতকের রাজনীতিক নেতারাও [ইস্পাহানী-সিদ্দিকী-সোহরাওয়ার্দী-নাজিমুদ্দীনরা] ছিলেন নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরের উকিল কিংবা চাকুরে শ্রেণীর লোক। তাঁদের মোকাবিলা করতে হয়েছে প্রজন্মক্রমে বিদ্যাবিত্তের ও সামন্তদাপটের মালিকজাদা-নওয়াবজাদা-খানজাদা-পীরজাদা এবং উকিল-ব্যারিস্টার ও আই.সি.এস. প্রভৃতি অফিসারদের। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালীরা হীনম্মন্যতা বশে কখনো সাহসে-সংকল্পে ও যুক্তিতর্কে-দাবিতে দৃঢ় থাকতে পারেননি। তাই তাঁদের চাওয়া-পাওয়ায় ত্রুটি ও ঘাটতি ছিলই। স্মরণীয়, প্রায় বছরই উন্নয়ন খাতের টাকা ঢাকা থেকে ফেরত যেত। অথচ সব কমিটিতে-কমিশনে-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংস্থায় আর সংসদে ক্যাবিনেটে বাঙালী কোথাও কম ছিল না। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীও কখনো কখনো বাঙালী ছিলেন। মননশক্তির দৈন্যজাত স্বধর্মীয় জাতীয়তায় আত্যন্তিক আসক্তি, হীনম্মন্যতাজাত ব্যক্তিত্বশূন্যতা প্রভৃতির ফলেই সৈন্যবাহিনীতে সংখ্যানুপাতিক চাকরী প্রাপ্তি সম্ভব এবং ব্যবসা-বাণিজ্য আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হয়নি। শক্তিমানের কৃপা-কদর পাওয়ার জন্যে চাটুকার সমর্থক হয়ে যেতেন বাঙালী সদস্য ও চাকুরে। এ হীনম্মন্যতার ও কৃপালোভীর চাটুকারিতার একটি নমুনা এই যে আয়ুব খান তাঁর যে Friends and Not Masters বইতে বাঙালীদের Aboriginal আখ্যাত করে অবজ্ঞা ও অপমান করলেন, সে-বইটিই সেকালের তিন প্রখ্যাত লেখক নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী ও সৈয়দ আলী আহসান সগর্বে অনুবাদ করে সরকারি কৃপা ও কড়ি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বাঙালীর কাছে নিন্দিত হননি।

বাঙালীর ব্যবসায়িক ঐতিহ্য ছিল না বলে সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্যে যথা PIDC, Shipping প্রভৃতিতে—তারা নিজেদের অংশ রক্ষা করতে পারেনি। উর্দুওয়ালাদের কাছে বেচে দিয়েছে কারবার। এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে পাকিস্তানের হয়ে যারা পূর্ব বাঙলা শোষণ-লুণ্ঠন করেছে তারা গোত্রে-ধর্মে-নিবাসে পাকিস্তানী ছিল না—ছিল বৈশ্বিক—আগাখানী-ইসমাইলী যেমন–গুজরাতীরা। পাকিস্তানীরা সেনাবিভাগে উত্তরপ্রদেশাগতরা শাসন-প্রশাসন বিভাগে ছিল অধিজন, পাঞ্জাবীরা অবশ্য সংখ্যায় কম হলেও সেনারূপে, চাকুরেরূপে ও রাজনীতিকরূপে দাপটে প্রধান ছিলই। 'পাকিস্তান ভারতীয় মুসলিমের জন্যে নিরাপদ বাসভূমি'– এ বিঘোষিত তত্ত্বেও আস্থা রেখে বিহারী নিম্নবিত্তের সাক্ষর, নিরক্ষর ও শিক্ষিত লোকেরা পূর্ববঙ্গে অভিবাসিত হয়। তারা ছিল মূলত প্রযুক্তিকুশল শ্রমিক। 'পাকিস্তান ভাঙার মুহূর্তে জানে-মালে মরল তারাই। যারা আজো ঢাকায় পড়ে রয়েছে— তাদের দু'প্রজন্মের জীবন যন্ত্রণার ও ব্যর্থতার শিকার। ভারতবিভক্তির নিশ্চিত সংকল্পের ও সিদ্ধান্তের মুখে ভূতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে রামনামের মতোই হঠাৎ জিন্নাহ্-সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাসেম বলে উঠলেন বাঙলার হিন্দু-মুসলমান ধর্মমতে ব্যতীত আর সবক্ষেত্রে রক্তে-গোত্রে-নিবাসে-ভাষায়-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, জীবনাচারে অভিন্ন। কাজেই বাঙলা [পাঞ্জাবও] দ্বিখণ্ডিত করা বাঞ্ছনীয় নয়, শরৎবসু নয়, শরৎবসু ও কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখও এ মতে সায় দিলেন। ডিজরেলি উচ্চারিত 'রাজনীতিতে শেষ কথা নেই' তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল কয়েকদিন। তারপর পূর্ববঙ্গ হল পূর্ব পাকিস্তান।

আর কম সংখ্যক কিন্তু রক্তে-গোত্রে-ভাষায়-সংস্কৃতিতে-জীবনাচারে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন ও বিচিত্র মানুষ এবং পরিসরে বহুগুণে [ছয় গুণ] বৃহৎ ভূমি নিয়ে গড়ে উঠল পশ্চিম পাকিস্তান। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, কেবল ইসলামকেই বন্ধনসূত্র রূপে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান। এমনি অবস্থায় ও অবস্থানে ঠোকাঠুকি লাগেই। তারা ছাড়া গোড়ার দিকে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে ছিলেন ভারত থেকে আগত সামন্তবিত্তের ও স্বভাবের জমিদার নেতারা এবং উচ্চতম পদের মুসলিম অফিসারেরা। তাঁরাই অধিষ্ঠিত হলেন শাসন-ক্ষমতায়। পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু এঁদের তাই বলতেন দফতরীশাসক। তাঁরা বহিরাগত, তাঁদের কোন নির্বাচনী এলাকা ও নির্বাচকমণ্ডলী ছিল না। কাজেই সংবিধান রচনায় তাঁদের কোন গরজ বা আগ্রহ ছিল না। এর ফলেই মুখ্যত ষড়যন্ত্রের রাজনীতি কেন্দ্রে গোড়া থেকেই প্রশ্রয় পায়। তা ছাড়া মানুষের প্রবৃত্তিগত মনস্তাত্ত্বিক নিয়মেই পাকিস্তান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামীজোশ গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় কমতে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে ব্যক্তিলিপ্সা আঞ্চলিক, গৌত্রিক, ভাষিক, শ্রেণীক স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা, ওঠে বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত ও অর্থ-প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে বঞ্চনার ও দাবির তর্ক, শুরু হয় দ্বন্দ্ব। পাকিস্তানে পাঁচ প্রদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্র তীক্ষ্ণ হওয়ার মুখেই পাঞ্জাবীরা মমতাজ দৌলতনার নেতৃত্বে এবং আয়ুব খানের গোপন প্রণোদনায় Documents X and A. B. C. তৈরি করে বাঙালীদের ঠেকানোর ও ঠকানোর জন্যে নিজেদের মধ্যে এক ষড়যন্ত্রমূলক ঐক্য ও একক প্রদেশ গঠন করে। ১৯৫৫ সনে তা সংসদে পাশ হয়। "The documents referred to the fact that West Pakistan in its confrontaion with East Bengal had often resorted to the small brother's big brother role to create disruption among leaders of West Pakistan:" [A Socio-Political History of Bengal. p. 141, Kamruddin Ahmad]

ওঁরা বাঙালী নেতা সোহরাওয়ার্দীকে বশ করেছিলেন এ বলে যে, "On the basis of four subject centre, Two provinces Federal in structure, Parity of representations, complete provincial and cultural autonomy." (ibid, P. 142)

উর্দুভাষী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে ও নেতৃত্বে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ হল একক প্রদেশে পরিণত, অধিজন অধ্যুষিত হয়েও পূর্ববাঙলা ভাগ-বাঁটোয়ারার ও লাভক্ষতির ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়ে দ্বিপক্ষীয় প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দ্বীপক্ষীয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের ঝুঁকি নিল। পরিণাম বুঝে না-বুঝে শ্রেয়োবোধ বশে সংখ্যা-সাম্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও রাষ্ট্রিক বিকাশ লক্ষ্যে যদি এ ব্যবস্থা করেও থাকেন, তা হলেও বলতে হবে এ চুক্তিতেও বাঙালীর চৈত্তিক দুর্বলতা, মননশক্তির ক্ষীণতা ও উর্দুভাষীদের মোকাবেলায় হীনম্মন্যতা প্রকাশ পেয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগা খানের নেতৃত্বে ১৯০৬ সনের পয়লা অক্টোবর মুসলিম ডেলিগেশন সিমলায় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করলে তাঁর পরামর্শে-প্ররোচনায় ডিসেম্বরে ঢাকায় ব্রিটিশ অনুগত মুসলিম রইসদের ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীদের নিয়ে মুসলিম লীগ গঠিত হলেও সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছরের মধ্যেও মুসলিম লীগের রাজনীতিক অর্থনীতিক কিংবা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক মত-পথ, নীতি-আদর্শ ও লক্ষ্য গড়ে ওঠেনি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৯১৬-১৮ সনে নেতাদের অনেকেই যুগপৎ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের অবসানে ১৯২৪ সন থেকে মুসলিমরা কিছুটা মুসলিম স্বার্থ সচেতন হয়ে ওঠেন আর ১৯৩০-৩২ সনের রাউন্ড টেবল কনফারেন্স অন্তে একান্তভাবে হিন্দু ও কংগ্রেস বিরোধী এবং হিন্দুর ভাবী কবল থেকে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে একাগ্র হয়ে ওঠে লীগ। তাই ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানপ্রাপ্তি মুহূর্তেই তাদের ভাব-চিন্তা-উদ্যম-উদ্যোগ-ক্ষোভ-ক্রোধ-চেতনার ও কর্মসূচীর অবসান ঘটে, তাদের রাষ্ট্র-সমাজ-শিক্ষা-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই কোন গঠন-উন্নয়নমূলক কোন চিন্তা-চেতনা কিংবা কল্পনা-পরিকল্পনা ছিল না বলে, এমনকি ক্ষমতা দখলে রাখা বা দখল করা ব্যতীত, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দ্রুত কিছু করাও তীব্র-তীক্ষ্ণভাবে তাঁদের অনুভবগত না হওয়ায় তাঁরা শিশুরাষ্ট্রের পরিচর্যায় ছিলেন উদাসীন। এই নির্লক্ষ্য নিরুদ্দিষ্ট দিশেহারা মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গে গোড়া থেকেই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল, অবশেষে ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছিল কিন্তু সেনানীশাসক আয়ুব খান-ইয়াহিয়া খান ও জিয়াউল হকরা ইসলাম পছন্দ ও মুসলিম লীগনির্ভর হওয়ায় তা আজো মতলববাজদের মধ্যে টিকে রয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানে জনগণের প্রসার ছিল না, কিন্তু পূর্ববঙ্গে তখন চাষী পরিবারেও ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটছে এবং সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও শিক্ষিত মাত্রই ছিল নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কেননা মুসলিম জমিদার তালুকদার-জোতদার ছিল এ অঞ্চলে করগণ্য। কিন্তু পাকিস্তান মূলে হিন্দুভীতি,—বিদ্বেষজাত বলেই কেন্দ্রের ভারতাগত দফতরী শাসকরা হিং টিং ছট'-এর মতো ঘন ঘন ইসলাম [তথা পাকিস্তান] বিপন্ন বলে হৈ চৈ করত, যাতে তাদের দুঃশাসনে ক্ষুব্ধ জনগণের শঙ্কা ও ক্ষোভ অদৃশ্য শত্রুর দিকে নিবদ্ধ হয়।

পাকিস্তানের Constituent Assembly-তে President রূপে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন যে, "You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual but in the political sense as citizen of the state."

অবশ্য এর আগেই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অভিপ্রায়ক্রমে দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু এ মানুষই কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম তোষণ লক্ষ্যে ইসলামী সমাজতন্ত্রের ও ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলেন।

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন বিদ্যায় আত্মপ্রত্যয়ী, বুদ্ধিতে পাকা, সংকল্পে দৃঢ়, মেজাজে কড়া, স্বভাবে আবেগশূন্য নিঃসঙ্গ প্রভুত্ববিলাসী প্রয়োজনসচেতন অসহিষ্ণু ডিক্টেটর। এঁকে তাই নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী সহ্য করতে চাননি। কিন্তু জিন্নাহর অসুস্থতা ও মৃত্যু [১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮] উভয়ের মধ্যে কোন প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব প্রকট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার সুযোগ দেয়নি। অবশ্য নওয়াবজাদা পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী নেতাদের রাষ্ট্রদূত করে দিয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েও বহুকাল ক্ষমতা উপভোগ করতে পারেননি। নিহত হয়েছিলেন ১৯৫১ সনের অক্টোবরে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নিরোধক 'লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি' (৮ই এপ্রিল, ১৯৫০] লিয়াকত আলীর একটি সৎকর্মরূপে স্মরণীয়। জিন্নাহর মৃত্যুতে নাজিমুদ্দীন হয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল, লিয়াকত আলীর মৃত্যুতে হলেন প্রধানমন্ত্রী আর এক পাঞ্জাবী গোলাম মুহম্মদ হলেন গভর্নর জেনারেল, অন্য পাঞ্জাবী চৌধুরী মুহম্মদ আলী সচিব থেকেও হলেন অর্থমন্ত্রী। এসব নিয়োগের কোনটাই বিধি-বিধান সম্মত ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করারও কেউ যেন ছিল না। কেননা গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল আমলাতন্ত্র—আমলারা ছিল পাঞ্জাবী ও উত্তর প্রদেশের সিভিল লোক, ব্রিটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সব পাকা পদস্থ আমলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যক্তিত্বহীন ভীরু প্রধানমন্ত্রী তাঁর উর্দুভাষী প্রভুকল্পমিত্রদের খুশি করবার জন্যে ঢাকায় এসে ১৯৫২ সনের জানুয়ারীতে ঢাকার এক জনসভায় জিন্নাহর মতোই ঘোষণা করলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এতে আগুন জ্বলে উঠল। এমন ঘোষণা তাঁর মুখে প্রত্যাশিত ছিল না, কেননা পূর্ব বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সনের মার্চে Action Committee-র আহ্বায়ক ও খাজা নাজিমুদ্দীনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে চুক্তি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রাদেশিক আইনসভায় বাঙলাকে প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহনরূপে পাশ করিয়ে নেন।

লোকে বলে কোরিয়ার যুদ্ধে পাট চালান দিয়ে পাকিস্তান অর্থে আকস্মিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধাবসানে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটতে থাকে। গোলাম মুহম্মদ দেশের নানা গুরু সমস্যার সমাধানে অসমর্থ নাজিমুদ্দীন সরকারকে পদচ্যুত করে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের বাঙালী রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মুহম্মদ আলীকে এনে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করলেন। এ মুহম্মদ আলী ছিলেন লঘু স্বভাবের ভদ্রলোক। সব সরকারই তাঁকে তাঁর আনুগত্যের জন্যে পছন্দ করতেন। ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গোলাম মুহম্মদকে জব্দ করার জন্যে ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে সংসদে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা সীমিত করে এক বিল পাশ হয়। অক্টোবরে Constituent Assembly ভেঙে দিয়ে গোলাম মুহম্মদ স্বৈর ও স্বেচ্ছাচারিতার চরম স্বাক্ষর নয় শুধু, প্রতিহিংসারও প্রমাণ রাখলেন, আর প্রতিষ্ঠা করলেন একনায়কত্ব। নতুন Constituent Assembly হল সংখ্যাসাম্য ভিত্তিক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ + ৪০ = ৮০ জনের। স্যার জাফরুল্লার ও আয়ুব খানের পরামর্শে ও সমর্থনে গোলাম মুহম্মদ ১৯৫৪ সনের SEATO-তে যোগ দিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার ও মুৎসুদ্দী হয়ে কম্যুনিজম ঠেকানোর অঙ্গীকারে চিরআবদ্ধ করলেন পাকিস্তানকে।

অবশেষে উগ্র অসুস্থ গোলাম মুহম্মদের ক্ষমতার লীলা শেষ হল, তাঁকে গদী ছাড়তে বাধ্য করা হল এবং তাঁর জায়গায় পূর্বতন জেনারেল ইস্কান্দর মির্যাকে দেয়া হল গভর্নর জেনারেলের পদ। প্রাক্তন প্রধান সচিব চৌধুরী মুহম্মদ আলী হলেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময়ে সোহরাওয়ার্দী-নির্মিত শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাড়ে আট বছর বয়সে ১৯৫৬ সনের ২৩শে মার্চ সংসদে গৃহীত হল, যা কখনো বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কিন্তু সদ্য গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী ষড়যন্ত্রপটু ইস্কান্দর মির্যাই পেলেন পাকিস্তানের প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট হবার গৌরব। ১৯৫৬ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয় পূর্ববঙ্গে আতাউর রহমান খানের প্রধানমন্ত্রিত্বে। আর তারপরে ১২ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে চৌধুরী মুহম্মদ আলীকে সরিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে বসানো হল প্রধানমন্ত্রীর আসনে।

সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাশ্মীর প্রশ্নে বোধ হয় যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারীতে কাশ্মীরপ্রশ্ন উত্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, এতে ভাসানীর সম্ভবত সমর্থন ছিল না। ঠিক এ সময়েই সেক্যুলার ভাসানী কাগমারীতে এক আন্তর্জাতিক রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। রাজনীতিক নেতা কেউ না এলেও কোলকাতা থেকে এলেন অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক। এটি খুব সাড়া জাগিয়েছিল। ইসলাম-পন্থীরা চট্টগ্রামে মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন করে এর প্রভাব হ্রাসে বৃথা প্রয়াসী হয়েছিল। যা হোক ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর বিদেশনীতির সমর্থক হয়ে গেলেন ওই সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় বিভ্রান্ত হয়ে। মার্কিন অনুগত সোহরাওয়ার্দী সুয়েজনীতির জন্যে নিন্দিত হয়েছিলেন দেশের ও বহির্বিশ্বের অনেকের কাছে।

১৯৫৬ সনে সংবিধান গৃহীত হয়েও নানা কারণে ও মতলববাজদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতায় নির্বাচনের ব্যবস্থা হল না। চাকুরীর মেয়াদ তিন বছর বৃদ্ধির পরেও আয়ুব খানের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হত ১৯৫৮ সনের এপ্রিলে। আয়ুব আবার মেয়াদ বৃদ্ধি চাইলেন, সোহরাওয়ার্দী রাজী হলেন না। কাজেই তাঁকে ষড়যন্ত্র মাধ্যমে ক্যু করে ক্ষমতা দখল করতে হল। সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগে বাধ্য করলেন ১৯৫৭ সনের অক্টোবরে। করাচীর ব্যবসায়ীদের যুক্তি ও দাবী ছিল এরূপ : "Parity in the political sphere may be a workable compromise but its application to economic planning without considering other important economic facts may lead us into blind alleys from where there may be no way out." সোহরাওয়ার্দী দ্রোহিতার প্রত্যক্ষ কারণ ঘটেছিল National Shipping Corporation গঠন নিয়ে। এর পরে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন মুসলিম লীগার আই. আই. চুন্দ্রিগড়। দুই মাস পরেই তাঁকেও পদত্যাগ করতে হয় এবং ফিরোজ খান নুন পেলেন ওই পদ।

অবশেষে ১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যা সামরিক আইন জারি করে আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক ও তিন বাহিনীর সর্বময় কর্তা করে দেন। আয়ুব খানই জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন–"Since the death of Quaid Azam and Mr. Liakat Ali Khan politicians started a free for all type of fighting in which no holes were barred. They waged ceaseless and bitter war against each other" আর যথারীতি নিয়মে ঘোষণা করেন "Let me announce in unequivocal Terms that our ultimate aim is to restore democracy but of the type that people can understand and work." তারপর তাঁর দশ বছরের কৃতি-কীর্তি সবাই জানে। ১৯৫৮ সনের ২৭শে অক্টোবর ইস্কান্দার মির্যাকে বিতাড়িত করে প্রেসিডেন্ট ও সামরিক প্রশাসক হলেন আয়ুব খান। এখন থেকে আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার তথা তৃতীয় বিশ্বের রাজ্যগুলোর মতো সামরিক শাসনের ফাঁকে ফাঁকে শ্রাবণের মেঘ-ভাঙা রোদের মতো তথাকথিত প্রেসিডেন্সিয়াল গণতন্ত্র নামের একনায়কত্ব চালু হল পাকিস্তানে এবং বাঙলাদেশেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট থেকে ১৯৫৮ সনের ৮ই আগস্ট অবধি এগারো বছরে সাতজন প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছেন। গভর্নর জেনারেল আর প্রেসিডেন্টও বদল হয়েছেন চারজন। এ কেবল দিল্লীর গিয়াস উদ্দীন বলবনোত্তর দাসবংশীয় বাদশাহদের ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাকিস্তানে রাজত্ব করেছেন যাঁরা, তাঁরা মুসলিম ছিলেন বটে, কিন্তু কেউ স্বদেশপ্রেমী স্বাধীনতাকামী ছিলেন না। ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অনুগত বা বশংবদ চাকুরে বা কৃপা-কদর প্রত্যাশী বিত্ত-বিদ্যার লোক। কাজেই তাঁদের লক্ষ্যই ছিল পদ-মান-খ্যাতি-ক্ষমতা লাভ। জনসেবায় বা রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের প্রয়াস-প্রযত্ন ছিল যান্ত্রিক, আন্তরিক নয়। সেনানী শাসকরাও স্ব স্ব বিত্ত-বেসাত করার ও খ্যাতি-ক্ষমতা অর্জন লক্ষ্যে কাজ করছেন বলে দুষ্ট-দুর্জন-দুস্কৃতিকেই তাঁরা তাঁদের সর্ব প্রকারের শাসনে-প্রশাসনে, দুর্নীতি-দুষ্কর্মে সহায়-সহযোগী করেছিলেন গাঁয়ে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে। ফলে দেশের আনাচে-কানাচে অবৈধ স্বৈর-স্বেচ্ছাচারী 'Power Elite' ভিত্তিক দুষ্ট-দুর্জন-দুষ্কৃতি-দুর্নীতিবাজদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে উঠেছে, মস্তানতন্ত্র চলছে সর্বত্র। জীবিকাক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতিজনিত আর্থিক অবক্ষয়ও এর অন্য সব কারণ।

আয়ুব খান ক্যু করেই সামরিক শাসকসুলভ সব আচরণই প্রায় নিখুঁতভাবে করলেন ও করালেন। হুকুম-হুমকী যোগে শহরের রাস্তা-ঘাট-পাঁচিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে দিলেন, সততাপ্রীতির নমুনাস্বরূপ দুর্নীতিবাজ চাকুরেদের পদচ্যুত করলেন, ভেজাল-চোরাচালান ধরালেন, ৭ই আগস্টে EBDO বা Elective Body Disqualification Order যোগে রাজনীতিকদের জব্দ ও স্তব্ধ করলেন ও রাখলেন ১৯৬৬ সনের ডিসেম্বর অবধি। করাচি থেকে রাজধানী সরিয়ে নিলেন পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে। আর Export Bonus Scheme করে হাত করলেন ব্যবসায়ীদের। ইতোমধ্যে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন বসিয়ে সে-কমিশনের সুপারিশক্রমে তিন বছুরে স্নাতক কোর্স চালু করে ছাত্র ও অভিভাবক সমাজে অসন্তোষ ঘটান এবং ছাত্রদের আন্দোলন ১৯৬১ সনে তুঙ্গে উঠলে সাবেক পদ্ধতি মেনে নেন। বুনিয়াদি গণতন্ত্র চালু করে গাঁয়ে গঞ্জে উন্নয়নমূলক কাজে বেহিসাব ব্যয়ের অধিকার দিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের প্রলুব্ধ করে, দুর্নীতিবাজ হবার সুযোগ দিয়ে সারাদেশের লোকের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে দেন। ওই দুর্নীতিবাজদের তিনি তাঁর সমর্থক ও সহযোগীরূপে পেলেন স্বৈর শাসনে-প্রশাসনে ও ভোটে। ১৯৬০ সনেই কেন্দ্রীয় রাজস্বের ৫০% প্রদেশে ব্যয় করার নীতি গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে লোকপ্রিয় হলেন। তাঁর তৈরি সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬২ সনে বুনিয়াদী গণতন্ত্র সম্মত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত তাঁর ক্রীড়নক সংসদ সদস্যদের বশংবদ রাখেন। আয়ুব দিগ্বিজয়ী রাষ্ট্রনেতার খ্যাতিপ্রতিপত্তি লোভে কাশ্মীর দখল লক্ষ্যে যুদ্ধ বাধান ১৯৬৫ সনে। পরাভূত হয়ে, মার্কিন অর্থে বঞ্চিত হয়ে, জনপ্রিয়তা হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময়ে তাঁর নামে পাকিস্তানের De facto শাসক ছিলেন সিভিলিয়ন ফিদা হোসেন ও আলতাফ গহর। তাঁর শাসনের 'দশ বছর কাল' পূর্তি উপলক্ষে সগৌরবে বহু ব্যয়ে উদ্‌যাপিত হয় Great `Decade'। ১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তানে শুরু হয় গণবিক্ষোভ ও গণআন্দোলন, তা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে নভেম্বরে। ১৯৬৯ সনের ২৫শে মার্চে আয়ুব খান ক্ষমতা ছাড়লেন, জেনারেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এহিয়া খান চালু করলেন সামরিক শাসন, তাঁর পছন্দমতো Legal Frame তৈরি করে তিনি প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচন দিলেন ১৯৭০ সনে।

আয়ুব খান কিছু ভালো কাজও করেছিলেন, ১৯৬১ সনে বিবাহ ও পরিবার আইন চালু করেন। স্বামীর একাধিক বিবাহ রোধ, পিতৃহীন সন্তানদের পিতামহের সম্পত্তিতে অধিকার প্রভৃতি কোরআন সম্মত না হলেও তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী মনের পরিচয় দিয়েছেন, World Bank প্রতিনিধি Eugine Black-এর মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সিন্ধুর পানিবণ্টন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হন। ১৯৬১ সনের মে মাসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক ও বাণিজ্যিক অসমতা স্বীকার করে বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার করেন। ঢাকায় তাঁর নিয়োজিত প্রদেশপাল ছিলেন আজম খান, জাকের হোসেন এবং আবদুল মোনেম খান। আয়ুব খান সামরিক অফিসার, পুলিশ অফিসার এবং স্থূল বাহুবলে আস্থাবান সুবিধাবাদী কিন্তু প্রভুভক্ত রাজনীতিক দিয়েই তাঁর রাষ্ট্রে শাসন-প্রশাসন চালাতেন। তাঁর অনুসৃত নীতি-নিয়মের ফলেই নীতি-আদর্শনিষ্ঠ দুর্লভ এবং দুষ্ট-দুর্জন-দুঃশাসক ও দুর্নীতিবাজ প্রশ্রয় পেয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। ছাত্ররাজনীতিতে গুণ্ডামী-মাস্তানী মোনেম খানের উদ্যোগে-উৎসাহে শুরু হয় N. S. F. [National Students Federation] নামের সরকার পোষ্য ও পুষ্ট ছাত্রদল দিয়েই। পূর্ব বাঙলায় আয়ুব খানের পতনের তথা বাঙালীসত্তা-চেতনার দ্রুত প্রসারের মুখ্য কারণ তিনটি : ১৯৬৫ সনের সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতা ও গাঁয়ের লোকের আকস্মিক হতাশা, আওয়ামী লীগের লোকমনোরঞ্জক ছয় দফা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাজাত গণবিক্ষোভ। ১৯৪৭ সন থেকেই ইসলামী ভ্রাতৃত্বমুগ্ধ স্থূল ও স্বল্পবুদ্ধি বাঙালীরা আত্মসত্তা লোপ করে কেবল রাষ্ট্রিক পরিচয়ে উল্লসিত ও কৃতার্থ বোধ করত। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান, পাকজবান, পাকিস্তানী-অভিধায় আমাদের বঙ্গভূমিকে, বাঙলা ভাষাকে ও বাঙালীত্বকে অভিহিত করে আমাদের আবহমান কালের সর্ব প্রকার পরিচিতি বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭১ সনে তার বিলুপ্তি ঘটল।

আধুনিক রাজনীতি হচ্ছে য়ুরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্তির ফল। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বাঞ্ছিত বিস্তার ছিল না, অজ্ঞ অনক্ষর মানুষ অধ্যুষিত ছিল গ্রামগুলো, রেডিয়ো তখনো এখনকার সংখ্যায় চালু হয়নি, দৈনিক পত্রিকাও পৌঁছুত না গ্রামে। টেলিভিশন তখনো অজ্ঞাত। লেখা-পড়া জানা মানুষের মধ্যেও নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক মানুষই গণতন্ত্রের গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা বুঝত। একটি প্রমাণ দিই, গণতন্ত্রী পাকিস্তানপন্থীরাই মনের দিক দিয়ে ছিল সামন্ত-ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ। তাই তারা মোহাম্মদপুরে সব রাজা-বাদশাহর নামে সড়ক করল অভিহিত। মোনেম খান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে যোগ করলেন জাহাঙ্গীরের নাম। এটি ব্রিটিশ সম্রাটের নাম যোগ করার মতোই। সেদিন জয়দেবপুর-এর বদলে অন্য সামন্তের নামে গাজীপুর করা হল। এখনো ঘরে ঘরে রাজা-রানী, বাদশাহ্, নাম রাখা হয় সন্তানের। পাকিস্তানে বা অশিক্ষাদুষ্ট বাঙলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বে সাধারণ মানুষে তখনো এবং এখনো 'গণতন্ত্র' চেতনা জাগেনি। শিক্ষিত লোকেরাও হয়নি প্রয়োজনীয় মাত্রায় গণতন্ত্রমনস্ক। তাই এসব দেশে তথাকথিত গণতন্ত্র চালু করলেও বেশিদিন চলে না। ফলে পাকিস্তানে বাঙলাদেশে তথা তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্র লঘু-গুরুভাবে সেনানীর স্বৈরস্বেচ্ছাতন্ত্র চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো একটি কথা, সামন্তশাসনের ধারা ছিল এক রকম—সেখানে শাসক-শোষিতের সম্পর্ক ছিল প্রায় বান্দা-মনিবের, প্রভু-ভৃত্যের, দুটো চির পৃথক শ্রেণীর, যদিও সামন্তরা প্রজার পিতৃত্ব তথা পালক-পোষকের মর্যাদা দাবি করত। রাজা হল পিতা আর প্রজা হল সন্তান। ক্ষত্রিয় যুগের অবসানে যখন বৈশ্য যুগ শুরু হল য়ুরোপে তখন বান্দা-ভৃত্য-সন্তান তত্ত্ব ও চেতনা হল বর্জিত, তার জায়গায় ধনী-নির্ধন, ক্রেতা-বিক্রেতা, কর্তা-কর্মী, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। আর পুঁজিজাত-শোষিতের সম্পর্কটা চলে গেল সাধারণের চোখের আড়ালে। তবু বিবেকবান শিক্ষিত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সৎ ও উদার বুর্জোয়ার বহুলতার দরুন য়ুরোপে বিশ শতকে একটা পরিচ্ছন্ন মানবিক ন্যায়বুদ্ধিসম্মত গণতন্ত্র তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। সেখানে আর্থিক বৈষম্যজাত জীবন-বিড়ম্বনা থাকলেও তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে না।

কাজেই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে, বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত শিল্পে-বাণিজ্যে, সমাজে, সরকারে ও রাষ্ট্রে ঘরোয়া রাজনীতি নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে সীমিত থাকে। অভ্যন্তরীণ আর্থিক জীবনের উঠতি-পড়তি-ঘাটতি-সমস্যা-বিপর্যয়ই সাধারণভাবে নাগরিকদের তথা ভোটারদের রাজনীতিক দল নির্বাচনের মাপকাঠি বা সমর্থন-অসমর্থনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির তথা প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে রাজনীতিক দলগুলোর মধ্যে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়।

পাকিস্তান, বাঙলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্ব সে-স্তরে উন্নীত হয়নি বলে এখানে গণতন্ত্র পরাশক্তির বা ভিন্ন রাষ্ট্রের মুৎসুদ্দী সরকার মাত্র। তা সহিংস্র ষড়যন্ত্রাশ্রয়ী হয়ে নীতি-নিয়ম বিধি-নিষেধ তুচ্ছ জেনে ভোটচুরি, নরহত্যা, ব্যালট বাক্সে কারচুপি, বাহুবল, ঘুষ, ভীতি-প্রদর্শন প্রভৃতি সর্বপ্রকার দুর্নীতিসম্বল তথাকথিত নির্বাচন মাধ্যমে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে। এমন অমানবিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত অমানুষ কি মনুষ্যসমাজের হিতৈষী হতে পারে?

তা ছাড়া জনবহুল দরিদ্র রাষ্ট্রে অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে নিম্নতম চাহিদা পূরণে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার আজ অবধি আবিষ্কৃত একমাত্র পন্থা বা উপায় হচ্ছে উৎপাদিত ও অর্জিত অর্থ-সম্পদের আনুপাতিক হারে বন্টন। অর্থাৎ অন্য কথায় রাষ্ট্রভাষী প্রত্যেকটি মানুষকে সামান্য শিক্ষার-চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখে ভাতে-কাপড়ে পোষার দায়িত্ব গ্রহণের সরকারী বা রাষ্ট্রিক অঙ্গীকার। অন্য কথায় জনগণের দাবি অনুসারে তাদের ভাতে-কাপড়ে পোষার সর্বপ্রকার দায়িত্ব যে সরকারের তথা রাষ্ট্রের—এ স্বীকৃতির বাস্তবায়নই কেবল দরিদ্র রাষ্ট্রে মানুষের বাঁচার এবং নির্বিশেষে মানুষকে বাঁচাবার একমাত্র উপায়। সে জন্য আজকের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে সমাজ-সরকার পরিবর্তন লক্ষ্যে অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠালক্ষ্যে স্বধর্মী-স্বজাতি-স্বজন শাসন-সরকার উৎখাতের সংগ্রামে নামতে হবে নিঃস্ব-নিরন্ন কৃষক-শ্রমিকদের। সে সংগ্রাম বা বিপ্লব শুরু এবং জয়ের সাফল্য শেষ না হলে গণ-মানবের নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে বাঁচার অধিকার মিলবে না।

যারা এ তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তারা সামন্ত-বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের নীতি-নিয়মে আবর্তিত শাসন-শোষণের চক্রবৎ চির আবর্তিত ইতিহাসের নূতন কিছু পাবেন না। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের ইতিবৃত্তে তাদের কোন প্রয়োজন বা আগ্রহও থাকার কথা নয়। এ কারণেই আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিবৃত্তেরও রূপরেখা আঁকব মাত্র।

১৯৬৫ সনে যুদ্ধকালে বোঝা গেল পূর্ব পাকিস্তান সামরিকভাবে অরক্ষিত এবং কেন্দ্রীয় সরকার তথা পশ্চিম পাকিস্তানী দিয়ে গঠিত বাহিনীর এ বিষয়ে চির ঔদাসীন্য। এ দিকে বিরক্ত মার্কিন সরকার ১৯৬৫ সনের জুন মাসেই অর্থ সাহায্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানীর ঔদাসীন্য, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে অবহেলা, সামরিক বাহিনীতে বাঙালীর সংখ্যাল্পতা প্রভৃতি বাস্তব কারণ ও মানসিক উদ্বেগ বাঙালীকে ছয় দফা দাবি পেশে প্রণোদনা দেয়।

ছয় দফার সারকথা

১. ১৯৪০ সনের মূল লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করে কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার গঠন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে কেবল দেশরক্ষার ও পররাষ্ট্রনীতির দায়িত্ব।

৩. পাকিস্তানের উভয় অংশে থাকবে সম্পূর্ণ পৃথক রাজস্ব ও অর্থ ব্যবস্থা।

৪. ফেডারেল সরকারের কোন কর বসানোর ও আদায়ের অধিকার থাকবে না।

৫. উভয় অংশের বাণিজ্যাদির বহিরার্জিত আয়ও থাকবে পৃথক।

৬. উভয় অংশ স্ব স্ব প্রয়োজনে Para military বা সশস্ত্র বাহিনী রাখতে পারবে।

১৯৬৮ সনের ২০শে জানুয়ারী সরকার রাষ্ট্রবিরোধী আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেন। দু'সপ্তাহ পরে শেখ মুজিবুর রহমানকেও ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা ও মামলার আসামী হিসেবে গ্রেফতার করা হয়। এ মামলায় জড়িত হন কমান্ডার মোয়াজ্জেম ও তিন C.S.P. খান শামসুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও আহমদ ফজলুর রহমান। আয়ুব খানের সুশাসনের ও দেশোন্নয়নের মহান দশক পালিতও হল ১৯৬৮ সনে। আর ১৯৬৮ সনের নভেম্বরের মধ্যেই শুরু হল আয়ুব বিরোধী আন্দোলন। ১৩ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে পয়লা ধর্মঘট পালিত হল। এর পরে AL, PDM, DAC, NAP প্রভৃতি নানা দল আর আইনজীবী-ছাত্র-সাংবাদিক-লেখক প্রভৃতি লঘু গুরুভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

১৯৬৯ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি গার্ডের গুলিতে আগরতলা মামলার এক আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি এ মামলার বিচারক সৈয়দ আব্দুর রহমানের আবাসগৃহটি পুড়িয়ে দেয়া হল। ভাসানী ১৬ই ফেব্রুয়ারি জনসভায় উত্তেজক বক্তৃতা দিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহীর অধ্যাপক শামসুজ্জোহা নিহত হন। সবটা মিলে ঢাকা প্রায় সরকারবিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। এ সময় মালিবাগের দিকে কার্ফ্যুও ব্যর্থ করা হল প্রাণের বিনিময়ে। অবশেষে আয়ুব খান আগরতলা মামলা তুলে নিলেন, রাউন্ড টেবিল Conference শুরু হল ২৬শে ফেব্রুয়ারি, কিন্তু ফল হল না। অবশেষে আয়ুব খান ত্যাগ করলেন গদী, ২৫শে মার্চ ক্ষমতা দখল করলেন এহিয়া খান। ১৯৭০ সনের ডিসেম্বরে সারা পাকিস্তানব্যাপী হল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সংসদে নির্বাচন। পশ্চিম পাকিস্তানীদের কল্পনাতীতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় সব আসন পেয়ে গেল আওয়ামী লীগ। সংখ্যাগুরুর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বা উজিরে আজম হওয়ার কথা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগুরুর নেতা People's

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Party-র জুলফিকার আলী ভুট্টো সেনানী শাসকদের গোপন সমর্থন পেয়ে তা হতে দিলেন না। বললেন, মুজিব হবেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আর আমি নিজে হব পাকিস্তানের উজিরে আজম। অতএব পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রস্তাব আসে ভুট্টো থেকেই। এহিয়া পূর্বে নির্ধারিত পয়লা মার্চ সংসদ বসালেন না। পূর্ব প্যাকিস্তান তখন মুক্তিপাগল হয়ে উঠল। সরকার দমনের জন্য ট্রেন্স-অস্ত্রশস্ত্র লোক-লস্কর সব তৈরি রেখেছিল। আপোষের ছদ্ম-কথা-বার্তা চালান কয়দিন শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকার। অবশেষে ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাত্রে সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে বাঙালী নিধন শুরু করল আকস্মিকভাবে। অবশ্য ভারত তার সীমান্ত খুলে না দিলে হয়তো সেবার বাঙালীর স্বাধীনতা পাওয়া সহজ ও ত্বরান্বিত হত না। কারণ ভারতকে নিরাপদ আশ্রয় করেই বাঙালীরা যুদ্ধ করতে পারল দেশের অভ্যন্তরে।

এবার জেনারেল ফজল মুকিমের 'Crisis in Leadership' থেকে কিছু তথ্য ও নিরপেক্ষ মন্তব্য তুলে দিচ্ছি ঃ

'In their [Yahia's advisers] opinion the Awami League did not enjoy the support of the majority of the population of East Pakistan and the people did not have the stamina necessary for prolonged opposition.'

তাই এ অভ্যুত্থান দমনের লক্ষ্যে এহিয়াকে পরামর্শ দেয়া হল 'a short and harsh action' নেয়ার জন্যে।

২৩ শে মার্চ এহিয়া টিক্কা খানকে নির্দেশ দিলেন 'To get ready to put emergency operation at short notice. It was decided to start an action [হত্যাকাণ্ড] at 11.00 a.m. on March 26. টিক্কা খান নির্দেশ দিলেন for disarming the East Bengal Battalion, EPR and the Police.

'The Bengali Personel belonging to the East Bengal Regiment, EPR and Police resisted the Pakistani Army when they tried to disarm them as ordered by General Tikka Khan.'

'In Chittagong Major Ziaur Rahaman alerted the Center [East Bengal regiment Center] and the EPR [East Pakistan Rifles] to revolt and within next week the five battalions of EPR stationed in East Pakistan the whole of EPR and the Army and Police revolted and took up Arms against Pakistan. Ziaur Rahaman became famous as he was the firstman to announce the formation of the Provisional Government of Bangladesh from the Chittagong Radio station [actually from Kalurghat] on March 26. কোলকাতাস্থ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ক্রমে 'The Mukti Bahini came into existence officially when on April 11, 1971...

'When the Mukti Bahini got properly organised which had there speparate branches the Army, the Navy and Air FORCE. The Army as the biggest and best organized branch, ১৯৭১ সনের জুলাই থেকেই মুক্তিবাহিনী আক্রমণ শুরু করে এবং 'The aim of the Mukti Bahini seemed to be to exhaust the Pakistan supply of Ammunitions.

By October 1971 the Mukti Bahini built up a horrifying record of sabotage, murder and kidnapping.

মুক্তিবাহিনী জাহাজ ফুটো করেছে চারটি, অয়েল ট্যাঙ্কার, বার্জ প্রভৃতিও নষ্ট করেছে। মোটামুটি হিসেবে বোমা মেরেছে নানা স্থানে ৪৯৭টি, নানা সরকারি গুদাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি আক্রমণ করেছে ২৮৩টি, সেতু ভেঙেছে ২৩১টি, রেললাইন নষ্ট করেছে ১২২ জায়গায়, বিদ্যুৎ লাইন বিকল করেছে ৯০টি এবং ব্যাংক ও কোষাগার লুট করেছে ৯০টি। শান্তি কমিটির সদস্য এবং রাজাকার মেরেছে তিন হাজারের বেশি।

অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১ সনের) জগজিৎসিংহ আরোরার কাছে জেনারেল আমীর আহমদ নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। বাঙলাদেশ স্বাধীন হল। পাকিস্তান বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ভাষার দৈন্যের দরুন বলত 'মুক্তি'। সেদিন ওরা সত্যিই ছিল এক একজন প্রমূর্ত মুক্তি।

আর যে কথা ফজল মুকিম বলেননি, তা হচ্ছে, ১৯৭১ সনের নয়টি মাস বাঙলার মানুষ চরম ত্রাসের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছে। গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে হাটে-ঘাটে-বাটে নারী ইজ্জত হানির শঙ্কা নিয়ে, পুরুষ জান হারানোর আতঙ্ক নিয়ে দিবারাত্রির মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করেছে এবং আড়াই থেকে তিন লক্ষ বাঙালী আর বিহারী প্রাণ হারিয়েছে। ইজ্জত হারিয়েছে কয়েক হাজার নারী।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা আয়ুব খানকেও সন্ত্রস্ত করেছিল এবং এ-ও সত্য যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলে, তখন আমিনা বেগম ব্যতীত ঢাকায় খ্যাত প্রায় সব নেতা আওয়ামী লীগ ছেড়েছিলেন। কিন্তু প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমান যেহেতু আওয়ামী নেতা, সেহেতু তাঁকে অবলম্বন করেই তাঁর মুক্তির দাবিতেই ঘটেছিল গণ-অভ্যুত্থান, অতএব তাঁর মুক্তির পরে যখন এহিয়া সত্তর সনে নির্বাচন ঘোষণা করলেন, দেশের লোক বাঙালী সত্তার প্রতীক জাতীয় বীর শেখ মুজিবকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতা মেনে নিল। নির্বাচন কর্মীরাও তাঁর সম্মতি ও মনোনয়ন লক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে জুটে গেল। এভাবে ১৯৭০ সনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাঙলায় প্রায় সর্বজন সমর্থিত একমাত্র রাজনীতিক জাতীয় দলে পরিণত হল। অন্যান্য দলগুলো এর পাশে দৃষ্টিগ্রাহ্য ঔজ্জ্বল্য হারাল। মুক্তিযুদ্ধকালে কেবল ইসলামপন্থী ছাড়া সবাই 'আওয়ামী লীগ' নেতৃত্ব অবিসম্বাদিতভাবে মেনে নিয়েছিল দেশের অভ্যন্তরে ও কোলকাতায়। যেহেতু যোদ্ধারা ও যুদ্ধের সমর্থক-সহায়করা সবাই আওয়ামী লীগার ছিল না, সেহেতু স্বাধীন বাঙলায় ন্যায়ত জাতীয় সরকার— দলীয় নয়, গঠিত হওয়া ও চালু থাকা বাঞ্ছিত ছিল নতুন নির্বাচন কাল অবধি। তা হল না, ফলে আওয়ামী লীগাররা সরকারী প্রশ্রয়ে অবাধে দুর্নীতি-দুষ্কৃতি আশ্রয়ী হয়ে শত্রু-সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ি-ঘর দখল করেছে, যেন তারা পররাজ্য জয় করেছে, এমনভাবে লুটপাটে ব্যক্তিগত শত্রু দমনে হিংসা-প্রতিহিংসা প্রয়োগ করেছে। সম্প্রতি আওয়ামী লীগারদের নরহত্যার একটা ইতিবৃত্ত বের হয়েছে [আহমেদ মুসা সংকলিত]। তাতে গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে নিহত-নির্যাতিত অনেকের পরিচিতি রয়েছে। রক্ষীবাহিনীর গণনির্যাতন স্মৃতিও আজো লোমহর্ষক।

আওয়ামী লীগাররা সামজতন্ত্রী ছিল না। তাদের সেই শিক্ষা বা দীক্ষাই ছিল না। সম্ভবত রাশিয়ার প্রভাবে মার্কসবাদে অজ্ঞ ও অদীক্ষিত সেই লোকেরাই আকস্মিকভাবে উচ্চারণ করল, আমরা সমাজতন্ত্রী। সমাজতন্ত্রী হলেই সেক্যুলার হতে হয়, তারও একটা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা থাকে, একটা দলীয় গণতন্ত্রও থাকে। একটি সত্তার বা অঙ্গীকারের প্রত্যঙ্গকে চারটি ভাগে দেখানোই ছিল একটা কপটতা। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে রচিত ও গৃহীত সংবিধানের বা শাসনতন্ত্রের [১৯৭২ সন] বাদ বাকী অংশ ছিল বাঞ্ছিত মানের গণতন্ত্রসম্মত। এবারেও হয়তো রাশিয়ার প্রভাবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একনায়কত্ব ভিত্তিক সমাজবাদী দল পরিচালিত রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে আকস্মিকভাবে দেশে 'বাকশাল' [BKSAL] বা বাঙলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ দল গঠিত হল, আইনের জোরে নয় হুকুমে বিঘোষিত এবং দেশশাসক রূপে, সংবিধানের নিয়মে নয়— গায়ের জোরেই নায়ক সরকারও প্রতিষ্ঠিত হল। এ-ও ছিল এক ত্রাসের রাজত্ব, শিক্ষিত,-শহরে চাকুরে-উকিল-ডাক্তার-মাস্টার -সাংবাদিক-বেণেবুর্জোয়া সবাই কেউ লাভে, কেউ লোভে, কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ ভয়ে-ত্রাসে বাকশাল সদস্য হয়ে গেল। সারাদেশে ঝুঁকি নিয়ে বাকী থাকলেন খ্যাত লোকের ক্বচিৎ কেউ, করগণ্য তারা। বাকশালী প্রশাসন বিন্যাস, আঞ্চলিক গভর্নরের অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পরিপূর্ণভাবে চালু হওয়ার কথা ছিল '৭৫ সনের পয়লা সেপ্টেম্বর। তার আগেই ১৪ই আগস্ট রাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সবংশে হননের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হল। এতে দলের লোকেরা স্তম্ভিত, শত্রুরা আনন্দিত, ত্রস্তরা স্বস্থ ও আশ্বস্ত হল। তবে জাতির পিতারূপে বন্দিত মুজিবুর রহমানের সপরিবারের হত্যা রাষ্ট্র ও জাতির পক্ষে কোন ক্ষেত্রেই কল্যাণকর হয়নি। কেননা তার পরের মুহূর্ত থেকে ১৯৮৯ সনের এ দিন অবধি সেনানী শাসনই, সাম্রাজ্যবাদীর মুৎসুদ্দী শাসনই বিত্ত-বেসাত-মান-খ্যাতি-ক্ষমতালোভী বিবেক-বিবেচনাহীন নিতান্ত সুবিধেবাদী ও সুযোগসন্ধানী লোক নিয়ন্ত্রিত। প্রশাসনিক, শিল্প-বাণিজ্যিক, আর্থসামাজিক ক্ষেত্র রয়েছে দুষ্ট-দুর্জন ও দুস্কৃতি-দুর্নীতিবাজ বহুল। মুজিবহত্যার ফলে বোঝা গেল নেতাভক্ত ও দলনিষ্ঠ বাকশালী সংখ্যায় বেশি ছিল না, বাকশালীরা তখন 'মুজিব কোট' লুকোনোয় ছিল ব্যস্ত। অপরাধ সচেতনরা আত্মগোপন করেছিল।

সবাই জানে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার তথা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে 'ক্যু-দে-তা [Cou-De Tat'] হয় কোন না কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পরামর্শে, প্ররোচনায়, মদদে ও অর্থে। জান্তা নায়কের ভাব-চিন্তা-কর্ম -আচরণে বোঝা যায়, তাঁকে মদদ জুগিয়েছে কোন রাষ্ট্র বা শক্তি। আওয়ামী নেতা ও বাকশালী খোন্দকার মোস্তাক আহমদ ক্ষমতা পেয়েই বাঙলাদেশ বেতারকে করলেন 'রেডিও বাংলাদেশ', রাষ্ট্রপতিকে বানালেন 'প্রেসিডেন্ট' জাতীয় পোশাক ধরলেন 'আসকান টুপি' আর তাঁর ইরাকী-বাগদাদী খোর্মা-খেজুর প্রীতিতে বোঝা গেল, তাঁর মনে-দিলে কখনো আওয়ামী দীক্ষা ঠাঁই পায়নি। তাঁর এতকালের কর্ম-আচরণ ছিল ছদ্ম। তিনি ছিলেন প্রমূর্ত কাপট্য। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদদ আছে অনুমানে তিনি নাকি তাজউদ্দীন-সৈয়দ নজরুল ইসলাম-কামারুজ্জামান-মনসুর আলী হত্যার কারণ হন। খালেদ মোশাররফ যে-কোন কারণেই হোক ঢাকার সেনানী-সিপাহীদের প্রয়োজনানুরূপ সমর্থন সহযোগিতা না পেয়ে নিহত হন।

এ সময়ে আকস্মিকভাবে কয়েক ঘণ্টার জন্য আবির্ভূত হন মুক্তিযোদ্ধা বীরোত্তম কর্নেল আবু তাহের। তিনি কর্মরত সেনানী না হয়েও ঢাকা সেনানিবাসে সিপাহীদের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটান এবং চট্টগ্রাম-কুমিল্লার সেনানিবাস থেকে কি অসামান্য ও অনন্য ব্যক্তিত্ববলে হ্যামিলনের বাঁশি বাজিয়ের মতো সিপাহীসেনা নিয়ে এসে ঢাকা দখল করলেন, তা' আজো আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। এ ঘটনা রূপকথার মতোই চমকপ্রদ এবং কর্নেল তাহের সে রূপকথার নায়ক হয়ে রয়েছেন লোকস্মৃতিতে। কিন্তু সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান বলতে কি বোঝায়, এর রাজনীতিক আদর্শ, লক্ষ্য, তাৎপর্য তথা তত্ত্ব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য কি, তা সেদিনও যেমন, আজো তেমনি অজানা—এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ, প্রচার-প্রচারণা হয়নি। গণবাহিনী বা সিপাহী জনতা বলতে কি বোঝায় তা আমাদের দেশে সাধারণভাবে কখনো গণআলোচ্যও হয়নি। ফলে কর্নেল তাহেরের রাজনৈতিক জ্ঞান-প্রজ্ঞার ও চিন্তা-চেতনার গুণ-মান-মাপ-মাত্রা আর স্বরূপ সাধারণের বোধগত হয়নি আজো। কর্নেল তাহের নিজে ক্ষমতাসীন না হয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে স্বেচ্ছায় কেন শাসন-ক্ষমতা দিয়ে দিলেন, তা আমরা জানিনে। এ-ও জানিনে কোন মতানৈক্যের কারণে কিংবা কর্নেল তাহেরের কোন অপরাধের জন্যে জিয়াউর রহমান সুকৌশলে বিচারের নামে তাহের হত্যা করার মতো এমন কৃতঘ্ন হলেন, তা আজো ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণে জানা যায়নি। People's Army গড়তে হলে তাহেরেরই উচিত ছিল ক্ষমতা হাতে রাখা, কেননা ব্রিটিশ বাহিনীর আদলে গঠিত বুর্জোয়া সেনানী তা কখনো হতে দিতে পারে না।

এখন বোঝা যাচ্ছে মেজর জিয়াউর রহমান পাক-সেনার হাতে প্রাণ হারানোর ভয়েই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথমেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি মুক্তিকামী বাঙালী মাত্রেরই হয়েছিলেন 'হিরো' এবং কৃতজ্ঞ করেছিলেন মুক্তিপাগল জনগণকে। তাঁর মধ্যে যে বাঙালীত্ব গর্ব, সেক্যুলার চেতনা, সমাজতন্ত্রপ্রীতি ও গণতন্ত্রানুরাগ ছিল না, তার প্রমাণ তিনি প্রথম যে-জনসভা রেসকোর্সে করেন, তাতে তিনি বলেছিলেন 'আপনারা এতদিন আজান দিতে, নামাজ পড়তে পারতেন না—ইত্যাদি'—এ আমার কানে শোনা। তিনি রাজাকারদের শাসন-প্রশাসনে তাঁর সহযোগী করেছিলেন। তখনো লোক-নিন্দিত আওয়ামী-বাকশালী মালেক-মিজানকে স্বদলে নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলেন। তিনি অবাধ পুঁজিবাদের ও বেসরকারি তথা ব্যক্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্প-কারখানার সমর্থক ছিলেন। আরো ছিলেন তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে ডিক্টেটরী শাসনের বা একনায়কত্বের পক্ষপাতী। তিনিও স্ব স্বার্থে দুষ্ট-দুর্জনের ও দুষ্কৃতী দুর্নীতিবাজদের সমর্থন-সহযোগিতা প্রাপ্তি লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দুর্নীতির ও দুঃশাসনের প্রশ্রয়দাতা ছিলেন।

আমাদের দেশের কাঙাল মানুষ কেবল অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনকেই ঈর্ষাবশে চরিত্রহীনতা বলে মানে। জেনারেল জিয়াউর রহমান এ তত্ত্ব জানতেন বলে 'অর্থলিপ্সা' করেননি। এতেই তিনি সামরিক সেনানীশাসক এবং নায়কতন্ত্রী হয়েও বিপুল ব্যয়বহুল হেলিকপ্টারে গাঁয়ে-গাঁয়ে অকারণে ঘুরে ঘুরে নিরক্ষর, নিঃস্ব চাষী মজুরের হাতে হাত মিলিয়ে এতই জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে বিশ-বাইশ বারে কয়েক হাজার দ্রোহী সৈনিক গোপনে হত্যা করেও নিহত হওয়ার পরেও তাঁর দল ক্ষমতাসীন থাকে। ফলে দলীয় স্বার্থেই দলের চেষ্টায় ও প্রচারণায় মহান জাতীয়তাবাদী নেতারূপে কেবল শ্রদ্ধেয় নয়, শক্তির ও সংহতির উৎস ও প্রণোদক হয়ে রয়েছেন, দলীয় নেতারূপে জিয়াপত্নীর প্রতিষ্ঠাও এ প্রচেষ্টা-প্রচারণারই ফল।

উচ্চাভিলাষী সেনানী ক্ষমতা হাতে নিয়েই রাষ্ট্রে বিরাজমান কিংবা সদ্য উদ্ভূত বৈনাশিক পরিণামমুখী প্রাশাসনিক, নৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার এবং দুঃশাসনজাত পরিস্থিতির ত্রাসকর বর্ণনা দিয়ে ও নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী করে শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে যথা শিগগির ফিরিয়ে দেবার অঙ্গীকার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। নিতান্ত সাময়িকভাবে যেন জবর দখল সামরিক শাসন স্বল্পকালের জন্য চালু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। একবার ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরে তাঁর শাসন সাময়িকও থাকে না। এমনকি বাহ্যত সামরিকও থাকে না। এমনিতেই Presidential Form of Government মাত্রই স্বরূপে একনায়কতন্ত্রই। তার উপর সে-প্রেসিডেন্ট যদি সেনানী হন, তা হলে ক্ষমতারিক্ত তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে তিনি হয়ে যান স্বৈর ও স্বেচ্ছাচারী ডিক্টেটর। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার এবং আমাদের রাষ্ট্রেরও জান্তা প্রথমেই দুর্নীতিবাজ চাকুরেদের পদচ্যুত করেন। কেবল নতুন করে তাঁদের সহযোগী দুর্নীতিবাজ তৈরি করার জন্যেই। পদচ্যুতদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি কাড়েন না কিংবা জেল-জরিমানারও ব্যবস্থা করেন না।

দেশপ্রেমী কিংবা মানবকল্যাণকামী না হলে তথা মাটি-মানুষকে ভালো না বাসলে কেউ একনিষ্ঠ জনহিতৈষী হয় না, হতে পারে না। আমরা আজো দেশের মাটি ও মানুষপ্রেমী শাসক-প্রশাসক কেজো সংখ্যায় পাইনি। তাই স্বার্থ ও মতলববাজ মুৎসুদ্দী শাসনের ছাপ ও চাপমুক্ত হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলবে, গণমুক্তি ঘটবে না। কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে আমরা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর [১৮৮৯-১৯৭৬] মধ্যে একজন দেশহিতৈষী জনকল্যাণকামী সৎ ও ত্যাগী পুরুষ পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন একজন অনন্য সাহসী পুরুষ ও নেতা। তাঁর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছিল, তিনি অনায়াসে বুঝতে পারতেন, স্থানের-কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সাময়িক সমস্যা-সঙ্কট ও অভাব-যন্ত্রণার দাবি। তিনি জনসাধারণের সেই চাহিদার কথা উচ্চারণ ও অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। তিনি ছিলেন কথার যাদুকর, মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু, তিনি ছিলেন গণচাহিদা অনুগ একজন বক্তারূপ কথাশিল্পী। তাই তাঁর শ্রোতা ছিলেন লক্ষ জন। তিনি একমতের, এককথার কিংবা একপথের লোক ছিলেন না, ঘন ঘন মত-পথ ও লক্ষ্য বদলাতেন। তাই তাঁর শুরু করা আন্দোলন কখনো সিদ্ধিতে সার্থক হয়নি। ভোটের ক্ষেত্রেও তার দল ভোট যোগাড়ে ব্যর্থ হয়েছে।

শেষ মুহূর্তে ভারতবর্ষ যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাহারের ফলে কেবল হিন্দু প্রধান ও মুসলিম প্রধান অঞ্চল হিসেবেই বিভক্ত হল এবং অভিবাসী বিনিময়ের কোন যুক্তি বা দাবিও উত্থাপন করা গেল না, তখন বুঝতে হবে কেবল দেশ ভাগ হল— রাষ্ট্র দুটো জাত-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে বহু বিচিত্র গোষ্ঠী অধ্যুষিত রয়ে গেল। ভারত তাই সেক্যুলার হয়ে গেল সাংবিধানিকভাবেই। পাকিস্তানেরও তাই হওয়া কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, আবশ্যিক ছিল। এ তাৎপর্যেই গান্ধী বলেছিলেন 'I belong to both India and Pakistan' এবং জিন্নাহ্‌ও ঘোষণা করেছিলেন 'Leave Delhi as an Indian citizen to save the people of Pakistan on their invitation as their Governor General' এবং কালক্রমে যে সেক্যুলার রাষ্ট্র পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কেবল নাগরিক রূপেই সহাবস্থান করবে— জিন্নাহ্‌ তাঁর ভাষণেই তা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানীরা কথা রাখেনি। সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে রাখার জন্যে তারা গোড়া থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র করার চেষ্টায় ছিল। ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কার্যত সংখ্যালঘু জনহত্যার পরোক্ষ কারণ হয়ে থাকে। আজ বাঙলাদেশেও বাঙালীসত্তা বিলোপ লক্ষ্যে ইসলামকে করেছে রাষ্ট্রধর্ম, এখানকার মুমিনরা আগে মুসলিম পরে বাঙলাদেশী এবং কৃচিৎ কেউ বাঙালী। ফলে দুই রাষ্ট্রেই রয়ে গেল শিক্ষার-সুরুচির-যুক্তির ও বিবেক-বুদ্ধির দ্রুত প্রসার সত্ত্বেও সেই সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব। ফলে ব্যর্থ হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধানতত্ত্ব। যদিও পাকিস্তানে-বাঙলাদেশে এবং ভারতে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অধিজনদের ধন-মান-খ্যাতি-ক্ষমতা প্রাপ্তি সহজ করেছে। পাকিস্তানে হিন্দু নগণ্য সংখ্যক তথা বিরলদর্শন হওয়ায় এবং বাঙলাদেশে অর্থে-বিত্তে হিন্দু এখন মুসলিমদের প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী নয় বলে, তাছাড়া 'নিকটে কাকের রাজা' বড়ই প্রবল বলে এখানে হিন্দুবিদ্বেষ রক্তপাত ঘটায় না। তবে উনজন মাত্রই মানসিকভাবে অস্বস্তিতে ভোগে। কিন্তু ভারতে এ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ঘন ঘন বিধর্মী নিধন ঘটায়।

যাঁকে কেন্দ্র করে, যাঁর বদৌলতে, যাঁর নেতৃত্ব ও নায়কত্ব এবং যাঁর আকর্ষণে ও অনুরাগে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সন অবধি রক্তক্ষরা প্রাণহারা সঙ্কল্পের, সংগ্রামের, বিপ্লবের বেদনা-মধুর সূচনা ও সমাপ্তি ঘটল, আবেগে হুজুগে দুর্বার গণ-আন্দোলন, শহীদ আকীর্ণ মুক্তিযুদ্ধ, বিজয়ীদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হল, সেই জাতি স্রষ্টা নির্মাতা শেখ মুজিবুর রহমানই [১৯২০-৭৫] যে সব কিছুর মূলে তা স্বরূপে উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে ভাবী কালের জাতীয় স্বার্থেই।

পাকিস্তানে অর্জনকারী মুসলিম লীগ দ্রোহী বাম ও বামঘেঁষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো [যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল] ব্যতীত উল্লেখ্য দল আছে আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুরাগী ও অনুগত। ভাসানী NAP নেতা হলেন, শেখ মুজিব রয়ে গেলেন লীগে। ১৯৬৬ সনে 'ছয় দফা' ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ পা বাড়ান জনপ্রিয়তার দিকে। কিন্তু শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হলে আওয়ামী লীগ ছাড়ল সবাই, কেবল শিবরাত্রির শলতের মতো রয়ে গেলেন আমিনা বেগম। শেষে যিনি ছাড়লেন তিনি আবদুস সালাম খান।

আগরতলার মামলার দরুন, শেখ মুজিব হলেন বাঙালীর সত্তার প্রমূর্ত প্রতীক। ছাড়া পেয়ে তিনি হলেন জাতীয় বীর, জাতির অবিসম্বাদিত নায়ক, জনপ্রিয় সর্বোত্তম নেতা। অমিত সাহসী জেলখাটা আদর্শ এ পুরুষ তখন থেকেই জাতির বিশ্বাস-ভরসার জন আশা-আকাঙ্ক্ষার অবলম্বন, গোটা জাতির অনুরাগের ও আনুগত্যের পাত্র। দেশবাসীর প্রেরণার ও প্রণোদনার উৎস। তখন তাঁর সার্বিক জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। আওয়ামী লীগের ছয় দফাও তখনকার এক দফায় স্থির, অটল ও অমোঘ। ১৯৭২ সনের গোড়ায় মুক্ত নায়ক বিজয় গৌরবে যখন দেশে ফিরলেন তখন তিনি ইন্দিরা গান্ধী উচ্চারিত ও জনগণ বন্দিত 'জাতির জনক ও পিতা'। এ সময়ে রাজাকার ব্যতীত অপ্রকাশ্যে ক্বচিৎ কারো হয়তো মুজিবে আনুগত্যের অভাব ছিল। গাঁয়ে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে এত জনপ্রিয়তা এ উপমহাদেশে আজ অবধি কেউ কখনো পায়নি। জনগণের উচ্চারিত কিংবা অনুচ্চারিত মনের কথা ছিল 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব'। এহেন নেতা স্বনির্ভর না হয়ে হলেন চাটুকারচালিত। গোড়া থেকেই অস্থির চিত্ত, একবার রাষ্ট্রপতি একবার প্রধানমন্ত্রী, একবার গণনির্বাচনে আস্থাবান, একবার একনায়কত্বে স্বস্থ, একবার 'সংবিধান-সংসদ নিষ্ঠা, আবার 'বাকশাল' নায়ক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি, আইন-কানুন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অস্থিরতা ও ক্ষণপরিবর্তন প্রবণতা ছিল নিত্যকার ব্যাপার। এত বড় নেতার প্রয়োজন ছিল না দল, চেলা কিংবা সমর্থক নির্ভরতার। এভাবে তিনি পড়লেন বারো ভূতের কবলে, শিকার হলেন দশচক্রের, পিতার ভূমিকা তিনি পালন করতে জানলেন না বা পারলেন না। নগরে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দরে গাঁয়ে-গঞ্জে সর্বত্র দেখা দিল জোর-জুলুমের রাজত্ব। শঙ্কায়-ত্রাসে মানুষ অস্থির-অস্বস্থ, সরকারি প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে গুণ্ডা-মস্তান-জালিম হুকুম-হুমকি-হামলা চালাচ্ছিল দুর্বল নিরীহ অসহায় ব্যক্তির ও পরিবারের জান-মাল গর্দানের ও ইজ্জতের উপর। প্রশাসনও দুর্জনেরে রক্ষা করত, দুর্বলেরে হানি। পঁচিশোর্ধ্বে যে কোন বাঙালীই এর সাক্ষ্য। তাছাড়া সম্প্রতি আহমদ মুসা রচিত 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ' বইতে এ বীভৎস, বর্বর কাড়া-মারার সচিত্র সনাম সস্থান পাথুরে প্রমাণ দেয়া রয়েছে। ১৯৭৪ সনে কয়েক লক্ষের প্রাণঘাতী একটা দুর্ভিক্ষও হয়ে গেল। স্বাধীন দেশে খাদ্যাভাবে আদম সন্তান মরে রইল রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাটে, পথে-প্রান্তরে। বিবেকহীন সরকার ও সরকারি দল ছিল নিষ্ক্রিয় নীরব দর্শকের ভূমিকায়। অবশেষে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের ফলে আকস্মিকভাবে সপরিবার ও সপরিজন নিহত হলেন তিনি বাকশালী শাসনে পূর্ণতা দানের মুহূর্তে [১৪ই আগষ্ট রাতে ১৯৭৫]। এমন জনপ্রিয় নেতা ও নায়কের এ পরিণাম সত্যি ট্র্যাজিক। কিন্তু দেশবাসী শোক করেনি, স্বস্তিবোধ করেছিল। তাঁর দুই অনুগত জন আবু সাঈদ চৌধুরী ও মালেক উকিলের মন্তব্যই তার সাক্ষ্য।

AMARBOI.COM

তৃতীয় পর্ব
বাঙলাদেশ পর্ব

রাষ্ট্রভাষা : বাঙালী-সত্তা চেতনার পটভূমি

১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি পর্ব সম্বন্ধে আমরা পরিশিষ্টে (৩) আন্দোলনের অন্যতম নেতা, সক্রিয় কর্মী, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী, প্রত্যক্ষদর্শী আবদুল মতিনের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছি। আরো কিছু পরিপূরক কথ্য এখানে পরিবেশন করলাম। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মীপরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করার ঘোষণা দেয় সভা-মিছিল ও হরতালের মাধ্যমে। ১৯৫২ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে একমাসের জন্যে ঢাকা জেলার সর্বত্র সভা-মিছিল, ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মীপরিষদের জরুরী বৈঠকে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল বটে, কিন্তু সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ও বিপুল সংখ্যক সাধারণ সচেতন ছাত্রের দাবির প্রণোদনাক্রমে মিছিল যোগে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের গণসিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং ছাত্রনেতা আবদুস সামাদের প্রস্তাব ক্রমে কিছুক্ষণ অন্তর একসঙ্গে দশজন করে 'দশজনী মিছিল' করার সিদ্ধান্ত হল। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি মিছিল গ্রেফতার হচ্ছিল। কিন্তু প্রায় সারা শহরের ক্ষুব্ধ কৌতূহলী ছাত্র-যুবক তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে গেছে। ফলে পুলিশ ছুঁড়ল কাঁদানে গ্যাস। ক্ষুব্ধ সংগ্রামী ছাত্ররা ঘন ঘন পুলিশি হানা-হামলার প্রতিরোধে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করল। জগন্নাথ হলের পূর্বতন মিলনায়তনই ছিল সংসদ ভবন। আর সংসদ অধিবেশন বসার কথা ছিল সম্ভবত সাড়ে তিনটায়। চারটার দিকে মেডিক্যাল কলেজের সড়ক-সংলগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানে নিহত হয় জব্বার [হোটেল বয়] ও রফিক উদ্দীন [রিকশাচালক]। পরে আর একজন আহত হন মেডিক্যাল হস্টেল শেডের জানালায় দাঁড়ানো অবস্থায়। ইনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম. এ শেষ পর্বের ছাত্র, মৃত্যু হয় তাঁর আটটার দিকে হাসপাতালেই। নামে আবুল বরকত। গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন প্রায় পনেরো-ষোলজনের মতো এবং তাঁদের সবাই যে ছাত্র ছিলেন, তা নয়।

পরিষদ সভায়ও বিরোধীদল মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করে ব্যর্থ হন, তবে ঢাকা শহর পরদিন বিক্ষুব্ধ জনতায় জনতায় হল জনসমুদ্র। ১৪৪ ধারা হল বৃথা ও ব্যর্থ। ২২শে ফেব্রুয়ারীর পত্রিকার সংবাদে দেখা গেল তিনজন নিহত, তিনশত জন আহত ও ১৮০ জন গ্রেফতার। সরকার সমর্থক 'মর্নিং নিউজ' অফিসে আগুন দিয়ে বিক্ষুব্ধ মিছিল যখন 'সংবাদ' অফিসের পথে তখন মিলিটারী গুলি চালায়, এখানেও কিছু লোক হতাহত হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে শফিউর রহমান নিহত হন। মিলিটারী-নিয়ন্ত্রিত ঢাকা শহরে গণমিছিল, গণবিক্ষোভ ও জনসভা বন্ধ করা যায়নি। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেদিন পরিষদ সভায় লীগ-সরকার বাঙলাকে প্রদেশে এবং গোটা পাকিস্তানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঢাকা শহর তখনো নবাবপুর-নাজিমুদ্দীন রোডের প্রান্তে ছিল সীমিত, পুরোনো রেল সড়ক তখনো অতিক্রম করেনি। বেকার শিক্ষিতও ছিল দুর্লভ। গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে ওঠা শহরে-আসা ছাত্ররাও তখনো নবরাষ্ট্র প্রাপ্তি সুখে ধন্য। কাজেই এই পটভূমিতে বিচার করলে ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর দাবি-আন্দোলন নতুন রাষ্ট্রে কালান্তর সূচনা করেছিল।

বদরউদ্দীন উমর তাঁর 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে তখনকার পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগের সম্পর্কাদির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক মন, মত ও মন্তব্য এবং বঞ্চনা ও দাবি, ক্ষোভ ও ষড়যন্ত্র প্রভৃতির তথ্য, তত্ত্ব, টীকা, ভাষ্য যোগে পরিণাম বিশ্লেষণ করেছেন।

১৯৪৭ সনের আগস্টেই আমাদের মতো অনেক বাঙালীর মনেই প্রশ্ন জেগেছিল—রক্তে, ভাষায়, ভৌগোলিক অবস্থানে ভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিলে করাচিতে রাজধানী করলে বাঙলা ও বাঙালী স্বাধীন হয় কি করে? এতো লন্ডন থেকে দূরত্ব কমিয়ে করাচিতে শাসনকেন্দ্র স্থাপন মাত্র! লন্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' তখনই বলেছিল, এ অস্বাভাবিক রাষ্ট্র টিকবে না। সবাই জানে কোন বিষয়েই সব মানুষ মাথা ঘামায় না। দেশে নিরক্ষর সাক্ষর অধিকাংশ মানুষই থাকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক-রাষ্ট্রিক বিষয়ে সমস্যায় সঙ্কটে উদাসীন। স্বল্প সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিক এবং সরকারই কেবল গুরত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে তার প্রতিকার-প্রতিরোধের কথা বলে। এঁরা এবং সরকারই মাত্র সঙ্কট উত্তরণের চেষ্টায় থাকেন। বুঝে না বুঝে কিছু ছাত্র নেতা এঁদের আহব্বানে সাড়া দিয়ে মিছিলে আন্দোলনে কর্মে সংগ্রামে যোগ দেয় —ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই দেশের ও জাতির আবর্তন-বিবর্তন ঘটে, মানুষের সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনে উৎকর্ষ-অপকর্ষ আবর্তিত হয়। তবু মানুষ মানসিক ও সামাজিকভাবে এগোয়। আমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বাধীনতা-পূর্ব দুই দশক ধরে শহরে শহরে রাজনীতি-প্রভাবিত সচেতন হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক সম্পর্কে যে তিক্ততা, বিরোধ-বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়েছিল, তাতে অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান দেশ-কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরপেক্ষ মুসলিম ভ্রাতৃত্বে ও অভিন্ন স্বার্থে আস্থাবান হয়ে উঠেছিল, শক্তির ও সাহসের নয়, দুটো পাকিস্তানের অবশ্যিকতা নির্দেশ করে। কিন্তু হুজুগ মাত্রই ছোঁয়াচে। ফলে তখন এ উপলব্ধি সম্ভব হয়নি।

লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দুই প্রান্তে দুটো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের দাবি ছিল। ১৯৪৭ সনের ৩রা জুনের প্রস্তাবে এক ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনে রাজি হন বাঙালী প্রতিনিধিরা। অথচ, ভূমির আকারে, আবহাওয়ায়, জনসংখ্যায়, খাদ্যবস্তুতে, ভাষায়, জীবনাচারে, পেশায়, রক্তে, শরীরে, শক্তিতে ও অবয়বে মিল ছিল না কোথাও। প্রথম ধাক্কা এল এভাবে, ক্ষোভ জাগল কিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকদের মনে; কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিবাদ করার, প্রতিকার চাওয়ার মতো সাহসী লোক ছিল না দেশে। তারপর পাকিস্তানে দেখল ব্যবসায়-বাণিজ্যে, অফিসে-সেনাবাহিনীতে, নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে কেবলই অবাঙালী। কিন্তু তখনো রাষ্ট্রপ্রাপ্তির আবেগ অবসিত হয়নি, এ ক্ষোভ-হতাশা-বঞ্চনার অভিব্যক্তি দেবার জন্যে কেউ মুখ খুলেনি, কেবল অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাঙলাভাষার দাবি উচ্চারণ করতেই হল, কেননা এর সঙ্গে অর্থ-বিত্ত-বৃদ্ধির ও চিন্তা-চেতনার শেকড় ছিল জড়িয়ে। এ সময়ে বর্ণহিন্দুর দেশত্যাগের ফলে শূন্য স্কুল-কলেজ দ্রুত ভরে উঠছিল আর্থিক ও সামাজিক জীবনোন্নয়নে আগ্রহী গৃহস্থদের সন্তানকে শিক্ষাদানের আত্যন্তিক আবশ্যিকতা উপলব্ধির ফলে। ১৯৫৬-৫৭ সনের দিকেই নতুন এক উদ্ভিন্ন যৌবন তরুণ-কিশোর-ছাত্র সামজ গড়ে উঠল কলেজে কলেজে এবং বিশেষ করে শহরে শহরে। শিক্ষাঋদ্ধ চেতনা নিয়েই এরাই- এ উঠতি বুর্জোয়াপ্রসূনরাই নানা ক্ষেত্রে বঞ্চনার বেদনা ও ক্ষোভ অনুভব করতে থাকে। এদের হয়েই ১৯৫৭ সনের প্রাদেশিক সংসদে আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমান মন্ত্রিত্ব কালে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছিলেন দু'চারজন সংসদ সদস্য। ১৯৫৪ সনের নির্বাচনকালেও সংহতি বিনষ্টির ভয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ-লুণ্ঠনের কথা না তুললেও জনগণের নামে জন-কল্যাণের লক্ষ্যে কিছু দাবি-দাওয়ার কথা উঠেছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারীর স্মারক ২১ দফা যার নাম।

প্রথম নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ও গণদাবি হিসেবে স্মরণীয় একুশ দফা পরিশিষ্টে (৪) দেয়া হল।

অন্যদিকে ১৯৪৭ সন থেকেই নানা কারণে পূর্ববঙ্গের মানুষের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান ভালো ছিল না, চাউলের সরবরাহ চাহিদা আনুপাতিক ছিল না। এমনকি ১৯৫১ সনে লবণের ও কেরোসিনের দামও আকস্মিকভাবে বেড়ে যায়। কম্যুনিস্টরাই ভারতের সেই শ্লোগান ক্ষীণভাবে এখানেও উচ্চারণ করে 'ইয়ে আযাদী ঝুটা হায়'। পঞ্চাশের তেভাগা আন্দোলন দমনে সরকারি বর্বরতা, খাপড়া ওয়ার্ডে সাতজন বন্দী হত্যা, নাচোল বিদ্রোহ, টঙ্কপ্রথা ও নানকার প্রথা দ্রোহিতা প্রভৃতি আঞ্চলিক বিদ্রোহ-আন্দোলন ইত্যাদিও ছিল অসন্তোষের পরোক্ষ ইন্ধন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সনের মধ্যে শহরে বাঙালীর চিন্তা-চেতনা-ক্ষোভ-বেদনা অতি দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। বদরউদ্দীন উমর তাঁর 'বাঙলা ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন, "১৯৪৮ সনের ভাষাআন্দোলন যে সীমিত এলাকায় ঘটেছিল এবং আন্দোলন ছাত্র-শিক্ষকসহ বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে যেভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।...১৯৫২ সালের ভাষাআন্দোলন মুষ্টিমেয় ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিল না... বস্তুত পক্ষে তা ছিল পূর্ব বাঙলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার পাকিস্তানী শাসক-শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণআন্দোলন।" অতএব, মানতেই হবে যে নতুন রাষ্ট্রভাষার দাবি থেকেই বাঙালীর মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। এ আন্দোলনেই বাঙালির সত্তার, স্বার্থের ও স্বাতন্ত্র্যের চেতনা উদ্ভূত হতে থাকে, যা পনেরো বছরের মধ্যেই নির্মোহ বুদ্ধিজীবীচিত্তে ও মনীষী-মননে পূর্ণতা লাভ করে।

ভারতভীরু হিন্দুবিদ্বেষীরা ছাড়া তথা মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, খেলাফতে রব্বানী, জামায়াতে ইসলামী কিংবা ইসলামপন্থী রক্ষণশীলেরা ব্যতীত শিক্ষিত মাত্রই সর্বক্ষেত্রে শোষণ-বাঞ্চনা-কাপট্য দেখে মনে মনে মুক্তিকামী হতে থাকে এবং প্রকাশ্যে অর্থ-সম্পদ-ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরী-কারখানা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ও বৈষম্য বিমোচন দাবি করতে থাকে। কিছু সংখ্যক মুক্তবুদ্ধির ও দূরদৃষ্টির চিন্তাশীল ব্যক্তি রাষ্ট্রিক বিচ্ছেদের তথা পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতার স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন। অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল কোন কোন কম্যুনিস্ট দলও। তারা বিচ্ছেদ চায়নি—সমাজ বিবর্তন চেয়েছিল মাত্র। চাকরীক্ষেত্রে বৈষম্যের একটি নমুনা : ১৯৫৫ সনে দেখা গেল, স্থল-জল-আকাশ বাহিনীতে বাঙালী অফিসারের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪, ৭ এবং ৬০। পাকিস্তানী ৮৯৪, ৫৯৩ এবং ৬৪০। বাঙালী C.S.P ছিল ৪১.৭%, ওরা ছিল ৫৮.৩%। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৯৫৮ সনে বাঙালী অফিসার ছিলেন মাত্র ৫১ জন, ওরা ছিল ৬৯০ জন।

AMARBOI.COM

ভাষার দাবির আনুষঙ্গিক যুক্তি হিসেবে আমাদের রক্তের, জীবনাচারের, ভৌগোলিক অবস্থানের, বিশ্বাস-সংস্কার-সংস্কৃতির, ইতিহাসের, ঐতিহ্যের, বিচিত্র গৌত্রিক ও স্থানিক চেতনার পার্থক্যও পরিব্যক্ত হতে থাকে ঘরোয়া জীবনে কথাবার্তায়, সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে লেখায় এবং রাজনীতিক আলোচনায় ও বক্তৃতায়। ফলে জাতীয়তার ইসলামী বন্ধনসূত্র গেল ছিঁড়ে, রাষ্ট্রিক ঐক্যের ভিতও হল নড়বড়ে। বাঙালীসত্তার সন্ধানে মেতে উঠল কিশোর-যুবক ও ছাত্র-রাজনীতিকরা।

এ সময়কার কিছু শ্লোগান হচ্ছে :

ক. কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না, শোষকের গদীতে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। মুক্তির একই পথ—বিপ্লব বিপ্লব। মুক্তি যদি পেতে চাও, হাতিয়ার তুলে নাও। জাগো জাগো সর্বহারা জাগো। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা কায়েম করো, মুক্তির মতবাদ মার্কসবাদ, লেনিনবাদ। তোমার নেতা, আমার নেতা—ভাসানী ভাসানী। ভোটের বাক্সে লাথি মারো, পূর্ব বাঙলা স্বাধীন করো।

খ. ছয় দফা মানতে হবে। আগরতলা মিথ্যা মামলা মানি না, মানি না। গোল টেবিল না রাজপথ—রাজপথ-রাজপথ। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়, ছয় দফা কায়েম কর—নয়তো বাঙলা স্বাধীন কর। জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।

গ. তোমার নেতা আমার নেতা বিশ্বনবী মোস্তফা। পাকিস্তানের উৎস কি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মস্কো না মক্কা– মক্কা। কম্যুনিজম না ইসলাম, ইসলাম —ইসলাম।

জিন্নাহর সেই 'ঈমান, শৃঙ্খলা ও ঐক্য' নামের আপ্তবাক্য তো ছিলই।

আবার আগ থেকেই PEN [Poets, Essayists, Novelists] Congress for Cultural Freedom, Pakistan Writers Guild, Bureau of National Reconstruction, Pakistan Council প্রভৃতির এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থ সাহায্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচালিত নানা Project আর সেমিনার পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের আপাত গণজ্ঞানবুদ্ধির ও উন্নয়নকামিতার মূলে ছিল এবং রয়েছে বুদ্ধিজীবীদের প্রলুব্ধ করে, বিভ্রান্ত করে তাদের স্বদেশের বাস্তব কল্যাণকামিতা ও কল্যাণক্রিয়া থেকে বিরত রাখা ও বিচ্যুত করা। উল্লেখ্য যে কম্যুনিস্ট বিদ্বান ও মার্কিন বৃত্তির লোভে ক্বচিৎ এড়াতে পারছে।

অতএব স্বার্থরক্ষার প্রেরণায় এবং বঞ্চনার লোভে বাঙালীসত্তার, স্বার্থের ও স্বাতন্ত্র্যের চেতনা প্রসার লাভ করতে থাকে এবং বাঙলাভাষা সরকারীভাবে অন্যতর রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হওয়ার পরেও শোষণমুক্তির স্পৃহা, সমানাধিকারের দাবি, স্বাধীনতার আকাঙ্খা ক্রমশ কম্যুনিস্টদের কর্মে, উঠতি তরুণ বুর্জোয়াদের উচ্চারণে এবং স্বতন্ত্র্যচেতনা বাঙালী তরুণদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচারণে প্রকট হতে থাকে। কিন্তু কম্যুনিস্ট কিংবা বুর্জোয়া রাজনীতিক দলগুলোর মধ্যে কোনটার সঙ্গে কোনটার মত-পথগত ঐক্য কিংবা সংঘবদ্ধ হওয়ার মতো সাদৃশ্যও ছিল না। তাই ১৯৬৯ সনের আগে কোন গণসমর্থিত আবেগতাড়িত লক্ষ্যনির্দিষ্ট ব্যাপক আন্দোলন হয়নি, হতে পারেনি।

কিন্তু রাজনীতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক এমনকি শৈল্পিক চিন্তায় চেতনায়, কথায় কাজে এবং আচরণে তা লঘুগুরুভাবে অভিব্যক্তি পেয়েছে।

AMARBOI.COM

সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এ আন্দোলনের প্রভাব

ইদানীংপূর্বকালে হিন্দু হিন্দুর জন্যে লিখেছেন, মুসলমানও লিখেছেন তার স্বধর্মীর জন্যে। উনিশ শতকের আধুনিক সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম দুর্লক্ষ্য। হিন্দুরা ভারতসীমায় নিবদ্ধ বলে ভারতীয় নানা বিষয় তাঁদের অবলম্বন হয়েছে— আর মুসলিমরা বৈশ্বিক স্বধর্মী চেতনাবশে তাদের রচনা বিষয় করেছে পশ্চিম-এশিয়া স্পেন মিশর আর মধ্য এশিয়া। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ববশে তাঁদের মানস বিচরণ ক্ষেত্র ছিল গোবী-সাহারায় প্রসারিত। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে স্বদেশের মুসলিমস্বার্থ সচেতন হয়ে ওঠে তারা। শিক্ষিত মুসলিম তখন থেকেই 'আল ইসলাম' 'ইসলাম প্রচারক', 'কোহিনূর', 'নবনূর', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি নানা স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকায় স্বধর্মীয় স্বাজাত্য ও স্বার্থবোধ প্রণোদিত হয়ে গদ্যে পদ্যে মনের কথার অভিব্যক্তি দিতে থাকে। ১৯৩৫ সনের দিকে মুসলিম লীগ রাজনীতিকভাবে প্রাধান্য পেতে থাকলে মুসলিমদের সত্তার ও স্বার্থের স্বাতন্ত্র্যচেতনা তীব্র ও উগ্র হতে থাকে। এ সময়কার মোহাম্মদী-সওগাতে এদের দ্বিজাতি তত্ত্ব ও স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রয়োজন চেতনা প্রকটিত হতে থাকে। প্রবন্ধাদির ক্ষেত্রে মৌলানা আকরম খান, আবুল মনসুর আহমদ, ইব্রাহিম খান, আকবর উদ্দিন প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। আর কবিতায় গোলাম মোস্তাফা, বেনজীর আহমদ, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মোফাখখরুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ পাকিস্তানকামী হয়ে ইসলামী জোশাধিক্যে বিশ্বের মুসলিম কৃতি-কীর্তির গৌরবগর্বী ও আস্ফালনমুখর হয়ে ওঠেনি। এ প্রজন্মেও রয়েছে এদের অনুসারী। গোলাম মোস্তাফা থেকে আজকের অল্পবয়সী ইসলামগর্বী কবি-লেখকরা দেশ-কাল প্রতিবেশ চেতনারিক্ত সর্বকালীন ইসলাম ঐক্যে ও বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বে তুষ্ট ও তৃপ্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের মধ্যে যিনি সামর্থ্যে ও কবিত্বে প্রধান তাঁর চেতনায় তাঁর জন্মভূমি বাঙলা ছিল কিছুটা অনুপস্থিত। বাঙলায় মরা 'লাশ' ও বাঙলাবাসী 'ডাহুক' ব্যতীত বলতে গেলে তাঁর কাব্য জগতে 'বাঙলাদেশ' নেই— আছে হেরা, বিয়াবান, লু, খোর্মাতরু, নারাঙ্গীবন, সাহারা প্রভৃতি। ইসলামী ধারায় অনেক কবি ছিলেন ও আছেন বটে, তবে কবিত্ব গুণে উল্লেখ্য কবি আর কেউ নয়। গল্পের ক্ষেত্রে শাহেদ আলী উল্লেখ্য, চিন্তামূলক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ আকরম খান, আবুল মনসুর আহমদ, দেওয়ান মোঃ আজরফ প্রমুখ অবশ্যই উল্লেখ্য। এ ক্ষেত্রেও ইসলামী চিন্তাবিদ অনেক, কিন্তু তাঁদের শিল্প চিন্তা-চেতনা সাবেকী বলে আলোচনা নিরর্থক। সেই রাজনীতিক ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত কালে সেই হিন্দুভীতির ও হিন্দুবিদ্বেষের যুগে মুসলিম মাত্রেরই ইসলামপছন্দ ও তমদ্দুনপন্থী হওয়া ছিল স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম ছিল বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। তাই পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সমিতি সংগঠকরা এবং 'তমদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠাতারা এবং তাঁদের সমর্থকেরা ১৯৫২ সন অবধি নিশ্চয়ই ছিলেন লোক-নন্দিত ও জনপ্রিয়। তখন সব মুসলমানই আবেগতাড়িত, হুজুগে, নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রাপ্তিসুখে আপ্লুত ও আচ্ছন্ন। তাঁরা যৌক্তিক বুদ্ধিমত্তার কিংবা স্বস্থ-সুস্থ মনের পরিচয় দেননি। আজো এঁরা দেশ-কাল নিরপেক্ষ চিরন্তন বৈশ্বিক ইসলামী চেতনায় আশ্বস্ত। এঁরা চিন্তায়-চেতনায়-আচারে-আচরণে কেবল 'মুসলিম' থাকতে চান —নির্বিশেষে 'মানুষ' নামে পরিচিত হতে চান না। এ কালে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির আনুগত্য এবং জ্ঞান, যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চাই কাম্য বিশ্বমানবের ও বিশ্ববাণিজ্যের সঙ্গে সমতালে চলবার জন্যে। আর আমাদের ইসলামবাদীরা চান আমাদের সাড়ে তেরোশ বছর আগেকার জীবনে ও জগতে কৃত্রিমভাবে নিবদ্ধ রাখতে তাঁদের কল্পিত শ্রেয়ো-প্রণোদনায়। দুনিয়ার সর্বত্র শিক্ষিত শহুরে মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়— ১. সরকার-ঘেঁষা, ২. সরকার-ভীরু, ৩. সরকার-শত্রু। উঠতি ও ঋদ্ধিকামী তোয়াজ-তোষামোদ প্রবণ স্তুতি-প্রশস্তিপটু চাটুকার মানুষ মতলব হাসিল লক্ষ্যে সব সময়ে সরকার-ঘেঁষা হয়, এক কথায় এদের হচ্ছে কম্প্রেটর চরিত্র। স্বরূপে এরাও নিজের ছাড়া অন্য কারো অনুগত নয়। সরকার-ভীরু মানুষের সংখ্যা শতে পঁচানব্বই জন। এরা সাধারণ্যে নিরীহ ও ভুল অভিধায় পরিচিত। কারণ, এরা মোটেই ইচ্ছা, অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষাহীন নয়। এরা প্রাপ্তিকামী কিন্তু ক্ষতি-ভীরু। ভয়ের ক্ষেত্রে এরা অনুপস্থিত, কিন্তু প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এদেরই ভিড়। এরা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটে থাকে না, তাই এদের নিন্দা নেই, শত্রুও নেই। এরা গা-পা বাঁচিয়ে বকের মতো কেবল শিকার করে।

সরকার-শত্রু মানুষ সমাজে অবশ্যই কম। জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েই সরকারবিরোধীর বা দ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। চিত্তের গভীর জনসেবাজাত আত্মতৃপ্তির ও আত্মতুষ্টির একটা অস্পষ্ট প্রণোদনা থাকলেও মুখ্যত যুক্তি-বুদ্ধি-সাহস-সঙ্কল্পবদ্ধ নীতিনিষ্ঠ আদর্শবান ব্যক্তিরাই প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী বা দ্রোহী হন। শেষাবধি দুর্বলচিত্ত বা মতলববাজ কিছু ব্যক্তি মত পথ ত্যাগ করে গৃহী জীবন বরণ করেন। প্রলুব্ধ কেউ কেউ সরকারের সঙ্গে জুটে যান, বিত্ত-বেসাত-খ্যাতি-ক্ষমতা উপভোগে ধন্য হন।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষকতা-সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেও এ তিন শ্রেণীর মানুষ মেলে। সরকার-ঘেঁষা চাটুকার কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীর ঘৃণ্য ভূমিকা ব্যাখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা কেবল সময়ের অপচয় ও মনের স্বাস্থ্য বিনষ্টি মাত্র। আর সরকার-ভীরুদের তো সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক কোন ভূমিকাই নেই। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁদের সৃষ্টি ও ভূমিকা কোন প্রভাব রাখে না। তাঁদের মধ্যে কোন নতুন চিন্তা-চেতনা উপ্ত নয়, তাঁরা সবক্ষেত্রেই গতানুগতিক।

১৯৪৭ সন থেকেই রাষ্ট্রভাষা-জিজ্ঞাসা জাগে। উর্দুভাষীদের ও সরকারের তাঁবেদার-চাটুকারেরা ইসলামি ঐক্য, মুসলিম সংহতি আর পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ নামে উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করতে ছিল আগ্রহী। বাঙালির চাকরীগত আর্থিক স্বার্থে এবং সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উৎকর্ষ নির্বিঘ্ন রাখার গরজে বাঙালিরা সরকারের এ মতলব রুখে দাঁড়ায়। সে সময় ভিন্ন রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বাঙলা ভাষার দাবি বানচাল করার প্রয়াস চলে, তখনই তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে আরবী-ফারসী শব্দের অধিক ব্যবহার ও সংস্কৃতি শব্দের অর্জন, ঈ, উ, ঋ, ঐ, ঞ, ষ, স, ব, ঢ, ক্ষ, ৎ প্রভৃতি বর্ণ বর্জন, আরবী বা রোমান হরফে বাঙলা লিখন প্রভৃতির সুবিধে ও প্রয়োজনীয়তা সরকারী ব্যয়েই প্রচার ও প্রচারণা করা হয়। অর্থাৎ খাঁটি মুসলিম ও পাকিস্তানী হওয়ার জন্যে হিন্দু সৃষ্ট বাংলার বর্ণ, বানান, বাক, বক্তব্য, ভঙ্গি সব বদলানো দরকার। যাতে বাংলাদেশ, বাঙালী, ভাষা প্রভৃতি নামে ও অবয়বে পাকিস্তান, পাকিস্তানী, পাকজবান, পাক-আদব হয়ে যায়। ১৯৪৯ সনের মার্চ মাসে সরকার নিয়োজিত বাঙলা ভাষা সংস্কার কমিটির সভাপতি ছিলেন মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান [মৃত্যু ১৯৬৮ সন] আর সম্পাদক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তাফা [মৃত্যু ১৯৬৪]। কিন্তু ১৯৪৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর কার্জন হলে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী [১.১.৪৯ সন অবধি] সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বাতন্ত্র্যকামী তমদ্দুন পন্থীদের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড করে দেন এ বলে যে, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।'

পাকিস্তানের 'তৌহিদী' জনতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয় ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের পনেরো দিন পর পয়লা সেপ্টেম্বর। এঁরা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'বাঙলা'কে স্বীকৃতিদানের আন্দোলনে বিরত থাকলেও তাঁদের পরিকল্পিত নতুন বাংলা ভাষা ছিল আবুল কাসেম, মিজানুর রহমান, আবুল হাসানাত প্রমুখ ব্যবহৃত ভাঙা ও বিকৃত বাঙলা। ১৯৫১ সন মুখ্যত অসাম্প্রদায়িক মন ও রুচি নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা ও সঙ্গীতাদির বিচিত্রানুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সংসদ গড়ে তোলে ছাত্ররা। ১৯৫২ সনে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের [১৮৯৭-১৯৮১] সভাপতিত্বে এবং কবি-ছড়াকার-সাংবাদিক ফয়েজ আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত দীর্ঘস্থায়ী সেক্যুলার সমিতি 'পাকিস্তান' সাহিত্য সংসদ'। গোড়ার দিকে সাহিত্য সংসদের পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসত 'সওগাত' অফিসে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের ব্যয়ে এবং সেখানে সদ্য লিখিত রচনা পঠিত ও আলোচিত হত। এ পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের উদ্যোগেই হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত প্রথম 'একুশের সংকলন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সনে এবং ১৯৫৪ সনে কার্জন হলে চারদিনব্যাপী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য সম্মেলন। ১৯৫১ সনের ১৬ই মার্চ তারিখে চট্টগ্রামে পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করেন 'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'প্রান্তিক' নামের সংঘ। প্রগতিবাদী ও সেক্যুলার মতের লোক আয়োজিত এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ [১৯৭১-১৯৫৩] এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল [জ. ১৯১১] আর উদ্যোগী ছিলেন আবুল ফজল [১৯০২-৮৩] ও সাইদুল হাসান [নিহত ১৯৭১ সন]। এরপরে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় তিনদিনব্যাপী [২২-২৪ আগস্ট, ১৯৫২] পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এর প্রচ্ছন্ন উদ্যোক্তা ছিল কমুনিস্ট পার্টি, আর.এস.পি [Radical Socialist Party], যুবলীগ ও ফরওয়ার্ড ব্লক। যদিও উদ্যোক্তারা বলেছিলেন যে আত্মসমীক্ষার জন্যে এ সম্মেলনের আয়োজন, তবু এ ছিল প্রথম প্রকাশ্য দ্রোহমূলক সম্মেলন। সরকারকে শিক্ষিত প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মত-মন্তব্য স্পষ্টভাবে জানানোই ছিল লক্ষ্য। এতে মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অজিত নাথ নন্দী। এ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ প্রগতিশীলদের জন্যে ছিল দিক-নির্দেশক স্বরূপ। সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম অনাগত সমাজবাদী সমাজকে স্বাগত জানান। এ সম্মেলনে মুক্ত উদার দৃষ্টি ও সমাজবাদ প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সনের পূর্বোক্ত পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ আয়োজিত ও কার্জন হলে অনুষ্ঠিত [২৩-২৬ এপ্রিল] চারদিনের সম্মেলনে 'সকল রকম বিবৃতি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা এবং জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে উপজীব্য করার মনোভাব বা সংকল্প পরিব্যক্ত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ [১৮৮৫-১৯৬৯] আর মূল সভাপতি ছিলেন আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ [১৮৭৫-১৯৫৯]। এ সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের মনোজ বসু, নরেন দেব, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন এবং কয়েকজন উর্দু লেখক উপস্থিত ছিলেন।

AMARBOI.COM

আওয়ামী লীগ নেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসনী এক কূটরাজনীতিক সমস্যা-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের একটি কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন তাঁর নিবাসের কাছে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে। সে সূত্রে বিপুলভাবে আয়োজন করেন আন্তর্জাতিক এক সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন। নাম 'কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। কোলকাতা থেকে এলেন সব প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিমনা সাংবাদিক আর প্রতিনিধি পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও মিশর। বিশ্বের বহু প্রখ্যাত, প্রয়াত বড় কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিক, দেশপ্রেমী ও রাষ্ট্রপতির নামে পঞ্চাশটি তোরণ তৈরি হয় মির্জাপুর থেকে কাগমারী অবধি রাস্তায়। মৌলানা ভাসানীর আলঙ্কারিক ভাষায় 'কাগমারী সড়ক; বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার সড়ক'। সম্মেলন চলে তিনদিন ধরে [৮,৯,১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭]। অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে, প্রখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগমে এবং সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচারে কাগমারী সম্মেলন ছিল Landmark, যুগান্তকারী। এখান থেকেই পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসন [এমনকি স্বাধীনতার বা বিচ্ছিন্নতার] প্রাপ্তির দাবি প্রবলতর ও গভীরতর হতে থাকে। শোষণ-বঞ্চনার ক্ষোভ-ক্রোধও থাকে বাড়তে। এ সময়ে সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল'ই ছিল প্রগতিশীল চিন্তার-চেতনার বাহন।

এ সময়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা বসে ছিলেন না। তাঁরা ১৯৫২ সনে চারদিন ব্যাপী [১৭-২০ অক্টোবর] ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। উদ্যোক্তা ছিলেন ইব্রাহিম খান, আব্দুল গফুর প্রমুখ। ১৯৫৭ সনে পালন করেন সিপাহী বিপ্লব বার্ষিকী [তিন দিন ব্যাপী ২৯ মার্চ— ১লা এপ্রিল], ১৯৫৮ সনে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের আদলে এঁরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঠন করেন সাহিত্যিক সংঘ, নাম 'রওনক'। এঁরাও ১৯৫৮ সনে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত করেন 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' [চার দিন ব্যাপী ২-৫ মে]।

এসব উদ্যোগে-আয়োজনে, ভাষণে, বক্তৃতায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, ইব্রাহিম খান, গোলাম মোস্তাফা, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মৌলানা আকরম খান, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রমুখ। এদের সব কথার মূল কথা হচ্ছে—তাঁরা মুসলিম, তাঁদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, তমদ্দুন ও জীবনাদর্শ, ইসলাম ও পাকিস্তানই হচ্ছে তাঁদের জীবন ও জগৎচেতনার উৎস, তাঁদের জীবনের ধারক ও নিয়ামক।

তাঁরাই কেবল মুসলিম ও পাকিস্তানী, অন্যমত-পথের মুসলিমরা হল ইসলামের ও পাকিস্তানের শত্রু। তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, তাদের সেক্যুলার অভিপ্রায় রোধ করা, ভাবে-চিন্তায় বর্ণে-ভাষায়, কথায় ও কাজে ইসলাম ও তমদ্দুন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়াই এখন মুমিনের আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তমদ্দুন মজলিশের সৈনিক আর মাসিক মোহাম্মদী, মাহে নও প্রভৃতি সাময়িকী ছিল এঁদের মুখপত্র।

১৯৬০-উত্তর বাঙলায় ইসলামী পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীলে দুর্বল হয়ে পড়ে—শোষক-বঞ্চক পাকিস্তানী সরকার ও শাসকদের বিরুদ্ধে ঢাকার বাঙালির ক্রমাগত নানা লঘু-গুরু আন্দোলনের মুখে। তবু আয়ুব সরকার রোমান হরফে বাঙলা লেখানোর চেষ্টা করে, বুনিয়াদি বা গণতন্ত্রী দালাল তৈরি করে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা করে [Bureau of National Reconstruction—BNR], পাকিস্তান লেখক সংঘ [Pakistan Writers Guild] প্রতিষ্ঠা করে বিমান ও বিদেশ ভ্রমণের লোভ দেখিয়ে কবি-লেখক-সাংবাদিক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের অনুগত করার ও রাখার উদ্দেশ্যে]। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরোধিতা করে সরকার প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা রোধ করতে ও সবাইকে ইসলামনিষ্ঠ পাকিস্তানী বানাতে সর্বাত্মক নরম-গরম প্রয়াস চালিয়ে যান মোনেম-আয়ুব খানী আমলে। এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর নির্ভীক উদ্‌যাপন যুগপৎ রবন্দ্রীসঙ্গীত চর্চার জন্যে সাঙ্গীতিক সংঘ ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙালি সত্তার সদম্ভ প্রকাশের জন্যে পহেলা বৈশাখ নব-বর্ষ উৎসব পালন সম্ভব করেছে। মহাকবি স্মরণোৎসব [গালিব, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, নজরুল ইসলাম] করে তখনকার ঢাকায় দ্রোহী পাকিস্তান লেখক সংঘ আয়ুবের Great Decade উৎসবের পরোক্ষ প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

এরপরে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতি পর্যন্ত ইসলামপন্থীরা ছিলেন মূক, এমনকি নিষ্ঠা, সাহস ও সংকল্পের অভাবে তারাও মেনে নিয়েছিলেন সেক্যুলার রাষ্ট্রনীতি-সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সেদিন ঈমানের জোর দেখাননি বাঙালি কোন পীর, বড় বড় মসজিদের শহুরে ইমাম, আলিম সমাজ কিংবা জেহাদী জামায়াতে ইসলামী।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কর্নেল আবু তাহেরের বদৌলতে ক্ষমতা আসনে বসেই জিয়াউর রহমান ইসলামপন্থী রাজাকারদের ও দলছুট আওয়ামী-লীগারদের সহযোগী করে শুরু করেন রাজত্ব। ক্ষুব্ধ-বিমূঢ় জাসদ তখন তাঁর শত্রু। এর পরে সাদা ক্যু করে ক্ষমতা দখল করলেন হোসেন মুহাম্মদ এরশাদ। তিনি গোড়া থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামকেই করলেন পুঁজি-অজ্ঞ অনক্ষর সরলবিশ্বাসী মুসলিমদের বিভ্রান্তির সুযোগে জনপ্রিয় হবার জন্যে, আর শিক্ষিত শহুরে সুবিধেবাদীর সমর্থন-সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্যে জিগির তুললেন মুসলিম উম্মার কম্যুনিস্টভীরু মার্কিন ইঙ্গিতে।

এখানে সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি কথা বলেই এ আলোচনা শেষ করছি। সভ্যতা-সংস্কৃতির য়ুরোপীয় বিকাশের ফলেই গোটা পৃথিবীতে আধুনিক যুগ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যুগ ও যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত যুগের উদ্ভব ঘটেছে। বহুকাল ধরে য়ুরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রই চিন্তায়-চেতনায় আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে মননে-মনীষায় সারা দুনিয়ার দিশারী। উল্লেখ্য, যে যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা শিল্পে-সাহিত্যে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-কৃৎকৌশলে-চিকিৎসাবিদ্যায় আবিষ্কারক-উদ্ভাবক স্রষ্টা-মনীষী তাঁদের অধিকাংশই বিগত শতকের য়ুরোপ থেকে গিয়ে অভিবাসিত হওয়া ইহুদী ও খ্রীস্টান। এখন বিশ্বের দেশ-রাষ্ট্র-জাতি নির্বিশেষে সবাই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির, যুক্তি-বুদ্ধি-রুচির-এককথায়— জীবনাচারের অনুকারক ও অনুসারক। আমাদের মানসিক ও আচারিক জীবন য়ুরোপ প্রভাবিত, য়ুরোপ প্রভাবিত, য়ুরোপ নিয়ন্ত্রিত।

আমাদের শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-ঘর-বাড়ি-আসবাব-পোশাক-কল-কারখানা -প্রযুক্তি-কৃৎকৌশল-শিক্ষা-চিকিৎসাশাস্ত্র বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি হয় য়ুরোপীয় অথবা য়ুরোপ প্রভাবিত। অতএব, আমরা য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার ধারক, বাহক ও অনুকারক। এ ক্ষেত্রে সমকালীনতা রক্ষার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যে ইংরেজি ভাষা শেখা আমাদের মেধাবী উচ্চশিক্ষার্থীদের পক্ষে আবিশ্যক। কাজেই মৌলিক বা ঐতিহাসিক তথা পরম্পরাগত সংস্কৃতির আস্ফালনে কোন শ্রেয়ো চেতনা নেই।

AMARBOI.COM

কম্যুনিস্ট ভূমিকা

ক. ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তাসখন্দে ভারতের প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের [নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের] নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে। ১৯২১-২২ সন থেকেই দেশের অভ্যন্তরে কমরেড মুজফফর আহমদরা তাঁদের তখনকার কর্মসূচী অনুগ প্রচারকার্য শুরু করেন। ১৯২৫ সনের পহেলা নভেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় The labour Swaraj Party of the Indian National Congress, মুখপত্র হল 'লাঙল', সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯২৬ সনে সংস্থার ও পত্রের নামের পরিবর্তন ঘটে, তখন নাম হয় The Peasants' and Worker's Party of Bengal, কুতুবউদ্দিন, আব্দুল হালিম, হেমন্তকুমার সরকার, শামসুদ্দিন প্রমুখ প্রতিষ্ঠাতারা পত্রেরও নাম দিলেন 'গণবাণী' এবং সম্পাদক হলেন মুজফফর আহমদ। প্রথম সংখ্যা বের হল ১২ই আগস্ট, ১৯২৬ সনে। ১৯২৭ সনেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে All India Workers and Peasants Party কার্যকর ভূমিকা পালন করতে থাকে।

১৯৪৩ সনের ১০-১১-১২ই মে নলিতাবাড়ীতে তিনদিন ব্যাপী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে বর্গাচাষীর জন্যে উৎপন্ন ফসলের দু'ভাগ এবং জমি মালিকের জন্যে একভাগ নীতির রূপায়ণে 'তেভাগা' নামে প্রখ্যাত কৃষক আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর ১৯৪৬ সনের শেষদিকে উত্তর বঙ্গে 'আধি নয়, তেভাগা চাই' শ্লোগানে কৃষক আন্দোলন তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হল। এ দ্রোহ শেষাবধি মালদহ-ময়মনসিংহ প্রভৃতি ১১টি জিলায় ছড়িয়েছিল। আর কয়েকশত কৃষক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল হতাহত। তাছাড়া নির্যাতিত হয়েছিল বহু অঞ্চলের কৃষক। এরপর হল পাকিস্তান।

একেতো সরকারের ও সামন্ত বুর্জোয়ার চোখে কম্যুনিস্ট হচ্ছে নাস্তিক দুস্কৃতী, আর কম্যুনিজম মানে নীতি-নিয়ম ও ধর্মহীনতা, তার উপর কম্যুনিস্টরা ছিল মুখ্যত হিন্দু সন্তান। আর পাকিস্তানের জন্মই হল মুসলিমদের হিন্দুভীতি ও হিন্দুবিদ্বেষের ফলে। কাজেই তেভাগা আন্দোলন যখন পাকিস্তান আমলেও চালু রইল, তখন একে ভারতীয় হিন্দুর পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করা এবং অজ্ঞ গণমনে সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগা স্বাভাবিকই ছিল।

তাই ১৯৪৭ সনের পর এখানে যে কোন গণদাবী ও গণআন্দোলন ভারত-প্ররোচিত বলে প্রচার করে সরকার সংগ্রামীদের প্রতি জনসাধারণকে বিরূপ করে তুলত এবং বর্বরোচিত পদ্ধতিতে দমন ও হনন করত। ফলে 'টঙ্ক প্রথা ধ্বংস হোক, জান দেব তবু ধান দেব না' জিগির তোলে, সরকার খুন-জখম করে তা স্তব্ধ দমন করেন ১৯৪৯ সনে। রাজবন্দীর মর্যাদার, ও নায্য সুবিধাপ্রাপ্তির দাবিতে যখন রাজশাহী জেলে আন্দোলন করেন কম্যুনিস্ট বন্দীরা, তখন পুলিশ গুলি চালিয়ে খাপড়া ওয়ার্ডে হত্যা করে সাতজন বন্দীকে —এঁরা হলেন হানিফ শেখ, দেলওয়ার হোসেন, কম্পরাম, আনোয়ার হোসেন, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, বিজন সেন ও সুধীর ধর। আর আহত হলেন একত্রিশ জন। অন্যান্য জেলে নিহত হয়েছিলেন শনি গুহ (ঢাকায়), মোজাম্মেল হক (যশোরে), বিষ্ণু বৈরাগী (খুলনায়)। আর তেভাগা-নেত্রী ইলা মিত্রের উপর অমানবিক ও পাশব অত্যাচারের বৃত্তান্ত তো প্রাবাদিক হয়ে রয়েছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে হিন্দু বলেই তাঁর উপর অত্যাচার সীমা অতিক্রম করেছিল। ১৯৪৮ সনে ভিন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্যে কম্যুনিস্ট পার্টির কোলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (২২-২৯ মে ফেব্রুয়ারী) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ই মার্চ 'পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়। এতে পূর্ব বাঙলার সদস্য ছিলেন মনি সিংহ, খোলা রায়, মনসুর, হাবিব, নেপাল নাগ ও কৃষ্ণবিনোদ রায়।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান যখন হল, তখনো শিক্ষিত মুসলিমের সংখ্যা ছিল নগণ্য। 'কম্যুনিজম' জানা, বোঝা এবং গ্রহণ করা ছিল অন্যান্য রাজনীতিক তত্ত্বের ও পদ্ধতির মতোই ইংরেজি তথা প্রতীচ্য শিক্ষা সাপেক্ষ। একজন অশিক্ষিত লোককে উত্তেজিত, প্ররোচিত ও আবেগচালিত করে হুকুম মাফিক স্থূল কর্ম করার জন্যে কর্মী হিসেবে ব্যবহার করা চলে, কিন্তু তাকে দিয়ে দীক্ষাদানের কাজ চলে না —সাংগঠনিক কাজেও তাকে লাগানো যায় না। তাছাড়া বঞ্চনার ক্ষোভ, আর্থিক দৈন্য, বেকারত্ব এবং জনদরদ না থাকলে কেউ সহজে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী তথা সক্রিয় কম্যুনিস্ট হয় না। কারণ, এ পথে শারীরিক শ্রমের, কষ্টের, গোপনীয়তা, মানসিক নিঃসঙ্গতার আর সার্বক্ষণিক জেল-জুলুম ও মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। পূর্ববাঙলায় ষষ্ঠ দশকেও শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকার সমস্যা ছিল, নতুন রাষ্ট্রে বুদ্ধিমানের রুজি-রোজগারের ভাল-মন্দ পথ-পদ্ধতি তেমন বিঘ্নসঙ্কুল ছিল না। তাছাড়া পূর্ব বঙ্গের আকাশে-বাতাসে মিশে ছিল হিন্দুভীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ, তখনো হিন্দু পালাচ্ছে, তখনো গুপ্তভাবে কিছু কিছু বিধর্মীতাড়ন ও হত্যা চলছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে, আর পশ্চিমবঙ্গে, উত্তর ভারতে তখনো এখনকার মতোই বিধর্মী হত্যা স্থানিক উদ্যোগে, আর পশ্চিমবঙ্গে, উত্তর ভারতে তখনো এখনকার মতোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধর্মী হত্যা স্থানিক বা আঞ্চলিকভাবে চলছিলই। এমনি অবস্থায় অর্থাৎ এমনি শৈক্ষিক, আর্থিক, নৈতিক, মানসিক ও প্রায়োজনিক বিরুদ্ধ প্রতিবেশে হিন্দু নেতারা লুঙ্গি-পায়জামা-প্যান্ট পরে ও মুসলিম নাম গ্রহণ করে মুসলিম সমাজে কম্যুনিজমের প্রসার ঘটাতে পারেননি। কিন্তু তাদের সাহস, সংকল্প, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং আদর্শনিষ্ঠা নিশ্চয়ই পূর্ববাঙলার মানববাদী সমাজবাদী মানুষকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ রাখবে এবং তাঁরাও থাকবেন জনযুদ্ধের সেনানীরূপে ইতিহাসে স্মরণীয়।

আর ষাটের, সত্তরের ও আশির দশকে যখন মুসলিমরা লাখে লাখে শিক্ষিত হচ্ছিল, বেকার হচ্ছিল, অসম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে আর্থিক দৈন্যের চাপে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে, প্রতিকারের উপায় খুঁজছে, ক্ষোভে-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তখনই (১৯৬৬-৬৭ সনে)– কম্যুনিস্টরা তাদের আদর্শের ও প্রেরণার উৎসভূমে ক্রুশ্চেভের মাও-সে-তুঙের তাত্ত্বিক, আদর্শিক ও প্রায়োগিক দ্বন্দ্বে পক্ষাবলম্বন করে নিজেরাই পরস্পর বিবাদের ও বিচ্ছেদের শিকার হলেন। এবং স্ব স্ব ক্ষুদ্র দল ও শক্তি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে কেবল ব্যর্থতাকেই, নিষ্ফলতাকেই, হতাশাকেই এমনকি বিলুপ্তিকেই বরণ করলেন। গোটা ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বয়স হল ঠিক আটষট্টি বছর, প্রচার ও কাজ শুরু হয়েছিল যথার্থভাবে ১৯২৭ সন থেকেই। সার্বত্রিক প্রস্তুতি ব্যতীত আংশিক ও আঞ্চলিক শক্তি নির্ভর কাজ শুরু করার দরুন তাঁদের সংগ্রাম ব্যর্থ ও বৃথা হয়েছে।

খ. ১৯৫১ সনে দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে কৃষ্ণবিনোদ রায়ের স্থলে এখানকার দল-সম্পাদক হলেন মনি সিংহ। উল্লেখ্য যে গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ১৯৫১ সনে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে গঠিত পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ এবং ১৯৫৩ সনে গঠিত পূর্ব-পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলগুলো ছিল কম্যুনিস্ট প্রভাবিত ও ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালিত। ১৯৫৬ সনে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯৫৫ সনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' আওয়ামী লীগ নামে অধর্মীয় ও অসাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করে। ১৯৫৭ সনের ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারীতে মওলানা ভাসানীর আহ্বানে ও নেতৃত্বে কাগমারীতে যে মহাসম্মেলন হয়, তা যেমন রাজনীতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল (আমেরিকার সঙ্গে সামরিক চুক্তি বিরোধী), তেমনি ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালি সত্তা সম্পৃক্ত। এতেও ছিল কম্যুনিস্টদের প্রভাব ও ভূমিকা। তারপর ১৯৫৭ সনেই গঠিত হয় National Awami Party (NAP), এ-ও ছিল বাম-ঘেঁষা জাতীয় দল। ১৯৬০ সনে রুশ-চীন বৈঠকে নীতিগত প্রশ্নে মতবিরোধ ঘটায় রুশ-চীন সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রুশ্চেভ-মাও-এর মতবিরোধ তীব্র হয়ে বিশ্বের কম্যুনিস্টদের দুটো পরস্পর বিরোধী দলে পরিণত করল। কাজেই আমাদের দেশেও মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী দুটো দল গড়ে উঠল। ক্রুশ্চেভের দল 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে' আস্থাবান হল, চীন রইল পূর্বের মতো বিপ্লবপন্থী। আমাদের দেশে রুশপন্থীরা সশস্ত্র কৃষক দ্রোহের ফলপ্রসূতায় আস্থাবান হয়। ১৯৬৬ সনের দিকে মনি সিংহ-বারীন দত্ত-খোকা রায়রা সোভিয়েত বা রুশপন্থী এবং তোয়াহা-সুখেন্দু দস্তিদাররা চীনপন্থীরূপে সাধারণ্যেও পরিচিত হন। ভাসানী ন্যাপও (NAP) এভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৭ সনে হক-তোয়াহা-দস্তিদার দল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রাম দখল করে শহর 'ঘেরাও' করার নীতি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এ দলে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন শরদিন্দু দস্তিদার, দেবেন শিকদার, অজয় ভট্টাচার্য, আলাউদ্দীন, হাবিবুর রহমান ও নজরুল ইসলাম।

১৯৬৭ সনে তরুণ সিরাজ সিকদার পূর্ব বাঙলার শ্রমিক আন্দোলন ও ১৯৭১ সনে পূর্ব বাঙলার সর্বহারা পার্টি গঠন করেন। এ দল দ্রুত প্রসার লাভ করে। মুজিব আমলে নিহত না হলে সিরাজ সিকদার হয়তো কম্যুনিস্ট আন্দোলন অনেকটা এগিয়ে দিতে পারতেন। আজ মস্কোপন্থী দল কম্যুনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ নামে অবিচ্ছিন্নভাবে সংহত শক্তিরূপে খ্যাত এবং স্বমতে-পথে অটল। আর পিকিং পন্থীরা বহু দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন যদিও ঘন ঘন ঐক্যবদ্ধ হবার ও Front গঠন করার চেষ্টা করে থাকেন। এদিকে ছাত্রদলেও মস্কো ও পিকিংপন্থীর নেতৃত্ব দেন মতিয়া চৌধুরী। এত ভাঙনের ও মতবিরোধের পরেও কম্যুনিজমের কোন বিকল্প নেই শোষিত মানবমুক্তির জন্যে।

আজ এ মুহূর্তে আমাদের কম্যুনিস্টরা চীন-রাশিয়ার মত-পথের, নীতি-নিয়মের, রীতি-পদ্ধতি আকস্মিক পরিবর্তনে হয় দিশেহারা, নয়তো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাঁদের মত-পথের, আদর্শের ও লক্ষ্যের উৎসভূমে যে পরিবর্তন চলছে তার রূপ-স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ তাঁদের বোধগত নয়, আবার তাঁরা স্বদেশে স্বমতনির্ভরও নয়, ফলে আমাদের তত্ত্বনিষ্ঠ কেতাবলগ্ন গুরুবাদী কম্যুনিস্টরা এ মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় —কেউ হতাশ, কেউ ক্ষুব্ধ, কেউবা গ্লানিক্লিষ্ট। এরপর থেকে বাঙলাদেশে খ্যাত-অখ্যাত কম্যুনিস্ট দলগুলোর একটা নামসার তালিকা আবু জাফর মোস্তফা সাদেক রচিত বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন (পৃ. ১৩৬-৩৮) থেকে উদ্ধৃত করছি।

AMARBOI.COM

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

বীরোত্তম কর্নেল আবু তাহেরের এ স্মারক বক্তৃতায় প্রথমেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সম্বন্ধে বলা বাঞ্ছনীয়। তার আগে একটা ব্যক্তিগত কথা সবিনয়ে বলে নিতে চাই। আমরা জানি ইচ্ছা অনিচ্ছায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয়ই। সরকার মাত্রই নানা মতলবে ও প্রয়োজনে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। সে অপপ্রয়োগ রোধের জন্যেই জনগণকে, বিরোধী রাজনীতিক দলকে মাঝে মধ্যে হৈ-চৈ করতে হয় —করতে হয় বিবৃতি-বক্তৃতা-মিছিলের মাধ্যমে আন্দোলন। এ কারণেই নাগরিক হিসেবে আমি চিরকালই জনগণের হয়ে সরকার বিরোধী। তাই যখন আমার মতানুগ সরকার বিরোধী কোন্দল গড়ে ওঠে, তখন আমি সে দলের সহযোগী হই। এক সময়ে আমি আওয়ামী ছাত্রলীগের সভায় বক্তৃতা দিয়েছি। পৃথিবীতে দুর্লভ অপ্রতিদ্বন্দ্বীও অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব ও অনন্য জনপ্রিয়তা আর 'জাতির জনক' অভিধা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যখন রাষ্ট্রনায়ক, তখন নেপথ্য নেতা দু'জন আ.স.ম. আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ ১৯৭২ সনের অক্টোবরে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' সংক্ষেপে JSD বা 'জাসদ' নামে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। রবের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাই গোড়া থেকেই আমি ওঁদের নানা সভায় বক্তৃতা দিয়েছি। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে দু'চারবার। তাতে মনে হয়েছে তাঁর দল ক্ষমতার অংশীদার হলে তাঁর দলের বিস্তার দ্রুততর হবে এমন একটা ধারণা যেন তিনি পোষণ করেন। সেই জন্যেই বোধহয় তিনি অনুকূল শর্তে পুঁজিবাদী শক্তিরও সহযোগী হতে রাজি। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই তাঁদের কাম্য বলে উচ্চারিত ও ঘোষিত হলেও প্রায় ৫/৬ বছর পরে 'কাস্তে' অঙ্কিত লাল প্রচ্ছদে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় তাঁদের মত-পথ সম্বলিত পুস্তক। আমার ধারণা সত্য হয়ে উঠল যখন দেখলাম যুক্তরাষ্ট্রবাসী ডক্টর জিল্লুর রহমান খানের সহযোগিতায় সিরাজুল আলম খান একখানা সংবিধান রচনা করে প্রকাশিতও করেন। এর মূলতত্ত্ব প্রত্যেক প্রকার পেশাজীবীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে পাঁচশ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদে। এমনকি সরকারি চাকুরে, সেনাবাহিনীরও প্রতিনিধিত্ব চান তিনি। একে আমার মনে হয়েছে সমাজতন্ত্র এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল বা ছলনা বলে। এখন দল বিখণ্ডিত। কে বা কারা এখন তাঁর পরিচালিত দলের নেতা, তা আমরা জানি না। তবে আ.স.ম. আব্দুর রব এখন এরশাদী আঁতাতে প্রকাশ্যেই বদ্ধ। তবু ১৯৭১ সনে স্বাধীনতার পতাকা বানানো ও ওড়ানোর কৃতিত্ব ও গৌরব রব-সিরাজেরই।

কর্নেল তাহের যখন কুমিল্লা-চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনানী সিপাহী এনে ঢাকায় নৈরাজ্যের অবসান ঘটালেন, তখন তিনি যথার্থই বিপন্ন রাষ্ট্রের উদ্ধারকর্তা হিসেবে জনসমর্থিত ও জননন্দিত হয়েছিলেন। সিপাহী-জনতার নেতা তাহের গৃহবন্দী জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে শাসন ক্ষমতা দান করেন। জিয়াউর রহমানও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর ছিল ইসলাম ও পাকিস্তানপ্রীতি। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা বাঙালি বলে তাঁকে হত্যা করবে আশঙ্কায় তিনি মুক্তিযোদ্ধা হন এবং প্রথমে নিজের নামে, পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন চট্টগ্রামের কালুরঘাট এলাকায় তৈরি বেতার যন্ত্র মাধ্যমে। তাঁর ইসলামপ্রীতির ও অখণ্ড পাকিস্তানপ্রীতির সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে চার নীতিভিত্তিক সেক্যুলার সংবিধানকে তিনি করলেন বিসমিল্লাহ জড়িত এবং পাকিস্তানপন্থী ইসলাম-পছন্দ রাজাকারদের করলেন তাঁর শাসন-প্রশাসনের সহযোগী ও বিশ্বস্ত সহচর। শোনা যায় তাঁর উপর সেনাবাহিনী প্রসন্ন ছিল না, বাইশ বার তাঁকে পদচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছিল, অবশেষে ১৩৮৯ (১৯৮১ খ্রিঃ) সনে তিনি সেনাদের হাতে চট্টগ্রামে নিহত হন। শেখ মুজিব নিহত হয়েছিলেন ঢাকায়, তাই তাঁর সরকারের পতন হয়েছিল, জিয়া নিহত হন চট্টগ্রামে, ফলে ঢাকায় তাঁর সরকার চালু থাকে। এমনকি রাষ্ট্রপতির নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু পরাশক্তির মদদে পরামর্শে উচ্চাশী হোসাইন মুহম্মদ এরশাদ 'ক্যু' করে ক্ষমতার গদী দখল করেন।

মার্কসবাদ পৃথিবীর সব মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছে। প্রত্যাশা ছিল পৃথিবীব্যাপী সর্বাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণমুক্তি ঘটিয়ে সাম্যের সমাজ গড়ে তোলা হবে। তাই মার্কসবাদীরা আন্তর্জাতিক পটে ও প্রয়োজনে চিন্তা ভাবনা করত। তৃতীয় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত অবধি তাদের স্বপ্ন, আশা ও সংকল্প ছিল এমনিই। প্রত্যাশা ছিল জোরজুলুম ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্য (equality) প্রতিষ্ঠিত হলে, মানুষ সাম্যের জীবনে ও সমআচরণে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন বিশ্বময় সবাইকে স্বাধীনভাবে চিন্তা কর্ম-আচরণের স্বাধীনতা (liberty) দেয়া যাবে। কেননা তখন পরিবর্তিত নীতি নিয়ম নিয়ন্ত্রিত সমাজে সামন্ত-বুর্জোয়া প্রতিবেশ বিলুপ্তির ফলে পূর্বাবস্থা ফিরে পাবার উপায় থাকবে না, কাজেই কারো আকাঙ্ক্ষা জাগবে না। যেমন আমাদের দেশে এখন কারো জমিদার হবার আকাঙ্ক্ষা জাগে না, বাস্তবে সম্ভব নয় বলেই।

যৌক্তিক আশা ছিল বুর্জোয়া বিকাশের একটা চরম অবস্থান আসবে। তার পরে প্রায় স্বাভাবিক তথা প্রাকৃতিক কারণেই শুরু হবে ক্ষয়। কেননা, পুঁজি বিনিয়োগের, কারখানার বহু ও বিচিত্র বস্তু নির্মাণের ও উৎপাদনের থাকবে একটা সীমা, যার পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মাণ উৎপাদন যাবে চাহিদা সীমার উপরে, তখন উদ্বৃত্ত আয়তো হবেই না, বরং পুঁজি হবে নষ্ট। তখন শ্রমিক হবে বেকার, সমাজে দেখা দেবে আর্থিক বিপর্যয়, নীতি নিয়মে, রীতি রেওয়াজে আসবে বিকৃতি, সমাজ হবে বিশৃঙ্খল, অভাবের প্ররোচনায় গণদাবী হবে উত্তুঙ্গ, অপ্রতিরোধ্য ও অপূরণীয়। ফলে বণ্টনে বাঁচা এবং বাঁচানোই হবে একমাত্র প্রশ্ন, নানাপন্থা। এরই পরিভাষিক নাম বুর্জোয়া সমাজের তথা পুঁজিবাদের 'নাভিশ্বাস' এবং সমাজবাদের সাম্যবাদের স্বতঃবিজয়। কিন্তু জ্ঞান-প্রজ্ঞা-ইতিহাস-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে তৈরি এ হিসেব আকস্মিকভাবে বানচাল করে দিল বিজ্ঞানের, যন্ত্রের ও প্রযুক্তির অভাবিত ও দ্রুত আবিষ্কার, বুদ্ধি ও বিকাশ এবং বিস্ময়কর বহু ও বিচিত্র উৎকর্ষ। কাজেই বুর্জোয়া পুঁজির ও সমাজের নীতি-নিয়মের গণবাঞ্ছিত এবং পণ্ডিত-প্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটল না, উঠল না নাভিশ্বাস। তাছাড়া নাভিশ্বাস-ভীরুরা আগে থেকেই সাধ্যমতো গণদাবী অনুগ দায়িত্ব ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে, তার মধ্যে 'কল্যাণ-রাষ্ট্র চিন্তাও রয়েছে।

তাই কম্যুনিস্টদের হিসেব মিলছে না, তারাও তাই দিশেহারা। এই দিকে রাষ্ট্রিক স্বনির্ভরতা ও স্বাতন্ত্র্য এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে প্রবল ও গভীরভাবে ব্যাহত হওয়ায় তাদের দ্বন্দ্বচেতনা এবং রণনীতিও হয়ে গেছে ছিন্নমূল। অথচ প্রাতিভাসিক দ্বন্দ্ব ও তত্ত্বের ও তথ্যের শেকড় যেন তাদের দৃষ্ট ও উপলব্ধ। ফলে কেতাবী তত্ত্ব ও তথ্য আজ যে মরীচিকামাত্র, গুরুবাদ-নবীবাদ যে আজ অচল, তা নির্মোহ চোখে, মনে জানার এবং বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধির বা বোঝার মানুষ যে-কোন কারণেই হোক, কম্যুনিস্টদের মধ্যে কম। তাই তারা শাস্ত্রবেত্তা সমাজপতিদের মতোই অনবরত কেতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও-এর দোহাই দিয়ে দিয়েই দলের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের দিশারীর-নেতার দায়িত্ব পালন করেন, দেশ-কাল-পরিবেশে বীক্ষাও তাই তাদের সুষ্ঠু হয় না।

আমাদের কম্যুনিস্ট দলের আর একটি ত্রুটি হচ্ছে আঞ্চলিক। কোন এক অঞ্চলে তারা প্রবল হলেই সে অঞ্চলে তারা তাদের কাজ লুঠ-দ্রোহ-হত্যা শুরু করে দেয়, গোটা দেশে একই সঙ্গে কাজ শুরু না করলে সরকারকে যেমন বিব্রত বিপর্যস্ত করা যায় না, তেমনি আঞ্চলিক দ্রোহ দমন করতে দ্রোহীদের উৎখাত করতে সরকারেরও তেমন বেগ পেতে হয় না। এভাবেও আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট শক্তি অপচিত হয়েছে বহুবার। প্রাণ হারিয়েছে অনেক অরুণ।

ধীশক্তি সবার সমান নয়, কাজেই তত্ত্ব ও তথ্য সবাই কখনো সমভাবে বুঝবে না, তার প্রয়োজনও নেই। নেতারাই কেবল জানবে বুঝবে, অন্যরা নির্দেশমতো কাজ করবে -সেনাবাহিনীর মতোই। এ যুগে ক্ষমতা দখলের জন্যে প্রয়োজন জনবল, ধনবল ও অস্ত্রবল —তত্ত্ব বা দ্বন্দ্বচেতনা নয়, প্রতিটি মানুষের আসন-বসন-নিবাস-নিদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা ও রাখার লক্ষ্যে অধিজনের তথা কার্যকর সংখ্যার মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা পেলেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা এ যুগে সম্ভব। ভয় কেবল ডানপন্থী সেনাবাহিনীকে। কেননা ক্ষমতার উৎস যথার্থই বন্দুকের নল। সেনাবাহিনীতে বামপন্থী তরুণরা যোগ দিলে এবং গাঁয়ে গাঁয়ে কম্যুনিস্ট কর্মীরা কেবল বাঙলা হরফগুলোর সঙ্গে নিরক্ষর মানুষের পরিচয় করিয়ে দিলে কমুনিস্ট বুলেটিন-ইস্তাহারের মাধ্যমেই এতদিনে গণজাগরণ ও গণসমর্থন প্রাপ্তি সহজ হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচার এবং মানুষকে বাঁচানোর এ পর্যন্ত আবিস্কৃত উপায়ের মধ্যে আধুনিকতম এবং শ্রেষ্ঠ উপায় বা পন্থা হচ্ছে মার্কসবাদ, তথা সমস্বার্থে বন্ধনে ও সহযোগিতায় সহিষ্ণুতায় আর সহাবস্থানে বাঁচা। এ কথাগুলোই কেবল প্রচার করে সমাজ পরিবর্তনে জনসমর্থন আদায় করাই এখন দলমত নির্বিশেষে সব বামপন্থীর প্রয়াস হওয়া বাঞ্ছনীয়। ক্ষমতা দখল করেও উপদলীয় বিবাদ শুরু করা যায় স্ব স্ব মত ও মতলব অনুসারে। কাজেই দেশ-কাল-পরিবেশের দাবি হচ্ছে নির্বিশেষে কম্যুনিস্ট ঐক্য।

মার্কস-লেনিন-মাও'র প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্যবশে কম্যুনিস্টরা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে, মুক্তচিন্তায় অভ্যস্ত হয় না, শাস্ত্রমানা মানুষের মতো কেবল শাস্ত্রেই পাঁজি-ফতোয়া খোঁজে। এজন্যেই চীন-রাশিয়ার নীতি নিয়মের পরিবর্তনে স্থূলবুদ্ধি ও মার্কসবাদে অজ্ঞ দক্ষিণপন্থীরা যখন কম্যুনিজম হাওয়া হয়ে গেল বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাস করে, তখন আমাদের কম্যুনিস্টরাও নিজেদের বড় অসহায় বোধ করে। এমনকি হতাশায় ভোগে। বলতে পারে না যে নাগরিকদের ভাত কাপড়ের পালন-পোষণের সর্বপ্রকার দায়িত্ব রাষ্ট্রের —এ অঙ্গীকার যতদিন সরকার পালন করবে এবং জনগণও এ দাবি ও অধিকার আদায়ে দৃঢ় থাকবে, আর্থিক-প্রশাসনিক শত পরিবর্তন সত্তেও 'সমাজতন্ত্র' স্বীকৃত থাকবে। কাজেই হতাশার বা ব্যর্থতার গ্লানি কোন কম্যুনিস্টকে এ মুহূর্তে আচ্ছন্ন করার কথা নয়।

উপসংহার

আমরা বক্তৃতার নাম দিয়েছি 'বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি'। এ নামও আজকাল ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কেননা বহু ও বিচিত্র ব্যবহারে উচ্চারণে বিপ্লব এখন একক তাৎপর্য ও অভিন্ন অভিধাচ্যুত হয়েছে। আমাদের উচ্চারিত এ 'বিপ্লব' কৃষি-শিল্প বিপ্লব নয়। বুর্জোয়া সমাজে আর্থিক সামাজিক রাজনীতিক দাবিপূর্তি লক্ষ্যে আন্দোলন বা দ্রোহ নির্দেশকও নয় – এ বিপ্লব কোন যান্ত্রিক সংস্কার আন্দোলনও নয়। আর্থসামাজিক জীবনে সর্বপ্রকার শোষণ-বৈষম্য-পীড়ন মুক্তি লক্ষ্যে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন লক্ষ্যে পরিচালিত দ্রোহ-সংগ্রামসঙ্কুল মতাদর্শ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমরা বিপ্লব বলে মানি।

AMARBOI.COM

১৯২০ সন থেকেই আমাদের কিছু লোক বিপ্লবমনস্ক হলেও অশিক্ষাদুষ্ট শাস্ত্রনিষ্ঠ সামাজিক ভাবেই যৌথহিতচেতনাও জাগানো আজ অবধি বাস্তবে সম্ভব হয়নি। এছাড়া আমাদের বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার অধিকাংশ-অবিস্তারের অন্যান্য কারণও রয়েছে। তার মধ্যে ইতিহাসগত কারণে হিন্দু-মুসলিম মনে দৃঢ়মূল বিধর্মীদ্বেষণা একটি বড় কারণ। যথার্থই আর্থ-সামাজিক অধিকার আদায়ের জন্যে গণ-আন্দোলনের উদ্যোগ-আয়োজন হয়েছে, তখনই আমাদের 'এ অঞ্চলে' ভারতভীতি কিংবা ইসলামপ্রীতি জাগানোর চেষ্টা করে সরকার ও সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক দল। তাছাড়া কম্যুনিস্ট আন্দোলনটি গোড়ায় হিন্দু ও নাস্তিক নেতৃত্বে শুরু হওয়ায় অশিক্ষাদুষ্ট গ্রামীণ ও অর্থবিত্তের ক্ষেত্রে ভুঁইফোঁড় সাধারণ শহুরে শিক্ষিত লোকেরও ভীতির ও অবজ্ঞার কারণ হয়ে থাকে। ফলে এদেশে সমাজ-পরিবর্তন লক্ষ্যে কোন আন্দোলনই প্রসার লাভ করে না। মার্কিন মদদপুষ্ট ও অর্থনিভর মুৎসুদ্দী সরকারও হিন্দুভীতিকে এবং ইসলামপ্রীতিকেই পুঁজি-পাথেয় করে লোকজন বশ করে। দেশে আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মননশীল নেতার অভাবে রাজনীতিক দলগুলোও নিরক্ষর রাজনীতি-অজ্ঞ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাসীন জনগণের মন-মত অনুগ ভোটের রাজনীতি করে। এমনকি কম্যুনিস্ট দলগুলোও সরকারের বা বিভিন্ন দলের নীতি হিসেবে ধর্মের রাজনীতিক ব্যবহারের নিন্দা করে না, অজ্ঞ-মুসলিমরা বিরূপ হবে আশঙ্কায়। অথচ রাজনীতিক দলের নেতার কাজ হল নিজেদের আদর্শ-উদ্দেশ্য অনুগ জনমত সৃষ্টি করা ও নিয়ন্ত্রিত-নিয়মিত করা। ফলে কম্যুনিস্টরা কিংবা সেক্যুলার আওয়ামী লীগও রাষ্ট্রধর্ম কিংবা ধর্মের রাজনীতিক ব্যবহার প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে না। আজ এ মুহূর্তে বাঙলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি এমনকি সাহিত্য-শিক্ষাও ইসলামপন্থী হিংস্র হাঙ্গর-কুমিরের গ্রাস কবলিত। অন্যরা গা-পা বাঁচিয়ে কাগুজে বিবৃতিতে ও মেঠো বক্তৃতায় প্রতিবাদ করে বটে, কিন্তু প্রতিরোধে এগিয়ে আসে না।

এসব কারণেই ১৯৪৬ সনে শুরু হলেও 'তেভাগা' আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-কম্যুনিস্ট পরিচালিত বলে চাষী-বর্গা-ভাগচাষীর এ লড়াই ব্যাপকতা পেলেও সরকারের ও শিক্ষিত জনের বিধর্মী-দ্বেষার প্রাবল্যে থেমে যায়। অথচ এ দাবির একটা নৈতিক ভিত্তিও ছিল। ফ্লাউড কমিশনও 'তেভাগার' ও বর্গাচাষীকে প্রজা হিসেবে স্বীকৃতিদানের সুপারিশ করেছিল। এ সূত্রে এ সময়কার টঙ্ক, গুন্দা, খাড়াভাগ, মকরাভাগ প্রভৃতি আন্দোলনও স্মর্তব্য। আর স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ১৯৫০ সনের রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দী হত্যার ও ইলা মিত্রের উপর পাশবিক হামলার বীভৎস ইতিবৃত্ত।

নাচোল-আত্রাইয়ের এবং অন্যান্য অঞ্চলে আবদুল হক-তোয়াহা-সিরাজ শিকদারের দলের লড়াইয়ের কথা শিক্ষিতদের অজানা নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী কর্নেল আবু তাহের অন্য উপায়ে ও পদ্ধতিতে একই বিপ্লবী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং আপাত সাফল্য অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু গণদীক্ষা ও গণপ্রস্তুতি ছিল না বলে সিপাহী-জনতার এ অভ্যুত্থানের দাগ এবং তার কোন চেতনাগত লেশ ও রেশ এখন দুর্লক্ষ্য।

AMARBOI.COM

এসব কারণেই বিপ্লব-বিবরণে আমাদের বক্তৃতা শেষ করা অসার্থক হবে। তাই আমরা এখানে আমাদের চলমান বা চলতি জীবনে-সমাজে-সংস্কৃতিতে সরকারের, রাজনীতিক দলের ও জনগণের আনুপূর্বিক অবস্থার, অবস্থানের ও ভূমিকা আনুপঙ্খ নয়, সাধারণ চিত্র তুলে ধরেই আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। এতে বিপ্লবের পথে বাধা কি কি এবং বিপ্লব ত্বরান্বিত করার উপায়ই বা কি কি, সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা-চেতনা উদ্রিক্ত হবে, আশা করি।

তৃতীয় পর্ব

পরিশিষ্ট-১

কমিউনিস্ট পার্টির ধারাবাহিকতা

১৯৪৮ পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বে-সাজ্জাদ জহির, মনসুর হাবীর, মনি হিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ।

১৯৫৬ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি মনি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৬ ১. মস্কোপন্থী —মনি সিংহ, নেপাল, অনিল
২. পিকিংপন্থী —সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা।

১৯৬৭ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) সুখেন্দু, তোয়াহা, আব্দুল হক, আলাউদ্দিন, দেবেন শিকদার, শান্তি সেন।

১৯৬৮ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) : দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, আলাউদ্দিন, আব্দুল মতিন।

১৯৭২ ১. পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল (মাঃ লেঃ) : সুখেন্দু, দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, শান্তি, নগেন, ইয়াকুব।
২. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি : আঃ হক, অজয়, সত্য মৈত্র, শরদিন্দু।
৩. বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি : আলাউদ্দিন, মতিন, আমজাদ, টিপু।
৪. বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি : দেবেন শিকদার, আঃ বাশার, সিরাজুল হোসেন খান।
৫. লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি : নজরুল, অমল, রনো, মেনন।

১৯৭৪ ৩. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি
ক. আলাউদ্দিন, মতিন, মাসুদ, আজিজ মেহের
খ. তারা, মোফাখখর চৌধুরী
৪. নাম পরিবর্তনে বাংলাদেশের গণবিপ্লবী পার্টি।

১৯৭৬ ১. বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মাঃ লেঃ)
২. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ)
ক. হক, অজয়, বিমল।
খ. সত্য, শরদিন্দু, ইদ্রিস লোহানী–বাংলাদেশের (মাঃ লেঃ) কমিউনিস্ট পার্টি
৬. মাসুদ, ওমর, দাহার। (৩/ক)+দেবেন, বাশার, সিরাজুল, মোল্লা (৪)।

১৯৭৭ ৬. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ)
(ক) ওমর, দাহার, মোল্লা, সাত্তার
(খ) দেবেন, বাশার, সিরাজুল।

১৯৭৮ ১. বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা লেঃ)
ক. সুখেন্দু, তোয়াহা, শান্তি, আলাউদ্দিন (৩/ক)
খ. নগেন সরকার, ননী দত্ত, আলী আব্বাস।
৫. নাম পরিবর্তনে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি।

১৯৮০ ২. ক. নাম পরিবর্তনে বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ)
১. হক, অজয়
২. বিমল, মুনীর (মতিন)

১৯৮১ ১. ক. থেকে ননী গোপাল দত্ত বহিস্কৃত
২. খ. গ্রুপে টিপু বিশ্বাস (৩) যোগদান।

১৯৮২. ৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ সত্য, শরদিন্দু, মতিন, টিপু
২. খ. বিমল মুনীর ২/ক/২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. খ. নাম পরিবর্তন –মজদুর পার্টি

১৯৮৩. ১. বাংলাদেশে সাম্যবাদী দল (মাঃ লেঃ)

১/ক/১/সুখেন্দু, তোয়াহা, আসদ্দর

১/ক/২/শান্তি, ইয়াকুব, আলাউদ্দিন।

১৯৮৪ ১/খ/১আলী আব্বাস, দিলীপ বড়ুয়া

১/খ/১ শাহ আলম, হাজী বশির।

১৯৮৫ ১. বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মাঃ লেঃ) : তোযাহা, আসদ্দর (ক/১), আলী, দিলীপ (খ/১)

৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ গ্রুপে শাহ আলম (১খ/'২) যোগদান

৫. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

ক. কমল, নজরুল।

খ. রনো, মেনন

১৯৮৬ ৫. খ. গ্রুপে বাশার (৬/খ) যোগদান।

বর্তমান অবস্থা ঃ

১. বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মাঃ লেঃ)

ক. তোয়াহা, আসদ্দর আলী, দিলীপ

খ. শান্তি, ইয়াকুব।

২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) : আঃ হক, অজয় ভট্টাচার্য।

৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ : মতিন, শরদিন্দু, টিপু, বিমল, শাহ্ আলম

৪. মজদুর পার্টি : দেবেন শিকদার

৫. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স·পার্টি

ক. অমল, নজরুল

খ. রনো, মেনন, বাশার

৬. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) : ওমর, দাহার, মেহের

৭. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) : মোফাখখর চৌধুরী।

এ সঙ্গে জনাব আমজাদ হোসেন রচিত ও ১৫ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ১৯৮৬ সনে বিচিত্রায় প্রকাশিত কম্যুনিস্ট দলের বিচিত্র বিভক্তির ও মিলন-মিশ্রণের চার্ট বা সারণী যুক্ত হল।

তৃতীয় পর্ব

পরিশিষ্ট-২

বইয়ের তালিকা

১. আমজাদ সুলতান : পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, মেনিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র

২. মাওলানা ভাসানী : ভোটের আগে ভাত চাই
১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ১৯৪৮-৮৬
বিভক্তি এবং ঐক্যের খতিয়ান

আমজাদ হোসেন রচিত এবং ১৯৮৬ সনের ২৮শে নভেম্বর সংখ্যা বিচিত্রা থেকে উদ্ধৃত।

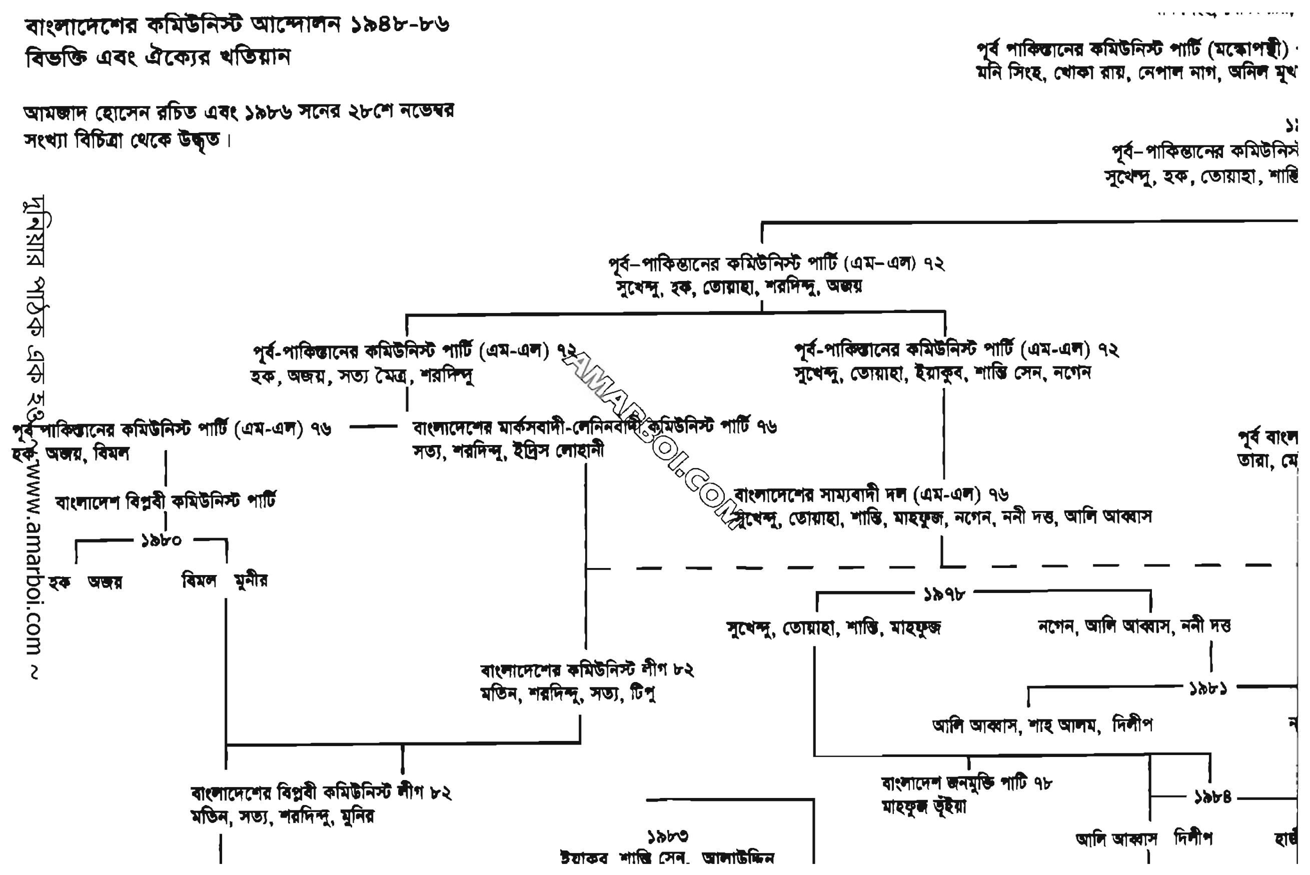

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

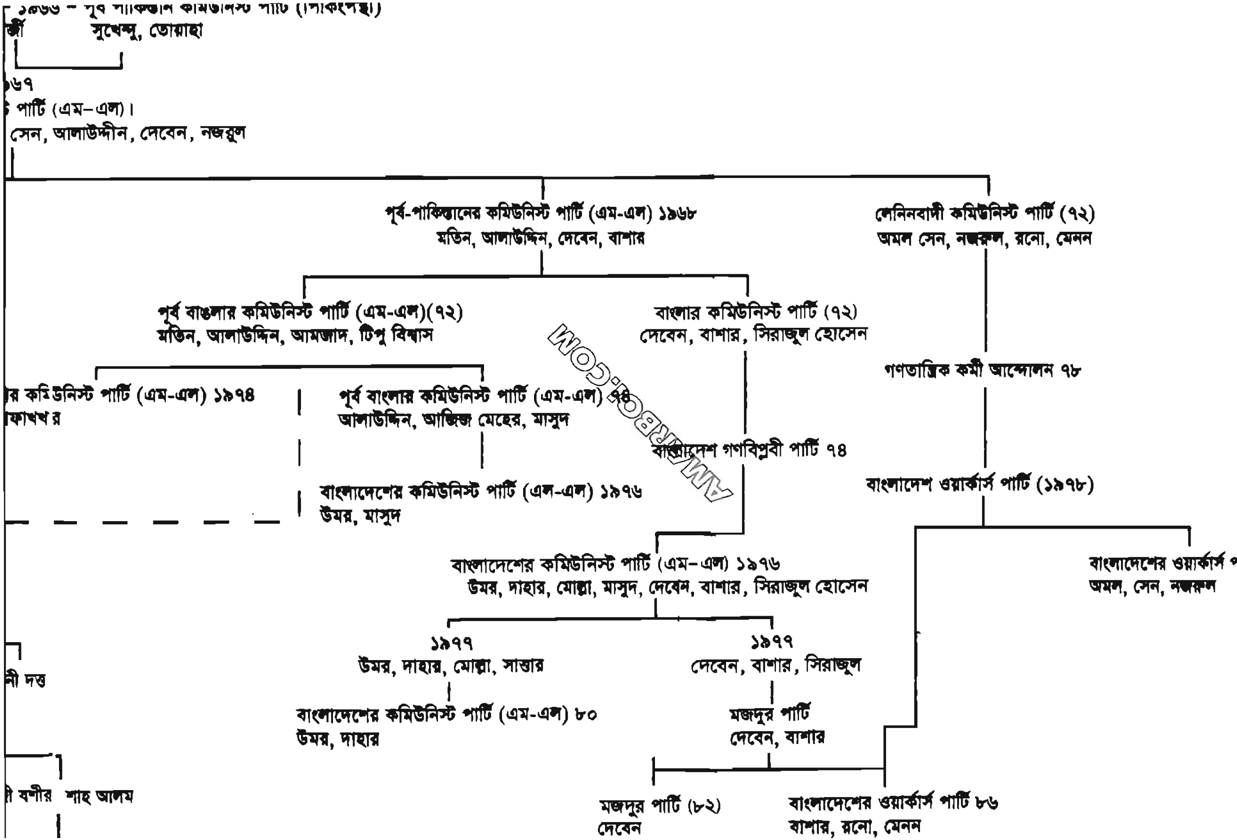

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩.	আজাদ সুলতান	: চক্রান্তের রাজনীতি, গণবাণী
	ঐ	: ভাসানীর রাজনীতি, ঐ
৪.	পূর্ব বাঙলা শ্রমিক আন্দোলন	: স্বাধীন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাঙলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী
৫.	বিপ্লব প্রকাশনী, ঢাকা	: ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও মার্কসবাদী রাজনীতি
৬.	মোহাম্মদ সুলতান	: ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংগ্রামী পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন, বিভেদের রাজনীতি পরাস্ত করুন।
৭.	আব্দুল হালিম (ন্যাপ)	: পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পাটির বক্তব্য
৮.	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি	: বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনের ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ
৯.	নাম নেই ১৯৬৯	: মার্কসবাদী (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)
১০.	ঐ ১৯৬৯	: মার্কসবাদী (২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)
১১.	ঐ ১৯৬৯	মার্কসবাদী (২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)
১২.	দেওয়ান মাহবুব আলী ১৯৬৮	: পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
১৩.	ড. আবু মাহমুদ	: The Concept of Islamic Socialism
১৪.	ড. হাসান জামান ১৯৬৯	: ইসলাম ও মার্কসবাদ
১৫.	আবদুল হক	: ক্ষুধা হইতে মুক্তির পথ
১৬.	ফজলুল হক ১৯৭৩	: বাঙলাদেশ সংগ্রামে চীনের ভূমিকা
১৭.	দেবেন শিকদার ১৯৭৯	: বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি ও কমিউনিস্ট ঐক্য প্রসঙ্গে
১৮.	আ. ম. বশিরুল আলম ১৯৭৯	: বাংলাদেশ আধা-ঔপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী
১৯.	বদরুদ্দীন উমর ১৯৭৬	: বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা
২০.	হারুনুর রশিদ ১৯৭৯	: বামপন্থীদের ভ্রান্তি ও বাংলাদেশের বিপ্লব
২১.	ফজলে লোহানী ১৯৭০	: মহীপুরের প্রান্তর
২২.	NAP (Muzaffar)	: NAP (Muzaffar What NAP (Muzzafar) stands for (Aims Objectives and Programme)
২৩.	অশোক বসু ১৯৭৩	: ভারতে বিদেশী লুট
২৪.	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭০	: কৃষক ফ্রন্টে আমাদের কর্তব্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫. কমরেড মেহেদী ১৯৭৭	:	উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয়তাবাদী পার্টি প্রসঙ্গে
২৬. বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৪/৯/১৯৭১)	:	বাঙলাদেশে জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার কর্মসূচী
২৭. আবু জাফর মোস্তফা সাদেক ১৯৮৭	:	বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন
২৮. কেন্দ্রীয় কমিটি – বাঙলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট (মাঃ এম)	:	পুনর্গঠন ও এককেন্দ্র করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের প্রথম সম্মেলনের ঘোষণা
২৯. আমজাদ হোসেন ১৯৮৩	:	মোহাম্মদ তোয়াহা ও সাম্যবাদী দলের রাজনীতি
৩০. আব্দুর রহিম আজাদ –	:	১ দফার আন্দোলন : গন্তব্য কোথায়
৩১. অনিল মুখার্জি ১৯৮০	:	স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রমের পটভূমি (২য় সং)
৩২. অজয় দত্ত ১৯৮৪	:	বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন
৩৩. রাজ্জাক ভূঁইয়া ১৯৮২	:	রাজনীতি গোড়ার কথা
৩৪. বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট লীগ –	:	সাবেক সি.পি.ই.পি (এম,এল)-এর দুটি দলিল
৩৫. শেখর দত্ত –	:	রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান : প্রতিষ্ঠা থেকে মুক্তিযুদ্ধ
৩৬. খোকা রায় ১৯৮৬	:	সংগামের তিন দশক
৩৭. নুরুল ইসলাম ১৯৮৮	:	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর
৩৮. অজয় দত্ত ১৯৮৫	:	কমরেড মাও সেতুং ও মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব
৩৯. বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট	:	গঠনতন্ত্র পার্টি, ঢাকা, ১৯৮৭
৪০. ঐ ১৯৮৭	:	রাজনৈতিক প্রস্তাব (চতুর্থ কংগ্রেস)
৪১. জ্ঞান চক্রবর্তী ১৯৮৭	:	ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ
৪২. অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ ১৯৮২	:	রুশ-ভারত-বাঙলাদেশ
৪৩. পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ১৯৮১	:	সভাপতি সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন (২য় খণ্ড) সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ
৪৪. মেজর জলিল ১৯৮০	:	মার্কসবাদ মুক্তির পথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৫. মোহাম্মদ ফরহাদ ১৯৮৭ : কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট

৪৬. আইয়ুব রেজা চৌধুরী ১৯৮৩ : বাংলাদেশের মার্কসবাদী আন্দোলন এবং একটি দৃষ্টিভঙ্গি

৪৭. দেবেন শিকদার ১৯৭৯ : উপমহাদেশের কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি (১ম খণ্ড)

৪৮. ঐ : মুক্তিযুদ্ধ

৪৯. আবদুল হক ১৯৭০ : ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

৫০. ঐ ১৯৭০ : আধা-ঔপনিবেশিক ও ভাষা-সামন্তবাদী

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবুল কাসেম সম্পাদিত ১৯৬৭ : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

২. বদরুদ্দীন উমর ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ : পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম এবং ২য় খণ্ড)

৩. ঐ ১৯৭২ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙলা দেশের কৃষক

৪. মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত ১৯৭৫ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙলা সমাজ

৫. Alamgir Kabir 1979 : Film in Bangladesh

৬. অলি আহাদ - : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫

৭. A.M.A. Muhit : Bangladesh : Emergence of a Nation

৮. মোহম্মদ হান্নান ১৯৮৪ : বাঙলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

৯. আব্দুল মতিন ১৯৭৮ : ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে

১০. Rounaq Jahan ১৯৭২ : Pakistan : Failur in National Integration

১১. A. K. Choudhury ১৯৮৪ : The Independence of East Bengal

১২. আবু জাফর মোস্তাফা সাদেক ১৯৮৭ : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন

১৩. রঞ্জন চৌধুরী ১৯৮৪ : কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি

১৪. Mohammad Ayub Khan. 1967 : Friend Not Masters

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫. Talukder Maniruzzaman Khan, 1967 : The Bangladesh Revolution and its Aftermath

১৬. আবুল মনসুর আহমদ ১৯৭০ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

১৭. Abul Hashim ১৯৭৪ : In Retrospection

১৮. Seela Sen – : Muslim Politics in Bengal 1937-1947

১৯. Kamruddin Ahmed ১৯৭৫ : A Socio-Political History of Bengal Lahore Resolution

২০. কামরুদ্দীন আহমদ ১৯৭৯ : বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী

২১. ঐ ১৩৮২ : বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ

২২. Hussainur Rahman ১৯৭৪ : Hindu-Muslim Relations in Bengal, ১৯০৫-১৯৪৭

২৩. আব্দুল হক ১৯৭৬ : ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব

২৪. সাঈদ-উর-রহমান ১৯৮৩ : পূর্ব বাঙলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা

২৫. ঐ ১৯৮৩ : পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন

২৬. আহমদ শরীফ ১৯৮৬ : বাঙলা ভাষা-সংস্কার আন্দোলন

২৭. আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৭৬ : একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন

২৮. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭ : বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

২৯. Rummana Ahmed : The Problem of Revisionism in the Development of Communist Movement in East Bengal 1948-71-Jan. June 1980. Asian Affairs Vol. 1. No. 1 Ed. by Emajuddin Ahmed, Study Group, Dhaka, PP. 120-39

৩০. সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৯৮৬ : ১৫ বর্ষ ২৪ ও ২৫ সংখ্যা ২১/২৮ নভেম্বর ১৯৮৬, ঢাকা [বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ২৪তম সংখ্যা ২১ নভেম্বর ১৯৮৬-আমজাদ হোসেন, পৃ. ১৯-৪১

২৫তম সংখ্যা, ২৮শে নভেম্বর ১৯৮৬ সন পৃ. ১৯-৩৫। [এ সংখ্যা থেকেই আমজাদ হোসেন রচিত বিভক্তির ও বিবর্তনের চার্ট বা সারণীটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উদ্ধৃত হল]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

পরিশিষ্ট - ৩

কমুনিস্ট জনাব আবদুল মতিনের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন

এই সংগ্রাম পরিষদের সামনে কর্মসূচী ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম কমিটির পূর্ব ঘোষিত [১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তৃতায় "কেবল মাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"—এই ধৃষ্টতামূলক উক্তির প্রতিবাদে ঢাকাসহ ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রধর্মঘট এবং মিছিলসহ শহর প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় গৃহীত প্রস্তাব।] ২১শে ফেব্রুয়ারীর দেশব্যাপী হরতাল এবং ঢাকা শহরে হরতাল, মিছিল ও পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপরিষদ ঘেরাও কর্মসূচী। যে 'সংগ্রাম পরিষদ' ২১শে ফেব্রুয়ারী রমনা এলাকায় সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিরোধিতা করে, ১৪৪ ধারার ভয়ে কম্পমান, সেই 'সংগ্রাম পরিষদ' যে হরতাল, মিছিল ও পরিষদ ভবন ঘেরাও দিবসকে বাধ্য হয়ে সমর্থনই করতে পারে কিন্তু ঐ রকম কর্মসূচী যে গ্রহণ করতে পারে না এ কথা বলাই বাহুল্য।

আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ফেডারেশন ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনে যে নেতৃত্ব ও 'গৌরবময়' ভূমিকার দাবী ও গর্ব করে, তা হল তাদের নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও তার ভূমিকা কখন কোন অবস্থায় এই সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল এবং তার কি মহান ও গৌরবময় ভূমিকা ছিল, তা তাদের আদর্শবাহী তত্ত্ববিদ ও ইতিহাস রচয়িতাদের লেখায় নয়, ২১শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী কয়েকটি অগ্নিঝরা দিনের বাস্তব ভূমিকার মধ্যেই তা সঠিক ও যথাযথভাবে পাওয়া সম্ভব। এইসব ঘটনা এবং তাতে তাদের ভূমিকা আরো প্রমাণ করে যে ১৯৭০-৭১ সালেই এবং তার পরবর্তী দুই দশকব্যাপী কেবল নয়, ১৯৫২ এবং তারও পূর্ব থেকে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ফেডারেশন আদর্শগতভাবে এক ও অভিন্ন।

'কমিউনিস্ট পার্টির' কোন ভূমিকা না থাকা, তার আওয়ামী লীগের নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি, তার মেরুদণ্ডহীনতা, তার আদর্শ বিবর্জিত কর্মকাণ্ড, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা এবং ১৯৬৬ সালে বিপ্লবী অংশের সেই 'পার্টি' থেকে বেরিয়ে আসা সব কিছুর মূলে রয়েছে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ফেডারেশনের আদর্শগত অভিন্নতা। এই আদর্শগত অভিন্নতার কারণে আজ তারা উভয়ে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং মুৎসুদ্দী ও আমলা-পুঁজিবাদের মহামিলনের পূতসমুদ্র আবগাহনে নীলকণ্ঠ মুৎসুদ্দী, আমলা, বুর্জোয়া।

হে ইতিহাস কথা কও
আর নহে নীরবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় নবাবপুর ছাত্রলীগ অফিসে ২১শে ফেব্রুয়ারীর হরতাল, মিছিল ও পরিষদ ভবন ঘেরাওর কর্মসূচী পালন সম্পর্কে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক চলাকালে ঘোষিত হল সরকারের রমনা এলাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশনামা।

তখন সংগ্রাম পরিষদের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল ১৪৪ ধারা প্রসঙ্গ। তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা কি না করা, এই নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক, আলি আহাদ এবং অপর দুইজন সদস্য ছাড়া সংগ্রাম পরিষদের আর সব সদস্য ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দিলেন। এর অর্থ— ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষিত কর্মসূচী বাতিল। কারণ? ১৪৪ ধারা! সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদই বটে। এ হল সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষপাতী অত্যন্ত সংখ্যালঘু অংশটির নিতান্ত নাছোড় বান্দা দাবী ও সংগ্রামের দরুন বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পরের দিন (২১শে ফেব্রুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় মত পেশ করার প্রস্তাব মেনে নিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই রকম একটা প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল এই ধারণা ও আশায় যে রমনা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারির সরকারী ঘোষণার কথা জেনে পরের দিন ছাত্ররা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হবে না, বা একান্ত যদি কিছু ছাত্র উপস্থিতও হয় তারা তাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার যুক্তি শুনলে তা মেনে নিয়ে হরতাল, মিছিল, পরিষদ ভবন ঘেরাওর কর্মসূচী করবে না। সংগ্রাম ও বিপ্লবে ভীত লোক ও শ্রেণীগুলি সব দেশে সর্বকালে এই রকমভাবেই চিন্তা করে। কিন্তু তাদের শত আশা ও সহস্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সংগ্রাম ও বিপ্লব এগিয়েই চলে।

সংখ্যালঘু অংশ যখন সেই রাতেই তৎকালীন প্রধান ছাত্রাবাসগুলিতে পরের দিন যথাসময়ে এবং প্রয়োজনবোধে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা বলছিল তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হচ্ছে না অর্থাৎ কিছুই হচ্ছে না—এই স্বপ্নের আবেগ সুখনিদ্রায় নিমগ্ন।

পরের দিন (২১শে ফেব্রুয়ারী) হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে সংখ্যালঘু যুক্তিতর্ক, বিপ্লবী সিদ্ধান্ত, দৃঢ়তা ও আবেদনের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব আওয়ামী লীগ সম্পাদক (আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলে) শামসুল হক প্রমুখদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার আবেদন ও যুক্তিতর্ক খড়কুটার মতো ভেসে গেল। সমবেত ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিলেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে গ্রেফতার করা সত্ত্বেও অবশিষ্ট হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা ৪ জন ৪ জন করে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল (বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে) প্রাঙ্গণে জামায়েত হতে থাকে। তারপর সেখান থেকে তাঁরা অগ্রসর হবেন পরিষদ ভবনের দিকে (বর্তমান জগন্নাথ হল এসেম্বলী ভবন)।

পথিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ ও বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে সমবেত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হল। গুরুতরভাবে আহতদের মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হতে লাগল। গুলিবর্ষণ ও তার ফলে ছাত্রহত্যার সংবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাবানলের মতো শহরে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে মানুষ মেডিক্যাল কলেজে ভীড় করতে লাগলেন।

এই সময় সাধারণ ছাত্র বা কোনো সচেতন অংশ থেকে প্রস্তাব আসে সংগ্রামপরিষদের তরফ থেকে পরের দিন (২২শে ফেব্রুয়ারী) হরতাল আহ্বান, লাশসহ মিছিল ও গায়েবী জানাজার কর্মসূচী দিয়ে একটা প্রচার পত্র বিলির। কিন্তু সংগ্রামপরিষদের আহ্বায়ক অস্বীকার করলেন উল্লেখিত প্রচার পত্রে স্বাক্ষর দিতে। তিনি বললেন, তিনি (অর্থাৎ সংগ্রামপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যার মধ্যে প্রধান আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ বা তাদের সমর্থক) ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের সঙ্গে, বা তাঁরা 'লুটকারীদের' সঙ্গে, 'কমিউনিস্টদের' সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখবেন না এবং তিনি তাদের কোনো প্রচার পত্রে স্বাক্ষর করবেন না।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে তার আহ্বায়কের স্বাক্ষর দিয়ে সেই প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। সেই রাতেই সে প্রচারপত্র ছাপা হয়ে ঢাকার মহল্লায় মহল্লায় বিলি হয়েছিল। এই সব তৎপরতায় কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ প্রচার পত্রের ভিত্তিতেই পরের দিন, অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী হরতাল পালিত হয়েছিল, মিছিল বের হয়েছিল, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর সেই গায়েবী জানাজা পড়াবার কর্মসূচী ছিল। যে কোনো কারণেই হোক তিনি সে-গায়েবী জানাজায় শরিক হন নাই। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের তরফ থেকে (তিনি তখন আওয়ামী লীগের সভাপতি) সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

২২শে ফেব্রুয়ারীর অভ্যুত্থানমূলক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের চেয়েও সেক্রেটারিয়েট কর্মচারী, সাধারণ চাকুরীজীবী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা অগ্রণী ছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী ছিল সাধারণ মানুষের বিপ্লব, এবং এ দেশে বিপ্লবের সূচনা (যে বিপ্লব এখনো সূচনাতেই)। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ এই মহান ভূমিকা কেবল ১৯৫২ সালেই নয়, ১৯৫৪ সালে, ১৯৬৮-৬৯ সালে, ১৯৭১ সালে, ১৯৭৫-১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ ৬-৭ নভেম্বর এবং ১৯৭১ ১-২ অক্টোবরে আরো বৃহত্তর ও রাজনৈতিকভাবে পালন করেছেন। ব্যর্থতার বা তাকে পরিণতির দিকে না নিয়ে যাওয়ার কারণ বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্ব। সকল ক্ষেত্রেই মার্কসবাদীদের ভূমিকা গৌণ। ২২শে ফেব্রুয়ারী হরতাল, মিছিল ও গায়েবী জানাজা না হলে ২১শে ফেব্রুয়ারী অন্যান্য দিবসের মতো একটা সাধারণ তথা তাৎপর্যহীন দিবসই হয়ে থাকত। কিন্তু ২২শে ফেব্রুয়ারী মিছিলের ওপর বারংবার গুলি চলার জন্য, বারংবার ১৪৪ ধারা, পুলিশ কর্ডন ও ব্যারিকেড ভঙ্গের জন্য জনগণের রুদ্ররোষে নূরুল আমিনের পত্রিকা 'দৈনিক সংবাদ' আক্রান্ত এবং সরকারি দৈনিক পত্রিকা 'মর্নিং নিউজ' ভস্মীভূত হওয়ার জন্য, এই সবের ফলে সরকার সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত ও পরাজিত হওয়ার জন্য এবং জনগণের সার্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের জন্য কেবল বাঙলা ভাষার দাবীই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ২১শে ফেব্রুয়ারী এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মহিমামণ্ডিত জাতীয় দিবসের মর্যাদাও অর্জন করেছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী জনগণের বিজয়ের এবং স্বৈরাচারী শাসকদের পরাজয়ের দিবস, যে-দিবস পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভারসাম্যই পাল্টিয়ে দিয়েছিল, যে ভারসাম্য আর কোন দিন ফিরে আসেনি, যে পরিবর্তিত বিশৃঙ্খল জোড়াতালি ভারসাম্যই হয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের পরবর্তী সকল কর্মকাণ্ডের কারণ ও ভিত্তি। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী আর কোনদিন ঐ দিবসে সংঘটিত রাজনৈতিক পরাজয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের এই দিবসে পরাজয়ের ক্ষত আর কোন দিন সারেনি, যে-ক্ষত তাদের পূর্ব পাকিস্তানে দাগী আসামীরূপে চিহ্নিত করে দিয়েছিল।

জনগণই যে ক্ষমতা ও শক্তির উৎস, তারাই যে রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি, যে শক্তির কাছে শাসকশ্রেণীগুলির শক্তির প্রধান কেন্দ্র তাদের রাষ্ট্র তার প্রধান উপাদান সশস্ত্র বাহিনীসহ অকেজো হয়ে যায়—তারা যে কাগুজে বাঘ এবং জনগণই প্রকৃত শক্তি, তা প্রতিপন্ন হয়েছিল ২২শে ফেব্রুয়ারী জনগণের বিজয়ের এবং শাসকশ্রেণীগুলির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ঐ দিনে জনগণের সংগঠিত শক্তির আঘাতে শাসকশ্রেণীগুলি এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র হতবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও অচল হয়ে গিয়েছিল। এটা শাসকগোষ্ঠীর ও তাদের রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক ও রণনৈতিক পরাজয় ছাড়া আর কি?

আমরা দেখেছি সর্বদলীয় সংগ্রামী পরিষদ কাদের নিয়ে, কি উদ্দেশ্যে কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভাষা আন্দোলনে তার কি ভূমিকা ছিল। মাত্র তিন সপ্তাহের অস্তিত্বের পর ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করে ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় অনুমোদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পূর্ব ঘোষিত ২১শে ফেব্রুয়ারী হরতাল, মিছিল ও পরিষদ ভবন ঘেরাও করার কর্মসূচী বাতিলের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলি ও হত্যার প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারী হরতাল, মিছিল ও গায়েবী জানাজার কর্মসূচী ঘোষিত প্রচারপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে এবং ঐ কর্মসূচীকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টায় অংশীদার না হয়ে ২৩শে, ২৪শে এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে সূচিত ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবের দিনগুলি জনগণের জন্য উৎসব হলেও সে দিনগুলি যেমন ছিল শাসকগোষ্ঠীর ও তাদের রাষ্ট্রের জন্য চরম বিপর্যয় ও পরাজয়ের এবং দুঃস্বপ্নের কয়েকটা দিন, তেমনি ২১শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী কয়েকটা দিন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জন্য ছিল চরম বিপর্যয়, বিচ্ছিন্নতা এবং রাজনৈতিক পরাজয়ের গ্লানির দুঃস্বপ্নময় কয়েকটা দিন।

ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস ও রায়! একটা ঘটনা ও তার বিকাশ দুই প্রান্তের বাহ্যত দুই রাজনীতির, কিন্তু মর্মবস্তুতে একই রাজনীতির, একই সঙ্গে সমভাবে চরম বিপর্যয় ও পরাজয়ের কারণ হয়েছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ একই রাজনীতির দুই প্রান্ত ছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর (সঠিকভাবে বলতে গেলে ২০শে ফেব্রুয়ারীর) পর থেকে ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে যে এরা একই রাজনীতির দুটো ভিন্ন রূপ, তথা প্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না।

এদের উভয়ের, অর্থাৎ একই বস্তুর দুইটি প্রান্তের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সূচিত পরবর্তী সংগ্রামমুখর বিপ্লবী দিনগুলির দ্রুত পরিসমাপ্তি ও অবসানের। এক প্রান্ত, অর্থাৎ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যা করতে পারছিল না, অপর প্রান্ত, তথ্য সংগ্রামপরিষদ সেই মহান দায়িত্ব পালন করলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ভাষা আন্দোলনের 'পরিসমাপ্তি' ঘোষণা করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

পরিশিষ্ট -৪

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক
রচিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন' থেকে উদ্ধৃত

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলে পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪। কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫। পূর্ববঙ্গকে লবণ-শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬। শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম-সংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২। শাসন-ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন-বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশী বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিতকরণঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫। বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬। যক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাঁহারা মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করিতে হইবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ে (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশ রক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌ-বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন-পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
নারায়ণ চৌধুরী
মনোরঞ্জন বিশ্বাস
মিহির আচার্য
আজহার উদ্দীন খান
ডক্টর প্রীতি মুখোপাধ্যায়
ডক্টর প্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ডক্টর প্রমথ রায় মণ্ডল প্রমুখ
কলকাতার সহ ও সমধর্মী ভাই-বন্ধু-স্বজনদের স্মরণ করছি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্যুলারিজম

ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি, কৌম ও গোত্রীয় মানুষকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সমবেত প্রয়াসে প্রতিকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করার স্থানিক ও কালিক প্রয়াস প্রসূন। মানুষের প্রয়োজনে সহযোগিতায় ও সহাবস্থানে যৌথ জীবন যাপন লক্ষ্যে সংহত-সহিষ্ণু সামাজিক জীবন গড়ে তোলার জন্যে এ এক টেকসই স্থায়ী বন্ধনসূত্র বিশেষ। এবং এ সূত্রের আমোঘ শক্তির উৎস হচ্ছে অভিন্ন অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ভয়-ভক্তি-ভরসা। আর সে কারণেই শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতির পালন-পোষণ-প্রয়োগ একান্তভাবেই সামাজিক—বরং কৃচিৎ ব্যক্তিক। যদিও ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, যদিও স্থান-কাল-সমাজ অভেদে মান্য, পাল্য ও প্রয়োজন কি-না এ নিয়ে বিস্তর বির্তক চলে এবং জ্ঞান যুক্তি-বুদ্ধি-মন-মননের শক্তি ভেদে সিদ্ধান্তেও লঘু-গুরু বৈচিত্র্য ও বিভ্রান্তি প্রকট হয়ে ওঠে, তবু ঐতিহাসিক, প্রায়োজনিক ও প্রায়োগিক গতিধারার পটে-প্রতিবেশে এবং একালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র নির্ভর সমাজে তার উপযোগের, লাভ-ক্ষতির বিচার-বিশ্লেষণ ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থেই আবশ্যিক।

যে-কালে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র আরণ্য-গোষ্ঠীদের আসমানী শক্তির ভয়-ভক্তি-ভরসার প্রয়োজন ও প্রভাব জানিয়ে বুঝিয়ে ও শুনিয়ে শাস্ত্র নির্ভর সংহত-সংযত জীবন গঠন ও সমাজ বন্ধন প্রয়োজন বা আবশ্যিক ছিল, সে-কালে বুনো-বর্বর সমাজে চালু থাকলেও সভ্য-ভব্য-প্রাগ্রসর সমাজে তা অপগত। এখন য়ুরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার ও লাতিন আমেরিকার কিংবা অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের সভ্য-শিক্ষিত-প্রগতিশীল সমাজে তা সমাজ-সংস্কৃতির ও মননের ক্ষেত্রে কেবলই বাধা, কেবলই পিছুটান এবং বিজ্ঞান-যন্ত্র-প্রযুক্তির সাক্ষ্য-বিরুদ্ধ, আবিষ্কারের তথ্য ও প্রকৌশলের বিস্তার বিরোধী।

আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশভূমি য়ূরোপ তার আধুনিক জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-মন-মনন-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশলের উন্মেষ-কালে ওই বাধা ও পিছুটান বাস্তবেই অনুভব করেছিল। প্রতাপে প্রবল ধর্মধ্বজী-শাস্ত্রপতি-সমাজসর্দার, যাজকদের ও শাহ-সামন্তদের হুকুম-হুঙ্কার-হুমকি-হামলারূপে পীড়ন-নির্যাতন দেহে-মনে অনুভব ও ভাব-চিন্তায় উপলব্ধি করেছিল। শাস্ত্রীর ও সমাজপতির শাসকের ও ধর্মধ্বজীর দেয়া বাধা-নির্যাতনই মুক্তবুদ্ধি প্রগতিবাদী বিজ্ঞানী-মনীষী-মনস্বীদের দ্রোহী করেছিল। এ দ্রোহীদের শ্লোগানের, অবলম্বিত উপায়ের, নির্বাচিত পন্থার আর গৃহীত আদর্শের নামই 'সেক্যুলারিজম'।

মানুষের অনুভব-উপলব্ধির জগতে এ সেক্যুলারিজমের উন্মেষ-বিকাশ-বিস্তার ঘটাতে য়ূরোপীয় জ্ঞানী-মনীষী-মনস্বীদের দীর্ঘকালের চিন্তা-চেতনার, প্রয়াস-প্ররোচনার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচার-প্রণোদনার প্রয়োজন হয়েছে। অবশেষে শাস্ত্র-সমাজ-রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে তাদের সেক্যুলারিজমের স্থানিক ও কালিক আবশ্যিকতা।

যদিও মূলে শাস্ত্রিক চর্যা-চর্চা, আচার-আচরণ, পালা-পার্বণ মাত্রই কম-বেশি আনুষ্ঠানিক ও সামাজিক এবং দেশ বিশেষে দৈশিক, রাষ্ট্র বিশেষে রাষ্ট্রিক, তবু বহু সম্প্রদায়, নানা জাতিসত্তা এবং বিভিন্ন শাস্ত্রিক জাত ও গোষ্ঠী অধ্যুষিত আধুনিক দেশে ও রাষ্ট্রে অধিজনের বা উনজনের শাস্ত্রিক-পালা-পার্বণ-সংঘাতের আর্থিক-রাজনীতিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শহরে-বন্দরে সহিষ্ণুতায় সম্প্রীতিতে সহযোগিতায় সহাবস্থানের স্থায়ী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সদুদ্দেশ্যে সেক্যুলারিজমবাদীরা শাস্ত্রের আদি উদ্দেশ্যের, লক্ষ্যের, তত্ত্বের ও তথ্যের তাৎপর্য জেনে-বুঝেও একালে নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ও বর্জনীয় বলে জানে ও মানে। তারা এ-ও জানে ভয়-বিস্ময়-ভরসাপুষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিরিক্ত আশৈশব কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কার লালিত অদৃশ্য অরি-মিত্রশক্তি আশ্রিত ভীরু মানুষ কখনো জ্ঞান-বোধি-যুক্তি প্রয়োগে নিরীশ্বর-নাস্তিক হবে না। তাই শাস্ত্রের অযৌক্তিকতা-অলীকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেই কেবল শাস্ত্রকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ও আচরণের বিষয় করে ঘরের ও অন্দরের সীমায় তার চর্যা ও চর্চা নিবদ্ধ রাখতে চায়। এজন্যেই সেক্যুলারিজমের সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা হচ্ছে : ধর্মের তথা শাস্ত্রের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অস্বীকৃতিই সেক্যুলারিজম। সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম সম্বন্ধে থাকবে সর্ব প্রকারের উদাসীন, শাস্ত্রাচার সম্বন্ধে সমাজ থাকবে নীরব নিষ্ক্রিয়, রাষ্ট্র থাকবে অজ্ঞ-উদাসীন। ঈদগাহ্ কিংবা কুম্ভমেলার ঘাট সরকারী ব্যয়ে নির্মাণ করা যাবে না, যাবে না মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-মঠ মেরামত করা, ঈদের কিংবা বিজয়ার বাণীও দেয়া যাবে না সরকারপ্রধানের। এরই নাম ধর্ম নিরপেক্ষতা।

ভারত একটি বিঘোষিত ও সাংবিধানিক সেক্যুলার রাষ্ট্র। কিন্তু মধ্যযুগীয় বিশ্বাস-সংস্কার পুষ্ট সাংবিধানিকরা জেনে-বুঝেই সেক্যুলারিজমের ব্যাখ্যায় গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়েছেন, দুকূল রক্ষার লক্ষ্যে। তাঁদের সেক্যুলারিজম হচ্ছে বাস্তবে সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শিতা। রাষ্ট্রান্তর্গত যে-কোন ধর্মের ধর্মীয় চর্যার-চর্চার নিরাপত্তা দান। ফলে শাস্ত্র ও শাস্ত্রাচার সরকারের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পায় মাত্র, সরকারের অস্বীকৃতির বা ঔদাসীন্যের আভাস মাত্র নেই। এ সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা সেক্যুলারিজম নয়, তাই অধিক হিন্দুদের তুষ্ট রাখার জন্যে উনজন মুসলিমদের গো-বধের অধিকার নির্দ্বিধায় হরণ করে তথাকথিত সেক্যুলার সরকার। সংবিধানে বিভিন্ন ধর্মের ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা রক্ষার সাংবিধানিক অঙ্গীকারই হিন্দুদের গোবধ নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানানোর অধিকার দিয়েছে। ভারত সরকারও অধিজনের দাবি পূরণে বাধ্য হয়েছে।

সেক্যুলারিজমের মর্মকথা হচ্ছে পার্থিব সর্ব বিষয়ে ঐহিকতাবাদ, ভারতে তা গুরুত্ব পায়নি, এমনকি স্বরূপে স্বীকৃতও নয়। ভারতের অনুসরণে-অনুকরণে বাঙলাদেশেও ধর্মনিরপেক্ষতা নয় কেবল, সংবিধানে নিরীশ্বরতা তথা সৃষ্টিকর্তার অনস্তিত্ব অঙ্গীকৃত ও স্বীকৃত হয়। তবু সম্ভবত ভারতের অনুকরণেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এখানেও সব ধর্মের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমানাধিকার এবং সরকারি সমদর্শিতার নীতিরূপে অপব্যাখ্যাত হয়। ফলে এখানেও উদ্দিষ্ট ফল মেলেনি সমাজ-সংস্কৃতির ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে, বরং আওয়ামী লীগের শাসনকালেই সরকার বাঙলাদেশকে মুসলিম অধিজন অধ্যুষিত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তানে 'মুসলিম সামিট' সম্মেলনে যোগ দেয় আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংবিধানিকভাবে অবৈধ জেনেও স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ঢাকার ধর্মশিক্ষালয় মাদ্রাসা আলিয়ায় গিয়ে কোটি টাকা সরকারি অনুদান অঙ্গীকার করেন।

এমনি স্বৈরাচারের কারণ ছিল। ১৯৭১-৭২ সনে মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালীদের এবং মুক্তি পরবর্তীকালে আওয়ামীলীগ সরকারকে রুশ-ভারতের অভিপ্রায়ে, মদদে, পরামর্শে ও নির্দেশে চলতে হয়েছে। সমাজতন্ত্রে আওয়ামী লীগের নেতা-উপনেতা কারুর কোন শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না, ছিল না মনে-মতলবেও কোন প্রবণতা। কিন্তু রাশিয়ার অভিপ্রায় ও নির্দেশ অনুসারী এবং রাশিয়ার মিত্রতানির্ভর ভারতের সম্মতিক্রমে মনে আস্তিক আওয়ামী লীগ নিরীশ্বর ও সমাজতান্ত্রিক সংবিধান তৈরী করতে বাধ্য হয়। কাজেই এর সঙ্গে আওয়ামী নেতাদেরও মনের, মতের ও মতলবের কোনই যোগ ছিল না। মুখে সমর্থন করলেও সায় ছিল না অন্তরের। তাছাড়া এ ছিল তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আস্থা ও স্বার্থ বিরুদ্ধ। তাই তারা তাদের ঐহিক-ব্যবহারিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে কখনো নিজেদের নিরীশ্বর ঐহিক ও সমাজবাদী বলে কোন লাক্ষণিক পরিচয় পরিব্যক্ত করতে পারেনি। না বললেও চলে, বরং তারা ছিল সাধারণভাবে দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী নিষ্ঠুর লুটেরা বলে গণত্রাস ও ঘৃণ্য। প্রমাণ—'শেখ মুজিব নিহত' সংবাদে জনগণ মুক্তির আনন্দ ও স্বস্তি অনুভব করেছিল এবং ক. সংসদের ২৯৯ জন সদস্য বেঁচেবর্তে থাকা সত্ত্বেও এবং খ. গোটা দেশের শহরে শিক্ষিত মাত্রই বাকশাল সদস্য হওয়া সত্ত্বেও গ. সর্বোপরি রক্ষীবাহিনী প্রবল থাকা সত্ত্বেও আর ঘ. সেনানী শাসকের সামরিক সরকারের অনুপস্থিতি ঙ. আওয়ামী লীগার মুস্তাক আহমদই রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগারেরা সকালে মন্ত্রিসভা আহ্বান না করে, বাকশালী জনগণ ক্ষোভ-ক্রোধ-শোক মিছিল বের না করে 'মুজিব কোট' খুলে আত্মগোপন করল, ভয় পেল। এতেই বোঝা গেল–তারা তাদের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন ছিল, আর মুজিবের প্রতিও ছিল না তাদের কোন মমতা। কেনেডী, জিয়া বা ইন্দিরা হত্যা যেমন সরকারে বিপর্যয় ঘাটায়নি, তেমনি এক নেতার এক দেশ বাঙলাদেশেও ২৯৯ জন সাংসদ যখন আওয়ামী লীগার, তখন মন্ত্রী মুস্তাকের অধীনে বা তাঁকে ভোটে সরিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার চালু রাখাই ছিল বাঞ্ছনীয়।

সংবিধান তৈরীর ক্ষেত্রেও জনগণকে আশ্বস্ত ও বিভ্রান্ত রাখার দুষ্টবুদ্ধি প্রকট ছিল আওয়ামী লীগের। কেননা সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই একবারে ও যুগপৎ রাষ্ট্রিক তথা দৈশিক জাতীয়তা, নিরীশ্বরতা বা রাষ্ট্রিক শাসনে-প্রশাসনে ধর্মের অস্বীকৃতি, তথা ধর্মনিরপেক্ষতা ও দলীয় গণতন্ত্র এর আবশ্যিক ভিত্তি ও অবিমোচ্য সুনিশ্চিত লক্ষণ বলে জানা ও মানা হয়। কুমীরের এক বাচ্চাকে চার করে দেখানোর মতোই আওয়ামী লীগের সাংবিধানিক চার নীতিও ছিল গণচমক লাগানোর অসদুদ্দেশ্য প্রসূত কিংবা অজ্ঞতার অভিব্যক্তিমাত্র। এবং বাস্তবে কোনটাই কোনদিন মানা হয়নি। দৈশিক বা রাষ্ট্রিয় জাতীয়তাও স্বীকৃত হয়নি। তাই বাঙালী জাতীয়তাই ছিল বিঘোষিত। প্রান্তিক আদিবাসীদের চাকমা, ত্রিপুরা, মার্মা, গারো, খাসিয়া, সাঁওতাল-রাজবংশীদের ভিন্ন জাতিসত্তা স্বীকৃত হলে আমাদের রাষ্ট্রিক জাতীয়তা হবে বাঙালাদেশী, আর অধিজন আমাদের সগর্ব গৌত্রিক পরিচয় থাকবে বাঙালী। রাষ্ট্রভাষাও থাকবে অধিজনের বাঙলা।

অননুভূত ও অনুপলব্ধ আরোপিত তত্ত্ব ও তথ্য আমরা তাৎক্ষণিক হুজুগে পড়ে গ্রহণ-বরণ করেছিলাম বলে আমরা একবার ভুল দ্বিজাতি তত্ত্ব ভিত্তিক পাকিস্তান বানিয়ে ভুল করে জানে-মালে-সংগ্রামে তার কাফ্‌ফারা দিয়েছি। এখন শুনি হুজুগে পড়ে পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক বাঙলাদেশ গড়াও ভুল হয়েছে বলে আফসোস করছে অনেক মুসলমান। এখন তারা বলছে পার্থিব-অপার্থিব সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে ধরে রাখা এবং মুসলমান থাকাতেই কেবল মুসলমানের কল্যাণ। তাই এখন তারা আগে মুসলমান, পরে বাঙলাদেশী বা বাঙালি। সেক্যুলার কখনোই নয়, সমাজবাদী তো নয়ই। তা হলে আমরা জাতি বা সম্প্রদায় হিসেবে না ভেবে, না বুঝে হুজুগে পড়ে বিগত বিয়াল্লিশ বছর ধরে বারবার বিড়ম্বনাকেই বরণ করেছি! এমনি প্রশ্ন এখন ব্যক্তিরও আত্মজিজ্ঞাসার এবং গোষ্ঠী-সন্দিৎসার অন্তর্গত।

স্বরূপে গণতন্ত্র হচ্ছে আঁধা-কানা-খোঁড়া, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, জাত-বর্ণ-ধর্ম-সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সব মানুষের রাষ্ট্রে সমান অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য আর জান-মালের নিশ্চয়তা নিরাপত্তা প্রভৃতির অঙ্গীকার, স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন। কাজেই একালে কেবল অধিজনের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির লক্ষণ-প্রচার ও প্রসার লক্ষ্যে রাষ্ট্রিক প্রয়াস মাত্রই অগণতান্ত্রিক, মৌল মানবিক অধিকার বিরুদ্ধ বলে অমানবিকও। রাষ্ট্রবাসী মাত্রেরই সমান নাগরিক অধিকার স্বীকৃত না হলেই কিছু মানুষ জিম্মি হয়ে যায়। জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষার কারণে উনজনদের স্বদেশে স্বস্থানে স্বঘরে স্বাধীনভাবে নিরাপদে স্বসম্পদে স্বপ্রতিষ্ঠ ভাবার পক্ষে যে-কোন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ব্যবহারিক বা মানসিকভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন তারা স্বদেশে-স্বঘরেই নিজেদের নির্জিত প্রবাসী ভেবে মানসিকভাবে হীনম্মন্যতায় ও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার অনিশ্চয়তায় ভোগে, আধিগ্রস্ত হয়, দেশপ্রেমী হওয়ায় ও দেশসেবায় উৎসাহ হারায়।

আমাদের দেশে এ মুহূর্তের সরকারী উচ্চারণে, কর্মে ও আচরণে মনে হয় এখানে কেবল মুসলিমরাই রয়েছে, অমুসলিমরা যেন আমাদের চিন্তা-চেতনায়ও অনুপস্থিত। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তার জন্যেই আমাদের সমাজতান্ত্রিক না হোক, সেক্যুলার হওয়া আবশ্যিক এবং নিতান্ত জরুরী।

আমরা যদি পার্থিব ব্যাপারে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক আচারে-আচরণে শাসনে-প্রশাসনে নির্বিশেষ চিন্তা-চেতনার ও সমদৃষ্টির অনুশীলন করি– রাষ্ট্রবাসী মাত্রকেই সমান নাগরিক বলে মনে-মননে, কর্মে-আচরণে গ্রহণ করি, তাহলে উনজনেরা স্বদেশে স্বস্থানে স্বঘরে স্বাধীনভাবে নিরাপদে স্ব-সম্পদে স্বপ্রতিষ্ঠ বলে জানবে ও মানবে। দেশের মাটি ও মানুষ তারও প্রিয়-প্রয়োজনীয় বলে অনুভব-উপলব্ধিগত হবে। যেহেতু সোয়া কোটি অমুসলিমের যাবার জায়গা পৃথিবীর কোথাও নেই, সেহেতু স্বদেশে হীনম্মন্যতারূপ আধির কারণ অপসৃত হলে, অধিজনের মতো জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সমদর্শিতা সুনিশ্চিত হলে ওরা প্রতিবেশী স্বধর্মীর প্রেরণায়-প্ররোচনায় কখনো আত্মদ্রোহী হয়ে আত্মহননের পন্থা অবলম্বন করবে না। স্বদেশে মাটিকে ও মানুষকেই আঁকড়ে থাকবে আপন ও আত্মীয় মেনে এবং নিজেদের স্বার্থেই তারা প্রাণের বিনিময়ে প্রতিরোধ করবে স্বধর্মী প্রতিবেশীর আক্রমণ। আমরা তিনদিকে ভারত পরিবেষ্টিত। এবং যেখানে 'কাফের রাজা বড়ই দুর্বার।' শ্রীলঙ্কায় যেমন, তেমনি স্বধর্মী-স্বগোত্র রক্ষার প্রয়োজনে ভারত বাঙালাদেশের উপর যে-কোন হুকুম-হুঙ্কার-হুমকি-হামলা চালাতে পারে। তা প্রতিরোধ করা ক্ষুদ্র দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সহজ হবে না।

প্রমাণ, একবার ভারত সরকারের প্রশ্রয়ে ও মদদে বাঙলাদেশের উত্তর সীমান্তে আবদুল কাদের সিদ্দিকী উপদ্রব শুরু করেছিলেন জিয়ার আমলে। জানে-মালে রোজ যে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছিল, তা সইবার শক্তি ছিল না আমাদের সরকারের। মোরারজি দেশাইর বদৌলত সে উপদ্রব প্রশমিত হয়। তুর্কী-মুঘল আমল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ আরণ্য উপজাতিরা আমাদের যোগাত কাঠ, বাঁশ, তুলা, গরু-ছাগল-হাতী এবং কিছু ফল-মূল। এদের সঙ্গে পাকিস্তান আমলেও ছিল সরকারের সম্প্রীতি। বাঙলাদেশ সরকার আকস্মিকভাবে এদিককার ভিন্ন রক্তের, গোত্রের, ধর্মের, ভাষার, রুচির ও সংস্কৃতির মানুষ নিয়ে এ আরণ্য গোষ্ঠীর নিরাপদ-নিরুপদ্রব শান্তি-স্বস্তি-সুখের জীবনে উপদ্রব ও সমস্যা সৃষ্টি করল, ওদের মাটিতে পাতের ভাতে ভাগী করে দিয়ে। অরণ্য শহর নয়, এখানে ওরা সর্বপ্রকার মানসিক আচারিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে নিজেদের প্রথা-পদ্ধতিতে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এ যে কেবল ওদের অর্থ-সম্পদে, বিত্ত-বেসাতে ভাগ বসানো তা নয়, গোষ্ঠী হিসেবেও যখন উনজন হবার আশঙ্কা বাস্তবরূপ নিচ্ছিল, সরকার ওদের আবেদন উপক্ষো করছিল, তখন ওরা প্রাণপণ সংগ্রামে হল অবতীর্ণ। আর ভারত দিল সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামীদের আশ্রয়। লড়াই এখনো চলছে, ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছে সামর্থ্যের অধিক।

যদি বাঙলাদেশ আন্তরিক ও কার্যকরভাবে সেক্যুলার হয়, তা হলে ভারত সরকার কোনদিন গণ-আন্দোলনের চাপে 'বঙ্গভূমি' দাবি করলেও নিজেদের স্বার্থেই এখানকার উনজনেরাই সর্বাগ্রে রুখে দাঁড়াবে। ওরাই হবে প্রবল প্রতিরোধ শক্তি এবং সে-অবস্থায় ভারত কখনো বাঙালাদেশের উপর হুকুম-হুমকি-হামলা চালাবার কোন অজুহাতই খুঁজে পাবে না। তাই আমাদের প্রতিরক্ষা কখনো হবে না বিপন্ন। কারুর মনে-স্বার্থে-সম্পদে আঘাত হানলে সে-লোক পর হয়ে যায়, বিপদকালে হয় শত্রু। অতএব শ্রেয়সের পথ অবলম্বন করাই জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বিবেচনার কাজ।

AMARBOI.COM

বিচ্ছিন্নতার ও সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব সম্বন্ধে বাঙলার ইতিহাসের কিছু তথ্যের সূত্রায়ণ

বাঙলার তথা ভারতের মুসলিমরা দুই শ্রেণীর—দেশজ ও বিদেশাগত। বিদেশাগতরা পশ্চিম ও মধ্যএশিয়া থেকে আগত—তারা শাসক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। দেশজ মুসলিমরা মুখ্যত অন্ত্যজ শ্রেণীর—স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নিম্ন বর্ণের, বর্গের ও বৃত্তির– সাধারণভাবে প্রজন্মক্রমে দরিদ্র ও নিরক্ষর হিন্দু থেকে দীক্ষিত।

উচ্চ বর্ণের ও বিত্তের লোক নৈতিক-সামাজিকভাবে বিপন্ন না হলে কিংবা ইহজাগতিক ক্ষেত্রে আত্মোন্নয়নে প্রলুব্ধ না হলে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে উত্তর, দক্ষিণ বা পূর্বভারতে ইসলাম বরণ করেনি। কেননা তাদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ ছিল এ যুগে কায়েমী স্বার্থবাজ সামন্ত-বুর্জোয়ার স্বেচ্ছায় কম্যুনিস্ট হওয়ার কিংবা শিল্পপতিদের শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয়ার মতো আত্মহনন মাত্র। প্রভু ও সেবিত বর্ণহিন্দুর পক্ষে মুসলিম হয়ে দৈবাদেশে প্রাপ্ত সেবাদাসদের সঙ্গে অভিন্ন হওয়া স্বেচ্ছায় আত্মবিনাশের সামিল। তাই ইসলাম ছিল তাদের স্বার্থের ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে ত্রাস স্বরূপ। এজন্যেই স্বাতন্ত্র্যরক্ষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতর্ক শাস্ত্রপতি ব্রাহ্মণের সঙ্গে স্বসংস্কৃতির সম্প্রসারণ প্রবণ শাসক যবনের [তুর্কী-মুঘল] মানস দ্বন্দ্ব গোটা মধ্যযুগেই থেকে গিয়েছিল। 'ব্রাহ্মণে [কেবল শাস্ত্রী] যবনে বাদ যুগে যুগে আছে'— এ উক্তির তাৎপর্য এ-ই।

দেশজ মুসলিমরাও প্রজন্মক্রমে ক্ষুদ্র পেশাজীবী ও চাষী ছিল বলে তাদের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না। তবু নতুন মুসলিম সমাজে কোন শাস্ত্রিক-সামাজিক বাধা ছিল না বলে কেউ কেউ পেশা পরিবর্তন করে স্থানীয়ভাবে অর্থে সম্পদে, প্রভাবে-প্রতাপে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সমাজে স্ব ও সু প্রতিষ্ঠ হত। এদের মধ্যে থেকেই মোল্লা-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-মুনসী-কাজী-খোন্দকার-আকুঞ্জি-আখন্দ-উকিল-কাজী হত, আমিন ফৌজদারও হয়েছে কেউ কেউ। দেশজ মুসলিমরা এর উপরের কিছু হয়েছে বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। ভৌমিক [ভূঁইয়া], হালদার, তালুকদার, তরফদার, মজুমদারও হয়েছে সম্ভবত মুর্শিদ কুলি খানের আমলেই [১৭১২ – ২৭]। শিক্ষিতদের জন্যে এ যুগের মতো এত বিভিন্ন প্রকার চাকরী ছিল না বলে লেখাপড়ায় সামাজিক উৎসাহ ছিল না। তাই সাক্ষর শিক্ষিত লোক নিম্ন বর্ণের ও বর্গের হিন্দুর মধ্যে যেমন লাখেও একজন ছিল না, তেমিন মুসলিমদের মধ্যেও ছিল বিরলতায় দুর্লভ।

কাজেই এদের মধ্যে আরবী-ফারসী-বাঙলা বিদ্যার চর্চাও ছিল না। অতএব স্বাধীনতা হারানোর ক্ষোভে-বেদনায় দিশেহারা দেশজ মুসলিমও ব্রিটিশবিদ্বেষ বশেই যে ইরেজী শিক্ষা বর্জন করেছিল বলে মিথ চালু রয়েছে, তার মূলে কোন সত্য নেই। বরং মুর্শিদাবাদে যারা রাজ্য-রাজত্ব হারিয়েছিল, সে উর্দুওয়ালা শাসকগোষ্ঠী কোম্পানী সরকারের কাছে আবেদন করে কোলকাতায় মাদ্রাসার মতোই মুর্শিদাবাদে ১৮২৪ সনেই [ইংরেজীকে রাষ্ট্র ভাষা করার কথা কখনো ওঠেনি] ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়েছিল। প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর সমাজ ও শ্রেণীভুক্ত উর্দুভাষী 'রইস'-রা গোড়া থেকেই হিন্দুদের মতোই ইংরেজী শিখছিল।

তেরো শতকের উষাকালেই বাঙলায় তুর্কী শাসন শুরু হয় বটে, কিন্তু তখনই গাঁয়েগঞ্জে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। প্রমাণে অনুমানে বলা যায় [এবং এ আন্দাজ অসঙ্গত নয়] তেরো শতকে কোন কোন গাঁয়ে ও গঞ্জে দরবেশ প্রচারকরা খানকায় অবস্থান নিয়ে দু'চারজনকে দীক্ষিত করে। চৌদ্দ শতকে দীক্ষিতের সংখ্যা দ্বিগুণ হয় এবং পনেরো শতকে গাঁয়ে গাঁয়ে শতকরা পাঁচজনে, ষোল শতকে শতকরা দশজনে, সতেরো শতকে পনেরো জনে, আঠারো শতকে পঁচিশ জনে এবং উনিশ শতকে শতকরা ত্রিশ জনে বৃদ্ধি পায়। [১৮৭১ সনে মুসলিম সংখ্যা প্রায় ৩২%] ষোল শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবোত্তর কালে ইসলামের প্রসার রুদ্ধ হয়ে যায়, সম্ভবত প্রচারও যায় থেমে এবং গাঁয়ে গাঁয়ে দীক্ষিত মুসলিমরা ছিল নিম্ন বর্ণের, বর্গের ও বিত্তের, এক কথায় দরিদ্র, নিরক্ষর, ক্ষুদে পেশাজীবী ও চাষী। এসব পেশাজীবীর তালিকা মেলে মুকুন্দরামের-ভারতচন্দ্রের কাব্যে।

অতএব ইংরেজ আমলে দেশজ মুসলিমরা [শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্থিক-সামাজিক কোন সম্পর্কই ছিল না বলেই] অর্থ-বিত্ত-বিদ্যাক্ষেত্রে কিছুই হারায়নি আলাদাভাবে। বেণে ইংরেজের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি-পদ্ধতির ফলে দেশী বেণে-বৃত্তিজীবীরা সবাই নানাভাবে বঞ্চিত ও পর্যুদস্ত হয়েছিল মাত্র। আর মদদে মাশ-আয়মা-ওয়াক্ফ প্রভৃতি মুখ্যত শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই ছিল সীমিত, ব্যতিক্রম ছিল কৃচিৎ এবং বিরলতায় নগণ্য ও দুর্লক্ষ্য। কাজেই মুঘল রাজত্বের অবসানে দেশজ মুসলমানের সর্বনাশ হয়নি, ক্ষতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল শাসকগোষ্ঠীর। আয়মা-মদদে মাশ-ওয়াক্ফ মামলা শেষ হয় ১৮৪৬ সনে আর ইংরেজী সামষ্টিক সামগ্রিক ও সামূহিকভাবে চালু হয় ১৮৪৪ সন থেকে সরকারী আদেশে এবং প্রাশাসনিক ও বিদ্যাবিতরণের ভাষা হিসেবে ইংরেজী পূর্ণতা পায় ১৮৬০ সনের দিকে। এ সময়ে দেশজ মুসলিমরা ইংরেজী শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েনি, বরং সত্য এই যে কখনো তারা শিক্ষা গ্রহণেও এগিয়ে আসেনি ঐতিহ্যগত রেওয়াজ ও আগ্রহ ছিল না বলেই। লেখাপড়াই করে না যারা, তারা ইংরেজী শিখবে কি? অতএব মোটামুটিভাবে ১৮৫০ সন থেকে প্রশাসনের ভাষারূপে ইংরেজী চালু হওয়ার কাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ কাল অবধি ইংরেজী না-জানার দরুন দেশজ মুসলিমরা আয়-উন্নতির তথা অর্থোপার্জনের নতুন বিবর্তমান পন্থাগুলো-ওকালতি-চাকরী-ব্যবসা-বাণিজ্য-কারখানাদারি, ঠিকেদারি-আড়তদারি-দালালি-ঘুষ প্রভৃতি থেকে দূরে থাকায় দরিদ্র ও নিরক্ষর থেকে যায়। তারা যে কেবল ইংরেজী শেখেনি তা নয়, লেখাপড়ার ঐতিহ্য ছিল না বলে আরবী-বাঙলা-ফারসীও পড়েনি। কাজেই আয়-উন্নতির তথা অর্থোপার্জনের উপায় ছিল না বলেই এ সময়ে তাদের পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূ-সম্পত্তি কমেছে, ভূমিহীন হয়েছে অনেকে। ফলে তারা দরিদ্রতর হয়েছে ক্রমে। এ তাৎপর্যে তারা বিধর্মী শোষিত নয়, বিধর্মীরাও স্বেচ্ছায় সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিমশোষণে হয়নি আগ্রহী। এ হচ্ছে স্থানিক ও কালিক আর্থ-সামাজিক নীতি-নিয়মের ও রীতি-পদ্ধতির পারিবেশিক ও আবস্থানিক পরিণাম, সুতরাং হিন্দুরা শোষক এবং মুসলিমরা শোষিত বঞ্চিত–তত্ত্ব হিসেবে এ মানা যাবে না। কারণ বর্ণ হিন্দুরা ছাড়া সাধারণভাবে সব বাঙালীই হয়েছিল এ দারিদ্র্যের ও দুর্ভোগের শিকার।

মানতেই হবে গোড়া থেকেই কিছু বামুনকে শাস্ত্রী, সম্পদশালী কিছু মানুষকে গাঁয়ে গাঁয়ে সমাজপতি থাকতেই হয়েছে, কিছু বৈদ্যকে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করতেই হয়েছে এবং কিছু কায়স্থকে জমির মাপ-ঝোঁক, মাটির কড়াকালি, টাকা কড়ির হিসেব জানতে বুঝতে হয়েছে, বেচা-কেনা, বিবাদ-বিনিময়, সুদ-কর-খাজনা প্রভৃতি বৈষয়িক, প্রাশাসনিক ও সরকারী প্রয়োজনে। এবং কিছু লড়িয়ে মল্লও রাখতে-পুষতে হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে। আরণ্য বা সমতলের স্থায়ী গ্রামীণ সমাজের জন্যে এ ব্যবস্থা অবশ্যই আবশ্যিক ছিল বলে মানতে হয়। তাহলে তুর্কী-মুঘল শাসনের পূর্ব থেকেই গাঁয়ে গাঁয়ে নগণ্য সংখ্যায় হলেও বর্ণহিন্দুদের একটা মধ্যশ্রেণী অবশ্যই ছিল, এরা ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে কালের মাপে সাক্ষর-শিক্ষিত সংস্কৃতিমান মধ্যশ্রেণী, এরাই নিয়ন্ত্রণ করত গাঁয়ের শাস্ত্রিক, নৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবন শাস্ত্রী-সমাজপতি-ধনীমানী মাতব্বর-মহাজন-পঞ্চায়েত-শিক্ষক-টাউট-দোকানাদার-আড়তদাররূপে। আজকাল ঐতিহাসিকরা সপ্রমাণ স্বীকার করেন যে তুর্কী-মুঘল আমলে গাঁ-গঞ্জ প্রায় সর্বক্ষেত্রে হিন্দুর সামাজিক-আর্থিক প্রাশাসনিক নিয়ন্ত্রণেই ছিল।

তুর্কী-মুঘল আমলেও গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিমরা সাধরণভাবে অজ্ঞ নিরক্ষর হওয়ায় এবং প্রাজন্মক্রমিক ক্ষুদ্র পেশায় নিযুক্ত থাকায় বাঞ্ছিত মাত্রায় তাদের আর্থিক শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক বিকাশ বা উন্নতি না হওয়ায় এবং সংখ্যায়ও তারা সাধারণভাবে গাঁয়ে গাঁয়ে উনিশ শতক অবধি উনজন থাকায় তারা ছিল গ্রামে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বার্থে বর্ণহিন্দু নিয়ন্ত্রিত। ব্যতিক্রম ছিল বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। দেশজ গ্রামীণ মুসলিমদের মধ্যে বর্ণহিন্দুর তুলনায় ধনী-মানী-প্রভাব-প্রতাপের মুসলিম ছিল করগণ্য। এর সাক্ষ্য প্রমাণ এখনো মুছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়নি। ইংরেজ আমলে বর্ণ হিন্দু সমাজে বিদ্যা ও বিত্ত অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল— আর্থ-সামজিক ও শৈক্ষিক-বৈষয়িক জীবন য়ুরোপীয় প্রভাবে ও আদলে বিবর্তিত হচ্ছিল বলেই। অতএব মধ্যযুগে কোন সময়েই কোন দিক দিয়েই হিন্দুরা সচেতন ও সক্রিয়ভাবে দেশজ মুসলিমের আকস্মিক দারিদ্র্যের, দুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের কারণ হয়নি। ব্রিটিশ আমলে অবশ্য-প্রত্যক্ষভাবে আপাত ও প্রাতিভাসিক নিমিত্ত ছিল মাত্র উনিশ শতকের শেষার্ধ ব্যাপী ইংরেজ আশ্রিত ও ইংরেজী শিক্ষাপুষ্ট বিদ্যা-বিত্তধারী ও চাকরী-ব্যবসাজীবী হিন্দুরা।

আস্তিক মানুষ তথা শাস্ত্রমানা মানুষ মাত্রই স্বধর্মকে সত্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানে ও মানে। সেজন্যে প্রত্যেক আস্তিক মানুষ ভিন্ন ধর্মকে ভুল বা মিথ্যা বলে জানে, অবজ্ঞেয় ও পরিহাস্য বলেও ভাবে। বাঙলায় তথা ভারতেও হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানের মধ্যেই নয় শুধু, স্বধর্মীর বৃহৎ কাঠামোর মধ্যেও বিভিন্ন উপমত, সম্প্রদায় এবং আচারও তেমনি অবজ্ঞা-উপহাস পায় ভিন্ন মতের ও আচারে দলের কাছে। কিন্তু এ কারণে গাঁয়ে গাঁয়ে হিন্দু-মুসলিমে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষের কারণ ঘটেনি কখনো, আজো ঘটে না। একেতো দেশজ মুসলিমরা ছিল গাঁয়ে উনজন, তাছাড়া তুর্কী-মুঘল শাসকরাও কখনো আর্থ-সামাজিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে ছিল না তাদের সহায়-সম্বল-আত্মীয়। তাই গাঁয়ে হিন্দু-মুসলিমে দাঙ্গা বাধেনি কখনো। আর তুর্কী-মুঘল আমলে শহরে-বন্দরে ওরাই ছিল শাসক, হিন্দুরা ছিল শাসিত। হিন্দু-মনে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি দুঃশাসনের ও বঞ্চনার, অন্যায়ের ও অবিচারের ক্ষোভ থাকলেও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দ্রোহ করার শক্তি-সাহস ছিল না বলে নীরবে সহ্যই করতে হয়েছে। কাজেই শহরে-বন্দরেও দাঙ্গা বাধেনি কখনো। অতএব, মধ্যযুগে তুর্কী-মুঘল শাসনে গাঁয়ে বা শহরে হিন্দু-মুসলিমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধেনি কখনো।

কোম্পানী আমল থেকেই ভেদনীতি প্রয়োগে ব্রিটিশ শাসন পাকা-পোক্ত ও নিরাপদ-নিরুপদ্রব করার সুপরিকল্পিত লক্ষ্যে ভারতবাসীকে শাসক-প্রশাসক ও ইতিহাস লেখকরা ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক পরিচিতিতে বিভক্ত ও চিহ্নিত তথা অভিহিত করতে থাকে। এর আগে দৈশিক-গৌত্রিক নামেই হত মানুষ চিহ্নিত ও পরিচিত: যেমন পার্শী, গ্রীক, শক, কুষাণ-হূণ-তুর্কী-মুঘল-পর্তুগীজ-দিনেমার-ওলন্দাজ-ফিরিঙ্গি-ইংরেজ-রুশ-মদনী, খোরাসানী, নিশাপুরী-সমরখন্দী-বুখারী, বদখশানী, বাঙ্গালী, দেহলভী, এলাহাবাদী, গোরখপুরী-নেপালী প্রভৃতি কিংবা উজবক, বররক, খালজি, তুঘলক, বলবন, লোদী, সৈয়দ প্রভৃতি গৌত্রিক নামে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার লোকেরা ভারতবাসীকে চিহ্নিত করত হিন্দুইভী বা হিন্দুস্থানী নামে ।[মূলে সিন্ধু>হিন্দু>হিন্দ]

সতেরো শতক অবধি বাঙলা-মৈথিলী সাহিত্যেও দেখি এ অর্থেই তুরস্ক, মুঘল, হিন্দুস্তানী সমরখন্দী প্রভৃতি আদি ও অবিকৃত অভিধায় ব্যবহৃত। 'হিন্দু ধর্ম বা মতবাদই ছিল পরিচিত। সতেরো শতকে মারাঠা হিসেবে অমুসলিম অবৌদ্ধ অখ্রীস্টানকে 'হিন্দু'— এ সর্বভারতীয় পরিচয়ে চিহ্নিত করা হত না। মারাঠারা স্থানীয় গোত্র অর্থে হিন্দ্‌বাসী হিন্দু নামেই সম্ভবত আখ্যাত হয়।

ইংরেজরাই সাম্রাজ্যিক স্বার্থে বিশেষ উদ্দেশ্যে তুর্কী-মুঘল শাসককে 'মুসলিম' নামে অভিহিত করে। ভারতীয় মুসলিম মাত্রই যে হিন্দুর শাসক, হিন্দুর শোষক ও হিন্দুর পীড়ক এবং হিন্দুর শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির বিনাশক, তা লিখিতভাবে গ্যাজেটিয়ার, স্থানিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিবৃত্ত, প্রাশাসনিক নানা বৃত্তান্ত ও রাজকাহিনী মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষিত মাত্রকেই তথা ভারতবাসীকে নানা প্রসঙ্গে বিচিত্রভাবে অসংখ্য রচনা মাধ্যমে এক-দেড়-দু'শ বছর ধরে জানিয়ে বুঝিয়ে ছিল। সত্য পড়ল চাপা। শাসিতগণের পক্ষে—ক্রোধ-উত্তেজনাকর, প্রতিশোধের প্রণোদনাকর, রঙচড়ানো কিস্‌সা-কাহিনী প্রচার করা হল সত্য, তথ্য ও ইতিহাসরূপে। এভাবে দেশজ মুসলিমরাও জানল, বুঝল ও মানল যে তারাও তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি ও বাদশাহ্‌র জ্ঞাত। কাজেই তাদেরও ছিল ধনদৌলত। ব্রিটিশের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে হিন্দু চাকুরে, ব্যবসাদার, জমিদার, মহাজনেরাই হরণ করেছে তাদের অর্থ-সম্পদ বিচিত্র পথে শোষণের মাধ্যমে। কাজেই বর্ণ হিন্দুরা হল তাদের জানি-দুশমন। কালিক পরিবেশও ছিল অনুকূল। ইংরেজী ভাষা মাধ্যমে প্রতীচ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহুমুখী হওয়া সত্ত্বেও, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প-সাহিত্যকে ছাপিয়ে যা আমাদের শিক্ষিত মনে প্রবল প্রভাব রাখল, তা হল দেশ ও জাতি চেতনা। য়ুরোপে এক ধর্মাবলম্বী হওয়াতে সেখানকার মানুষের মধ্যে দেশ ও জাতি চেতনায় সহজেই হতে পেরেছিল সংহত ও সংঘবদ্ধ। বহুধর্মাবলম্বীর ভারতে তা সহজ ও সরল মনে হল না। কোন গাঁ-অঞ্চল-প্রদেশ কোন একক ধর্মবিশ্বাসীর নয়, ভাষাও বহু এবং বিচিত্র। ফলে বাঙলায় তথা ভারতে দৈশিক, ভাষিক এমনকি পরিণামে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাও মনন-গ্রাহ্য হল না। তাই উনিশ শতক থেকেই হিন্দু, মুসলিম শিক্ষিত হয়ে হয়েছে দেশকালহীন মুসলিম-বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বে ও ঐক্যে আস্থাবান। সবাই হল স্বধর্মীয় স্বাজাত্যবোধে স্বস্থ। কেউ বাঙালী বা ভারতীয় থাকেনি, মুখে যা-ই বলুক, অন্তরে বিশ্বাসে হয়েছিল হিন্দু কিংবা মুসলিম। কংগ্রেস ত্রিশ বছরের [১৯১৫-৪৬] আন্তরিক চেষ্টায়ও ধর্মমত নিরপেক্ষ দৈশিক জাতীয়তা লোকগ্রাহ্য জনস্বীকৃত করাতে পারেনি। ব্রিটিশ ভারতের বিখণ্ডন তারই ফল। দুষ্টবুদ্ধি ব্রিটিশ ভেদনীতি সুফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিল, যে বিষ নগরে-বন্দরে, স্কুলে-কলেজে সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছিল, তা আজো রয়েছে অবিলুপ্ত, বরং এখনো বদমতলবী রাজনীতিকরা তা সযত্নে সুতীক্ষ্ণ ও সুতীব্র করছে। বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তি, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার এবং দাঙ্গার [বাস্তবে হত্যার] অবিরলতা তাই সর্বত্র প্রকট। [আমার এ বিষয়ক অনেক প্রবন্ধে তথ্য প্রমাণ দেয়া রয়েছে বলে এ প্রবন্ধ পাদটীকা কণ্টকিত করা হল না।]

দেশের শিক্ষাতত্ত্বের সূত্রায়ণ্

যা শেখে বা শেখানো হয়, তা-ই শিক্ষা। যা জানা বা জানানো হয়, তা-ই জ্ঞান বা বিদ্যা।

শিখলেই তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, তেমন কোন নীতি-নিয়ম রীতি-রেওয়াজ সিদ্ধ নয়। মানার কোন দায়িত্ব বর্তায় না।

অতএব শিক্ষা কুশলী করে, নৈপুণ্য বাড়ায়, জ্ঞান বা বিদ্যা-বুদ্ধি বাড়ায়, প্রসার ঘটায় চেতনার, অর্থাৎ বিদ্যা জ্ঞান বৃদ্ধি করে, চরিত্র গড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ আমরা বিদ্যার ও জ্ঞানের সঙ্গে উন্নত, দৃঢ় ও আদর্শ চরিত্রের ও বিবেকের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সম্পর্ক চিরকালই কল্পনা করে প্রত্যাশা পুষে চিরকাল প্রতারিত হচ্ছি।

শৈশবে বাল্যে ছেলেমেয়ের রুচি-সংস্কৃতি, আদব-কায়দা, স্বাদ-সাধ, আচার-আচরণ প্রভৃতির কাঠামো গড়ে ওঠে পরিবারের সদস্যদের পরিব্যক্ত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ এবং আর্থিক, সামাজিক, শৈক্ষিক অবস্থার ও অবস্থানের প্রভাবে। তার সঙ্গে বাল্যে-কৈশোরে যুক্ত হয় পাড়ার লোকের আচার-আচরণ ও মত-পথের পছন্দসই প্রভাব। শিক্ষার্থীদের উপর বাল্যে-কৈশোরে মানসপ্রবণতা অনুসারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্র-শিক্ষকের ছেলেমেয়েরা অনুকরণে আগ্রহী, তখন শেখার, আত্মস্থ করার ওইটিই একমাত্র উপায়। যৌবনে যেমন দেহ-মনের গঠন স্থিতি পায়, বাড় বন্ধ হয়, তেমনি ওই বয়স থেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার ও অপরের সমকক্ষতার আগ্রহচালিত হয় বলে তরুণ বয়সে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস, উদ্যম-উদ্যোগ সম্বন্ধে এক প্রকারের আত্মপ্রত্যয় জাগে। তখন আত্মপ্রসার কাম্য হয় বলে পরের অনুকরণ অনুসরণের স্পৃহা কমে। তখন সবটাই স্ব-স্বাতন্ত্র্যের ও স্বসত্তার তথা নিজের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি বলেই জানিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার সচেতন প্রয়াস চলে।

কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নীতি-উপদেশ দেয়ার সুযোগ কিংবা অবকাশ মেলে না। সেখানে ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ বা বিশ্লেষণ মাধ্যমে বিদ্যা বিতরণ ও গ্রহণই কেবল চলে। তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের তখন পুরো নারী বা পুরুষ বলে কেউ হিতাকাঙ্ক্ষা বশে নীতিকথা বলতে বা সৎপরামর্শ উপযাচক হয়ে দিতে এলে তাকে অপমানিত করার নামান্তর বলেই মনে হয়। অতএব, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' বলে, কিংবা রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বিরত থেকে ভবিষ্যতে তাঁদের মতোই যোগ্য নাগরিক ও রাজনীতিক হতে উপদেশ দিয়ে নিজেদের অজ্ঞতার মূর্খতার পরিচয়ই দেন না কেবল, অনধিকার চর্চাও করেন।

মাটি ও মানুষপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনা, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি আধুনিক জন-মননের প্রসূন, জীবন-চেতনার অভিব্যক্তি। এ আমাদের নয়—প্রতীচ্য বিদ্যার দান। নিরক্ষর মানুষআকীর্ণ তৃতীয় বিশ্বে কিছু উকিল-ডাক্তার-ঠিকাদার-সওদাগর এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছাড়া রাজনীতিক নেতা ও কর্মী হওয়ার মতো শিক্ষিত বেকার মেলে না। তাই তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্যে, দাবি আদায়ের ও পীড়ন মুক্তির সংগ্রামের জন্যে, সভা-মিছিল-আন্দোলনের জন্যে ছাত্রকর্মী ও ছাত্রসমর্থক এ মুহূর্তেও আবশ্যিক। কাজেই ছাত্রদের যারা রাজনীতি এড়াতে বা ছাড়তে বলে তারা হয় মূর্খ, নয়তো দুষ্টবুদ্ধি দুর্জন।

শিক্ষার্থীদের রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়তে পরামর্শ দেন কেবল সমকালীন সরকারি দল নিরুপদ্রবে রাজত্ব করার জন্যেই। অন্য রাজনীতিক দলগুলো ছাত্রদের থেকেই চেলা, সমর্থক ও লড়িয়ে মস্তান যোগাড় করে। লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমলের এক কথায় অতীতের সব রাজনীতিক, আর্থ-সামাজিক, ভাষিক, প্রাশাসনিক, কর-খাজনা, আইন-অধ্যাদেশ বিষয়ক প্রতিকারে-প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, প্রতিশোধে কিংবা যে-কোন ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনে, মিছিলে, সভায়, সংগ্রামে-দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে-সংঘাতে ছাত্রদের সক্রিয় সমর্থনে সহযোগিতায় এবং ছাত্রদের প্রাণদানের, রক্ত ঝরানোর বিনিময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফল্যের তারিফ ও গর্ব করে উচ্চকণ্ঠে ও অকুণ্ঠচিত্তে সবাই। কেবল স্ব রাজত্বকালেই সরকারি লোকেরা ছাত্র নিন্দায় ও ছাত্রনির্যাতনে সদা উৎসুক। অন্য রাজনীতিক দলগুলোও বিরুদ্ধ দলের ছাত্র নিন্দায় থাকে মুখর। এ হচ্ছে নীতিবিরহী রাজনীতিক দুষ্টোমি।

কৈশোরে ও উদ্ভিন্ন যৌবনে কাঁচা মন-বুদ্ধি আবেগ-উচ্ছ্বাস বশে ছেলেমেয়েরা যে-কোন হিতচেতনায় ও আদর্শের প্রণোদনায় দেশ-জাতি-সমাজ ক্ষেত্রে পরার্থে কিছু একটা করতে আগ্রহী হয়। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা আকীর্ণ এদেশে রাজনীতি ব্যতীত সম্পদ, সময় ও শ্রম ব্যয় না করে আর কিই বা করা যায়! ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে স্বাধীনতার স্পৃহা ও শোষণমুক্তির গরজ ছাত্রদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবর্তনা দিত। তাই তারা ছিল স্বেচ্ছা-সংগ্রামী আদর্শনিষ্ঠ ও লক্ষ্যনির্দিষ্ট কর্মী। সেজন্যে ছাত্রদলে বেচা-কেনা ছিল না, এখন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বুর্জোয়া রাজনীতির একটি মাত্র লক্ষ্য– রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। কাজেই এখানে কোন আদর্শিক প্রেরণা নেই, আছে কেবল দখলের লোভ ও লড়াই। তাই এখন দলগঠনের জন্যে চেলা সমর্থক ও মস্তান লড়াকু সংগ্রহ করতে হয় অর্থের বিনিময়ে, সর্বপ্রকার নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে এবং ভাবী বৃত্তি-বেসাত-অর্থ-সম্পদের লিপ্সা জাগিয়ে। এ প্রয়োজন প্রায় সব রাজনীতিক দলের। তাই গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, পাড়ায়-মহল্লায় সর্বত্র মস্তানের উদ্ভব, সংখ্যাবৃদ্ধি ও বেপরওয়া স্বৈর ও স্বেচ্ছাচার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা দেশের নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এখন তাদের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার শিকার। গাঁয়ে সর্দার, মাতব্বর, কাউন্সিল সদস্য-চেয়ারম্যান থানা-সালিশ-পঞ্চায়েত সবাই এর নীরব নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা। জনগণ-শঙ্কিত-ত্রস্ত দর্শক। তাই প্রকাশ্যে জনবহুল গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে খুন-জখম-ছিনতাই হলেও কেউ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে না। সাক্ষীও মেলে না কোথাও। তাই মনে হয় মস্তানেরা সবাই নিষ্ক্রিয় সরকারপোষ্য। জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র চলছে আরণ্য নীতিনিয়মে-রীতি রেওয়াজে।

কেবল কম্যুনিস্টরা বা বামপন্থীরাই জানে যে স্বদেশী-স্বধর্মী-স্বভাষী-স্বজাতি শাসনেই গণমানব স্বাধীন হয় না, হয় না শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা মুক্ত। সার্বিক ও সর্বাত্মকভাবে সমাজ পরিবর্তন আবশ্যিক-শোষণমুক্ত করে গণমানবকে স্বদেশে স্বঘরে স্বাধীনভাবে স্বও সু প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। গণসংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলে ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি ছাত্রদল দেশের শিক্ষাঙ্গনে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতে জড়িত থাকে না। বুর্জোয়া দলগুলোর ছাত্র সমর্থকরা স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-হলে-হস্টেলে এমনি অপ্রতিরোধ্য মারামারি হানাহানি করতেই থাকবে। কারণ দলগুলোর দায়িত্ব-কর্তব্য এই। দলগুলোর কাছে শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আবেদন মাত্রই তাই সরকারি বেসরকারি লোক ভোলানোর রাজনীতিক কাপট্য মাত্র। এর মধ্যে শিক্ষানীতির বা পাঠ্য বইয়ের কোনই ভূমিকা নেই। শিক্ষকদেরও নেই কিছু করার। ছাত্রদলগুলোকে গড়ে ও নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতিক দলগুলো। কাজেই রাজনীতিক দলগুলো কোন সমঝোতায় এসে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বন্ধ করতে চাইলেই কেবল মুহূর্তে তা থেমে যাবে। স্বস্তি-শান্তি-শৃঙ্খলা-সহাবস্থান ফিরে আসবে বিদ্যালয়ে ও ছাত্রাবাসে।

গোটা দুনিয়ায় এমন দিন-কাল-যুগ ছিল সুদীর্ঘ সময় ধরে, যখন জ্ঞান-অর্জনের জন্যে, বুদ্ধির বিস্তারের জন্যে, হিতাহিত বোঝার জন্যে, কোন অজ্ঞতা ঘোচানোর জন্যে কোন বইপত্র ছিল না। সেকালে কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন সূক্ষ্মবুদ্ধির চালাক-চতুর ধূর্ত মানুষ অজ্ঞ-অসহায় ব্যক্তির ও যূথবদ্ধ মানুষের জগৎ ও জীবন এবং জীব-উদ্ভিদ-নিসর্গ সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানাবিষয়ক জিজ্ঞাসা, সন্ধিৎসা, কৌতূহল, আর ভয়-ভরসার আনুমানিক উত্তর যুগিয়ে বলবুদ্ধি দিয়ে সমাজের সবাইকে করত অনুগত। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অতুল্য। তারাই অলৌকিক শক্তিধর গুরু ওস্তাদ রূপে ছিল পূজ্য ও ভক্তিভাজন। তারাই ছিল গোড়ায় লোকশিক্ষক গুরু-পুরোহিত। তারা সহজে কাউকে অনুগৃহীত করত না, শিষ্যকে অনুগত ও অনুরক্ত রাখার দুষ্টবুদ্ধি বশে। দীর্ঘকাল পায়রবি করে তাদের কৃপা পেত কেউ কেউ। এ জন্যেই তারা পরমপূজ্য। এ সেদিন অবধি আমাদের দেশে বিদ্যাগুপ্তি ও মন্ত্রগুপ্তি চালু ছিল, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এমনি বহুকাল ধরে ব্যর্থ পদসেবা করে করেই অবশেষে ওস্তাদের কৃপা পেয়ে সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। আগে শিক্ষণীয় বা জ্ঞাতব্য ছিল সৃষ্টি-স্রষ্টা, ইহ-পরলোকে প্রসৃত জগৎ ও জীবন রহস্যবিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যার ও মন্ত্রজ্ঞানের সেকাল বহুকাল আগেই অপগত। কিন্তু গুরু-ওস্তাদ-শিক্ষকের সে সুপ্রাচীন মূল্য, মর্যাদা ও পূজাস্পদতা ও ভক্তি প্রাপ্যতা আজো লোকসংস্কারে রয়েছে অবিকৃত, অটুট ও অম্লান। এখন বিদ্যালয়ে মর্ত্য মানবকে শেখানো হয় সব পেশা বা জীবিকা সম্পৃক্ত কেজো অর্থকর সব পার্থিব বিদ্যাই।

সে-বিদ্যা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-সমাজ-অর্থ-চিকিৎসা-প্রকৌশল-বাণিজ্য বিজ্ঞাপন, দোকানদারী-সওদাগরী গার্হস্থ্যনীতি-টাইপশিক্ষা অবধি বিচিত্রভাবে বিস্তৃত। এখন ব্রহ্মবিদ্যা বা মন্ত্রজ্ঞান কেউ কেনে বেচে না। বিদ্যালয় মাত্রই অর্থকর বিদ্যাবিক্রয়ের বিপণী মাত্র। আর শিক্ষকরা হচ্ছেন বিদ্যাবিপণীর সেলসম্যান বা বেতনভুক বিক্রেতামাত্র। এখানে দান-গ্রহণ নেই। ক্রেতা বিদ্যার্থীরা বাপের কাঁচা পয়সায় পড়ে। বিদ্যার্থীদের কোন বিষয় জানিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় পান না শিক্ষক। কিন্তু পয়সা পেলে গৃহশিক্ষক হন নিঃসঙ্কোচে। বিদ্যার্থী বেআদবি করলে তাকে পরীক্ষায় প্রাপ্য নম্বর দেন না, চাটুকার ছাত্র ও প্রিয় ছাত্রীকে বেশি নম্বর দিয়ে কৃতজ্ঞ করেন, আত্মীয় বিদ্যার্থীকে কৃপা করেন। এখানেই শেষ নয়, লড়াকু ছাত্র লেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েও বাসা দখল করেন, উচ্চতর পদে আসীন হন। আর সাধারণভাবে বিদ্যার্থীদের ব্যবসায়ী অভিভাবকদের থেকে সস্তা দামে চাল-ডাল-ইট-সিমেন্ট-কাঠ-লোহা-ফ্যান-ফ্রিজ-রেডিয়ো-টেলিভিশন কেনেন, বইও ছাপেন। পদস্থ চাকুরে অভিভাবকের কৃপা নেন প্রয়োজনে। এমন শিক্ষকও অনেকতায় বহু।

কাজেই এখনকার যুগে বিদ্যালয়গুলোকে গুরু-শিষ্যের, ওস্তাদ-সাগরেদের মঠ-আখড়া-খানকার মতো পবিত্র কিছু ভাবা বাঞ্ছনীয় নয়। বাস্তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে বিদ্যাবিপণীর বিক্রেতা-ক্রেতারূপে মেনে নিলে, অর্থ মূল্যে বিদ্যা বিক্রয় ও ক্রয় অন্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মতো নির্বিঘ্নে চলতে পারে। শিক্ষকের থাকবে না পিতার বা গুরুর মান পাওয়ার দাবি, শিক্ষার্থীর থাকবে না শ্রদ্ধা-ভক্তি করার দায়িত্ব। ব্যক্তিগত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-সৌজন্য গুণে কোন শিক্ষক শ্রদ্ধেয় হলে অবশ্যই তা পাবেন, পদাধিকার বলে নয়। শিক্ষার, বিদ্যার, জ্ঞানের গুরু-উস্তাদের প্রাচীন পবিত্রতার ও গুরুত্বের সংস্কার পরিহার করলে অন্য নানা পেশা শেখা-শেখানোর, দেয়া-নেয়ার, চাহিদা-সরবরাহের নীতি-নিয়মে প্রতিষ্ঠানের মতো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে তুললে শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার মতো আবদার এবং হলে-হস্টেলে সস্তা খাবার ও অন্য নানা সুবিধে পাবার জন্যে দাবি করবে না। ফলে শিক্ষকতা ছাড়া অন্য সর্বপ্রকার দায়বদ্ধতা থেকে রেহাই পাবে কর্তৃপক্ষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাক্ষেত্রে এখন অশিক্ষা-অজ্ঞানতা এবং নকলে পাশের নৈরাজ্য চলছে। তার কারণ ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত নীতি-নিয়মে পরবর্তী কালে সরকারের ও শিক্ষকদের অবহেলা, ঔদাসীন্য, রীতি ও রেওয়াজ বর্জন প্রভৃতি।

আগে বার্ষিক পরীক্ষায় নিম্নতম হারে পাশ নম্বর না পেলে, শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তরণ সম্ভব হত না, আটকানো হত। ওই শ্রেণীতেই আর এক বছর পড়তে হত, অথবা বিদ্যালয় ছাড়তে হত। এখন প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী অবধি অবাধে উত্তরণ ঘটে, বেতন পরিশোধই একমাত্র শর্ত। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের যেন কোন দায়িত্ব নেই। অর্থোপার্জন লক্ষ্যে কেবল নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বলা হয়, যেহেতু তুমি বা তোমরা ইংরেজী-অঙ্কে কাঁচা, তোমাদের হিতার্থে খোলা কোচিং ক্লাসে এখন থেকে ভর্তি হয়ে যাও—টাকা লাগবে কয়েক'শ।

আগের মতো টেস্ট পরীক্ষায়ও আটকানো হয় না। detain disallow প্রভৃতি শব্দ আজকাল প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি কোথাও আর চালু নেই। নিয়মিত লেখাপড়া না করেই পরীক্ষায় বসে অধিকাংশ শিক্ষার্থী। কাজেই নকলই তাদের সম্বল ও পাশের উপায়। এখন তাই শহুরে উচ্চবিত্তের সন্তানেই বিদ্যা সীমিত। ব্যক্তিক্রম এত বিরল যে উল্লেখ্য নয়।

লেখাপড়ায় পাকা করানো নয়, অভিভাবকের পক্ষে কেবল পাশ করানোর তীব্র আগ্রহ আর্থ-সামাজিক কারণেই জেগেছে। বাঁচার তাগিদ অপ্রতিরোধ্য। গৃহস্থ ঘরের একটা নারী গণিকা হয় কেন, কখন এবং কিভাবে? তেমনি একজন ব্যক্তি বা পরিবার যখন শ্রম ও যোগ্যতা দিয়ে প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ বা অর্জন করতে পারে না, উৎপাদিত বা নির্মিত পণ্য দিয়ে বাঞ্ছিত ও ন্যায্য মূল্য পায় না, জীবিকা ও জীবনযাত্রা অবাধ হয় না, বাচাঁ ও প্রিয়জনকে বাচানো কোন প্রকারেই নির্বিঘ্ন থাকে না, চাওয়ার ও পাওয়ার চাহিদায় ও সরবরাহে সমতা বিনষ্ট হয়, রপ্তানী ও আমদানীও হারায় আনুপাতিকতা, তখন মুদ্রাস্ফীতিও জনজীবন দুর্বহ করে তোলে। অভাবেই দূর্নীতির জন্ম, দূর্নীতি নতুনতর দুর্নীতির পথ করে দেয়। ফলে দুর্নীতির পথ-পদ্ধতি অভাবিত ও বিচিত্রভাবে বিকশিত বিস্তৃত এবং বহু ও বিবিধ হয়েছে। দুর্নীতি রেওয়াজে পরিণত হলে অপ্রয়োজনেও দুর্নীতি মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তখন শাসক প্রশাসক-সরকার নয় কেবল, দোকানী কারখানী সবাই হয় ভেজালদার দুর্নীতিবাজ, এ মুহূর্তে আমরা এর শিকার। ঘুষ দিয়ে দুবাই যাওয়ার মতোই একবার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশের সনদ তথা সার্টিফিকেট হস্তগত করতে পারলেই পি.টি.টি. স্কুল হয়ে অর্থ দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানে চাকরী কেনা কঠিন নয়। এ কারণেই পরীক্ষার্থীর আত্মীয় পরিজন মাত্রেরই নকল সরবরাহে এ আগ্রহ, নকল সমর্থনে এ উৎসাহ। বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে-অন্তত গুজব রটে। বাঁচার- আত্মপ্রতিষ্ঠার ফিকিরের ফকিরে এখন দেশ আকীর্ণ। ন্যায়-নীতি-আদর্শের অবলুপ্তি ঘটেছে এদেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকেই। তাই সরলতা এখন বিদ্যা নয়, বাঁচার জন্যে বিত্তই প্রয়োজন। যে-অর্থসম্পদ লভ্য কেবল পাশের সার্টিফিকেটের বা সনদের জোরেই, নকল সে সনদ পাইয়ে দেয়। তাই নকলের এমন আদর, কদর ও অসীম গুরুত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগের মতো প্রথম শ্রেণী থেকে নয়, কারণ এ যুগের স্বীকৃতি অনুসারে দশ বছর বয়সের মধ্যে পাঁচবছুরে বিদ্যালয় জীবনে বালক-বালিকার জন্মগত অধিকার রয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই বার্ষিক পরীক্ষায় নিম্নতম হারের নম্বর না পেলে শিক্ষার্থীকে আগের মতোই আটকাতে তথা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তরণ রোধ করতে হবে। দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী টেস্ট পরীক্ষায় বাঞ্ছিত নিম্নতম হারে নম্বর না পেলে detain বা disallow করতে হবে। অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে, এবং কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঞ্ছিত সংখ্যায় শ্রেণীতে অনুপস্থিতির দরুন চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে শিক্ষার্থী। কঠোরভাবে নকল প্রতিরোধ করতে হবে। এমনি সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যার্জন হবে অকৃত্রিম। শিক্ষার মান হবে আবার খাঁটি ও উঁচু।

বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র

এক সময়ে বলা হয়েছিল বিদেশী তাড়াও, সুখ আসবে, বিদেশী ব্রিটিশ বিতাড়িত হল, সুখ এল না। তারপর বলা হয় বিধর্মী হঠাও সুখ আসবে, বিধর্মীরা নিজেরাই পালাল, ছেড়ে গেল বিত্তবেসাত, তবু সমৃদ্ধি এল না। তারপরে বলা হল বিভাষী বিতাড়িত কর, অর্থ-সম্পদে দেশ ভরে উঠবে, তাদেরও তাড়ানো হল, তবু আজো সম্পদ গণমানবের অনায়ত্ত, সুখ আজো স্বপ্নের কোঠায়।

আমরা আজো সাধারণভাবে দেশ বলতে, জাতি বলতে, মানুষ বলতে, সচ্ছল সাধারণ শহুরে মানুষকে বুঝি। এখনো দেশের অর্থসম্পদ শহর থেকে গ্রাম অবধি, রাষ্ট্রপতি থেকে গ্রাম্য মাতবর-কাউন্সিল সদস্য অবধি Power Elite নামের ব্যক্তি সূত্রে বাঁধা। কাজেই গণমানব কখনো কোন ক্ষেত্রেই গণ্য হয়নি। কেবল সুপ্রাচীন কাল থেকে গুরুত্ব পেয়েছিল দাস-ভৃত্য ও তুচ্ছ পেশাজীবী রূপে আবশ্যিক গার্হস্থ্য ও সামাজিক প্রাণী হিসেবে।

বুর্জোয়া যুগে সামন্ত-শক্তি বিলোপ লক্ষ্যে ওদের ভোটাধিকার দিয়ে বুর্জোয়ারা ওদের মনুষ্যত্বের নয়, মাথা গুনতি গুরুত্বদান করেছে রাষ্ট্র ও প্রাশাসনিক ক্ষমতায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে, আজ অবধি আমাদের দেশে তারা সে অবস্থাতেই রয়েছে। যদিও বলতে গেলে বিগত বিয়াল্লিশ বছরে রাষ্ট্রশক্তি হাতবদল হয়েছে তিনবার।

সাক্ষর বা শিক্ষিত হয়ে এদের থেকেই গড়ে ওঠে মধ্যশ্রেণী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বিদ্যায়-বিত্তে মানে-মর্যাদায় খ্যাতিতে ক্ষমতায়। ওই ধরনের ভুঁইফোঁড়েরাও স্বেচ্ছায় সযত্ন প্রয়াসেই জ্ঞাতিত্ব-আত্মীয়তা ভোলে। এ কয় বছরে রক্তের পরিচিতির, আর্থিক অবস্থানের ও সংস্কৃতির নৈকট্য দুস্তর ব্যবধানে পরিণত হয়েছে। নইলে ১৯৪৭ সনে আমাদের মধ্যে শিক্ষিতের ও ধনীর সংখ্যা ছিল নগণ্য, আমরা গণমানব দরদী হলে তখনই তেভাগা দাবি, টঙ্কপ্রথা বিলোপ প্রভৃতি আন্দোলনে সফল হতে পারতাম, সরকারি বাধা টিকত না। কেননা সংসদ সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন অনতিপূর্বের গৃহস্থ সন্তান। ১৯৫৩ সনে জমিদারী উচ্ছেদের পরেও আমরা উদ্যোগী হলে এবং সমাজবাদীরা বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যায় থাকলে সমাজবাদ তখনো অঙ্গীকার করা ও তার ক্রমবাস্তবায়ন সম্ভব হত। আর বলতে গেলে ১৯৭২ সনের আগে লাখপতি কোটিপতি বাঙালী ছিল মাত্র করগণ্য। শেখ মুজিবতো সে-সুযোগে 'বাকশাল' কার্যত না হলেও নামতো ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সে-শিক্ষা কিংবা সে-দীক্ষা আওয়ামী লীগের কারো ছিল না বলে, তা বাস্তবরূপ পেত না। তার প্রমাণ এই আওয়ামী লীগ সদস্যরা কিংবা জিয়া ও এরশাদ সেবীরা। সর্বজনীন সাক্ষরতার ব্যবস্থা যদি হত ১৯৪৭ সন থেকেই, তাহলে গাঁয়ে চাষী-মজুরও পত্র-পত্রিকা-বুলেটিন-বিজ্ঞাপন-ইস্তাহারের মাধ্যমে শহুরে শিক্ষিতের চিন্তা-চেতনার প্রভাব অনুভব করত, তারাও হত জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে কম-বেশি জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিতে যোগ্যতর, হত স্বার্থ ও শত্রুসচেতন, উদ্যোগী হত আত্মোন্নয়নে। সরকার ও রাজনীতিক দলগুলো এ মুহূর্তেও ওদের অজ্ঞ অনক্ষর রাখতে সদাসযত্ন। ওরা চক্ষুষ্মান হলে তারা ছল-চাতুরী প্রয়োগে শাসক-শোষক থাকতে পারবে না। আমাদের পণ্য উৎপাদন-নির্মাণ, আমাদের আমদানী-রপ্তানী, আমাদের শিল্প-বাণিজ্যনীতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিয়ন্ত্রিত, আমাদের সম্পদ সৃষ্টি ও উন্নয়ন পরিকল্পনাও ঋণ-দান দাতা বিদেশীর নির্দেশ ও অনুমোদন সাপেক্ষ। আমরা চির মুৎসুদ্দী সরকার শাসিত। তাই আমাদের চাষী মজুরের জীবন-জীবিকার বিকল্প চিররুদ্ধ। তার উপর ব্রিটিশ আমল থেকেই গ্রামে ও গ্রামের হাটে সীমিত লোকজীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত Pastoral Economy-র দেয়াল ভেঙে প্রবেশ করল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তরঙ্গ। শুরু হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-পুঁজির হামলা।

তখন থেকেই ক্রমবর্ধমান সেই তরঙ্গাভিঘাতে, সেই হামলায় গ্রাম বাঙলার চাষী-মজুর আর্থিকভাবে হচ্ছিল কাহিল, পর্যুদস্ত ও দরিদ্রতর। অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতিরূপ পাগলা ঘোড়ার পদাঘাতে চাষী-মজুরের আর্থিক জীবন আকস্মিকতায় অনিশ্চিত। কৃষক সমিতিগুলো বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে যত আগ্রহী তত উদ্যোগী নয় তাদের দুঃখমোচনের আন্দোলনে।

ভিক্ষাজীবীর ও দিনমজুরের অবসরের নামান্তর হচ্ছে সপরিবারে উপবাস, তাই তারা নয়, বরং ভূমিনির্ভর অনন্যোপায় অসচ্ছল মানুষই জীবনে ঋদ্ধির স্বপ্নরিক্ত ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে নিরুদ্যম জীবনে বাস্তব হতাশার গ্লানি ভুলবার জন্যে আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে ও আল্লাহর সেবায় আত্মনিয়োগ করে জীবনে স্বস্তি খুঁজছে। চল্লিশোত্তর বয়সের এ ধরনের মানুষের ভীড় দেখা যায় কাকরাইলের মসজিদ কেন্দ্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে, এরা আসে বাঙলাদেশের সব অঞ্চল থেকেই, এরাই ভীড় জমায় টঙ্গীর বার্ষিক ইস্তেমায়। স্বপ্নশূন্য আশাহীন নিরানন্দ কোটি জীবনের কি অপচয়, কি করুণ ব্যর্থতা! আল্লাহ-নির্ভর, কোরআন-হাদিসের অনুগত আত্মপ্রত্যয়হীন একশ্রেণীর শাস্ত্রবিদ ও ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে কোরআন হাদিস নির্দেশিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে একালেও মানুষের ব্যক্তিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের কোন সঙ্কট সমস্যা থাকবে না। কেননা, কোরআন হাদিস হচ্ছে একটা সর্বকালিক, সর্বস্থানিক, সর্বমানবিক জীবনব্যবস্থা। এরা মানব প্রকৃতি ও প্রগতি স্বীকার করে না, দেশ কাল মানুষের বিকাশ-বিবর্তন ধারায়ও গুরুত্ব দেয় না, উপলব্ধি করে না এ যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রজগতের মানুষের আন্তর্জাতিক নির্ভরতা ও বৈশ্বিক জীবন। তারা সাড়ে তেরোশ বছর আগেকার Pastoral Economy ব্যবস্থার জাকাত-ফিৎরাই আজো নিঃস্ব প্রতিবেশীর অনাহার প্রতিরোধে সমর্থ বলে মানে। ভাবে না যে কয়েক লক্ষ ধনীর দানে কোটি কোটি লোকের সাংবাৎসরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারিদ্র্য, নিঃস্বতা কিংবা অনাহার ঘুচতে পারে না। অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অবাস্তব বলেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিমুখ এ মত ও পথ আজকের রাষ্ট্রে ও সমাজে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা মেটাতে কিংবা নানা সঙ্কট-সমস্যার-সমাধান দিতে পারে না-পারবে না। তবু একদল আদর্শবান কোরআন-হাদিসমানা আল্লাহ-নির্ভর এবং মানবশক্তিতে আস্থাহীন মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে ও আদি ইসলামের রাষ্ট্রিক ও প্রাশাসনিক রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। জামায়াতে ইসলামী দল এদেরই। এদের অন্যরা 'মৌলবাদী' অভিধায় চিহ্নিত করে। লোকে বলে কম্যুনিজম ঠেকানো লক্ষ্যে বহির্শক্তি এদের মদদ ও মুদ্রা যোগায়। আর যারা ইসলাম বেচে খায়, তারা ধর্মধ্বজী এবং কেবল ভোটশিকারী। অন্য বুর্জোয়া তথা দক্ষিণপন্থী দলগুলো নির্বাচন মাধ্যমে কিংবা সেনানী নায়কের সহযোগী রূপে রাষ্ট্র-ক্ষমতা আয়ত্তকরণ লক্ষ্যে রাজনীতি করে। তাদের জনসেবাসূচীতে থাকে প্রশাসন ও জনহিতকর কাজ। নানা ক্ষেত্রে জনগণকে করহ্রাস প্রভৃতি নানা সুবিধাদান, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জনগণের অর্থসম্পদ বৃদ্ধির উপায় সন্ধান প্রভৃতির আশ্বাসদান।

গুরুদায়িত্ব থাকে কেবল বামপন্থীদের। কেননা তথাকথিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে স্বদেশী স্বজাতি মুৎসুদ্দী সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে হয় জান-মালের, সুখ-স্বস্তির বিনিময়ে। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার প্রায় সব রাষ্ট্রগুলোর মতো আমরা আরো বহুকাল থাকব ক্যু-নায়ক সেনানীশাসকের হুকুম-হুমকি-হামলার শিকার হয়ে। কৃচিৎ কয় মাসের জন্যে মাঝে মাঝে থাকব অসামরিক মুৎসুদ্দী নেতার নিয়ন্ত্রণে। গাঁয়ের লোক শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা সচেতন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

রাজনীতি সচেতন ও জনসেবায় আগ্রহী ছাত্ররাই আগের দিনে কংগ্রেস, লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্রশাখা বা ফ্রন্ট হিসেবে ছাত্রদল গঠন করত। এভাবেই ১৯৫৮ সন অবধি তখনকার পূর্ববাঙলায় বা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদলগুলো বিভিন্ন মতবাদী দল হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। গভর্নর আজম খানই প্রথম ঢাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় আলাপ-পরিচয় করেন তাদের লাট ভবনে ডেকে নিয়ে। তারপরে মোনেম খান গভর্নর হলেন। তিনি N. S. F. (National Students Federation) দলের ছাত্রদের সরকারপোষ্য, সরকারসমর্থক চাকুধারী মাস্লম্যান রূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্রাস গুণ্ডামির শুরু। Evil begets evil. তারপর থেকে ছাত্রদলের ধান্দাবাজ দাঙ্গাবাজ ছাত্রের সংখ্যা বাড়ে। ১৯৭২ সনের পর থেকে প্রায় প্রতিটি রাজনীতিক দলই তাদের ছাত্রফ্রন্টে খুনে-ধান্দাবাজ সংগ্রহ করতে থাকে। তখন থেকেই অর্থের বিনিময়েই– রাজনীতিক কোন আদর্শ বলে নয়, বিভিন্ন দললগ্ন ছাত্র ও যুব ফ্রন্ট গঠিত হতে থাকে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যেমন C. P. B.-র অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টি অব বাঙলাদেশের অনুগত ছাত্র ইউনিয়ন আজো আগের মতো রাজনীতিক আদর্শের অনুগত রাজনীতি সচেতন ছাত্রদল। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের মতো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) ছাত্রদলও ছিল গোড়াতে রাজনীতিক মতাদর্শ নিষ্ঠ। জিয়াউর রহমান-এরশাদের আমলে ছাত্রদলগুলো দাঙ্গাপ্রিয় হত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে মাসলম্যান-মস্তান নেতৃত্বে এবং ভারতের যুবকংগ্রেসের অনুকরণে এখানেও মস্তান পরিচালিত যুবদল গঠন করা হল, এরা কার্যত দল-অনুগত সেনাবাহিনী এবং ভাড়াটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণ্ডাদল। আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় কেবল, পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে গুণ্ডা-মাস্তান দল। অদৃশ্য শক্তির প্রশ্রয় পেয়ে এবং আশ্রয়ে থেকে এরা এখন পাড়ার লোকের জান-মাল বিপন্ন এবং স্বস্তি-সুখ বিনষ্ট করেছে। নানা অছিলায় চাঁদা নামে অর্থ আদায় করছে, তা ছাড়াও কিশোরী তরুণীর ইজ্জতের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ার লোক এখন একাধারে ও যুগপৎ হুকুম-হুমকির ও অনুকম্পার পাত্র-পাত্রী। গোড়ায় সরকারই বিপুল অর্থের বিনিময়ে সরকার সমর্থক ছাত্রদল গঠন করে মোনেম-জিয়া-এরশাদ আমলে। দলনেতারা সানুচর সে অর্থ মদে-মেয়েমানুষে সিনেমায় রেঁস্তরায় ব্যয় করে। রাজনীতিক আন্দোলন-উত্তেজনা-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ না থাকলে বৃত্তি-ভাতা-ভাড়া কমে যায়। এখন নেশাসক্ত নেতা-মস্তানের সহচর অনুচর চেলারা রাস্তায় নামে রাহাজানি-হরণ-লুট-হ্যাইজ্যাক-চাঁদা প্রভৃতি কাজে। সারাদেশে নৈরাজ্য ও ত্রাসের রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছে এভাবেই। অগণতান্ত্রিক ও সামরিক একনায়কত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই তথা সরকারই এ মস্তানতন্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবে এবং মাৎস্যন্যায় ও আরণ্য অবস্থার জন্য দায়ী এবং পরোক্ষে দায়ী অভিন্ন পন্থায় প্রতিরোধ প্রয়াসী বিরোধী দলগুলো। রাজনীতিকদের শহুরে আন্দোলন স্তব্ধ বা প্রতিরোধ লক্ষ্যে গণধিকৃত সরকার যা লঘু কূটব্যবস্থা হিসেবে চালু করেছিল, তা আজ গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে সর্বত্র ব্যক্তিজীবন বিপন্ন, সামাজিক জীবন বিকৃত, সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাধিগ্রস্ত, রাষ্ট্রিক জীবন বিপর্যস্ত এবং মননজীবন করেছে বন্ধ্যা। গ্রামের ও শহরের শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারদের করবে লুটে-হরণে-হননে প্রলুব্ধ। এ গণদারিদ্র্য দুষ্ট অনুন্নত দেশের পক্ষে এ সরকারী দুর্নীতি-দুঃশাসনের পরিণাম হবে মারাত্মক। কেননা এ নৈতিক আদর্শিক ও প্রশাসনিক অবক্ষয় ঘটাবে জাতীয় আত্মার গুণে-মানে মাপে-মাত্রায়, ঘটবে মানবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দীর্ঘকালীন অপমৃত্যু। অতএব জাতীয় সত্তার ও স্বার্থের অপূরণীয় ক্ষতি হবার আগেই সরকারের ও রাজনীতিকদের এ পথ পরিহার করা আবশ্যিক। এ সূত্রে এও উল্লেখ্য যে গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর মুরব্বীর তথা অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। যে-কোন কারো আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামরিক শক্তি নিয়ে যে-কোন রাষ্ট্রে। সম্প্রতি ভারতও সে ভূমিকায় অবতীর্ণ, পূর্ববঙ্গ, সিকিম, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ তার সাক্ষ্য।

লোকে বলে নদী একূল ভেঙে ওইকূল গড়ে। এও সে বৃত্তান্ত কি-না জানি না। তবে আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে এ তত্ত্ব ও তথ্য বাস্তবরূপ নিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বেতাল মুদ্রাস্ফীতি, ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা, বেকারত্ব এদিকে গ্রাম বাঙলার জনগণকে ক্রমাগত দরিদ্রতর করছে। অন্যদিকে গঞ্জ-বন্দরের কিছু উদ্যমী-উদ্যোগীর আয়-উপার্জন বৃদ্ধির ফলে সচ্ছলতা ও অর্থসম্পদে ঋদ্ধি গ্রামীণ সমাজকে চক্রবৎ আবর্তিত করছে, ধনী দরিদ্র হচ্ছে, নিঃস্ব সচ্ছল হচ্ছে। এছাড়াও বাঙলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে দুবাইওয়ালার আধিক্যহেতু পরিবার বিশেষের আর্থিক ঋদ্ধি সম্পদবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও বড়-ছোট-মাঝারি কৃৎকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ এবং সাধারণ অকুশল শ্রমিকও পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশ থেকে ডলারে নগদ টাকা নিয়ে আসছে। এরাই গাঁয়ে জমির ও ইট-কাঠের, শহরে রেডিয়ো, টি.ভি., ভি.সি.আরের এবং প্রসাধন সামগ্রীর বাজার গরম করে রেখেছে। তবু গাঁয়ে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে সচ্ছল আর ধনী-মানুষের সংখ্যা স্বল্প আয়ের দরিদদ্রের, নিঃস্ব ক্ষেতমজুর-কুলি-শ্রমিকের তুলনায় নগণ্যই। মানুষ নিঃস্ব ও বেকার থাকছে বেশি সংখ্যায়। অভাবের তাড়নায় নিতান্ত প্রাণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁচে থাকার গরজে চীনে মা-বাবারা কন্যা বিক্রয় করত, স্বামী দিত স্ত্রীর গতর ভাড়া উনিশ শতকে সম্রাটদের আমলে, এমনকি বিপ্লবের আগেও। আমাদের দেশেও সেই অবস্থায় নেমে এসেছে গণমানব গাঁয়ে ও শহরে। শহরে ও পশ্চিম এশিয়ায় [য়ুরোপীয়দের ভাষায় মধ্যপ্রাচ্যে] চাকুরীর নাম করে ক্রেতার, দালালের বা নারীপাচারকারীদের থেকে গোপনে টাকা নিয়ে তাদের হাতে সমর্পণ করে সোমত্ত কন্যাকে। ওরা উপভোগ্য প্রাণী হিসেবে নারীদের পাচার করে আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্র বা মণ্ডলীর মাধ্যমে। এ বীভৎস বর্বর ব্যবসা প্রতিরোধের তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থাও নেই। ঘুষে-কমিশনে, অদৃশ্য প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে এ ব্যবসা নাকি দক্ষিণ ভারতে ও বাঙলাদেশে জমজমাট। মানুষের ও মনুষ্যত্বের কি লোমহর্ষক বীভৎস অবমাননা! এসব নিঃসংশয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে শাস্ত্রিক, নৈতিক, বাঞ্ছিত সামাজিক, প্রত্যাশিত সাংস্কৃতিক, অভিপ্রেত রাষ্ট্রিক জীবনের স্থিতি অর্থ-বিত্তের উপরই। অর্থ-সম্পদের অভাব মানুষকে প্রবৃত্তিচালিত অন্য প্রাণীর চেয়েও হীন করে ছাড়ে। মানবিক গুণ-মান-মাহাত্ম্যের বিকাশ, প্রসার ও স্থিতি আর্থিক সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরুপদ্রব অবস্থান নির্ভর। অর্থ-সম্পদই মানুষের মানবিকতার, মানবতার, তথা মনুষ্যত্বের জনক, লালক ও পালক, অনেকটা বীজ-বৃক্ষ-ফলের মতোই আবর্তনধর্মী।

দেশ, জাতি, মানুষ হিসেবে আমরা কোথায় নেমেছি, আমাদের দৈশিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থান কোথায়, আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি কত গভীর ও ব্যাপক অবক্ষয়ের শিকার, তা কি আমাদের সরকার, আমলা, সওদাগর, কারখানাদার, ঠিকেদার, শিক্ষাজীবী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকরা দেখেন, জানেন, বোঝেন, মন ও মনন দিয়ে কি উপলব্ধি করেন? প্রতিকারের, প্রতিবাদের কিংবা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা গ্রহণে কি আন্তরিকভাবে তাঁরা আগ্রহী কিংবা উদ্যোগী?

এ সূত্রে এও উল্লেখ্য যে আজকাল আমাদের শহরে-বন্দরেও ক্ষতিকর নেশা বা মাদক আসক্তি শুরু হয়ে গেছে কিশোর যুবাদের মধ্যে। নিত্যকার জীবনাচারের, শ্রমের ও কর্মের একঘেয়েমির ক্লান্তির, গ্লানির, শঙ্কার, সঙ্কটের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অস্বস্তি ভুলবার জন্যে বৈচিত্র্যের ও আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনাহীন জীবনে নেশাকেই দুস্থ মানুষ জীবনে জরুরী এবং উদ্যম উদ্যোগ বজায় রাখার জন্যে আবশ্যিক মনে করেছে। আমলকি, হরিতকি, পানসুপারি, গাঁজা-চরস, তামাক-খৈনি প্রভৃতি মুখে গ্রহণ করে এবং তাস বাঘবন্দী খেলে, আড্ডা দিয়ে এবং সর্বপ্রকার মাঠ-ময়দানী খেলা মানসিকভাবে উপভোগ করেই মানুষ প্রায়ই নানা সমস্যা-সঙ্কটপূর্ণ নিরানন্দ-নিস্তরঙ্গ জীবনে সাহস-সঙ্কল্প ও ধৈর্য-অধ্যবসায় বজায় রাখার ইচ্ছাশক্তি ঝালাই করে নেয়। আমরা শিক্ষিত সমাজে ব্যক্তিকে কেবল ঘন ঘন চা খেয়েই, শ্রমিক-কৃষক-রিক্সাওয়ালাদের কেবল বিড়ি সিগ্রেট খেয়েই শ্রান্তি ভুলতে, কর্মোদ্যম ফিরে পেতে দেখি। আর নিঃস্ব মানুষেরা স্বপ্নহীন কাঙ্ক্ষাহীন প্রাজন্মক্রমিক শ্রমক্লান্ত একঘেয়ে জীবনের গ্লানি ভুলবার জন্যে সন্ধ্যার পরে ধেনো তেলো মহুয়া রসে মত্ত হয়ে নাচ-গান-বাজনায় পাড়ার নারী-পুরুষ নিয়ে দুঃসহ জীবনে মানসিকভাবে কিছুক্ষণের জন্যে সব ভোলানো স্বর্গসুখ লাভ করে বাঁচার আগ্রহ ফিরে পায়।

কিন্তু আজকের কিশোর তরুণের কোকেন, হেরোইন, মারিজুয়ানা, প্যাথেড্রিন প্রভৃতি মাদকাসক্তির কারণ একান্তই স্থানিক ও কালিক। এ যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রণাময় জীবনে সমস্যা ও সঙ্কট অনেক এবং জটিল। এ জটা-জটিল বহুবিচিত্র জীবিকা প্রতিবেশে অর্থসম্পদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃত্তি-বেসাতে মধ্য, নিম্ন ও নিম্নতর অবস্থানের মেধা-সাহস-সংকল্পহীন আত্মপ্রত্যয়রিক্ত কিশোর তরুণের আকাঙ্ক্ষাপুষ্ট জীবনস্বপ্ন বাস্তবে বিরুদ্ধ প্রতিবেশে কাচের মতোই ভেঙে পড়ছে। সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে, জগতে ও জীবনে তাদের জয়ী হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবার কোন উপায় নেই। জীবনে সমাজে স্বনির্ভর হয়ে স্বস্থ ও সুস্থভাবে স্থিত হওয়ার ও স্থিতি পাওয়ার পন্থা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব জেনেই সাহস-ধৈর্য-অধ্যবসায়হীন নিরাশ কিশোর-তরুণেরা মাদকাসক্ত হয়ে তিলে তিলে জীবনে বিনাশী ওই পন্থা বরণ করেছে। এরা জীবনে জিজ্ঞাসাহৃত, কৌতূহলচ্যুত, কাঙ্ক্ষাশূন্য ও হতাশাজাত আধিগ্রস্ত। এ যুগে পৃথিবীর পুঁজিবাদীর সব শহরেই এদের পাওয়া যাবে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে এরা মূলে আকাঙ্ক্ষা ঋদ্ধ স্বাপ্নিক, কিন্তু চাওয়াকে পাওয়াতে রূপায়িত করা সাধ্যাতীত বুঝেই এরা এখন আত্মবিনাশ প্রবণ। আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থা না পাল্টালে এ রোগের বিলুপ্তি ঘটবে না, কেবল বিস্তারই।

একালে মানুষ ছিল অজ্ঞ-অকুশল অসহায়। ক্রমে জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা বলে হাতিয়ারের উদ্ভাবনে-উৎকর্ষে এবং রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা সাধনে মানুষ সমর্থ হয়ে আর প্রকৃতিকে দাস ও বশ করে উন্নত মানের জীবন যাপন করতে থাকে। এমনি আকাঙ্ক্ষাপূর্তির প্রেরণায় ও প্রেষণায় মানুষ আবিষ্কারে উদ্ভাবনে ঋদ্ধ হয়ে হয়ে মন-মনন-রুচির বিকাশ ঘটিয়েছে, ব্যবহারিক জীবনে সৃষ্টি ও সংগ্রহ করেছে ভোগ-উপভোগের বহু ও বিচিত্র উপকরণ।

বাল্যে আমরাও দেখেছি অজ্ঞ-অনক্ষর দরিদ্র চাষী-মজুর কিংবা নিম্ন পেশার গরীব মানুষরা থাকত আদুড়, তিন-চার বছরের শিশুরা থাকত উদম, হাটে এবং শহরে ছাড়া দ্রব্য-সামগ্রীর দোকান ছিল না। কৃচিৎ অজ গণ্ডগ্রামে মুদির দোকান থাকত। এদের জীবনে শারীর ভোগ্যবস্তু ছিল সীমিত, মানস উপভোগের বিষয়েও ছিল না বৈচিত্র্য। নাচ-গান-বাজনা, সাঙ্গীতিক কথকতা, কবিয়াল-কথক, গাজী-বয়াতী নামের ঘুঙুরপরা নৃত্যশীল গীতিকার আর যাত্রাদল, এতেই সীমিত ছিল তাদের মানসোপভোগ। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে ইলেকট্রিকের এবং বিশশতকের এ শেষ দু দশকে ইলেকট্রনিকের বিচিত্র সব যন্ত্র ও তৈরি সামগ্রী মানুষের ব্যবহারিক ও মানসিক ভোগ-উপভোগের জীবনকে ও জগৎকে করেছে বিস্ময়করভাবে বিস্তৃত ও বিচিত্র। মানুষের অনুভবের, আকাঙ্ক্ষার, ভোগ-উপভোগ লিপ্সার, সংস্কৃতির, অভাব চেতনার ও চাহিদার প্রসার ঘটেছে দ্রুত। দ্রুত বাড়ছে জনসংখ্যা। জীবনবোধের বিকাশে জীবনের ব্যবহারিক ও মানসিক চাহিদাও গুণে-মানে, মাপে-মাত্রায় ঋদ্ধ ও উন্নত হচ্ছে। চাহিদা ও সরবরাহ দ্রুত বাড়ছে। তাই আজ গাঁয়ের মোড়ে, ক্ষেতে ও রাস্তার বাঁকে বাঁকেও চা-বিড়ি-সিগ্রেট, লজেন্স-চকলেট মেলে। আর হাটে-বাজারে কাঁচা পণ্যকে তুচ্ছ ও গৌণ করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান। শহর-বন্দরও হয়ে উঠেছে ব্যক্তিজীবনে আবশ্যিক। পৃথিবী এমনটি আগে কখনো ছিল না। ব্যক্তি ও পরিবার অর্থের যোগান চায়, রাষ্ট্রকেই তথা সরকারকেই এ অর্থ যোগাতে হবেই। নইলে মানুষের ক্ষোভ, ক্রোধ, দ্রোহ পরিব্যক্ত হবে লুটে-রাহাজানিতে হরণে-হননে, বেপরওয়া কর্মে ও আচরণে। অর্থসম্পদেই যে সুশৃঙ্খল ব্যক্তিক, সামাজিক, প্রাশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক স্থিতি—এ তত্ত্ব ও তথ্য এখানেও আর একবার প্রমাণিত। তাই হয় বণ্টনে ও নিয়ন্ত্রণে মানুষকে সংযত রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে, নয়তো শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। শেষোক্ত সমাধান সহজ নয়, বিঘ্ন সঙ্কুল।

বিগত শতকে অশিক্ষাদুষ্ট মুসলিম সমাজের যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে কিংবা সাংবাদিকতায় লেখক-সাংবাদিকরূপে বিচরণ করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই সামান্য, স্বল্প অথবা অসম্পূর্ণ শিক্ষার লোক। নিজেদের চেষ্টায় ও যত্নে তাঁরা স্বশিক্ষিত ও জ্ঞানী হয়েছিলেন অবশ্যই, তবু তাঁদের রচনা বাঞ্ছিত মানের ছিল না। এমনকি ১৯৪৭ সন অবধি উচ্চ শিক্ষিত মুসলিমরা যে-সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা করেছেন কোলকাতায়, তাও কোলকাতার কোন হিন্দুরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। হিন্দুর রচনার ও মননের তুলনায় নিম্নমানের বলেই। তাই বাঙলাদেশে আমন্ত্রিত হয়ে এসে শিব নারায়ণ রায়ের মতো মননশীল বিদ্বান ও র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট তাঁর পূর্বপ্রজন্মের সাহিত্যিক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, আবুল ফজল এবং শিখাগোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের আবিষ্কার করেন এবং অতিথির দায়িত্বপালন করেন এদের তারিফ করে। লেখা ও লেখক যে অবহেলিত ছিল, তার কারণ মুসলিম লেখকদের চেতনা ও মনন প্রত্যাশিত গুণ-মান-মাপ-মাত্রা ও সূক্ষ্মতা পায়নি। সাহিত্য-শিল্পের যৌক্তিক মুক্ত চিন্তা-চেতনার বিকাশের ও উৎকর্ষের জন্যেও প্রাজন্মক্রমিক অনুশীলন এবং শৈক্ষিক-সাংস্কৃতিক একটা বাঞ্ছিত প্রতিবেশ প্রয়োজন। এ দুটোর অভাব ছিল মুসলিমদের, তাই বোধ হয় মুসলিম লেখক-চিন্তকদের অনুভবের, দৃষ্টির ও মননের মান বাঞ্ছিত মাপে ও মাত্রায় সূক্ষ্ম ও উঁচু নয়। পূর্ববঙ্গ থেকে ১৯৪৭ সনের পরে পরেই শিক্ষিত বর্ণহিন্দুর প্রস্থানে সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রণোদনাকর পরিবেশও নষ্ট হল বলে আজো আমরা অনেকাংশে কোলকাতার সাহিত্যের অনুকারক-অনুসারক। ব্যতিক্রমও অবশ্য এখন আর দুর্লক্ষ্য নয়।

১৯৪৭ সনের পরে অর্থ-সম্পদে ঋদ্ধি লক্ষ্যে লোকে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। তাই এখন শিক্ষিতের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। স্কুল-কলেজও গাঁয়ে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে এখন কবির সংখ্যাই চারপাঁচশ, গল্প-উপন্যাস লেখক তুলনায় অনেক কম বটে, তবু শতেক সাপ্তাহিক পত্রের জন্যে গল্প মেলে, প্রবন্ধ লেখক কম, গবেষক তুলনায় বেশি, সবচেয়ে আশার কথা গদ্যে-পদ্যে লেখিকাও শতোর্ধ্ব, বেগমের পার্বণিক সংখ্যাটি তার প্রমাণ। দুই মহিলা রিজিয়া রহমান ও সেলিনা হোসেন এখন গল্প-উপন্যাসে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। আমি অবশ্য শিক্ষার প্রসারের সুফল প্রসঙ্গেই লেখক সংখ্যার ও লেখার পরিমাণ উল্লেখ করলাম। গুণগত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ বা অনভিপ্রেত চিত্রকলার, ভাস্কর্যের ও সঙ্গীত-নাটক-সিনেমার প্রসারও আমাদের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের আশ্বস্ত ও নিশ্চিত করে।

আমাদের মুৎসুদ্দি সরকার গণসাক্ষরতার ও শিক্ষার বিস্তার চায় না, তাইতো সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি সরকার এড়িয়ে যায়। ঋণ ও দানদাতা শক্তির অনভিপ্রেত বলেই। যারা বিদ্যা পেয়ে চক্ষুষ্মান হয়েই গেছে তাদের বশ করবার জন্যে বরং মেডিক্যাল প্রকৌশল কলেজ করতে সরকার সদা রাজি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। এবং শিক্ষক-আমলা-বুদ্ধিজীবীদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সুবিধে ও অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়ে সরকারের অনুগত ও পুঁজিবাদের-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক করে রাখে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গ্রামবাসী জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কিত বলে ১৯৫৭-৫৮ সনে আতাউর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমান সরকার স্বদলের ভোট যোগাড় লক্ষ্যে সাবডেপুটিদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দিয়ে ওই পদ বিলোপ করেন। ঠিক সেই একই লক্ষ্যে ১৯৭৩ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি চাকুরে করে নিল সরকার। যদিও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শোনা যায় বেড়া ও বেঞ্চ ক্বচিৎ কোথাও একসঙ্গে মেলে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা নাকি ক্রয় করতে হয় এবং মাসিক বেতন নিতে হয় কমিশন দিয়ে। সব শিক্ষক একই দিনে একই সময়ে স্কুলে যান না, দু'একজন শিক্ষক কিছুক্ষণের জন্যে নাকি শিক্ষার্থী সামলান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ষাট সত্তর লক্ষ শিক্ষার্থী প্রবেশিকা শ্রেণীতে তিন বা সোয়া তিন লক্ষে কেন ঠেকে, এ-ই তার মুখ্য কারণ। আরো শিক্ষিত হলে আরো কবি-লেখক-চিত্রী, বুদ্ধিজীবী পেতাম আমরা।

কিন্তু কম্যুনিস্ট-ভীরু বিদেশী শক্তির তাঁবেদার সরকার ওই সরকারের ইঙ্গিতে এখন ইসলামকে করেছে রাষ্ট্রধর্ম। ইংরেজীকে অবশ্যপাঠ্য করেছে প্রথম শ্রেণী থেকে, প্রাথমিক স্কুলের পাশে বসিয়েছে মক্তব, স্কুলেও ইসলামি শাস্ত্র-শিক্ষা আবশ্যিক ও ইংরেজী পাঠ্য করেছে শিক্ষার প্রসার রোধকল্পে। কেননা গাঁয়ের নিরক্ষর মা-বাবার সন্তান ইংরেজীর ভয়ে স্কুল ছাড়বে। আর এই বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির যুগে যুক্তির ও মুক্তবুদ্ধির প্রসারের এবং স্বাধীন মন-মনন লালনের একালেও তেরোশ বছর আগেকার জগতে আমাদের নিবদ্ধ রাখার জন্যেই শাস্ত্র শেখানোর এ ব্যবস্থা। জাতির প্রগতির বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে না কোন রাজনীতিক দল জনপ্রিয়তা তথা ভোট নষ্ট হবে আশঙ্কায়। আমরা দু'হাজার বছর ধরে ধনে ও মনে কাঙাল বলে এবং এ কারণেই আমাদের চিন্তা-চেতনা কর্ম-আচরণ স্থূল বলে, মন-মনন রুচি অবিকশিত নিম্নমানের বলে, আমরা শহরে এসে কোথাও প্রলোভন এড়াতে পারিনি। প্রলোভন প্রবল হলেই আমরা ফাঁদে পা দিয়েছি। সর্বক্ষেত্রে সত্তার স্বাতন্ত্র্য, আত্মার মর্যাদা, ব্যক্তিত্বের অভিমান পরিহার করে অপকর্মে ও অসদুপায়ে অর্থ-বিত্ত মান-খ্যাতি অর্জনে আমরা প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছি। সেখানে অনেক ভীড় গাঁয়ে ও শহরে।

আমাদের তেমন কোন ব্যবসায়িক পরম্পরা ছিল না। এখানে যারা খালি ও খোলা বাজারে নামল, তারা ঠিকেদার রূপে ঠকানোকেই, দোকানদাররূপে চোরা চালানকেই, নির্মাণ-উৎপাদনের কারখানাদার রূপে ভেজালকেই দ্রুত আত্মোন্নয়নের উপায় হিসেবে বেছে নিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে ধৈর্য, অধ্যবসায়, সততার খ্যাতি প্রয়োজন, তা ক্বচিৎ কারো রয়েছে। এরা সোনার হাঁস পোষণ নয়, হত্যা করাই শ্রেয় মনে করে। অথচ সবাই জানে কোন দেশের আমদানীর চাইতে রপ্তানী কারবার বেশি না হলে, অর্থাৎ বিদেশী পণ্য আমদানীতে যা ব্যয় হয়, স্বদেশীপণ্য রপ্তানীতে তার চেয়ে বেশি আয় না হলেই দেশ দরিদ্র হতে থাকে। আমরা তাই রোজ দরিদ্রতর হচ্ছি, বাণিজ্য ঋণেও আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সুদ পরিশোধেও অসমর্থ হয়ে পড়ছি। গত বিয়াল্লিশ বছর ধরে রাষ্ট্রের তথা দেশের আর্থিক জীবনের আয়-ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বার্ষিক বিবরণীগুলোই এ ক্রমাবক্ষয়ী চিত্র দান করে। সরকারপ্রধান উজির সচিব আমলার মধ্যে মানবসেবী দেশপ্রেমীর অভাবই এ অবস্থার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থিত বাঙলাদেশে লবণ আমদানী করতে হয়। আমদানী করতে হয় চিনিও। বিদেশীর ঋণে দানে উপদেশে নাকি কোন রাষ্ট্র স্বনির্ভর স্বয়ম্ভর হতেই পারে না এ আর্থিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে। কাজেই দারিদ্র্য-দৈত্য আমাদের হাঙ্গরের মতো হাড়-মাঁস গুঁড়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। এর শেষ কোথায় কিংবা কূলকিনারা কত দূরে কেউ জানে না। অথচ জনসংখ্যা বাড়ছেই। পূর্বতন উর্দুভাষীরা এবং অন্য বিদেশীরা এখনো পুঁজিবিনিয়োগ করছে। তবে বাঙালীরা অবশ্যই খাঁটি ব্যবসায়ী হয়ে উঠবে পরবর্তী প্রজন্মে।

ফলে গাঁয়ে গঞ্জে যে অর্থোপার্জনের উপায় দেখে না, যে পরিবারের বোঝা নিয়ে দিশেহারা, সেই মরীয়া হয়ে জুয়াড়ির ঝুঁকি নিয়ে যে-কোন পন্থায় অর্থ আয়ত্তে আনার জন্যে ঘরের বাইরে যাচ্ছে। তাতেই বেপরওয়া বেদেরেগ কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি চলছে সর্বত্র। তার ফলেই প্রত্যেক দ্বিতীয় ব্যক্তিই তখন 'ফেল কড়ি মাখ তেল' নীতি স্বত্যো-অনুসৃত। এতে ইতর-ভদ্রের, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের, ধনী-দরিদ্রের এবং বাজারের-দফতরের কোন পার্থক্য নেই। ন্যায়-অন্যায়ের নয়, লেন-দেনের এ বিচিত্র খেল ইতোপূর্বে তেমন দেখা যায়নি। তবু এর মধ্যেই দেখি শিক্ষিত বেকার ছাত্র-যুবক খুনে রাহাজানিতে হাইজ্যাকিতে লিপ্ত হলেও অল্প বেতনের চাকুরেও কেউ এহেন কর্মে সাধারণভাবে জড়িত নয়। এতেই বোঝা যায় নিতান্ত ভাত-কাপড়ের অভাব না হলে সর্বত্র এমন খুন-জখম-লুট এমনি পেশা ও নেশা হয়ে উঠত না। দারিদ্র্য-দোষ মানুষের সবগুণ নষ্ট করে, নষ্ট করে মনুষ্যত্ব। তাই বহু যুগের প্রচারে-অনুশীলনেও নিরাপদ সহাবস্থানের প্রয়োজনে অর্জিত, অভ্যস্ত ও অনুসৃত নীতি-আদর্শ-সংস্কার ঘরে ঘরে জনে জনে পরিহার করা সম্ভব হত না। আজকাল আস্তিক হয়েও অন্যায় অপকর্মে পাপ হবে, কিংবা একর্মে সমাজে নিন্দা হবে বা লোকে কি বলবে প্রভৃতি কেউ উচ্চারণ করে না। যেন এ-ই রীতি-রেওয়াজ। অথচ এসব ছিল ১৯৪০ পূর্ব দেশে নিত্য উচ্চারিত স্মারক ও সতর্ক বাণী।

আগে বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর না পেলে আটকানো হত, উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হত না। এখন ফি দিলেই প্রমোশন। ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অজস্র অযোগ্য পরীক্ষার্থী নকল করেই, —করায় তাদের অভিভাবকরা, সহযোগিতা করেন কোন কোন শিক্ষকও, পরোক্ষ সহায়তা বা ঔদাসীন্য থাকে নজরদারির দায়িত্বে থাকে যাঁরা, তাঁদের। সাধারণ অভিভাবকরা শিক্ষার বা জ্ঞানের কদর বোঝে না, তারা পাশের আদর ও 'পুশের' গুরুত্ব মানে ও দাম জানে, – যাকে বাস্তবে বলে 'মামার জোর'। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই নকলেই তক্‌দীর খোলে। পরীক্ষাপদ্ধতি হচ্ছে মান্ধাতার আমলের। পাঠ্যবই থেকে বড় জোর ত্রিশটা 'প্রশ্ন' তৈরী করা সম্ভব। এ বছরের প্রশ্ন পরের বছরে না দেয়াই রেওয়াজ। কাজেই গত বছর যে দশটা প্রশ্ন এসে গেছে সেগুলোর উত্তর বাদ। তার আগে দুবছরের প্রশ্নগুলো থেকে কয়েকটা বেছে নিলেই হল। এখন যে প্রশ্ন নিশ্চিতই থাকবে বেশি নম্বর পাওয়ার জন্যে তার উত্তর হুবহু নকল করা গেলে শুধু পাস নয়, পদও মিলবে– এ চেতনাই ছাত্রকে নকলে প্রলুব্ধ করে। কাজেই পরীক্ষাপদ্ধতি বদলালেই নকল-প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু শিক্ষক মাত্রকেই শিক্ষাবিদ মেনে যে কোন শিক্ষককে শিক্ষা কমিটির সদস্য বা চেয়ারম্যান করলেই কমিটির বুদ্ধি পরামর্শ সুপারিশ বাস্তবে বৃথা ও ব্যর্থ হবেই। স্কুল কলেজ বেড়েছে, গাঁয়ে-গঞ্জে মেয়েরাও পড়ছে। প্রতিবেশ বদলাচ্ছে। জ্ঞানচক্ষু অচিরেই খুলবে। সবাই লঘু গুরু ভাবছে।

ব্রিটিশ আমলে সাধারণভাবে অর্থেবিত্তে প্রতিষ্ঠিত উকিল ব্যারিস্টারেরাই বেশি সংখ্যায় রাজনীতি করতেন অর্থাৎ নানা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ও সংসদে সদস্য হতেন। ১৯৫৪ সনেও উকিলের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। কিন্তু তারপর ঠিকাদার সওদাগরের

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যাই বাড়তে থাকে। তখন থেকে টাকার জোরই যে নির্বাচন-সেতু পার হওয়ার মোক্ষম উপায় তা প্রমাণিত হল। নির্বাচনে দুর্নীতির প্রসার এভাবেই ঘটে। আর এরশাদ আমলে তাঁর নেতৃত্বে তা চরম ও অদৃশ্য অলৌকিক রূপ ধারণ করে। ঠিকাদার-সওদাগর-কারখানাদারেরা অর্থের জোরে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সামান্য ধনী উকিল ব্যারিস্টার শিক্ষক সজ্জন ও স্থানীয়ভাবে যোগ্য ও জনপ্রিয় লোকদের সরিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ টাকা নেই বলে ব্যয়বহুল নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া সাধারণের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

নারীর সালোয়ার-কামিজে নয় শুধু, প্যান্টেও পরিবর্তিত হচ্ছে নারীর পোশাক উচ্চবিত্তের বিদেশঘোরা মেয়ে মহিলাদের মধ্যেও। এ প্রজন্মের পুরুষের ভদ্রপোশাক যে হাওয়াইয়ান শার্ট ও প্যান্ট হয়েই গেছে, তার প্রমাণ গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে অধিকাংশ লোককে এ পার্বণিক পোশাকে দেখা যাচ্ছে। এদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। শিশু-বালকের পোশাক লুঙ্গি-ধুতি তো কিশোরদের মুসলমান বানিয়েছেন, একালে দাদাভাই 'কচি কাঁচার আসরে' মানুষ বানানোর প্রয়াসী।

নাচে গানে বাজনায় অভিনয়ে ও চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে বাঙালী মুসলিমের কোন পরম্পরা ছিল না। এখন বাঙলাদেশে অধিজন হিসেবে সবটাতেই তাদের ভূমিকা থাকে। সিনেমায়ও এরাই প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা-নেত্রী। সর্বপ্রকার খেলা-ধুলায়ও এরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে দুর্নীতিবাজ মুৎসুদ্দী শাসনেও স্বাধীনতার প্রসাদ থেকে, উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজন থেকে, আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষকে একেবারে বঞ্চিত রাখা যায় না। ঢাকা শহর এখন আর কেবল ইট পাথরের নয়, সৌন্দর্যের সুরুচির সংস্কৃতিচেতনারও সাক্ষ্য। তারপরেও আমাদের শিক্ষিতরা নতুন রাষ্ট্রকে এ বিয়াল্লিশ বছর ধরে লুট করে ধানমণ্ডি-গুলশান-বনানী-বারিধারায় বাড়ি ভাড়ায় খাটিয়ে সন্তানদের বহুব্যয়ে স্কুলে ও ঘরে পড়িয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার রূপ অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনে সক্ষম 'মানুষ' করে এখন বিদেশ পাঠাচ্ছে ডলার রোজগার ও বসবাস করতে। এরা বলে, দেশে সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও আরণ্য ন্যায় চলছে। স্কুল কলেজে লেখাপড়া নেই, অফিসে-ব্যবসায়ে সততা শৃঙ্খলা নেই, রাজনীতি হয়েছে গুণ্ডামি নীতির নামান্তর, এমনি দেশে কি বাস করা যায়! কিন্তু ১৯৪৭ সন থেকে আজ অবধি দেশকে এ দুরবস্থায় নামিয়েছে কারা? এ শহুরে শিক্ষিতরাইতো, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিক, সওদাগর, মৌজুতদার, দোকানদার, আড়তদার, কারখানাদার প্রভৃতি সবাই জাল জুয়া-জোচ্চুরি, ছল-চাতুরী-প্রতারণা, ভেজাল-পাচার, জোর-জুলুম-লুট, জবর দখল প্রভৃতি তো এদেরই কৃতি ও কীর্তি।

এ তৃপ্তম্মণ্যদের উপর প্রকৃতিও প্রতিশোধ নিচ্ছে, শুনতে পাই এরাঁও নিঃসন্তানদের মতো নিঃসঙ্গতায় ভোগে, এদেরও হৃদয়ে নাকি দৈহিক জীর্ণতা ও মানসিক জড়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার জাগে, মমতা প্রত্যাশী হৃদয় কাঁদে আর অপূর্ত প্রিয়স্পর্শকাঙ্ক্ষা নিয়ে মরে।

শাসন প্রশাসন-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে দেশহিতৈষী মানবসেবী সৎ মানুষ থাকলে বিদেশী প্রসাধন দ্রব্য, বিভিন্ন বিলাসসামগ্রী ও প্রমোদ যন্ত্রাদি আমাদের বাজার দখল করে জাঁকিয়ে বসতে পারত না। এগুলো কিছুটা নিম্নমানের হলেও দেশে তৈরী হতে পারত। গরীব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে পরিহার্য ও অনাবশ্যিক পণ্যের খোলাবাজার দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে মাত্র। শুনেছি কমিশন প্রাপ্তি লোভে কর্তা ব্যক্তিরা বহু অপ্রয়োজনীয় পণ্য উচ্চমূল্যে ক্রয় করান ঋণ-দান রাজস্বের সরকারি অর্থে। রাস্তার গ্যাস মিটার, প্রভৃতি এমনি সব ব্যয়বহুল তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু আমদানীতে নাকি সরকারি উৎসাহ অধিক। আগেই বলেছি ১৯৪৭ সন থেকেই ধনে-মনে কাঙাল আমরা বাঘের ক্ষুধা, হায়েনার লোভ, নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে ধন-মান খ্যাতি-ক্ষমতা অর্জন লক্ষ্যে শহরে বন্দরে আসছি, আমাদের চিন্তা-চেতনা কর্ম-আচরণে কেবল অর্থ-সম্পদ অর্জনই ছিল মুখ্য, এমনি স্বভাব ও লক্ষ্য ছিল আঠারো-উনিশ শতকের কোলকাতার ভাগ্যান্বেষীদেরও। আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম শুরু হয়ে গেছে, তৃতীয় প্রজন্মে বিদ্যায় বিত্তে ঋদ্ধ গাড়ি-বাড়িওয়ালার সন্তানেরা হবে সহজ ভোগে-উপভোগে তৃপ্ত ও তুষ্ট, মর্যাদাবান সুকৃতি ও সুকীর্তিকামী আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবণ সৎ সমাজসেবী। যেমনটা দেখেছি আমরা উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে কোলকাতার হিন্দুসমাজে।

আমরা দেখেছি যোগ্য নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানী, ভাঙা ফ্রান্স, বিনষ্ট জাপান অল্পদিনেই পূর্বাবস্থা ফিরে পেয়েছিল, দরিদ্র রাশিয়া পরাশক্তিতে পরিণত, ভারত দেশপ্রেমী সৎ কংগ্রেসী নেতৃত্বে বিস্ময়করভাবে দ্রুত উন্নতি করেছে আর্থিক বৈষয়িক ব্যবসায়িক জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে, চীন দু'বছর পরে স্বাধীনভাবে আত্মগড়নে আত্মনিয়োগ করে বিশ্বের প্রধান শক্তির একটি। আর আমরা আজো মাত্র 'মালী'র উপরে, মুদ্রাস্ফীতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যন্ত্রণা বৃদ্ধির আপাতকারণ।

এ মুহূর্তের সবচেয়ে বড় সমস্যাকে আমরা চিহ্নিতও করি না। সেটি হচ্ছে হাজার বারোশ দেশী বিদেশী 'এন জি ও' -এর উপদ্রব। এরা ছদ্মবেশী বন্ধু ও সহায়। এদের কাজ আপাত মধুর কিন্তু পরিণামে হবে বিষ। এরা আমাদের নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হতে দিচ্ছে না, দিচ্ছে না স্বনির্ভর হতে। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সাহস উদ্যম উদ্যোগ এরা আমাদের মতো করে প্রয়োগ করতে দিচ্ছে না। এভাবে আমাদের করছে হৃতবল, অসমর্থ ও উদ্যমহীন অলস।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের আত্মস্থ হয়নি, রাজনীতিক মতাদর্শও মন-মনের অঙ্গ নয়— বুকের সত্য নয়, মুখের কথামাত্র, সংস্কৃতি তো নয়ই। তাই আমরা বাঙালীসত্তা অঙ্গীকার করেও আগে মুসলিম পরে বাঙলাদেশী বা বাঙালী। আমাদের রাষ্ট্র উচ্চকণ্ঠ ভিক্ষাজীবী। আমাদের ব্যক্তিক সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক মর্যাদাবোধ গড়ে ওঠেনি। আমাদের দেশপ্রেমী, মানবপ্রেমী মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক-প্রশাসক-নিয়ন্ত্রক চাই। তার প্রতীক্ষায় থাকব আমরা। আমাদের অতীত ছিল না, অতীত নেই, বর্তমান ম্লান, কিন্তু ভবিষ্যৎ অবশ্যই আছে, তা যতদূরেই থাক। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা,' এ আমাদের প্রিয় স্বদেশ, জন্মভূমি মাতৃক্রোড়, আমাদের প্রাজন্মক্রমিক আবাস, তাই আশা-প্রত্যাশা ছাড়তে পারি না। আমরা এ-ও জানি, 'এদিন যাবে, রবে না' এবং 'কোনদিন যাহা পোহাবে না, তেমন রাত্রি নাই।' অতএব মাভৈঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণ ও যৌতুক

কনে বেচার দামের নাম পণ, আর ছেলে কেনার মূল্যের নাম যৌতুক। এ স্থূল সংজ্ঞায় আপাতত আমাদের কাজ চলবে।

বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার আগে রূপসী নারী নিয়ে পুরুষদের মধ্যে চলত দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা, ঘটত সংঘর্ষ। সমাজ যখন মাতৃতান্ত্রিক ছিল, তখনো এ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সংঘাত এড়ানো ছিল অসম্ভব। নারীও বীরভোগ্যা এবং কাব্য-কবিতার সৃষ্টি পুরুষের নারীবাঞ্ছা, নারী-সম্ভোগ ও নারীহরণ নিয়েই।

এই দ্বন্দ্ব-হানাহানি নিবারণের জন্যেই বিবাহপ্রথা হয়েছিল চালু—ভাইবোনে কিংবা নিকট-আত্মীয় বিবাহ হয়েছিল নিষিদ্ধ, চালু হয়েছিল কোথাও স্বগোত্রে, কোথাও ভিন্ন গোত্রে বিবাহ।

বিবাহপ্রথা চালু হওয়ার পরে হরণ-ধর্ষণ যখন শাস্ত্রে-সমাজে হল নিন্দনীয় এবং প্রাশাসনিক নিয়মনীতিতে দণ্ডনীয়, তখনই রূপসী-যৌবনবতী নারীপ্রাপ্তির জন্যে দর কষাকষির শুরু। কনেপণ তাই আদিম ও সার্বত্রিক। ক্রমে এ প্রথারও বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটেছে :

ক. স্বেচ্ছাবৃত বা স্বয়ম্বর হওয়া।

খ. পণ নিয়ে কন্যা বিক্রয়।

গ. খোরপোষ এবং নগদ পরিশোধ্য ও পরে পরিশোধ্য অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়।

ঘ. যুদ্ধ পরাজিত পক্ষের কন্যা-ভগ্নী এমনকি স্ত্রী দান করে বিজয়ী পক্ষের তুষ্টি সাধন।

তারপর সভ্যতা সংস্কৃতি ক্রমবিকাশের ধারায় সামাজিক মন-মনন ও রীতি-নীতি নানা বাস্তব কারণে ও প্রয়োজনে জটিল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে, তখন বিবাহের নিয়ম-নীতিতে এবং রেওয়াজেও বৈচিত্র্য আসে দেশ, সমাজ, শাস্ত্র ও কালভেদে।

তবে বিয়ের আনন্দ-ভোজ ও মৃতের সদগতিভোজ দেশ-দুনিয়ার বুনো-বর্বর-ভব্য সব সমাজে আদিকাল থেকেই রয়েছে চালু।

ক. পারিবারিক ও সামাজিক সম্মতি ক্রমে প্রেমজ বিবাহ।

খ. পুরুষের তুলনায় নারীর আনুপাতিক সংখ্যাল্পতার দরুন কনে-পণ দিয়ে বিবাহ।

গ. পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাগুরুত্বের জন্য বিনাপণে বিবাহ ও বহুবিবাহ।

ঘ. রূপসী নারীর জন্যে প্রতিযোগীর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে উচ্চ হারে কনেপণ হাঁকা।

ঙ. সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির জন্যে ধনী-মানী পরিবারে বিবাহ করার আগ্রহের ফলে চড়া দামে উঠতি বা পড়তি অভিজাত বংশের মেয়ে ক্রয়।

চ. নিঃস্ব বা দরিদ্র পরিবারকে বিবাহোৎসবের ব্যয় যাবৎ আগ্রহী বরপক্ষের নগদ অর্থদান।

ছ. ব্রাহ্মণদের সালঙ্কার কন্যা-সম্প্রদান।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিকথা, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য, কিংবদন্তী এবং সনাতনরীতি বলে চালু এখনকার বিভিন্ন দেশ-বর্ণ-ধর্মের মানুষের বিবাহ-রীতিতে এসবের আভাস মেলে।

বর কেনার তথা যৌতুকরূপে বরপণ দেয়ার রেওয়াজও অজ্ঞাত ছিল না বটে, তবে তা বিরলতায় ছিল দুর্লক্ষ্য। কেননা আদিম সমাজে বিদ্যা অর্থকর ছিল না। বৃত্তিজীবী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে মুদ্রা মাধ্যমে শ্রম বা পণ্য বিনিময়ও বহুল প্রচলিত ছিল না, তা ছাড়া আদিম কাল থেকে সামন্তযুগ অবধি ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা ও মর্যাদা ছিল প্রায় অভাবিত। কৌমে, গোত্রে, বংশে ও পরিবারে চিহ্নিত জনসমাজে ব্যক্তি পরিচিতি ছিল গোত্রের বংশের ও পরিবারের সদস্যরূপে—স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিরূপে স্বনামে নয়। কাজেই বিয়ে-শাদী হত 'ক' গোত্রের, সঙ্গে 'খ' গোত্রের, 'ক' বংশের সঙ্গে 'খ' বংশের। কুলগর্ব, সম্বন্ধগৌরব, আভিজাত্যবোধ প্রভৃতি এভাবেই অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হত। কুল ক্রয় করার জন্যে সে যুগে ক্বচিৎ বর ক্রয় করা হত— সাধারণভাবে কনে ক্রয়ই ছিল রেওয়াজ। আজো দেশের অশিক্ষিত সমাজে বৈবাহিক সম্বন্ধ এভাবেই ঘটে। তাই 'কনেপণ' সেখানে আজো সুলভ। ধনগর্ব, কন্যাস্নেহ ও বরবরণে আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে বরকে তথা জামাতাকে উপহার সামগ্রী দেয়ার রেওয়াজও সুপ্রাচীন। তবে তা দাবির অন্তর্গত ছিল না।

কিন্তু ইংরেজ আমলে বিদ্যায়-লভ্য বড়-ছোট সরকারি চাকরির কিংবা উকিল-ডাক্তারের মান-মর্যাদা সমাজে ব্যাপক ও গভীর হয়ে ওঠে। কারণ এভাবেই আমাদের সমাজে সামন্তযুগের ক্ষয় এবং বুর্জোয়া যুগের উন্মেষ ঘটে।

এখন পরিচয়ের ক্ষেত্রে বংশ বা পরিবার নয়- ব্যক্তিই প্রধান। কাজেই বিয়ের ক্ষেত্রে কোন্ যোগ্য ব্যক্তি বর হচ্ছে তা-ই হল বিবেচ্য। আগে বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে থাকত আমরা প্রথম পুত্রের সঙ্গে 'ক'-এর তৃতীয়া কন্যার, আরো পরে যখন কন্যাও বিদুষী এবং চাকুরে তখন বর-কনের নাম নিমন্ত্রণ পত্রে আবশ্যিক হয়ে ওঠে। কুল-চেতনা রইল বটে, তবে তা আর প্রধান থাকল না।

এখন থেকে জামাই-ধরা বা বর-কেনা ফাঁদরূপে যৌতুক বহুল প্রচলিত হয়। একজনকে দশ কুলীনে বা পনেরো রূপসীকন্যার বা কুশ্রী কন্যার বাবা জামাই করার প্রস্তাব দিলে গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠি যৌতুক নামের আর্থিক মূল্য না হয়েই পারে না।

আজ এ হচ্ছে একান্তভাবে শিক্ষিত ভদ্র চাকুরে সমাজের সমস্যা। সমাজব্যবস্থা এমনি থাকলে যৌতুকও থাকবে। অবশ্য এ রোগেরও নিদান আছে। এর উৎপাটনের উপায়গুলো এই:

১। সন্তানদের স্ব স্ব জীবনসাথী গ্রহণের স্বাধীনতা দান, অর্থাৎ মা-বাবার নিরপেক্ষ থাকা।

২। সামজতন্ত্র অঙ্গীকার করা।

৩। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জীবিকা অর্জনে সম্মত থাকা।

৪। বিবাহের ক্ষেত্রে কুলগৌরবে বা পদমর্যাদায় কিংবা ধন-সম্পদে গুরুত্ব না দেয়া।

৫। নারীর রূপগত কারণে আর পুরুষের অর্থোপার্জনে অসামর্থ্যজাত কারণে সাথী না জুটলে কৃত্রিম আর্থিক প্রলোভনে পাত্রস্থ বা পাত্রীস্থ না করা।

৬। সামন্ত্র-বুর্জোয়ারা অলঙ্কারকে রূপ-সুষমা বৃদ্ধির উপকরণ বলে নয়, ঐশ্বর্যগর্ব প্রকাশের বাহন বলেই জানে ও মানে। তাই হীরা-মুক্তা-সোনা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ও পাথর প্রদর্শনের ইজেল করে তোলে নারীকে। পরে নিম্নবিত্তের ও মধ্যবিত্তের বুর্জোয়ার সংখ্যা যখন য়ুরোপীয় সমাজে বৃদ্ধি পেল, তখন আর্থিক দৈন্যের কারণেই আত্মসম্মান রক্ষার উপায় হিসেবে সুরুচির ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য চেতনার নামে অলঙ্কার বর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের উঠতি সমাজে সে-পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ও গাঁয়ের গৃহস্থদের সমস্যামুক্তির জন্যে দামী অলঙ্কার বর্জনে অনুপ্রাণিত করার আন্দোলন এখনই গড়ে তোলা দরকার।

আমাদের ভদ্র সমাজটা নবীন ও ভুঁইফোড় বলেই অলঙ্কারে, গৃহসজ্জায় ও পোশাকে কিংবা গাড়ী-বাড়ী-শাড়ী-সুটে আভিজাত্য অর্জনে প্রয়াসী। তাই যৌতুক নয় কেবল ঘুষ-জাল-জুয়া-প্রতারণাও এখানে বহুল প্রচলিত।

অর্থের বা রূপের অভাবে যখন বর্ণ হিন্দুশিক্ষিত ঘরে মেয়ে আইবুড়ো হয়ে আটকে রইল, তখন শাস্ত্রের ও সমাজের ভয় উপেক্ষা করে শিক্ষিত শহুরে ঘরে মেয়ে অনূঢ়া রেখে এ আর্থিক, শাস্ত্রিক ও সামাজিক সংকট-সমস্যা এড়াল, যদিও জৈব সঙ্কট-সমস্যা জীবনকে বৃথা ও ব্যর্থ করে দিল— দাম্পত্য ব্যবস্থার অভাবে। য়ূরোপে এ সমস্যা-সঙ্কটই সহ-বাস বা Living together রীতি সমাজসম্মত করে দিল। এখন বাঙলাদেশের শহুরে শিক্ষিত মুসলিম সমাজেও চির-অনূঢ়ার সংখ্যা বাড়ছে একই কারণে। কিন্তু গাঁয়ের অশিক্ষিত নিম্ন বর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-মুসলিম সমাজ আজো কন্যা-দায়ে বিপর্যস্ত। কেননা, ওখানে এখনো অনূঢ়া রাখা শাস্ত্রিক সামাজিক কারণেই অসম্ভব।

AMARBOI.COM

অসুস্থ-অস্থির বাঙালী

১৯৪৬ সনের দাঙ্গায় ও প্রাদেশিক বিধান সভার নির্বাচনে নিঃসংশয়ে জানা গেল বাঙলার তথা ভারতের মুসলিমরা স্বধর্মীর জাতীয়তায় বিশ্বাস রাখে—দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তায় তাদের কোন আস্থা নেই। কাজেই পরিণামে হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতি তত্ত্বের মৌখিক ও বাস্তব স্বীকৃতিতে ও ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। [যদিও লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন 'দ্বিজাতিবাদ' পরিহার করতে মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে শেষ মুহূর্তে রাজি বা বাধ্য করেছিলেন।]

আবার এই বাঙালী মুসলিমরাই বলা শুরু করল যে দ্বিজাতিবাদ তথা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ছিল ভুল—একটা বিদ্বিষ্ট মনের অসুস্থ চেতনার প্রসূন। কাজেই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ ঠিক বা উচিত হয়নি।

অর্থ-চাকুরী-বাণিজ্য ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত শোষিত বাঙালী স্বাতন্ত্র্য, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য, গৌত্রিক ভিন্নতা, জীবনাচারের পার্থক্য প্রভৃতির যুক্তিতে বাঙালী সত্তায় প্রাধান্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' প্রতিষ্ঠার সংকল্প বা অঙ্গীকার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জান-মাল-গর্দান পণ রেখে, জয়ী হল ১৯৭১ সনের ষোলই ডিসেম্বর। দ্বিজাতিবাদ ভুল বলে মুখে উচ্চারণ করল বটে, কিন্তু তারা ভারতীয় জাতীয়তায় আস্থা রেখে ভারতভুক্ত হতে চাইল না।

আবার বাঙলাদেশ পেয়েই—দুবছর না যেতেই মুজিব আমলেই সংবিধানের চারনীতি—দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পরিহার করে অধিকাংশ মুসলিম কেবল বাঙালী সত্তায় স্থির না থেকে মুসলিম পরিচয়ে গুরুত্ব দিতে থাকে। তখন তারা বাঙালী মুসলিম—পরে মোস্তাক-জিয়া-এরশাদের আমলে মুসলিম বাঙালী কিংবা কেবল মুসলিম হয়ে গেল, —এ মুহূর্তে তারা ইসলামসেবক কেবল মুসলিম, দেহে মনে প্রাণে [তাদের কর্মে-আচরণে তা স্বপ্রকাশ না হলেও, কারণ দেশে মুসলিমরাই দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতী] না হলেও উচ্চারণে অবশ্যই। এরাই বলছে যে পাকিস্তান ভাঙা ভুল হয়েছে। এ ভুল সংশোধন লক্ষ্যে কিনা জানি না, এরাই এখন জিন্নাহ-ইকবাল-মোনেম খাঁ-নূরুল আমীন-সবুরের জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করে। এরা যদি হুজুগে পাকিস্তান গড়ে, হুজুগেই বাঙালী সত্তা অঙ্গীকার করে এবং আবার 'মুসলিম' হয়ে দেশ-কালহীন বিশ্বমুসলিম 'উম্মাবাদী' হয়, তাহলে এরা কবে আর ধীরবুদ্ধি ও স্থিরবিশ্বাস নিয়ে দেশ-কালগত জীবনে স্বস্থ বাঙালী, বাঙলাদেশী ও সুস্থ মানুষ হবে!

শেকড় সন্ধানে

AMARBOI.COM

১. পরিবর্তনের উৎস

স্রষ্টায় বিশ্বাসের উদ্ভব বিস্ময়ে কল্পনায় ভয়ে ভক্তিতে ভরসায়। জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসা শূন্য মানুষের গতানুগতিক জীবনাচারে স্রষ্টায় ও শাস্ত্রে, ভূতে ও ভগবানে, অলীকে ও অলৌকিকতায় আস্থা আশৈশব থাকে স্থিত এবং পায় দৃঢ় স্থিতি। প্রশ্নহীন উদাসীন মানুষেও তাই বিদ্যা জ্ঞান দান করে মাত্র। কারণ-কার্যের তাৎপর্য চেতনা জাগায় না বলে, তারাও জ্ঞান যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগে জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় উন্নীত করে জগৎচেতনা বা জীবনভাবনা বিকাশে-বিস্তারে-বিশ্লেষণে গভীর ও ব্যাপক করে না। কেবল জিজ্ঞাসু, সন্ধিৎসু সাহসী শিক্ষিত মানুষেরই স্রষ্টায় ভয় ও শাস্ত্রে আস্থা শিথিল হতে পারে, হয়ও। এমনি মানুষ দেখেই লোকে বলে যে উচ্চ শিক্ষা ব্যক্তিকে শাস্ত্রে উদাসীন, শাস্ত্রিক আচারে-অনুষ্ঠানে আস্থাহীন করে। এ জন্যেই লোকে ভাবে যে, যদিও মানসিকভাবে তা কৃচিৎ সত্য, প্রতীচ্যবিদ্যা মানুষকে আধুনিক করে এবং এ আধুনিকতা শাস্ত্রে আস্থাশৈথিল্যের মানুষকে আধুনিক করে এবং এ আধুনিকতা শাস্ত্রে আস্থাশৈথিল্যের নামান্তর মাত্র। অবশ্য এ তথ্য ও তত্ত্ব স্বীকার করতেই হবে যে আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষায় ও শাস্ত্রে আস্থায় লঘু গুরু মাত্রায় দ্বন্দ্ব রয়েইছে। তবে তা কেবল যুক্তিপ্রবণ বুদ্ধিমান জ্ঞানীর ক্ষেত্রেই সত্য ও প্রযোজ্য মাত্র। তবু প্রাপ্তিলিপ্সু ক্ষতিভীরু দুর্বলচিত্ত জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিরিক্ত মানুষ চিরকালই অধিজন থাকবে বলেই পৃথিবীতে শাস্ত্র, শাস্ত্রী ও অলীক-অলৌকিকে বিশ্বাসী মানুষ চিরকালই থাকবে প্রতুল, বিজ্ঞানীর জগৎরহস্য উদ্‌ঘাটন এবং প্রযুক্তির বিস্ময়কর দ্রুত বিকাশ সত্ত্বেও। কাজেই যুক্তি, বিবেক ও আত্মমর্যাদা নির্ভর এবং সমস্বার্থে-সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায়-সহাবস্থানে আগ্রহী ন্যায়বান নির্লোভ মানুষ সমাজে আরো বহু বহু কাল থাকবে বিরলতায় দুর্লভ। অতএব পরিবর্তনের উৎস মন-মনন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. সংস্কৃতির উৎস

সৃষ্টিশীলতা ব্যক্তি মনের-মননের প্রসূন। যে-কোন ভাব-চিন্তা-কল্পনা-পরিকল্পনা তত্ত্ব ও রূপ, চেতনা ও স্বপ্নরূপে উদ্ভূত হয় মানসে তথা চিত্তলোকে। তা-ই আর্থিক ও মানসিক সামর্থ্যানুসারে পরিবেষ্টনীর আনুকূল্যে ও প্রয়োজনের গরজে রূপায়িত হয় বাস্তবে। সভ্যতার শৈশবে স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রীর প্রবর্তনায় মোটাবুদ্ধির সম্রাট ফেরাউ মর্ত্যজীবনের সুখ-সম্ভোগ মৃত্যুর পরে অপার্থিব জীবনেও আয়ত্তে রাখবার বাঞ্ছাবশে ভোগ-উপভোগের সামগ্রী ও সেবক নিয়ে পুনঃপ্রাপ্য শারীর সুখে আস্থাবান হয়ে পিরামিড তৈরি করিয়েছিলেন। অমৃত প্রাণ পুনঃপ্রাপ্তি লক্ষ্যে রাসায়নিক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও কৌশল প্রয়োগে দেহকে রাখতে চেয়েছিলেন অবিকৃত। বাদশাহর মনের বাঞ্ছাই প্রণোদনা প্রবর্তনা দিয়েছিল পিরামিড নির্মাণের কৌশল উদ্ভাবনের মমি তৈরীর উপায় আবিষ্কারে। শাহজাহানের সাধই তাজমহলের রূপকল্পনা এবং অর্থ প্রতিপত্তিই তাজমহল সৌধের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব করেছে। ভাব-চিন্তা তত্ত্ব-তথ্য-যুক্তি-জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্বপ্রকার কলা-শিল্প সাহিত্য-দর্শন-প্রকৌশল-প্রযুক্তিমাত্রই ব্যক্তিক সৃষ্টি-উদ্ভাবন-আবিষ্কার-অবদান। এ ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-কৃতি-কীর্তিই দৈশিক-জাতিক-মানবিক-রিকথ হয়ে টেকে সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ বিস্তার ঘটেছে এমন সৃষ্টিতে গ্রহণে বরণে-অনুকরণে-অনুসরণে।

কাঙ্ক্ষা ও চাহিদারূপে দুনিয়ার যাবতীয় কলার উদ্ভব ব্যক্তিমনে। তার আকাঙ্ক্ষা পূর্তির ও চাহিদা মেটানোর প্রয়াসে-প্রযত্নেই সব কলার বাস্তবে অনুশীলন-রূপায়ণ-উন্নয়ন-উৎকর্ষ হয়েছে, হচ্ছে সম্ভব। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্য দর্শন যদিও ব্যক্তিক চিন্তা-মনন সাধ-সাধ্য-প্রয়াস-প্রযত্ন প্রসূত, শারীর কলাশিল্পে, হাতিয়ারে ও বস্তুগত শিল্পের রূপায়ণে জনসহযোগিতা ও শ্রমই হয়েছে অর্থের বিনিময়ে প্রধান পুঁজি। নাচ-গান-বাজনা, ভাস্কর্য-স্থাপত্য এবং শাহ-সামন্ত-ধনী-মানী অভিপ্রেত মনুষ্য নির্মিত যাবতীয় রাস্তা-ঘাট, উদ্যান-সরোবর, ঘরবাড়ি-তৈজসপত্র, পোশাক প্রভৃতি সবকিছুই নিঃস্ব নিরন্ন স্পৃশ্য অস্পৃশ্য মজুরের শ্রমসাধ্য অবদান। তবু তা এদের নয়, কারণ সবকিছু হয়েছে শাহ-সামন্তের ও উচ্চবিত্তের অভিজাতের ভোগ-উপভোগ বাঞ্ছার ও চাহিদার প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় সৃষ্ট ও নির্মিত। যেমন আমাদের দেশে নৃত্য-গীত-বাদ্য যাদের পেশা, তারা ভারতীয় সমাজে ইদানীং পূর্বে প্রজন্মক্রমে ছিল পেশাদার। এ ছিল এদের ঘরানা জীবিকা। এবং তারা সামাজিক জীবনে কলাকাররূপে সম্মানিত ছিল না, অর্থাৎ তারা আসরে আদর পেত, সমাজে কদর পেত না। সামন্তরা দালান-কোঠা-প্রাসাদ তৈরী করে বলেই ওরা রাজ বা ছুতার মিস্ত্রী বা রঙরেজ। ঘরে হোটেলে যারা রাজসিক সব বিচিত্র ও দামী আহার্য তৈরী করে, তা তাদের সৃষ্টি নয়—ধনী মানীদের বাঞ্ছার ও চাহিদার বাস্তবায়নে নির্দেশিত পদ্ধতিতে বানানোতে ওরা শ্রম ও প্রশিক্ষা প্রসূত নৈপুণ্য দেয় মাত্র।

কাজেই সংস্কৃতির স্রষ্টা, বিকাশক, প্রসারক ও প্রচারক হচ্ছে উচ্চবিদ্যার ও রুচির মানুষ। অন্য শ্রমিক-সহায়করা অর্থের বিনিময়ে সহযোগিতা করে মাত্র। তাদের কোন ভোগ-উপভোগের চাহিদা চিহ্ন নেই এসব বস্তুতে। অতএব শাহ-সামন্তের সাধের, সাধ্যের, ভোগ-উপভোগ বাঞ্ছার ও চাহিদার বাস্তবায়ন ঘটেছে প্রাচীনতম কাল থেকে আজকের দিন অবধি। সর্বপ্রকার মানব প্রচেষ্টার, উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের মধ্যে গণমানব কেবল শ্রম দিয়েছে, নৈপুণ্য দিয়েছে, কোন কালেই ভোগ-উপভোগের অধিকার পায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই পিরামিডে, গ্রেকো-রোমান চিত্রে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে, অজন্তা ইলোরার গুহাশিল্পে পৃথিবীর নানা সভ্যজাতদের চিন্তার চেতনার অভিপ্রায়ের-উপভোগ্যের রূপায়ণ-বাস্তবায়নই দেখতে পাই। এর নামই দৈশিক গৌত্রিক জাতিক সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবগর্ব প্রতীক ঐতিহ্য।

বিকাশমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এ যন্ত্র জগতে ও যন্ত্রযুগে আমরা গণমানবেরও সাধ-সাধ্যের ভোগ-উপভোগ বাঞ্ছার ও চাহিদার যোগান চাই, বাস্তবায়ন চাই জীবনের, সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে। যার শ্রম, তার সাধ ও প্রয়োজন পূর্তির আয়োজনও হবে, তার জন্যেই আমরা চিত্রে ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে-সাহিত্যে, নৃত্য-গীত -বাদ্যে গণজীবনের, গণসংস্কৃতির, গণপ্রয়োজনের, গণদাবির রূপায়ণ-ই মুখ্য দেখতে চাই। পুরোহিত যুগ, ক্ষত্রিয় যুগ, বৈশ্য যুগ-অবসানে শূদ্র তথা গণমানব যুগ, গণমানব যুগ শুরু হয়ে গেছে বহু রাষ্ট্রে এ শতকের গোড়া থেকেই। আমরা আর কতকাল বঞ্চিত থাকব!

৩. বিদ্যালয়ে হাঙ্গামার উৎস

চারদিকে শিক্ষিত লোকেরা বলে বেড়াচ্ছে স্কুলে-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ঢুকেছে, ঢুকছে শিক্ষক-ছাত্র নির্বিশেষের মধ্যে। শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাত্রদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে শাসিয়ে নীতি কথায় মিষ্টি কথায় আদর্শ-চেতনাদানে বশ করে অনুগত রেখে সৎমানুষ, ভালো মানুষ, সুনাগরিক ও শিক্ষিত সংস্কৃতিবান আদর্শ মানুষ তৈরী করা। এরা ভেবে দেখে না যে কেউ বাইরে থেকে হাটে বাটে মাঠে ঘাটে কিছু শেখে না, শৈশবে বাল্যে-কৈশোরেই ঘরের-পাড়ার-প্রাথমিক-মাধ্যমিক, বিদ্যালয়েই এদের মন-মেজাজের কাঠামো পাকাপোক্ত হয়ে যায়—পরে দেহের মতোই তা পুষ্ট হয় মাত্র। তখন রুচি-বুদ্ধির প্রকার ও মাত্রানুযায়ী বিভিন্ন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের, মতের ও পথের প্রতি আসক্তি জন্মে। এভাবে মানসিক প্রবণতা তথা অনুরাগ অনুসারে নৈতিক-সামাজিক নীতি নিয়ম, রীতি রেওয়াজ মানা-নামানায় আপেক্ষিকভাবে মাত্রাভেদ ঘটে। যেহেতু দেশকাল এবং আর্থিক-নৈতিক-শৈক্ষিক অবস্থা ও অবস্থান ভেদে সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে বাঞ্ছিত মাপে ভালো -মন্দ ও মাঝারি বিবেচিত হয়। কাজেই নীতি-উপদেশে-কিংবা সৎসঙ্গে চরিত্রোন্নয়ন বা মানসিক উৎকর্ষ মধ্যযুগীয় অজ্ঞতাসুলভ ধারণা মাত্র। তত্ত্ব কথা বাদ দিয়ে কেবল আজকের গণ উদ্বেগ ও অভিভাবকের উৎকণ্ঠার জবাবে কেবল দুটো কথা বলছি।

এক, অনুন্নত দেশে প্রতীচ্য চেতনাজাত আধুনিক রাজনীতিতে নিরক্ষর আকীর্ণ আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় ছাত্র ব্যতীত রাজনীতি চলে না। নেতারা ছাড়া অন্য শিক্ষিতরা চাকরী ও পেশাজীবী, তাই লোকাভাব।

দুই, এ যাবৎ ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে যা যা করেছে সমকালীন সরকার ব্যতীত দেশের লোকেরা তাদের ভূমিকার, কাজের ও সাফল্যের তারিফ ও গৌরব করে। যেমন বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তি আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ। আজো সমকালীন সরকার এবং সমকালের কায়েমী স্বার্থবাজরাই 'শিক্ষা গেল গেল' করে হৈ চৈ করছে। এক্ষেত্রে তারা ছাত্রদের পূর্ব-কৃতি ও আন্দোলন স্মরণ করতে নারাজ।

এবার উপসংহারে বলছি। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা রাজনীতির নামে মারামারি, হানাহানি, ধর্মঘট-হরতাল করছে দেশের সরকারি-বেসরকারি কোন না কোন রাজনীতিক দলের সদস্য হিসেবে এবং দলের নির্দেশে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই অন্যের প্রাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরণ করছে। এবং বিভিন্ন দলের সমর্থক শিক্ষকরাও আড়ালে থেকে অদৃশ্যে উপদেশ-পরামর্শ-উত্তেজনা-প্রবর্তনা যোগাচ্ছেন। রাজনীতিক কর্মীদের কেউ কেউ এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে হয়েছে চাঁদাজীবী, হয়েছে মস্তান, হুকুম-হুমকি-হামলা চালিয়ে তারা অর্থবান ব্যক্তির ও সদাগরদের থেকে অর্থ আদায় করে। এর কারণ দেশে কোন শক্তিমান দলই নৈতিক বা আর্থ-সামাজিক আদর্শের রাজনীতি করে না, করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। কাজেই কোন আদর্শে শিক্ষার্থীদের তারা অনুপ্রাণিত করতে পারে না, ফলে অর্থের ও ক্ষমতা খ্যাতির লোভ দেখিয়ে ভবিষ্যতে অর্থে, পদে বা পেশায় প্রতিষ্ঠিত করার আশ্বাস দিয়ে ছাত্রদের প্ররোচিত করে নেতারা। ছাত্র সমাজে গুণ্ডা-মাস্তানের উদ্ভব ঘটে এভাবেই। কাজেই রাজনীতিক দল আওয়ামী লীগ-বি,এন,পি জামায়েতে ইসলামী, ফ্রিডম পার্টি ও সরকার যদি ছাত্রযুবকদের নিষেধ করে, তাহলে কি ওরা অকারণে মারবার ও মরবার এ খেলার ঝুঁকি নেবে?

পরিবেষ্টনীজাত সংস্কার ও তার প্রভাব

আমাদের সুপ্রাচীন ধারণায় পুরুষ রতিভোক্তা, নারী হচ্ছে সম্ভোগ্য। তাই পুরুষ যখন কারো মা-বোন নিয়ে রতিক্রিয়ার হুমকি দেয়, তখন উদ্দিষ্ট পক্ষ উত্তেজিত কিংবা কাবু হয় চরম অপমানবোধে। কিন্তু কোন নারী কখনো কারো বাপ-ভাই নিয়ে এমন হুমকি দেয়ই না। তার কারণও সেই সম্ভোগ্যার ওই সতীত্বের ধারণা। অতএব পুরুষের পক্ষে যা জয় প্রতীক, অন্যকে জব্দ করার উপায়, নারীর পক্ষে তা-ই পরাজয়ের, লজ্জার ও চরম অপমানের এবং সর্বনাশের ইঙ্গিত। অথচ আমরা যদি নারী-পুরুষের পার্থক্য সম্বন্ধে সনাতন ধারণা পরিহার করতে পারি, তা হলে ওই চরম অশ্লীল গালি তার অস্তিত্বই হারাবে, কারণ তা অপমান-উত্তেজনা প্রতীক 'বাণ' হয়ে থাকবে না।

তেমনি আমরা যদি মানুষের দেহ সম্বন্ধে আশৈশব লালিত ধারণা পরিহার করতে পারি, তাহলে হাতে ধারা, পায়ে পড়া, কান ধরা, ঘাড় ধরা, মাথায় হাত বুলানো, পিঠ থাবড়ানো কিংবা করে কপালে কপোলে চুম্বনের তাৎপর্য প্রভৃতির সংস্কারও যাবে বিলুপ্ত হয়ে।

স্বধর্ম নিন্দায় কিংবা স্বধর্মী হত্যায় যারা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে নরহত্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারাও এমনি এক পরিবেষ্টনীগত সংস্কারের দাস। তারা নিজেরা ধার্মিক নয় এবং স্বধর্মে আস্থা এবং স্বধর্মীপ্রীতিও যে তাদের গভীর এবং আন্তরিক তা-ও নয়। এ এমনি একটি মনস্তাত্ত্বিক সংস্কার কিংবা পরিবেষ্টনী প্রসূত আশৈশব লালিত ত্বকসম অবিচ্ছেদ্য এক সামাজিক আচারমাত্র। যেমন মা-বাবা-ভাইবোন এবং বাল্যের বাসভূম মানুষের প্রিয়, এতে আবেগ আছে, কোন যুক্তি নেই, কারণ এর সঙ্গে রূপ-গুণ-ধনের, ভালো-মন্দের, লাভ-ক্ষতির চেতনা প্রায়ই থাকে অননুভূত।

বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা চালিত শাস্ত্র-সমাজ মানা সাধারণ মানুষের পক্ষে উক্ত কোন আচার সংস্কার পরিহার সম্ভব ও স্বাভাবিক নয়, তবু জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনা-বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি প্রয়োগে মানুষ সংযমের ও সহিষ্ণুতার মাত্রা অবশ্যই বাঞ্ছিত মাপের ও মানের করতে পারে।

মুক্তি বৈরাগ্যে নয়, সুখ নেই আলস্যে

পাঁচ শ বছর আগে ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, Whoever finds pleasure in solitude is either a beast or a God: বাল্যে আপ্তবাক্য হিসেবে বাণী মুখস্থ করেছিলাম, এখন এ বৃদ্ধ বয়সে মনে হচ্ছে এ বাক্য মিথ্যাগর্ভ—অন্তত শূন্যগর্ভ। কেননা, পশু পাখি কীটপতঙ্গ কেউ স্বপ্রজাতি সঙ্গচ্যুত নয় মোটেও। তাদেরও রয়েছে দল-সঙ্গ-সংহতি-সভা। উই পিঁপড়ে থেকে বানর, হাতি, ভেড়া শস্যভুক টিয়ে পঙ্গ কাক শকুন প্রভৃতিই তার প্রমাণ। কোন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব নয় একক ও একাকি জীবন যাপন করা, নিঃসঙ্গ থাকা। আর ঈশ্বরতো একঘেয়ে একাকিত্বে ও নিঃসঙ্গতায় হাঁপিয়ে উঠেই বললেন- একোহম বহুস্যামঃ— বহুতে বিচিত্র হয়ে আমি আত্ম অনুভব ও আনন্দ উপভোগ করব। হাঁকলেন— —আলো এসো, তমস বিলুপ্ত হও। উচ্চারণ করলেন, 'কুন' হো যা, আমার শক্তি মহিমা মাহাত্ম্য প্রকটিত হোক, দেখে শুনে আমি আনন্দিত হই।

AMARBOI.COM

তাহলে নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, বেকারত্ব, দায়িত্বশূন্য, কর্তব্যরিক্ত জীবন কারুর কাম্য নয়। ভীড়ের ফাঁকে ফাঁকে নিঃসঙ্গতা, লাগাতার কাজে বিরতি, একটানা শ্রমের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম অবশ্যই কাম্য। এবং এরূপ নির্জনতা, নিঃশব্দতা, নিঃসঙ্গতা, বিরতি, বিশ্রাম ও ছুটি শুধু কাম্য নয়, হাঁপছাড়া পরম উপভোগ্যও। লাগাতার দুতিন মাসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে চাষাবাদ সমাপ্তি অন্তে চাষীও এক রকম মুক্তির আনন্দ অনুভব করে, তখন মনে মনে গায় 'আজ মেঁ' বহত খুশি হুঁ।' সকারণ হলেও দৃশ্যত বাস্তবে কোন প্রাপ্তি সুখ না থাকলেও একেই বলা চলে অকারণ পুলকানুভব।

যে যেই চাকরি বা ব্যবসাই করুক, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে করে বলে একঘেয়েমির দরুন মানসিক ক্লান্তিতে ভোগে। ছুটি পেলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে কিছুদিন। সে মানুষকেই চাকরি থেকে অবসর দিলে তার দিন কাটে না, তাকে গ্রাস করে ম্লানিমা ও অবসাদ, তার আয়ু কমে, জরা জীর্ণতা আক্রমণ করে থাকে। নিষ্কর্মার-বেকারের নিরুদ্দিষ্টের নিরুদ্দেশ্য অতিথির শুইয়ে বসেও কাটে না দিন।

সন্ত-সন্ন্যাসী-দরবেশ-বিরাগী-বিবাগীর জগৎচেতনা ও জীবনদৃষ্টি হচ্ছে আধিগ্রস্ত দেহ-মন প্রাণের বিকৃতিপ্রসূন। এ হচ্ছে জগৎ-জীবন ও পরিণামভীরু মানুষের পলায়ন-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি মাত্র। মুক্তি বৈরাগ্যের নয়, সুখ নেই আলস্যে।

বন্ধ্যা দম্পতি কি সন্তান লালনের ঝামেলামুক্ত বলে সুখী, সম্পদরিক্ত পরান্নজীবী নিষ্কর্মা মানুষ কি দায়িত্বমুক্ত বলে সুখী, উপার্জনের যোগ্যতাহীন পিতৃসম্পদনির্ভর আত্মীয়-পরিজন-পরিচিত সমাজে অবহেলিত মানুষ কি সুখী? আমাদের দৈশিক ধারণা অবশ্যি অদ্ভুত। পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাওয়া, বধূর খাটে বসেই গৃহকর্মহীন জীবনই ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের আদর্শ, জীবনে বাঞ্ছিত সুখে অবস্থান অবশ্য এ আলস্যানন্দের—এ আলস্যসুখের পূর্বশর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত সম্পদ ও হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর মতো অনুগত জন ও সেবক ভৃত্য। যেহেতু কর্মমাত্রই লঘু-গুরু দৈহিক কিংবা মানসিক শ্রম সাধ্য, সেহেতু শ্রম মাত্রই যেন সুখবিরুদ্ধ। অতএব, সুখানুভবের ও সুখোপলব্ধির এবং উপভোগের একমাত্র উপায় বা পন্থা হচ্ছে শ্রম তথা কর্মবিমুখতা, নিষ্ক্রিয় নিষ্কর্মা হয়ে জীবন যাপন। অথচ আমরা জানি দেহটার স্থিতির ও স্থায়িত্বের জন্যেই শ্রম আবশ্যিক। নিষ্কর্মারা যে কারণে ব্যায়াম করে, শ্রমসাধ্য খেলার উদ্ভাবনের মূলেই হয়তো রয়েছে নিষ্কর্মা ধনীলোকের শারীর প্রয়োজন। আজো গাড়ীওয়ালারা সকালে বিকেলে হাঁটাহাটি করে শারীরিক শ্রম করে স্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্যে।

মানুষের এ দৈহিক শক্তির বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনা যে অশেষ, তার প্রমাণ মেলে সার্কাসে অলিম্পিকে। সুপ্ত শারীর শক্তির উন্মেষের ও বিকাশের জন্যে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা-অনুশীলন করেছে আবাল্য বা আকৈশোর কিংবা আযৌবন, সেই ব্যায়াম বীরেরা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের-পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল-চোখ-চোয়াল-দাঁত শ্বাস প্রভৃতির শক্তির বিকাশের ও প্রয়োগের বিচিত্র কৌশল আমাদের দেখিয়ে থাকে। এ নরম দেহ নৃত্যে যেমন পেলব লতা এবং ভঙ্গিতে মুদ্রায় যেমন কুসুম কোমল হয়ে ওঠে, চর্চার ফলে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাষাণ-কঠিন হয়ে ওঠে, তাতে ইট ভাঙা কিংবা কুস্তি-মুষ্টি লড়িয়েদের লাথালাথি আর ঘুষোঘুষিই তার সাক্ষী। কোটি কোটি মানুষ দেহের এ সুপ্তশক্তির অনুশীলন করে না, খবরই রাখে না। এ ঔদাসীন্য মানব শক্তি-সভ্যতার বিকাশের অন্তরায়। এ মানবজীবনের-ব্যক্তিজীবনের ও শক্তির অব্যবহারজাত অপচয়। দেশের দুই বাহুহীন এক কিশোর পায়ের আঙুলে শুধু লেখে না, মাছ তরকারী কুটা থেকে সর্বপ্রকার গৃহকর্মও করে। ঢাকা টিভিতে তার নানা কর্মপটুতা দেখানো হয়েছিল। অন্যদিকে মন-মনন-মস্তিষ্কের নিয়মিত নিষ্ঠ পরিচর্যা, চর্চা বা অনুশীলনও যে মাটির মানুষকে স্ব-গড়া অতুল্য ও অসামান্য দেশ ও কালহীন এক অশেষ ও অদৃশ্য মনোজগতে বিচরণ শক্তি দান করে, তা-ও চির বিস্ময়কর। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-স্থাপত্য-ভাস্কর্য নয় কেবল, বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানের চর্চায় পরীক্ষণে পর্যবেক্ষণে গণিত বিদ্যার প্রয়োগে আজ মানুষ বিশ্বের স্বরূপ ও সীমা খুঁজে বেড়াচ্ছে, বের করছে জাগতিক প্রাকৃতিক সব কিছুর কারণ-ক্রিয়া, ভেদ করছে সব রহস্য, বানাচ্ছে বিস্ময়কর সব যন্ত্র। অবসান ও বিলুপ্তি ঘটছে সব অলীক ও অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-বুজুরকির।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সাধারণভাবে দেহ-প্রাণ-মন-মস্তিষ্কের অসামান্য সুপ্ত শক্তি সম্বন্ধে উদাসীন। কেবল কিছু বিশেষ প্রবণতার ব্যক্তি ব্যতিক্রম মাত্র। ওঁরাই সব আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কর্তা, দেহ-মনের সুপ্তশক্তির উন্মেষ-বিকাশ সাধক, সে-মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় শত কোটিতে গুটিক, মনুষ্যশক্তির অব্যবহারের কি বিপুল অপচয়! প্রশিক্ষণ পেলে পশু পাখি মাছ তথা জল-স্থল ও আকাশচর প্রাণী বিস্ময়কর শক্তির, বুদ্ধির ও নৈপুণ্যের প্রমাণ দেয়। অতএব একালে মনুষ্য সন্তানের শিক্ষার লক্ষ্য হবে দেহের, প্রাণের, মনের, মস্তিষ্কের ও মননের স্ফূর্তিসাধন। শিক্ষার সর্বাত্মক ও সর্বার্থক ব্যবস্থা করা ও রাখা হচ্ছে কালের দাবি। জাহাজে-বিমানে গতিদানের জন্যেই যেমন ইন্ধনের ব্যবস্থা—এটি উপায় মাত্র লক্ষ্য নয়, তেমনি মনুষ্য জীবনে তো নয়ই প্রাণিজগতে-জীবজীবনেও হয়তো আহার-নিদ্রা-মৈথুন জীবনের লক্ষ্য নয়, ভাব-চিন্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মে-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে দেহ-প্রাণ-মন-মস্তিষ্ক-মনন নিয়োজিত রাখার শক্তি সরবরাহের ও প্রণোদনাদানের উদ্যম অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেই শ্রান্তি, ক্লান্তি ও গ্লানিহর আহার-নিদ্রা-মৈথুন আবশ্যিকমাত্র। সুতরাং জীবনের সুখ-সার্থকতা ও আনন্দ দায়িত্বমুক্ত নিষ্ক্রিয়তায় নয়, দায়িত্বের বন্ধন স্বীকারে, কর্তব্যের দায়বদ্ধতায়, দেহ-প্রাণ-মন-মস্তিষ্কের সর্বাত্মক ও সর্বার্থক অনুশীলনে, ব্যায়ামে, চর্যাকল্প চর্চায়, ব্যক্তিজীবনকে কোন না কোন ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল করার অঙ্গীকারে।

আত্মরক্ষা নিরাপদ ও সুনিশ্চিত হলেই, আত্মপ্রসারে প্রয়াসী হওয়া জৈব প্রবৃত্তি বা স্বভাব, কাজেই মানুষ মাত্রই আত্মপ্রসার ও প্রতিষ্ঠাকামী। কিন্তু যৌথজীবনে পারিবারিক, নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের ও প্রথা-পদ্ধতির নিগড়ে নিবদ্ধ মানুষ অবস্থা ও অবস্থান ভেদে অনেক অনেক জৈব-বাঞ্ছাকে সুপ্ত ও সংযত রাখে। তাই ব্যক্তিমানুষের তথা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে কেবল গতানুগতিক আবর্তন থাকে, বিকাশ বিবর্তন থাকে না। একালে সংহত বিশ্বে অনুকৃত বিবর্তন ও কৃত্রিম বিকাশ বলতে গেলে প্রায় প্রতি মুহূর্তেই ঘটছে।

আজ সময় এসেছে, প্রতিটি শিশুর-বালকের-কিশোরের দেহ-প্রাণ-মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ দানের জন্যে বিদ্যালয়ে; পাড়ায় ও বাড়িতে সাধ্যমতো সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বা আয়োজন রাখা। মানুষের সর্বাত্মক ও সর্বার্থক বিকাশ ঘটানোর প্রয়াসস্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্রে নবপদ্ধতির নবযুগ আনা আবশ্যিক। মনে রাখতে হবে, মানুষের অঙ্গ ও অন্তর দুটোই সমগুরুত্বের।

আমাদের বুঝতে হবে, জীবনের সুখ, সার্থকতা ও আনন্দ অলসতায়, নিষ্ক্রিয়তায়, পরসম্পদজীবিতায়, নিরীহতায়, কিংবা পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাষ্ট্রিক জীবনে অপরিচিতিতে-অপ্রতিষ্ঠায় নয়, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠায়। দায়িত্বচ্যুত বা কর্তব্যরিক্ত জীবন মাত্রই বৃথা ও ব্যর্থ সামাজিক দৃষ্টিতে। তাই 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে 'কারুর' নয়।

অসংখ্য বন্ধনের মাঝে 'লভিবে মুক্তির স্বাদ।' জীবনের মূল্য, মর্যাদা ও সার্থকতা এখানে। আবার বলি মুক্তি, সুখ, আনন্দ, আরাম বৈরাগ্যে আলস্যে নয়, দেহ-প্রাণ-মন-মস্তিষ্ক-মননের স্ফূর্তিতে।

তিনটি আবশ্যিক সাংবিধানিক অঙ্গীকার

রাজ্য রাষ্ট্র গড়ে ওঠে পৃথিবীর মাটির উপর জীবন্ত জনের প্রয়োজনে ও স্বার্থে জনশাসনের ও জনকল্যাণের লক্ষ্যে। সে কল্যাণ ও প্রশাসন আবশ্যিক মানুষের নিজ নিজ স্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায়, সহাবস্থানের জন্যেই। কেননা যৌথ বা দলবদ্ধজীবনে বলা-চলা-করার সর্বক্ষেত্রেই নিরুপদ্রবে বাঁচার ও বাঁচতে দেয়ার জন্যেই পারস্পরিক বোঝা-পড়া ও সমঝোতা জরুরী।

কাজেই রাজ্যের, রাষ্ট্রের সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে অশন বসন-নিবাস-নিদান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য অর্জনের ও রক্ষা নিরাপদ নির্বিঘ্ন ব্যবস্থা করা ও রাখা। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি মানুষের জীবন-জীবিকা নিরুপদ্রব-নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যূথবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সবাইকে মানসিক স্বস্তি-সুখ-আরাম-আনন্দ সম্বন্ধে যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব আশ্বস্ত রাখাই হচ্ছে রাষ্ট্রের ও সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। সবটাই মর্ত্য মানবের পার্থিব জীবনে আবশ্যিক। এর মধ্যে আসমানী কিছুই নেই, সবটাই জমি সম্পৃক্ত মাটিলগ্ন জীবনের মৌল চাহিদা-অপরিহার্য প্রয়োজন।

আধুনিক ভাষায় ও সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের ও সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে কৃষি-শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ-বিস্তার সাধন, আমদানী হ্রাসের ও রপ্তানী বৃদ্ধির নিত্য প্রয়াসনিষ্ঠা। জনগণের আর্থিক জীবনে সাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য দান লক্ষ্যে অর্থনীতি নির্ধারণ, দেশে জনজীবনে নিরাপত্তার স্বস্তিশান্তি রক্ষা লক্ষ্যে আইন প্রয়োগ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সততা সতর্কতা ও নিষ্ঠা, মানুষের মৌলিক ন্যূনতম অধিকারের বাস্তব স্বীকৃতি এবং মৌল ও ন্যায্য দাবি রক্ষণ, তথা তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের, মনুষ্যোচিত কুটিরের, রোগে চিকিৎসার, পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার এবং সাধারণভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল পরিবেশ রক্ষণ, সরকারের কাজই হচ্ছে কুশল অকুশল বর্ধিষ্ণু জনগণের যোগ্যতানুসারে কাজের ব্যবস্থা করা ও রাখা। একালে তা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কল-কারখানা স্থাপনে, পণ্য উৎপাদনে-নির্মাণেই সম্ভব। রপ্তানীমূলক বহির্বাণিজ্য এ জন্যে আবশ্যিক।

আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের জীবিকাগত নিরাপত্তা এবং আর্থিক সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্য কাম্য। এজন্যে নীতিনিয়ম-রীতিরেওয়াজ মানা ও আইন-শৃঙ্খলার অনুগত নাগরিকের বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকা আবশ্যিক। সরকার ও প্রশাসকের আদর্শানুগত্য, ন্যায়নিষ্ঠা এবং মাটি ও মানুষ প্রীতি না থাকলে তা কখনো সম্ভব হয় না। তার প্রমাণ পৃথিবীর অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো।

AMARBOI.COM

আর্থিক সাচ্ছল্যে ও স্বাচ্ছন্দ্যে মানসিক উৎকণ্ঠা মুক্তিজাত একটা নিঃশঙ্ক নির্বিঘ্ন-নিশ্চিত অন্তত ন্যূনতম মাত্রায় তৃপ্ত ও তুষ্ট মনেই জাগে উপলব্ধির ও অনুভবের সূক্ষ্ম জগতে বিচরণের সাধ। আর এ অনুভব-উপলব্ধিই রয়েছে মানবিকতার, মানবতার, মনুষ্যত্বের বাঞ্ছিত আবশ্যিক গুণগুলোর উদ্ভবের মূলে। আত্মোপলব্ধির, পরপ্রীতির, পরার্থে কাজের, বহুজনহিত ও বহুজনসুখ লক্ষ্যে কাজ করার, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণে সৌন্দর্য-সুষমার লাবণ্য সৃষ্টির। চিত্রে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে রূপ সৃষ্টি, নাচে-গানে বাদ্যে সুর-লয়-তানের সমন্বিত সুষম লাবণ্য-মাধুর্যদানে, চারু দারু-কারুশিল্পে অনুভূতি-উপলব্ধির ও ভোগবাঞ্ছার আর রূপতৃষ্ণার অভিব্যক্তি এবং পৃথিবী ও মর্ত্য জীবন যে একটা অনুপম-নিরুপম অনিঃশেষ বিস্ময়কর, আনন্দ-বেদনায় অসামান্য ঐশ্বর্য, দুর্লভ সম্পদ সে-অনুভব-উপলব্ধি সুখের অবলম্বন, এমনি জীবন-ভাবনার ও জগৎ-চেতনার, জীবনের ও জগতের তাৎপর্য বোধের অভিব্যক্তি হচ্ছে শিল্প–সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান। এককথায় জীবন ও জগৎ তত্ত্বের সামূহিক, সামগ্রিক ও সামষ্টিক রূপ-স্বরূপের, তত্ত্বের ও তথ্যের, জিজ্ঞাসার সন্ধিৎসার-গোটা জীবন প্রেরণার ও প্রয়াসের উৎস হচ্ছে ওই অনুভব ও উপলব্ধি।

এ অনুভব-উপলব্ধির জগতে বোধ-বুদ্ধিস্বল্প দুর্বলচিত্ত মানুষের ভয়-ভক্তি-ভরসাপ্রসূত বিস্ময়-কল্পনা-বিশ্বাসজাত সৃষ্টি হচ্ছে ভূত-ভগবান-সৎ-অসৎ, অরি-মিত্র, ভালো-মন্দ প্রতীক শক্তির কাল্পনিক ধারণা—যা যুগে যুগে দেশে দেশে গোত্রে-গোত্রে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির প্রসারের ফলে বর্জনে-গ্রহণে বারবার পাল্‌টে গেছে ও যায়। এ হচ্ছে পরলোকে প্রসৃত দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির জীবন, মন ও মনন-আশ্রিত সংস্কার ও বিশ্বাস, —যুক্তিগ্রাহ্য তত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা তথ্য নয়। রাষ্ট্রের ও সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের ঐহিক-জীবন সম্পৃক্ত সম্পদে ও সমস্যায় সীমিত।

বিভিন্ন শাস্ত্রিক মত-পথের নাগরিক অধ্যুষিত আধুনিক রাষ্ট্রে পালন অসাধ্য অসম্ভব বলেই মানুষের পারত্রিক হিতাহিত সম্পৃক্ত কোন বিষয়ই রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্যভুক্ত হতেই পারে না। স্থূল গণতান্ত্রিক কিংবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাস্ত্রিক আচরণ থাকবে ব্যক্তির ঘরোয়া জীবনে নিবদ্ধ। শাস্ত্রের ও শাস্ত্রিক ভাব চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অসহযোগিতার ও অস্বীকৃতির নামই হচ্ছে সেক্যুলারিজম। কাজেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিবদ্ধ থাকবে মানুষের সর্বপ্রকার ঐহিক বা ইহজাগতিক কল্যাণ সাধনে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নয় কেবল, আধুনিক বুর্জোয়া-নিয়ন্ত্রিত স্থূল অর্থের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও তিনটে মৌলনীতি আবশ্যিক: কাজ দিয়ে যোগ্যতানুসারে ভাত-কাপড় যোগানের ব্যবস্থা রাখা। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিকের মৌল মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা ও তার বাস্তবায়ন, আর দুর্নীতি ও দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী-দুর্নীতিবাজ থেকে প্রশাসনকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা। অর্থাৎ মোটা দাগের তিনটে নীতি সাধ্যানুসারে জানা-মানা-বাস্তবে প্রয়োগই কেবল রাষ্ট্রিক স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুখ ন্যূনতম মাত্রায় হলেও রক্ষা করতে পারে: আর্থিক বা আর্থনীতিক ন্যায়, সামাজিক ন্যায় ও প্রাশাসনিক ন্যায় মেনে চলার প্রয়াসে সরকার আন্তরিক হলেই মানুষের কিছুটা নিরুপদ্রব স্বস্তির জীবন হবে নিশ্চিত। নইলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বৃথা ও ব্যর্থ হয়ে যায়।

এমনি অবস্থাতেই মধ্যে ও উচ্চে অবস্থানের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনাচারে, রুচিতে, সৌন্দর্যানুধ্যানে, মনে-মননে তথা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে শিল্প-সাহিত্যাদি সর্বপ্রকার কলার চর্চায় উচ্চ, সূক্ষ্মঃ, সুন্দর ও বাঞ্ছিত মানবিকতা, মানবতা ও মনুষ্যত্ব সঞ্জাত গুণের প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। এ অভিব্যক্ত বা বিচিত্রভাবে পরিব্যক্ত গুণের ও চেতনার বস্তুগত ও ভাবগত রূপায়ণের নামই 'সংস্কৃতি'। ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে এর সুষম-সুন্দর লাবণ্য এবং সামূহিক, সামগ্রিক ও সামষ্টিক রূপায়ণই জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ব্যক্তিকে সুজন, সমাজকে ভব্য এবং জাতিকে সভ্য করে ও দেশ-কালের উপযোগী রাখে।

অনুভব কণিকা

১. কাঙ্ক্ষার পূর্তি-অপূর্তির সামষ্টিক অনুভূতিই সুখদুঃখময় জীবন।

২. কর্মে আচরণে কাঙ্ক্ষাজাত জীবনানুভূতিরই ঘটে প্রকাশ ও বিকাশ।

৩. সবাই চায়, সুন্দর স্বপ্নে ভরে উঠুক বুক এবং স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়নে জীবন হোক ধন্য।

৪. জীবনকে ফুলের মতো পরিচ্ছন্ন ও অম্লান রাখাই, জীবন সফল ও সার্থক করাই, সঙ্গ-সংলাপ আকর্ষণীয় করাই প্রতি মানুষের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক।

৫. শৈশবে বাল্যে কৈশোরে জাগে ভাবী জীবনের নানা সাধ ও স্বপ্ন। যৌবনে চলে সেসব স্বপ্ন-সাধের বাস্তবায়নের যথাশক্তি প্রয়াস। আর বার্ধক্যে জড়তা-জীর্ণতা প্রাপ্ত জীবন হচ্ছে ফসল-তোলা শূন্য প্রান্তর। স্বপ্নহীন-কর্মহীন জীর্ণ জীবন কেবল স্মৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমন্থন। বর্তমান নেই, নেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কেবল অতীতই স্মৃতির সম্বল। তাও সবার পক্ষে সুখের নয়। জীবনের ক্ষেত্রে কারো শস্য নষ্ট হয়েছে খরায়, কারো ফসল পচে গেছে বন্যায়, কারো ক্ষেত বিনষ্ট করেছে ঝড়।

৬. জীব-উদ্ভিদের সচেতন-অবচেতন সার্বক্ষণিক প্রয়াসই হচ্ছে অস্তিত্বের স্থিতি ও বিস্তৃতি সাধন।

৭. প্রিয়া কোল দেয়, পৃথিবী করে লালন, —এ দুটো ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন হলেই জীবন হয় আনন্দিত স্বপ্ন।

৮. শেষরাত্রে আঁধার ক্ষণে ক্ষণে কাটে—ফিকে হতে থাকে, আলোর আভাস বাড়ে, হয় ঘন। আর সন্ধ্যায় বাড়তে থাকে আঁধার। তাই উষা হচ্ছে আশ্বাসের প্রতীক আর সন্ধ্যা হচ্ছে নৈরাশ্যের।
আলো জ্ঞানের ও অভয়ের প্রতীক, আর আঁধার অজ্ঞতার ও ভয়ের আকর।
উষার শৈত্য ও শিশির শরীরের ক্ষতি করে না, কেননা উষার গতি ক্রমোষ্ণতার দিকে, সন্ধ্যার শৈত্য ও শিশির দেহে তাদের প্রভাবে ক্রমশ গভীর করে ও ক্ষতি করে।

৯. বিস্ময়-কল্পনা-ভয়ভক্তি-জরা-সাজাত লৌকিক, অলৌকিক, অলীক ও শাস্ত্রিক সংস্কার বিশ্বাসকে এক শব্দে Prejudice সংজ্ঞায়িত বা অভিহিত করলে এ Prejudice বর্জন করে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে জ্ঞান ও যুক্তি প্রয়োগই হচ্ছে 'আধুনিকতা।'

১০. আদর করা ও কাড়া, আদর পাওয়া ও দেওয়া মনুষ্য স্বভাব এবং জীবনানুভূতির আবশ্যিক অঙ্গ বা অংশ। আদর আনন্দ পাওয়ার ও দেওয়ার জন্যেই।

১১. অর্থ-বিত্ত ভীরুকে করে সাহসী, খ্যাতি বিনয়ীকেও করে উদ্ধত।

১২. পাকিস্তানীদের ইসলামি দৌরাত্ম্য একবার আমাদের বাঙালী ও সেক্যুলার করেছিল, এবার স্বদেশীর ও স্বধর্মীর ইসলামি হামলা আমাদের নাস্তিক কিংবা শাস্ত্রদ্রোহী করবে।

১৩. প্রাণিজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক রয়েছে বলে দুর্বলকে দেখলে তাড়া করে, আর প্রবলকে দেখলে পালায়, খাদক তাড়া করে, খাদ্য প্রাণ নিয়ে পালায়। মানবে বাঞ্ছিত অনুশীলিত গুণের অভাবে সাধারণ মানুষও তার হাত রাখে প্রবলের পায়ে আর দুর্বলের ঘাড়ে।

১৪. আমাদের কর্তব্য কি? ২১শে ফেব্রুয়ারির গৌরবের রোমন্থন, না সমকালীন সঙ্কটে-সমস্যায় ২১শের সংগ্রামের অনুসরণ।—সংগ্রামের অনুসরণ, না গৌরবের রোমন্থন?

১৫. কাল আছে দুটো ঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ। প্রতি মুহূর্তে ভবিষ্যৎ ক্ষণকালিক বর্তমান হয়ে অতীত হয়ে যাচ্ছে।

১৬. জীবন-প্রয়াসের ও জীবন-সংগ্রামের প্রসূন ও উপজাত হচ্ছে সংস্কৃতি। প্রাত্যহিক জীবনে সত্তার সংরক্ষণের ও সম্বিৎ সম্প্রসারণের প্রয়াসেই সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পুষ্টি। সংস্কৃতি তাই যুগপৎ ব্যক্তিক ও সামাজিক সৃষ্টি।

১৭. সার যেমন জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে, জ্ঞানও তেমনি মনন শক্তির উৎকর্ষ ঘটায়।

১৮. জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস এবং সংকল্প-উদ্যোগই হচ্ছে জীবনে আকাঙ্ক্ষা পূর্তির ও কর্মে সাফল্যের মূল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯. রবীন্দ্রসঙ্গীত এক অর্থে আকাশচারিতা আর নজরুলগীতি হচ্ছে মাটিঘেঁষা শারীরগন্ধী। একটি স্বর্গের-ভূমার, অপরটি মর্ত্যের—ভূমির। একজন আকাশচারী, অপর জন মর্ত্যবিহারী, রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম, নজরুল স্থূল।

২০. কল্পনা-বিশ্বাস-আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ম্যাজিক, আর ঐহিকতা হচ্ছে লজিক। তাই যুক্তিই জীবনাচারের নিয়ামক।

২১. আজো দুনিয়াটা জানে-মালে, ঘাড়ে-গর্দানে, খ্যাতিতে-ক্ষমতায় নামদার ও জোরদার ব্যক্তিদের কবলগত। সৌজন্যের, সততার ন্যায়পরায়ণতার অনুগত হয়ে মানুষ কবে যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে গণমানবকে পীড়-শোষণ, জোর-জুলুম মুক্ত করবে!

২২. উৎপাদনের ও বণ্টনের গুরুত্ব ও অন্ধি-সন্ধি বুঝে সমাজের ব্যষ্টি নির্বিশেষে সবার হিতার্থে উন্নততর পদ্ধতিতে ও নিপুণতায় উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থা করে জনগণের জীবনে ভাত-কাপড়ের তথা অশন-বসন-নিবাস-নিদানের চাহিদা সুনিশ্চিত করে ব্যক্তি জীবনে স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাধিকারে স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ রাখাই আদর্শ সংস্কৃতির পরিমাপক ও পরিচায়ক।

২৩. সৃষ্টির জগতে অপচয় অশেষ। ফুল ফোটে অসংখ্য কিন্তু ফল ধরে কয়টি? মুকুলিত আম গাছ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জীবনের জন্যে লাগে মাত্র একটা কীট কিন্তু নষ্ট হয় কত!

২৪. যন্ত্রণামুক্ত জীবন নেই। তাই যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি ও সংযম চাই।

২৫. সুখ কেউ দিতে পারে না, সুখ পেতে জানতে হয়, সুখ বাইরে নেই। সুখ চিত্তলোকে সৃষ্টি করতে হয়।

২৬. প্রীতিহীন হৃদয় ও নির্লক্ষ্য কর্ম দু-ই বন্ধ্যা।

২৭. গুণ ও গন্ধ গোপন রাখা যায় না।

২৮. মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়। কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারো প্রতি ভালো, কারো প্রতি মন্দ, কারো জন্যে ভালো, কারো জন্যে মন্দ, কারো কাছে ভালো, কারো কাছে মন্দ।

২৯. মানুষের প্রীতিই জীবনের শ্রেষ্ঠ পুঁজি ও পাথেয়। স্মৃতির মধুরতম সঞ্চয়।

৩০. জ্ঞান ও যুক্তি মানুষকে প্রতারিত করে না।

৩১. বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা স্বাধীন চিন্তা-চেতনার ও আত্মবিকাশের পরিপন্থী।

৩২. একের অভিজ্ঞতাই অন্যদের জ্ঞান।

৩৩. দেশে কালে মনীষী-মনস্বীরা চিন্তানায়কের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা সময়-সচেতন মোরগের বাঙের মতোই দেশকালগত মানুষের নৈতিক-আর্থিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক চাহিদার কথা উচ্চারণ করেন। কিন্তু সমাজে স্বার্থপর ধূর্তলোকের এবং আত্মপ্রেমী ছা-পোষা মানুষের সংখ্যাধিক্যের দরুন দেশে সমস্যা-সঙ্কট প্রবহমান থেকেই যায়।

৩৪. যুক্তিনিষ্ঠার অপর নামই বিবেকবানতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫. দিনের আলো এবং রাস্তার অপরিচিত লোক আমাদের নির্ভয় রাখে। রাতের অন্ধকার ও নির্জনতা আমাদের ভীত করে।

৩৬. পরের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনাকে নিজের বলে অনুভব করাই সাহিত্যরস।

৩৭. বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির এবং সংকল্পের সঙ্গে উদ্যোগের যোগ ঘটলে কাজে সাফল্য সম্ভব হয়।

বিদ্যাসাগর—চরিত্রে, চেতনায় ও কৃতিত্বে

। ১।

যে-কোন মানুষের আত্মরক্ষার, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মপ্রসারের জন্যে তিনটে গুণ থাকা আবশ্যিক—বুদ্ধি, সাহস ও সঙ্কল্প। বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির এবং সঙ্কল্পের সঙ্গে উদ্যোগের যোগ ঘটলে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উত্তরণ নিশ্চিত হয়। উনিশ শতকের অনন্য-অসামান্য পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এসব গুণই ছিল। এগুলোর সঙ্গে আর যা ছিল তা হল সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অহমিকা। এরই প্রসূন হচ্ছে তীব্র আত্মাভিমান ও আত্মমর্যাদা চেতনা। বলা বাহুল্য অবিচলিত আদর্শনিষ্ঠা ও সার্বক্ষণিক লক্ষ্যচেতনা এমনি দৃঢ়মূল আত্মমর্যাদা চেতনারই ফল। এমন মানুষ মনে-মননে, বুকে-মুখে, কথায়-কাজে অভিন্ন না হয়েই পারে না। এমন মানুষ মাত্রই হয় বিবেক চালিত নির্ভীক শ্রেয়োবাদী। আর যুক্তিনিষ্ঠার অপর নামই বিবেকবানতা। দুধে চনার মতো বিদ্যাসাগরের এতসব গুণের মধ্যে ছিল তাঁর জন্মসংবাদে পিতামহ অনুমিত ও উচ্চারিত এঁড়ের বা ষাঁড়ের স্বভাব। ষাঁড় অহমিকা বশে সর্বক্ষণই থাকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ, অসহিষ্ণু ও আস্ফালনপ্রবণ। আত্মপ্রত্যয়ী ষাঁড় স্থান-কাল প্রতিবেশ মানে না। বিদ্যাসাগরেরও ছিল ফলাফল নিরপেক্ষ একগুঁয়েমি ও জেদ, তিনি ছিলেন একরোখা ও একগুঁয়ে, গোঁয়ার ও জেদী। তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এ ছিল তাঁর সিদ্ধি-সাফল্যের পথে বড়ো বাধা। এ জেদই তাঁর জীবনে-জীবিকায় ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে কাজ করেছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রী শক্তি ও অমোঘ নিয়তিরূপে। তাঁকে চাকরী ছাড়তে হয়েছিল, বিধবা বিবাহে সর্বস্বান্ত হয়ে বিরত হতে হয়েছিল, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধেও হতে হয়েছিল ব্যর্থ। শিক্ষাবিস্তারেও আসেনি বাঞ্ছিত সাফল্য। জেদী একরোখা বলেই তিনি বুঝতে চাননি যে তিনি নারী মুক্তির ও তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তখনি যা কিছু করতে চাইছেন তার জন্যে প্রতীচ্য শিক্ষা প্রসার আবশ্যিক ছিল। পরিবেশ অনুকূল ছিল না বলেই তাঁর প্রয়াস পাথুরে বাধায় প্রতিহত হচ্ছিল। দান-দয়া-দাক্ষিণ্যের, কৃপা-করুণার প্রাবাদিক ও প্রাবচনিক 'সাগর' বিদ্যাসাগরের স্বকালে কোলকাতার সমাজে প্রত্যাশিত লোকপ্রিয়তা ও গুণ-স্বীকৃতি ছিল দুর্লভ। যদিও গাঁয়ের ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বহুবিবাহ নিরোধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন আন্দোলনের নায়ক বা প্রবক্তা হিসেবে তখনই তিনি জনপ্রিয় এবং সে কারণে তাঁর ছবিও ঘরে ঘরে সমাদৃত ও রক্ষিত। এমনকি তাঁর স্বকালে তাঁর সাহিত্যিক অবদানও ছিল না সর্বজন স্বীকৃত, ভাষা-শৈলীর ঋণও ছিল ক্বচিৎ উল্লেখ্য। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচিত ও সংকলিত পাঠ্য-পুস্তকের উপযোগ ও উৎকর্ষ স্বীকৃত হলেও, তাঁর শিক্ষা-নীতি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি। ফলে আমরা হতাশ বৃদ্ধ দরিদ্র নিঃসঙ্গ ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগরকে আবাল্যের আবাস কোলকাতা ছেড়ে সাঁওতাল গাঁ কার্মাটাড়ে পলাতক জীবন বরণ করতে দেখি। এ মহৎ জীবনের কত বড়ো ট্রাজেডী ভাবতেও ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু এ ছিল দ্রোহী বিদ্যাসাগরের অসহযোগী শহর ও সমাজ বর্জন মাত্র—পরাজয় বা পলায়ন নয়। কারণ তিনি বাঙালীর উদ্যমহীনতায়, উদ্যোগবিমুখতায়, চারিত্রিক দুর্বলতায় ও মানসিক অসারতায় ক্ষুব্ধ[১] বিরক্ত হলেও ব্রতভ্রষ্ট হননি। তার প্রমাণ তিনি কার্মাটাড়ে বাড়ি ও বাগান করে বাস করলেও কোলকাতায় তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে ঘন ঘন কোলকাতায় যাতায়াত করতেন। কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের হোমিও চিকিৎসা করতেন, পথ্য দিতেন, তাদের দারিদ্র্য দর্শনে ও অনুভবে বেদনা পেতেন।

প্রৌঢ় বয়সে [১৮৬৯ (১২৭৬ বঙ্গাব্দে) সনে] উনপঞ্চাশ বছর বয়সে একবার তিনি শান্তিপূর্ণ নিষ্ক্রিয় নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনে আকস্মিকভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন,[২] তখন তাঁর পিতামাতাও জীবিত। এ অবশ্য নিতান্ত সাময়িক কোন অভিঘাতজাত মানসিক অবসাদের ফলও হতে পারে। এতেই বোঝা যায় তিনি গৃহী হয়েও অর্থসম্পদে এবং ভোগ উপভোগে ছিলেন অনাসক্ত, বিষয়ী হয়েও ছিলেন বিবাগী। তাঁর দানে দয়ায় কৃপায় করুণায় আর্তের সেবায় ও দাক্ষিণ্যেই ওই বিরাগী-বিবাগী মহৎ মনস্বী বিদ্যাসাগরের পরিচয়ই হয়েছে প্রকট। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সেই ১৮৭৫ সনে মৃত্যুর পনেরো বছর আগেই করা Will সূত্রেও বোঝা যায়, তাঁর ভোগাসক্তির চেয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনাই ছিল প্রবল।

বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বারবার প্রমাণ করেছেন যে ঈশ্বর মানে কারুর আদেশে-নির্দেশে-হুকুমে-হুমকিতে হুঙ্কারে ও হামলায় বিচলিত না হওয়া, কারুর কাছে মাথা নত না করা, কোন ত্রাসে ত্রস্ত না হওয়া, কোন ভয়ে শঙ্কায় বিব্রত না হওয়া, কারুর সাহায্যের ভরসায় না থাকা, যথাশক্তি লড়ে যাওয়া, সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে সঙ্কল্পে অটল থাকা, কখনো পিছু না হঠা, প্রতিকারে এগিয়ে আসা, প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হওয়া, ঈশ্বর মানে আপোসহীন অনবরত সংগ্রাম। তিনি জানতেন বুদ্ধি, সাহস ও সঙ্কল্পই ব্যক্তি জীবনের পুঁজি ও পাথেয়। আদর্শনিষ্ঠাই জীবনের চালিকা শক্তি। লক্ষ্যনির্দিষ্ট চেতনাই জীবনের দিশারী। আরো জানতেন এবং মানতেন যে জ্ঞানের চেয়ে মান বড়, তার চেয়েও বড় মনের ও মননের স্বাধীনতা। তাই ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের বহুক্ষেত্রে ঈশ্বরের মতোই অনপেক্ষ। তবে পরার্থে, আর্তের সেবায় ও সাহায্যে সামর্থ্যাতীত অর্থব্যয় করতে হয়েছে বলে করুণাময় দরদী বিদ্যাসাগরকে বাকি-বকেয়ার জন্যে এর-ওর কাছে ধর্ণা দিতে হয়েছে। হাত পাততে হয়েছে ঋণের জন্যে। একবার সাড়ে সাত হাজার টাকার জরুরী ঋণ শোধের জন্যে তাঁকে ঋণ চেয়ে নাটোরের রানীর কাছে আবেদনও করতে হয়েছিল।[৩]

বহরে ছোট, মাথায় বড়ো, মাপে ছোট, মানে বড়ো, মনে বিরাট, মননে বিশাল। প্রসৃর্ত মনুষ্যত্ব, মূর্তিমান মানবতা, উন্নতশির, একরোখা একগুঁয়ে-গোঁয়ার জেদী-দ্রোহী-দরদী ঈশ্বরচন্দ্র তাই উনিশ শতকের বাঙলার-ভারতের-কোলকাতার লক্ষ-কোটি মানুষের ভীড়ের মধ্যেও একক, স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ, অতুল্য, অনন্য ও অসামান্য। তাই তাঁর চিন্তার ও কর্মের অসিদ্ধি ও অসাফল্য সত্ত্বেও গোটা উনিশ শতকে অসাধারণ ব্যক্তি ও চরিত্র হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিত্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। খুঁত তাঁরও ছিল, কিন্তু তা অন্যদের মতো তেমন প্রকট ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় স্বকালের অসংখ্য বাঙালীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই ছিল একমাত্র যথার্থ বাঞ্ছিত মানুষ। কালান্তরে এখন বিদ্যাসাগর আমাদের স্মরণীয় কেন? তা কি তাঁর আদর্শনিষ্ঠার জন্যে, নারী দরদী বলে, শিক্ষাবিস্তারে নিষ্ঠ বলে, ভাষা-সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্যে, সর্বসংস্কার মুক্ত উদার মানবতাবাদী বলে কিংবা তাঁর জেদী ব্যক্তিত্বের জন্যে? রবীন্দ্রনাথই বা তাঁকে কোন্ তাৎপর্যে বাঙালীর মধ্যে 'মানুষ' আখ্যাত করেছিলেন, সে-কি আত্ম ও জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতীক প্রমূর্ত বাঙালী সত্তা, হিমালয় সম চিরউন্নত শির অনমনীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বা দৃপ্ত পৌরুষ বলে? বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবদরদী মানুষ, মানুষই ছিল আমাদের এ ঈশ্বরের সেব্য! অর্থে-বিত্তে বঞ্চিত নিঃস্ব নর আর স্বাধিকারহৃত ব্যর্থ ও বৃথা জীবনের যন্ত্রণা কাতর নারীই ছিল তাঁর সেবার ও সহানুভূতির, কৃপার ও করুণার, দানের ও দাক্ষিণ্যের পাত্র-পাত্রী। নিঃস্ব বিপন্নের বিপন্মুক্তির, বঞ্চিতা নারীর বঞ্চনা মুক্তির চিন্তায় ও প্রয়াসেই নিয়োজিত ছিল তাঁর কর্মজীবন। আর প্রায় সমান গুরুত্বে কাজ করেছেন জ্ঞানচক্ষুদান লক্ষ্যে শিক্ষাবিস্তারে। বিদ্যাসাগর ছিলেন চিন্তার ও কর্মের ক্ষেত্রে চির নিঃসঙ্গ আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ। অপরের সহযোগিতায় সৎকর্ম করার জন্যে মত সহিষ্ণুতায় মিলে মিশে পরমত বা পরামর্শ গ্রহণে স্ব-মতের আংশিক বর্জনে তিনি রাজি ছিলেন না কখনো। মত পার্থক্যের জন্যেই দু'বার চাকরী ছেড়েছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। স্ব-মত ও স্ব-মান তাঁর কাছে জানের চেয়েও বড়ো ছিল বলে হেলায় ছাড়লেন সে-পদ। অত বড় পদে ইস্তফা দেয়ার লোক-সেকালে তো নয়ই—একালেও মিলবে না। বিদ্যাসাগরের কাছে জানের চেয়ে মান এবং মানের চেয়ে স্বাধীনতাই ছিল কাম্য। তাই তিনি ইয়ং বেঙ্গলের কিংবা ব্রাহ্মকর্মীর সাহায্য-সহায়তা গ্রহণের চেষ্টাও করেননি।

উনিশ শতকের কোলকাতার শহুরে হিন্দু-সমাজের রেনেসাঁসের মূলে রয়েছে মুখ্যত চার জনের মনীষার দান। সমকালীন প্রাগ্রসর প্রতীচ্য মানুষের জীবন দৃষ্টিসম্পন্ন ও সমাজসচেতন যুক্তিবাদী মনীষী রামমোহন শিক্ষিত হিন্দুর সমাজের ভাঙন রোধের কেজো উপায় বের করে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। বিদ্যাসাগর যুক্তিযোগে সনাতন সমাজের অযৌক্তিক ক্ষতিকর বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রথা-পদ্ধতির বিলোপ ঘটিয়ে হিন্দু ঘরে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ও প্রচারে আর প্রতীচ্য আদলে সমাজ গঠনে দিশাদান বাঞ্ছায় জ্ঞানচক্ষু দান-লক্ষ্যে শিক্ষা বিস্তারে ছিলেন নিরত। উভয়েই রইলেন উদার সংস্কারক মাত্র। নতুন শাস্ত্র ও সমাজ নির্মাণে তাঁদের আগ্রহ ছিল, কিন্তু বৈরী সময় তাঁদের তত সাহস ও শক্তি যোগায়নি। তাই শাস্ত্রে আস্থাহীন হয়েও শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কারে তাঁরা ছিলেন শাস্ত্রাশ্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞানে-দর্শনে প্রতীচ্য মনন-পুষ্ট, শাস্ত্র-সমাজ ক্ষেত্রে শ্রেয়োবাদী দার্শনিক এবং বিবেকানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যতত্ত্ব চিন্তার উৎকর্ষগর্বী সদর্থেই আধুনিক মৌলবাদী। উনিশ শতকের হিন্দুর শহুরে রেনেসাঁস মুখ্যত তাই রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের এবং কিয়ৎপরিমাণে বিবেকানন্দ ছিলেন বিরাগী-বিবাগী-অধ্যাত্ম জগৎচারী। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক-দার্শনিক ও সমাজহিতৈষী লেখক। কাজেই বিদ্যাসাগরই ছিলেন অবিস্মরণীয় গণনায়ক। বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন— এটিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপ্রত্যয়ী যুক্তিবাদী ইহজাগতিক জীবনবাদী মর্ত্যমানবপ্রেমী দুস্থসেবী, নারীর বৈধব্য ও সাপত্ন্য মুক্তি ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী সাহসী Nonconformist বিদ্যাসাগরকে আজ অবধি লোকবন্দ্য রাখলেও তাঁর মননের, উপলব্ধির দৃষ্টির, দায়িত্ববোধের, কর্তব্যচেতনার প্রত্যাশিত বিকাশ যে ঘটেনি, তা নির্মোহ বিচারে ধরা পড়েই।

। ২ ।

প্রথমত নাস্তিক হয়েও জন্মগত পরিবেশের প্রভাবে তাঁর চিন্তা-চেতনায় বর্ণহিন্দু সমাজের বিশেষ করে ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ, সাধারণ বর্ণহিন্দু সমাজে শিক্ষা বিস্তারে ছিল তাঁর দৃষ্টি ও প্রয়াস নিবদ্ধ। বহু বিবাহ নিরোধ কিংবা বিধবা বিবাহ প্রচলনই যে নারীর ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে সব সমস্যার সমাধান ঘটে না বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পায় না, তা বিদ্যাসাগরও উপলব্ধি করেননি। তাই নারী সংক্রান্ত তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি এ আন্দোলনেই রেখেছিলেন সীমিত। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের হিন্দুর ও অহিন্দুর প্রতি তাঁর কোন কর্তব্য-চেতনার নিদর্শন নেই। দান-দয়া-দাক্ষিণ্য আর কৃপা-করুণাও ছিল তাঁর [ব্যতিক্রম দেখা গেছে অবশ্য কার্মাটাড়ে] হিন্দু পাড়ায় নিবদ্ধ। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকারে পরদুঃখকাতর দয়ার সাগর ও করুণার সাগর, তাঁর অর্জিত অর্থেই ঘুচাতে চাইতেন নিঃস্ব ব্যক্তির অভাব, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ। দুর্ভিক্ষ কালীন অন্নসত্র তার প্রমাণ। অথচ তাঁর অর্জিত সামান্য অর্থে দানের সাগর হওয়া অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। তিনি পুণ্যকামী সাধারণ মানুষের মতো সনাতন প্রথা-পদ্ধতিতে ব্যক্তির আর্থিক অভাব মোচন করে যথাসাধ্য দায়িত্ব পালনে তৃপ্ত ও তুষ্ট থেকেছেন। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ তাঁকে নাস্তিক, ঐহিক জীবনবাদী, মাটি ও মানুষলগ্ন সেবাবাদী করলেও মানুষের আর্থিক-সামাজিক-নৈতিক জীবনে সমস্যা-সঙ্কটের মূল কারণ অনুসন্ধিৎসু করেনি, আর্থিক, সামাজিক-ন্যায়চেতনা জাগেনি তাঁর মনে। তাই কার্ল মার্কসের সমকালীন হয়েও, মিল-বেন্থাম-কোঁতের মতো নাস্তিক হয়েও, প্রত্যক্ষবাদ, নাস্তিক্য, মানবসেবা ও উপযোগবাদ অঙ্গীকার করেও তিনি আর্থিক-সামাজিক-নৈতিক প্রথা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন চিন্তায় আগ্রহী হননি, উৎসাহবোধ করেননি। বর্ণ-প্রথা বিলোপ আন্দোলনে কিংবা কৃষক-শ্রমিক ক্ষেতমজুরের শোষণ অপমান ও দারিদ্র্যমুক্তির লক্ষ্যে বিরোধিতা করেননি ভূমি-রাজস্বের, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ও ব্যবস্থার। অথবা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেনি নীলদ্রোহও। অতএব, বিদ্যাসাগরের মানব ও সমাজসেবা সংকীর্ণ সড়কে, স্বভাষীর, স্বধর্মীর মধ্যেও স্বশ্রেণীর ক্ষুদ্র সীমায় ছিল নিবদ্ধ। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির এমনকি অবিশেষ বাঙলার ও বাঙালীরও ছিলেন না হিতকামী, সেবক বা ত্রাতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখনকার চিন্তায় চেতনায় 'এজু' দ্রোহীদের [ইয়ং বেঙ্গলদের] তিনি সাহায্য দেনওনি, নেনওনি, কেবল এককভাবেই সামাজিক কর্মে সিদ্ধি খুঁজেছেন। অথচ সম ও সহ মতবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক সমর্থন সহযোগিতা ছিল প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রেও তিনি নিঃসহায়-নিঃসঙ্গ জেদীসাধক। অন্যের হুকুমে চলার ও অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলার গুণ ঈশ্বর চরিত্রে ছিলই না। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি। স্বাতন্ত্র্যে শৈকুল কাঁটা। পারিজাত ঘ্রাণে] রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী [কঠোর কঙ্কাল বিশিষ্ট মানুষ] এবং রবীন্দ্রনাথ [বিশ্বকর্মার গড়া মানুষ] বলে এই একক, নিঃসঙ্গ, আপোষহীন বিরামহীন জেদী গোঁয়ার দ্রোহী বিদ্যাসাগরকেই নির্দেশ করেছেন। বিদ্যাসাগরকে তাই রবীন্দ্রনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনেছেন 'অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব' রূপে। অহমিকা-আত্মাভিমান, মর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যচেতনাই বিদ্যাসাগরকে অনমনীয় দৃঢ়তার, স্থির মতের ও অটল সঙ্কল্পের মানুষরূপে খাড়া রেখেছিল। উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দুর মনীষা ও রেনেসাঁস-মুগ্ধ একালের দু'জন স্থির মতের ও প্রায় অনমনীয় চরিত্রের প্রমূর্ত অহমিকা ও আত্মাভিমানী লেখক কবি মোহিত লাল মজুমদার এবং নীরদচন্দ্র চৌধুরী জেদী বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিয়ে দেন।

আমরা আজ বিশ শতকের অন্তিমপর্বে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের, চেতনার, চিন্তার ও কর্মের সীমাবদ্ধতা পরিমাপ করছি। কিন্তু মানুষের সব ভাব-চিন্তা-চেতনা-অনুভব-কর্ম-আচরণের উৎসই স্বকাল ও স্বস্থান। স্থানিক-কালিক ও ব্যক্তিক-সামাজিক প্রয়োজন চেতনাই সব প্রয়াসের কারণ। তাই কালান্তরে সব মানুষের সর্বপ্রকার কৃতি-কীর্তি উপযোগ হারায়। বিদ্যাসাগরের কর্ম-প্রয়াস-অবদানেরও তাই আজ আর কোন বাস্তব উপযোগ নেই। তবে চিন্তাশীল মানুষের মনে মননে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকবে অবিমোচ্য। চীনের প্রাচীরের বা তাজমহলের কিংবা দুর্গের আজ বাস্তব উপযোগ কি? বিদ্যাসাগর তাঁর স্বকালে সমকালে স্বদেশে স্বসমাজে যা করেছেন, তা ছিল চেতনায় চিন্তায় কর্মে ও আচরণে অচিন্ত্য নতুন ও বৈপ্লবিক। টুলো ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে সংস্কৃতে শাস্ত্র-পড়া পণ্ডিত গোড়াতেই আস্থা হারালেন স্রষ্টায় ও শাস্ত্রে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে, ন্যায় ও দর্শনে 'বিদ্যাসাগর' হিন্দুর বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে এবং বার্কলের ইনকোয়ারিতে, রঘুনন্দনের 'অষ্টবিংশতি তত্ত্বে' তাত্ত্বিক অসঙ্গতি ও অসারতা আবিষ্কার করে স্বদেশী শিক্ষার্থীর বিভ্রান্তি মুক্তি লক্ষ্যে পাঠসূচী থেকে তা বর্জনে হলেন প্রয়াসী। ব্রিটিশ সরকার অনুমোদিত শিক্ষাব্যবস্থা মেনে নিয়ে জাতিকে সমকালের যোগ্য করার উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা ও সযত্নে পরিচালনা করলেও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ছিল এক অনন্য ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। আধুনিক মন-মননের যোগ্য নর-নারী তৈরীর জন্যে তিনি কেবল বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ, প্রকৃতি, ইতিহাস, জীবনচরিত, ভূগোল, গণিত, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি ঐহিক মানববিদ্যা মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতা তাঁর ছিল বলেই। সমকালে এ বুদ্ধির দেশী বা বিদেশী শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তক ছিলেন না বলে তাঁর সুপারিশ স্বীকৃত বা গৃহীত হয়নি। পরিণামে প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি পদত্যাগ করেন নির্দ্বিধায়। কিছুটা নিজের আস্থা ছিল না বলে এবং কিছুটা সব বর্ণের লোকের শাস্ত্র শিক্ষায় অধিকার ছিল না বলেই পাঠসূচীতে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রপাঠ সুপারিশ করেননি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষায় অধিকার চেতনা, স্বাধিকার সচেতন আধুনিক সমাজ গঠনে নারী শিক্ষার আবশ্যিকতা, বাঙলাকে তথা মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার গুরুত্ব, গাঁয়ে দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সরকারি অর্থে বহু বহু বালক ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞান-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক ও মানবিক তথা ইহজাগতিক দিকে গুরুত্ব দান প্রভৃতি প্রতীচ্য প্রভাবিত সেক্যুলার চেতনার জন্যে বিদ্যাসাগর উনিশ শতকে ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও প্রাগ্রসর মানুষ। ছিলেন বাঙালী হিন্দুর মনের ও সমাজের মধ্যযুগ মুক্তির যোদ্ধা, বাহিনীবিহীন সেনানী। সর্ব সংস্কারমুক্ত, শাস্ত্রে সংশয়বাদী, নিরাকার ব্রহ্মবাদী যুক্তিবাদী রামমোহনের, পরিণামে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও ভক্তিসম্বল মোক্ষকামী বঙ্কিমচন্দ্রের কিংবা আর্য-অধ্যাত্মচিন্তার উৎকর্ষগর্বী বিবেকানন্দের মতো অসামান্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সত্ত্বেও শাস্ত্র ও সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কারে ও প্রতীচ্য সেক্যুলার বিদ্যার প্রচারে সর্বসংস্কারমুক্ত নাস্তিক মানবতাবাদী আর্তমানবদরদী হৃদয়বান নির্দল নিঃসঙ্গ প্রমূর্ত পৌরুষ ও দৃপ্তদ্রোহী বিদ্যাসাগর গোটা উনিশ শতকে অনন্য ঔজ্জ্বল্যে বীকনের মতো, বাতিঘরের মতো এককভাবে স্থিত। ওঁরা ছিলেন পূর্ব সংস্কারবদ্ধ আস্তিক। বিদ্যাসাগর ছিলেন মুক্ত মনের ও বুদ্ধির নাস্তিক ও মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ছিলেন কেবল মানুষ। আত্মপ্রত্যয়ী যুক্তিপ্রবণ ও প্রত্যক্ষবাদ প্রভাবিত নাস্তিক বিদ্যাসাগর শাস্ত্র, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকতেন। এ বিষয়ক আলাপে আলোচনায়ও যোগ দিতেন না। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলে অবজ্ঞা করতেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁকে নাস্তিক বলে জানতেন। কাশীর পণ্ডিতদের তিনি বলেছিলেন যে, তিনি কোন দেবতা মনেন না, তাঁর পিতামাতাই তাঁর দেবতা। তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক নয় শুধু গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণও বর্জন করেছিলেন। অন্তরে ঈশ্বরচেতনা ছিল না বলেই বোধোদয়ের [১৮৫১ সনে] প্রথম মুদ্রণে ঈশ্বরের ঠাঁই হয়নি। পরে পণ্ডিত বিজয় গোস্বামী এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ন্যায়বুদ্ধি চালিত বিবেকবান বিদ্যাসাগর নিজের মত আস্তিক শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় বুঝে ঈশ্বরকে নানা প্রসঙ্গে তাঁর সব পাঠ্য বইয়ের ঠাঁই দিলেন। তাও সে-ঈশ্বর 'নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ' সাকার নন। বিদ্যাসাগর তাঁর Will-এ দেব পূজার ও মন্দিরের জন্যে এক কপর্দকও ব্যয়ের ব্যবস্থা রাখেননি।

বড় চাকুরে জাত্যভিমানী বিদ্যাসাগর বাঙালী সত্তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার জন্যেই ব্রিটিশ আমলে স্যুট বা চৌকা-চাপকান পরেননি। চটি জুতা, থান ধুতি, মোটা চাদর এবং মস্তক মুণ্ডন করে পৈতা পরে বহরে অবয়বে প্রায় উড়ে বামুন সাজতেন, সেই একই ঐতিহ্য রক্ষার জন্যে বা লোকাচারে অবচেতন আনুগত্য বশে তাঁর পত্র শীর্ষে 'শ্রীহরি' লিখতেন। এ 'হরিতে' বিশ্বাসের সাক্ষ্য নেই। পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও মমতা বশে তাঁদের শাস্ত্রিক বিশ্বাসের মর্যাদা ও সম্মান দেয়ার জন্যেই তিনি যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেছিলেন, এ-ও তাঁর শাস্ত্রে আস্থার প্রমাণ নয়। নিজে নাস্তিক হয়েও শাস্ত্রানুগত আস্তিক হিন্দুর ঘরে সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই শাস্ত্রানুকূল্যের প্রয়োজন আবশ্যিক জেনেই তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধকল্পে শাস্ত্র সম্মতি সন্ধান করেছেন শ্রুতি-স্মৃতি-সংহিতা-গীতা-পুরাণে। বিদ্যাসাগরের অঙ্গে ও অন্তরে দেবতা, ঈশ্বর, অলৌকিকতা প্রতীক মন্ত্র-মাদুলী প্রভৃতির ঠাঁই ছিল না।

শাস্ত্র ও সমাজ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অসাফল্যের কারণ ছিল তাঁর লোক-সংস্কার ও লোকাচার বিরোধী প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা। সমাজহিতৈষণা ছিল মধ্যযুগীয় পরিবেশ প্রতিবেশ দুষ্ট দেশ-কাল-মন-মনন বিরোধী। পরে শিক্ষার ও প্রতীচ্য প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত শহুরে ও ব্রাহ্মসমাজে নয় কেবল, গাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিত, সাক্ষর-নিরক্ষর মুর্খ সমাজেও বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ, অনূঢ়া-অধবাজীবন, তালাক প্রভৃতি বিনা প্রয়াসে-প্রচারে-প্রচারণায় বৃদ্ধি প্যাচ্ছে। যুগান্তরে কাল-প্রভাবে এমন দিনও দূরে নয় কালিক প্রয়োজনে যখন Living together প্রথা চালু হবে। কৃত্রিম উপায়ে কলা-কাঁঠালের মতো কোন ফল পাকানো গেলেও তা সব ফলে প্রয়োগ চলে না, তেমনি কোন কোন নীতি নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বদলানো সম্ভব হলেও ইহ-পরলোকে প্রসারিত জীবন-চেতনায় আকস্মিক যৌক্তিক হামলাও বৃথা ও ব্যর্থ হয়। জেদী যোদ্ধা অহমিকা ও আত্মাভিমান বশে যৌবনে তা উপলব্ধি না করলেও প্রৌঢ় বিদ্যাসাগর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনেছিলেন ও মেনেছিলেন যে সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং দেশবাসীর মনোভাব অনুকূল না হলে সমাজ কল্যাণের জন্যে কোন কাজ সফল হয় না।[৭] এ উপলব্ধি থেকেই সম্ভবত তিনি মৃত্যুর আগে 'সহবাস সম্মতি আইন' প্রবর্তনের দাবির দরখাস্তে [এবং বঙ্কিম চন্দ্রও] ১৮১৯ সনে সই দিতে রাজি হননি।[৮]

।৩।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজক্ষেত্রে সর্বসংস্কারমুক্ত শাস্ত্রে আস্থাহীন যুক্তিপ্রবণ প্রথম সংস্কারক। নারীমুক্তির কথা এজু'দের মনে জাগলেও বিদ্যাসাগরই প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা। গাঁয়ে গঞ্জে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারেও তিনি ছিলেন প্রথম নায়ক। এ তাৎপর্যে তিনি গণশিক্ষার প্রয়োজন চেতনা ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ। উল্লেখ্য যে কাল বৈরী বলেই অন্যদের আপত্তির আশঙ্কায় তাঁর পক্ষে সংস্কৃত কলেজের দ্বার সবার জন্যে উন্মুক্ত করা সম্ভব ছিল না বটে, তবে এতে তাঁর ব্যক্তিগত আপত্তি ছিল না। শাস্ত্র ও সংস্কার নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের ও মানববিদ্যার গুরুত্বও পষ্টভাবে অনুভব করেন তিনিই এবং শিক্ষার্থীর মন-মননের বিকাশের জন্যে মাতৃভাষাই যে প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র বাহন হওয়া আবশ্যিক এ উপলব্ধি এবং উচ্চারণও তাঁরই। রামমোহনের পরে সমাজক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরই প্রতীচ্য আদলে দ্বিতীয় বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিপ্রবণ, মানবতা ও জনহিতবাদী মুক্ত মনের ও পরিশীলিত রুচির আধুনিক মানুষ। আত্মপ্রত্যয়ের, অহমিকার বা স্বনির্ভরতার ও স্বাতন্ত্র্যচেতনারই যে অপর নাম ব্যক্তিত্ব, বিদ্যাসাগরেই আমরা তা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করি। সমকালীন শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় মানুষের রুচি-আদর্শ জনহিতৈষণা এবং জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তি-সাহস আর সংকল্প বা উদ্যম-উদ্যোগ ছিল তাঁর। তাই টুলোপণ্ডিত পরিবারে জন্ম নয় শুধু স্বয়ং সংস্কৃত কলেজ নামের টোলে টুলোপণ্ডিতের ছাত্র হয়েও কলেজে ইংরেজী ভাষায় প্রাথমিক পাঠ নিয়ে স্বশিক্ষিত হয়েই নাস্তিক হতে পারলেন বিদ্যাসাগর তখনকার কোঁতে, মিল, বেন্থামের মতো। বুঝতে পারলেন পদাধিকারে নয়, ব্যক্তি জীবনের সাফল্য, সার্থকতা ও সিদ্ধি রয়েছে আদর্শ নিষ্ঠায়, চারিত্রিক দার্ঢ্যে এবং আর্তের সেবায় আর বহু জনহিতে ও বহু জনসুখে সঙ্কল্পের রূপায়ণে। তাই নিতান্ত দরিদ্র সন্তান হয়েও দু'দুবার কলেজের লোকবাঞ্ছিত দুর্লভ চাকরি হেলায় ছাড়লেন আদর্শ বা হিতবুদ্ধি প্রসূত মতবিরোধের ফলেই। সত্তর বছরের দীর্ঘ জীবনে বিদ্যাসাগর চাকরি করেছেন মাত্র নয় বছর—১৮৪৬-৪৭ সনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রূপে এবং ১৮৫১-৫৮ সনে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষরূপে। বাকি জীবন তিনি বই বেচেই অজস্র অর্থ অর্জন করেছেন। ভেতো ও ভীত কোন বাঙালীর পক্ষে স্বেচ্ছায় এতবড় চাকরি ছাড়া ও গ্রন্থ ব্যবসায়ের অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের ঝুঁকি নেয়া কখনো সম্ভব হত না। অজেয় পৌরুষ, অকুতোভয় স্থির মতের হিতবাদী বিদ্যাসাগরের নতুন চিন্তা-চেতনার, কর্মের ও আচরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সে-কালের কোলকাতার তথা বাঙলার শিক্ষিত জনতার উপর। অক্ষয় মনুষ্যত্ব রূপ আধুনিক মানুষ ও বীর যোদ্ধা জীবনের নানা ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তা-চেতনায়, নির্মাণে-মেরামতে চিরসংগ্রামী বিদ্যাসাগর তাই গোটা উনিশ শতকের একাধারে তেজস্বী-মনস্বী পুরুষ এবং একক ও অনন্য ব্যক্তিত্ব রূপে নিত্য স্মরণীয় আর মানুষের ও মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে সব বয়সের মানুষেরই প্রেরণার ও প্রণোদনার চির উৎস হয়ে রইলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তা কেবল পরিকল্পনার, পরামর্শের ও পরিব্যক্ত মতের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। য়ুরোপসম্ভব এ নতুন চিন্তা-চেতনার এবং সুষ্ঠু উপযোগবুদ্ধির, বিষয় নির্বাচন দক্ষতার, বর্ণবিন্যাস নৈপুণ্যের এবং শিক্ষার্থীর সামর্থ্যানুগ ভাষা শৈলী প্রয়োগ প্রভৃতি তাঁকে আদর্শ শিক্ষাবিদের ও শিক্ষকের স্বীকৃতি ও গৌরব দান করেছে। উল্লেখ্য প্রথম পাঠ রচনার জন্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং চারুপাঠ সংকলক বিজ্ঞানমনস্ক ও সংস্কারমুক্ত প্রায় নাস্তিক অক্ষয়কুমার দত্তের নামও এ সূত্রে স্মরণীয়। বিদ্যাসাগর রচিত ও সংকলিত বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জুরী প্রভৃতি শিক্ষাচিন্তক বিদ্যাসাগরের মন-মননের গতি প্রকৃতির, সামর্থের ও প্রতিভার সাক্ষ্য।

আর বিদ্যাসাগর যে অনুবাদক মাত্র ছিলেন না, গ্রহণ বর্জন নির্মাণ সংযোজন সমেত কাব্য-নাটককে গদ্য কাহিনী আখ্যান-উপাখ্যান-উপন্যাস রূপে উপস্থাপন ও বিষয়ানুগ সূচিত শব্দ প্রয়োগে স্বচ্ছন্দ গতির ভাষাশৈলী নির্মাণ বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর অবিস্মরণীয় অবদান। তবু সে শব্দচয়ন ও ভাষাশৈলী বেতাল পঞ্চবিংশতিতে, সীতার বনবাসে, শকুন্তলায় ও ভ্রান্তিবিলাসে অভিন্ন নয়, অভিন্ন নয় তাঁর রচিত অনূদিত ইতিহাসের, জীবনচরিতের, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিচায়ক প্রবন্ধের, প্রভাবতী সম্ভাষণের অথবা বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ বিষয়ক মৌলিক রচনার ও যৌক্তিক বিতর্কের এবং খেউর জাতীয় বিতর্ক নামের চাপান-উতোরের ভাষা ও ভঙ্গি। কাজেই বিদ্যাসাগর একাধারে অনুবাদক ও সাহিত্যস্রষ্টা, প্রাবন্ধিক ও রসিক তার্কিক। সংস্কৃত শব্দানুরাগী এবং সহজ ও লৌকিক ভাষার শব্দপ্রীতি গুরু ভেদ জ্ঞান ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ। তিনি তাঁর লেখায় প্রয়োগের জন্যে বর্ণানুক্রমিক শব্দ-সংগ্রহ করেছিলেন, 'ক' বর্ণটিই সম্ভবত অসমাপ্ত ছিল। অতএব বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের যথার্থ অর্থে প্রথম শিল্পী। বঙ্কিম প্রমুখের ভাষা-শৈলী বিদ্যাসাগরের ভাষা-শৈলী ভিত্তি করেই যে গড়ে উঠেছিল ও বিকাশ পেয়েছিল, তা অবশ্যই স্বীকার্য।

আজ বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি আন্দোলনের, শিক্ষানীতির, ভাষাসাহিত্যকৃতির কোন উপযোগই নেই বাঙালীর জীবনে, কালান্তরে আমরা সে-সব সমস্যা-সঙ্কট অতিক্রম করে এসেছি। তবু কোথায় যেন বিদ্যাসাগর আমাদের নৈতিক-চেতনায় সার্বক্ষণিক হয়ে স্থিরভাবে বিরাজমান। যে-বিদ্যাসাগর গোঁয়ার ও জেদী, আদর্শনিষ্ঠ, লক্ষ্যনিবদ্ধ উদ্যমশীল উদ্যোগী, অহং-সচেতন আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ়চিত্ত সাহসী তেজী যোদ্ধা, অটল সঙ্কল্পের ও অনমনীয় মতের হিতবাদী দরদী একগুঁয়ে কর্মী, বীকনের মতো, সামুদ্রিক বাতিঘরের মতো, মহামহীরুহের মতো, ধ্রুবনক্ষত্রের মতো আর অভিন্ন মূল রসুনের মতো পৌরুষের, সাহসের, সঙ্কল্পের, মানবতার ও সংগ্রামীর প্রতিমূর্তি, সে-বিদ্যাসাগরই প্রমূর্ত ব্যক্তিত্ব হয়ে আমাদের বাঞ্ছিত আদর্শের, তেজস্বিতার, মানবতার, আত্মপ্রত্যয়ের, আত্মাভিমানের ও বাঙালী সত্তার প্রতীক রূপে আমাদের প্রেরণার ও জীবনের দিশারী হয়ে থাকবেন। বিদ্যাসাগরের অবিচ্ছিন্ন অপরিহার্যতা এখানেই। আর য়ুরোপীয় জীবন ও সমাজ চেতনার ধারক ও প্রচারক বিদ্যাসাগর বঙ্গভূমে সক্রিয় ভাবে আধুনিকতার আবাহনে, বীজ বপনে ও নবযুগ নির্মাণে রামমোহনের পরেই প্রথম ও প্রধান ব্যক্তি। তাঁর কাছে বাঙালীর এ অপরিশোধ্য ঋণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এক কথায় মনে-মননে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-হিত-উপযোগবাদী বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্তরে স্বকালের য়ুরোপের প্রথম সারির প্রগতিশীল আধুনিকতম নাগরিকের সমতুল্য, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গে ধুতি-চাদর-চটি পরিহিত মাটি ও মানুষপ্রেমী বিদ্যাসাগর ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ তেজস্বী বাঙালী সত্তার প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে 'অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব'ই বিদ্যাসাগর।

তথ্যনির্দেশ

১. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃ ৪৩৩। আমাদের দেশের লোক এত অসৎ ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।
২. চিঠিপত্র ৯-১৫ মা, বাবা-ভাইদের কাছে লিখিত, ১২৭৬ সাল। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১৯৭৩ সং পৃঃ ৪৫৪-৫৭।
৩. করুণাসাগর বিদ্যাসাগর ইন্দ্রমিত্র, পৃঃ ৫২৯-৩০

বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ

AMARBOI.COM

১৮৬৫ সনে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিমসাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলছে গত একশ চব্বিশ বছর ধরে। কাজেই তাঁর এবং তাঁর সাহিত্যের কোন দিকেরই আলোচনা সমালোচনা, তাঁর ও তাঁর সাহিত্যের, তাঁর চিন্তা চেতনার ও তাঁর মন-মত-মন্তব্যের নিন্দা-তারিফও আর নতুনভাবে করা সহজ নয়। তবে প্রবহমান জীবনে প্রাজন্মক্রমিক আবর্তন বিবর্তন ধারায় অবস্থানভেদে ব্যক্তির ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। জগৎ-চেতনা আর জীবন-ভাবনাও নতুন নতুন পরিবেশে পরিবর্তিত হয়। কাজেই পুরোনো কথা আর কাজ, চিন্তা ও কৃতি ব্যক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কোন লঘু ও গুরু তাৎপর্যে হীরক খণ্ডের ঔজ্জ্বল্যে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে। এজন্যেই নতুন দৃষ্টিতে কোন দেশের, কালের, স্থানের, ঘটনার ও মানুষের ইতিহাস বারবার লেখার ও পুনঃপুন খুঁটিয়ে পড়ার শেষ নেই। কেননা নতুন চেতনার মানুষের বাখানিতে ইতিহাস 'তিলে তিলে নতুন হোয়।'

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য এখন ঐতিহ্যের ও ইতিহাসের বিষয়। ওই কথা, ওই লেখা ওই আঙ্গিক এখন অপ্রচল। কিন্তু চিন্তানায়ক জাতিস্রষ্টা বঙ্কিম ইতিহাসের সাক্ষ্যরূপে আবশ্যিক এবং আজো আলোচ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল বৃত্তি প্রবৃত্তি চালিত মানুষের চিন্তা-চেতনার ও মন-মেজাজের গতিপ্রকৃতি জানার তীব্র কৌতূহল। সেজন্যেই তিনি মানুষের কর্ম-আচরণের তাৎপর্য সন্ধানী। তাই কোন একটা নীতি-আদর্শ বা তত্ত্ব-তথ্য প্রকটন লক্ষে একটা পরিকল্পনা ও সংকল্প নিয়ে কোন কাহিনী মাধ্যমে তা রূপায়িত করার জন্যে লেখনী ধারণ করলেও মানুষের হৃদয়াবেগজিজ্ঞাসু বঙ্কিম বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট ও সংকল্পচ্যুত হয়েছেন। রূপবহ্নি, অসূয়াবিষ ও নিয়তি নির্ভরতা যৌবনে মানুষের ভাব চিন্তা-কর্ম-আচরণে বৃত্তিচ্যুতি ঘটিয়ে মানুষের জীবনে অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয় বা ট্রাজেডি ঘটায়— বঙ্কিমের এ বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সব রোম্যান্তো উপন্যাসে। যে-সব চরিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব আধির শিকার হয়েছে, —গুনিন যেমন 'বাটি-চালা' দিয়ে তার অপ্রতিহত গতির অনুবর্তী হয়—লেখক বঙ্কিমও সেসব প্রবৃত্তিচালিত চলমান চরিত্রের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করেছেন গভীর আগ্রহে ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে। তাই তাঁর পরিকল্পিত নায়ক বা নায়িকাই গ্রন্থনামের উৎস হলেও, প্রায় কোন গ্রন্থেই তারা মুখ্য হয়ে ওঠেনি, পার্শ্ব চরিত্রের প্রাধান্যে ও ঔজ্জ্বল্যে তারা হারিয়ে গেছে, অন্তত ম্লানিমায় আকর্ষণ হারিয়েছে। যেমন দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, ওসমান, আয়েশা, কপালকুণ্ডলায় মতিবিবি, মৃণালিনীতে মনোরমা-পশুপতি, বিষবৃক্ষে হীরা, চন্দ্রশেখরে দলনী-শৈবলিনী প্রতাপ, কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী, রাজসিংহে দরিয়া-মোবারক-জেবুন্নেসা, আনন্দমঠে-ভবানন্দ-জীবানন্দ-শান্তি, দেবী চৌধুরানীতে প্রফুল্লসত্তা এবং সীতারামেও শ্রী-ই পাঠক মনে স্মরণীয় বা আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে। যে রচনার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিপিনচন্দ্র পাল উচ্চারিত এবং সাধারণ্যে আখ্যাত 'ঋষি', সেই আনন্দমঠে 'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে' নিয়ে গেল, কেননা হিন্দু তখনো স্বাধীনতা প্রাপ্তির ও রক্ষার যোগ্য হয়নি। দেবী চৌধুরানীতে প্রমূর্ত ধর্মতত্ত্ব —অনুশীলন দেবী পরিণামে প্রফুল্ল হয়ে স্বামীর সংসারে থালা-বাসন মেজে জীবন সার্থক করে। আর 'শ্রী'র জীবনের ব্যর্থতায় ও সীতারামের পতনে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া রাজসিংহেরও হিন্দুর বলবীর্য প্রকাশ পায়নি। রাজসিংহের বিজয় মোবারকের সাহস ও নৈপুণ্যের ফলমাত্র।

মানব চরিত্রের রহস্য-জিজ্ঞাসু বঙ্কিম গ্রন্থ-সমাপ্তির লগ্নে উদ্দিষ্ট প্রতিপাদ্যের কথা স্মরণ করে যেন-তেনভাবে অর্থাৎ পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা না করেই অসঙ্গতভাবে কাহিনীর দ্রুত সমাপ্তি ও চরিত্রের পরিণাম ঘটিয়েছেন। প্রমাণ বিষবৃক্ষে সূর্যমুখীর প্রতিষ্ঠা ও কুন্দের আত্মহত্যা, কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী হত্যা, চন্দ্রশেখরে শৈবালিনীর স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন ও প্রতাপের যুদ্ধযাত্রা ও মৃত্যু ইত্যাদি। বঙ্কিমসাহিত্যে সাক্ষাৎ ও সংলাপ বড় আকর্ষণীয় মতিবিবি- মেহেরুননিসা, মতিবিবি-নবকুমার, নির্মলকুমারী-আওরঙ্গজেব, মানিকলাল-রাজসিংহ, বিমলা ওসমান, কল্যাণী-ভবানন্দ প্রভৃতি।

সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশের প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ অবধি মানুষের নিতান্ত সীমিত জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাশক্তির দরুণ নতুন চিন্তা-চেতনা আসমানী দোহাই দিয়েই পরিব্যক্ত ও প্রচার করতে হত। এই নতুন চিন্তা-চেতনা মাত্রই নতুন শাস্ত্রের রূপ নিত। প্রাগ্রসর ও কল্যাণকর নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ এভাবে ধর্ম শাস্ত্রানুগত হয়ে ধর্মবিশ্বাসরূপে গ্রাহ্য ও গৃহীত হত জনসমাজে। নবী-অবতার মুনি-ঋষি-সন্ত-দরবেশ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এভাবেই। সবাই অনক্ষর বলে তাঁদের সব বাণীই কেবল উচ্চারিত, লিখিত নয়। এ কালেও সে ধারণার সাক্ষ্য মেলে লালনে রামকৃষ্ণে। অসামান্য মন বুদ্ধি মনন সম্পন্ন কেউ দৈশিক কিংবা আঞ্চলিক অথবা গৌত্রিক বা সাম্প্রদায়িক স্তরে মানুষের জগৎ-ভাবনা ও জীবনজিজ্ঞাসা, জীবনাচারের নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি পালটে দিয়ে নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন। যুক্তি-বুদ্ধি-বিদ্যার প্রসারের ফলে নবী অবতারবাদের কাল অপগত। এ কালে এমনি সব মত-পথ-পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনসম্মত মনে হলেই মানুষ গ্রহণ-বরণ করে। প্রমাণ মার্কসবাদ, বিবর্তনবাদ, গ্রহতত্ত্ব, বিজ্ঞানের তথ্য প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাবনের, আবিষ্ক্রিয়ার আর প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষের ফলে মানুষের আজকের জীবন যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রচালিত। গোটা পৃথিবী দৈহিক ও মানসিকভাবে পরিক্রম সম্ভব। এমনটি আগে ছিল না। পৃথিবীর পরিধি ছিল সর্বপ্রকার ধারণাতীত। মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক জীবন ছিল অতি সংকীর্ণ এলাকার পরিসরে সীমিত। তাই চলমান জীবন ছিল গতানুগতিক—মানসিক ও আচারিক জীবনে আবর্তন ছিল, বিবর্তন ছিল বিরলতায় দুর্লভ।

ভিন্ন দেশের, ভাষার ও আচারের মানুষের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে কিংবা যুদ্ধকালেও মানসিক, ব্যবহারিক ও আচারিক সংস্কৃতির বিনিময় তেমন ঘটত না। তার প্রমাণ য়ূরোপীয় বেণেরা ভারতে ষোল শতক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকলেও ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ও ইংরেজী ভাষা শেখার আগে য়ূরোপীয় প্রভাব আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি-মননের কোনক্ষেত্রেই অনুভূত হয়নি। অর্থাৎ নতুন পণ্য এসেছে, চিন্তা-চেতনা আসেনি। অতএব বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষীর সঙ্গে শাসক-শাসিত সম্পর্ক স্থাপিত হলেই কেবল সেকালে মানুষের চিন্তায় চেতনায়, কর্মে আচারে, আচরণে পরিবর্তন ঘটত। এভাবে পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক হলেও শাসিতের হীনম্মন্যতার ও শাসকের উত্তম্মন্যতার মাত্রাভেদে তারতম্য থাকত।

বিজিত দেশ বা জাতি পরাজয়ের গ্লানির মধ্যেই জগৎ বলে চেতনাচাঞ্চল্য তাদের মধ্যেই হত তীব্র ও তীক্ষ্ণ। ফলে ঘটত সর্বপ্রকারে যুগান্তর। কাসিমপুত্র মুহম্মদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে একেশ্বরবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবে শঙ্কর [৭৮৮-৮২০] হন দেব-দ্বিজ ও মূর্তিদ্রোহী এবং বিমূর্ত ব্রহ্মবাদী। এভাবে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ ইসলামের প্রভাবে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব প্রচার করেন। আবার উত্তর ভারতে তুর্কী বিজয় ঘটলে সেখানেও নিরাকার অদ্বৈতবাদী সন্তধর্মের উদ্ভব ঘটে। বাঙলার চৈতন্যদেব ব্যতীত উত্তর ভারতের সবাই ছিলেন নিম্নবর্ণের—কবির, রবিদাস, সেন, তুকারাম, ধর্মদাস এবং দাদু, সুন্দরদাস, বিমান, তিরুবল্লভ এবং নিম্ন বিত্তের নামদেব ও নানক। এঁরাই প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিয়ে চিন্তাচেতনার রেনেসাঁসধর্মী নতুন যুগ সৃষ্টি করেন—একালের পরিভাষায় সে নতুন যুগের নাম 'মধ্যযুগ'।

আবার ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই সুপ্ত গ্লানিজাত যে-চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা দিল, তাতেও একেশ্বরবাদী ইংরেজ প্রভাবে ইংরেজী-জানা রামমোহন হলেন শঙ্করের মতোই বিমূর্ত ব্রহ্মবাদী। নাস্তিক হলেন অক্ষয়দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনিশ শতকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্মরণীয় অনেকেই ছিলেন, তবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রতীক ত্রিশূল স্বরূপ ছিলেন তিন চিন্তানায়ক— রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। কিছু পরে এলেন আধুনিক ব্যাখ্যায় সনাতন ধর্মের প্রচারক বিবেকানন্দ।

উনিশ শতকের শেষার্ধে সনাতন শাস্ত্র ও আচারপন্থী রাধাকান্ত দেবের ও তাঁর উত্তরসূরি শশধর তর্কচূড়ামণির ভূমিকা ম্লান ও অকেজো করে দিয়ে প্রাচীন সনাতন চেতনার প্রতীচ্য আদলে নবায়ন ঘটালেন রামকৃষ্ণ [গদাধর চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৫-৮৬] ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ [নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮৬৩-১৯০২] বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালেই। রামকৃষ্ণ বিশ্বেশ্বরকে ভক্তবৎসলা কৃপা-করুণাময়ী ক্ষমাশীলা বিশ্বজননী রূপা কালীমাতারূপে বরণ করে নির্বিশেষ মানব সেবাকেই ঐহিক ও পারত্রিক মোক্ষের শ্রেষ্ঠ পন্থারূপে প্রচার করলেন। মন-মত-পথগত পার্থক্যে সহিষ্ণুতা সহাবস্থানের জন্যে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবশ্যিক, তা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন রামকৃষ্ণই [যত মত তত পথ]। আর বাস্তবে স্বদেশে সর্বত্র মতে পথে বর্ণে বিশ্লিষ্ট সংস্কার-দুষ্ট আচার সর্বত্র হিন্দু সমাজে দৃঢ়মূল থাকলেও বিবেকানন্দ য়ুরোপে আমেরিকায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের সার্বকালিক মূল্যমান এবং ব্রাহ্মণ্যদর্শনের সার্বমানবিক উপযোগ ও মহিমা প্রচারে থাকেন মুখর। বস্তুত গুরু-শিষ্যের—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মত-পথ-মনীষা-মনস্বিতা স্বরূপে অভিন্ন ছিল না। একজন ছিলেন সন্তান বৎসলা জগন্মাতার প্রতি ভক্তিবশে মানবপ্রেমী ও মানবসেবী। সৃষ্টিকে ভালোবেসে স্রষ্টার কৃপাপ্রার্থী। অপরজন ছিলেন যোগী ও কর্মী, স্বদেশের ও স্বধর্মীর ঐহিক উন্নয়ন লক্ষ্যে গীতা-উপনিষদের তত্ত্বের আলোকে তাদের মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী। বলতে গেলে বিবেকানন্দের উপনিষদাদির প্রায়োগিকভাষে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের অনুসৃতিই পাই। মূলত উভয়েই ছিলেন আজকের পরিভাষায় দেশকাল সচেতন প্রগতিকামী মৌলবাদী।

আজ বিশ শতকের এ অন্তিমপর্বে ব্রাহ্মসমাজ সর্বার্থেই অন্য শাস্ত্রানুগত সমাজের মতোই স্থবির এবং বিদ্যাসাগরের ও বঙ্কিমের প্রভাব আর প্রয়োজনও অবসিত।

আজ দেশ-জাত সমাজ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সচেতন শিক্ষিত শহুরে সমাজে কম্যুনিজমের প্রসার প্রতিরোধ লক্ষ্যে কোলকাতায় তিনটে ধারায় চিন্তা-চেতনা প্রবল দেখা যায়: একটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শন ধারা, দ্বিতীয়টি গান্ধী-রবীন্দ্র চিন্তাধারা, অন্যটি সনাতনী বা মৌলবাদী ধারা। এ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ যদিও কম্যুনিস্ট শাসনে রয়েছে, তবু প্রতিক্রিয়াশীল মনীষার প্রভাব অধিকাংশের উপর উৎকটভাবে প্রবল।

কাজেই বঙ্কিমচর্চা এখন ইতিহাস অনুশীলনেরই নামান্তর যেহেতু উনিশ শতকের শেষার্ধের ও বিশ শতকের প্রথম পাদের শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর মনে-মননে বঙ্কিম প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক, সেহেতু বঙ্কিম ভূমিকা আমরা যতই বিশ্লেষণ মাধ্যমে বুঝবার চেষ্ট করব, আমাদের পরম্পরাগত স্বরূপ নতুন ও স্বচ্ছদৃষ্টিতে স্পষ্টতর ও সুষ্ঠুতরভাবে অনুভব-উপলব্ধি করব।

কৌতূহল, নতুনের আকাঙ্ক্ষা, পুরোনো ভাব-চিন্তায়, নিয়ম-নীতিতে, রীতি-পদ্ধতিতে বিরাগ-সন্দেহ-সংশয় আর জিজ্ঞাসা এবং জিগীষা আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে, পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার পরিহারে ব্যক্তিমানুষকে সাহস ও শক্তি যোগায়। নতুন চিন্তা-চেতনায় প্রবুদ্ধ, নতুন আশায় উদ্দীপ্ত, নতুন উদ্যমে, সাহসে ও প্রত্যয়ে ঋদ্ধ মানুষই দেশে-সমাজে রাষ্ট্রে যুগান্তর ঘটায়। আমাদের তিন চিন্তানায়ক রামমোহনের, বিদ্যাসাগরের ও বঙ্কিমচন্দ্রের কমবেশী এসব গুণ ছিল। বলা বাহুল্য, এসব চিন্তানায়ক প্রতীচ্য শিক্ষার প্রসূন। প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত মুসলিমরা তখন কেবল অতীতাশ্রয়ী সংস্কারক ও ব্রিটিশ শাসকদ্রোহী। এরাই ওয়াহাবী ও ফরায়েজী। য়ূরোপীয় যুক্তিবাদ তাদের আয়ত্ত ছিল না বলে তারা আবেগতাড়িত ক্ষুব্ধ স্বাপ্নিক। সর্বনাশ এড়ানো লক্ষ্যে উভয় দলেরই বাঞ্ছিত আদর্শ তখন ধর্ম জীবন। হিন্দু মুসলিম সবাই তখন কেবল স্বধর্মীরই কল্যাণকামী। য়ুরোপীয়দের মতো ভাষিক কিংবা গৌত্রিক-ভৌগোলিক জাতিচেতনার উন্মেষ ঘটেনি তাদের মধ্যে। ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের মুক্ত মন-মেজাজের আধুনিক মানুষ করা লক্ষ্যে রামমোহন সংস্কারমুক্ত যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন বিমূর্ত ব্রহ্মোপাসক বানানোই তাঁর জীবনের মুখ্যব্রত করে নিয়েছিলেন। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর মুক্তিতে ও শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ঠিক সৃজনশীল ছিলেন না এবং তাঁরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল স্বধর্মীর ও স্বশ্রেণীর কল্যাণের অনুধ্যায়ী। স্মর্তব্য যে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর ছিলেন সর্বসংস্কার মুক্ত ও আধুনিক প্রতীচ্য মননের ও জীবনাচারের সমর্থক। আর বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ ছিলেন সনাতন ধর্মের আধুনিক মননযুক্তিগ্রাহ্য সর্বকালীন সত্য ও প্রয়োগসাফল্য প্রচারক। অতএব উক্ত চারজনই বাহ্যত সংস্কারক হলেও প্রথম দুজন প্রগতিপন্থী আধুনিক, অপর দু'জন সনাতন শাস্ত্রের গৌরবগর্বী।

বিশ্বাসকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত করা পুতুলে হাত পা চোখ কান বসিয়ে তাকে জীবন্ত মনে করারই নামান্তর মাত্র। কেননা তাতে শাস্ত্রতত্ত্ব একটা কাল্পনিক অবয়ব ও আত্মা পায় বটে, কিন্তু বাস্তবে রবোটের মতো কেজো হয় না। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবুদ্ধি একালে আসমানী শক্তি নির্ভরতার বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক যাদুর প্রয়োজন হয়নি। স্বধর্ম, স্বধর্মী, স্বসমাজ ও স্বশ্রেণী বঙ্কিমচন্দ্রেরও অনুধ্যানের বিষয় হলেও দেশটা যে কেবল হিন্দুর নয়, এ চেতনও তাঁর ছিল। আর তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পরিবেষ্টনী ও ইতিহাসাশ্রিত। ফলে বঙ্কিমের মানস-বিচরণের ক্ষেত্র ছিল বিশাল, কল্যাণচিন্তা মানে ছিল উঁচু, মাপে ছিল ব্যাপক, মাত্রায় ছিল গুরু। তাই রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে অল্পায়ু হলেও বঙ্কিম হয়েছেন কৃতিবহুল। বঙ্কিমের বহির্মুখী চেতনার সঙ্গে অন্তর্মুখী চেতনাও ছিল প্রবল। তাই তরুণ বয়সে তাঁর মনে জেগেছিল গভীর জিজ্ঞাসা—'এ জীবন লইয়া কি করিব?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।..... অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি, যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, 'অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কর্মক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি।' বস্তুত এ জিজ্ঞাসাই বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ-ভাবনার, জীবন-জিজ্ঞাসার ও জীবনদৃষ্টির প্রসার ঘটিয়েছিল। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শুরু নাস্তিক্য দিয়েই। এ নাস্তিক্যই তাঁর সংস্কারমুক্তদৃষ্টির ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির উৎস ও ভিত্তি। পঁয়তাল্লিশোত্তর জীবনে আত্মপ্রত্যয়হৃত বঙ্কিম ভক্তিবাদী গীতাশ্রয়ী নিষ্ঠাবান একাগ্রচিত্ত মুমুক্ষু হিন্দু হওয়ার পূর্বাবধি ছিলেন ঐহিক জীবনপ্রিয় মানবতাবাদী। তাঁর ধারণায় মানুষের নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিক জীবনে অসংযম ও প্রলোভনই বিপর্যয় ঘটায়। এ জন্যে সাধারণভাবে রূপবহ্নি, অসূয়াবিষ ও পরিহার্য নিয়তিচেতনা [আমোঘ নয়]— এ তিন প্রকারের চিত্ত বিভ্রমকেই তিনি জীবনে ট্র্যাজেডীর কারণ বলে জানতেন ও মানতেন।

বাস্তব জীবনপ্রতিবেশে ব্যক্তি মানুষের একটা ব্যবহারিক বৈষয়িক সত্তা রয়েছে। সে-সত্তা বাস্তবজীবনের সমস্যা ও সম্পদ, চাওয়া পাওয়া না-পাওয়া নিয়ন্ত্রিত। আর এক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসত্তা থাকে, যারা কল্পনা-স্বপ্ন ও বাস্তবের মিশ্রণে-বাঞ্ছিত মনোময় জগৎ নির্মাণ করে তাতে মানসভ্রমণে সুখ পায়। নানা আঙ্গিকের সাহিত্য স্রষ্টারা এবং দার্শনিকরা ও অধ্যাত্মবাদীরা এ শেষোক্ত সত্তার লোক। একজন স্রষ্টা তার জ্ঞানপ্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে দার্শনিক চেতনা লাভ করেন, তাকে পুঁজি করেই বাস্তবে যা আছে এবং যা বাঞ্ছিত—এ দুটোকে কল্পনা ও স্বপ্ন বা কাঙ্ক্ষাযোগে সমন্বিত করে জীবনে অবাঞ্ছিতের প্রতি পাঠক-শ্রোতার বিরক্তি, এবং যৌথজীবনে কাম্য ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণের প্রতি আসক্তি জাগানো লক্ষ্যেই সাহিত্যালোক বা দার্শনিক জগৎ নির্মাণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে সব স্রষ্টার ও দ্রষ্টার জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা-রুচি-সংস্কৃতি একই মানের, মাপের ও মাত্রার নয় বলে অনেকের রচনাই অনর্থ ঘটায়—অগ্রাহ্যে বৃথা ও ব্যর্থ হয়। অতএব ব্যক্তির বাস্তব জীবনাচারে ও নৈর্ব্যক্তিক শ্রেয়োচেতনা প্রসূত ও নির্মিত শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের ভুবনে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। একই ব্যক্তি বাস্তবজীবনে আটপৌরে গতানুগতিক মননশীল, আবার সৃষ্টির ভুবনে বাস্তব ও বাঞ্ছিত কল্পনার রাসায়নিক মিশ্রণপটু। তাই শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক বাস্তব বৈষয়িক সামাজিক জীবনেও স্বসৃষ্ট ভুবনে কখনো অদ্বৈত, কখনো দ্বৈত, কখনো কখনো দ্বৈতাদ্বৈত সত্তায় আত্মপ্রকট করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ও রবীন্দ্রনাথকে বাঙালীরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যেই দেখতে অভ্যস্ত। ফলে তাঁদের কাছে এঁদের রক্ত-মাংসের ব্যক্তিরূপ ও স্রষ্টারূপ অভিন্ন হয়ে গেছে। তাই মানুষ বঙ্কিম কিংবা মানুষ রবীন্দ্রনাথ আজ অবধি কখনো স্বরূপে চিহ্নিত হননি। চিন্তা-চেতনার বিষয় ও বাহন সমকালীন বাস্তব জীবনপ্রতিবেশ থেকেই লঘু-গুরু কিংবা স্থূল-সূক্ষ্মভাবে সংগৃহীত হয় বলেই সাহিত্যিক-শিল্পী দার্শনিকের উভয় সত্তারই খবর আবশ্যিক হয় স্বরূপে তাঁদের জানবার বুঝবার জন্যেই।

বাস্তব জীবনের সমস্যার, সম্পদের ও প্রয়োজনের কথা যখন কোন চিন্তাশীল মনীষী প্রবন্ধে পরিব্যক্ত করেন, তখন তাতে আমরা একজন যুক্তিবাদী বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে পাই। অতএব, বাস্তব, ঘরোয়া ও সামাজিক কর্মে-আচরণে ও প্রবন্ধে আত্মপ্রকাশিত মানুষকেই কেবল প্রায়-পূর্ণ স্বরূপে জানা-বোঝা যায়। কাজেই প্রাবন্ধিক বা বক্তা কিংবা কর্মী মানুষ আর শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক মানুষ অভিন্ন ব্যক্তি হয়েও সবক্ষেত্রে অভিন্ন নন। প্রথম জন দেশ-কালের প্রতিবেশের অনুগত বাস্তব জীবনের সমস্যা-সম্পদের মধ্যে বাঁচেন, দ্বিতীয় জন বাস করেন স্ব অনুধ্যেয় ও স্বরচিত ভুবনে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মানুষ' সম্বন্ধে কৌতূহল ও তার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ছিল অশেষ। তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মানবতার অনুরাগী। গাঁয়ে আযৌবন লালিত হয়েও তিনি ছিলেন সর্ব সংস্কারমুক্ত নাস্তিক। বাল্যে-কৈশোরেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল। 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' তাই তাঁর জগৎ-ভাবনা ও জীবন-চেতনা অন্যের চেয়ে মানে মাপে মাত্রায় উঁচু ছিল। তখনই তিনি বুঝেছিলেন সম্ভবত যে 'বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।' এ মনুষ্যত্ব দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতির পরিবেষ্টনীর মাধ্যমেই যে অর্জন করতে হয় তাও মনে হয় তাঁর বোধগম্য হয়েছিল। সর্বসংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ ও স্বকীয় জীবনদৃষ্টিই ছিল তাঁর পুঁজি। তাঁর প্রথম দু'খানা রোমান্সে তাই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম চেতনা তেমন প্রাধান্য পায়নি।

এর পরেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-কাল-জীবন-জাতি ও সংস্কৃতি সচেতন হয়ে ওঠেন, প্রতীচ্যবিদ্যা ও প্রতিচীর প্রভাবমুক্ত ভারতে যূরোপীয় তাৎপর্যে কোন জাতিচেতনা ছিল না, 'দেশ' বা রাষ্ট্রচেতনাও ছিল না। রাজ্য ছিল রাজার। রাজার ও রাজ্যের সঙ্গে লোক সাধারণের সম্পর্ক সম্বন্ধ ছিল অনেকটা বাড়িঅলা-ভাড়াটের মতো। তাই দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা ছিল অনুপস্থিত। শাস্ত্র-সংস্কারের বন্ধনসূত্রে জাত একটি মানস-স্বাধর্ম্য চেতনা ছিল বটে, তবে সে গ্রন্থিও ছিল শিথিল। সতেরো শতকের শেষ পাদে মারাঠা অভ্যুত্থানের পর থেকেই পৌত্তলিকরা 'হিন্দু' অভিধা পেতে থাকে বটে, কিন্তু ইংরেজরাই এ নামে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে এদের স্বতন্ত্র জাতি-চেতনা দিতে থাকে, আর তুর্কী-মুঘলকে অভিহিত করতে থাকে কেবল 'মুসলমান' রূপে। হিন্দ্ [ভারত] হিন্দু, হিন্দুস্তানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[ভারতের অধিবাসী] হিন্দি [ভারতীয় ভাষা] প্রভৃতি নিত্য ব্যবহৃত নাম ও অভিধা ইংরেজ শাসকরা সুপরিকল্পিতভাবে ভুলিয়ে দেবার নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করল।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম একটি ভৌগোলিক স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বিৎসাবশে আবিষ্কার করেন সুবা-ই-বাঙ্গলা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে [বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা] স্বদেশরূপে এবং অধিবাসীদের স্বজাতি বলে। বাঙলা প্রেসিডেন্সীর অধিবাসীরা [বিহার উড়িষ্যা সমেত] তাই বাঙালী অভিধা পেল তাঁর থেকেই। এর আগে 'দেশ' শব্দটাই ছিল স্বগ্রাম নির্দেশক। এখনো আমাদের মধ্যে তা [দেশ, দেহাত] প্রচল রয়েছে। বঙ্কিম তাঁর মানসলোকে লালন করেছেন এ বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতি। দেশকে তিনি প্রথম 'মাতৃ' রূপে জেনেছেন, মাটি পূর্বেই দেবী বসুমতী অভিধায় চিহ্নিত ছিল, পৌত্তলিক পরিবারে ও সমাজে লালিত বঙ্কিম অবচেতনভাবেই দেশমাতার প্রতীক ও প্রতিমরূপে দুর্গাকেই বরণ করেছিলেন বটে।

কিন্তু তাঁর এ দেশমাতা কেবল হিন্দুর জন্যে ছিল না, বাঙলা বিহার উড়িষ্যার জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সব অধিবাসীর জন্যেই পরিকল্পিত। প্রমাণ তখন বাঙলার অধিবাসী সংখ্যা তিন কোটি, আর গোটা প্রেসিডেন্সীর জনসংখ্যা সাত কোটি।

অতএব স্বদেশের মাটির ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম গভীর প্রেমবশেই বন্দে মাতরম (১৮৭৫ সনে) নামের যাদুশক্তির মহামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে ঋষির সূক্তর মতো। এ গান নয়, কবিতা নয়, স্বদেশের, স্বজাতির ভাবমূর্তি, জাতীয় সত্তার শাব্দিক অবয়ব। একটি ভৌগোলিক অবস্থানে জাতিসত্তাবোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমের মনে জাগল পরম্পরা বা ঐতিহ্য জিজ্ঞাসা। খুঁজতে গিয়ে বুঝলেন আমাদের অতীত তুষার ঢাকা। এ উপলব্ধিও হল বিধর্মী বিদেশীর অভিসন্ধিজাত তথাকথিত বাঙলার ইতিহাসে বাঙলাকে ও বাঙালীকে পাওয়া যাবে না, তাই বাঙালী সত্তার সুপ্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও উন্নয়ন লক্ষ্যে চাই বাঙলার ইতিহাস, বাঙালীর ইতিহাস। এ ইতিহাসচেতনা বঙ্কিমের মানস-সন্তান।

তুর্কী বিজয় দিয়েই নতুন যুগের শুরু, যার এ কালীন নাম মধ্যযুগ। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বারো শতক থেকে উনিশ অবধিকালের আলেখ্য বিবৃত ও বিধৃত করতে চেয়েছিলেন তাঁর রোম্যান্সধর্মী ইতিবৃত্ত ভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে। ইতিহাস জানা ছিল না বলে ইতিহাসের কল্পিত ছায়া কিংবা অনুমিত কঙ্কাল সম্বল করেই তিনি কালক্রম রক্ষা না করেও উপন্যাসের আকারে বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাস রচনা করে দইয়ের সাধ ঘোলে মিটিয়েছেন।

মৃণালিনীতে তুর্কী বিজয় মুহূর্তের উদ্যমহীন শিথিল চরিত্র বাঙালীর সমাজের ও সরকারের পরিচয় বিধৃত ও স্বাধীনতা হারানোর কারণ নির্দেশিত। কপালকুণ্ডলার মতো রোমান্সেও দিল্লী দরবারের ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের চিত্র অঙ্কিত। বিষবৃক্ষে ও কৃষ্ণকান্তের উইলে উনিশ শতকী গ্রামীণ সমাজজীবনের আলেখ্য বিধৃত। সেসঙ্গে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সমস্যা আর ব্রাহ্মমতও হয়েছে প্রাসঙ্গিক। তেমনি রজনীতে ও ইন্দিরায় রয়েছে শহুরে জীবনে বিলেতী প্রভাবের আভাস। চন্দ্রশেখর, সীতারাম, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী প্রভৃতি আঠারো শতকের বাঙলার ইতিবৃত্তাশ্রিত উপন্যাস। কেবল রাজসিংহ-ই বঙ্গবহির্ভূত ইতিবৃত্তান্তমূলক রচনা।

তাঁর প্রথম দিককার রচনায় ঐহিক জীবন রসিক প্রত্যক্ষতাবাদী কিংবা শাস্ত্র-সংস্কারমুক্ত বঙ্কিমের চিত্তালোক প্রতিফলিত। বিমলা, আয়েশা, ওসমান, মতিবিবি, কুন্দ, দলনী, শৈবলিনী, রোহিণী, দরিয়া, মোবারক, জেবুন্নিসা, ভবানন্দ অসামান্য সৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দিষ্ট তত্ত্বপ্রতীক চরিত্রগুলো যেমন ভ্রমর, সূর্যমুখী, কপালকুণ্ডলা, লবঙ্গলতা, চঞ্চলকুমারী, মানিকলাল, অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্ব প্রতীক শ্রী, জয়ন্তী, দেবী চৌধুরানী [প্রফুল্ল] শান্তি, জীবানন্দ প্রভৃতি যন্ত্রচালিত পুতুল বিশেষ। ভোগবঞ্চিতা হীরার জিজ্ঞাসা ও দ্রোহ, শৈবলিনীর শাস্ত্র-স্বামী নয়, প্রেমনিষ্ঠা লেখকের অসামান্য উদার ও রসিক দৃষ্টির সাক্ষ্য। ভোগে বঞ্চিত বিধবা হীরার জিজ্ঞাসা, ক্ষোভ ও দ্রোহ এবং প্রেমিকা বিমলার স্বেচ্ছাবৃত আত্ম অবমাননা কিংবা প্রেমিকা শৈবলিনীর শাস্ত্র-স্বামীদ্রোহিতা, সতীত্ব ও পত্নীত্ব দেহে না মনে—এ প্রশ্ন আজো আমাদের সাহিত্যের অমীমাংসিত আলোচ্য উপাদান-উপকরণ।

নানা প্রয়োজনে ও প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অর্জিত, অনুভূত ও উপলব্ধ জগৎ-জীবন সম্বন্ধীয় তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন উপন্যাসগুলোতে। তবু জ্ঞানী মনীষী তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সত্যসন্ধিৎসু জ্ঞানপিপাসু বঙ্কিমের চলমান জীবনে পরিবর্তমান মন-মননের, মত-পথের, রুচি-সংস্কৃতি অকৃত্রিম রূপ-স্বরূপ বিধৃত রয়েছে তাঁর অন্যান্য রচনায়। তাঁর ঐহিক জীবনদৃষ্টি, প্রতিবেশ চেতনা ও শ্রেয়োবোধ প্রতিফলিত হয়েছে লোক রহস্যে, বিজ্ঞান রহস্যে, কমলাকান্তে এবং বিবিধ প্রবন্ধে ও সাম্যে আর তাঁর ধর্মানুরক্তির ও শাস্ত্রনিষ্ঠার দার্শনিক ও যৌক্তিক ভিত্তি রচনা করেছেন কৃষ্ণ চরিত্রে অনুশীলনে ধর্মতত্ত্বে ও শ্রীমদভগবদ্ আলোকে এবং প্রত্যক্ষবাদের প্রভাবে সনাতন শাস্ত্রের ও আচারের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, বিনাবিচারে নির্দ্বিধায় পুরোনো কোন নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। তবু তিনি প্রাচীনপন্থী সংস্কারক মাত্র, নতুন মতের স্রষ্টা নন। শাস্ত্র ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মত-পথের উৎসও প্রাতীচ্য বিদ্যা :

"আমরা যাহাকে ইংরেজী শিক্ষা বলি, তাহা বস্তুত জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি।... ইংরেজী শিক্ষাও নব্য হিন্দু ধর্মের অংশ বলিয়া আমি স্বীকার করি।"

পাদ্রী হেস্টির হিন্দু ধর্ম নিন্দা তাঁকে বাহ্যত শাস্ত্রানুশীলনে প্ররোচিত প্রণোদিত করলেও প্রৌঢ় বঙ্কিম নানা কারণে মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্কিমের আদর্শমানব কৃষ্ণকে, তাঁর অনুশীলনলব্ধ তথ্যকে, তাঁর উপলব্ধ ধর্মতত্ত্বকে এবং তাঁর দেয়া গীতার ভাষ্যকে তাই আচারনিষ্ঠ সনাতনীরা গ্রহণ করেনি, স্মার্তরাও না—সংস্কারকরাও না।

হাঁপানী ও বহুমূত্র রোগাক্রান্ত নিঃসন্তান, নিঃসঙ্গ দাম্ভিক [রাশভারী] বঙ্কিম আপ্তবাক্যে ও শাস্ত্রে আস্থা অঙ্গীকার করে বার্ধক্যের মুখে ঐহিক পারত্রিক জীবনে অভয় ও আশ্রয় প্রার্থী হলেন। ভক্ত হিন্দু বঙ্কিম সাম্যবাদে ভুল খুঁজে পেয়েছেন, গেরুয়া পরেছেন, নিরামিষ খেয়ে মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছেন। হিন্দুয়ানির কানাগলিতে আটকে পড়েছেন। যিনি দেশের মাটিকে মাতা বলে জেনেছিলেন, যিনি দেশের সমাজের ও মানুষের রূপ-স্বরূপ ইতিহাসের আয়নায় প্রত্যক্ষ করতে আকুল হয়েছিলেন, তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন মুসলমানকে বাদ দিয়ে দেশের বা মানুষের কথা পূর্ণতা পেতে পারে না। তাঁর সাহিত্যে তাই মুসলমানের ভীড় দেখি। আয়েশা, জেবুন্নিসা, ওসমান, দলনী, মীরকাসিম, মোহাম্মদ আলী, মোবারক, দরিয়া, চাঁদশাহ প্রভৃতি অনিন্দ্য চরিত্র। তাঁর আগে ঠকচাচাকে [প্যারীচাঁদ] তোরাপকে [দীনবন্ধু] আর হানিফকে [মধুসূদন] পেয়েছি—একজন খল, অপর দু'জন নিরক্ষর সাহসী লেঠেল। এত কথার পরেও করগণ্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবধি বলতে গেলে হিন্দুর রচনায় মুসলমান অনুপস্থিত, আর মুসলিমের লেখায় হিন্দু দুর্লভ। একালের কিছু গণসাহিত্যই কেবল ব্যতিক্রম।

বিদেশি শাসক-শোষক ইংরেজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্বাভাবিক ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল, ওয়ারেন হেস্টিংস ব্যতীত তিনি কোন চাকুরে ইংরেজের তারিফ করেননি, আর তাঁর উপরওয়ালা কোন ইংরেজের সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। এমন কি গোরাসেনা কর্নেল ডফিনের বিরুদ্ধে মামলা করে তাঁর অবমাননার শোধ নিয়েছিলেন। শেষাবধি তিনি চাকরীর মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই চাকরী ছাড়লেন। কিন্তু বিদেশাগত হলেও স্থায়ি বাসিন্দা পাঠানদের [স্বাধীন তুর্কী সুলতানদের ১৩৩৮-১৫৩৮] রাজত্বকালে বাঙলা স্বাধীন ছিল বলেই তিনি মানতেন। স্বাধীনতাই এ সময়কার হিন্দু সমাজের চিৎপ্রকর্ষের কারণ বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের দিল্লীকেন্দ্রী শাসনকে তিনি পরশাসিত শোষিত বাঙলার দুর্ভাগ্যের কাল বলে বিশ্বাস করতেন।

"রাজা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের [পাঠান আমলে] জমিদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকে রাজা বলিয়া বোধ হয়; তাঁহারা করদ ছিলেন মাত্র।

"পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।......মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। [মোগল আমলে] বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য দিল্লীর পথে গিয়াছিল।..... বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।"

তিনি জানতেন তিন কোটি বাঙালী কখনো ইংরেজি ভাষা শিখতে পারবে না। তাই "যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। ...সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই।" [বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, পত্র সূচনা, ১২৭৯ সাল]

'বঙ্গদর্শন' বাঙালীর মন-মননের, সাহিত্যরুচির ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করেছিল, বাঙালীর চিৎপ্রকর্ষের সহায়ক হয়েছিল। এতে সর্বপ্রকার বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।' [জীবনস্মৃতি] সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল। তিনি হিতবাদে, উপযোগবাদে ও নন্দনতত্ত্বে আস্থা রাখতেন: 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'—উনিশ শতকে এমনি স্বচ্ছ উপলব্ধি কেবল বঙ্কিকমের মতো মনীষীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। এক্ষেত্রে বঙ্কিম বামপন্থী লেখকের পূর্বসূরি। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষারও সমর্থক ছিলেন [স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের সময়ে]। উনিশ শতকের মধ্যে বঙ্কিমের মধ্যে বিজ্ঞানের যে গুরুত্বচেতনা দেখি, তা শত বছর পরেও মৌলবাদীদের অধিগত হয়নি, 'বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস—যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু।'

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাগ্রসর চিন্তা চেতনার স্তর ও বিস্তার কত উঁচু মানের, মাপের ও মাত্রার ছিল, তার সাক্ষ্য তাঁর সাম্য গ্রন্থ নয় কেবল, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের মনীষীরাও। কেননা রবীন্দ্র-শরৎ-প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ রাশিয়ায় সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন দেখেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজবোধে ও জীবনাচারে মধ্যযুগীয় সামন্ত ও একালের বুর্জোয়া মন-মত-রুচি পরিহার করতে সমর্থ হননি। কোঁতে প্রভাবিত বঙ্কিমও ব্যক্তিকে নয়, সমাজকেই গুরুত্ব দিয়েছেন আর বেন্থামের হিতবাদও তাঁর মন হরণ করেছিল। এ দু'জনের প্রভাব বঙ্কিমের উপর শেষাবধি ছিল, যদিও রুসো ও মিল শাস্ত্রানুগত বঙ্কিমকে ধরে রাখতে পারেন নি। তাঁর মানবপ্রীতি কোঁতে প্রভাবিত। 'মনুষ্য-জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না। [কমলাকান্তের দপ্তর] চিত্তশুদ্ধিই যে মনুষ্য কাম্য ও মনুষ্যসাধ্য শ্রেষ্ঠ চর্যা তা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন [চিত্তশুদ্ধি]।

বঙ্কিমচন্দ্র দেশকালের পরিবেষ্টনীর মধ্যে একটা নৈতিক আদর্শিক জীবনচর্চার ও জীবনাচারের অনুধ্যান করেছিলেন। শিক্ষিত প্রতীচ্য মানুষের চিন্তা-চেতনা-রুচি-সংস্কৃতিই ছিল তাঁর আদর্শ। বেন্থাম ও কোঁতে এবং রুশো ও মিল গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন প্রত্যক্ষবাদী ও হিতবাদী বঙ্কিমচন্দ্রকে।

বাঙলার দুই প্রজন্মের দু'জন মনীষীর মধ্যে এক আকস্মিক বৈপরীত্য দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে [১৮৮২ সনে] নির্মোহ উদার চিন্তা-চেতনার আকাশ ছেড়ে শাস্ত্রের সংরক্ষিত সংকীর্ণ মন্দিরে আশ্রিত হন স্বেচ্ছায় স্বোপলব্ধ শ্রেয়োপ্রণোদনায়। আর রক্ষণশীল রবীন্দ্রনাথ সাতচল্লিশ বছর বয়সে বৈশ্বিক চেতনায় হন প্রবুদ্ধ। নাস্তিক বা প্রত্যক্ষবাদী সংস্কারমুক্ত উদার মানবিকতাবাদী বঙ্কিম শাস্ত্রিক সত্যের মোহে পড়ে 'কেবল হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম' [৫ম অধ্যায় অনুশীলন] জেনে একাগ্রচিত্তে জীবনের অমূল্য শেষ বারো বছর ব্যয় করলেন। এভাবে সুপ্রাচীন সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের ও দর্শনের আধুনিকায়নে নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্কিম হলেন চিন্তানায়ক ও জাতিচেতনার জনক।

য়ুরোপীয় তাৎপর্যে জাতিচেতনা ছিল গোটা উনিশ শতকেই অজ্ঞাত। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মধ্যে তখন বিকৃত অভিধায় স্বধর্মীর ঐক্য ও স্বার্থচেতনাই ছিল "জাতীয়তা"। ফলে বাঙলায় তথা ভারতে ইংরেজি শিক্ষিতরা কেবল হিন্দু হল কিংবা মুসলমান হল, কেউ আর নির্বিশেষণে বাঙালী বা ভারতীয় রইল না। বস্তুত ১৯১৫ সনের পর থেকে গান্ধী নেতৃত্বের জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে কেবল ভারতীয় বানানোর কংগ্রেসী চেষ্টা কার্যত ব্যর্থই হয়েছিল। একালের 'সম্প্রদায়' অভিধায় সেকালে হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান পার্শী কেউ অভিহিত হত না। তারা সবাই ছিল স্বতন্ত্র 'জাতি'। বৈষয়িক জীবনে হাজার বছর ধরে সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদে বেদনায় একত্র হয়েছে কখনো কখনো, কিন্তু একাত্ম হয়নি কখনো, পাশাপাশি বাস করেছে, যানবাহনে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসেছে, হাটে-মাঠে-বাটে দেখা হয়েছে, লেনদেন করেছে, ঝড়-খরা-বন্যার শিকারও হয়েছে একইভাবে, কিন্তু প্রত্যেকেরই জীবন চেতনা ও জীবনাচার স্ব স্ব শাস্ত্র শাসিত বলে এরা কখনো গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে ভিন্ন দলের, গোষ্ঠীর, সমাজের বা শাস্ত্রের মানুষের সঙ্গে মন দেয়া নেয়া করেনি। অবশ্য কামে-প্রেমে শ্রম বিনিময়ে বা ক্রয়ে বিক্রয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও সহযোগিতা চিরকালই চালু ছিল, আছে এবং থাকবে।

'সম্প্রদায়' কেবল দল, গোষ্ঠী, গুরুর শিষ্য সমাজ নির্দেশক ছিল। কাজেই বঙ্কিম যদি হিন্দু জাতি গঠনে প্রয়াসী হন কিংবা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন ও প্রণোদনা দানে প্রয়াসী হন, তা হলে তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' বলা যাবে না। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বজাতি প্রেমী, স্বদেশসেবী বলেই জানি ও মানি। মানবিকতায়-মানবতায়ও ছিল তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্বার অনুরাগ। আরো একটি কথা জানবার বুঝবার ও স্বীকার করবার রয়েছে। ব্যক্তি বঙ্কিমের কোন ইংরেজপ্রীতি ছিল না, ইংরেজের তথা য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন ইতিহাসই তাঁর মন হরণ করেছিল। বঙ্কিম ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ওপরঅলা ইংরেজের সঙ্গে কখনো সদ্ভাব রাখেননি, তেমনি তাঁর সাহিত্যেও ইংরেজকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করেছেন আঠারো শতকের নওয়াব ও প্রশাসকদের নিন্দা করেছেন। [দেবী চৌধুরানীতে, আনন্দমঠে] বিক্ষুব্ধ দেশেপ্রেমী বঙ্কিম, তাঁর দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন বলেই, মুসলমান বলে নয়। প্রমাণ মীর কাসিম। চঞ্চল কুমারীর বাদশাহর তসবিরে বিদ্বেষ নেই, বিদ্বেষ কেবল তখনকার শাসক আওরঙজেবের প্রতি। পদাঘাতে তসবির ভাঙায় লেখকের মনের সায় ছিল ভাবা উচিত নয়, বড় ঘরেও কদর্য রুচির উত্তেজিত লোক যে থাকে এ তারই প্রমাণ, যেমন সীতারামে এক ইতর মুসলমান রাস্তা আগলে শুয়ে থাকে। 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে শাইলকের প্রতি ঘৃণা ও ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। একি শেক্‌সপীয়ারের, না সমকালীন ভেনিসিয়ান খ্রীস্টানদের? বঙ্কিমসাহিত্যও এ দৃষ্টি ও মন দাবি করে।

তা ছাড়া নিম্ন বর্ণের ও বিত্তের দেশজ মুসলিমরা ছিল সাধারণভাবে নিরক্ষর ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী—কলু, নিকেরী, তাঁতী [জুলহা], নিঃস্ব খেতমজুর, প্রান্তিক চাষী, মুলুঙ্গী, কাগজী, কাহার, কয়াল প্রভৃতি। তুর্কী-মুঘল আমলেও গাঁয়ে তাদের ছিল হিন্দু পাইক পেয়াদা-রাজস্ব কর্মচারী কায়স্থ ও বেণে জমিদার তালুকদার তরফদার মহাজন দোকানদার নিয়ন্ত্রিত জীবন। প্রাত্যহিক জীবনে তারা ছিল নাপিত-ধোপা-মুচি-মালি-হাড়ি-ডোম-পাল্‌কীবাহক প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া দরবেশের হাতে দীক্ষিত বলে শরীয়তি ইসলামের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল সামান্য। হিন্দু বৌদ্ধ পূর্বপুরুষের আচার সংস্কার তখনো তাদের মধ্যে ছিল ব্যাপক ও গভীর। কাজেই ভেদবুদ্ধিহীন হিন্দু-মুসলিম বাউলদের মতোই এদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-চেতনার উন্মেষ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে হয়নি। রাজনীতিক স্বার্থবুদ্ধি জাত ওয়াহাবী ফরায়েজী আন্দোলনই দেশজ মুসলিমদের মধ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি জাগায়। তাই সেকালে সাম্প্রদায়িক তথা ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা হয়নি। কাজেই এ দেশজ মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সম্পর্ক কোন দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ছিল না। উল্লেখ্য যে স্বধর্মী বলে, বিশেষ করে শাস্ত্রের সমর্থন রয়েছে বলে দেশজ মুসলিমের সম অবস্থানের-শোষিত লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও—স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য তফ্‌শীলী হিন্দুরা কখনো বর্ণ হিন্দু জমিদার মহাজন চাকুরের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি, কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মুসলিমরা শাসক শোষক বঞ্চক বলে হিন্দুবিদ্বেষী হয়। শাসক মুসলিমদের সম্বন্ধে শাসিত হিন্দুর কিছু বেদনা বিরক্তির, পীড়ন-শোষণের স্মৃতি হিন্দুমনকে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ-রুষ্ট করত, করে। তেমনি ক্ষোভ ক্রোধ-রোষ আমাদের রয়েছে ইংরেজদের প্রতিও। ইংরেজকে 'খ্রীস্টান' নামে চিহ্নিত করে গালি দিলে সারা খ্রীস্টান জগৎ তা গায়ে মাখবে। 'ইংরেজ' দৈশিক নামে পরিচিত রইল, কিন্তু ভেদনীতির সাফল্য লক্ষ্যে তুর্কী মুঘলদের কেবল 'মুসলিম' নামে করল আখ্যাত। ফলে উনিশ শতক থেকে হিন্দু মাত্রই দেশজ ও বিদেশী নির্বিশেষে মুসলমানদের প্রতি হল অপ্রসন্ন বা বিদ্বিষ্ট। যেন মুসলিম শাসক দুঃশাসক হয় ধর্ম বিশ্বাসের ফলেই। আর দেশজ মুসলিমদের গায়েও লাগে প্রাক্তন শাসকদের প্রতি হিন্দু উচ্চারিত নিন্দা-গালি। বঙ্কিম সাহিত্যে এখনো যদি 'মুসলমান' কেটে মুঘল কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠান বসানো হয়, তাহলে তাঁকে মোটেই মুসলিম বিদ্বেষী বা সাম্প্রদায়িক বলা সম্ভব হবে না। আমাদের আরো জানা দরকার যে আনন্দমঠের পত্রিকায় প্রকাশনাকালে যেসব স্থানে ইংরেজ নির্দেশক শব্দ ছিল সেগুলো গ্রন্থাকারে মুদ্রণ কালে যবন, নেড়ে, ম্লেচ্ছ রূপ ধারণ করে। লেখক চাকুরে বলে পদচ্যুতির ভয়জাত এ পরিবর্তন, —মুসলিম বিদ্বেষের পরিচায়ক নয়।

বঙ্কিম সেই তুর্কী-মুঘল মুসলিমদের ক্বচিৎ কারো নিন্দা করছেন উপন্যাসের কাহিনীর খাতিরে, লাঞ্ছিত স্বজাতির ক্ষোভ ক্রোধ রোষ বেদনা প্রকাশের জন্যেই। আমরা জানি সমকালীন কোন মুসলিমের প্রতি তাঁর বা অন্য কোন হিন্দু লিখিয়ের কর্মে-আচরণে কোন বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। কেননা উনিশ শতকে মুসলমানেরা কোন ক্ষেত্রেই হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বরং সামাজিক রীতি অনুসারে চাষী-মজুরের প্রতি ছিল তাদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য। রামা কৈবর্তে ও হাসিম শেখে তাঁর সুপ্ত বা ব্যক্ত পার্থক্য চেতনা ছিল না। বন্দে মাতরম সঙ্গীতের সাত কোটিতে হিন্দু মুসলিম-খ্রীস্টান সবাই আছে। তিনি এ-ও জানতেন বাঙলার মুসলমানরা বাঙলা ভাষায় তাদের মন-মনীষার অভিব্যক্তি না দিলে বাঙলার সামগ্রিক সামূহিক ও সামষ্টিক উন্নতি হবে না।

একশ বছর আগে চাষী-মজুর সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনা একালের প্রগতিশীল সমাজ ও সম্পদ সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তির মতো ছিল : "তুমি আমি দেশের কজন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয়জন থাকে? তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য হতে পারে না? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?... যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই" [বঙ্গদেশের কৃষক ১ম পরিচ্ছেদ]।

AMARBOI.COM

পরশ্রম ও পরসম্পদ জীবিতার গ্লানি সম্বন্ধেও বিবেকবান বঙ্কিম সচেতন ছিলেনঃ "দুধ আমার বাপেরও নয়, দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। খাইতে পাইলে কে চোর হয়? পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন?....আমি যদি খাইতে না পাইলাম তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?" [কমলাকান্ত]

উচ্চ মানের ও মাত্রার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র যে সৎ ও ন্যায়বান ছিলেন, আদর্শ মানুষের গুণাবলী-চেতনাও যে তাঁর ছিল, তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ—রুচি-রিক্ত চরিত্রহীন আদর্শশূন্য সুযোগ ও সুবিধে সন্ধানী তোয়াজ তোষামোদকারী ও কপট পদলেহীদের তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। প্রমাণ ইংরেজ স্তোত্র, বাবু গর্দভ এবং মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত। মূর্খতার নিন্দাও আছে, যেমন 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র'। আর বাহ্যত রাশভারী হলেও লোকরহস্য, কমলাকান্ত এবং মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত রঙ্গ-ব্যঙ্গ বিদ্রূপ [Wit, humour] রসিক, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, লোকচরিত্র জিজ্ঞাসু, কৌতুকপ্রিয়, সূক্ষ্মবুদ্ধি সদাপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচায়ক। তাত্ত্বিক দার্শনিক প্রবন্ধেও বিজ্ঞ এবং সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ মননশীল বঙ্কিমকে পাই, যেমন বাহুবল ও বাক্যবল, চিত্তশুদ্ধি, একা-কে গায় ওই, পতঙ্গ, বড় বাজার ইত্যাদি।

যত বড় মনীষীই হোন মানুষ মাত্রেই জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা শক্তি সীমিত বলেই তাঁদের জানা-বোঝায় ভুলত্রুটি থাকে, কথায় কাজেও সবসময় সঙ্গতি থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না দীর্ঘ জীবনাচারের ধারায়। বঙ্কিমের চিন্তায়-চেতনায় কর্মে-আচরণে তেমন ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্লক্ষ্য নয়। বিধবা বিবাহে তাঁর সায় ছিল না। তাঁর যুক্তি— যে নারী স্বামীকে ভালোবেসেছে, সে কখনো পুনর্বিবাহে রাজি হবে না। অথচ স্ত্রীকে ভালোবাসা যে পুরুষেরও দায়িত্ব তা মৃতদার বঙ্কিম পুনর্বিবাহকালে ভেবে দেখেননি।

বাঙলা সংবাদপত্রের প্রকাশের ও প্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। বারো বছর বয়সের পূর্বে স্বামী সহবাস নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করার জন্যে সরকারের কাছে গণস্বাক্ষর নিয়ে যে দরখাস্ত করা হয়েছিল ১৮৯০ সনে, তাতে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সই করতে সম্মত হননি।

আর একটি পুরোনো কথা মনে পড়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতির বিশেষ মূল্য দিতেন না, যেমন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের তাচ্ছিল্য ছিল মধুসূদনের কবি-রুচির প্রতি। এর মধ্যে কি জিগীষুর সূক্ষ্ম অসূয়া ছিল! [আমার 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা' গ্রন্থভুক্ত বঙ্কিমবীক্ষা নামের দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে অনেক কথা বলা হয়েছে বলেই এখানে কোন কোন মত-মন্তব্য বিশ্লেষিত হয়নি।]

AMARBOI.COM

বঙ্কিমচন্দ্র

নতুন বাঁকা চাঁদ দিয়েই শুরু হয় চান্দ্র মাস, গণনা করা হয় চান্দ্র বছর। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বাঙলাসাহিত্য ক্ষেত্রে তেমনি এক নতুন বাঁকা চাঁদ। তাঁকে দিয়েই আমাদের সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু। তাঁর সমকালীন য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে প্রতীচ্য আদলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেন বঙ্কিমচন্দ্রই। উল্লেখ্য মধুসূদনের সাহিত্যিক চিন্তা-চেতনা অঙ্গে ও অন্তরে ছিল সতেরো শতকের ক্লাসিক সাহিত্য সীমানায় নিবদ্ধ।

বিদ্যাসাগর নির্মিত ভাষাই বঙ্কিম-শৈলীর ভিত্তি। তাজমহলের ভিতও অন্য অনেক মসজিদের মতোই, কিন্তু তাজমহল যেমন সৌন্দর্যে অতুল্য, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-শৈলী ছিল তাঁর সমকালে অনুকরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রূপ ও আচরণ বর্ণনা ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রায় ক্ষেত্রেই আবেগপুষ্ট, ছন্দোবদ্ধ, রোমান্টিক গদ্যকবিতা হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে-কোন উপন্যাসের যে-কোন পৃষ্ঠায় এমনি কবিতার সাক্ষাৎ মিলবে।

লক্ষ্যনির্দিষ্ট তত্ত্বপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতে একাধারে ইতিবৃত্তের, রোম্যান্সের ও উপন্যাসের স্বাদ মেলে। তাঁর রোম্যান্টিক কল্পনাও বাস্তব এবং বাস্তব চিত্রও রোমান্স ঘেঁষা হয়েছে। পড়ার সময়ে পাঠকের কাছে কোথাও কোন বর্ণনা অলৌকিক বা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বৃত্তি-প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের চিন্তা-কর্ম-আচরণের রহস্যজিজ্ঞাসু। তাঁর উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসেও তাই পাত্র-পাত্রীর আচরণ তিনি নিয়ন্ত্রণ করেননি, কেবল অনুসরণ করেছেন। শ্রেয়োবাদী হয়েও তিনি ছিলেন মানবিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবতার সাধক। তাই তাঁর সাহিত্যে ভিলেন [Villain] নেই, ঘৃণ্য নয় কোন চরিত্র। সহানুভূতি পায় সব হতভাগ্য চরিত্রই।

উদ্ধত বীরেন্দ্র, লম্পট শশিশেখর, শূদ্রী কন্যা বিমলা, মুঘল-পদলেহী মানসিংহপুত্র জগৎ সিংহই প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক ও মানববাদী সাহসী তরুণ বঙ্কিমের শ্রদ্ধেয় পাত্র-পাত্রী। এর পরেও মতিবিবি, পশুপতি, হীরা, কুন্দ, রোহিণী, শৈবলিনী, ভবানন্দ, সীতারাম অবজ্ঞেয় হয়নি। হীরা শৈবলিনীর জিজ্ঞাসার উত্তর মেলেনি এবং দ্রোহের কারণ হয়নি অপসৃত।

কল্পনাশক্তিতে, মননে, রসবোধে, ভাষাশৈলীতে, বিষয়-বিন্যাসে, যুক্তি প্রয়োগে, জীবন ও প্রকৃতি চেতনায়, দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় ও মানব চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায় বঙ্কিমচন্দ্র যে অনন্য ছিলেন, অসামান্য ছিল তাঁর শক্তি, তা দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) আগে প্রকাশিত তাঁর পূর্ববর্তী দুই বিদ্বানের, প্যারীচাঁদ মিত্রের [১৮১৪-৮৩] আলালের ঘরের দুলাল [১৮৫৮] ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের [১৮২৭-৯৪] অঙ্গুরীয় বিনিময় [১৮৬২] গ্রন্থ দুটোই আমাদের জানিয়ে দেয়।

বিষয়গত বৈচিত্র্যে, বাকে-বাক্যে-বক্তব্যে, ব্যক্তিসত্তার মননবৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে আজ গল্প-উপন্যাস সাহিত্য অনেক বিকাশ-বিস্তার পেয়েছে, তবু রোহিণীর মৃত্যুর, বিনোদিনীর ঘরছাড়ার, কিংবা কিরণময়ীর উন্মাদ হওয়ার কারণ আমাদের সমাজে-সংসারে-চিন্তায়-চেতনায় অথবা রুচি-সংস্কৃতি সৌজন্য ক্ষেত্রে অপসৃত হয়েছে কি? হীরা-শৈবলিনীর প্রশ্নের উত্তর মিলেছে কি? ঘরে-বাইরের বিমলা, গৃহদাহের অচলা কিংবা পুতুল নাচের ইতিকথার কুসুম কি শৈবলিনীকে সত্যই অতিক্রম করেছে?

AMARBOI.COM

। ২ ।

বঙ্কিমচন্দ্র মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতেন। চিন্তায়-কর্মে আচরণে জীবনকে সর্বপ্রকারে সফল ও সার্থক করার উপায়ও সন্ধান করেছেন আবাল্য। তাঁর মন-মনন-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাও গড়ে উঠেছিল পড়ে পাওয়া পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-চেতনার রুচি-সংস্কৃতি সৌজন্যের আদলে। প্রতীচ্য প্রভাবে পাওয়া জন্মভূমি চেতনা হিন্দু ঘরে লালিত বঙ্কিমের চেতনায় মাতৃভূমি হয়ে উঠল এবং তা দুর্গা প্রতিমা ভর করল। এ-ই ছিল স্বাভাবিক। এ সময়ে এ বিষয়ে তাঁর পরিবেষ্টনীগত সতর্ক বিবেচনার কারণ ছিল না। কেননা, দেশজ শিক্ষিত মুসলমান ছিল বাঙলাদেশে তখনো বিরলদৃষ্ট এবং বঙ্কিমের প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগে উনজন বা সংখ্যালঘু। উল্লেখ্য যে তখনো আদম সুমারিও শুরু হয়নি। কাজেই হিন্দু জমিদার, মহাজন, উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং হিন্দু শিক্ষিত ও চাকুরে অধ্যুষিত সমকালীন বাঙলার মনীষী দেশমাতৃকারূপে প্রমূর্ত দুর্গাকে গ্রহণ করে অদূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখলেও সাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দেননি। কেননা, তাঁর 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র সঙ্গীতোক্ত সাত কোটি সন্তান সেকালের সুবাহ বাঙ্গলায় বাঙালী, বিহারী, উড়িষা হিন্দু-মুসলমান নিয়েই ছিল সাত কোটি, কাজেই ওই সঙ্গীতোক্ত সংখ্যা কেবল বাঙালী হিন্দুর নয়, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর জাত-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সব অধিবাসীর।

আরো উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যে-কৈশোরে অখণ্ড ভারত চেতনাও জাতীয়তার ভিত্তি হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা খণ্ডভাবে বোম্বাই ও মাদ্রাজ ছাড়া ১৮৪৯ সনের পরেই পাঞ্জাব ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে আসে এবং দিল্লীর বাদশাহীও গণচিত্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় স্থ ান ছিল। ফলে গোটা ভারতের কোন মানচিত্র মনের মুকুরে কিংবা বাস্তবে অঙ্কিত মানচিত্রেও ছিল না। তাই বঙ্কিমের স্বদেশচেতনা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর সীমানায় এবং অবচেতনভাবেই তাঁর স্বজাতিবোধ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল নিবদ্ধ।

অখণ্ড ভারত-চেতনা কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠা-উত্তরকালে মনোজগতে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হতে থাকলেও, তা দৃঢ়মূল হবার আগেই বঙ্কিমজীবনের অবসান ঘটে। প্রত্যক্ষবাদী ও নাস্তিক, মানবতার সাধক, মানবিকতাপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবেষ্টনীগত কারণে, ব্রিটিশ প্ররোচনায় ও প্রচারে হিন্দু-প্রধান জাতি-চেতনা জাতিনির্মাণে ও জাতি-প্রাণ সমাজ গঠনে অনুধ্যান ও আগ্রহ থাকলেও তিনি কখনো সচেতনভাবে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। প্রমাণ 'পাঠান কুল তিলক' ওসমান, নারীরত্ন আয়েশা, মোহাম্মদ আলী, দলনী বেগম, দরিয়া, মবারক, চাঁদশাহ এবং পরিণামে জেবুন্নিসা। আর নির্মল কুমারী সম্পর্কে ঔরঙ্গজেব তো উদার ও হৃদয়বান মহৎ সৃজন। লক্ষণীয় যে এরা সবাই মুসলমান বটে, তবে বাঙালী নন— তুর্কী মুঘল। আর যে মানুষ পরান মণ্ডলকে ও হাসিম শেখকে সমচোখে দেখেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনায় গলেন এবং সাম্য লেখেন, পাঠান আমলকে বাঙালীর স্বাধীনতার যুগ বলে মানেন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কি তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে? হিন্দুকে প্রেরণা-প্রণোদনা দেয়ার ও হিন্দুমনের পরিচয় দানের গরজে উপন্যাসে যে মাঝে মধ্যে তুর্কী-মুঘল শাসকবিদ্বেষ ছড়াতে হয়েছে, সেকথা কবুল করেছেন। আর দেবীচৌধুরানীতে ও আনন্দমঠে স্বাধীনতা রক্ষায় অক্ষম শাসকগোষ্ঠীর প্রতি দেশের সদ্য স্বাধীনতাহৃত হিন্দুর যে বিদ্রূপ-বিদ্বেষ অভিব্যক্তি পেয়েছে, তা দেশজ মুসলিমকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে 'মুঘল' শব্দের পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসকের ও ইতিহাসকারদের প্রভাবে কেবল 'মুসলমান' শব্দটি ব্যবহারের ফলেই। [আনন্দমঠে গোড়ায় উদ্দিষ্ট শত্রু ছিল ইংরেজই]

AMARBOI.COM

। ৩ ।

বঙ্কিমচন্দ্র দেশ -কাল-সমাজ সচেতন, মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন মনীষী-মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও সতর্ক দৃষ্টির, জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসার এবং নানা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বচেতনার সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর লোকরহস্যে, বিজ্ঞানরহস্যে ও কমলাকান্তে। আর দেশ-জাতি সমাজ ও মানুষ এবং নীতি-নিয়ম-শাসন-সংস্কৃতি-ইতিহাস সম্পৃক্ত সমস্যা ও সম্পদ আলোচিত হয়েছে তাঁর বিবিধ প্রবন্ধে। প্রত্যেকটা পুস্তক সমালোচনায় ও বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধে অভিব্যক্ত মতে ও মন্তব্যে রয়েছে তাঁর শ্রেয়োবোধের ও হিতবাদের স্বাক্ষর। এক কথায় উপর্যুক্ত রচনার অঙ্গে ও অন্তরে রয়েছে ধীরবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী স্থির-প্রত্যয়ী শ্রেয়োবাদী মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ পরিচয়। অক্ষয়কুমার দত্তের [১৮২০-৮৬] পরে বঙ্কিমচন্দ্রই বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞাননির্ভর মানুষ। "বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। [ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, বঙ্গদর্শন, ১ম বর্ষ, ভাদ্র] আর কমলাকান্তে তো বঙ্কিমের আত্ম-অনুভবই অভিব্যক্ত। এ তাৎপর্যে বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ-ভাবনা ও জীবন-চেতনা, এক কথায় তাঁর জীবন-তত্ত্ব কমলাকান্তেই স্বরূপে প্রকটিত হয়েছে। তাঁর সমকালীন শিক্ষিত হিন্দু সমাজ-মন প্রতিবিম্বিত হয়েছে ইংরেজ তোত্রে 'বাবু'তে ও 'গর্দভ' স্তুতিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

।৪।

আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন পূর্তি-অপূর্তির অনুভবের সমষ্টিই জীবনানুভূতি। নিরাপদ-নিরুদ্বেগ জীবনই জীব মাত্রেরই কাম্য। মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখে, জানে ও বোঝে যে চাওয়া ও পাওয়া অবাধ বা বির্বিঘ্ন নয়। না পাওয়ার দুঃখ-যন্ত্রণা-ক্ষতি ঘটায় কোন এক অদৃশ্য মন্দ শক্তি, তাকে অসহায় মানুষ ভয় পায়, সে-শক্তিকে প্রতিরোধ করার সহায়ক-শক্তি খোঁজে মানুষ। এভাবেই মানুষের জীবন আদিকাল থেকেই ভয়-ভরসা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই ভয়ের অরি দেবতাকে প্রতিহত করার জন্য ভরসা দেয়ার মিত্র দেবতাও তাকে বানাতে হয়েছে। কল্পনায় এসব অরি-মিত্র শক্তির সৃষ্টি, প্রাজন্মক্রমিক সংস্কারে এদের স্থিতি এবং বিশ্বাসে এদের প্রতিষ্ঠা। বিশ্বাসকে যুক্তিযোগে সত্য করার প্রয়াস পুতুলে হাত-পা-চোখ বসিয়ে তাকে প্রাণবন্ত ভাবার নামান্তর। ভয় থেকেই এ আসমানি শক্তির উদ্ভব। আত্মপ্রত্যয়শূন্য সাহসরিক্ত ভীরুচিত্তে ভয়-ভরসার লালন। গৃহগত জীবনে এ ভয়-ভরসা মানবচিত্তে আশৈশব লালন পেয়ে দৃঢ়মূল হয়। প্রাচুর্যের নিরাপদ ও যৌবনের সুস্থ ও স্বস্থ জীবনে এ ভয়-ভরসা চেতনার প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় না বিশেষত প্রয়োজন বা প্রলোভন প্রবল হলে মানুষ করে না হেন দুঃসাধ্য সু বা কু কর্ম নেই। এ অশৈশবলালিত পারিবারিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক ও আচারিক বিশ্বাস-সংস্কার-আচার পরিহার করতে পারে তেমন জ্ঞান-প্রজ্ঞাবান যুক্তি-বুদ্ধিমান আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী মানুষ ক্বচিৎ কোটিতে গুটিক মেলে। শাস্ত্র-সংস্কার-বিশ্বাস-আচারের ফলাফল পরম্পরাগত শোনা-কথা নির্ভর হলেও, যুক্তি ও প্রমাণ গ্রাহ্য না হলেও, দ্বিধাগ্রস্ত ভীরু মানুষ 'যদি' আশ্রিত হয়, যদি শাস্ত্র অভ্রান্ত ও অপৌরুষের হয়, যদি পাপ-পুণ্যের পুরস্কার-তিরস্কার থাকে, যদি স্বর্গ-নরকের সুখ-শান্তি সত্য হয়। যদি মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ কিংবা জন্মান্তর, প্রেতলোক, চিরনরক-যন্ত্রণা থাকে, সবচেয়ে বড়ো কথা, যদি অবিনশ্বর 'আত্মা' বা চেতনা বলে কিছু থাকে এবং মর্ত্যজীবনের অবসানে ভয়াবহ চির-জ্বালা যন্ত্রণাকর অবস্থায় তাকে থাকতে হয় তা হলে! —— এর নামই আস্তিক্য। ভীরু মানুষ সাধারণভাবে বৃদ্ধ বয়সে আসন্ন বা আপন্ন মৃত্যু-চেতনা কবলিত হয়ে পরজীবনের অনিশ্চয়তাভীরু হয়ে ধর্মকর্মে আন্তরিক ও একাগ্রচিত্ত হয়।

প্রত্যক্ষ ও মুখ্যত হেস্টির হিন্দুশাস্ত্র নিন্দায় জাতীয় অবমাননাবোধে ক্ষুব্ধ হয়ে পরোক্ষে পিতার স্নেহ ও ভিটাচ্যুত, হাঁপানি-বহুমূত্র কবলিত, ভগ্নস্বাস্থ্য, অপুত্রক, নিঃসঙ্গ, আত্মাভিমানী হতাশ বঙ্কিমচন্দ্রও আকস্মিকভাবে ধর্মাশ্রিত হয়েছিলেন, 'আকস্মিকভাবে' বলছি এ জন্যে যে পঁয়তাল্লিশ বছর অবধি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মুখ্যত কোঁতে, মিল ও বেন্থাম প্রভাবিত প্রত্যক্ষবাদী, নাস্তিক, ঐহিক জীবনে শ্রেয়োকামী, সাম্যবাদী, মানবতার প্রবক্তা প্রচারক।

এক সময়ে যাঁর মদে-মাংসে অনীহা ছিল না, তিনি হঠাৎ গেরুয়া পরে, চন্দন চর্চিত হয়ে, নিরামিষ খেয়ে, সন্ধ্যা-আহ্নিক করে, 'ভক্তিতেই মুক্তি' তত্ত্ব অঙ্গীকার করে ভিন্ন এক মানুষ হয়ে উঠলেন। উল্লেখ্য যে জ্ঞান-কর্মবাদের মতো ভক্তি কোন তত্ত্ব নয়, আবেগমাত্র। অবতার কৃষ্ণকে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে লৌকিক ইহজাগতিক ও আদর্শ জীবননীতি-নিয়ম প্রবর্তক সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্তা মহামানব হিসেবে দাঁড় করালেন। কাজেই কৃষ্ণকে তিনি অপৌরুষের নয়—পৌরুষেয় মানবধর্ম প্রবর্তকরূপে দেখেছেন। মানবধর্ম মাত্রই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহজাগতিক বা ঐহিক জীবনসম্পৃক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা হলে তাঁর ন্যায়সঙ্গত যৌক্তিক ধর্ম—কোঁতে, মিল, বেন্থাম প্রমুখ প্রচারিত প্রত্যক্ষবাদ, হিতবাদ, উপযোগবাদ প্রভৃতির মতো কোন এক নামে পরিচিত হত, বঙ্কিম প্রচারিত এ মানবধর্ম এক নব দার্শনিক অবদানরূপে প্রশংসিত হত। কিন্তু ভক্তিবাদী বঙ্কিম ভক্তিকে ও ঈশ্বরানুগত্যকেই পারলৌকিক মোক্ষের উপায় রূপে অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর মানব-ধর্মের স্থিতি গীতায়। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী বঙ্কিম জানলেন, বুঝলেন ও মানলেন যে জগতে 'কেবল হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। [অবশ্য স্ব স্ব ধর্ম সম্বন্ধে সবাই এমনি কথাই বলেন।] একবার বলেন 'সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্তিই মনুষ্যত্ব', আবার বলেন 'ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ... ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি, ইহারই 'লক্ষণ ভক্তি, প্রীতি, শান্তি।' শেষাধি বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মমতের ক্ষেত্রে সংস্কারক। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমের আবিষ্কৃত এ ধর্মতত্ত্ব শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ নিরপেক্ষ। তাই বেদ উপনিষদ স্মৃতির ও পুরাণের তত্ত্ব ও সত্যসার নয় এটি কোন অর্থেই। পুরাতন শাস্ত্রীয় মত-পথকে জোড়াতালি দিয়ে যুগোপযোগী করে তোলাই সংস্কারকের কাজ। সংস্কারক মাত্রই মূলে সনাতনী ও স্বরূপে রক্ষণশীল। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন ধর্মের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ব্যাখ্যাপ্রবণ, টীকা-ভাষ্য যোগে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে ও সত্যে আস্থাসঞ্চারকারী আধুনিক অর্থে একজন মৌলবাদী মাত্র। উদার মানবতার পোষক, মানবিকতার রহস্য সন্ধানী, বিজ্ঞানপ্রিয়, সাম্য ও শ্রেয়োবাদী, ঐহিক জীবন রসিক বঙ্কিমচন্দ্র, শেষাবধি গীতাপন্থী হিন্দু হয়েই ঐহিক-পারত্রিক জীবনে ধন্য ও সার্থক হতে চাইলেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র নন, হিন্দুত্বগর্বী ধর্মবেত্তা ও ধার্মিক বঙ্কিমচন্দ্রই হিন্দুত্বগর্ব ও স্বাতন্ত্র্য চেতনা জাগিয়ে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ বিঘ্নিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে বেদ-উপনিষদ-গীতার তত্ত্বের সত্যের আধুনিক যৌক্তিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের, ধর্মের ও সভ্যতা-সংস্কৃতির তাত্ত্বিক মূল্য ও মর্যাদা স্বদেশে ও প্রতীচ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বঙ্কিম জীবনেরই প্রান্তপর্বে। স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন সদর্থেই মৌলবাদী।

AMARBOI.COM

মানববাদী বঙ্কিম

না পড়ে বা বিচ্ছিন্নভাবে সামান্যাংশ পড়ে কিংবা প্রসঙ্গচ্যুত উদ্ধৃতিমাত্র দেখে বিগত একশ চব্বিশ বছর ধরে মুসলিমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে [১৮৩৮-৯৪] মুসলিম-বিদ্বেষী বলেই জানে, এমনকি বাঙলা সাহিত্যের মুসলিম অধ্যাপকরা এবং ইদানীং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকামী কিছু হিন্দু লেখকও বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলিম-বিদ্বেষী বলে মানেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বড়জোর মুঘলশাসকগোষ্ঠী বিদ্বেষী বলা চলে, কিন্তু কদাচ মুসলিম নামের ধর্ম-বিশ্বাসীবিদ্বেষী নয়। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের কোন রচনা থেকেই এ প্রমাণ পাওয়া যাবে না। সেকালের ব্রিটিশ লেখকদের প্রভাবে বঙ্কিম 'মুঘল' অর্থে মুসলিম শব্দ তথা 'মুসলমান' শব্দ প্রয়োগে মুঘল শাসক ও সেনাবাহিনীকেই নির্দেশ করে স্বল্পবুদ্ধি লোকের ভুল বোঝার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ ঘটিয়েছেন মাত্র। তাছাড়া কাহিনীর প্রতিপাদ্যের প্রয়োজনে পাত্র-পাত্রীর মুখে যা' বসানো হয়, তা লেখকের মত বলে মনে করা অনুচিত! মার্চেন্ট অব ভেনিসে পরিব্যক্ত ইহুদীবিদ্বেষ কি শেক্সপীয়ারের?

ইদানীং কিছু ধীমান মুসলিম গবেষক ও অধ্যাপক বঙ্কিম-মানসের ও সাহিত্যের সুষ্ঠু মূল্যায়নে মুসলিম সমাজের পূর্বলব্ধ ভিত্তিহীন ধারণার ও ক্ষোভের এবং বঙ্কিম-বিদ্বেষের বিলোপ সাধনে এগিয়ে এসেছেন এবং শিক্ষার্থীদের মনে বঙ্কিম-অনুরাগ সৃষ্টিতে সফল হচ্ছেন। এবার তাই ঢাকায় উপন্যাস পরিষদের আয়োজনে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের উদ্যোগে বঙ্কিমের সার্ধশততমজন্ম উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। বঙ্কিম-বিদ্বেষীরাও হয়েছে উত্তেজিত।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র যে মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন না, তা তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যের বহির্ভূত অন্যান্য রচনা দিয়েও প্রমাণ করা সহজ। যেমন বন্দেমাতরম সঙ্গীতে তিনি সুবে বাঙলার [বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার] হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টান-উপজাতি নির্বিশেষে সাত কোটি অধিবাসীকেই স্বজাতি বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি জানতেন 'রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।'.... 'মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠানই আমাদের মিত্র' [বাঙ্গালার ইতিহাস]। অতএব তাঁর মতে বিদেশাগত স্বাধীন পাঠান শাসনেও বাঙালী স্বাধীন ছিল। তাছাড়া 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধেও তিনি স্বাধীন সুলতানী আমলকে বাঙ্গালার স্বাধীনতার যুগ বলে জেনেছিলেন, 'মোগল জয়ের পরে বাঙলার অধঃপাতন হইয়াছিল। বাঙ্গালীর অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগ মাত্র হইয়াছিল।' বঙ্কিমচন্দ্র 'স্বাধীনতার' সংজ্ঞায় বিদেশীর বিধর্মীর শাসনকে গুরুত্ব দেননি, দিয়েছেন সুশাসন কুশাসনকে, গুরুত্ব দিয়েছেন শোষণ ও হিতসাধনকে, অর্থ-সম্পদের দেশগত উপভোগে ও বিদেশে পাচারকে। তাঁর মতে প্রজাহিতৈষী সুশাসকের শোষণ-পীড়নমুক্ত রাজ্যই স্বাধীন। তাই তিনি বলেছেন "যে জাতি পর জাতি পীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন। অতএব, পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে।..... পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে। যথা- নর্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। ... [প্রজাহিতৈষী সুশাসক বলে] আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।" [ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা] সর্বব্যাপিনী প্রীতিকেই ডিনি মনুষ্যত্ব বলে জানেন, ফুলের মতোই জীবনে পরার্থে হৃদয়-কুসুমের গন্ধ বিলানোর গুরুত্ব যিনি বোঝেন, উনিশ শতকেই যিনি 'সাম্য'-মহিমা প্রচার করেন, তিনি কি সাম্প্রদায়িক চেতনাদুষ্ট বা বিধর্মী বিদ্বেষী হতে পারেন? সাহিত্য-শিল্পী প্রতিপাদ্য লক্ষ্যে কাহিনীতে বা নাটকে চরিত্রের স্বরূপ চিত্রণে কথায় ও আচরণে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। তার জন্যে শিল্পীর মনন ও নৈপুণ্যই বিবেচ্য, লেখকচরিত্র নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল বর্ণনা করেও চাকরি নিরাপদ রাখার দায়ে—'আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ চাইনে, কেননা আমরা সামাজিক বিপ্লবের পক্ষপাতী নই' বলে যে পারম্পর্যহীন অসমঞ্জস, অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক কৃত্রিম মত প্রবন্ধে যুক্ত করেছিলেন লেখক, তাকেই গুরুত্ব দেব, না তাঁর মনের কথার চাষী-প্রজার মুক্তিবাঞ্ছার মূল্য দেব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীর মশাররফ হোসেন 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরীসেতু' গ্রন্থের পরিচিতি প্রসঙ্গে ১২৮০ সনের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে বঙ্গিমচন্দ্র বলেন, "বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত-প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর [মুঘল শাসকগোষ্ঠী ভুক্ত উর্দুভাষীর বংশধররা] মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে...ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষায় একতা।" এ সূত্রে 'বন্দেমাতরম'-এর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীবাসী সাত কোটি স্মর্তব্য। এমন উদার স্বচ্ছ অসাম্প্রদায়িক ও যৌক্তিক চেতনা আঠারো-উনিশ শতকেও বিশ শতকের প্রথমার্ধে আর্যদর্শন সম্পাদক যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণের [১৮৪৫-১৯০৪] মতো বাঙলার কৃচিৎ কোন মনীষী চিত্তে ক্ষণপ্রভার মতো উদ্ভূত হলেও স্থায়ী হয়নি, এ ক্ষেত্রে ধীরবুদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় অনন্য।

বঙ্কিম যে শুধু মানবসাম্যের কিংবা ধন ও বর্ণসাম্যের সমর্থক বা প্রবক্তা ছিলেন তা নয়, নারী-পুরুষেও তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির, শক্তি-সাহসের, অঙ্গীকার-উদ্যমের এবং স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পার্থক্য স্বীকার করতেন না। সাম্যগ্রন্থে বঙ্কিম বলেন, "মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি। অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? ... প্রথমত স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে স্বাধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত ইহা আমরা স্বীকার করি না।.....[দ্বিতীয়ত] যে সকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে অধিকার বৈষম্য দেখা যায় সে সকল বিষয়ে স্ত্রী পুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে।"

এ কেবল তাঁর সাম্যগ্রন্থে নয়, উপন্যাসেও বিমলা, হীরা, দলনী, শৈবালিনী, দরিয়া, নির্মলা, শান্তি, মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি প্রায় সব নারী চরিত্রেই মেলে অল্প-বিস্তর। যেমন ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে রাত্রে সাক্ষাৎ বিষয়ে কপালকুণ্ডলার "সিদ্ধান্তই ছিল যে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই। পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রীপুরুষের সাক্ষাতের উভয়ের সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাহার বোধ হইল।" —এ হচ্ছে দেড়শ বছর পূর্বের মানববাদী, সাম্যবাদী বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, আজ এ মুহূর্তেও কি এমন উদার মানববাদী, সাম্যবাদী নারীমুক্তিবাদী বাঙালীসুলভ?

নাস্তিক হলেও হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র হেস্টির হিন্দুশাস্ত্র নিন্দায় স্বাজাত্যবোধে অপমানিত, ক্ষুব্ধ, প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে শাস্ত্রানুশীলনে নিরত হলেন। দার্শনিক যুক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণকে দাঁড় করাতে চাইলেন আধুনিক Nationbuilder ও Statesman রূপে। প্রচলিত শাস্ত্রিক ধারণায় ও আচারে-আচরণে আস্থাহীন বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক প্রতীচ্য নীতিশাস্ত্রিক-দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগে অনুশীলনের গুরুত্ব প্রতিপাদনে এবং ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় হলেন প্রয়াসী। এ কাজে তিনি মুখ্যত যুক্তিচালিত হলেও তাঁর অজান্তেই ছিলেন আবেগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়িতও। ওই আবেগ বশেই অচেতনভাবেই তিনি হলেন হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী। নানা রোগে জীর্ণ, পারিবারিক বিরোধে ক্লান্ত, অপুত্রক বঙ্কিম শেষজীবনে আবেগ তাড়িত গেরুয়াপরা নিরামিষ ভোজী মুমুক্ষু ভক্তিবাদী— তখন যুক্তির অঙ্গীকারমুক্ত বঙ্কিম ভক্তি আশ্রিত মুমুক্ষু। এ অনিচ্ছাপ্রসূত মানসিক ও আচারিক অসঙ্গতির মধ্যেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। কাজেই তাঁর অঙ্গীকৃত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ ও অবলম্বিত ভক্তিবাদ–দুটোরই উদ্ভব আকস্মিক–সুপরিকল্পিত নয়, আবেগ প্রসূত–যুক্তিজাত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একালে নজরুল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য
অধ্যাপক আব্দুল আজিজ খান প্রীতিনিলয়েসু
এবং
অধ্যাপক এ.টি.এম. আনিসুজ্জামান প্রিয়বরেসু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম ঃ কবির মনোজগৎ

কবি কাজী নজরুল ইসলামের গদ্য-পদ্য রচনায় যা' সাধারণভাবে মুখ্য হয়ে উঠেছে, এমনকি তাঁর জীবনযাত্রায়ও যা প্রাধান্য পেয়েছিল তা হল 'অতৃপ্তি'। তৃপ্তি নেই কিছুতেই, স্বস্তি নেই কোথাও। না-পাওয়ার ক্ষোভ, পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা, প্রাপ্তির পরও স্বরূপে তাকে উপলব্ধির অসামর্থ্যজাত অস্বস্তি যেন কবি ও ব্যক্তি নজরুল ইসলামের গোটা জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এ অতৃপ্তির উৎস কি তা না জানলে, এর মূলীভূত কারণ আবিষ্কৃত না হলে কেবল কাব্যের আক্ষরিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এর কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না।

আমরা জানি, কোন ঋজু একক কারণে প্রায় কিছুই ঘটে না। তাই কারণ বলতে কারণ-পরম্পরা বুঝতে হবে। এবং সে কারণ সন্ধান কিংবা আবিষ্কারও কোন একহারা বিদ্যার কাজ নয়। দেশকালের পরিমণ্ডলে থাকে নানা জটিল কারণ-ক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত। সেজন্যে আজকাল যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উদঘাটন লক্ষ্যে বিচার-বিবেচনায় শারীরবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান প্রয়োগে আর্থিক নৈতিক-শাস্ত্রিক-সামাজিক-শৈল্পিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করতে হয়। পদ্ধতিটার নাম অবশ্য বৈজ্ঞানিক হলেও উদঘাটিত তথ্য ষোলআনা সত্য হবে না–কারণ মানুষ যন্ত্রও নয়, জড় পদার্থও নয়। বর্ণিত পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগের সাধ্যও আমাদের নেই। তবু রেওয়াজের অনুসরণে জন্ম ও জীবনকালের, বিশেষ করে তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবনের বাঙলার একটি স্থূল প্রতিবেশ আভাসিত করার জন্যে ইতিহাসাশ্রিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর উল্লেখ করছি।

১৮৫০ সনের পরে বিশেষ করে ১৮৭০ সনের পরে য়ুরোপে বিভিন্ন যন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কারের ফলে কৃৎকৌশলের অভাবিত উন্নতি ও উৎকর্ষ শ্রমের ও সমাজক্ষেত্রে তথা জীবনে ও সামাজিক নিয়ম-নীতিতে পরিবর্তন জরুরী ও অনিবার্য করে তোলে। জীবনাচারের এ পরিবর্তন জীবন-ভাবনায় এবং জগৎ চেতনায়ও সৃষ্টি করেছিল অভিঘাত, য়ুরোপীয় শাসিত সাম্রাজ্য আর উপনিবেশেও জেগেছিল লঘু-গুরুভারে এ তরঙ্গ। সিপাহী বিপ্লবের পরে রানীর প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ওই নতুন চেতনার দূরাগত ধ্বনির সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতিও সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলায় সুদৃঢ় হচ্ছিল। ফলে হিন্দুমেলায় হিন্দুর যে আত্মসত্তার ও আত্মস্বার্থের স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত আত্মসম্মানবোধ অভিব্যক্তি পেল, তার আদলে দোষে-গুণে ভারতীয় মুসলিম সমাজের রামমোহন, স্যার সৈয়দ আহমদ খানও (১৮১৭–৯৮) মুসলিমদের সত্তার ও স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় হয়ে ওঠেন সচেষ্ট। তুর্কী-মুঘল আমলের পরাধীনতার স্মৃতিজাত ক্ষোভ ছিল হিন্দু মনে। সংখ্যাগুরু হিন্দুর বর্ধিষ্ণু বিত্তে-বিদ্যায় আর প্রতাপে-প্রভাবে শঙ্কিত হচ্ছিল মুসলিম। পরিণামে উনিশ শতকের শেষ দশকে মুসলিমদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাবিও উচ্চারিত হয়। তাছাড়া বাঙলায় শিক্ষিত মুসলিমরা চোখ মেলে দেখছিল–জমিদার, মহাজন, চাকুরে সব হিন্দু, ধনী মানী শিক্ষিতরাও হিন্দু, শাসক-শোষক সবাই হিন্দু, কাজেই তাদের মনে সহজেই জেগেছিল হিন্দুভীতি ও হিন্দু বিদ্বেষজাত স্বাতন্ত্র্য চেতনা। ব্রিটিশের পরোক্ষ প্ররোচনায় হিন্দু ও মুসলিমের সত্তার ও স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত দ্বন্দ্ব কেবলই নামসূত্রে বাড়তে থাকে। প্রাগ্রসর বাঙালী হিন্দুর সংহত শক্তি নষ্ট করার লক্ষ্যে তাদেরকে তিন প্রদেশে সংখ্যালঘু করে রাখার মতলব প্রসূত ১৯০৫ সনের বঙ্গব্যবচ্ছেদ সূত্রে ব্রিটিশের ভেদনীতি দৃঢ়ভিত্তিক ও ফলপ্রসূ হয়। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিক প্রয়াসও প্রবল হয় এ সময় থেকেই। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলিমরা স্বতন্ত্র জাত বা সম্প্রদায় হিসেবে নতুন মুসলিম লীগকেই তাদের জাতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯১৩ সনে মুসলিম লীগ ভারতে স্বায়ত্তশাসনও দাবি করে। ১৯১৫ সন থেকে জাতীয় কংগ্রেস হল মুসলিমের চোখে কার্যত হিন্দুর রাজনীতিক দল। এর পরে রাজনীতি ক্ষেত্রে বা রাজনীতিগন্ধী যে কোন ঘটনার ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দুর, মুসলিমের ও ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা ১৯৪৭ সন অবধি দেখা যায়নি, যদিও মিলনের, সমঝোতার, সহিষ্ণুতার ও প্রীতির কৃত্রিম প্রয়াস ছিল অব্যাহত। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনকালে (১৯২০–২১ সনে) হিন্দু মুসলিমের স্বল্পকাল স্থায়ী মিলনও হয়েছিল। আবার বিচ্ছেদও ঘটল 'দাঙ্গা' নামের হনন উৎসবের (১৯২৬ সনে) মাধ্যমেই।

১৮২০–২২ সন থেকে জাতীয় উন্নতি লক্ষ্যে বাঙলার নির্জিত মুসলমানরাও 'ওয়াহাবী' এবং কিছু পরে 'ফরায়েজী' নামের ধর্মসংস্কার শুরু করে। এর প্রসারকালে জমিদারদের ও সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে তারা যুগপৎ ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিক আন্দোলনও আরম্ভ করে। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে উক্ত দুটো সংস্কার আন্দোলনও ক্ষয়ক্ষতি-পীড়নে ও ব্যর্থতার গ্লানিবশে ব্রিটিশ-বিরোধ নীতি পরিহার করে। যদিও ব্রিটিশের কৃপার প্রত্যাশা ছিল না বলেই আরবী ফারসী শিক্ষিতদের ও নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনে নাসারা-বিদ্বেষ সুপ্তভাবে থেকেই গিয়েছিল। সেকারণেই মৌলানারা ছিলেন স্বাধীনতাকামী ও কংগ্রেস সমর্থক।

এদিকে ক্রমে ক্রমে আবেদন মাধ্যমে প্রজাদের–শাসিত জনদের কিছু কিছু চাহিদা পূরণের দাবিও রাজসরকারে পেশ করা হচ্ছিল। ফলে ১৮৮৫ সনেই বাঙলার প্রজাস্বত্ব আইন ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন পাশ হয়।

অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষিত সচেতন উঠতি মধ্যবিত্ত হিন্দুর মনে জাগছিল নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা–আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রসারের আকুতি। কিন্তু তখন ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থক যোগাড়ের প্রাথমিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সাম্রাজ্য হয়েছে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ। কাজেই হিন্দু মধ্যশ্রেণীর দাবিতে সহজে সাড়া দেয় না সরকার, এগোয় না দাবি পূরণে।

ফলে আই. সি. এস. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পদচ্যুতি, আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীর বয়োসীমা উনিশে বেঁধে দেয়া, ইলবার্ট বিল প্রভৃতিই ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে হিন্দু-মনে ব্রিটিশবিদ্বেষ জাগিয়ে দেয়। সে বিদ্বেষ ক্রমে বাড়তে থাকে, কেননা আঠারো শতকের বা উনিশ শতকের গোড়ার দিককার মতো হিন্দুর প্রতি নানাভাবে কৃপাবিলানোর সাধ্য ছিল না ব্রিটিশ সরকারের। ফলে হিন্দুদের মধ্যে এবং স্বাজাত্যচেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী শিক্ষিতদের মধ্যে বেড়ে চলছিল মন্থরভাবে জাতীয় আন্দোলনের আকারে। অন্যদিকে হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী ও দুর্বল প্রতিযোগীরূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিকটোরিয়ার আমলে ব্রিটিশ কৃপা ও মদদ লোভী ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিমদের নীতি হল ব্রিটিশতোষণ। এ সময়ে হিন্দু-তোষণ নীতিরূপে অকটেভিয়ান হিউমের মধ্যস্থতায় শাসক-শাসিতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ সনে) প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯০৯ সনে মর্লি-মিন্টো কমিশনের শাসন-সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ গৃহীত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধকালে ১৯১৫ সন থেকে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভূমিকা পালন দাবি আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে সংগ্রামী রূপ পায়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধে জান-মালের ক্ষতিই হয় মুখ্য। ব্রিটিশও হচ্ছিল ধনেজনে দুর্বল। পরাধীনতায় ক্ষুব্ধ ভারতবাসীরা মনে মনে কামনা করছিল জার্মানীর জয়। তা হল না বটে, কিন্তু কংগ্রেসের দাবি পূরণ লক্ষ্যে আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠছিল। ১৯১৬ সনে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের চুক্তি সম্পাদিত হয়, ১৯১৯ সনে প্রচারিত হয় মন্টেগু-চেমসফোর্ড সুপারিশে শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘোষণা। এ শাসন-সংস্কার ছিল যুদ্ধকালে ভারতীয়দের আনুগত্যের প্রতিদান স্বরূপ। যুদ্ধ শেষ। ১৯১৯ সনের সুপারিশে অসন্তুষ্ট কংগ্রেস দাবি আদায়ের জন্যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এ সময়ে ভারতীয় মুসলিমরা তুরস্কে খিলাফত-এর বিলুপ্তিতে বিক্ষুব্ধ। হিন্দুরা স্বদেশের কল্যাণে আর মুসলিমরা স্বধর্মীর সংহতিপ্রতীক 'খিলাফত' বজায় রাখার জন্য আন্দোলনে উদ্যোগী। আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীর আহ্বানে 'কংগ্রেস খিলাফত' গোষ্ঠীর যৌথ আন্দোলন 'অসহযোগ খিলাফত' সংগ্রাম জোরালো হল। যেহেতু এ মিলনে কোন সুষ্ঠু ও অভিন্ন বন্ধনসূত্র ছিল না, সাময়িক রাজনীতিক চাল হিসাবে পরিচালিত এ মিলিত সংগ্রাম ফলপ্রসূও হয়নি, সংহতিও হয়নি স্থায়ী। বরং এ মিলন আংশিকভাবে দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে ১৯২৬ সনে কোলকাতায় হিন্দুদের রাজ-রাজেশ্বরী দেবীর মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধায়। উল্লেখ্য যে ১৯২১ সনে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নও প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পরে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে ১৯৩০ সনের আইন অমান্য আন্দোলন, প্রথম গোল টেবিল বৈঠক, জিন্নাহর চৌদ্দ দফা, ১৯৩১ সনের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক, শ্রম-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ, ১৯৩২ সনের তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক, সাম্প্রদায়িক রোঁয়েদাদ, ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন, ১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু, ১৯৪০ সনে গৃহীত লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব এবং ১৯৪৩ সনের মন্বন্তর অবধি সবকিছু কাজী নজরুল ইসলামের জানা ছিল। আর বিদেশে ১৯১৭ সনের বিপ্লবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা। তারপরে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালীর ও জার্মানীর হৃত ধন-মান-ক্ষমতা উদ্ধারের প্রয়াস প্রভৃতিও তাঁর অজানা ছিল না।

আমি ঘটনাগুলো তালিকাভুক্ত করলাম বটে, তবে এগুলোর কোন কোনটির তাৎপর্য, প্রভাব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল গভীর, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, পরিণামও হয়েছিল ক্ষেত্রবিশেষে বৈনাশিক।

বলেছি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই শিক্ষিতদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম যথার্থ জাগ্রত ও গভীর করে, গাঁ-গঞ্জের অশিক্ষিতদের মধ্যেও তা এ সময় থেকেই উপ্ত হতে থাকে। গণআন্দোলন বলতে যা বোঝায়, তা এ সময়েই প্রথম শুরু হয়, হিন্দু-মুসলিমের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিও এ সময় প্রবল ও সুস্পষ্ট হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধসম্পৃক্ত সংবাদের পাঠক-শ্রোতা মনে রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা বিনা অনুশীলনেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকাশ পেতে থাকে, তা' এদেশে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে পেতে থাকে বিকৃতিও। শ্রেণী স্বার্থের ও শ্রেণীবিদ্বেষের বীজও লঘু এবং অস্পষ্টরূপে উপ্ত হচ্ছিল।

রাজনীতি কখনো আর্থিক জীবন নিরপেক্ষ হতে পারে না। কাজেই সব আধিকারবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে অর্থ-বিত্ত তথা অন্নে-বস্ত্রে সত্তার স্বাধীন সচ্ছল স্থিতি ও বিকাশ। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপে তথা তাদের সাম্রাজ্য উপনিবেশে দেখা দিল আর্থিক বিপর্যয়। এ আর্থিক মন্দার উপজাত হিসেবে বেকারত্ব, দুর্নীতি, অস্থিরতা, নৈতিক জীবন অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক জীবনে বিকৃতি, মনো-জীবনে অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খল বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের উপায়চিন্তা প্রকট হয়ে ওঠে। উদ্ভুত বিচিত্র সমস্যার সমাধানপন্থা হিসেবেই রাজনীতিক্ষেত্রে চাহিদা পূরণের অধিকার, প্রাপ্তির, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ও আন্দোলন প্রবল হতে থাকে, এবং উপর্যুক্ত তালিকারূপে ঘটনা ও ব্যবস্থা রূপ পেতে থাকে। রুশবিপ্লবের সাফল্যে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, এদেশেও সে শক্তি অনুভূত হতে থাকে। ব্রিটিশকে এদেশে শ্রমনীতি গ্রহণ ও ঘোষণা করতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ীপক্ষেরও আর্থিক মানসিক বিপর্যয় আফ্রো-এশিয়া লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলোতেও লোকমনে আর্থিক মুক্তির ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগায়। ভারতে তথা বাঙলায় নজরুল গণমনের এ চাহিদা পূরণ করলেন। বিদ্রোহের, সংগ্রামের, সাম্যের ও স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করে। এ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং যন্ত্রের ও কৃৎকৌশল প্রভৃতি য়ুরোপীয় বিকাশের প্রসাদপুষ্ট গোটা পৃথিবীর মানুষ য়ুরোপীয় মন-মননের, জীবন-জীবিকার ও সমাজ-সংস্কৃতির আদলে জীবনাচার নিরূপণে নিষ্ঠ। কাজেই য়ুরোপীয় সমাজের, সংস্কৃতির, মন-মননের আচার-আচরণের অনুকরণে তৈরি হয় আজকের বিশ্বের শহুরে শিক্ষিত মানুষের জীবন-প্রতিবেশ।

গত দু'শ বছরের য়ুরোপের বিবর্তনধারা এরূপ ঃ যেখানে সামন্ত ছিল এক, শিল্পবিপ্লব ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের ফলে সেখানে বুর্জোয়া পুঁজিপতি হল লক্ষ লক্ষ, কৃৎকৌশলের ও যন্ত্রের উদ্ভাবনে, প্রসারে ও সর্বাত্মক প্রয়োগের ফলে স্বাধিকার সচেতন মধ্যশ্রেণী ও শ্রমিকগোষ্ঠী হল কোটি কোটি। শাহ-সামন্তের কবজাগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হয়ে গেল খণ্ড খণ্ড, শক্তি হল বিকেন্দ্রী, বহু বিবিধ ও বিচিত্র। আবার এরাই হল ধন-মান যশের এবং বিত্ত-বৃত্তি বেসাতের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিদ্যা-বুদ্ধি আবিষ্কার উদ্ভাবনও তাই এ প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবহৃত হচ্ছিল পুঁজিরূপে। আগে যা কিছু হত শাহ-সামন্তের স্বার্থে ও অভিপ্রায়ে, একালে তা ঘটে বুর্জোয়াদের প্রয়োজন ও অভিলাষে এবং গণমানবে বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে। মোটামুটিভাবে ১৮৭০ সনের পর থেকে আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মাত্রা, সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেড়ে যায়, এবং সে হারে মানুষের মানসিক আর্থিক নৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা পদ্ধতিও পেতে থাকে রূপান্তর, হতে থাকে জটিল ও বিচিত্র।

রোগ-বন্যা-খরা-ঝঞ্ঝা-দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধশক্তির বৃদ্ধি, কৃৎকৌশলের উৎকর্ষ, যন্ত্রের সৌকর্য প্রভৃতিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির, মৃত্যুহার হ্রাসের, বাণিজ্য প্রসারের দূরত্ব ও অগম্যতা কমানোর, অপরিচয়ের ব্যবধান হ্রাসের কারণ হওয়ায় পৃথিবীও ক্ষুদ্র ও সংহত হয়ে উঠছিল।

মনীষা সম্পন্ন মানুষের মনোলোকেও ঘটে গেল বিপ্লব, ডারউইন, মার্কস ও ফ্রয়েড বদলে দিলেন মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, খুলে গেল চিন্তা-চেতনার নবদিগন্ত। আগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্র-সমাজের ও নীতির নিগড় পড়ল খুলে, কিন্তু তার জায়গায় গড়ে উঠল না নতুন নিয়মনীতি। তাই নীটশেকে নবমূল্যবোধের প্রয়োজনতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে হল। চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ, হিতবাদ, আবিষ্কার উদ্ভাবনের, যন্ত্রের, কৃৎকৌশলের, বাণিজ্যনীতির, চিন্তা-চেতনার, জীবনাচারের সর্বপ্রকার প্রভাব আমাদের নগরে-বন্দরেও অবিলম্বে পড়তে থাকে।

নজরুল এমনি সময়ে সামাজিক পীড়ন-দুর্নীতি, আর্থিক সঙ্কট এবং রাজনীতিক সমস্যা সচেতন তরুণ কবিরূপেই লেখনী ধারণ করেন। বলতে গেলে বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে তিনিই প্রথম পুরোপুরি কবি, রাজনীতিক, সংগ্রামী, গণবাদী ও সাম্যবাদী। সাহিত্য, শাস্ত্র ও সমাজ-সংস্কারমূলক রচনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য বা ব্রত। গোড়া থেকেই গানে কবিতায় নাটকে উপন্যাসে প্রবন্ধে সাংবাদিকতায় রাজনীতিক, আর্থ সামাজিক আর শাস্ত্রিক মতাদর্শ প্রচারব্রতী কোন লিখিয়ে পূর্বে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে সক্রিয় রাজনীতিকরূপে আবির্ভূত হননি। নজরুলের পূর্বে কোন লেখক রাজদ্রোহের জন্যে নাকি কারাবাসও করেননি। যদিও লেখা বাজেয়াপ্ত করা শুরু হয় উনিশ শতক থেকেই। এজন্যেই নজরুলের রচনার বিষয় হয়েছে জাত, ধর্ম, বর্ণ, জীবন, শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, শাসন, শোষণ, পীড়ন, সংগ্রাম, বিপ্লব, বিদ্রোহ, স্বাধিকার, স্বাধীনতা প্রভৃতি। অতএব কবিতাকে ও গানকে সংগ্রামের হাতিয়াররূপে ঐকান্তিক প্রয়োগের গৌরব নজরুল ইসলামের প্রাপ্য। এ সঙ্গে সমকালীন জনসমাজ-মানসের অস্থিরতা, উম্মাদনা, স্ববিরোধ আর অতৃপ্তিও নজরুল সাহিত্যে সুপ্রকট।

আবার এ-ও সত্য যে নজরুল যতই বিপ্লবের, সংগ্রামের, দ্রোহের সংস্কারের, শোধনের কথা বলুন, 'ধূমকেতু' ও 'লাঙল' প্রকাশিত করেন, তার সবটাই ছিল উচ্চারিত বাণীর সীমায় নিবদ্ধ। সংগঠনের মাধ্যমে প্রথাসিদ্ধ নিয়মে সিদ্ধিলক্ষ্যে আন্দোলনের মন, মেজাজ কিংবা যোগ্যতা তাঁর ছিল না। এ অর্থে তিনি কখনো রাজনীতিক কিংবা সমাজকর্মী ছিলেন না। তাঁর সবটাই ছিল ন্যায়নিষ্ঠ হিতকামী তাত্ত্বিকের ভূমিকা। তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' হচ্ছে এক আবেগপ্রবণ ভাববাদী কবির উচ্ছ্বাসমাত্র। কোন রাজনীতিক এ ক্ষেত্রে ন্যায়ের সত্যের ও ভগবানের দোহাই উচ্চারণ করতেন না।

১৮৯৯ সনে মে মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুলের জন্ম বলে সবাই কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন, যদিও এটি বিদ্যালয়ে ভর্তির খাতায় প্রাপ্ত– পারিবারিক প্রমাণসূত্রে নয়। বাঙলা ১১ই জ্যৈষ্ঠ হলে ১৩০৬ বাঙলা সনের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁর জন্ম। কাজেই নজরুল ইসলামের জন্ম ও জীবন প্রতিবেশ বিশ শতকের প্রথম চুয়াল্লিশ বছর। সুফী জুলফিকার হায়দারের সাক্ষ্যে মনে হয় ১১ই বৈশাখ কবির জন্ম। হায়দার নাকি পারিবারিক মজলিসে কবিকে বলতে শুনেছেন, 'বিশ্বকবির জন্ম ২৫শে বৈশাখ আর আমার জন্ম তারও ১৪ দিন পূর্বে অর্থাৎ ১১ই বৈশাখ।'[১] মাজারকেন্দ্রী দরিদ্র মোল্লা ঘরে তাঁর জন্ম। পিতৃবিয়োগের ফলে জীবনই ছিল বিপর্যস্ত। কারো উপর নির্ভর বা ভরসা করবার না থাকলে শৈশবে বাল্যেই কেউ কেউ বাঁচার অবচেতন প্রেরণায় স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনীকারদের বর্ণনা তথ্যভিত্তিক হলে নজরুলেও তা কতকটা ছিল বলে মানতেই হবে। দরিদ্র-সুলভ প্রয়োজন-বুদ্ধিই নজরুলকে বাল্যেই কিছুটা বেপরওয়া

১ নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, পৃ ঃ ১২১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউণ্ডেলে করে তোলে। এমন মানুষ সহজেই অপরিচিতকে পরিচিত, অনাত্মীয়কে আত্মীয়, পরকে আপন করে, প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করে তুলতে পারে। অবশ্য এ-ও সত্য যে মানুষ কখনো স্থায়ী সম্পর্কে গুরুত্ব দেয় না, যাযাবার-বৃত্তিই মুখ্য বলে চলমানতার সঙ্গে মানস চাঞ্চল্য হয় তাদের সম্বল। তাই অন্য হৃদয়ে স্মৃতির দাগ কেটে এবং দাগা দিয়ে নিত্য নতুন স্বজন সৃষ্টি করে চলে এরা। নজরুলও নাকি সহজে অপরিচয়ের দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে যে কোন পরিবারের পরিজন হয়ে উঠতেন অল্পক্ষণের মধ্যে। আবার যেহেতু ছিলেন নিঃসঙ্কোচে চাওয়ার, আবদারের মানুষ, সেহেতু তাঁর অভিমানও ছিল গভীর, ক্ষোভ হত তীব্র। বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়ায় সৈনিক জীবনের অবসানে করাচি থেকে এসে বাড়ি গিয়ে যখন তিনি জানলেন যে তাঁর মৃত পিতার প্রতি স্মৃতির আনুগত্যে তাঁর মায়ের বিচলন ঘটেছে, তখনই তিনি বাড়ি ছাড়লেন, ক্ষোভে অভিমানে চিরকালের মতো ছাড়লেন মাকেও। প্রেম করে প্রমীলাকে বিয়ে করেও ১৯২৮ সনে ঢাকায় ফজিলতুন্নেসাকে দেখেই প্রেমে পড়লেন। সে মোহ যে কি তীব্র ছিল, তা' প্রতিদিন লেখা চিঠি থেকেই বোঝা যায়। 'আমার কোন কিছু ভাল লাগে না। এত আড্ডা গান কিছুতেই মনকে ডুবাতে পারছিনে, এর কোথায় শেষ কে জানে।'[১] লেখা-পড়ায় আগ্রহ ছিল, একটানা স্কুলে পড়া বা এক জায়গায় থাকা দারিদ্র্যের দরুনই সম্ভব হয়নি। ফলে কৈশোরেই ছুটতে হয়েছিল লেটোর ও যাত্রার দলে কবিয়াল হিসেবে, তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ-বিকাশ ঘটে ওই লেটো গান ও সংলাপ রচনার মাধ্যমেই এবং বলাবাহুল্য হিন্দু পুরাণের বিচিত্র বৃত্তান্তও আয়ত্তে আসে ওই সময়েই শ্রুতি-স্মৃতির বদৌলতে।

যা সহজে গড়ে ওঠে, তা ভেঙে পড়ে হয়তো সহজেই। তাই নজরুলের কোন বৃত্তির কিংবা বন্ধুত্বের বা প্রেমের কালিক পরিসর সামান্য ও সংকীর্ণ। তাছাড়া প্রাণধর্মের তাগিদে চলা আবেগতাড়িত মানুষের ধৈর্য-সংযম কোনটাই থাকে না, থাকে না মোহমুক্ত বিবেচনার শক্তি। তাই রেলগার্ডের বাসায় বাবুর্চির কাজে নিযুক্ত হয়ে লঙ্ঘন করলেন আচরণের ও অধিকারের সীমা, ফলে পালাতে হল তাঁকে। চায়ের ও রুটির দোকানেও টেকেননি বেশি দিন। কেননা, এমন প্রাণবান মানুষ নিজেকে নিঃস্ব জেনেও বেশিদিন কারো হুকুম-হমকি-হামলা সহ্য করতে পারে না। এমনকি ময়মনসিংহের 'কাজী সিমলা' গাঁয়ে থাকা এবং দরিরামপুর স্কুলে পড়াও সম্ভব হল না—স্বভাবগত চঞ্চল প্রকৃতির ও বাউণ্ডেলে প্রবৃত্তির কারণেই। তিনি নিজেই উনত্রিশ বছর বয়সেই বলেছেন, 'সমাজ-রাষ্ট্র-মানুষ-সকলের ওপর বিদ্রোহ করেই তো জীবন কাটল।'[২]

দারিদ্র্যের দরুন আবাল্য ঘরছাড়া ভাগ্যান্বেষী অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ইতোমধ্যেই অভ্যস্ত, পরকে আপন করে দূরকে নিকট করে দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ অতিক্রান্ত কৈশোরে উদ্ভিন্ন যৌবনে—যাঁর হারাবার কিছুই ছিল না, ছিল না পিছুটান—১৯১৭ সনে নির্ভীকচিত্তে অভিযাত্রীর মতো যুদ্ধের সৈনিক হওয়ার জন্যে ছুটে যাওয়া তাঁর পক্ষেই ছিল

১ ৮ম পত্র : নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়, প্রঃ সঃ আগষ্ট ১৯৬৭, করাচি বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বিভাগ।

২ নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, পৃ ১২১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ। তাঁর নিজের ভাষায় 'ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি। যে স্নেহে যে-প্রেমে বুক ভরে ওঠে কানায় কানায়–তা কখনো কোথাও পাইনি।' (নজরুলের জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়, ৩ সংখ্যক চিঠি পৃ. ৪৯)

লেটোর দলের রচনা বাদ দিলে ১৯১৭ সন থেকেই তাঁর লেখার শুরু–বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী, ব্যথার দান, রিক্তের বেদন তাঁর সৈনিক জীবনে রচিত। গোড়া থেকেই তিনি রোমান্টিক, আবেগচালিত, ধীরবুদ্ধির কিংবা স্থিরচিন্তার মানুষ তিনি কখনো ছিলেন না। ফলে কবিতাক্ষেত্রে তাঁর তীব্র আবেগ ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি ফলপ্রসূ হলেও আধুনিক মননশীল কবির গৌরব তাঁর প্রাপ্য হল না। কেননা আবেগতাড়িত মানুষ মননচালিত হয় না, আবেগের প্রাবল্য মননকে রাখে দুর্বল, আবেগের তীব্রতা মননকে করে মন্দ-মন্থর, এমনকি স্তব্ধও করে দেয়। আর গদ্য রচনায়–প্রবন্ধে নাটকে গল্পে উপন্যাসে আবেগবাহুল্যই তাঁর রচনাকে করেছে ব্যর্থ, ভাষাকে করেছে প্রমূর্ত উচ্ছ্বাস। এ জন্যেই তাঁর রচনা হৃদয়ের অকৃত্রিম উৎসার হলেও মনীষার প্রসূন নয়।

১৯১৯ সন থেকেই লেখা হল তাঁর পেশা, গোড়া থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে হিন্দু-মুসলিম দুই পৃথক ধর্মসংস্কৃতির বাহক বটে, কিন্তু পরস্পর কেবল প্রতিবেশী নয়, হাটে-ঘাটে-মাঠে তারা সহযাত্রী সহকর্মীও। পরিবেষ্টনী অভিন্ন হওয়ায় জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে স্পর্শ করে আর রোগ-মহামারীর এবং রোদ্র-বৃষ্টি-ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যার তারা সমান শিকার। সাহিত্যক্ষেত্রে তাই তাঁর এ অসাম্প্রদায়িক মৈত্রীকামী চেতনা সক্রিয় ছিল গোড়া থেকেই। নজরুল ইসলাম সারা জীবন প্রায় সতর্কভাবেই চেতনায় চিন্তায় কথায় কাজে ও আচরণে এ অসাম্প্রদায়িকতা বজায় রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেও বলা যায়, এক্ষেত্রে সেদিন তিনিই ছিলেন একক ও অনন্য। তিনি বলেছেন, "বাঙলা সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দুদের দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানদের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দুদের দেবীর নাম নিই। অবশ্য এজন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই করেছি।"[১]

কাজী নজরুল ইসলাম দৈহিক রূপচর্চায় আসক্ত ছিলেন, স্নো, ক্রীম, পাউডার, সেন্ট প্রভৃতি প্রসাধনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল,[২] হয়তো রমণীবল্লভ হওয়ার বাসনাই অঙ্গসজ্জায় দিত প্রণোদনা। লম্বা ঝাঁকড়া চুল, গায়ে হলদে বা কমলা রঙের জামা ও চাদর তাঁর প্রিয় পোশাক। বুদ্ধদেব বসুর 'রঙিন জামা পরেন কেন?' প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য তিনি বলেছিলেন, 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট করে চোখে পড়ে তাই'[৩] এ হালকা উত্তরও সত্যের কাছাকাছি বলে মনে করি। ১৩৩০ সনের পৌষ সংখ্যা কল্লোলে তাঁর 'আলতা স্মৃতি'[৪] নামের কবিতা প্রকাশকালে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল এরূপ ঃ 'কবি নজরুল ইসলাম তার চিঠিপত্র, গল্প, কবিতা সব লালকালিতে লেখেন।'

---

১ সওগাত, পৌষ, ১৩৩৪, পৃঃ ৫৮০। ইব্রাহিম খানের কাছে লিখিত চিঠিতে উক্ত।

২. জুলফিকার হায়দার, 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' পৃঃ ৩০-৩১

৩. নজরুল ইসলাম, কবিতা, কার্তিক–পৌষ, ১৩৫১ সাল।

৪. জুলফিকার হায়দার, 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়,' পৃঃ ১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি ভোগবিলাসী ছিলেন, দরিদ্র-সন্তান গান বেঁধে ও গেয়ে টাকার মুখ দেখেই (১৯৩২–৪২ সন) ধনীলোকের মতো জীবন যাপনে হলেন আগ্রহী। তখন তাঁর বাড়ির গেটে নেপালী দারোয়ান, গ্যারেজে গাড়ী, বারান্দায় শোফা, ঘরে গৃহভৃত্য। স্বভাব বেপরওয়া বে-হিসেবী উদ্দামতা ছিল বলেই অর্থের অপচয়ে, ব্যয়বাহুল্যে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। পরিণাম-চেতনার অভাবে শেষে দারিদ্র্য পুনরায় তাঁর সঙ্গী হল। তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন, 'জীবনকে আমি উপভোগ করেছি পরিপূর্ণভাবে। দুঃখকে বিপদকে দেখে আমি ভয় পাইনি। আমি জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।' উদ্দামতা ছিল বলেই তিনি আড্ডাবাজ, আর আড্ডাবাজ বলেই তার বন্ধুপ্রীতি ছিল গভীর, নিঃস্বার্থ আর তাই অকৃত্রিম। 'আপনি তো জানেন তাঁহার বন্ধুপ্রীতি কত গভীর ও কত নিঃস্বার্থ। তিনি এত ভালোবাসতে পারেন, তিনি শুধু মহাপ্রেমিকই নন, তিনি মহাবীরও।'[১]

অনুকূল প্রতিবেশে বয়োধর্ম ও মনোধর্ম পার্থক্য থাকার কথা নয়, সুস্থতা ও স্বস্থতা দেহমনের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে আবশ্যিক। কিন্তু তা সবার পক্ষে সব সময় পাওয়া বা রাখা সম্ভব হয় না, তাই বয়োধর্মে যা কাম্য বাধাবিঘ্নে পর্যুদস্ত মনোধর্মের বিকৃতির জন্যে তার বিচ্যুতি ও বিপর্যয় ঘটে।

দেখা যাচ্ছে ১৯২১–২২ সনে নজরুল যে-সব কবিতা রচনা করেছেন, ধূমকেতুর জন্য যেসব সম্পাদকীয় রচনা করেছেন, সেগুলোতে প্রায় সর্বত্র রয়েছে রণহুঙ্কার। তখন তিনি গদ্যে-পদ্যে কথায় কথায় দ্রোহ, লড়াই ও বিপ্লবের কথা বলতেন। রণ দেখেননি, রণক্ষেত্রেও যেতে হয়নি, রণের দূরাগত ধ্বনিই তাঁর মনে জাগিয়েছিল রোমাঞ্চ। হয়তো সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করতে হলে কিংবা রণ-ক্ষেত্রের বীভৎসতা ও ভয়ঙ্করতা প্রত্যক্ষ করলে কথায় কথায় দ্রোহের যুদ্ধের-বিপ্লবের আগুনের ও সংগ্রামের হুঙ্কার এত সহজে ঘন ঘন হাঁকতে পারতেন না। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফেরতারা, বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরা, মানববাদীরা দুনিয়ার সর্বত্র বিশেষ করে য়ুরোপ যুদ্ধ-বিরোধী হয়ে ওঠে। আজকের দুনিয়ায় যুদ্ধকে ও যুদ্ধবাজকে ঘৃণা করার লোকই অধিক। নজরুল ইসলামের নৈতিক সাহস যে অকৃত্রিম ও অপরিমেয় ছিল তা অস্বীকার করবার কারণ নেই। কিন্তু বাস্তবে তাঁর দৈহিক সাহস ও নির্ভীকতার প্রমাণ দুর্লভ। এ মানুষ কারো সঙ্গে বনিবনা না হলেই চটাচটি করে ঘুষাঘুষি শুরু করার কথা। কিন্তু তেমন নজির পাওয়া যায় না, বরং প্রাপ্য অর্থের অনাদায়ে তেমন ক্ষেত্রে অভিমান করার, ক্ষোভ প্রকাশ করার, ক্ষমা করার এমনকি অনুনয় করার বৃত্তান্তই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সৌজন্য, বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশে নজরুল সাধারণত চাটুকারের মতো আবেগবহুল তোয়াজের, তোষামোদের ভাষাই প্রয়োগ করতেন গদ্যে-পদ্যে ও পত্রে-ভাষণে। এতে মনে হয় কৈশোরে-যৌবনে-দ্রোহে-সংগ্রামে আকর্ষণ থাকলেও তা আবেগ প্রসূত তরল উচ্ছ্বাসমাত্র–প্রত্যয়গত গভীর ও ব্যাপক চেতনার ফল নয়। তার অন্য প্রমাণ, ত্রিশোত্তর জীবনে কবির এ লড়াই প্রবণতা হ্রাস পায়–মন্দা হয়ে আসে এবং অবশেষে লোপ পায়।

যদিও রুশবিপ্লব তাঁকে অব্যাহত অনুপ্রাণিত করেছিল, তা কখনো তাঁর বিশ্বাসের অনুগত হয়ে অন্তরের সত্য হয়ে ওঠেনি। প্রমাণ 'ব্যথার দানে' মুক্তিফৌজের কথা থাকলেও প্রথম দিকে রচিত তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর ভাবসত্য অন্যরূপ। এমন বিদ্রোহী

১. শেষ অধ্যায় পৃঃ ১৮০, 'ডেটেনিউ' লেখক অমলেন্দু দাশগুপ্তের পত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতায়ও তাঁর বিদ্রোহ নিরুদ্দিষ্ট, অন্তত বহুমুখী ও বহুবিধ। কাজেই অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী বা ভাঙার গান কিংবা গদ্য রচনা যুগবাণীতে নির্জিত জাতিকে জাগানোর, জাতির আর্থিক নৈতিক মুক্তির, সংগ্রামের ও হিন্দু-মুসলিম মিলনের বাণী বার বার উচ্চারিত হলেও তাতে সুনির্দিষ্টভাবে সশস্ত্র-বিপ্লবের, কংগ্রেসী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কিংবা বোলশেভিক পন্থা অবলম্বনের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। এ সময়ে তাঁর মনোজগতেও তিনি কোন সুনির্দিষ্ট মত-পথের অনুসারী নন। তখনো তিনি যে কোন সাময়িক আবেগে ও আহ্বানে, ঘটনায় ও অনুভবে তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে চলেছেন। তখন তিনি দেহে মনে বয়সে চল-চঞ্চল তরল-তরুণ মুখর ভাবক।

তাই তিনি যুগপৎ স্বদেশের, স্বজাতির, স্বধর্মীর ও শোষিত-নির্যাতিত বিশ্বমানবের সর্বপ্রকার মুক্তিকামী এবং সংগ্রামকেই মুক্তিপন্থা বলে মানেন বটে, তবে সংগ্রামের রীতি-নীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে তখনো তাঁর ধারণা স্পষ্ট নয়, অবশ্য তিনি জানেন পুরোনোকে ভাঙতে হবে, গড়তে হবে নতুন করে এবং বাঁচতে হবে লড়াই করে।

নজরুল ইসলাম যখন 'লাঙল' পত্রিকা বের করেন (১লা পৌষ, ১৩৩২ সাল ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫ সন) তখন তাতে নিজে কিংবা অন্য কারো প্রবর্তনায় তিনি সুস্পষ্টভাবে একটা রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য ঘোষণা করেন। 'লাঙল' ছিল–শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ' সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপাত্র। ঘোষিত বিষয়গুলো এই :

"নারীপুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণস্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভ এ দলের উদ্দেশ্য।" "আধুনিক কল-কারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিষ লাভের জন্যে ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্যে ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।"

"ভূমির চরমস্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণক্ষম স্বায়ত্তশাসন বিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের উপর বর্তিবে–এই পল্লীতন্ত্র ভদ্র-শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।'

এ ঘোষণা সমাজবাদমুখী–এটি নজরুল-কল্পিত নাও যদি হয়, তা হলেও অন্তুত কাগজের উদ্দেশ্য হিসেবে নজরুল সম্মত ও সমর্থিত নিশ্চয়ই।–উল্লেখ্য যে সাম্যবাদীর, সর্বহারার ও ফণিমনসার কবিতাগুলোও এ অঙ্গীকারের অনুগত।

আশ্চর্য, এরপরে তিনি এ পথই ছেড়ে ছিলেন, হয়তো মতও। পরবর্তীকালে ক্বচিৎ জিঞ্জীরে, সন্ধ্যায় ও প্রলয়শিখায় নিতান্ত যৌবন ধর্মের ও পূর্ব অভ্যাসের বশে কিছু জাগরণবাণী ও হিতকথা ধ্বনিত হয়েছে মাত্র আর 'চন্দ্র বিন্দুতে' বিদ্রূপ।

আসলে নজরুল ইসলাম আবাল্য অসহ্য দারিদ্র্যের শিকার ছিলেন বলে চিরকালই শোষিত-নির্যাতিত দীন দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু নিজকে সে শ্রেণীর একজন ভাবতে ও রাখতে চাননি। এবং সাম্যবাদেও তাঁর ছিল না কোন আন্তরিক আগ্রহ। তিনি চেয়েছেন নিজকে কোলকাতা শহরের ধনীমানী অভিজাতদের একজনরূপে দেখতে ও দেখাতে। তাই টাকা উপার্জনের একটা প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা অনুভব করেই অধৈর্য হয়ে গাড়ি-বাড়ি নয় শুধু, ফটকে দ্বারবান রাখার মতো হাস্যকর বিলাসেও ছিল তাঁর আগ্রহ। দরিদ্র মানুষকে যে তিনি স্বশ্রেণীর বলে ভাবতে লজ্জাবোধ করতেন, সাম্যবাদ তাঁর মুখে উচ্চারিত হলেও সে বুকের সত্য ছিল না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য সব কবির কিংবা সব মানুষের মনেই সত্তার অমিত শক্তির ক্ষণিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভূতি বা উপলব্ধি জাগে। এবং সেই মৌহূর্তিক অনুভবেই তাঁর আত্মপ্রত্যয় হয় দৃঢ় আর আত্মচেতনা জাগায় পূর্তিসম্ভব অসীম আকাঙ্ক্ষা। তখন ক্ষণকালের জন্যে হলেও মানুষ স্বসত্তার সম্ভাবনায় ও মহিমায় হয় মুগ্ধ, এমনকি এ অবস্থায়, সে ঈশ্বরের মতোই নিজেকে স্বজীবনের বিধাতা বলেই মানে। তেমনি ক্ষণের রচনা হচ্ছে নজরুলের বিদ্রোহী কিংবা ঝড় (বিষের বাঁশী) ও ধূমকেতু এবং মোহিতলালের 'আমি ও ধূমকেতু'। নজরুল ছিলেন জীবনের, যৌবনের, মর্ত্যের, মাটির, মানুষের, ভোগের, কামের, প্রেমের এবং সংগ্রামের কবি।

আবাল্য সংস্কারবশে তিনি মুসলিমই থেকেছেন, আস্থা রেখেছেন বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বে, তাই প্রথম বয়সের উচ্ছ্বাসের অবসানে কোরআন, রসূল ও ইসলামই হয়েছে তাঁর কাব্যিক অনুধ্যানের বিষয়। এমনকি মোহররম, কোরবানী, ফাতেহা দোয়াজদহম এবং শাতিল আরব প্রভৃতি কবিতা রচিত হয় প্রথম দিককার নির্যাতিত মানবতার আশু শোষণমুক্তিকামী আগুন-জ্বালানো রক্ত-ঝরানো বিপ্লবী কবির হাতেই।

অতএব, তোয়াজ-তারিফের ভাষায় তাঁকে কখনো বাঙালী সাম্যবাদী, কখনো বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, কখনো বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদী, কখনো বিপ্লবী কবি বলে অভিহিত করা হলেও আসলে তিনি ছিলেন সমকালীন মাটিলগ্ন জীবন ও জগৎ প্রতিবেশের কবি। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে অন্য কয়েক কারণের মধ্যে একটি ছিল–রচনার বিষয়ের ও চেতনার সমকালীনতা, বক্তব্য ছিল দুস্থ বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ শোষিত মানুষের মুক্তির আশ্বাস, কণ্ঠে ছিল অকল্যাণকর চিন্তার, কর্মের, আচরণের ও প্রথার প্রতিবাদ, আর ভাষায় ছিল বৈচিত্র্য, হিন্দু-পুরাণের, মুসলিম ঐতিহ্যের ও আরবী-ফারসী-হিন্দি আর দেশী শব্দের সুষম চমকপ্রদ প্রয়োগ। ভঙ্গিতে ছিল বলিষ্ঠতা ও পৌরুষ, ছন্দেও ছিল একাধারে চটুল চল-চপলতা আর বজ্রের গাম্ভীর্য ও মেঘের মন্দ্রতা। তাই তিনি লোকপ্রিয় কবি। এ ভাষার, ছন্দের ও বিচিত্র-চিত্রের আঙ্গিক বৈভব, ভাবের দৈন্য এমনকি অসঙ্গতিও আড়াল করে রাখে। বিমুগ্ধ পাঠকের আদর পান বলেই সমাজে তাঁর কদরও বেশি। রচনার গুণগত বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও স্বদেশে নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতার ও গানের জন্যে রবীন্দ্রনাথের মতোই জনপ্রিয়। বাঙলাদেশে গর্বিত স্বধর্মীয় মুখে প্রায় 'রবীন্দ্র-নজরুল' এক সঙ্গেই হন উচ্চারিত এবং রবীন্দ্রনাথের পরেই হয়েছে নজরুলের স্থান।

আর একটি কথা, শাস্ত্রানুগত আস্তিক মানুষ বাস্তব-বৈষয়িক প্রয়োজনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে সহাবস্থান করলেও, ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব হলেও অবজ্ঞা-বিদ্বেষমুক্ত সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারে না। তাছাড়া রাজনীতিক কারণেও হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি ব্রিটিশ আমলে অসম্ভব জেনেও নজরুল ইসলাম জাতীয় প্রয়োজনের তাগিদে রাজনীতিক্ষেত্রে, অন্তত সহযোগী ও সহযাত্রী রাখার বাঞ্ছাবশে উভয় সম্প্রদায়ের বা জাতির মৈত্রী প্রতীক 'হ্যান্ডশেক' করানোর জন্যে এবং 'গালাগাল'কে গলাগলিতে উন্নীত করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন,[১] তাঁর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনেও ছিল এমনি কৃত্রিম বন্ধনের ও মিলনের প্রয়াস ও সাধনা।

---

১. ১৯২৯ সনের ১৫ ডিসেম্বর, জাতীয় সংবর্ধনার উত্তর স্বরূপ ভাষণে উক্ত 'আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-ও স্বীকার করতে হবে যে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও উদ্গিরণের মতো নজরুল প্রতিভাও বছর দশেকের মতো প্রচণ্ড আবেগে ও দ্রুততায় বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্যে ও বজ্রের গর্জনের জ্বালাময়ী ভাষায় বলদৃপ্ত ভঙ্গিতে, মন্দ্রিত ছন্দে অভিব্যক্ত হয়ে শীতকালীন প্রস্রবণের মতো মৃদু-মন্দ মধুর-কোমল কান্তরূপ লাভ করল। রোগে নির্বাক-নির্বোধ না হলেও তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় ঔজ্জ্বল্য ও উৎকর্ষ দুর্লভ হত, তাঁর ত্রিশোত্তর জীবনের রচনার বিষয় এবং তার ভাষাভঙ্গি দেখে তা' যে কেউ আন্দাজ করতে পারে। তা'ছাড়া, তাঁর কল্পনার, মননের ও বিচরণের আকাশ কখনো অসীম ছিল না, ছিল মাটিলগ্ন, সমাজলগ্ন এবং দেহ-জড়িত।

দরবেশ-পীরের মাজারের ও মসজিদের খাদেম বংশ নয় শুধু, বাল্যে স্বয়ং খাদেম ছিলেন বলেই ভূত-প্রেত-জীন-পরী-দেও-দানু-তাবিজ-কবচ-যন্ত্র-মাদুলী-তুক-তাক-দারু-টোনা-বাণী-উচাটনে তাঁর আস্থা ছিল অটল। তবু মুমীন হয়েও, অলৌকিক, কেরামতিতে আবাল্য আস্থাবান থেকেও মৃত্যু ও পাপভয়বিরহী তরুণ বয়সে নজরুল ইসলাম 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কিংবা 'আগমনী' দেবস্তুতি, শ্যামাসঙ্গীত, দশমহাবিদ্যার মতো দেবীমূর্তি প্রশস্তিও রচনা করতে পেরেছিলেন দ্বিধাহীনচিত্তে। এসূত্রে শাক্ত-শৈবসঙ্গীতও স্মর্তব্য। কাজেই সাহিত্যের কিংবা জীবনের ক্ষেত্রে তিনি কখনো ধীরবুদ্ধির ও স্থিরবিশ্বাসের লোক ছিলেন না। মনে হয় তাঁর মনটি ছিল ঠিক চোখের কোলেই। তাই দেখা-বিষয় কিংবা শোনা-কথা মনে পড়লেই তাঁর মত মন্তব্য-ভাষায় পেত অভিব্যক্তি। তাই তিনি সমভাবে রইলেন যুগের ও হুজুগের কবি হয়ে। 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।'

এর ফলে তাঁর রচনার বিষয় যেমন বাস্তবঘেঁষা, তেমনি তা জীবনের স্থূল দিক সম্পৃক্ত। মহৎ, তত্ত্ব, সূক্ষ্ম অনুভূতি কিংবা উচ্চদর্শন অথবা প্রজ্ঞালব্ধ উপলব্ধি তাঁর রচনায় বিরল। বাস্তব প্রতিবেশ সঞ্জাত অনুভবের ও সংবেদনার অভিব্যক্তি বলেই তাঁর কবিতা পাঠককে মাতিয়ে তুলেছিল আর তিনি হয়েছিলেন জনপ্রিয়। পত্রিকায় সংবাদের শিরোনাম পদ্যে দেয়া কিংবা পদ্যে সম্পাদকীয় লেখা এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। ফলে তাঁর রচনা হয়ে রইল আবেগতাড়িত, অস্থিরচিত্ত, পরিশীলনকুণ্ঠ সংবেদনশীল এক মানবদরদী মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতির প্রকাশ হিসেবেই। এ রচনার আবেদনও অকৃত্রিমতার, আন্তরিকতার আর প্রাণ-মনের উষ্ণতার জন্যেই।

কবিতার শৈল্পিক অনুশীলন-পরিশীলন-পরিচর্যায় এ কুণ্ঠা ও ঔদাসীন্য তিনি অন্যভাবে মহিমান্বিত করে লোক-নিন্দা এড়িয়েছেন তাঁর 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় ঃ

বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই 'নবি'
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি।
ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নন।

এদের দুর্দশা—'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে'

রক্ত ঝরাতে পারি না একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রার্থনা করো–যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ,
এবং–বড় কথা বড় ভাব আসে না'ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও যাহারা আছ সুখে।

পরে আর একবার এমনি করে কবি আত্মসমর্থনে বলেছিলেন ঃ

'বন্ধুগো, সুর স্রষ্টা নই, কবি নই, আমি সাগের জল
কভু মেঘ হয়ে ঝরে পড়ি, কভু নদী হয়ে বহি কেবল
কভু জমে হই হিম তুষার।
(কেন আপনারে হানি হেলা–শেষ সওগাত)

কবির 'কৈফিয়ত' নিন্দুককে আপাত জব্দ ও স্তব্ধ করে বটে, কিন্তু তাঁর ত্রিশোত্তর জীবনের রচনার ক্ষেত্রে এ কৈফিয়ত প্রযোজ্য হয় না। তবে আত্মসচেতন কবি সমকালীন বাঙলার সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে স্বভূমিকার মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে এবং তাঁর সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের ধারণা সম্বন্ধে সচেতন ও পরিপূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল ছিলেন। আত্ম-বিশ্লেষণের ও আত্মমূল্যায়নের সামর্থ্য সব বুদ্ধিমানের কিংবা প্রতিভাবানেরও থাকে না। কবি যে স্বদেশের স্বকালের মানুষের ও সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করে মানবিক কর্তব্যই করছেন, সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

শুধু আত্মদর্শনের এ ক্ষমতা নয়, তাঁর মধ্যে ছিল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও। এবং তা ছিল দাম্ভিকতার জনকও। এটি প্রায় অশালীন ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে,–মুজফফর আহমদের মতে, তাঁরই মুসাবিদা করা ও আলি আকবর খানের নামে মুদ্রিত তাঁর বিয়ের কনে পক্ষের নিমন্ত্রণপত্রে ঃ 'বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের দেশবিখ্যাত পরমপুরুষ, আভিজাত্যে গৌরবে পরম গৌরবান্বিত আয়মাদার মরহুম মৌলবী কাজী ফকির আহমদ সাহেবের দেশবিশ্রুত পুত্র মুসলিম কুলগৌরব, মুসলিমবঙ্গের 'রবি' কবি-সৈনিক নবযুগের ভূতপূর্ব সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের সাথে।... বাণীর দুলাল, দামাল ছেলে বাঙলার এই তরুণ সৈনিক কবি ও প্রতিভান্বিত লেখকের নতুন করে নাম বা পরিচয় দেবার দরকার নেই।'–খ্যাতির ও যশঃলিপ্সার কি নগ্ন আকুল আকুতি!

আগেই বলেছি, কথায় কথায় রণহুঙ্কার ছাড়লেও, আগুন জ্বালানোর ও রক্ত ঝরানোর কথা বললেও বাস্তবে নজরুল শারীরিক সংঘর্ষ প্রবণ ছিলেন কি-না জানিনে, তবে দৃঢ় সংকল্পের ও অনমনীয় মেজাজের যে ছিলেন, তাঁর প্রমাণ–হুগলী জেল কর্তৃপক্ষের প্রাশাসনিক পীড়নের প্রতিবাদে ১৯২৩ সনের মে মাসে যে অনশন শুরু করেন, তা' কারা কর্তৃপক্ষের নির্যাতন এবং মাতা-আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুদের অনুরোধ সত্ত্বেও পরিহার করতে রাজি ছিলেন না। অবশেষে মাতৃসমা বিরজা সুন্দরীর অনুরোধে চল্লিশ দিন অন্তে অনশন ত্যাগ করেন।[১] তাঁর বিধবা মা তাঁর চাচা করিমকে স্বামীরূপে বরণ করায় অভিমানী সন্তান মায়ের সঙ্গে চিরকালের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। এবং কাবিনে

১. রবীন্দ্রনাথের তারবাহী অনুরোধ ঠিকানা ভুলের অজুহাতে নজরুল ইসলামের হাতে বিলি হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর-জামাই থাকার শর্ত আরোপ করায় নার্গিসকে বিয়ে না করেই রাত্রেই পথে নামাও জেদী ও দৃঢ়চেতা নজরুলের পরিচায়ক।[১]

নজরুল ইসলাম প্রেমে বা কোন বিশেষ নারী প্রেমে নিষ্ঠ ছিলেন না, তাঁর নিজের কথায়, যৌবনে 'প্রেম সেথা চির মেঘ আবৃত তনু–সেথা ভোলে তনুমায়ায়।' রূপবতী ও যৌবনবতী নারী তাঁকে আকৃষ্ট করত, অথবা নারীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণের শক্তি ছিল তাঁর। যুদ্ধে যাবার আগেই কোন এক কিশোরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এ অনামিকাকেই তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' উৎসর্গ করেছিলেন, দ্বিতীয়টির সন্ধান মেলে গার্ডের বাড়িতে, তৃতীয় জন নার্গিস, চতুর্থ জন দুলি ওরফে আশালতা প্রমীলা, ঢাকায় পঞ্চমজন ফজিলতুন্নেসা, হয়তো রানু সোমও, জাহানারা চৌধুরীর ও উমা মৈত্রের প্রতি গুণানুরূপ তো ছিলই, হয়তো রূপানুরাগও ছিল। তাদের পাওয়ার জন্যে লেখা গানগুলো এ ইঙ্গিতই দান করে। কামে আর প্রেমে পার্থক্য বোঝা সহজ, যদিও সংজ্ঞাবদ্ধ করা কঠিন। কাম যে কোন নারীতে বা পুরুষে চরিতার্থ করা সম্ভব, অতএব দেহের ক্ষুধার অংশ কাম আর মানসরুচি বা বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ বা অনুরাগই হচ্ছে প্রেম। একটিমাত্র নারীতে বা পুরুষে নিবদ্ধ রুচি বা আকর্ষণই প্রেম। প্রেম চিরস্থায়ী হবে এমন কোন কথা নেই, যতদিন আকর্ষণ থাকবে, অপরিত্যাজ্য-অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে, তত দিনই, তা প্রেমই। শক্ত সুস্পষ্ট দেহ, বিস্তৃত বুক, ডাগর রক্তিম চোখ, লম্বা ঝাঁকড়া কেশ, গেরুয়া কমলা রঙের পোশাক, আকর্ষণীয় চেহারার ও গুণের খোলামনের সপ্রতিভ (smart) প্রাণবন্ত এহেন যুবাপুরুষের প্রতি সহজেই নারীমন আকৃষ্ট হওয়ারই কথা। ঢাকায় ইনি ঈর্ষ্যু তরুণদের হাতে মার খেয়েছিলেন। মেদিনীপুরেও এক বিমুগ্ধ কিশোরী আবেগবশে গানের আসরেই কবিকে গলার হার উপহার দিয়ে স্ব-সমাজে পরিবারে গঞ্জনা পেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। আরো নারী তাঁর প্রীতির বন্ধন স্বীকার বা অঙ্গীকার করেছিল কি-না আমরা জানিনে বটে, তবে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। স্থূলভাবে যদি বলা যায় নারীর আকর্ষণটা কাম আর মানস-আকুতিটা প্রেম, তাহলে নজরুল ছিলেন মুখ্যত প্রেমের কবি এবং গৌণত হৃদয়সম্বাদী প্রেমিক। অবশ্য নজরুল সম্বন্ধে পাঠক সমালোচকের এ সিদ্ধান্ত অবিসম্বাদিত। তাঁর প্রেম-প্রণয়-বিষয়ক সব কবিতার ও গানের মূলে রয়েছে অবহেলা-প্রত্যাখ্যান-বিচ্ছেদ-বিরহজাত হাহাকার-আর্তনাদ। না পাওয়ার, পেয়ে হারানোর, অতৃপ্তির ও অস্থায়িত্বের কান্না জড়িত কবিতা গানে তাঁকে দেখা যায় করুণাকামী অসহায় এক কাঙালরূপে। এ নিশ্চয়ই অনুভবগত মহৎ ও সূক্ষ্ম মানবপ্রেমের ও প্রেমিকের লক্ষণ নয়। 'কি যেন কি নাই কিসের অভাব এ বুক ব্যথা-বিধুর' (চক্রবাক ঃ

---

১. ক. প্রসঙ্গত নিবেদন করি, আমার কৈশোরে আমি আমার এক সহপাঠির জননী হিসেবে নার্গিস আক্তার খানমকে ও তাঁর পারিবারটিকে মোটামুটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পাই। এটুকু জানি যে, নজরুলের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারটি অসত্য ও রটনা হিসেবেই তারা গণ্য করতেন। যে ঘটনার বিবাহের সত্যতা তর্কসাপেক্ষ, অথচ যা অসত্য বলে প্রমাণ পাচ্ছি তা মানবো না কোন যুক্তিতে।' (ডক্টর হায়াৎ মামুদ, ভিন্নমত, বিচিত্রা, পৃঃ ৪১; ১৩ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১৯শে এপ্রিল, ১৯৮৫; বৈশাখ, ১৩৯২ ঢাকা।
খ. আক্‌দের আগেই কাবিনের শর্ত ঠিক করাই নিয়ম, কাজেই ঘটনাটি আকদ্‌পূর্ব।
গ. কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা : মুজফফ্‌র আহমদ–তৃতীয় মুদ্রণের ভূমিকা, পৃঃ১৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজিয়াছি বর) কেবল তা নয়, কারো কারো মতে নারীর সঙ্গে তাঁর বাস্তব সম্পর্কের অনুভূতির অভিব্যক্তিও রয়েছে। তাঁর অনেক কবিতায় ও গানে—ছায়ানটে, পূবের হাওয়ায়, দোলনচাঁপায় ও চক্রবাকে সেসব বিধৃত রয়েছে।[১] যে কবি দ্রোহে, সংগ্রামে, বিপ্লবে, রক্তে, আগুনে, রণহুঙ্কারে অকুতোভয়, সে কবিই প্রেমভিক্ষায় বিনয়ী, করুণা যাচঞায় নিঃসংকোচ, বেদনা-যন্ত্রণা-হতাশায় বিদীর্ণ হৃদয়। কবির প্রণয়-গানে আনন্দ দুর্লভ, বেদনাই নিত্যসঙ্গী। একদিকে কবি বজ্রকঠোর আপোসহীন বিরামহীন সংগ্রামে উৎসুক, অন্যদিকে, প্রণয়ক্ষেত্রে তিনি কুসুম কোমল, কথায় কথায় বিক্ষত-হৃদয়, কবির চোখে অশ্রুর বন্যা।

তাঁর মতে এ ধূলির ধরায় প্রেম-ভালোবাসা আলেয়ার আলো, নারী কুহেলিকা। নারী যে কখন কাকে পথ ভোলায়, কখন কাকে চায়, তা চিরতিমিরে আচ্ছন্ন। পুরুষও তেমনি হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে তার মানসীকে খুঁজে ফেরে। তাই প্রেম সত্য চিরন্তন/ প্রেমপাত্র বহু অগণন/ মদ সত্য পাত্র সত্য নয়। (অনামিকা, সিন্ধু হিন্দোল)

চোখ ভরা জল, বুক ভরা ব্যথা
কণ্ঠে আসে না সুর।
(চক্রবাক ঃ সাজিয়াছি বর)

অথবা, একি তৃষ্ণা অনন্ত অপার/ কোথা তৃপ্তি, তৃপ্তি কোথা (পূজারিণী)। আশ্চর্য এ কান্না ও শূন্য হৃদয়ের হাহাকার, বঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষোভ কবিতায় গানে সীমিত নয়। তাঁর গল্পে-নাটকে-উপন্যাসেও সংক্রমিত। অবশ্য বিরহবোধের অপর নাম স্মৃতির রোমন্থন, অতৃপ্তিই অপ্রাপ্তিই বিরহ। শারীর প্রেমের ঐতিহ্য আমাদের সুপ্রাচীন। সংস্কৃত গাথায়, আর্যায়, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদে কিংবা হরগৌরী, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-নাপ্পিনাই প্রণয় কথায় এ শারীর প্রেমই কীর্তিত হয়েছে। আধুনিক সাহিত্য প্রেমকে সুফী-বৈষ্ণব ধারায় অনুভবের সূক্ষ্ম ও উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

কবি বলেছেন—'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য।'

আত্ম-ভূমিকা ও কৃতি সম্পর্কে কবির ধারণা নির্ভুল। তবে তাঁর বাঁশের বাঁশরী বেশি করে ধ্বনিত করেছে বেদনার-কান্নার সুরটা, এ বিষয়ে কবিও ছিলেন সচেতন। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' থেকে সমাজের বার্ষিক সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে সম্পাদক সৈয়দ আবুল হোসেনকে ১০.২.২৭ সনে লেখেন ঃ

'আমরা সরস্বতী অশ্রুমতী, বেদনা-শতদলে তাঁর চরণ। যুগ-যুগান্তরের অশ্রুর অঞ্জলি এসে পড়েছে তার পায়ে। এ ক্রন্দসীর গান শুধু একটানা ক্রন্দন। আনন্দ উৎসবের নৌরাতির দীপশিখা নিবে যায় এর হতাশ্বাসে' (চিঠি, শিখা, চৈত্র, ১৩৩৩ সাল)।

আগে গানের ছিল শ্রেণীবৈশিষ্ট্য, সুর-তাল-লয়ের এক বিশেষ ধরনের বিশেষ বিষয়ক গান। যেমন বৈষ্ণব কীর্তন, শাক্তগীত, ভাটিয়ালি গান, বাউলগীতি প্রভৃতি। রাগে-সুরে-তালে-লয়ে ব্যক্তিক শৈলী অঙ্গে ও অন্তরে হাড়-মাঁস-রক্তের মতো অভিন্ন হয়ে

১ ক. কুমিল্লায় নজরুল : এন. এ. কুদ্দুস, পৃ. ১৩-৬১, ১ম সং ১৯৭৬, কুমিল্লা।
খ. নজরুলের প্রেমের কবিতা : এম. এ. মজিদ, পৃ. ৩৮-৪৪, ৫১-৬১, ১ম সং ১৩৭৯, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপ পায় প্রথম রবীন্দ্র সংগীত, তারপরে তাই দেখতে পাই নজরুল গীতিতে। যে কোন বয়সের যে কোন লোক শোনামাত্রই রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের যে কোন অপরিচিত বা অশ্রুত গান শনাক্ত করে দিতে পারে। এমনি একালের বা ভিন্নকালের সঙ্গীত সম্বন্ধে কখনো বলা যায়নি বা বলা যায় না। বিদ্যাপতিতে, গোবিন্দদাসে, চণ্ডীদাসে, জ্ঞানদাসে, রামপ্রসাদে, কমলাকান্তে এমন প্রভেদ এখনো লক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের গান ছিল নজরুলের প্রিয় পাঠ্য ও গেয় বিষয়। কিন্তু রাগে-তালে-লয়ে-বাক্যে-বক্তব্যে কত পৃথক। গানে বা কবিতায় প্রায়ই নজরুল কঠিন শব্দে, বাক্যে ও ভঙ্গিতে 'বাণীবদ্ধ' করেছেন বক্তব্য। তাঁর অনেক কবিতা ও গান পড়া ও গাওয়া দুই অনুশীলন ও শ্রমসাধ্য–সহজ নয়। নজরুল তাঁর রচিত গানের মাধ্যমেই সাধারণ্যে হন পরিচিত ও জনপ্রিয়। তাঁর কালের গ্রামোফোন ও রেডিয়ো হয়েছিল তাঁর সহায়, যা প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালরা পাননি। গ্রামোফোন-রেডিয়ো নজরুলের জীবিকারও ছিল উৎস। তাঁর ইসলামি গান আব্বাসউদ্দীনের পরামর্শে, শ্যামাসঙ্গীত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র আগ্রহে এবং শ্যামসঙ্গীত-কীর্তন প্রতিভা বসুর পিসীর অনুরোধে রচিত। সঙ্গীতে নজরুল অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন, তবে সঙ্গীত কালান্তরে টেকে না বলে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা নজরুলগীতিও জনপ্রিয়তা হারাবে। অতএব নজরুল গানের জগতে অমর হবেন–অনুরাগীদের এ প্রত্যাশা পূরণ না হবারই কথা। তবু এতেও ছিল তাঁর অসামান্য ও অমিত শক্তির প্রকাশ, বিস্তার ও বিকাশ। রবীন্দ্রসঙ্গীত এক অর্থে আকাশচারিতা, আর নজরুলগীতি হচ্ছে মাটিঘেঁষা শরীরগন্ধী। একটি স্বর্গের, ভূমার, অপরটি মর্ত্যের, ভূমির। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম, নজরুল স্থূল। একজন আকাশচারী, অপরজন মর্ত্যবিহারী। তবু এ সত্য মানতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথের বাণীপ্রধান গানের ঐতিহ্য ছাপিয়ে নজরুল বাঙলা গানকে রাগপ্রাধান্য দিয়ে বিশেষ ঋদ্ধ করেছেন। আমরা জানি, বিদ্যালয়ে নজরুলের শিক্ষা ছিল অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত। তাঁর আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশও ছিল না মোটেই অনুকূল। তার মধ্যেই এ দুরন্ত দুর্মদ কিশোর তরুণ দুর্বার আগ্রহে হয়েছিলেন স্বশিক্ষিত। জেনে বুঝে আয়ত্ত করেছিলেন শিল্পীর পক্ষে সৃষ্টির জন্যে অতিপ্রয়োজনীয় অনেক বিদ্যা ও কৌশল। সৃষ্টি করেছিলেন ভাষা-অলঙ্কার, রাগ-সুর তাল-লয়। গ্রহণে বরণে ও মিশ্রণে, ভাষায়-ছন্দে-অলঙ্কারে, রাগে-সুরে-তালে লয়ে এনেছিলেন বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। এসব ছিল তাঁর কাছে কুমোরের হাতের কাদার মতো, তিনি ইচ্ছে মতো অনায়াসে অবলীলায় প্রয়োগ করেছেন তাঁর কবিতার ও গানের অঙ্গসজ্জায়, মর্ম গঠনে ও অবয়ব নির্মাণে। তাঁর মতো স্বল্পশিক্ষিত চল-চঞ্চল যাযাবর তরুণের কাছে এসব প্রত্যাশিত ছিল না। আবিষ্কারে উদ্ভাবনে ও সৃজনে তাঁর যে সহজ ও সহজাত শক্তি ছিল, তারই বৈদ্যুতিক প্রকাশ ও বিকাশ সবাইকে করেছিল চকিত, চমকিত, বিস্মিত, অভিভূত ও বিমোহিত। এ শক্তিরই লোক-প্রচলিত নাম প্রতিভা। তাঁর অনায়াস অযত্ন সৃষ্ট শব্দ, রূপপ্রতীক, বাকপ্রতিমা তাঁর নিমিত্ত উদ্দামগতির প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত, বেগবান অক্ষরবৃত্ত ও চটুল চালের স্বরবৃত্ত ছন্দ বাঙলা কাব্যের বিশিষ্ট ও বিস্ময়কর সম্পদ। কবিতার চরণে চরণে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর শক্তির, অসংযমের, শিল্পরুচির ও বাক্‌মোহের দ্বান্দ্বিক উপস্থিতির সাক্ষ্য-প্রমাণ। তাঁর কাব্যাঙ্গে প্রলিপ্ত ও কলঙ্কের কথা প্রায় সব পাঠক-সমালোচকই বলেছেন সক্ষোভে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর রচিত ক্ষুদ্র অঙ্গের বহু বহু গান নিখুঁত নিটোলরূপে ও গাঢ়রসে অপরূপ অসামান্য হওয়ার কারণও ওই সংযতবাক ও সংহত ভাব। গানের রূপ, রস ও সুর মুগ্ধ শ্রোতারা তাই গানের জগতে নজরুলের অমরত্ব প্রত্যাশা করেন।

কাজী নজরুল ইসলামেও আমরা তাঁর বয়োধর্মে ও মনোধর্মে অবাঞ্ছিত অসঙ্গতি দেখি। তাঁর চুয়াল্লিশ বছরের জীবনে তথা তাঁর তেইশ-চব্বিশ বছরের কবি জীবনে কোন উৎকর্ষ বা বিবর্তনগত পরিণতি কিংবা পরিপক্কতা দেখিনে, শুরু ও শেষ যেন একই রকম।

অবশ্য আমরা জানি বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই মানুষের দেহ-মন পরিপূর্ণতা পায়, পায় পূর্ণাঙ্গ অবয়ব। তারপর দেহ-মনের লাবণ্যের, স্বাস্থ্যের দার্ঢ্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে বটে, কিন্তু অভিনব বা অনবদ্য কিছুর উন্মেষ ঘটে না। তাই ওই বয়সের মন-বুদ্ধি-রুচির ও চিন্তা-চেতনার আবর্তনই মুখ্য হয়ে ওঠে, বিবর্তন সম্ভব হয় না দীর্ঘজীবী হলেও। এমনকি ত্রিশোত্তর জীবনে দীর্ঘজীবী বিদ্বান-বুদ্ধিমান মানুষও সমকালীনতা রক্ষা করতে পারেন না গ্রাহিকা শক্তির অভাবে। বাল্য-কৈশোরের অর্জিত দেহ-মনের কাঠামো বদলানো যে সহজ ও সম্ভব নয়, তা অমিত প্রতিভার রবীন্দ্রনাথকে দেখেও বিশ্বাস করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বারবার কালান্তরকে তথা দেশকালের হাওয়া বদলকে স্বীকার ও বরণ করতে চেয়েও বাল্যেকৈশোরে অঙ্গীকৃত চেতনার সীমা অতিক্রম ক্বচিৎ করতে পেরেছেন। তাঁর গদ্য-পদ্য রচনায় প্রাকরণিক বা আবয়বিক পরিবর্তন হলেও প্রাণ চৈতন্যের সূক্ষ্ম সূত্রের অবিচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা রয়েই গেছে।

নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায় তাঁর সম্ভাবনা ছিল অসামান্য, কিন্তু সম্পূর্ণতা নেই কোথাও। সম্ভাবনা সিদ্ধিতে পরিণতি ও পূর্ণতা পায়নি আকস্মিকভাবে তাঁর কবি জীবনের ছেদ পড়ল বলে নয়, দীর্ঘজীবনে আমৃত্যু সৃষ্টিশীল থাকলেও সে-সিদ্ধি সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে—কেননা তিনি স্রষ্টা ছিলেন বটে, কিন্তু সুরুচিনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন না। স্রষ্টার আবেগের সঙ্গে শিল্পীর সংযম ও সুরুচি যুক্ত না হলে যা হয়, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে নজরুলসাহিত্য। বদ্ধ ঘরে 'চা' ও 'পান' তাঁকে রচনায় নিবিষ্ট রেখেছিল বটে, কিন্তু শিল্পীর ধৈর্য্য দান করেনি। ফলে বিপুল সম্ভাবনা বাঙালীর ও বাঙলা সাহিত্যের ছিল, তা এভাবে অপূর্ণই রইল। তাঁর অনুভবের ব্যাপকতা ও সহজতা এবং আবেগের ও অভিব্যক্তির উচ্ছলতা তাঁর রচনার সর্বত্র শেষাবধি লঘু-গুরুভাবে বজায় থাকলেও অনুভূতি সূক্ষ্মতায়, চিন্তা গভীরতায়, অভিব্যক্তি শৈল্পিক লাবণ্যে উৎকর্ষ লাভ করেনি। ফলে তাঁর রচনা সংখ্যায় ও পরিমাণে স্ফীত হয়ে উঠলেও গুণে-মানে-মনীষায় প্রত্যাশিত রূপ পায়নি। এসূত্রে উল্লেখ্য যে তাঁর দীর্ঘ কবিতা মাত্রই বিচ্ছিন্ন ভাবের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তবক সমষ্টিমাত্র। এ জন্যে কোন দুই স্তবকে অর্থ ও বক্তব্যের সঙ্গতি-সামঞ্জস্য নেই—নেই ধারাবাহিকতা। আর একটি কথা, আবেগপ্রবণ বলেই যুক্তি, বুদ্ধি ও মনন নজরুলের চিন্তা চেতনায় নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্লভ। ফলে আবেগ প্রাবল্যই তাঁকে রেখেছে অতিমাত্রায় রোমান্টিক। যে কয়টি লক্ষণের ভিত্তিতে লেখাকে-লিখিয়েকে রোমান্টিক চিহ্নিত করা হয়—যেমন সুদূরের আকর্ষণ, দুঃসাহসিক অভিযাত্রাপ্রীতি, ঐতিহ্যে মুগ্ধতা, সৌন্দর্য-তৃষ্ণা, বিধি-নিষেধে ঘৃণা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, প্রকৃতি-প্রীতি, স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন, অলৌকিকতা প্রীতি, কল্পনার আতিশয্য, ব্যক্তির আত্মরতির প্রতি আসক্তি প্রভৃতির যে কোন লক্ষণ প্রকট ও প্রবল থাকলেই লেখাকে বা লেখককে রোমান্টিক বলে অভিহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা চলে। নজরুল ইসলাম যে তাঁর গানে কবিতায় নাটকে-গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে এমনিক সম্পাদকীয় নিবন্ধেও পূর্ণমাত্রায় রোমান্টিক তা কাউকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় না। মননদৈন্যই এর মূল কারণ। এ সূত্রে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে তথা বিশ্বের য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যে ও উপনিবেশগুলোতে পরাধীনতার গ্লানিবিশিষ্ট শোষিত-পীড়িত জনমনে ভাগ্য পরিবর্তনের তথা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, হয়তো বিপর্যস্ত য়ুরোপীয় প্রভুরাষ্ট্রের দুরবস্থাতেই তাদের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথের মতো ভাববিলাসী কবিও যুদ্ধোত্তরকালে কিছুদিন সমাজ-স্বদেশের প্রতি দায়িত্ব সচেতন হয়ে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, বলাকার সবুজের অভিমান, শঙ্খ প্রভৃতি ও মৃত্যুমহিমা বাচক কবিতাই তার প্রমাণ।

নজরুলের সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ বড় কবিদের মধ্যে হরবোলা কবি সত্যেন্দ্রনাথের (১৮৮২–১৯২২) ভাব-কল্পনায় বৈচিত্র্য থাকলেও, সাম্যের শ্রমিকের জনগণের স্বদেশের প্রতি প্রীতিমূলক কবিতা লিখলে, তিনি ভাবাদর্শে ভিন্ন জীবন চেতনার কবি, তাঁর কোন আদর্শ বা বাণী ছিল না। দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭–১৯৪৩) শোষিত নির্যাতিত গণমানবের প্রতি দরদ থাকলেও তাঁদের মুক্তির বাণী উচ্চারিত হয়নি, যেমন হয়নি জসীমউদ্দীনের কবিতায়, আর দেহাত্মবাদী মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯৫২) ছিলেন মর্ত্যজীবনে ভোগ-উপভোগবাদী, সুখ, শক্তি ও সৌন্দর্য সন্ধানী কল্পনাবিহারী কবি। নজরুলের সমবয়সী কল্লোল (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), পরিচয়, (১৯৩১), পূর্বাশা লালিত শ্রেষ্ঠ কবিদের সবাই-জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১–৬১), বিষ্ণু দে (১৯০৯–৮৩), অমিয় চক্রবর্তী , (১৯০১–৮৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–৭৪) ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের তথা য়ুরোপীয় সাহিত্যের রসপুষ্ট কবি। নজরুল ইসলামের সে বিদ্যা ছিল না, তাঁর সাহিত্য ওঁদের রচনার মতো শিল্পগুণ ও মননমণ্ডিত নয়। তাই বলে এফ.এ পরীক্ষা না-দেয়া শরৎচন্দ্রের মুখে প্রবেশিকা পরীক্ষা না-দেয়া নজরুলকে 'অশিক্ষিত পটুত্বের কবি' বলে অবজ্ঞা করা উচিত হয়নি।

চেতনার অনুচ্চ অবিশাল আকাশের নীচে নজরুল ইসলাম মুখ্যত শোষিত নির্যাতিত মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি লক্ষ্যে স্বদেশসহ পরাধীন জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্রোহের, বিপ্লবের, সংগ্রামের ও রক্তক্ষরা লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁর সমকালে প্রথম মহাযুদ্ধের মুসলিম জগৎই ছিল য়ুরোপীয় শক্তি কবলিত পরাধীন দরিদ্র দেশ। তাই আকস্মিক অভিন্নতার দরুন তিনি মুসলিম জাগরণের কবিরূপেও চিহ্নিত এবং অভিনন্দিত। অন্যদিকে তিনি বয়োধর্ম প্রেমের গানে ও কবিতায় রূপে ও রসে, কামে ও প্রেমে অতৃপ্তির আত্মআকুতি প্রকাশে ছিলেন সদা উন্মুক্ত ও উৎসুক। গল্পে-উপন্যাসে নাটকে-প্রবন্ধেও আবেগই তাঁর মুখ্য সম্বল ছিল বলে একটা বিশেষ ঋজু বক্তব্যই পুঁজি হিসেবে আবেগবাহী হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে বলে স্থূল অনুভূতি হল প্রকট, সূক্ষ্ম মননমিশ্রিত হয়ে তার চেতনার গভীরে মহৎ তাৎপর্য লাভ করেনি। ফলে তাঁর সৃষ্টি অঙ্গে মুসলিম ইতিবৃত্তের ও হিন্দু পুরাণের অজস্র-অঢেল বাক-প্রতিমা চিত্রকল্পের চমকপ্রদ সজ্জা গ্রহণ করে সুখপাঠ্য হলেও মনন দৈন্যে তা মহৎ সাহিত্যের স্তরে উত্তরণ পায়নি।

নজরুলের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে তাঁর চিন্তা-চেতনার সমকালীনতা। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর আর্থিক সঙ্কট, আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলোর মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুরোপীয় শক্তির বিপর্যয় দৃষ্টে স্বাধিকারের, স্বায়ত্তশাসনের এমনকি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটল ও দাবি উঠল। রাশিয়ার বোলশেভিকবাদের সাফল্যে যে নতুন প্রত্যাশা জাগল নজরুলের কণ্ঠে জনগণের বুকে গুমরে ওঠা সে সব অব্যক্ত বাসনা-বেদনা ভাষা পেল। আর প্রেমের গানে-কবিতায়ও পেল সাধারণ ও স্বাভাবিক অনুভূতি-অভিব্যক্তি। ফলে নজরুলের কবিতা ও গান জনগণমন জয় করল, হল জনপ্রিয়। তাঁর এ কালোচিত ভূমিকাই তাঁকে ইতিহাসে করল অমর, জাতিকে করল কৃতজ্ঞ, সাহিত্যকে করল গণসাহিত্যমুখী, সাহিত্য যে আকাশচারিতা নয়–বাস্তব জীবনসমস্যাসম্পৃক্ত হাতিয়ারও তা নজরুল সাহিত্যই বাঙলা ভাষায় বাঙালীর কাছে নুতন করে প্রমাণ করে দিল। কাজেই সাধারণ অর্থে জীবনতাত্ত্বিক মহৎ কবি না হলেও নজরুল ইসলাম যুগের কবি, দেশকালের প্রয়োজন-চেতনার কবি, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার সহ ও সমমর্মী কবি। তাঁর কাব্যের আবেদন ইন্দ্রিয়ের কাছে, হৃদয়ের কাছে–মস্তিষ্কের কাছে নয়।

সমকালীন পাঠক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারণায় 'রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসেনি বাঙলাদেশে, এমন সহজগতি আবেগের আগুনে ভরা কবিতা বাঙলা সাহিত্যে বিরল।' (যাত্রী, সং-১, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৭ সাল) শরৎচন্দ্রও নাকি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'একজন সত্যকার কবি, রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।' আবেগের আগুনভরা বলেই তাঁর রচনার আবেদন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, হৃদয়সংবেদ্য, মনীষা-মিশ্রিত বা জারিত নয়। আর আবেগ বাহুল্যের দরুনই হয়তো শনিবারের চিঠিওয়ালাদের খপ্পরে পড়া রবীন্দ্রনাথ ওই অগ্নিক্ষরা কবিতাগুলোকে 'সার্কাসের পালোয়ানি ও যাত্রার বীরের আস্ফালন' বলে নিন্দা করেছিলেন ইঙ্গিতে।'[১]

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আজো নজরুল ইসলাম এক প্রচণ্ড প্রাণ প্রবল শক্তিধর অনন্য পুরুষ। অমোঘ নিয়তির মতো, বিসুবিয়সের বিস্ফোরণের মতো, কালবৈশাখীর প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মতো, জনপদ প্লাবী পার্বত্য বন্যার মতো, মহাসমুদ্রের গর্জনমুখর জলোচ্ছ্বাসের মতো তরুণ কবি নজরুল ইসলামের আকস্মিক আবির্ভাব তাক লাগানো এক অসামান্য স্মরণীয় ঘটনা। এ যেমন আকস্মিক, তেমনি চমকপ্রদ, তেমনি স্বল্পকালস্থায়ী। এ প্রতিভা ক্ষণপ্রভার মতো, এর প্রভাব বজ্রবিদ্যুতের মতো, এর ধ্বনি কখনো মন্দ্র, কখনো নির্ঘোষ। নজরুলের অন্তর্লোকের প্রকাশ ঘটেছে 'বিদ্রোহী ও ঝড়' কবিতায়– একটি বিশৃঙ্খল অভিব্যক্তি, অপরটি প্রচণ্ড কিন্তু প্রাণশক্তির অনির্দেশ্য প্রকাশ। বলতে গেলে তিনি ছিলেন 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়ই'। এবং এ কখনো বারোমেসে নয়। মৌসুমী মাত্র। তাই কবির নবযৌবনেই এর উন্মেষ, বিকাশ ও অবসান, ত্রিশোত্তর কবিতাতে আগের আদল থাকলেও তখন তিনি মনে মেজাজে সামর্থ্যে অন্য মানুষ। নিপুণ শিল্পী, মহৎ কবি, নতুন তত্ত্বের দার্শনিক না হয়েও নজরুল ইসলাম সাহিত্যের ইতিহাস অতিক্রম করে বাঙলার শাস্ত্রিক, সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল সক্রিয় ও ফলপ্রসূ ভূমিকার প্রবল পুরুষরূপে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাঙলার জাতীয় ইতিহাসে তাঁর অবদান অবশ্যই স্বীকৃত থাকবে চিরকাল। এমন সৌভাগ্য অনেক মহৎ কবিরও ঘটেনি, ঘটে না।

---

১. 'সাহিত্যধর্ম ও সাহিত্যের নবত্ব' প্রবন্ধ, ১৩৩৪ সন ; শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ, প্রবাসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাধির উন্মেষই যে তাঁর মানব অবসন্নতার কিংবা অনুভব উপলব্ধির দৈন্যের আর সৃষ্টি-মন্থরতার কারণ, তা জানা থাকলেও অসচেতনভাবেই যেন তিনি সৃজনশক্তির ক্রমাবনতি অনুভব করতেন নির্বাক হওয়ার কয়েক বছর আগে থেকেই। তাই ১৯৩২ সন থেকেই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু দেশ-কাল-জাতি-স্বাধীনতা সংক্রান্ত উত্তেজনা উদ্দীপনা-দ্রোহ-সংগ্রামমূলক থাকেনি, ভাঙ্গার গান, বিষের বাঁশি ও আশ্বাসের বাণী আর শোনা যায়নি। ১৯৩২ সন থেকে কাজী নজরুল ইসলামের মানস-জগৎ ভিন্নরূপ— বৈশিষ্ট্যহীন প্রায় নিস্তরঙ্গ রূপ ধারণ করে। ১৯৪২ সনের ৯ই জুলাই তারিখে নির্বাক হওয়ার আগে ১৯৪১ সনের ৯ই এপ্রিল (৫/৬ই) মাসেই তিনি তাঁর ভেতরকার অক্ষমতা যেন অনুভব করেছিলেন–যেন দেখতে পেয়েছিলেন আসন্ন নিয়তিকে। তাই উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর মুখে–'যদি আর বাঁশী না বাজে আমায় ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন।' এ সূত্রে ১৯৪২ সনের জুন মাসে নবযুগে প্রকাশিত 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধটিও স্মর্তব্য। সেখানে তাঁর কবিজীবনের উন্মেষ ও অবসানের কথা একজন সিদ্ধ মরমী পুরুষের মতোই ব্যক্ত করেছেন।

বলেছি, আমাদের ধারণায় কাজী নজরুল ইসলাম স্থিরবিশ্বাসের ও ধীরবুদ্ধির মানুষ ছিলেন না। স্বাস্থ্যসুন্দর শিশু যেমন চঞ্চল ও দুরন্ত হয়, কৌতূহলতাড়িত হয়ে কেবলই ছুটোছুটি করে, কেবল হৃদয়বান মননে দীন কবিও তেমনি আবেগচালিত হয়ে অনুভবমাত্রই অজস্র কথায় তা প্রকাশ করে স্বস্তিবোধ করেন–হন সৃষ্টির বেদনামুক্ত। কাজী নজরুল ইসলামের গদ্য-পদ্য সব রচনাই এ সাক্ষ্যই বহন করে। উচ্ছ্বাসই নজরুলের পুঁজি। এ উচ্ছ্বাস তাঁকে আধুনিক কবির গৌরব থেকে করেছে বঞ্চিত, আর এটিই তাঁর গদ্যশৈলীকে রেখেছে অনাদৃত। এমন আবেগচালিত মানুষের মনটি থাকে চোখের কোলেই, এঁরা চোখ মেলে দেখেন, আর যা দেখেন তাই সৃষ্টি করে বুদবুদের মতো তাৎক্ষণিক ভাব ও ভাবনা এবং আবেগঋদ্ধ সংবেদনশীল স্বভাব কবি তা ব্যক্ত করেন কথার মালায়–সে-মালা বাঞ্ছিত অঙ্গের ও রূপ-বিন্যাসের হচ্ছে কিনা সে বিবেচনার দায়িত্ব যেন তাঁর নয়। ফলে কাব্যের অঙ্গনির্মাণে, রূপসজ্জায় কিংবা ভাববিন্যাসে ঘটে যত্নের অভাব–থাকে অবহেলার ছাপ। তাই কবিতাও অঙ্গে ও অন্তরে সুষম সুসঙ্গত অবয়ব পায় না–পায় না প্রাণশক্তি। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যদেহে পরিমিতির ও পরিশ্রুতির এবং কাব্য ভাবনার সংহতির ও সঙ্গতির অভাব চোখে পড়ে–অন্তরে বাজে।

কাজী নজরুল ইসলাম যত্নের সঙ্গে ফারসী ভাষা শিখেছিলেন, নিবিষ্টচিত্তে পড়েছিলেন হাফিজের ও উমর খৈয়ামের গীতিকাব্য। জিজ্ঞাসু কবি একাগ্রচিত্তে আয়ত্ত করেছিলেন হিন্দু-পুরাণের খুঁটিনাটি বহু বিষয়। আরবী-ফারসী ও পুরাণের উপাদান-উপকরণ তাঁর কাব্যকে অভিনব লাবণ্যে জড়িত করে সুখপাঠ্য করেছে– করেছে জনপ্রিয়, কিন্তু এসব হচ্ছে কাব্যদেহের আভরণ–অলঙ্কার, কাব্যহৃদয়ের সম্পদ নয়। তাই স্বল্প-মনীষার ও স্থূল রুচির কিশোর-তরুণের হৃদয়-মন এ কাব্য সহজে শীঘ্র জয় করলেও, মননশীলতা ও মনস্বিতার স্বল্পতার দরুন তা মননগ্রাহ্য হয়ে মহৎ সূক্ষ্ম ও গভীর চেতনায় সঞ্চিত সম্পদ রূপে মানস-পাথেয় হয় না।

আরবী-ফরাসী-সংস্কৃত থেকে কবি বহু শ্রমে সাধনায় যে সম্পদ সংগ্রহ করে তাঁর কাব্য-সৌধের শ্রী চমকপ্রদ করলেন, তাও অঙ্গে ও আত্মায় অতীতের, যে-অতীত প্রাগ্রসর মানুষকে ধরে রাখতে পারেনি, পারেনি ভরে তুলতেও। তাই কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষায় ছন্দে তিনি সমকালের অধুনাতন কবির একজন হতে পারলেন না। ত্রিশোত্তর জীবনে ও ত্রিশোত্তর কবিসভায় পেলেন না আসন।

সাধারণত বড় ও বিশিষ্ট কবির চেতনায় জগৎ-জীবন-সমাজ-সংসার সম্বন্ধীয় একটা দার্শনিক মত বা ধারণা প্রধান ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবন, মানুষ, সংস্কৃতি, রাজনীতি বা অর্থ-সম্পদনীতি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চিন্তা-চেতনা শক্তিমান কবি হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের কাব্যে রূপায়িত হয়নি বলে তাঁকে কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সহজে অবিসম্বাদে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। তাঁর বিবিধ ও বিচ্ছিন্ন মত, বিমিশ্র চেতনা, বিশৃঙ্খল জীবনভাবনা, অস্থির মানসপরিক্রমা, স্ববিরোধী চিন্তা, বিচিত্র ও বিপরীত বিষয়ক ফরমায়েসী কবিতা ও গান তাঁকে পাঠকের চোখে 'বহুরূপী' করে তুলেছে।

আর এ ফাঁকেই তিনি একাধারে হয়েছেন বিপ্লবের ও বিদ্রোহের, সংগ্রামের ও সঙ্গীতের, গানের ও রণের, সাম্যের ও প্রেমের, মুসলিমের ও হিন্দু-মুসলিমের, ভারতের ও বাঙলাদেশের, মানুষের ও স্বদেশের ইসলামের ও বাঙালীর কবি।

এতে নজরুল কাব্যের উপযোগ বেড়েছে। সবশ্রেণীর বাঙালীই স্ব স্ব মত ও মতলব অনুযায়ী নজরুল কাব্যের বাণী বাস্তব জীবনে শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো কাজে লাগাতে পারে। অতএব, নজরুল সাহিত্য, নির্বিশেষে বাঙালীর প্রয়োজনের ও প্রণোদনার আধার ও উৎস।

নজরুলের জন্ম হয়েছে ও কবিজীবন কেটেছে ব্রিটিশ ভারতে তথা পরাধীন বাঙলায়। দেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাই উদ্দীপনা-উত্তেজনাকর কবিতা গানে স্বকালের স্বদেশীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করাই ছিল তাঁর ব্রত। সে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। কাজেই তাঁর ব্রিটিশ-বিতাড়ন লক্ষ্যে রচিত সংগ্রামী কবিতাগুলো বাঙালীর বাস্তবজীবনে উপযোগ হারিয়েছে। কিন্তু তিনি যুগপৎ দেশের বঞ্চিত দলিত জনগণের-গণমানুষের, দুস্থ মানবতার আর্থিক সামাজিক মুক্তির সংগ্রামেও ছিলেন সমমাত্রায় উৎসাহী। সে-মুক্তি আজো মেলেনি—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাজেই তাঁর কাব্যের এ অংশ আজো দুস্থ মানবের, মানববাদীদের সংগ্রামী প্রেরণার ও প্রণোদনার আকর।

পাঠক সমালোচকদের চোখে নজরুল সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে নজরুল ইসলামের কণ্ঠ ছিল নতুন, স্বর ছিল কখনো মন্দ্র, কখনো বজ্রভীষণ, উচ্চারণের ভঙ্গি ছিল অভিনব আর বক্তব্য ছিল যুদ্ধোত্তর কালে গণবাঞ্ছিত। তাই নজরুলের আবির্ভাবে শিক্ষিত বাঙালী চকিত-চমকিত না হয়ে পারেনি। এ আবির্ভাব কারুর কাছে দ্রোহীর মতো, কারুর কাছে ঝড়ের মতো, কারুর কাছে বা ধূমকেতুর মতোই। সামান্য, সাধারণ কিংবা স্বাভাবিক যে নয়, তা অবচেতনভাবে অনুভব ও সচেতনভাবে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে নিভৃতপল্লীর স্বল্প শিক্ষিত পাঠক অবধি সবাই। এক হিসেবে নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা। সাহিত্যকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচেতনভাবে রাজনীতির, সমাজ-সংস্কারের, সংগ্রামের ও বিপ্লবের বাণী প্রচারের সার্থক বাহন করেন নজরুল ইসলামই। আর এক অর্থে নজরুল ইসলাম ছিলেন যুগন্ধর-যুগনায়ক কবি। জনগণের মনের কথা, কাম্যবাণী, প্রত্যাশিত সংগ্রাম নজরুলের রচনাতেই বিঘোষিত।

কেবল রবীন্দ্রনাথেরই জীবনকালে তাঁর সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন বা আলোচনা গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিল, শশাঙ্ক মোহন সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, অজিতকুমার চক্রবর্তী, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ এক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রণী। মধুসূদন থেকে বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিত লাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি প্রখ্যাত বা বিশিষ্ট কবিদের কৃতি সম্বন্ধে তাঁদের মৃত্যুর পরেও বেশি গ্রন্থ রচিত হয়নি। কিন্তু নজরুল ইসলাম যখন জীবন্মৃত তখন থেকেই তাঁর রচনার মূল্যায়ন গ্রন্থ প্রণয়নে আগ্রহী ও উদ্যোগী হন অনেকেই। এ-ও সত্য যে স্বধর্মীর গৌরবগর্বই অনেককে এ আলোচনা গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। তবু এ-ও সত্য, এ কবি সম্বন্ধে কেউ উদাসীন থাকতে পারেননি। তাঁর বড়ত্ব ও গুরুত্ব যেন বিবেকের নির্দেশে স্বীকার করবার জন্যে কিংবা বিরাগের তাড়নায় তার রচনার সামান্যত্ব দেখাবার জন্যে অনেককে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে ও হচ্ছে। রচিত হয়েছে বহু বই। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় যেমন এতকাল দেখা গেছে কেবল তারিফ করবার জন্যেই, ভক্ত হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশের জন্যেই আলোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে, ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে কৃচিৎ ও কদাচিৎ। ইদানীং অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের চল্লিশোর্ধ্ব বছর পরে রবীন্দ্র মনের, মননের, রুচির, ভঙ্গির, মতের ও মন্তব্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির ও অপূর্ণতার কথা বলা শুরু হয়েছে, এটি শুভলক্ষণ। নজরুল সম্বন্ধে লিখিত বইগুলোরও অধিকাংশ হচ্ছে তোয়াজের, তারিফের ও স্তুতির বাহন। দোষত্রুটি-অপকর্ষ চিহ্নিত হয়েছে কৃচিৎ।

AMARBOI.COM

আসলে গোড়ায় নবাগত প্রতিভার নিন্দায় মুখর থাকে পাঠক সমালোচক। যখন তাঁর প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তখন সবাই অনেক কালের জন্যে স্তাবক বনে যায়। সে অবস্থায় কেউ যথার্থ মূল্যায়নে অগ্রসর হলে তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের ও নজরুলের ক্ষেত্রে তা' প্রত্যক্ষ করেছি। এখনো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ যোগেও কোন সত্য কথা উচ্চারণ করা নিরাপদ নয়। বুদ্ধদেব বসু থেকে সুশোভন সরকার অবধি সবাই নিন্দিত হয়েছেন রবীন্দ্রভক্তদের দ্বারা। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে নিন্দাবাক্য সহ্য করার লোক আজো কম। নজরুলের নিন্দা পশ্চিম বঙ্গে চললেও বাঙলাদেশে এখনো অচল।

আসলে ভক্ত মাত্রই কেবল গুণগ্রাহী, আর নিন্দুকমাত্রই দোষ-ত্রুটি সন্ধানী। এ হচ্ছে রাগ-বিরাগের অভিব্যক্তি। অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ধৃত সত্য থাকে এ দুটোর অনায়ত্ত। ফলে 'সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ'–এ আপ্ত বাক্যই হয় লোকগ্রাহ্য ও জনপ্রিয়। অবশেষে কালান্তরেই কেবল কারুর দানের অবদানের, কৃতির-কীতির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয়। কেননা, কালান্তরে নতুন প্রজন্মের মানুষ নতুনতর জীবনচেতনা ও জগৎজিজ্ঞাসা নিয়ে পূর্বেকার মানুষের চিন্তাচেতনার দৈন্য, অনুভব, উপলব্ধির অপূর্ণতা এবং মত-মন্তব্যের ত্রুটি সহজেই দেখতে-জানতে ও বুঝতে পারে। এ সঙ্গে এ-ও স্বীকার্য যে যুগে যুগে স্থানে স্থানে পরিবেশের ও প্রয়োজনের প্রভাবে মানুষের বিচার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনার মাপকাঠি বদলায়, উপযোগবৃদ্ধি হয় পরিবর্তিত। এ জন্যেই এক কালের উচ্চ অন্য কালে তুচ্ছ, এবং পূর্বকালের কোন অবহেলিত তত্ত্ব নতুনকালে প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়, সহায়ক হয় পুনর্জাগরণের। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসে বিস্মৃত গ্রীক-সাহিত্য-দর্শন-মনীষার অবদান এক্ষেত্রে সাক্ষ্যস্বরূপ স্মর্তব্য।

আমরা জানি, মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণমাত্রই দেশকাল পরিবেশ প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। এ অর্থে প্রতি মানুষই স্ব-কালের সৃষ্টি। একে অতিক্রম করে পুরো স্বসৃষ্ট হওয়া অতি বড় প্রতিভাবানের পক্ষেও সম্ভব হয় না। শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্ব-কালের সমঝদার সমালোচকদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, রুচি-বুদ্ধি-দৃষ্টিও সমকাল প্রভাবিত বলেই তাদের নিন্দা-প্রশংসাও কালিক ও সাময়িক। সময়ের ধোপে তা-ই প্রায়ই ভুল কিংবা অসঙ্গত বলে মনে হয়। মধুসূধনের, বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের কিংবা নজরুল ইসলামের যে সব রচনা তাঁদের সমবয়সী কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ পাঠকদের তীব্র নিন্দার বা প্রতিবাদের শিকার হয়েছিল, দুর্বোধ্যতার, অশ্লীলতার ও নীতি-নিয়ম ভঙ্গের জন্যে সমকালীন বিদ্বানদের ঘৃণা পেয়েছিল যে সব রচনা, সেগুলোই পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকের কাছে শিল্পোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য বলে নন্দিত হয়েছে। আবার সমকালে যে-গ্রন্থ সমাদর পেয়েছে, পরবর্তীকালে তা বিস্মৃতির কবলে পড়েছে এমন নজিরও বিরল নয়। তবে সব যুগেই সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নতুন চিন্তার ও চেতনার এবং কথার ও কর্মের গুরুত্ব যথাযথ বোঝার লোকও দু'চারজন থাকে। প্রশংসা ও স্বীকৃতি উচ্চারিত হয় তাদের কণ্ঠেই। সেকালেই সর্বভারতীয় নেতা ও বাঙলা সাহিত্যে সমালোচক বিপিনচন্দ্র পাল নজরুলকে নতুন যুগের কবি বলে সহজেই স্বীকার করেছিলেন। নজরুলের কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশে যে নতুন ভাব জন্মিয়াছে তার সুর পাই। তাহাতে পালিশ বেশি নাই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান কাজী নজরুল ইসলাম নতুন যুগের কবি।[১]

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা আটাশী খানারও বেশী। এগুলোর মধ্যে অবশ্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থও রয়েছে। তবু একক লেখকের গ্রন্থও কম নয়। সবগুলো অবশ্য স্বীকৃত মানেরও নয়। তা-ই অনেক বই-ই সমালোচনার দাবি রাখে না। আমরা স্বীকৃতমানের ও উঁচু মানের কয়েকটি আলোচনা গ্রন্থে পরিব্যক্ত মত, মন্তব্য এবং মূল্যায়নজাত সিদ্ধান্ত এখানে উদ্ধৃত করব এবং প্রয়োজনমতো প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের মত-মন্তব্য ব্যক্ত করব।

১. কাজী আবদুল ওদুদ–'নজরুল প্রতিভা'

সম্ভবত কাজী আবদুল ওদুদই প্রথম 'নজরুল প্রতিভা' নামের একটি প্রবন্ধে নজরুল রচনার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ১৩৪৮ সালে বা ১৯৪১ সনে। প্রবন্ধটি কবির ৪৩তম জন্মোৎসবে পড়া হয়েছিল বলে পাদটীকা রয়েছে।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে, কবির লেখক জীবনের রয়েছে চারটি স্তর ঃ প্রথম স্তর 'বিদ্রোহী' পূর্বকাল, দ্বিতীয় স্তর 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার পর থেকে কবির রাজনীতিক জীবনের অবসান অবধি, তৃতীয় স্তর সঙ্গীত ও গজল রচনার যুগ এবং চতুর্থ স্তর কবির যোগী জীবন।

---

১. "মানিকগঞ্জ সাহিত্য সভায়" (১৩৩৫) সভাপতির ভাষণ–কল্লোল, জৈষ্ঠ্য ১৩৩৬ সাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী আবদুল ওদুদের এ স্তর বিভাগের কোন যৌক্তিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলেই আমাদের ধারণা। কাজী আবদুল ওদুদের মতে, প্রথম স্তরে নজরুল ঃ

ক. 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পূর্বেই তার নবীনতা অথবা উদ্দামতা আর ছন্দসামর্থ্যের প্রতি বাঙলার সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

খ. 'বিদ্রোহী' থেকে তাঁর (কবির) মানবজীবনের গতি যে মুখী হলো তার সঙ্গে তাঁর পূর্বের ভাব-জীবনের সঙ্গতি-অসঙ্গতি দুই-ই রয়েছে। এই যুগের 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে .... কবি তাঁর তরুণ জীবন কিছু পরিমাণে চিত্রিত করেছেন.....। এই রচনায় দেখা যাচ্ছে কবি একজন অসাধারণ ভাববিলাসী ও অভিমানী ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় গভীরভাবে আহত .... (তবু) মুহ্যমান তিনি হননি।

গ. কবি ছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীতে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রেম সঙ্গীতে আত্মহারা।

দ্বিতীয় স্তরের নজরুল ইসলাম ঃ

ক. রবীন্দ্রনাথের যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অথবা 'এবার ফিরাও মোরে' নজরুলের তেমনি 'বিদ্রোহী'।– জীবনে হঠাৎ একটি বৃহৎ চেতনার আবির্ভাবের সৌরভ এ-সবে বিধৃত। ... বিদ্রোহীর আকর্ষণ কবিকে বাস্তবিকই ঘরছাড়া করেছিলো। ... প্রচণ্ড ধূমকেতুর মতো কি এক ভীষণ মনোহর জীবন কবির ভিতরে সূচিত হয়েছিলো। ... তিনি যেন এক নতুন জীবন নিয়ে জেগে ওঠেন, নিজেকে ও জগৎকে দেখতে আরম্ভ করেন এক নতুন দৃষ্টিতে।

–এসব বলেও কাজী ওদুদ নজরুলকে যুগপ্রবর্তক বলে স্বীকার করেন না। কারণস্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের বলাকা যুগের কবি নজরুল বলাকার ভাবসম্পদে প্রভাবিত, এ বিশ্বাসে 'বিদ্রোহী'র অনবদ্যতা প্রকারান্তরে অস্বীকার করেছেন। কাজী আবুদল ওদুদের এ অনুমান সঙ্গত নয়। এ দ্রোহ যুদ্ধোত্তর কালের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং কিছুকালের জন্যে এ প্রভাবে পড়ে সবুজের অভিযান, শঙ্খ প্রভৃতি কয়েকটা কবিতা লিখেছিলেন মাত্র।

খ. শ্রেষ্ঠ কবিদের বিশেষ বিশেষ কবিতার কবিকল্পনার যে পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায়, নজরুলের রচনায় সেটির অভাব...। তাঁর কবিপ্রতিভা বরং প্রকাশ পেয়েছে উৎকৃষ্ট চরণ রচনায়। নজরুলের 'বিদ্রোহী' যুগের অনেক কবিতায় দেখা যাবে–! 'বিদ্রোহী'ও সেসবের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশের সঙ্গতি-সুষমা অথবা যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি বেশ উদাসীন হয়েছেন। কবি তিনি যত বড় তার চাইতেও বড় তিনি যুগমানব, যুগের বেদনা ও উন্মাদনা তাতে এত প্রবল যে, কবির কল্পনা-লোকে অবস্থান তাঁর পক্ষে যেন দুঃসাধ্য। প্রতিদিনের জীবনের তাড়নায় তীব্রভাবে তাড়িত হয়েই তিনি চলেছেন। ...এর জন্যই নজরুলকে এ যুগের একজন অসাধারণ কবি ভাবা কঠিন, কিন্তু এ যুগের একজন অসাধারণ ব্যক্তি তিনি অবিসংবাদিত রূপে।

কাজী আবুদুল ওদুদের এসব মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত মনে হয় এখনো প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য।

গ. বাণীর ত্রুটি তাতে যতই থাকুক, জীবনের উপলব্ধি তাঁর সুগভীর। তাঁর বিখ্যাত কবিতা সমষ্টি 'সাম্যবাদী' সম্বন্ধেও একথা খাটে।

ঘ. অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি (কবি) তাত্ত্বিক–আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরমপ্রিয় তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ–ইংরেজিতে যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণত Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য শেষ পর্যন্ত নেই–ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন সবকিছুই ভগবানের লীলা। .... এই লীলাবাদ তাঁর (নজরুলের) জন্যে এক ধরনের আত্মবিস্মৃতি এনে দিয়েছে, তাঁকে আশ্চর্যভাবে নিরহঙ্কার ও সৌন্দর্য পিপাসু করেছে। কিন্তু কবিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে এই বাধা উপস্থিত করেছে যে, এর ফলে বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী তিনি হয়েছেন অনেক বেশি, রূপবৈচিত্র্য অঙ্কনের চাইতে Type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছে।

–কাজী আবদুল ওদুদের 'গ' ও 'ঘ'-তে পরিব্যক্ত মত গ্রহণ করা যাবে না, কারণ নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুলো জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা থেকে অর্থাৎ তার অন্তরের বিশ্বাস ও অনুসৃত আদর্শ থেকে উৎসারিত নয়, যুগের দাবির আনুগত্যজাত রচনামাত্র। মাজার-সেবক, মুয়াজ্জিন-মোল্লা পরিবারের সন্তান জন্মসূত্রেই এবং বাল্যে-কৈশোরের খালেদ-মুয়াজ্জিন থাকার কালেই লীলাবাদে, ভূত-প্রেত-দেও-দানু-জ্বীন-পরীতে এবং কিরামতিতে আর ইসলামে তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল। এটি তাঁর অর্জিত নয়, বরং কুসংস্কার কবলিত আবেগ প্রবণ দুর্বলচিত্তে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি-মনন দৈন্যের পরিচায়ক। আর রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে বিশেষ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োজন। তার গল্প, উপন্যাস, নাটক দেখে মনে হয় সে শক্তি তাঁর ছিল না। কাজেই প্রয়াসে প্রযত্নে বাঞ্ছিত মানের প্রত্যাশিত রূপ-স্বরূপ তথা চরিত্রচিত্র অঙ্কন সম্ভব হত না। স্বয়ং কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, 'কিন্তু পুরোপুরি সাম্যবাদী নজরুল কখনো হননি, হলে তাঁর এই সাম্যবাদ প্রচারের দিনে' খালেদ, ওমর, জগলুল প্রভৃতি প্যান-ইসলামীভাবের কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। সাম্যবাদের প্রভাবে তাঁর ভিতরে ঘনীভূত হয়েছে দুস্থ ও বঞ্চিত মানবতার জন্যে দরদ। (এ সূত্রে স্মর্তব্য যে স্বয়ং নজরুলও আজন্ম দুস্থ ও বঞ্চিত মানুষ)।

AMARBOI.COM

তৃতীয় স্তরে ঃ

নজরুল যে-প্রেম সঙ্গীত রচনা করেছেন, তা বুঝতে গেলে সহজেই চোখে পড়ে, তাঁর 'বাঁধন হারা' পত্রোপন্যাসে তাঁর প্রথম জীবনে যে ব্যর্থ প্রেমের ছবি তিনি অঙ্কিত করেছিলেন সেইটিই হয়ে রয়েছে তাঁর সারা জীবনের ধুয়া। যে বিরহ ছবি তাকে মুগ্ধ করেছে সেটি সংসার অনভিজ্ঞ, অবুঝ, কিশোর-কিশোরীর বিরহ.. এ বিরহবোধ তাদের জন্যে হয়েছে যেন জীবনের এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা– জীবন যেন পরম সমৃদ্ধ হয়েছে এই বিরহের স্পর্শমণির ছোঁয়ায়।

– কাজী আবদুল ওদুদের এ মত সবার পছন্দ হবে না। তবে নজরুলের কবিতায় ও গানে প্রত্যাখ্যানের, না পাওয়ার, পেয়ে হারানোর অবহেলার জন্যে ক্ষোভ ও কান্না অভিব্যক্তি পেয়েছে, তা যে কতকটা কৃত্রিম অনুযোগের মতো লঘুও হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। কেউ যদি কবিকে 'বিরহ বিলাসী' বলেই জানে, তা হলে উচ্চকণ্ঠে আপত্তি করাও যাবে না।

২. বুদ্ধদেব বসু ঃ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ঃ নজরুল ইসলাম [কালের পুতুল গ্রন্থে সংকলিত]।

যে-দুরন্ত দুর্মদ প্রমত্ত প্রাণের প্রমূর্ত পুরুষকে তরুণ বুদ্ধদেব বসু 'বেপরোয়া দিলখোলা ফুর্তিবাজ মানুষ'রূপে জানতেন, যাঁর চওড়া মজবুত শরীর, লাল-ছিটেলাগা বড়ো-বড়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদির চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাঁকড়া চুল যাঁর প্রাণের ফুর্তির মতোই অবাধ্য, যাঁর প্রাণশক্তির অমন অলঙ্কৃত উচ্ছ্বাস দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে যার প্রাণ, পরিণত বয়সে বুদ্ধদেব বসু সেই কবির সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

ক. 'নজরুল চড়াগলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ চৈ অত্যন্ত বেশি, এবং এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায়, কিপলিঙের মতো, তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন'। এ ধরনের কবি হবার বিপদ এই যে জোর আওয়াজ হতে থাকলেই মনটা খুশি হয়, সে আওয়াজ যে অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজমাত্র সে-খেয়াল একেবারেই থাকে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি– অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধুই হৈ চৈ আছে, কবিত্ব নেই। প্রেমের বা প্রকৃতির বিষয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে–একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল অনর্গল অবচেতন বাক্য বিন্যাসে বদ্ধস্রোত। অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ–এবং প্রধান দোষ। যা কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে, ভাবতে বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি।

... এদিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে–সেই কাঁচা, কড়া, উদ্যমশক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কলকব্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের দীনতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন। বায়রন সম্বন্ধে গ্যয়টে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে-কথা। The moment he thinks, he is a Child— পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর পর তাঁর বইগুলিতে কোন পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম।

খ. গদ্য লেখক হয়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদ্যে তাঁর অতি মুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে প্রকাশ পাবে, সে তো অনিবার্য।

গ. গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে সার্থকভাবে দান করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলির মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তার গানের। 'তাঁর গান তাঁর কবিতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর' গানের ক্ষুদ্র আকারে তাঁর অতিকথনের দোষ প্রশ্রয় পেতে পারেনি–বুলবুল ও চোখের চাতকে কিছু কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশি বলা হয় না। আরো বেশি গান যে অনিন্দ্য হয়নি, তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ। কোন একটা অমার্জিত শব্দ প্রয়োগে সমস্ত জিনিসটিই গেছে নষ্ট হয়ে। (গানই) নজরুল প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।... কালের কণ্ঠে গানের (যে) মালা তিনি পরিয়েছেন, সে-মালা ছোট কিন্তু অক্ষয়।

–নজরুল ইসলামের কবিতা ও গদ্যরচনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর উপর্যুক্ত মতই সাধারণভাবে একালের সাহিত্যরুচির তরুণ ও মধ্য-বয়স্করা অবিসম্বাদিতভাবে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু নজরুলের গানের অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে দ্বি-মতের অবকাশ রয়ে গেছে। গানের আঙ্গিক পূর্ণতা কিংবা ভাবের গভীরতা অথবা বক্তব্যের ও সুর-তাল-লয়ের বিশুদ্ধতাও গানকে কালজয়ী করে না। পরিত্যক্তও হয় না ত্রুটির জন্যে। গায়ত্রীমন্ত্রের কাল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ অবধি কোনকালের গান পৃথিবীর কোথাও কালান্তরে টিকে থাকে না। রবীন্দ্রনাথের গানও কবিতা হিসেবে পাঠযোগ্য থাকলেও কিছুকাল পরে সঙ্গীত হিসেবে লোকপ্রিয় থাকবে না। কালান্তরে মানুষের ভাষা-ছন্দ-সুর-তাল-লয় সম্বন্ধে প্রাতিবেশিক কারণেই নতুনতর মনোভঙ্গির দরুন ও চেতনার ও রুচিবোধের পরিবর্তন ঘটে। এ মুহূর্তে বালক-কিশোর-তরুণেরা রেডিয়ো-টেলিভিশনের যেসব সুর-তালের-ভাবের রসের ও ভাষার গান শোনানোর ফরমায়েশ করে, একই গানে বিচিত্র ও বিবিধ সুরের যে মিশ্রণ ও সহাবস্থান কামনা করে, যে অঙ্গভঙ্গি ও পোশাক গাইয়ের কাছে বাঞ্ছিত হয়, তা রবীন্দ্র সঙ্গীত বা নজরুল-গীতি বাঁধা রাগরাগিনী পরিহার না করে নতুনভাবে কালোপযোগী হয়ে টিকে থাকতে যে পারবে না, তার সাক্ষ্য প্রমাণ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে।

তবু বুদ্ধদেব বসুর মতো অধিকাংশ সমালোচকই গানগুলোকেই নজরুলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং অক্ষয় কীর্তি বলে জানেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে বুদ্ধদেব বসু 'শব্দ' প্রয়োগে, কাব্যের আঙ্গিক পরিচর্যায় নজরুল ইসলামের কাব্যে ক্রটি দেখেছেন, আর প্রথম দর্শনে চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের কবিতায় ভাব-ভাষা-ছন্দের ও শব্দের সুষম প্রয়োগে। তাই আবেগভরে উচ্ছ্বসিত ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন 'মোসলেম ভারত' সম্পাদককে—

'যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বমণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রা-বিনাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে... ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে, কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। এই প্রকৃত কবি শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে।...সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতি প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝঙ্কারের মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যত্র (মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৭ সন) ...ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বরসপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভার-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী।'

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্য চর্চা' (১৯৭৬ সনের দে'জ মুদ্রণ) নামের প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে (১৯৫২ সনে লিখিত) নজরুল ইসলামের কৃতি, কীর্তি ও ক্রটি সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন, সেগুলো উদ্ধৃত করছি। এখানে বুদ্ধদেব বসু নজরুল ইসলামকে কবিতার ক্ষেত্রে নতুন যুগস্রষ্টা বলে স্বীকার করেছেন ঃ

১. রবীন্দ্র সমকালে সব কবিই রবীন্দ্র প্রভাবে যখন স্ব স্ব সত্তার স্বাতন্ত্র্যহারা, তখন 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ চৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো। নজরুল ইসলামকে ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলেছি; সে কথা নির্ভুল। পূর্বোক্ত প্রকরণগত ছেলেমানুষি তাঁর লেখার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি তাঁর বলাকা ছন্দের প্রেমের কবিতায় যেমনভাবে পাওয়া যায়, তেমন কখনো সত্যেন্দ্রনাথে দেখি না; আর সত্যেন্দ্রনাথেরও নিদর্শন তাঁর রচনায় প্রচুর। নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগলভ। তাতে পরিণতির দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবণতা নেই, আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ বোঝা যায় না। নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে, সব সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।... নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি–ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন। ... নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়।... শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথ থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন।... এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্যপথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জানালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানাদিকে, এলেন 'স্বপনপসারীর সত্যেন্দ্রদত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের অগভীর–কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য বিধর্মিতা। আর এইসব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো কল্লোল গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো। নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন, তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। (পৃঃ ১২৪–১২৬)

৩. আজহারউদ্দীন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত হয়। তখনো নজরুল সম্বন্ধে গ্রন্থাকারে আলোচনা বিশেষ হয়নি। বোধ হয় তার আগে জনতিনেক নজরুল সম্পর্কে বই লিখেছেন। আজহারউদ্দিন খানের এ দাবি, নানাদিক দিয়ে নজরুল প্রতিভার বিচার হয়ত এই প্রথম তাঁর গ্রন্থেই করা হল। এই বইটি জনপ্রিয় হয়েছিল। আমাদের এখনকার আলোচনার অবলম্বন পঞ্চম সংস্করণ। ষষ্ঠ সংস্করণ এখনো বের হয়নি। আজহারউদ্দীন খান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সমাবেশ করার চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনি অনাসক্ত দৃষ্টিতে নজরুল সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণের প্রয়াসী হয়েছেন। তবে মতে মন্তব্যে ও বিশ্লেষণে সর্বত্র প্রত্যাশিত অন্তর্দৃষ্টির সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেনি যেন। তাঁর মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের সারাংশ এখানে তুলে ধরছি ঃ

ক. নজরুল ইসলাম 'বীণাযন্ত্রে তুলেছেন দীপক রাগিনীর ঝঙ্কার। বাংলা সাহিত্যে তিনি বিপ্লবের কবিরূপে প্রসিদ্ধ, বিদ্রোহের সুর তাঁর ভাব সাধনার প্রধান সুর। তাঁর সাহিত্য সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।... একাধারে সমাজসেবা এবং সাহিত্যসেবার সম্মিলন নজরুলের পূর্বে আর কোন সাহিত্যিক তেমন সুষ্ঠুভাবে করতে পারেননি। কবি নজরুল ইসলাম নতুন যুগের নতুন গানের সূত্রধার।... তিনি এযুগের বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ... দীন অত্যাচারিতের শরীক হয়ে, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনকর্তা হিসাবে (পৃঃ ৯)।

– তাঁর বিস্তৃত আলোচনার চুম্বক হচ্ছে এ-ই। কাজী নজরুল ইসলামের বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালী জীবনে অবদান সম্বন্ধে আজহার উদ্দিনের সিদ্ধান্ত বা সামগ্রিক ধারণাই এখানে অভিব্যক্ত।

খ. নজরুল জীবনকে দেখেছেন, মানুষকে দেখেছেন, আঘাত দিয়েছেন, তাদের সমতলে নেমে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করেছেন, ...কাজেই অভিজ্ঞতার জোরে অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্য রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত হয়েছেন। প্রেম-প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর স্বকীয়তা বিদ্রোহী রূপের মত প্রখর (পৃঃ ১০৭)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. নজরুল মানুষের উত্তপ্ত হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। সময়ের প্রয়োজনকে তিনি কাব্যে লাগাতে পেরেছিলেন। সেই চঞ্চলতার যুগে নজরুল অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, প্রলয়শিখা হাতে নিয়ে বিপ্লব ও সংগ্রামকে কামনা করেছেন। সেদিন অবাক বিস্ময়ে তাঁর কথা শুধু শুনিনি, তার মতাদর্শে চলার প্রেরণা নিয়েছি। কিন্তু তাঁর সময় যখন ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে লাগল, তখন তিনিও ক্রমশঃ স্তিমিত হতে লাগলেন।... সময়ের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ফলে সময়ের পরিবর্তনে তিনি নিজেকে অসহায় ভেবেছেন। তাই তাঁর অনেক কবিতাই আজ নিষ্ফল হয়ে গেছে (পৃ. ১০৮–১০৯)।

ঘ. তাঁর ভারত ছিল 'মানুষের-মহামানুষের মহাভারত' (পৃঃ ১০৯)। তিনি মানুষের জয়গান গেয়েছেন (মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান) পথের মানুষ... যারা–সেই অশিক্ষিত, উপেক্ষিত, দলিত জনসাধারণের কবি হলেন নজরুল (পৃঃ ৯৮)।

ঙ. নজরুল বুদ্ধি-নির্ভর কবি নন, তিনি হৃদয়-নির্ভর কবি। স্বভাব কবি বলতে যা বোঝায় তিনি তা-ই। কাব্যের পরিণতির দিকে তার প্রবণতা নেই। তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন–কুড়িতে যেমন ছিলেন চল্লিশেও তেমনি রয়েছেন (পৃঃ ১২৯)। ... তবে রবীন্দ্রযুগে good poet হিসেবে তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন তা সানন্দে মেনে নিচ্ছি। কোন কোন কবিতায় ও গানে মহৎ কবিতার স্বাদও পেয়েছি (পৃঃ ১২৪)।

–এ সূত্রে জীবনানন্দ দাশের মন্তব্যও স্মর্তব্য, 'তাঁর প্রতিভা চমৎকার কিন্তু মনোত্তীর্ণ নয়।' (কবিতা ঃ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১ সন)।

চ. মোহিতলাল, নজরুল জীবনানন্দ এঁরা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু যে যাঁর নির্দিষ্ট পথ বেছে নিয়ে তাঁর প্রভাবকে ঝেড়ে ফেলেছেন।.. এ তাগিদ থেকেই মোহিতলাল দেহাত্মবাদ নিয়ে এলেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সুর তুললেন দুঃখবাদের। ... কিন্তু জাতির সঙ্কট মুহূর্তে তাঁরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াননি (যেমন দাঁড়িয়েছেন নজরুল) (পৃঃ ১১৮)... বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ হামসুন-লরেন্সীয় রক্ত-মাংসের প্রেমের মধ্যে আত্মগোপন করলেন, কেউ কেউ আবার বক্তব্যের দুর্বোধ্যতা দিয়ে নিজের চারধারে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুললেন। পশ্চিমী এলিয়টিক ভঙ্গীতে নৈরাশ্যবাদে (nostalgia) মত্ত হয়ে আসন্ন প্রলয়ের মুখোমুখি হয়েও পরিত্রাণ লাভের উপায় না ভেবে মৃত্যুই কামনা করেছেন। নজরুল এই নৈরাশ্যের মধ্যে উজ্জ্বল প্রাণের দীপ্ত আশাবাদের নব বন্যা বইয়ে দিলেন। বিপ্লবাত্মক কবিতাগুলো নিজস্ব সৃষ্টি এবং বিশিষ্ট অবদান (পৃঃ ১১৯)।

ছ. আধুনিক বাংলা কবিতা ও নজরুল শীর্ষক অধ্যায়টি সত্যি সুলিখিত। এ অধ্যায়ে নজরুলের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনই ছিল উদ্দিষ্ট। তাই আলোচনা হয়েছে তুলনামূলক। গুণ-মান-মতগত পার্থক্য থাকলেও এ অনেকটা বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' প্রবন্ধের মতোই। তাঁর চোখে সমকালীন অন্যান্য কবি ঃ

১. রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমাদের চোখের সামনে ছিলেন। সৌন্দর্যপ্রিয়তার সঙ্গে মানবপ্রীতির অনবদ্য উপস্থিতি থাকলেও সেই পটভূমির সচেতনা তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়নি (পৃঃ ১২৫)।

২. সত্যেন দত্তের নিজস্ব বাণী কিছু ছিল না, তবে ছিল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রাণপ্রাচুর্য। বাঙালী সংসারের ও বাঙলাদেশের নানা টুকিটাকি খবর তাঁর কবি প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, তাতে বেদনা ছিল, নৈরাশ্য ছিল, প্রত্যাশাও ছিল কোন কোন জায়গায়। তাই তাঁর খ্যাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি ছিল এবং পাঠকেরা তাঁকেই পছন্দ করেছে বেশি, কারণ তাঁর মধ্যে দেশের চলতি ঘটনার প্রতিফলন পেয়ে উল্লসিত হয়েছে। তিনি শ্রমিক-কৃষকের জাগরণকে স্বীকৃতি দিয়ে সাম্যবাদকে অভিনন্দন, জানিয়েছেন।...কিন্তু সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল মিন্‌মিনে ভাষা নয়,–জোরালো ঝাঁঝালো সুরের।... তাঁর কবিতায় জ্বালা ছিল না, বিপ্লবী ঘোষণা ছিল না (পৃঃ ১২৬)। এ সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' ও কালিদাস রায়ের 'কৃষাণীর ব্যথা' কবিতার অদ্রোহের কথাও বলা হয়েছে (পৃঃ ১২৯)।

৩. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সমকালীন কাব্যে মরুভূমির রুক্ষতা নিয়ে এলেন, মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে মানব সমাজের যারা ভিত্তি গড়ে তুলেছে তাদের অন্তর্জ্বালোকে ব্যঙ্গ-শাণিত কথনে রূপ দিলেন (পৃ: ১২৭)। চাষী-মজুরদের মেহনত ও কায়িক ক্লেশের কোন স্বীকৃতি বাঙলা সাহিত্যে আবেগ ও দৃঢ়তার দাবি নিয়ে নজরুলের আগে রূপায়িত হয়নি (পৃঃ ১২৯)।

৪. স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস একটি বিশ্বাসকে, একটি আদর্শকে জৈবিক বাস্তবতা ও দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিকতাকে সহজ স্বীকৃতির সাথে গ্রহণ করে নিজস্ব ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন, কারুর কাছ থেকে ধার করে গলা সাধেননি (পৃঃ ১২৬)।

৫. মোহিতলাল ভোগাত্মবাদের দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। কালা পাহাড়ের মধ্যে মানুষের জয়ধ্বনি আছে কিন্তু মানুষের প্রতি কারা অত্যাচার করেছে, তার প্রতিকার কি, এ সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন।... সমাজসচেতনতা থেকে বেশি ছিল তাঁর আত্মসচেতনতা (পৃঃ ১৩২)।

৬. নজরুল 'যুগের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। কালের দাবি... তাঁর প্রাণশক্তির অদম্য উৎসাহে সেদিন তিনি যে-দীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন সেই আগুন থেকে এখনও অনেক কবি গণ-সংযোগের মশাল ধরিয়ে নিচ্ছেন (পৃঃ ১৩৩)।

এসব কবিদের মধ্যে রয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, রাম বসু। জুলফিকারও রয়েছেন, এঁদের প্রত্যেকের কবিতাংশ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে (পৃঃ ১৩৩–৩৬)।

৭. নজরুল দেখেছেন মানুষের যুক্তিহীন বিচারমূঢ় ধর্মান্ধতা, দেখেছেন বলদৃপ্তের সীমাহীন স্পর্ধা, জাতিবিশেষের দুর্বার সাম্রাজ্যলিপ্সা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা, মানবাত্মার অপমান, নারীত্বের অমর্যাদা, সভ্যতার মুখোস-পরা ভদ্রবেশী বর্বরতা।... বিশ্বের বুকে প্রতিনিয়ত ট্রাজেডীর সৃষ্টি করে, সেই ট্রাজেডীই নজরুল-কাব্য-চিন্তার প্রধান উপজীব্য (পৃঃ ১৪২)।

৮. কবির নিজের উক্তি ঃ শুধু রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে (রাজবন্দীর জবানবন্দী।)

আজহার উদ্দিন খান সতেরোটি পরিচ্ছেদে নজরুল ও নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পরিচ্ছেদগুলোর শিরোনাম ঃ নজরুল জীবনী; নজরুলের সাহিত্যের আলোচনা; নজরুল সাহিত্যের বিচার; আধুনিক বাংলা কবিতা ও নজরুল; নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা; শিশু সাহিত্যে নজরুল; নজরুল সাহিত্যে নারী; গীতিকার নজরুল; সৌন্দর্যের কবি নজরুল; প্রেমিক কবি নজরুল; সাধক কবি নজরুল; নজরুল প্রতিভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌরুষ; শিল্পীযোদ্ধা নজরুল; দেশের মুক্তিসাধনায় নজরুল; নজরুল সাহিত্যে গণবাণী; শেলী-বায়রন-নজরুল; বাংলা সাহিত্যে নজরুল।

–সাধারণত এ ধরনের আলোচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুনরুক্তি ঘটে। এ বইতেও তা এড়ানো যায়নি। শেলী-বায়রন-নজরুল নামের পরিচ্ছেদে তুলনায় আলোচনার প্রয়াস আছে বটে, তবে সাদৃশ্য মৌলিক ও ঐকান্তিক নয়, সাধারণ ও আকস্মিক। কামের-প্রেমের ও সৌন্দর্য তৃষ্ণার আবেগ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, দ্রোহের আস্ফালন সব কবিরই কমবেশি থাকে, তাতে কবিদের একে অপরের সদৃশ হয়ে ওঠেন না। তবু লেখক বলেন, যাদের পড়াশুনার পরিধি দূর বিস্তৃত তাঁরা (নজরুলের) প্রেমের কবিতায় বায়রনের অন্তর্দাহ প্রতপ্ত আবেগ, জীবনের স্পর্শকাতর চিত্ররূপ, শেলীর আদর্শবাদের পরোক্ষ সান্নিধ্য কমবেশি অনুভব করবেন (পৃঃ ২৩৯)। যা' হোক সীমিতক্ষেত্রে লেখকের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। পরিচ্ছেদগুলোতে প্রাসঙ্গিকভাবে নজরুলের বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার উদ্ধৃতি, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন রয়েছে।

নজরুলের চরিত্র সম্বন্ধে আজহার উদ্দিন বলেন, মুজাফফর আহমদ 'কবি জীবনের ত্রুটির কথা, দোষের কথা, প্রেমের কথা, একাধিক মেয়ের সঙ্গে অমিতাচারের কথা, নীতিহীনতার কথা কিছু বলেননি।' ... নজরুল-চরিত্র যে গঙ্গাজলে ধোয়াতুলসী পাতা ছিল না... একথা তাঁর জীবনের বহু ঘটনা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে। এবং আবুল ফজলের ভাষায়, তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না, বরং পঞ্চইন্দ্রিয়ের দাস ছিলেন বলতে পারি। ভালবেসেছেন প্রাণ ঢেলে, ভালবাসা পেয়েছেনও অপর্যাপ্ত। প্রেমে পড়েছেন, প্রেমে না পড়েও প্রেম করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, প্রত্যাখ্যানও করেছেন, বিরহের অনলে নিজে পুড়েছেন, অন্যকেও পুড়িয়েছেন। এমনকি তাঁর জন্য আত্মহত্যাও করেছেন নারী।'[১]

আজহার উদ্দিন বলেন 'মেয়েদের প্রতি নজরুলের প্রচুর দুর্বলতা ছিল। (৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে বাসকালে) কোন তরুণীকে যেতে দেখলে সব কাজ ফেলে দিয়ে তাকে দেখতে থাকতেন।' –যদিও 'কবিকে পাবে নাকো তাঁর জীবন চরিতে'–রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি এখন আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে, তবু স্বীকার করতেই হবে যে, ব্যক্তিমানুষ যেহেতু দেশ-কাল আর আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক-নৈতিক শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের সৃষ্টি অর্থাৎ উক্ত সব অবস্থার ও অবস্থানের দ্বারা ব্যক্তিমানুষের ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু ব্যক্তির জীবনপ্রতিবেশ ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অবশ্যই প্রতিফলিত হয়। অতএব, কর্মের তাৎপর্য বোঝার ও মূল্যায়নের জন্যে কর্তাকে নিবিড়ভাবে জানতে বুঝতে হবে। মানতেই হবে যে নজরুল ইসলামের কামপ্রবণতা তাঁর প্রেমের কবিতার ও গানের স্বতঃস্ফূর্ত উৎস হয়ে উঠেছিল।

গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকারের প্রযত্নের ছাপ সর্বত্র দৃশ্যমান, কিন্তু কোথায়ও দৃঢ়, ঋজু ও উচ্চ কণ্ঠে তীক্ষ্ণ শব্দ ও তীব্র ভাষায় তাঁর মত ও মন্তব্য যেন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না। যেমন নজরুল রচিত শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য–'শিশুকে কেন্দ্র করে নজরুল যত কবিতা লিখেছেন, তাদের উৎস হচ্ছে শিশুর প্রতি তাঁর হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা।' –এ ঢালাও কথার তাৎপর্য কি? তেমনি নারী সম্বন্ধে নজরুলের মনোভাব ছিল তার ধারণায়, "নজরুল নারীর রণরঙ্গিনী মূর্তিই কামনা করেননি, তাকে প্রেমময়ী বধূ, স্নেহময়ী জননী ও

---

১. আবুল ফজলের প্রবন্ধ : নজরুল জীবনীর উপকরণ–সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয়দয়িতারূপেও চিত্রিত করেছেন।”–এ উক্তিতে নারী সম্পর্কে কবি হিসাবে নজরুলের কি বিশেষ গুণ প্রকাশ পেল, যা অন্য কবিতে দুর্লভ! অন্য পরিচ্ছেদগুলোর আলোচনাও এমনি অনুজ্জ্বল।

৪. ডক্টর সুনীল কুমার গুপ্ত রচিত 'নজরুল চরিতমানস' (দে'জ সংস্করণ ১৯৭৭ সন এপ্রিল) ঃ

এ গ্রন্থে বিষয় বিন্যাস এরূপ ঃ প্রথম ভাগ ঃ ১ম অধ্যায় ঃ নজরুল যুগ, ২য় অধ্যায় ঃ নজরুল জীবন। দ্বিতীয় ভাগ ঃ ১ম অধ্যায় ঃ কবি নজরুল, ২য় অধ্যায় ঃ অনুবাদক নজরুল, ৩য় অধ্যায় ঃ শিশু সাহিত্যে নজরুল, ৪র্থ অধ্যায় ঃ নজরুলের উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ও প্রবন্ধ, ৫ম অধ্যায় ঃ নজরুলের সাংবাদিকতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ গীতিকার ও সুরকার নজরুল। তৃতীয় ভাগ ঃ ১ম অধ্যায় ঃ নজরুলের উত্তরাধিকার, ২য় অধ্যায় ঃ বাঙলার সংস্কৃতি জীবনে নজরুলের অবদান, ৩য় অধ্যায় ঃ নজরুলের উত্তর সাধক। অতএব আলোচনা যে সর্বাত্মক তা মানতেই হবে। 'নজরুল যুগ' আলোচনার শুরু ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ও সংক্ষিপ্ত বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা দিয়ে। কাজেই সুবিস্তৃত পটের এ আলোচনা মূল্যবান এবং প্রায় প্রাসঙ্গিক হয়েছে। যদিও নজরুল ইসলামের মানস ও সাহিত্যকৃত পরিমাপের জন্যে অত গোড়ায় ও গভীরে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন ছিল না।

ডকটর সুনীল কুমার গুপ্ত তাঁর এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৯৬০ সন) প্রথম অনুচ্ছেদেই নজরুল সম্বন্ধে তাঁর মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, গ্রন্থ মধ্যে তাঁর সে-ধারণাই কেবল যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রমাণসিদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন ঃ

AMARBOI.COM

১. নজরুল ইসলামের জীবন যেমন বিচিত্র, তাঁর প্রতিভাও তেমনি বহুমুখী। আধুনিক বাংলা কাব্য ও সঙ্গীতের ইতিহাসে নজরুল নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ অধ্যায়ের যোজনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সবচেয়ে নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কণ্ঠ তাঁরই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বর্তমান শতাব্দীতে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে নজরুল সর্বপ্রধান কবি। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে অতি আধুনিক বাংলা কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র একটি নিজস্ব গতিপথ খুঁজে নিতে সাহায্য করার প্রতিভা নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নজরুল অন্যতম। এই যুগে পরাধীন সমস্যা পীড়িত ও দ্বন্দ্ব জর্জরিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাস্পৃহা, বিদ্রোহ, নৈরাশ্য ইত্যাদি নানাবিধ ভাবতরঙ্গ সবচেয়ে সার্থকভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। নজরুল বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণ করি। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগে গীতিকার ও সুরকার হিসেবেও তিনি একটি অতি মহৎ আসনের অধিকারী। এক্ষেত্রেও জনপ্রিয়তার বিচারে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। এছাড়াও নজরুল প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে, বিদেশী কাব্যের অনুবাদে ও সাংবাদিকতায়। এমনকি গায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও অভিনেতা রূপে তাঁর পরিচিতি অনেকেরই অজানা নয়। বর্তমান যুগে এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকর্মীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

– এ মূল্যায়নের মধ্যে স্পষ্টত আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। গুণে মানে মাহাত্ম্য সমকক্ষ না হলেও বহুমুখিতায়, বিচিত্রতায়, সর্বাত্মকতায়, নবযুগ সৃষ্টিতে নজরুলের মধ্যে ডকটর সুনীল কুমার গুপ্ত রাবীন্দ্রিক শক্তির বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. রবীন্দ্র প্রভাবের গভীরতা ও প্রখরতা বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথের সঙ্গেই নজরুল মানসের ভাবধারা ও প্রকাশরীতির অন্তরঙ্গ সহৃদয়তা আবিষ্কার করা যায় (পৃঃ ২৬)।

৩. ১৯০৫ সনের 'বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলন' যুগের রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীত বিদ্রোহপ্রবণ নজরুল চিত্তকে প্রচুর পরিমাণে প্রেরণা যুগিয়েছে সন্দেহ নেই (পৃঃ ২৬)।

– আকস্মিক যোগাযোগ ও সাদৃশ্যকে প্রভাব বলে বিশ্বাস করার মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা। কাজী আবদুল ওদুদ ও নজরুলের উপর বলাকার কবিতাগুলোর প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজ হিতৈষণা ও মানব কল্যাণ দর্শন আর নজরুলের শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কার ও পীড়ন-শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক সাম্য আর স্বাধীনতার দাবি সম্পূর্ণ ভিন্নদৃষ্টির প্রসূন।

৪. সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম মহাসাম্যের গান গেয়েছেন, শ্রমিক শক্তির বন্দনা করেছেন। তিনিই প্রথম লিখেছেন শ্রমিক ধর্মঘটের উপর কবিতা। নজরুলের পূর্বসূরির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কাছেই নজরুল বোধ হয় সবচেয়ে বেশী ঋণী।

– এ ধরনের মতে-মন্তব্যে ও সিদ্ধান্তে কেবল গতানুগতিকতাই আছে, এর ভিত্তি হচ্ছে পূর্বসূরির সদৃশ কর্মের নির্বিচারে প্রভাব স্বীকারের রেওয়াজের আনুগত্য মাত্র। ডকটর গুপ্ত এমনি রেওয়াজ বশ্যতার দরুন নজরুলের উপর জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্যেও গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত থেকে মুকুন্দ দাস অবধি সবার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এ ধরনের প্রভাবে গুরুত্ব দিলে আদমের কাল থেকে পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু হয়েছে, তার প্রভাব প্রতিটি মানুষের উপর জন্মকাল থেকেই যে পড়েছে তাও উল্লেখ করতে হবে। অতএব বলেছি, ঢালাওভাবে এমনি কারণ-কার্য আবিষ্কার নিরর্থক বলেই মানতে হবে। মানুষ স্বদেশের স্বকালের স্বপরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে, ঘরেবাইরে অর্থ বিত্ত শিক্ষা সংস্কৃতি শাস্ত্র সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যার যেমন ও যেখানে অবস্থান, তার মন-মেজাজ, রুচি ও জীবন-চেতনা আর জগৎভাবনা তেমনিভাবে ও অবস্থান অনুসারে বেড়ে ওঠে। কাজেই মানুষের জীবনের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা ও তার আর্থ-সামাজিক নৈতিক-শৈক্ষিক-শাস্ত্রিক অবস্থান অনুসারেই জাগে ও রূপ পায়। এক অবচেতন প্রয়োজন প্রেরণায় জাগে সুখস্বপ্ন, অনুকূল প্রতিবেশে তাই দেখা দেয় আকাঙ্ক্ষারূপে, এর পূর্তিবাঞ্ছাই প্রয়াসে হয় রূপায়িত। প্রতিপক্ষ থেকে আদায় করতে হলে প্রয়াস দাবির ও সংগ্রামের রূপ পায়। যেহেতু মানুষের মানসপ্রবণতা অভিন্ন ও সমমাত্রার নয়, সেহেতু লক্ষ্যগত কিংবা প্রয়াসগত সাদৃশ্য প্রভাবের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় না, বরং প্রেম, প্রীতি, ঘৃণা বিদ্বেষ জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতার স্পৃহা, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ, দ্রোহ ও লড়াই করার সাহস প্রভৃতি ব্যক্তিগত মানসপ্রবণতার ফল। এগুলো কেউ দেখে দেখে শেখে না। –দেখেতো সবকিছুই, কিন্তু গ্রহণ বা অনুকরণ করে কয়টি। কারণ মনের ঝোঁক ও রুচির সায় না থাকলে কেউ-ই ভালো বা মন্দ বিবেচনা করে মূল্য বুঝে কিছু গ্রহণ-বরণ করে না। কাজেই আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রভাব খুঁজে বেড়ানোর সার্থকতা সামান্য। অনুকারক কখনো সার্থক স্রষ্টা বা শিল্পী হতেই পারে না। নজরুল ইসলাম তাঁর সর্বপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসামর্থ্য নিয়েও যে অনন্য, তা স্বীকার করার পর প্রভাব সন্ধান শ্রমের অপচয় মাত্র। যেমন ডক্টর গুপ্ত নিজেই আবার পরমুহূর্তে তাঁর পূর্বের মত খণ্ডন করেছেন, বলেছেন, "প্রগতিমূলক চিন্তাধারা সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক কবিতায় প্রথম নিয়ে এলেও সেই চিন্তাধারার উৎস যতটা ভাবকল্পনার ততটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিল না। নজরুলের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যচিন্তা ও বক্তব্যকে সত্যেন্দ্রনাথের চাইতে অনেকক্ষেত্রে বহুগুণে তীব্র ও গভীর করে তুলেছে।... সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্রোহের সুরকে নজরুলই জাতির মর্মমূলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। (পৃঃ ২৭)।

অতএব সমমর্মিতাজাত সাদৃশ্য মাত্রই প্রভাব নয়। বরং বলা যায় অভিন্ন প্রতিবেশে সমরুচির মানুষ অভিন্ন সমস্যার ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে মাত্রাভেদ থাকলেও অভিন্ন রূপ আচরণ করে। এ হচ্ছে মননশীল হলেও মানুষ প্রজাতির প্রাণিসুলভ স্বাভাবিক আচরণ। এক প্রকার মানবিক অভিব্যক্তি, প্রভাব নয়।

৫. সমাজ-সচেতনতার ক্ষেত্রে ভাব ও ভঙ্গিতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের একাত্মতা অনুভব করা যায়, যদিও নজরুল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আবেগে অধিকতর দীপ্ত ও স্বাভাবিক। ডকটর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন–"সত্যেন্দ্রনাথ এমনই করিয়া যে ছন্দে সাম্যের গান গাহিলেন, যতীন্দ্রনাথ যে ছন্দে একহাতে শোষণ ও অন্য হাতে তোষণের ভণ্ডামিতে বিদ্রূপের শরবর্ষণে নির্মম আঘাত করিলেন কিছু পরে কাজী নজরুল ইসলাম সেই একই সুরে একই ছন্দে সাম্যের গান গাহিয়াছেন।" উদ্ধৃতি ডকটর গুপ্তের, কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায় ঃ ১৯৫৫ সন, পৃঃ ২৪০)। কিন্তু যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ভাব পরিমণ্ডলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল নজরুল তাকে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বমুখর ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেন (পৃঃ ২৭)।

– বলা বাহুল্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রচলিত নিয়মে ওই প্রভাবই সন্ধান করেছেন, এবং সাদৃশ্য আবিষ্কার করে তৃপ্ত হয়েছেন। ছাত্রজীবনে কবি পরিচিতির পৃষ্ঠা পাঠ করে এমন ধারণা হত 'অক্ষয় কুমার দত্তের পৌত্র বলেই যেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবি হয়েছিলেন, মধুসূদনের জ্ঞাতিদাদা কবি ছিলেন বলেই যেন মধুসূদন কবি হলেন, যেন কোন কবি-লেখকের আত্মীয়-স্বজন না হলে লেখায় কারুর অধিকার জন্মায় না। –এসব প্রভাব তত্ত্বও তেমনি প্রশ্ন মনে জাগায়, পূর্বসূরির প্রভাব ব্যতীত কিছুই কি হয় না! ডকটর সুশীলকুমার গুপ্তের পুনরাবৃত্তি দোষসুলভ।

উনিশ শতকেই ইংরেজি শিক্ষালাভের ফলে যে য়ুরোপীয় জীবন-চেতনা বাঙালীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হল তাতে বহুবিবাহ, বিধবাসমস্যা, কৌলীন্য প্রথা, মদ্যাসক্তি, লাম্পট্য প্রভৃতি নিয়ে কোলকাতার শিক্ষিত বাঙালীরা প্রায় আড়াইশ' তিনশ' নাটক প্রহসন কবিতা লিখেছেন। এ হচ্ছে স্বকালের সমস্যায় সাড়া দেয়া, কেউ কারুর প্রভাবে পড়া নয়। এখানে প্রভাব সন্ধান করলে বিড়ম্বিত হতে হবে।

৬. প্রেম ধারণার ক্ষেত্রে মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের নৈকট্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। মোহিতলালের মানবিক প্রেম আধ্যাত্মিকতার আবরণ ত্যাগ করে দেহাত্মবাদের মহিমাকীর্তন করেছে। নজরুলের মানবিক প্রেম অনেক স্থলে স্বভাবসুলভ দেহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। মোহিতলালের গতানুগতিকতার প্রতি বিদ্রোহ ও মানুষের সহজবিশ্বাসের প্রতি অনাস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে নজরুলের কাব্যে তরঙ্গ তুলেছে। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের মতো নজরুল রুদ্রদেবতা মহাদেবকে বিদ্রোহের নায়ক বলে বন্দনা করেছেন (পৃঃ ২৮)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কথায় কথায় এ রকম তুলনামূলক আলোচনা কি মূল্যায়নের সহায়ক হয়? মোহিতলালের নিজের কথা, 'আমার পিরীতি দেহরীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত ভস্মভূষণ কামের কুহকে দেখা দিল স্মরজিৎ/ দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন সংগীত।' নজরুলেও চিরজনমের প্রিয়া, চিরপূজারিণী প্রভৃতি বিভ্রান্তিকর উক্তি রয়েছে। আর প্রভাব যদি দেখাতেই হয়, তাহলে বিদ্যাপতির আদি রসাত্মক পদেরই প্রভাব দেখানো ভালো। দুনিয়ার কোন্ কথা কোন্ ভাব আগে কোন না কোন ভাবে প্রকাশ পায়নি যে এ যুগে কেউ নতুন কথা বলবে। কাজেই সবটাই এবং সবকিছুই বহু পুরাতন কথা। কেবল নতুন ভাষায়, ভঙ্গিতে, প্রতিবেশে ও তাৎপর্য আর প্রয়োগেই কথা বার বার নতুন হয়ে উঠেছে মাত্র।

৭. নজরুল নিপীড়িত পরাধীন ও আর্তজনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-বেদনা প্রকাশের জন্য জাতীয় চারণ কবির স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন (পৃঃ ২৯)— এই যুগে যে তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে আধুনিকতা অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে তিনটি হচ্ছে কল্লোল, কালিকলম ও প্রগতি। এই তিনটি পত্রিকার সঙ্গেই নজরুলের আন্তরিক যোগাযোগ ছিল (পৃঃ ৩১)।...নজরুল এই (কল্লোল) গোষ্ঠীর একজন হয়েও নিজের প্রতিভাকে ... এই মহত্তর সংগ্রাম-চেতনার ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন (পৃঃ ৩২)।—এ বিষয়ে বোধ হয় কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না।

৮. নজরুল প্রকৃত কবি ধর্মের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর কাব্য বৈচিত্র্যে নতুন, স্বতঃস্ফূর্ততায় স্বাভাবিক ও ভাবাবেগে বেগবান। একদিকে যেমন দেশপ্রেমের উন্মাদনা ও অন্যায় লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর সৃষ্টিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে, অপরদিকে তেমনি বিরহ মিলন ও রাগানুরাগকে নিয়ে তিনি জীবনের কোমল মধুর রূপের মহিমা কীর্তন করেছেন' (পৃঃ ৯৫)। এ কথাগুলো অস্থানে অযথা পুনরুক্ত হয়েছে।

৯. অগ্নিবীণা, বিশের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনযা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা প্রলয়শিখা—কবির বিদ্রোহী রূপ এগুলির মধ্যে প্রধানত পরিস্ফুট। দেশপ্রেম, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে কবির বিক্ষোভ, নৈরাশ্য, আশা ইত্যাদি কাব্যরূপ নিয়েছে। দোলনচাঁপা, ছায়ানট, পুবের হাওয়া, সিন্ধু হিন্দোল ও চক্রবাকের মধ্যে কবির প্রেমিক রূপই বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত (পৃঃ ১০৩)।

— আজহারউদ্দীন খানের মতো ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্তও নজরুলের ঐতিহ্য স্বাধীনতা প্রীতির সাদৃশ্য খুঁজেছেন শেলী ও বায়রনে। এ আলোচনা নিরর্থক বলব না, তবে চেতনা ও উৎস অভিন্ন বলেই দুনিয়ার সর্বত্র কবিদের স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, স্বাধীনতার বা দাসত্ব মুক্তির কামনা এমনিভাবেই—মাত্রার ও লাবণ্যের এবং ভঙ্গীর পার্থক্য সত্ত্বেও অভিব্যক্তি পায়। সে জন্যেই কেউ কারুর থেকে কিছু ধার করছে, বলা যাবে না।

'পূজারিণী' কবিতা আলোচনা সূত্রেও তিনি দেশী-বিদেশী কবির কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্য স্মরণ করেছেন। এতে অবশ্য আলোচনা সুখপাঠ্য হয়েছে এবং অভিন্ন বিষয়ে মানুষের অনুভূতি আর উপলব্ধি মাত্রা ও ভঙ্গিভেদ থাকলেও যে প্রায় অভিন্ন হয়ে যায় এসব আলোচনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য নজরুলের কোন কোন কবিতা "Walt Whitman"-এর প্রত্যক্ষ অনুসরণে যে রচিত তা' অস্বীকার করা যাবে না। বিদ্রোহী (Song of myself) অগ্রপথিক (pioneers) কবিতা এসূত্রে স্মর্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. নজরুলের প্রেম মোহিতলালের প্রেমের মতো গভীরতাসমৃদ্ধ, ধনৈশ্বর্য ভূষিত ও প্রমত্তগতি না হলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জ্বালায় তা বেদনামধুর, আবেগস্পন্দিত ও প্রাণবন্ত। 'পূজারিণী' প্রভৃতি খুব স্বল্প সংখ্যক কবিতাতেই নজরুল সার্থকভাবে তাঁর প্রেম-সিদ্ধান্তকে উপস্থিত করতে পেরেছেন।... কোন কোন ক্ষেত্রে কামাবেগের দাসত্ব বন্ধন স্বীকার করাতে তাঁর কবিতা Sensuousness-এর মাত্রা ছাড়িয়ে sensual হয়ে উঠেছে (পৃঃ ১৩৪)। নজরুল প্রেমের অমরতায় বিশ্বাসী (পৃঃ ২০৩)।–এ অবশ্যই স্মৃতির অমরতা। প্রেম সঙ্গীতে নজরুলের কীর্তি সর্বজন স্বীকৃত (পৃঃ ৩৫৮)। নজরুলের মানবিক প্রেম দেহস্পর্শ প্রতপ্ত।.. মানবিক প্রেমের ক্ষেত্রে নজরুলের সবচেয়ে বড় পূর্বসূরি গোবিন্দদাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও মোহিতলাল মজুমদার। তবে নজরুলের দেহকেন্দ্রিক প্রেমের ভিতরে যে তোপোন্মুখতা, যে দেহস্পর্শ মুখরতা, যে তীব্র মদিরতা দেখা যায়, তার তুলনা পাওয়া ভার (পৃঃ ৩৪৯)।

১১. নজরুলের সাম্যবাদ তাঁর অন্তরেরই প্রেরণালব্ধ জিনিস–শরীর প্রেমের কবি নজরুলের পক্ষে এই ছিল স্বাভাবিক ও নিজস্ব কবি-কল্পনার রঙে রঙিন। গভীর ও ঘনিষ্ঠ মানবতাবোধই এই সাম্যবাদের ভিত্তি (পৃঃ ১৬৮)।

–এর সঙ্গে মার্কস-ব্যাখ্যাত সাম্যবাদের সম্পর্ক নেই। তাছাড়া নজরুলের সাম্যের গান ও কবিতা যতটা আবেগতাড়িত, তার সিকি পরিমাণও উপলব্ধিজাত নয়। তাই এ ধরনের মত ও কবিতা জীবনব্যাপী সাধনার ও অনুসৃত আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল না–তিনি সরে গিয়েছিলেন।

১২. নজরুল আবেগপ্রধান কবি বলে কাব্যের বহিরঙ্গ গঠনে তাঁর কৃতিত্ব অন্তরঙ্গ নির্মাণ নৈপুণ্যের তুলনায় কম।... নজরুলের ভাষা লক্ষণীয় পরিমাণে বেগবান, শাণিত, সংগ্রামমুখর ও বলিষ্ঠ।... তাঁর পূর্বে ভাষার ঠিক এই ধরনের সংগ্রামশীল মূর্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না (পৃঃ ২২৫)। শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে নজরুল দেশী-বিদেশী, তৎসম-তদ্ভব প্রভৃতি সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রেই অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন (পৃঃ ২২৬)।

১৩. নজরুল যৌগিক ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দে নজরুল যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। যৌগিক ছন্দে নজরুলের শক্তি সীমিত (পৃঃ ২২৮)। নজরুলও... কাব্যদেহকে অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। শব্দালঙ্কারের মধ্যে ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি এবং অনুপ্রাসের ব্যবহার নজরুল কাব্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায় (পৃঃ ২৩১)।

১৪. নজরুলের আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তার ভিত্তির উপর রচিত (পৃঃ ৩৫১)।

–লেখকের এ সিদ্ধান্ত যথার্থ বলে মনে হয় না। নজরুল ছিলেন একাধারে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ও বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যে আস্থাবান। ব্রিটিশ বিরোধিতার ভিত্তিতে তিনি অভিন্ন ভারতীয় তথা বাঙালী জাতীয়তায় রাজনৈতিকভাবে ছিলেন দৃঢ়বিশ্বাসী। কাজেই বলা যায় একাধারে তিনি ছিলেন ভারতীয়, বাঙালী ও মুসলমান। কোন আস্তিক মানুষই 'ধর্মভেদ' ভুলতে পারে না, পারে না জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম ও ভাষাভেদ ভুলে থাকতে। মনের গভীরে ভেদজ্ঞান সুপ্ত থাকেই। ইহপরলোকে প্রসারিত জীবন নিয়ন্ত্রক বলেই শাস্ত্র-মানা মানুষ কখনো ভাষার, স্থানের ও স্বার্থের ভিত্তিতে একজাতি হয়ে ওঠে না–প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হয় মাত্র। এবং বিভেদের প্রাচীরও সাময়িকভাবে সরায় মাত্র। শিয়া-সুন্নী, আহমদী-বাহাই-হিন্দু-শিখ-প্রোটেস্টান্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথলিকের স্বাতন্ত্র্যচেতনা এবং গোত্রের ও বর্ণের বিভেদ আজো বহু বহু পার্থিব জীবন সমস্যার উৎস।

১৫. ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্তের মতে যাঁদের উপর কাজী নজরুল ইসলামের লঘু-গুরু প্রভাব পড়েছে বা রয়েছে সে-সব কবি হচ্ছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪–৮৮), জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯–৫৪), বিমল চন্দ্র ঘোষ (১৯১০ খ্রীঃ), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬–৪৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ খ্রীঃ), দিনেশ দাস (১৯১৫ খ্রীঃ), গোলাম কুদ্দুস (১৯২০ খ্রীঃ), বেনজীর আহমদ (১৯০৩–৮৩), ফররুখ আহমদ (১৯১৭–৭৪), তালিম হোসেন (১৯১৮ খ্রীঃ), শামসুর রাহমান (১৯২৯ খ্রী)।

ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্তের তুলনামূলক আলোচনার দিকেই ঝোঁক বেশি। তাঁর আলোচনা সুখপাঠ্য হলেও, সমালোচকসুলভ তীক্ষ্ণ রসবোধের ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অভাব রয়েছে তাতে। তাছাড়া বিভিন্ন কবিতায় ও অধ্যায়ের আলোচনায় পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে ঘন ঘন। তবু সামগ্রিকভাবে এ বই নজরুল সাহিত্যের নিষ্ঠ পরিচায়ক।

৫. সৈয়দ আলী আহসান 'কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা' [ভারত সং ১৩৭৮ সন] নামের সংকলন গ্রন্থে 'নজরুল ইসলাম' নামে নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী, ছন্দ, ভাঙ্গার গান, যুগবাণী, মরুভাস্কর, বনগীতি, জুলফিকার, ফণিমনসা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধাকারে আলোচনা করেছেন, তা'ছাড়া 'নজরুল ইসলাম' নামে তাঁর একখানা বইও রয়েছে।

AMARBOI.COM

সৈয়দ আলী আহসান মুখ্যত ভাববাদী রোমান্টিক কবি। তাঁর গদ্যরীতিতেও থাকে অমূর্তভাবের ও আবেগের বিশেষ কাব্যিক ব্যঞ্জনা, তাতে তিনি অনবরত তথ্য নির্মাণের ও তত্ত্ব আবিষ্কারেরও আনন্দিত প্রয়াস চালান। শব্দের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগের ফলে তাঁর বক্তব্য কখনো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থবহ মূর্তিময় বাণীরূপ লাভ করে না। এক রকম হাওয়াই ধোঁয়াটে ভাব, তথ্য ও তত্ত্ব তাঁর রচনায় আবরণ ও আভরণরূপে জড়িয়ে থাকে। ফলে বক্তব্য হেঁয়ালি হয়ে ওঠে। পাঠক মৌহূর্তিক মোহ অন্তে বক্তব্যের নির্যাস আবিষ্কারে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। তবে মানতেই হবে ভাব সূক্ষ্ম কিংবা সাংকেতিক হলেও তাঁর ভাষা ও ভঙ্গি অবশ্যই মনোরম ও শ্রুতিমধুর। কাজী নজরুল ইসলামের কৃতি-কীর্তি সম্বন্ধে সৈয়দ আলী আহসানের সাধারণ মন্তব্য ঃ

১. একদিন স্থির প্রবহমান সময়কে তিনি আবর্ত-সঙ্কুল করেছিলেন।

২. বেদনা ও করুণতাকে জীবন্ত করেছিলেন সংঘাত ও সঙ্কটের মধ্যে।... সময়ের দাবি তিনি মেনেছিলেন। পরিবেশ যা দাবি করেছিল, কাছের মানুষের যা ছিল কাম্য, তিনি তাই এনে দিয়েছিলেন (পৃঃ ১৬৬)।... যে কারণে নজরুল সকলের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, তা হলো সাময়িক আদর্শবিলাস। এ আদর্শবিলাস হল প্রথমত নিপীড়িতের প্রতি মমত্ববোধ, দ্বিতীয়ত, দেশের স্বাধীনতার জন্যে একটি উদগ্র আবেগ (পৃঃ ১৬৭)।

৩. তিনি কোনো দীর্ঘ কবিতার ভাবগত সম্পূর্ণতা অথবা পারম্পর্য বজায় রাখতে পারেননি। চরণের সৌকর্য অথবা স্তবকের মাধুর্যই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। চঞ্চল হয়েও তিনি তন্ময় ও দীপ্ত ভাবুক (পৃঃ ১৭০)

৪. নজরুল কাব্যে এ ঐতিহ্য বিচিত্র রূপা। সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্র কখনও তা হিন্দু পৌরাণিকবোধকে আশ্রয় করেছে, আবার কখনও পারসিক ঐশ্বর্যবিলাস ও আনন্দের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরণ করেছে। (কবিতার কথা পৃ ঃ ২০)... রামায়ণ মহাভারত ভাগবত কিম্বদন্তীর ঐতিহ্য অপূর্বভাবে নজরুল ইসলামের কল্পনায় প্রবাহিত হয়েছে (ঐ. পৃঃ ২১)। ... নজরুল ইসলাম যৌবনের উল্লাসকে নিরীক্ষণ করেছেন ইরানী ঐশ্বর্যের রশ্মিরেখায় (পৃঃ ২৩)।

৫. নজরুল ইসলাম আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর আপন কবিসত্তার বিকাশের প্রয়োজনে, ধর্মবোধের প্রবণতায় নয় (ঐ, পৃঃ ২৬)।

– লেখকের এ উক্তির তাৎপর্য কি? ধর্মবোধ মুসলিম বলেই তো ইসলামী শাস্ত্র ও সংস্কৃতির উদ্ভবক্ষেত্রে আরব-ইরানের ভাষায় ও ঐতিহ্যে ছিল নজরুল ইসলামের আকর্ষণ।

৬. এরপর 'বিদ্রোহী' আলোচিত হয়েছে। এ আলোচনায় নজরুলের উপর Walt Whitman-এর প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টাই পেয়েছে প্রাধান্য। তুলনামূলক আলোচনায় জ্ঞানের ব্যাপ্তির পরিচয় মেলে বটে, তবে রসদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কিংবা বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ও গভীরতাজাত মূল্যায়ন অবহেলিত হয়। উদ্ধৃতিবহুল আলোচনায় কীটস-শেলীও ঠাঁই পেয়েছেন। লেখকের সিদ্ধান্ত এই ঃ Whitman'-এর প্রভাব নজরুল ইসলামের উপর অত্যন্ত বেশি, স্পষ্ট, দীপ্ত ও প্রত্যক্ষ। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যৌবনের আবেগ যেখানে তাঁর কাব্যের উপপাদ্য হয়েছে, সেখানেই তিনি Whitman-কে অনুসরণ করেছেন নিঃসঙ্কোচে (পৃঃ ১৮৭)।

৭. 'ভাঙ্গার গান' সম্বন্ধে লেখক কবি আলী আহসানের মন্তব্য, জীবনের উপজীব্য যেখানে অনাকাঙ্ক্ষা প্রহরের দাবি মেটানো, যেখানে মানুষ অধিকারের প্রশ্ন তোলে না, যেখানে মানুষের সমস্ত চিন্তার গতি শুধু মন্থরতায় স্বল্পায়ু জীবনের কামনা-বাসনার আবর্তে বিলীন হয়, সেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া অন্যকিছু আশা করা চলে না।

নজরুলের 'ভাঙ্গার গান' এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাম্য। দুর্দশাগ্রস্ত জাতির জন্যে এ গান মুক্তির গান নয়–এ গান শাসনক্ষেত্রের অধিকারীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভের গান (পৃঃ ২০৭)।

৮. 'মরুভাস্কর্য' কাব্যের অহঙ্কার ও গানের বই 'বনগীতি' আর জুলফিকার সম্বন্ধেও রয়েছে উদ্ধৃতিবহুল মামুলি আলোচনা। আর ফণিমনসা সম্বন্ধে রয়েছে বিরূপ মন্তব্য, 'নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর সাংবাদিকতার জন্য। মানুষের প্রতি সাধারণ সমষ্টিগত অনুভূতির কাছেই তিনি আবেদন এনেছেন' (পৃঃ ২২৯)।

৬. নজরুল প্রতিভা ঃ মোবাশ্বের আলী, ১ম সং ১৯৬৯ সন।

অধ্যাপক মোবাশ্বের আলীর 'নজরুল প্রতিভা' গ্রন্থে রয়েছে দশটা প্রবন্ধ ঃ জীবন শিল্পী নজরুল, নজরুল কাব্যের পটভূমি, নজরুল মানস, নজরুলের রোমান্টিকতা, ঐতিহ্য এবং নজরুল কাব্য, নজরুল কাব্যে প্রেম, প্রকৃতির কবি নজরুল, নজরুল কাব্যে নারী, নজরুলের মরমীবাদ ও নজরুল প্রতিভা।

প্রথম প্রবন্ধে নজরুলের জীবনকথা তথা কবিজীবনের প্রধান ঘটনাগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোন তথ্যপঞ্জী বা আকর গ্রন্থের উল্লেখ নেই। তবে কৃচিৎ কারুর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে। লেখকের লেখার গুণে ও বিন্যাসের নিপুণতায় কবির মন, মেজাজ ও মনন সমৃদ্ধ একটা প্রায়-কেজো ধারণা মেলে। এতে কিছু তথ্যের ভুল আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. এক অজ্ঞাত কারণে বিয়ে হতে না হতেই বিচ্ছেদ হয় (পৃঃ ১০)। –বিয়ের আগে কাবিনের শর্তগুলো নির্ধারিত হয় এবং কাবিন লেখা ও সই হয়। কাজেই 'ঘর জামাই' থাকার শর্ত নিয়ে মতবিরোধ হওয়াতেই নজরুল দৌলতপুর ছেড়ে বিয়ের রাতেই হাঁটা পথে কুমিল্লা রওয়ানা হন। অতএব নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিয়েই হয়নি। যাঁরা বিয়ে হয়েছিল বলে লিখেছেন বা বিশ্বাস করেন, তাঁরা উক্ত বিয়ের রীতি নিয়মে গুরুত্ব দেননি। এক্ষেত্রে কমরেড মুজফফর আহমদ গৃহীত সন্তোষ কুমার সেনের সাক্ষ্য, যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই– কেন মনে রাখ তার গানটি, বিরজা সুন্দরীর মন্তব্য এবং নার্গিসের চিঠির উত্তরে স্বয়ং কবি নজরুল ইসলামের লিখিত জবাবকেই তথ্য প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করতে হবে।[১]

২. রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা, আঘাত-অবহেলায় তিনি ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারালেন এবং অপ্রকৃতস্থ হয়ে উঠলেন (পৃঃ ২৩)। –অপ্রকৃতস্থ হওয়ার একমাত্র কারণ রোগ এবং তা ছিল সিফিলিস।

৩. নজরুলের বাড়িতে হিন্দুয়ানী আচার ও ভাষা চালু ছিল বলে এবং নজরুল হিন্দু-মুসলিম মিলন সমন্বয় প্রয়াসী ছিলেন বলে, লেখকের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে এবং বলেছেন, 'কিন্তু দুই ভিন্ন ধর্ম এবং ধর্মজাত সংস্কৃতির মধ্যে যে মূল বিরোধ তা তিনি কোন দিন উপলব্ধি করতে পারেননি (পৃঃ ২৮/২৬–২৭)।

– লেখকের এ ধারণা ভুল। কোন শাস্ত্র-মানা মানুষেই যে ভিন্ন শাস্ত্রানুগত মানুষকে (ব্যক্তিগত প্রেমে বন্ধুত্বে অবশ্য সম্ভব) অভিন্ন স্বার্থ বশেও আপনা বা স্বজন ভাবতে পারে না, তা' নজরুলের অজানা ছিল না, কিন্তু সমস্বার্থে সহাবস্থানের প্রয়োজনে সহিষ্ণুতায় বাস অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক বলেই তিনি মনে করতেন, তাই তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'

৩. 'নজরুল কাব্যের পটভূমি' আলোচনায় লেখক উনিশ শতকও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু নজরুল কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেননি। নজরুল সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ঃ 'নজরুল ইংরেজ আমলের বাংলা কাব্যে শেষ প্রতিভাধর কবি। এবং উনিশ শতকের নবজাগরণের যে প্রধান সূত্র মানববাদ, তা তাঁর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহিমায় অপার বিশ্বাসী। এদিক দিয়ে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর সাধক (পৃঃ ৩৬)।

৪. নজরুল রোমান্টিক কবি (পৃঃ ৪২)।... নজরুলের কল্পনা সর্বত্র উর্ধ্বগ নয় বলেই তাঁর অন্তরে যে ক্লেদ, গ্লানি ও পীড়া ছিল এরই নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ ঘটেছে কাব্যে। এ জন্যেই তাঁর সৃষ্ট কাব্যজগৎ সর্বতোভাবে সুন্দর বা মনোহর নয়, বরং এক অযত্ন-লালিত, অপরিপুষ্ট ও অবচেতন মনের পরিচায়ক। নজরুলের মধ্যে যে মানুষের মহিমা কীর্তিত হয়েছে সে মানুষ অতিমাত্রায় সাধারণ (পৃঃ ৪৪)।... নজরুলের মধ্যে যুগের যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত-সঙ্কট প্রকটিত হয়ে উঠেছে। যুগের এই অস্থিরতা, উন্মাদনা, জটিলতা ও

---

১. মুজফফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা পৃঃ ১০৮–৩৯ (পৃঃ ১১৩, ১২৩)। 'কবির মনে জগৎ-এ'-এর পাদটীকায় উদ্ধৃত হায়াৎ মামুদের সাক্ষ্যও এ সূত্রে স্মর্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধিতা কবি নজরুলের মধ্যে প্রতিফলিত। তাই তিনি এত অস্থির, এত উন্মাদ, এত স্ববিরোধী ও রহস্য সংসক্ত (পৃঃ ৪৪)।

৫. 'নজরুল-মানস' পরিচিতি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, নজরুলের 'স্বাতন্ত্র্য' তাঁর চাল-চলন, হাবভাব, কথাবার্তা, বেশ-ভূষা, খেয়াল-খুশি সব কিছুতে লক্ষণীয়।... এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে রয়েছে নিজেকে বিশেষরূপে জাহির করার প্রয়াস যাকে ইংরেজিতে Exhibitionism অথবা প্রদর্শনধর্মিতা বলা যেতে পারে (পৃঃ ৪৬)। কবি নজরুল একদিকে বাঁশের বাঁশরীর ললিত সুরে চির সুন্দরের সাধনা, অপরদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নি সৈনিকরূপে রণতূর্য নিনাদ করেছেন। ... কিন্তু তাঁর মানস আরও জটিল, দ্বন্দ্ববহুল ও স্ববিরোধী। তিনি কখনও বিদ্রোহী, কখনও প্রেমিক, কখনও প্রকৃতি-পূজারী, আবার কখনও বা মরমীসাধক (পৃঃ ৪৭)। ...প্রথমত তিনি একজন বিদ্রোহী।... সেখানেও স্ববিরোধী। তিনি ইসলামী দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও সাম্যবাদী। আবার হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রয়াসী এবং জাতীয়তাবাদী হয়েও তিনি মুসলিম নবজাগরণের কবি।... দ্বিতীয়ত তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি।... প্রিয়ার পদতলে নিজেকে লুটিয়ে দিয়েছেন,... এই বিরহকে সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে তাঁর অশান্ত হৃদয় শান্ত বা তৃপ্ত হতে চেয়েছে। পথ তাঁর আত্মার দোসর (পৃঃ ৪৮)। তৃতীয়ত বিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে যে নবজাগরণ ঘটে নজরুল কাব্যে তার রূপায়ণ দেখা যায়। শুধু বিষয় নির্বাচনের নয়, শব্দচয়ন ও প্রতীক প্রয়োগেও তিনি ইসলামী ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেছেন। এক্ষেত্রে আরবী, ফরাসী কাব্য তাঁর বিশেষ সহায় হয়েছে। ... এ জন্যেই তাঁকে মুসলিম নবজাগরণের কবি বলা যায় (পৃঃ ৪৯)। ... চতুর্থত নজরুল 'সুফী সাধকের ন্যায় ধ্যানমগ্ন হয়েছেন' (পৃঃ ৫০)।

৬. 'নজরুলের জীবনের মতোই তাঁর কাব্য-ধারারও কোন ক্রমবিকাশ ও পরিণতি নেই।... স্বভাবধর্মে তিনি একজন জাত রোমান্টিক (পৃঃ ৫১)। কোন রোমান্টিক কবিই আত্মসচেতন নয়। ...নজরুল-কাব্য সচেতন মনের সৃষ্টি নয় (পৃঃ ৫২).. পঁচিশ বছরের কাব্য সাধনায় তাঁর কবিশক্তির কোন উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটেনি (পৃঃ ৫৩)। এক কোটি থেকে অন্য কোটিতে, এক লোক থেকে অন্য লোকে বিচরণ রোমান্টিক কবি নজরুলের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। ... স্বপ্নের মধ্যে বিরোধাভাস সম্ভব বলে তিনি নাস্তিক, বিদ্রোহী হয়েও প্রেমিক, সাম্যবাদী হয়েও মরমী, হিন্দু ঐতিহ্যের পুচ্ছগ্রাহী হয়েও ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক (পৃঃ ৫৪)।...নজরুলের কাব্য ধারায় মহৎ কোন লক্ষ্য বা পরিণতির সন্ধান পাওয়া যায় না। ... সজ্ঞান ও সচেতন নিষ্ঠার অভাবহেতু শিল্পীরূপে তাঁর মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকটিত হয়ে উঠেছে। শব্দচয়ন ও প্রয়োগে তিনি মারাত্মক রকমের অসাবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও ছন্দপতন ঘটেছে। শুধু তাই নয়। বহু কবিতায় বিরোধ ভাব ফুটে উঠেছে (পৃঃ ৫৫)। ... তিনি সেই মহতী প্রতিভার উপযুক্ত স্বাক্ষর রেখে যেতে পারলেন না কাব্যক্ষেত্রে (পৃঃ ৫৬)।

– শব্দচয়নে ও প্রয়োগে নজরুল ইসলামের অসামান্য নৈপুণ্যের তারিফও করেছেন মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি অনেকেই। শেষের দিকের 'নতুন চাঁদ' কাব্যে কবিতার অপকর্ষও ঘটেছে।

তরপরে নজরুলের রোমান্টিকতা, ঐতিহ্য এবং নজরুল কাব্য, নজরুল কাব্যে প্রেম, –এ সম্পর্কে লেখক বলেন, 'নজরুলের মধ্যে আদিম জৈবিক সত্তা কাব্যাকারে ধরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছে (পৃঃ ১০০), প্রকৃতির কবি নজরুল, নজরুল কাব্যে নারী, নজরুলের মরমীবাদ এবং নজরুল প্রতিভা সদৃষ্টান্ত সাধারণ আলোচনা, এগুলোতে কোন বিশেষ বক্তব্য বা নতুন কথা নেই। নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে গ্রন্থাকার মোবাশ্বের আলীর শেষ সিদ্ধান্ত এইঃ সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও নজরুল কাব্যগগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং তাঁর কাব্য বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট সম্পদ হয়ে বিরাজ করবে (পৃঃ ১৪৫)।

৭. আতাউর রহমান রচিত 'কবি নজরুল' (১ম খণ্ড) ১ম সং ১৯৬৮ সন। অধ্যাপক আতাউর রহমান নিজেও কবি। এ গ্রন্থে তিনি নজরুল কাব্যের বিভিন্ন দিক প্রবন্ধের আকারে আলোচনা করেছেন, আবার নজরুল কাব্যে ভাবপ্রবাহ ১ম ও ২য় তরঙ্গ নামে বিভিন্ন কবিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নজরুলের মন-মননের রূপ প্রকটনেও প্রয়াসী হয়েছেন। আমি এখানে আলোচিত বিষয়গুলোর আনুক্রমিক তালিকা দিলাম ঃ নজরুল জীবনীপঞ্জী, নজরুল রচনাবলী (তালিকা), বাংলা সাহিত্যে নজরুলের ভূমিকা, নজরুলের কাব্য প্রেরণার উৎস, নজরুল ইসলাম ও বাংলা কবিতায় ঋতুবদল, নজরুলঃ একজন নৈরাজ্যবাদী, নজরুল সাহিত্যে প্রেম ও রোমান্টিকতা, নজরুলের দৃষ্টিতে প্রেম ও নারী, নজরুল কাব্যে প্রকৃতি, নজরুলের অধ্যাত্মিকতা, সাম্যবাদী নজরুল, নজরুল কাব্যের শাশ্বত ও সাময়িক মূল্য, নজরুল কাব্যের ভাবপ্রবাহ–১ম তরঙ্গ ঃ অগ্নিবীণা-বিষেরবাঁশী-দোলনচাঁপা-ছায়ানট-চিত্তনামা-ভাঙার গান-পুবের হাওয়া। ২য় তরঙ্গ ঃ সর্বহারা-ফণিমনসা-সিন্ধুহিন্দোল।

আতাউর রহমানের মতে ঃ

১. রবীন্দ্রনাথের পর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো নজরুল থেকে (পৃঃ ১৮)।... নজরুলের সাহিত্য সাধনার মূলে প্রেরণা দান করেছে সমাজ-বিপ্লবের এষণা (পৃঃ ২২)। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন প্রার্থনার ভাষা; নজরুল দিয়েছেন প্রতিবাদের ভাষা। ... স্বদেশী নেতারা নিবিত্ত নিঃস্ব জনসাধারণের উপকার করায় প্রয়াসী, নজরুল তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী (পৃঃ ২৪)। তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ও অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন (পৃঃ ৪৩)।

২. নজরুলের উক্তি 'দুঃখী বেদনাতুর হতভাগ্যদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি।' আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না, নিখিল আর্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রণার চিৎকার। 'আমি কবি, অপ্রকাশ্যে সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদান করার জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত।... আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র।' (রাজবন্দীর জবানবন্দী).. নজরুলের সাহিত্যসাধনার মূলে প্রেরণা দিয়েছে সত্য প্রকাশের আগ্রহ–সত্যই তাঁর জীবনের মূল দর্শন (পৃঃ ২৭)। – এসব কথা কোন আধুনিক বিপ্লবীর মুখে কিন্তু মানায় না।

৩. 'নজরুল অবশ্যই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে অঙ্গীকার করতে পারেননি। তবু সাম্যের প্রবল চেতনায় তাঁর কাব্য গান উন্মুখর। তাঁর সমাজচেতনা বিশেষ কোন আদর্শে স্থির থাকতে পারেনি (পৃঃ ৩৩)।' আবার লেখক বলেছেন, 'নজরুলের সাম্য-প্রেরণার মূলে মার্কস-লেনিনের শিক্ষা ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল তাঁর স্বাভাবিক মানবতাবোধ ও ন্যায়-জ্ঞান (পৃঃ ৪০)। ... প্রাথমিক পর্যায়ে কবিতার বিষয়বস্তু গ্রহণে এবং আঙ্গিক রচনায় নজরুল সমভাবে মৌলিক-স্বকীয়তায় উজ্জ্বল' (পৃঃ ৩৩)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. কম-বেশি সাময়িকভাবে নজরুল প্রভাবিত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ, মোহিতলাল আর বিশেষভাবে প্রভাবিত লেখক আবুল মনসুর আহমদ, ইব্রাহিম খাঁ, বেনজীর আহমদ, মহীউদ্দীন, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ৩৫–৩৭)। বিমল-কুদ্দুস-সুভাস-সুকান্ত এবং অন্যান্য তরুণ কবিদের কাব্যে নজরুলের প্রভাব নানাভাবে সক্রিয় হয়েছে (পৃঃ ৩৮)।'

আতাউর রহমান এ-ও মনে করেন যে,

'সমাজজীবনে সংকট ঘনীভূত হওয়ায় বিশুদ্ধ সৌন্দর্য চেতনার কবি রবীন্দ্রনাথকেও তিরিশের পর বাস্তব জীবন ভিত্তিক কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করতে হয়েছে। নজরুলের ১৩৩২-এর 'ফরিয়াদ' রবীন্দ্রনাথে ১৩৩৮-এ 'প্রশ্ন'রূপে উপস্থিত। নবজাতকের অনেক ঘোষণাই নজরুলের প্রভাবকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। কবির কৈফিয়ৎ দেবার নজরুলের রীতি 'ঐক্যতানে' বিস্ময়কর মানস-সাদৃশ্য নিয়ে উপস্থিত (পৃঃ ৩৮)।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রণেশ দাশগুপ্তও নজরুলের 'নারী' কবিতা রবীন্দ্রনাথকে 'মহুয়া' কাব্য রচনায় প্রবর্তনা দিয়েছে বলে মনে করেন (মাসিক পূবালী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ সাল)।

৫. 'তাঁর (নজরুলের) কবিতায় প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, প্রেমের তত্ত্ব বা দর্শনচিন্তা বিশেষ প্রকাশ পায়নি। তাঁর কবিতায় প্রিয়াহারার কান্না আছে, বঞ্চনার জ্বালা আছে, ঈর্ষা আছে, প্রতিহিংসা আছে, প্রতিঘাত আছে। প্রেমের কবিতায় নজরুল সীমাহীনভাবে কোমল ও ব্যথাকাতর এবং বহুক্ষেত্রে ঈর্ষাতুর (পৃঃ ৫৬)। ... নজরুলের কবিতায় ও গানে নিত্যকালের নরনারীর বিরহী প্রাণের অশেষ কান্না ধ্বনিত হয়েছে (পৃঃ ৬৭)। –হু হু করে ওঠে তবু হিয়া/ কি যেন কি নাই কিসের অভাব, এ বুক ব্যথা বিধুর (চক্রবাক)। প্রেম-সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়/ প্রেম সত্য, প্রেম পাত্র বহু অগণন।

AMARBOI.COM

লেখক আতাউর রহমান প্রেম ও রোমান্টিকতা এবং প্রেম ও নারী তথা মানুষের কাম-প্রেম প্রকৃতি সম্বন্ধে উদ্ধৃতি বহুল আলোচনায় অকুণ্ঠ।

৬. 'তার (নজরুলের) কবিতায় সন্ধ্যা রাত্রি, বর্ষা রজনী, শরতের মৃত্তিকা ও আকাশ-শীতের ময়দান মূর্তি ধরে এসেছে (পৃঃ ৮৩)। শীত, মনে হয়, নজরুলের প্রিয় ঋতু (পৃঃ ৮৫)।

৭. কবি নজরুল 'স্নেহমেঘশ্যাম, আমার সুন্দর, রসঘন সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, প্রিয়-সুন্দর নামে তাঁর জীবন-নিয়ন্তা আল্লাহর উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, এক পরম সুন্দর উপলব্ধিতে কবিসত্তা আচ্ছন্ন হয়েছিল (পৃঃ ১০৪)। এ সূত্রে লেখক নজরুলের আধ্যাত্মিকতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, এভাবে কাব্যে এক রহস্যময়ীর আবির্ভাব ঘটল (পৃঃ ৯৪, ৯৮)।

– কিন্তু আমাদের ধারণা সম্ভবত তাঁর রোগের উন্মেষের ও ক্রম বিস্তারের সঙ্গে এ অধ্যাত্মবুদ্ধির প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ রসঘন সুন্দরে 'জীবনদেবতার' প্রভাব আছে কি?

৮. 'নজরুলে সাম্যবাদী ও সর্বহারা কাব্যের ভাবসত্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বহু লক্ষণ বহন করেছে। ... নজরুল সাহিত্যের সর্বত্রই শ্রেণী সচেতনতা এবং সাম্যের চেতনা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১০৮)।... শ্রেণী সংগ্রামের মূলভাব নজরুল কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে, সন্দেহ নেই (পৃঃ ১০৯)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– বহু উদ্ধৃতিযোগে লেখক তাঁর এমত প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু যেহেতু নজরুলের কোন মত-নিষ্ঠা বা অবিচল আদর্শানুগত্য ছিল না, এবং গদ্যে-পদ্যে-পত্রে-ভাষণে পরিব্যক্ত তাঁর বিশ্বাসে আচারে, মতে-পথে স্ববিরোধ এত বেশি, এত প্রকট, সেহেতু তাঁর কোন মতে ও মন্তব্যে, বিশ্বাসে ও আদর্শে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মনন চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয় বলে আমাদের ধারণা।

৯. 'নজরুল কাব্যের শাশ্বত ও সাময়িক মূল্য' প্রবন্ধে লেখক নজরুল সাহিত্যে সাময়িকভাব অপবাদ খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে ঃ 'নজরুলের বিদ্রোহ ও বিপ্লব অভিযান চিরকালের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, কেবল কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নয় (পৃঃ ১২২)।... সমাজ জীবনের সর্বত্র কবি কামনা করেছেন মানবতা, সাম্য ও সত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা... স্বাধীনতা অর্থে নজরুল বুঝতেন মানুষের মর্যাদা, সমাজ ও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ, সংস্কার ও সংকীর্ণতা থেকে মানুষের অন্তর-বাহিরের পূর্ণমুক্তি। ...নজরুলের মুক্তি কামনার পিছে রয়েছে মানবতা ও নৈতিকতার প্রেরণা। তাই এর আবেদন বিশেষ দেশে বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ নয়। নজরুল ইসলামের স্বাধীনতা জাতির নয়, মানুষের (পৃঃ ১২৫)। মানব স্বভাবের সঙ্গে সে কবিতার যোগ নিবিড় বলেই তা সফল ও সমাদৃত' (পৃঃ ১৩০)।...এ বিদ্রোহ আজকের হয়েও সর্বযুগের, একদেশের হয়েও সর্বদেশের (পৃঃ ১৩৪)।

১০. নজরুল কাব্যের ভাব প্রবাহ ১ম ও ২য় তরঙ্গে রয়েছে কয়েকটি ভালো কবিতার উদ্ধৃতিবহুল রসগ্রাহী আলোচনা। লেখক আতাউর রহমান এ গ্রন্থে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির ব্যাপকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা ভক্ত রসগ্রাহীর–নিরপেক্ষ সমালোচকের নয়। তাই এ গ্রন্থ নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়নে সাহায্য করে না, নজরুলের প্রতি অনুরাগবৃদ্ধির সহায়ক মাত্র।

AMARBOI.COM

৮. মধুসূদন বসু রচিত 'নজরুল কাব্য পরিচিতি', ১ম সং ১৯৭৫, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা।

এই অধ্যাপক-লেখক সম্ভবত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। বিষয়সূচী এরূপ–নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা, নজরুল কাব্য ঃ দেশকাল, বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব, বিদ্রোহী কবি নজরুল, নজরুল কাব্যের কয়েকটি দিক, ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার, নজরুলের গান, নজরুলের প্রভাব, তারপর নজরুলের কয়েকটি কাব্য ও কবিতার বিশ্লেষণমূলক রসগ্রাহী আলোচনা রয়েছে ১৪৩ থেকে ২৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী।

'দেশ-কাল' পরিচ্ছেদ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের কথা দিয়ে শুরু হলেও ধারাবাহিকভাবে রাজনীতির কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনার উল্লেখ অথবা আলোচনা নেই। ১৯৩৪ সনে গভর্নর স্যার জন এন্ডারসনকে দার্জিলিঙে গুলি করে মারার চেষ্টাতেই দেশকাল পরিচিতি সীমিত এবং কবি জীবনেও ১৯২৬ সন অবধিই দেশকাল প্রভাব নিবদ্ধ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ হচ্ছে 'বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব'–এতে আছে ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র লাল, রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের নতুন চিন্তা-চেতনা সম্পৃক্ত আলোচনা। কাব্যধারার সঙ্গে নজরুল কাব্যের পার্থক্য নির্দেশ সূত্রে দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে মধুসূদন বসু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছেন, 'কিন্তু নজরুলের সঙ্গে এই সকল কবির পার্থক্য এই সকল কবির দেশাত্মবোধের মনোভাব বিদ্রোহের সুরে ফাটিয়া পড়ে নাই' (পৃঃ ৫২-৫৩)।

অন্যত্র লেখক বলেছেন, নজরুলেরও পূর্বে মানুষের লাঞ্ছনা-অবমাননায় সহানুভূতির মনোভাব বাঙালী-রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ-কবির কবিতায় প্রকাশ পেলেও 'তাঁহাদের কবিচিত্তের সেই বেদনার প্রকাশ তাঁহাদের কাব্যের স্থানে স্থানেই কেবল লক্ষণীয়' (পৃঃ ৫০)। 'নজরুলের কাব্যে মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি এত গভীর যে তাঁহার সমসায়িক বা তাঁহার পূর্ববর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের সকল কবিকেই তাহা ছাড়াইয়া যায়।' (পৃঃ ৫০)।

'বিদ্রোহী নজরুল' প্রবন্ধে লেখক কবির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্যে এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে মুক্তির জন্যে বিপ্লবের, সংগ্রামের ও সংস্কারের আহ্বান সম্বলিত কাব্য কবিতার আলোচনা করেছেন। এ সূত্রে তিনি 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশনার লক্ষ্যের কথাও বলেছেন।

'নজরুল কাব্যের কয়েকটি দিক' পরিচ্ছেদে লেখক শাস্ত্র, সমাজ, পাপ, নারী, মানুষ, সাম্য প্রভৃতি বিষয়ে নজরুল মানসের বৈশিষ্ট্য ও নজরুলের কাব্যে তার অভিব্যক্তির রূপ উদ্ধৃতিযোগে আলোচনা করেছেন।

'ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা', মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' এবং নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' সম্বন্ধে লেখকের মত ও মন্তব্য এরূপ-'আমি' রচনাটির সহিত 'অভয়ের কথা' রচনাটির সাদৃশ্য সত্ত্বেও যেমন 'অভয়ের কথা' রচনাটিকে 'আমি' রচনাটির সাক্ষাৎ প্রেরণা বলা উচিত নহে, তেমনিভাবে 'বিদ্রোহী, কবিতাটির সহিত 'আমি' রচনাটির সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও 'আমি' রচনাটিকে 'বিদ্রোহী কবিতাটির সাক্ষাৎ প্রেরণারূপে অভিহিত করা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে' (পৃঃ ১৯৭)।

www.amarboi.com

এ বইয়ে নতুন তথ্য, তত্ত্ব কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ তেমন কোন আলোচনা নেই সত্য, তবে 'নজরুলের প্রভাব' নামের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃতি যোগে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল ঘোষ, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের উপর নজরুলের প্রভাব দেখানো হয়েছে। এদিক দিয়ে পরিচ্ছেদটি মূল্যবান।

নজরুলের প্রভাব পড়েছে-বুদ্ধদেব বসুর মর্মবাণী কাব্যের শঙ্খ যাত্রী, ক্ষতিপূরণ কবিতায়,

জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' কাব্যের 'নব নবীনের গান' 'যে কামনা নিয়ে' কবিতায়,

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমা কাব্যের 'কবি', 'নমস্কার', 'দেবতার জন্ম হল', 'দ্বারখোল', 'অপূর্ণ', 'পাঁওদল' কবিতায়,

বিমলচন্দ্র ঘোষের উদাত্ত ভারত কাব্যের 'আমি তাহাদের কবি', 'বহ্নিঃ', 'শীতের রাত্তিরে র‍্যাপার চোর', 'সোনার বাংলা', 'মানুষ', কবিতায়,

দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের 'কাস্তে', 'গোলামখানা', 'ভুখমিছিল', 'গ্লানি', 'ডাস্টবিন', 'নববর্ষের ভোজ', 'শুভ্রভোর', ও 'অহল্যা' কবিতায়,

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'সে দিনের কবিতা', 'এখানে', 'আহ্বান', 'চিরকুট', 'স্ফুলিঙ্গ' কবিতায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'সিঁড়ি', 'সিগারেট', 'দেশলাই', 'কাঠি', 'রানার', 'উদ্বীক্ষণ', 'বিদ্রোহের গান', 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' কবিতায় মদুসূদন বসু নজরুল প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। আর ঢাকার মহীউদ্দীন, বেনজির, ফররুখ, তালিম হোসেন প্রভৃতি অনেক কবিই নজরুল শিষ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রণেশ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথেও নজরুল প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, "বিদ্রোহী কবি তাঁর 'নারী' কবিতা না লিখলে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' অতো সহজে মঞ্জরিত হতো না।... আধুনিককালে বাংলা কবিতায় প্রদর্শক হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম, টি.এস.এলিয়ট নন। বাংলা কবিতায় টি.এস. এলিয়টের প্রভাবের কাল শুরু হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের এক দশক পরে।" (মাসিক পূবালী, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৩৬৮ সাল থেকে আতাউর রহমান কর্তৃক তাঁর 'কবি নজরুল' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৮)। আতাউর রহমানও রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতায় নজরুলের 'ফরিয়াদ' কবিতার, 'ঐকতান' কবিতায় নজরুলের কৈফিয়ৎ এবং 'নবজাতক' কাব্যের অনেক কবিতায় নজরুলের প্রভাব দেখেছেন।

৯. **আবদুল মান্নান সৈয়দ রচিত 'নজরুল ইসলাম–কবি ও কবিতা' ১ম সং ১৯৭৭, নজরুল একাডেমী ঢাকা।** এ গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ছয়টি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'অনুসরণ', 'সাযুজ্যমালা', 'উত্তর প্রবেশ'–এ পরিচ্ছেদে নজরুলের উপর রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের প্রভাব ও সাযুজ্য আলোচিত হয়েছে সাক্ষ্য প্রমাণযোগে। এ সঙ্গে নজরুল প্রভাবিত বলে জীবনানন্দ, ফররুখ আহমদ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বেনজির আহমদ, দিনেশ দাস, বিমল ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, মহীউদ্দীন, (খান মুহম্মদ) মঈনুদ্দীন প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'সৃজন পদ্ধতিতে' প্রথম স্তরে বিভিন্ন গান ও কবিতা রচনার প্রত্যক্ষ স্থান, কাল ও উপলক্ষ তথা প্রেরণার উৎস বর্ণিত। দ্বিতীয় স্তরে কোন কোন কবিতার পরিমার্জনার নমুনা আলোচিত। এখানেই আবদুল মান্নান সৈয়দ নজরুলের বিদ্রোহী রচনায় মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি'র প্রভাব লক্ষ করে বলেছেন, 'মোহিতলালের কথিকাটি নজরুলের 'বিদ্রোহী' ফলাতে সহায়তা করেছিল, এতে আমি কোন সন্দেহ দেখি না। নিশ্চয় মোহিতলালের অভিপ্রায় থেকে নজরুলের উৎকাঙ্ক্ষা আলাদা হয়ে গেছে, তবু প্রাথমিকভাবে 'বিদ্রোহী'র জন্য নজরুলের মানস জমি তৈরি করেছে ঐ রচনাটি' (পৃঃ ৪৮)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'কাব্যযাত্রা'। এ পরিচ্ছেদে লেখক নজরুল কাব্য 'পরিবর্তনবিহীন ও পরিণতিরিক্ত' বলে যে নিন্দা রয়েছে, তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ–যাঁরা প্রথম রবীন্দ্রবিধর্মী কবি, তাঁদের কারো মধ্যই কি (বিবর্তন) বর্তমান? এমনকি উত্তরকালীন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কি জীবন-ভোর খুব বেশি বিবর্তিত হয়েছেন? (পৃঃ ৬৪)।

– লেখকের এ জিজ্ঞাসায় সত্য রয়েছে। সাধারণ কবি মনীষী মনস্বীদের মনমত সাধারণত বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ বছরেই দৃঢ় ভিত্তিক হয়ে যায়, তারপর সে মন-মত-মন্তব্য-যুক্তি-বুদ্ধির দার্ঢ্যে পোক্ত হয় বটে, কিন্তু মূলগত পরিবর্তন হয় না, এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাও বারবার কালান্তর স্বীকার করে চিন্তা-চেতনায়, অঙ্গে-অন্তরে সমকালীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবার সচেতন প্রয়াসী হয়েও সম্পূর্ণ নতুন হতে পারেননি, মনোযোগী তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠকের চোখে তাঁর আদি-স্বরূপ কখনো আচ্ছাদিত থাকেনি।

এ তৃতীয় পরিচ্ছেদেই নজরুলের দ্রোহাত্মক কবিতার অলঙ্কার ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যর সদৃষ্টান্ত আলোচনাও রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রথম বাক্যেই লেখক বলেছেন, 'সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে নজরুল কাব্যের সম্বন্ধ নির্ণয় বক্ষ্যমান নিবন্ধের আলোচ্য' (পৃঃ ৯০)।– নজরুল ইসলামের সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কাজেই এ ধরনের আলোচনার যৌক্তিকতা কিংবা উপযোগ আমাদের উপলব্ধির বাইরে। সংস্কৃত অলঙ্কার ও ছন্দের প্রভাব নজরুলের উপর পরোক্ষ ও ঐতিহ্যিক মাত্র।

প্রঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে ফারসী কবিতার প্রভাব ও অনুবাদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রয়েছে নজরুল গীতি 'নরত্বারোপ, তুলনা/ প্রতিতুলনা প্রেক্ষা, ছন্দ, মধ্যমিল, কবিপ্রসিদ্ধি, অনুপ্রাস, প্রতিষঙ্গ, চিত্রকল্প প্রভৃতির আলোচনা।

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে দশটি পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচ্য বিষয় শব্দ, কবিপ্রসিদ্ধি, রূপক/প্রতীক, অনুপ্রাসামিল, পুরাণ প্রয়োগ, উপমা/ উৎপ্রেক্ষা, নরত্বারোপ, চিত্রকল্প ও ছন্দ। লক্ষণীয় যে লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির আলোচনায় প্রায় অত্যুৎসাহী। কবিতার এরূপ আঙ্গিক-প্রত্যাঙ্গিক বিশ্লেষণ কাব্যরস ও কাব্যসৌন্দর্য উপভোগের সহায়ক কি-না, অথবা কেবল সমীক্ষণ পটুতার, তীক্ষ্ণবুদ্ধির ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পণ্ডিতের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচায়ক তা' নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। তবে এ যে কাব্য-কবিতায় এক প্রকারের হাড়বিদ্যা ও শারীবিদ্যা প্রয়োগ প্রয়াস তা' অস্বীকার করা যাবে না। লেখকের শ্রম, নিষ্ঠা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা কারো দৃষ্টি এড়ায় না। তবু শব ব্যবচ্ছেদে যেমন আঙ্গিক লাবণ্য ও অন্তরের সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়, মনে হয় এমনি বিশ্লেষণে কাব্যের সামূহিক ও সামগ্রিক রূপ-রস আস্বাদন ব্যাহত হয়।

AMARBOI.COM

তৃতীয় খণ্ডে নজরুল গীতি, নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়, নজরুল-পত্রাদি, মোহিতলালের সাতটি কবিতা/ নজরুলের উদ্দেশ্য, নজরুল/ তিরিশের কবিদের চোখে, কথা ও নীরবতা শিরোনামে বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আব্দুল মান্নান সৈয়দ-এর নানা জ্ঞান-প্রজ্ঞার, গবেষণা-নিষ্ঠার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় রয়েছে এ গ্রন্থে, তবে এ বই পড়ে কবি সম্বন্ধে একটা পূর্ণাবয়ব ধারণা পাওয়া সহজে সম্ভব হয় না।

১০. সমালোচক ও কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ 'নজরুল ইসলাম' সম্বন্ধে দুখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং অন্য এক গ্রন্থে রয়েছে নজরুল সম্বন্ধে একটি অধ্যায়।

১. নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ১ম সং ১৯৬৩ (১৯৭৩) সাল, ঢাকা;

২. নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ, ১৯৭৩ (১৯৮০ সাল), ঢাকা;

৩. নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য/ বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ১ম সং ১৯৭৫ গ্রন্থের অন্তর্গত (১৩৭২ সাল), ঢাকা।

সাহিত্য সমালোচক হিসাবে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সুপরিচিত। যদিও তাঁর মূল্যায়ন নীতিতে পূর্বলব্ধ ধারণার প্রভাব থাকে, সে কারণে তাঁর বিশ্লেষণের ও মূল্যায়নের মান উঁচু ও সূক্ষ্ম হয় না, তবু তাঁর তথ্যনিষ্ঠা এবং জিজ্ঞাসা প্রশংসনীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা গ্রন্থে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ও নজরুল মূল্যায়ন-নীতির পরিচায়ক অংশটি উদ্ধৃত করছি ঃ

১. "সমকালীন যুগ-সমস্যার নিরিখে বিচার করলে নজরুল কাব্যে মানবীয় আদর্শের প্রতিফলনের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রেরণা এবং সর্বোপরি নির্যাতিত মানবতার উদ্বোধন নজরুলের কবিচিত্তে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত জনিত আবেগে নজরুল সর্বত্রই মানবতার লাঞ্ছনা অনুভব করেছেন। অনেক কবিতার মানবীয় আদর্শের উচ্চারণে নজরুল তাঁর ধর্মীয় প্রেরণার কথা স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন; যেখানে প্রত্যক্ষত ধর্মীয় বা ঐতিহ্যিক অনুপ্রেরণার কথা ঘোষণা করেননি, সেখানেও তাঁর অধিমানসিক চেতনায় সে ঐতিহ্যবোধ ক্রিয়া করেছে। অমুসলিম সংস্কৃতি ও কাব্যাদর্শ থেকে যে অনুপ্রেরণা সংগ্রহে কুণ্ঠিত হননি, তাও সেই মানবীয় আদর্শের প্রেরণাতেই। ... নজরুলের মানস প্রবণতার মূল নিহিত রয়েছে তাঁর শৈশবের শিক্ষায়।... তাঁর আদর্শবোধে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে প্রত্যহ জীবনের অভিজ্ঞতাই স্থান লাভ করেছে (পৃঃ ২০–২১)।

– লেখকের শেষ বাক্যে ব্যক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা বলেছেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ 'সনাতন রোমান্টিকতাই তাঁর (নজরুলের কাব্যের) উপজীব্য, তাঁর বিদ্রোহ রোমান্টিক উচ্ছ্বাসেরই প্রকাশ' (আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা)।

নজরুলের কাব্য বিচারে লেখক রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রমুখকেও তুলনামূলক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সে আলোচনায় লেখকের নজরুল সম্বন্ধীয় মন্তব্যগুলো এরূপ ঃ

ক. নজরুল ইসলাম যদিও সংহত ও ভাবগম্ভীর কাব্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস করেননি (পৃঃ ৩৩)।

খ. নজরুলের ভাষা ছন্দের কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে অনায়াস কবি কর্মে (পৃঃ ৩৩)।

গ. (মোহিতলালের তুলনায়) নজরুলের কবিতা মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতাজাত (পৃঃ ৩৩)।

ঘ. জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমল চন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদ, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, মহীউদ্দীন, বেনজির আহমদ, বন্দে আলি মিয়া, কাজী কাদের নওয়াজ, সুফিয়া কামাল, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল ইসলাম প্রমুখ অনেক কবির উপর রয়েছে নজরুল ইসলামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব।

এ গ্রন্থে নজরুল ইসলামের অসামান্যতা ও তাঁর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা প্রমাণের চেষ্টাই সুপ্রকট।

২. নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ :

এ গ্রন্থে রয়েছে পাঁচটি অধ্যায় ঃ ক. কবিতার শিল্পরূপ ঃ নজরুল কাব্য প্রসঙ্গ, খ. নজরুল কাব্যে কল্পনা-প্রতিভা, গ. নজরুল কাব্যে উপমা, ঘ. নজরুল কাব্যে চিত্রকল্প, ঙ. নজরুল কাব্যের ভাষা ও ছন্দ।

প্রথম অধ্যায়ে কবিতার শিল্পরূপ সম্বন্ধে রয়েছে সাধারণভাবে তাত্ত্বিক আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক নজরুল কাব্যে কল্পনা-প্রতিভা সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন সেগুলোর কয়েকটি এরূপ ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. তিনি (নজরুল) 'শুধু রবীন্দ্রনাথের অসীম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একজন 'জোতদার' নন এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে কেবল নিজের এলাকার শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করেননি, সেই সঙ্গে নিজের সৃষ্টিক্ষমতায় ফসলের জাতও বদল করে নিয়েছেন (পৃঃ ২৪)।

খ. নজরুলের কিশোরকালের কবিতাতেই কল্পনার প্রশ্রয় লক্ষণীয় (পৃঃ ২৬)।

গ. সৃজনী-কল্পনার স্বাধীনতায় নজরুল কিশোরকালেই কীভাবে জীবনের আটপৌরে ঘটনাকে হৃদয়সংবেদ্য কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন, তার পরিচয় আমরা 'চড়ুই পাখির ছানা' 'ভগ্নস্তূপ' ইত্যাদি কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি (পৃঃ ৩৭)।

ঘ. 'নজরুল সহজাত কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর রচনার অনায়াসপটুত্ব কৈশোরকালেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল' (পৃঃ ৪৭)।

ঙ. বীরত্বব্যঞ্জক ও উদ্দীপনা-আশ্রয়ী কবিতাতেও নজরুলের কল্পনাপ্রতিভার আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছে (পৃঃ ৫২)। ইসলামের উন্মেষ যুগের ইতিকথা অবলম্বনে রচিত নজরুলের কবিতা সম্বন্ধে লেখকের ধারণা–'নজরুল শুধু ইতিহাসের রূপকার নন, নবযুগের পটভূমিকায় রেনেসার বাণীবাহক' (পৃঃ ৬৫)।

চ. রোমান্টিক মানস-প্রবণতার দরুনই নজরুল কবিতায় প্রকৃতি-আশ্রয়ী হয়েছেন।

– বহু পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় নজরুলের বহু কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক তাঁর উপযুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্ত করেছেন। মন্তব্যে পুনরাবৃত্তিও লক্ষণীয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে উপমার আলোচনা। লেখকের মতে ঃ 'কাব্যের সৌন্দর্য এবং অর্থঘনত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই কবিরা উপমা সৃষ্টিতে এবং সে সবের যথাযোগ্য ব্যবহারে আত্মনিয়োগ করেন' (পৃঃ ৮৩)। উপমাধর্মী ভাষাব্যবহারের নৈপুণ্য প্রদর্শন আর 'উপমা প্রয়োগে' সাফল্য অর্জন সম্পূর্ণ এক এবং অভিন্ন নয়। (পৃঃ ৮৪)। নজরুল শুধু কাব্যের ভাষার ক্ষেত্রে নয়, উপমা উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প রচনা ইত্যাদির ব্যাপারেও পুঁথিসাহিত্যের ঐতিহ্য এবং ঐশ্বর্যকে অবলম্বন করেছেন (পৃঃ ৮৮)।

– লেখকের এ ধারণা ভুল। কেননা 'পুঁথি সাহিত্য' তথা দোভাষী পুঁথিতে বা সাহিত্যে যে ধরনের আরবী ফারসী শব্দ এবং উপমাদি ব্যবহৃত হয়েছে, নজরুল সেগুলোর অনুকারক ছিলেন, সে-সাক্ষ্য তাঁর কাব্যে নেই। বরং পরবর্তীকালের কবি ফররুখ আহমদই ছিলেন দোভাষী সাহিত্যের বা পুঁথির অনুসারী।

তারপর বহু পৃষ্ঠাব্যাপী বহু উদাহরণযোগে লেখক নজরুলের উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগে নৈপুণ্য ও সাফল্য দেখিয়েছেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যের উপমাও তুলনায় আলোচিত হয়েছে। লেখকের মতে নজরুলের 'উপমা সৃষ্টি এবং সে-সবের যথাযথ প্রয়োগে নজরুলের যে সাফল্য তা' কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং নজরুলের কবিতার উপমা কোনো আরোপিত ব্যাপার হয়েও নেই। কাব্যের বিষয় ও বক্তব্যের প্রকাশ রূপের অনুষঙ্গ হিসাবেই নজরুলের কবিতায় উপমার ব্যবহার' (পৃঃ ১৯৫)।... প্রাচীন ইরানী রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে (পৃঃ ১৪৯)।.. উপমা সৃষ্টি ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবির ইমাজিনেশন বা কল্পনা প্রতিভার সত্যিকার স্বরূপ ধরা পড়ে (পৃঃ ১৫৩)।

উপসংহারে লেখক বলেছেন ঃ 'নজরুল কাব্যে উপমার বৈচিত্র্য, বহুমুখিতা ও গভীরতা এবং সর্বোপরি অনুপম সৌন্দর্যের 'সাক্ষাৎ' মেলে। কারণ, নজরুল ভিন্নমুখী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপরীত ধর্মী ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ করে তাঁর কাব্যে উপমার জগৎ গড়ে তুলেছেন। সে জগৎ হয়েছে রূপ ও সৌন্দর্যে মনোহর, কল্পনা-প্রতিভার স্পর্শে প্রাণবান ও সজীব' (পৃঃ ১৫৬)।

চতুর্থ অধ্যায়ে নজরুল কাব্যে চিত্রকল্প আলোচিত এবং পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর ভাষা ও ছন্দ আলোচিত। স্পষ্টতই লেখক নজরুল প্রশস্তির জন্যে তাঁর কাব্যের রূপ-গুণ ও তুলনায় উৎকর্ষ প্রমাণের সদুদ্দেশেই এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। কাজেই সমালোচকের নিরপেক্ষ বিচার এখানেও প্রত্যাশিত হলেও প্রাপ্য বা প্রাপব্য নয়। এ হচ্ছে ভক্তজনের এক প্রকারের 'দোষহর, গুণ ধর' শ্রেণীর রচনা।

৩. 'নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য'–এ বিষয়ের আলোচনা ও পৌনঃপুনিক উল্লেখ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর উপর্যুক্ত দুটো বইতেই রয়েছে।

ক. এ প্রবন্ধে লেখক বলেন, 'কাব্যিক উপাদান সংগ্রহে এবং ঐতিহ্যের রূপরেখাকে সমন্বিত করার ব্যাপারে তিনি (নজরুল) ভৌগোলিকতার দিকে তেমন ফিরে তাকাননি, বরং সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহ ও তার বৈচিত্র্যময় রূপবিন্যাসকেই বড় করে দেখেছেন' (পৃঃ ১৪৮)।

খ. লেখক নজরুল কাব্যে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের 'সমন্বিত রূপ দেদীপ্যমান' দেখেও বলেছেন 'ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁকে হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে।... (কারণ নজরুল) উভয় সম্প্রদায়ের মনোবিকাশের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর এ কারণেই তাঁকে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সারাৎসার থেকে কাব্য উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে' (পৃঃ ১৪৯)।

– আসলে নজরুল কাব্যে হিন্দুয়ানীর সাফাই হিসেবেই লেখক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তাই 'ঐতিহাসিক প্রয়োজনটা' উল্লেখ বা বিশ্লেষণ করেননি।

১১. শাহাবুদ্দীন আহমদ এ যাবৎ নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে চারখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। চারখানা গ্রন্থের সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আট শতাধিক। পাঠক থেকে কাজী নজরুল ইসলামের অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতি আদায়ের জন্যই যেন বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শাহাবুদ্দিন কলম ধরেছেন সাহিত্য বিশ্লেষক, বিচারক ও নজরুল কীর্তি-কৃতির উদঘাটক রূপে।

নজরুলের শক্তি ও অনন্যতা প্রমাণের জন্যে তুলনামূলক বিচার বিবেচনার গরজে অনেক পড়াশোনা করেছেন, অর্জন ও প্রয়োগ করেছেন অনেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই রয়েছে শ্রমসাধনার সাক্ষ্য। তাঁর বইয়ের পাঠক গোড়াতেই অনুভব করবেন যে, কবি নজরুল ইসলামের অসামান্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুপমত্ব প্রমাণের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েই লেখক কলম ধরেছেন।

শাহাবুদ্দীন রচিত চারখানা গ্রন্থ ঃ ১. শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম (১৯৭০), ২. নজরুল সাহিত্য বিচার (১৯৭৬), ৩. ইসলাম ও নজরুল ইসলাম (১৯৭৬), ৪. নজরুল সাহিত্য দর্শন (১৯৮৩)।

শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম (১৯৭০), নজরুল একাডেমী ঢাকা প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৯। ভূমিকায় লেখক বলছেন 'নজরুলের কবিতায় শব্দ শুধু শব্দ– word নয়, শব্দ হল শব্দ —sound, শব্দ হল গান, শব্দ হল চিন্তা, শব্দ হল চিত্র, শব্দ হল শিল্প'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–এ গ্রন্থে নজরুলের হাতে আরবী-ফারসী শব্দের বিষয়ানুগ সুষম সুপ্রয়োগ দেখানোই মুখ্য উদ্দেশ্য। সে-সঙ্গে অন্যান্য হিন্দু-মুসলিম কবিরা আরবী-ফারসী শব্দকে, কতভাবে কত সংখ্যায় ব্যবহার করেছেন, তারও তালিকা যুক্ত করেছেন, সে-তালিকায় রয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন। শেষ পরিচ্ছেদে নজরুলের কবিতায় তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

এ গ্রন্থ রচনায় লেখকের ইসলামী জোশই প্রণোদনার উৎস ছিল বলে মনে হয়। আবেগমুক্ত দৃষ্টিতে দেখলে স্বয়ং লেখকের কাছেও এ গ্রন্থ রচনা পণ্ডশ্রম বলে মনে হত।

'নজরুল সাহিত্য বিচার মূলত প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪। প্রকাশক : মুক্তধারা, ১৯৭৬ সন। এতে রয়েছে নজরুল ও নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে পঁচিশটি প্রবন্ধ : নজরুল চর্চা, নজরুলের চিঠির ভাষা, নজরুল ইসলামের গদ্য, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু, নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও মোহিতলালের 'আমি', নজরুলের গান, মৃত্যুক্ষুধা, যুদ্ধ কবিতা : যতি নয় জিজ্ঞাসা : পাঠকের জিজ্ঞাসা, নজরুল মানস, বাঁধন হারা, মোসাহেব সমালোচক ও নজরুল ইসলাম, অনুবাদক নজরুল, নজরুল সাহিত্য বিচার প্রভৃতি।

– ভূমিকায় লেখক কেবল নজরুল সম্বন্ধেই কেন লেখেন, বন্ধুদের এ প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন–"নজরুল সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যেসব আলোচনা হয়েছে সে সব আলোচনায় আমি সন্তুষ্ট নই বলে, নজরুল সম্বন্ধে আমি যা জানি সে জানা অন্যে জানে না বলে, আমার জানার কথা আমার প্রকাশ না করে যাওয়া আমার কাছে অপরাধ বলে এবং সবশেষে বাংলা সাহিত্যের তুলনায় তার প্রতিভাকে আমি অভ্রংলিহ বলে মনে করি। তাঁর (নজরুলের) মনুষ্যত্বের যে তুলনা নেই সে কথা বলা বাহুল্য, এবং তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ও সংগীত প্রতিভাও অসামান্য (পৃ: ক)।

'বাঙালীর জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে লেখক যথার্থই বলেছেন 'হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ঐক্যসাধনের শ্রেষ্ঠতম ভূমিকা হল নজরুল ইসলামের' (পৃঃ ৭৮)।

'নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু' প্রবন্ধে নজরুল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর ত্রুটি নির্দেশক বা নিন্দাজ্ঞাপক মন্তব্য সম্পর্কে ক্ষুব্ধ শাহাবুদ্দীন বলেছেন 'বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্পর্কে যে-সব উক্তি করেছেন তা, অনেকখানি অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। তাঁর অব্যবস্থিত চিত্তের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে অনির্ভরযোগ্য' (পৃঃ ৯২)।

–এভাবে গোটা বইয়ের পঁচিশটি প্রবন্ধেই লেখক নজরুলের কৃতির-কীর্তির সমর্থনে, বিরূপ সমালোচকের মত-মন্তব্যের প্রতিবাদে মুখর। লেখকের সব প্রয়াস ও যুক্তি প্রয়োগ এবং সাক্ষ্য প্রমাণ কেবল আদালতে বিবাদীপক্ষের উকিলকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শাহাবুদ্দীনের রচিত আর দুটো গ্রন্থ **'ইসলাম ও নজরুল ইসলাম'** এবং **'নজরুলের সাহিত্য দর্শন'** আলোচনায় নতুন কোন তত্ত্ব বা তথ্য মিলবে না। গোড়াতেই বলেছি, আবার বলছি, শাহাবুদ্দীনের লক্ষ্য নজরুল ইসলামকে 'অসামান্য প্রতিভারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করাই শাহাবুদ্দীনের এই জীবনের ব্রত। এ কাজে তিনি সত্যই দেহ মন আত্মা সমর্পণ করেছেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ - যুক্তির ভাণ্ডার ঋদ্ধ করার জন্য তিনি সাহিত্য শিল্প বিষয়ক বিস্তর বিদ্যাও অর্জন করেছেন এবং প্রায় বিশ্বসাহিত্যের পটে নজরুলের অসামান্যতা প্রমাণে হয়েছেন উদ্যোগী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্য বিচিত্রা' ১ম সং ১৩৬৩।
এই প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের 'কবি নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে লেখকের নজরুল সম্বন্ধে মত ও মন্তব্য এরূপ ঃ

১. নজরুল-মানসের অভিনবত্ব সর্বজন স্বীকৃত। বাংলা কাব্যের বিশ শতকীয় লোকায়ত মানসে নজরুল একটি প্রবল সুর সংযোগ করেছেন। সমাজ সচেতনতা, সমকালীন গণতান্ত্রিক চেতনা ও সাম্যবাদী প্রত্যয় তাঁর কবিতায় আগ্নেয় দীপ্তিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ অথবা মোহিতলাল প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসে নি–কিন্তু নজরুলকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিক্ষেত্রেও নামতে হয়েছে। সুতরাং তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতারও একটি স্বতন্ত্র রূপ ফুটেছে। কৃষাণ শ্রমিক কুলি মজুরের জীবনের ব্যথাহত দীর্ঘশ্বাস তাঁর কবিতায় এক অসাধারণ অর্থগৌরবে ভরে উঠেছে।... সেদিনের জাগ্রত গণজীবনের প্রাণোত্তাপকে সবচেয়ে বেশি রূপায়িত করেছেন নজরুল (পৃঃ ১৪৪)... নজরুলই এই সময়ের সর্বভারতীয় গণমানসকে তার যথার্থ ভাষা দিয়েছিলেন (পৃঃ ১৪৫)। সত্যেন্দ্রনাথের চেয়েও নজরুল সমকালীন ঘটনায় বেশী প্রভাবিত হয়েছেন (পৃঃ ১৪৭)।

২. নজরুল কবি মানসের বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে।...পূজারিণী কবিতাটি নজরুলের প্রেমানুভূতি ও যৌবন-স্বপ্নের একটি বিশিষ্ট কবিতা। রবীন্দ্রকাব্যে 'মানস সুন্দরী' ও শেলীর কাব্যে 'এপিসাইকিভিয়ন'-এর যা স্থান, পূজারিণী কবিতাটি নজরুল কাব্যে সেই স্থান অধিকার করেছে (পৃঃ ১৫২)। নজরুলের রোমান্টিক প্রেম-চেতনা এক নামহারা বাসনায় অধীর হয়ে উঠেছে–পাওয়ার মধ্যে না পাওয়ার এক অনির্দেশ্য-বেদনা দুরযানী স্বপ্ন-চারণার কল্পসহচরী একদিকে ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যানুভূতি, অন্যদিকে মূর্তিময়ী নারী–এই দুইয়ের বিরোধ নজরুল মানসে সৌন্দর্যের মধুচক্র রচনা করেছে (পৃঃ ১৫৩)।

– ডক্টর রায়ের এ ব্যাখ্যা অবশ্যই পূজারিণী ও অনামিকা কেন্দ্রী।

৩. নজরুলের স্পর্শকাতর কবিমন প্রকৃতির নেপথ্যচারী এক অনন্ত সৌন্দর্য রূপিণীকে অনুভব করেছে (পৃঃ ১৫৬)।..সৌন্দর্য চেতনা, রূপমুগ্ধতা, প্রকৃতি ও প্রেমানুভূতির অকুণ্ঠিত প্রকাশ নজরুলের কাব্যের অন্যতম ঐশ্বর্য।

৪. সত্যেন্দ্রনাথ বা মোহিতলাল, কেউই হিন্দী-আরবী ফারসী শব্দের প্লাবন আনতে পারেননি যেমন এনেছিলেন নজরুল।

৫. শিশুপাঠ্য ছড়াগুলিতে নজরুল স্বাভাবিকভাবেই খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

৬. নজরুলের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হিন্দু-মুসলমান পুরাণের বিচিত্র উল্লেখ।

৭. নজরুল-গীতিকা মুক্তাফলের মতো জ্যোতির্ময় ও নিটোল। নজরুলের কবি-প্রতিভার ক্রমবিকাশ নেই। নজরুল মত্ত কিন্তু আবিষ্ট নন। গীতিকার নজরুল বড়, তাঁর চেয়ে বড় ব্যক্তি নজরুল, আর সবচেয়ে বড় নজরুলের ব্যক্তিত্ব। –এই সব মত ও মন্তব্য সাধারণভাবে সবার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য।

১৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, "জ্যৈষ্ঠের ঝড়" ১৯৬৯।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত হালকা চালে রাম্যরচনার মতো সুখপাঠ্য করে নজরুল ইসলামের জীবনের ও সাহিত্যকৃতির পরিচায়ক' 'জৈষ্ঠ্যের ঝড়' নামে ৩৫১ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। তিনি তথ্য-সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। নজরুল জীবনের সর্ব প্রধান ঘটনার ও রচনার লঘু-গুরু সবদিকের রসাল বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থে। এটি 'গুণ ধর দোষ হর' নীতি ভিত্তিক প্রশস্তিমূলক রচনা। সবটাই ভক্তবন্ধুর গুণগ্রাহিতা, প্রশংসা ও প্রশস্তি। এ গ্রন্থে সাহিত্য সসালোচনা নেই, আছে স্তাবকতা, চরিত্রের কিংবা সাহিত্যের মূল্যায়ন গ্রন্থ নয়। তবু অচিন্ত্যকুমার দু'একটি মন্তব্যেই নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

'(নজরুল) ভাষায় এনেছে তীক্ষ্নতা, ছন্দে এনেছে জীবন স্পন্দন, ভাবে এনেছে বল-বীর্য-ওজঃ তেজের উদ্দীপ্তি। শুধু স্বাধীনতা-আন্দোলনেই সে বেগসঞ্চার করেনি, সমস্ত বাংলা সাহিত্যের নির্জীব স্নায়ু-শিরায় নতুন রক্তের প্রবাহ সঞ্চার করেছে। যা কিছু জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত তাকে সংহার করেছে; যা কিছু জীবন্মৃত তাকে উজ্জীবিত করেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে নজরুলের দান প্রত্যক্ষরূপে অগ্রগণ্য' (পৃঃ১-২)। নজরুল মানস সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ

'নজরুলের সমস্ত ঝড়ের অন্তরালে একটি গভীর শান্তি আছে, বিষাদ আছে যার জন্ম প্রেমে। সেইটিই নজরুলের দহন-দীপ্তির উৎসমুখ'। যে প্রদীপের শিখায় দাবানল জ্বলছে সে প্রদীপটি আসলে গৃহকোণের স্নিগ্ধ প্রদীপ, হয়তো বা দেবমঞ্চের বাতি। তার শিখায় বিদ্রোহ কিন্তু তার তেলে প্রেম, করুণা, ভক্তি। বিদ্রোহী নজরুলকে ছাপিয়ে উঠেছে নজরুল, মানব প্রেমিক নজরুল আর এই মানব প্রেম তাঁকে নিয়ে গেছে ঈশ্বরপ্রেমে (পৃঃ ৯)

–উপযুক্ত দুটো উদ্ধৃতিতেই উচ্ছ্বাসের প্রবলতা থাকলেও নজরুলের দান ও মানসলক্ষণ তথা স্বভাব এখানে স্বরূপে উদ্ঘাটিত।

১৫. আবুল ফজল রচিত 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' ২য় মুদ্রণ ১ শ্রাবণ ৩৫৫।

এ গ্রন্থে লেখকের নজরুল ও তাঁর কৃতি সম্বন্ধে মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত এই ঃ

১. তাঁহার কবি-আত্মা ও কাব্যাদর্শের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার রচিত বিখ্যাত বিদ্রোহী নামক কবিতায়।... তাঁহার রচনা, মতবাদ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, রীতি এক কথায় সবকিছুর মধ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এই বিদ্রোহী নামের সার্থকতা (পৃঃ ১৯)। রবিকরোজ্জ্বল বাংলা সাহিত্যে নজরুল করিলেন সর্বপ্রথম নতুন আলোকপাত, ফুটাইয়া তুলিলেন নতুন সুর, ধ্বনিয়া তুলিলেন নতুন বাণী (পৃঃ ১২)। নজরুল ইসলম কবি, মানুষের কবি, মানবতার কবি, দাসত্বের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে কুসংস্কারের নির্যাতন ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এই কবি একদিন বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছেন বিদ্রোহ (পৃঃ ১৩)।

২. ছোটগল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নজরুল হয়ত অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার রচনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমা এই রচনাগুলিকেও দিয়াছে এক অনন্য সাধারণ অভিনবত্ব ও আকর্ষণ (পৃঃ ৯০)।

৩. সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তি ও প্রতিভা পাইয়াছে এখানে (গানে) অধিকতর মুক্তি ও বিকাশ। তাই গানের ক্ষেত্রে নজরুল এখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনতিক্রম্য।

বলা বাহুল্য ১২৮ পৃষ্ঠার এ বই রসগ্রাহী পাঠকের রচনা নয়, অনুরাগীর স্তাবকতামাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. ডক্টর অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ (১৯৭৮ সন) গ্রন্থে (পৃঃ ২২৮–৫৯) নজরুল সম্পর্কে যে মত ও মন্তব্য পরিব্যক্ত করেছেন তা এই– “আমেরিকার জননন্দিত কবি ওয়ালট হুইটম্যানের কথা– Who touches this book, touches a man. নজরুল সম্পর্কে একথা সম্পূর্ণ সত্য। একটি প্রবল ব্যক্তি চরিত্রের স্পর্শ পাওয়া যায় তাঁর গানে ও কবিতায়। তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর দোষগুণ সবই কবিতায় প্রতিফলিত। এই উচ্ছ্বাস, এই প্রাণ-বাহুল্য, এই দৃপ্ত জীবনাবেগেই নজরুলের ব্যক্তিপরিচয় এবং কাব্যপরিচয়।”

‘বিদ্রোহী’ কবিতা সম্বন্ধে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের মত এই, “আমি মানি নাক কোন আইন’ আর ‘আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ’–এই দুটি চরণে নজরুলের পরিচয় পাই।... বিদ্রোহী কবিতা অনবদ্য কবিতা নয়, ত্রুটি রয়েছে যথেষ্ট। তারুণ্য ও প্রাণাবেগে চঞ্চল কবিস্বরূপটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে... এই কবিতায় হৈচৈ আছে প্রচুর, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে গভীর ও আন্তরিক আবেগ, যা সকল মহৎ কাব্যের প্রাণ। তাঁর অন্যসব মন্তব্য ও মূল্যায়ন এই ঃ

ক. নজরুল জন ও জনতার বন্ধু, জনতার কবি।

খ. অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা–অকৃত্রিম সহজ প্রকাশ, আন্তরিক ভাবাবেগ দৃঢ় প্রত্যয় নজরুলের কাব্যে রয়েছে।

গ. যদি দশের ও দেশের প্রতি মমত্ব কবিকে সোচ্চার ও মুখর করে তোলে এবং তা যদি কাব্যাপরাধ না হয় নজরুল সেই গুণে গুণান্বিত।

ঘ. রুদ্র থেকে রতি, রতি থেকে রুদ্র... এইভাবে নজরুল বারবার যাওয়া আসা করেছেন।

ঙ. প্রেম-কবিতা ও গানে নজরুল তীব্র ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের উপাসক।... তথাপি নজরুল দেহভিত্তিক প্রেমের পূজারী নন, তিনি রোমান্টিক প্রেমের উপাসক। এই যৌবনদ্রোহী আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিক অতৃপ্ত অনির্দেশ... প্রেম সাধনার পরিণতি বিরহ-আর্তনাদে।

চ. শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ, আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার, বর্ণবহুল চিত্রাঙ্কনে, নজরুল সত্যেন্দ্রানুসারী।

– এ আলোচনা ও মূল্যায়ন মূলত অনুরাগীর ও রসগ্রাহীর।

১৭. ডক্টর বাঁধন সেনগুপ্ত রচিত ‘নজরুল কাব্য গীতি-বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন’, ১ম সং ১৯৭৬, নবজাতক প্রকাশন কলিকাতা।

এ বই পি-এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্তি লক্ষ্যে লিখিত অভিসন্দর্ভ। কাজেই এই বইয়ের সর্বত্র এক প্রকারের যান্ত্রিকতার ছাপতো রয়েইছে, তা'ছাড়া কোন বিষয়েই লেখকের পরিচ্ছন্ন ধারণার সাক্ষ্য মেলে না এ বইতে। লেখকের বক্তব্য নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত : নজরুলের গীতিকাব্য-প্রস্তাবনা-উদ্দীপকভাব, সূক্ষ্ম রোমান্টিক চেতনা, প্রকৃতিপ্রীতি, সাম্যবোধ, সমাজ চিন্তা, গীতিধর্মী কবিতা, হাস্যরস, গীতিকাব্যের ভাষা, সুর ভাব বৈচিত্র্য এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন।

প্রস্তাবনায় ডক্টর বাঁধন সেনগুপ্ত বলেছেন, ‘নজরুলের কবিতা মুখ্যত অলঙ্কার খচিত। ফলে তাঁর কাব্যে অজস্র অলঙ্কারের সার্থক পরিমিতির পাশাপাশি দেখা দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিসর্গপ্রীতি, উপমা, ছন্দ, অনুপ্রাস, প্রতীক, বা সার্থক চিত্রকল্পের বর্ণমালা। এরই ভেতর দিয়ে নজরুলের গীতিকবিতা আবিষ্কার করেছে তার নিজস্ব এক জগৎ' (পৃঃ ৩৩)।

–এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে লেখকের কাব্য মূল্যায়নের ধারা ও মান। শেষ পরিচ্ছেদে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের কয়েকটি এরূপ ঃ

১. সম্ভবত রোমান্টিক নজরুলের মরমিয়া কবিসত্তা এ কারণেই প্রেমভাবনার উদ্বেলতায় ভরপুর। সে ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রবণতার আধিক্য সহজেই অনুমেয় (পৃঃ ২৩২)।

২. আবেগ প্রবণতা একান্তই তাঁর স্বোপার্জিত। কাব্যের সূক্ষ্ম মননলোকে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত প্রকৃতির মূলে রয়েছে এই বিরোধ (পৃঃ পৃঃ ২৩৩)।

৩. আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় রেখে বিচার করলে নজরুলকে কেবলমাত্র তাঁর দুরন্ত আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলত দেখতে হবে।

তবে অন্যদের মতো তিনিও বলেছেন ঃ

ক. সমসাময়িক প্রভাবের ক্ষেত্রে নজরুলের কবিতা দু'এক দশককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল (পৃঃ ২৪৫)

খ. কাব্য বিচারে কবিতা গঠন প্রকৃতির দিক থেকে নজরুলের অনেকাংশে চ্যুতি ঘটেছে (পৃঃ ২৪৪)।

গ. রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যা শাশ্বত নজরুলের কাব্যে তাই প্রতিদিনের নৈকট্যে মুখর (পৃঃ ২৪২)। – অলমিতিবিস্তরেন।

AMARBOI.COM

১৮. ডক্টর রফিকুল ইসলাম রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা' ১৯৮২ সন, এটি একটি পি-এইচ-ডি অভিসন্দর্ভ।

প্রথম ভাগে তথ্যের সঞ্চয় আছে, তবে কবি ব্যক্তিত্বের সামগ্রিকতার অবয়ব নেই। তা ছাড়া গ্রন্থটি উদ্ধৃতিবহুল ও অতিকথনদৃষ্ট। দ্বিতীয় ভাগেও কাব্যের সামগ্রিক কিংবা সামূহিক সামষ্টিক আলোচনা দুর্লভ, পৃথকভাবে কবিতাগুলোর কালিক প্রতিবেশ ও তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে মাত্র। ফলে তথ্যের আকর হলেও গ্রন্থটি উপলব্ধির, রসগ্রহণের তেমন সহায়ক নয়। তাছাড়া পরমতের উদ্ধৃতি কণ্টকিত ও অসংহত আলোচনা থেকে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মত-মন্তব্য সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য বা শ্রমসাধ্য কর্ম। উল্লেখ্য যে রফিকুল ইসলাম রচিত পূর্বেকার নজরুল জীবনী বইয়ের সম্প্রসারিত ও ঈষৎ বিন্যাসরূপ হচ্ছে আমাদের আলোচ্য এ গ্রন্থটি। যাহোক আমরা এ গ্রন্থের উপসংহারে পরিব্যক্ত লেখকের মতের নির্যাস তুলে ধরলাম ঃ

"যৌবন ধর্মের দুইটি বিশিষ্টগুণ বিদ্রোহ আর প্রেম। নজরুলে দুইটির উপস্থিতি প্রবল। প্রথমটির পরিচর্যা উদ্দীপনামূলক কবিতায় আর দ্বিতীয়টির গীতি কবিতায়। নজরুলের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব-মুক্তি তা ভাব-ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে যতটা কার্যকর, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ততটা নয়। এই প্রভাব-মুক্তি উদ্দীপনামূলক কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গীতি কবিতার ক্ষেত্রে নজরুল প্রচলিত কাব্য-ঐতিহ্যের অনুসারী। প্রেম-প্রকৃতি-সৌন্দর্যের যে রোমান্টিক বিষণ্ণতা বাংলা কবিতার আধুনিক যুগে বিহারীলাল থেকে শুরু হয়ে রবীন্দ্রনাথে চরম উৎকর্ষতা [উৎকর্ষ] লাভ করে, গোবিন্দ চন্দ্র দাস ও মোহিতলাল মজুমদারে যার সঙ্গে যুক্ত হয় দেহজ আবেগ, নজরুলের গীতি কবিতা সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাকে আরো অগ্রসর করেছে। প্রেমের শরীরী-রূপ বা রক্তিম বাসনার পূর্ণস্বীকৃতি দান করে নজরুল বাংলা প্রেম কবিতাকে বিহারীলালের মরমীতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ, মোহিতলালের নৈতিক অনুশাসন থেকে মুক্তিদান করে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করেছেন। ফলে বাংলাগীতি কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে।"

– অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম শারীর প্রেমের কবি হওয়ার যে গৌরব নজরুলকে দান করেছেন, তা কি নজরুলেরই মানস বিচরণের নতুন ক্ষেত্র; সংস্কৃত গাথায়, আর্যায়, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসে কিংবা হর-গৌরী, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-নাপ্পিনাই প্রণয়কথায় ছিল না? আধুনিক সাহিত্যে প্রেমকে সুফী বৈষ্ণবধারায় প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাবে অনুভবের উচ্চতর স্তরে তোলার যে প্রয়াস বিহারীলালে ও রবীন্দ্রনাথে প্রত্যক্ষ করি, নজরুল সে-স্তরের অনুভবের অনুশীলন মাত্র না করে শারীর আকর্ষণকে চরম ও পরম বলে বরণ করেন। তাই তাঁর প্রেমকবিতায় একটি মূলতত্ত্ব স্বীকৃত রয়েছে ঃ প্রেম চিরন্তন কিন্তু প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পরিবর্তন সাপেক্ষ। 'প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়। প্রেম এক প্রেমিকা সে বহু' (অনামিকা)। অন্য অনেকের একটি মতের ও সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি রফিকুল ইসলামের অপর একটি মন্তব্যে মেলে ঃ

'প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসাধনার প্রয়াস ছিল আধুনিক বাংলা কবিতাকে ঐ গতানুগতিকতা [রবীন্দ্র কাব্য মণ্ডল] থেকে মুক্তিদান করা। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনায় আমরা সে প্রয়াসের সার্থকতা লক্ষ করি।'

১৯. এ সূত্রে মোতাহার হোসেন চৌধুরীর একটি মন্তব্যও স্মর্তব্য (নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস প্রবন্ধ)।

'নজরুল ইসলাম রিনেসাঁসের প্রেরণা। বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর রচনার মারফতে তা আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হয়েছে।... রিনেসাঁস মূল্যবোধ ও যুক্তি বিচারের স্বাধীনতা, রিভাইভালইজম, অহমিকাবোধ, রিনেসাঁস সাধারণ মনুষ্যত্ব-প্রীতি, রিভাইভালইজম বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্যপ্রীতি। নজরুল ইসলামে সাধারণ মনুষ্যত্বের জাগরণই প্রাধান্য লাভ করেছে।... নজরুল ইসলাম বেড়াভাঙ্গার গান গেয়েছিলেন।'

২০. **নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে অরবিন্দ পোদ্দারের ধারণা ঃ** [কবি নজরুল প্রবন্ধ]

কাজী নজরুল ইসলাম Transition-এর যুগসংক্রান্তির কবি। নজরুলের কাব্যসাধনার আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি এমন একটা সময়ে যখন বাংলার রাজনৈতিক জীবন ছিল অস্বাভাবিক মাত্রায় চঞ্চল, রূপান্তরের ঘূর্ণাবর্তে বিক্ষুব্ধ। ... নজরুল সেই চঞ্চলতার সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।... নজরুল ইসলামে সেই প্রেরণা [ভারতবর্ষকে শৃঙ্খল মুক্ত করার] অভিব্যক্ত হল কাব্যের রূপ ধরে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে নজরুল কাব্য একাত্ম হয়ে গেল।... বাঙালী বিপ্লবীর রিভলবার যে ঋণ শোধ করতে চাইছিল তারই আবেগ উচ্ছ্বাস মথিত উদ্বেল রূপ আঁকলেন নজরুল কাব্যে।... কবি কীট্‌স বলেছিলেন 'poetry should please by a fine excess' নজরুলের কাব্য সবটাই excess কদাচিৎ fine আর ঐ excess টুকু বাদ দিলে কাব্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর প্রাণ থাকে না।... এই বিদ্রোহী কবির কাব্যে নির্যাতিত মানুষকে মানবিক মর্যাদা দানের যে আকুতি অভিব্যক্ত, মানুষকে মানবিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার যে-বেদনা পরিস্ফুটি, তা অন্যত্র সুদুর্লভ। আধুনিক বাংলা কবিতার যে আশ্চর্য প্রসার, তাতে বোধ করি নজরুলের এইটেই শ্রেষ্ঠ অবদান।

২১. নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে হাসান হাফিজুর রহমানের অভিমত : [কবি নজরুল—একটি সমীক্ষা প্রবন্ধ]

'নজরুল বাংলাকাব্যে যে নতুনত্ব এনেছেন, যে নতুন সুরের সংযোজনা করেছেন, তা-ই একজন কবিকে একটি কাব্যধারার ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট।... বলা চলে, নজরুল তাঁর সমসাময়িকতার আয়নায় সেই সময়ে বাংলাদেশের সমগ্র মানস আলোড়নের তিনি ধারক ছিলেন। সেই হিসেবে চেতনাগত দিক থেকে তাঁর 'সমসাময়িক বাংলা' ও তাকে বলা চলে।... নজরুল যেজন্যে কবি হিসেবে বাঁচবেন তা হলো তাঁর আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা এবং আবেগের তীক্ষ্ণতা, বিশ্বাসের তীব্রতা ও সংকল্পের স্থিরতা-নিশ্চয়তা এবং সামগ্রিকভাবে আত্মপ্রকাশোন্মুখ বিরাট বিশাল পৌরুষের দীপ্তি ও বলিষ্ঠতা এসব অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু এবং বাংলা কাব্যে আরো দুর্লভ।.. বাংলা কাব্যের জীবন-মুখিনতা ও জীবনবোধ নজরুলের হাত ধরে জীবন সম্পৃক্তিতে বিবর্তিত হয়েছে। ...তাঁর অন্তর্জ্বালার মৌলিক বীজগুলো হল অতৃপ্তি, অসন্তোষ, কোন কিছুতে বাঁধা না পড়ার, স্থির হয়ে না পড়ার আর্তিতে আকুল উত্তেজনা ... তাঁর প্রেমের কবিতাগুলো লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে পাওয়াকে তিনি সত্য করতে পারতেন না। প্রেমে ব্যর্থতা তাঁর মনোভাবজাত।... নজরুলের এই মনোভাব যৌবন ও তারুণ্যের উত্তেজনা, চঞ্চলতা, বীর্যবত্তা, সহৃদয়তা, প্রচণ্ড প্রেমাবেগ, সুতীব্র সহমর্মিতা, একান্ত উদ্যোগধর্মিতার মণ্ডনে মণ্ডিত হয়ে প্রতিফলিত।'

—হাসান হাফিজুর রহমানের এ মূল্যায়নের মূলে রয়েছে এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ওকালতি। উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবির ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতা আদায়ের প্রেরণার প্রসূন হচ্ছে এ রচনা। সবটারই ভিত্তি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি।

২২. ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী Introducing Nazrul Islam নামে একটি ছোট কিন্তু মূল্যবান বই লিখেছেন। [১ম সং ১৯৬৫, শোধিত ২য় সং ১৯৭৪] ইংরেজি ভাষায় রচিত বলে সে বইয়ের পরিব্যক্ত মত-মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করলাম না। তবে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নজরুল সম্বন্ধীয় বাঙলা প্রবন্ধও রয়েছে কয়েকটি। তাঁর প্রবন্ধগুলো সাধারণভাবে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর।

২৩. আমীর হোসেন চৌধুরী রচিত 'নজরুল কাব্যে রাজনীতি' মূলত নজরুলের উদ্দীপনামূলক ও কৃষক-শ্রমিক বিষয়ক সংগ্রামী কবিতার উদ্ধৃতিবহুল হালকা আলোচনা। নজরুল যে স্বাধীনতাকামী ও মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা প্রণোদনা-প্রবর্তনা দানের কবি, তা' এ নাতিদীর্ঘ আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে।

২৪. এম. আবদুল কুদ্দুস রচিত 'কুমিল্লায় নজরুল' (১৯৭৬) বইটির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। তিনি এ পুস্তিকায় এমন কতগুলো প্রণয় কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলো স্থানকালের দিক দিয়ে নার্গিসের ও পরে দুলীর তথা প্রমীলার সঙ্গে পূর্বরাগ অনুরাগের উন্মেষ ও বিকাশ নির্দেশক। তাঁর মতে ওই কবিতা ও গানগুলো কবির নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের তথা হৃদয় মনের বাস্তব অনুভব আকৃতি জাত। কুদ্দুসের ভাষায় এগুলো কবির "বেদনাবিজড়িত মর্মদহন জ্বালা ও বারতা।"

দৌলতপুরে রচিত কবিতা ও গান : পাপড়ি খোলা, হার মানা হার, মানসবধূ, অনাদৃতা, অবেলায়, বিদায় বেলায়, হারামণি, বেদন অভিমান, বিধুরা-পথিক প্রিয়া, মুকুলের উদ্বোধন, লাল সালাম, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, মটর শুঁটি, ঝিঙে ফুল, সর্ষেফুল, পৌষের শূন্য মাঠ, আমন ধানের ক্ষেত, সবুজ বন, মাছরাঙ্গা ঘর, কামরাঙা প্রভৃতিও দৌলতপুরে লেখা। আর কার বাঁশী বাজিল, প্রণয় ছল প্রণয় নিবেদন, শরাবন তহুরা, দুপুর অভিসার, সাধের ভিখারিণী, নিশীথ প্রতিম, অবেলার ডাক, মিলন মোহনায়, ব্যা গরব, অভিশাপ, আশান্বিতা, অকরুণপ্রিয়া, শেষের গান, তোমায় পড়িছে মনে, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, বেদনামণি, হিংসাতুর, পরশপূজা, দেখ মোরে পাছে ঘুম ভাঙ্গিয়াই ঘুম না টুটিতে তাই চলে যাই, যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই–প্রভৃতি কবিতা ও গান নার্গিসকে অবলম্বন বা লক্ষ্য করে লেখা।

নার্গিস সম্বন্ধীয় কবির একটি স্বীকারোক্তি "এক অচেনা পল্লীবালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি যা কোন নারীর কাছে কখনও হইনি (রচনা সম্ভার ১ম খণ্ড, ২৩১–৩২]।

দুলীকে নিয়ে রচিত গান ও কবিতা : মনের মানুষ, পূজারিণী, সমর্পণ, বিজয়িনী, অভিমানিনী, প্রিয়ার রূপ, শায়ক বেঁধা পাখী, চিরচেনা, স্তব্ধবাদল, দোদুলদুল ও চপল পাখী।

এসব কবিতা ও গান বিধৃত হয়েছে দোলনচাঁপায়, ছায়ানটে, পুবের হাওয়ায় ও চক্রবাকে।

২৫. এ. আবদুল মজিদ সংকলিত 'নজরুলের প্রেমের কবিতা'য় (১৩৭৮) একটি ভূমিকা বা আলোচনা থাকলেও তা প্রত্যাশিত মানের নয়। তবে নজরুল রচিত প্রেমের কবিতাগুলোর প্রায় সব কয়টিই হাতের কাছে পাওয়া যায়, এ বইয়ের মাত্র এটিই গুণ।

কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন একান্তই কবি, দার্শনিক ছিলেন না, কিংবা ছিলেন না কবি-দার্শনিক। ফলে এক প্রকারের রোমান্টিক কবি হলেও তাঁর মানসোত্থিত ভাবের কবি ছিলেন না, ছিলেন বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত জ্বালাযন্ত্রণার অভাব পীড়নের কবি। এ জন্যে তার কবিতায় তত্ত্ব নেই, রয়েছে তথ্য। আর তথ্য মাত্রই দল বা শ্রেণী স্বার্থে বিতর্কের বিষয় হতে পারে বটে, তবে নিরাসক্ত বিবেকবান তাতে বিতর্কের কারণ ও প্রয়োজন খুঁজে পান ক্বচিৎ।

একটা 'চেয়ার' চেয়ার কি-না তা নিয়ে চক্ষুষ্মানের মধ্যে তর্ক চলে না–তেমনি নজরুল কাব্য-ধৃত শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার কথা নিয়েও উচ্চমার্গের তাত্ত্বিক বিতর্ক চলে না, এ জন্যে নজরুল সাহিত্যের আলোচনা দার্শনিক সূক্ষ্মতার অভাবে উচ্চমার্গের উচ্চমানের হতে পারে না, পারে না সমালোচকদের মধ্যে মতে-মন্তব্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের দেয়াল তৈরি করতে। নজরুলের প্রেমের গান এবং কবিতাও শারীর বলে তাতেও কোন সূক্ষ্ম আলোচনার কিংবা গভীরতার জীবন সত্যের উপলব্ধির সুযোগ মেলে না।

বস্তুত নজরুলের ছন্দে-প্রবন্ধে, গল্পে-উপন্যাসে, নাটকে রচিত সাহিত্য, তত্ত্বঋদ্ধ, ভাবগর্ভ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বাক্য বা চরণ দুর্লভ। তাই নজরুল সাহিত্য পড়তে, বোঝাতে বিশেষ কোন মনীষার, মনস্বিতার, শাস্ত্র সমাজের কিংবা আর্থরাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। জনপ্রিয় কিংবা বাস্তব জীবনে শাস্ত্র-সমাজ-রাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ প্রেরণার-প্রণোদনার কবি হলেও এমন কবির রচনার শিল্প সৌন্দর্য, মাধুর্য কিংবা রূপ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপক আলোচনা করা সম্ভব হয় না। অথবা জগৎ জীবন সম্বন্ধে কবির চিন্তা চেতনার বৈশিষ্ট্য কিংবা তাত্ত্বিক-দার্শনিক উপলব্ধির স্বরূপ সন্ধানমূলক আলোচনাও বেশিদূর এগোয় না।

এ কারণেই নজরুল সম্বন্ধে বিচিত্রভাবে আলোচনা করা, আকর্ষণীয় নতুন কথা বলা প্রায় অসম্ভব। যে কারো আলোচনা মনে হয়, 'অতি পুরাতন কথা নব আবিষ্কার' মাত্র।

শ্রোতার বা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা না করে, নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্তে কলম ধরার সাহস পাওয়া প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাহোক নজরুল কাব্য পড়াতে পড়ানোতেই সুখ, ও-ই হচ্ছে নগদপ্রাপ্তি। গণমানবের দুঃখ মোচনের, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রেরণাও মিলবে কাব্য পাঠে, আলোচনা সমালোচনা পড়ে নয়।

আগেই বলেছি, আবার বলছি, নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন কিংবা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন নজরুলের বন্ধু কিংবা ভক্ত, ক্বচিৎ কেউ কাব্যরসিক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকরেট উপাধি লাভ লক্ষ্যে যান্ত্রিক পদ্ধতির গবেষক। তাই অনুরাগ, ভক্তির স্তাবকতা প্রভৃতির প্রকাশ যতটা ঘটেছে, নজরুল কাব্যের বা তাঁর সামগ্রিক দানের প্রকৃত মূল্যায়ন প্রয়াস ততটা হয়নি।

স্তাবকতা ছাড়াও আলোচনা-সমালোচনার বইগুলোতে অনুকৃতি কিংবা অনুভূতি আবিষ্কারমূলক তুলনা প্রধান আলোচনাই ঠাঁই পেয়েছে বেশি, আর কেউ কেউ করেছেন কবিতার আঙ্গিক ত্রুটির সন্ধান, কেউ কেউ নজরুল কাব্যে ভাবে ভাষায়, ছন্দে এবং অবয়বে ও অনুভবে, অঙ্গ ও অন্তরে ক্রমবিকাশের ও উৎকর্ষের অভাব লক্ষ করেছেন। আবার নজরুল প্রভাবিত কবিগোষ্ঠীর কথাও কোন কোন বইতে সগর্বে ও সগৌরবে উচ্চারিত হয়েছে। এসব ছাড়া নজরুল কাব্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্য, শোষণমুক্তি, সমাজনীতি, শাস্ত্ররীতি, প্রেম ও প্রকৃতি আর ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক কবিতার ও গানের পৃথক পৃথক আলোচনা, তারিফ ও মূল্যায়ন প্রয়াসও রয়েছে প্রায় সব গ্রন্থেই।

নজরুল ইসলাম ও নজরুলকাব্য বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা আটাশীর উপর। এগুলোর মধ্যে গান ও কাব্য সংকলন, জীবনী আর স্মৃতিকথাও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন কবিতা ও গান রচনার দিন-কাল-উপলক্ষ বর্ণিত হলেও কাব্যের গুণাগুণ আলোচিত হয়নি। সেজন্যে সেসব গ্রন্থ এ অধ্যায়ে পরিচিতি পায়নি।

দুনিয়াব্যাপী সাহিত্যজগতে অনুকৃতি-অনুসৃতি ও মৌলিকতা দেখানোর জন্য তুলনামূলক আলোচনা-সমালোচনার রেওয়াজ আছে বটে, তবু আমরা এখানে স্বীকৃত রীতির রেওয়াজ বিরোধী কিছু কথা বলতে চাই কারুর সমর্থন মিলবে না জেনেও।

ভাষা কারুর ব্যক্তিগত সৃষ্টি না। ভাষা সাধারণের সমাজের সৃষ্টি। যদিও প্রতিটি শব্দ হয়তো গোড়ায় ব্যক্তি বিশেষেরই ছিল উদ্ভাবিত। সেই পুরোনো আটপৌরে ভাষায় অঞ্চলবাসী সব মানুষেরই রয়েছে সম অধিকার, সবারই তা' ঐতিহ্য উত্তরাধিকার এবং মন-প্রাণের সম্পদ, অস্তিত্বেরই অপরিহার্য অংশ।

সেই সাধারণ সর্বজনীন শব্দের ও বাকরীতির ব্যক্তিক প্রয়োগে ভাষা ও ভঙ্গি হয় ব্যক্তিক স্বতন্ত্র সৃষ্টি ও সম্পদ। সাধারণ সম্পদ এভাবেই হয়ে ওঠে ব্যক্তিক ঐশ্বর্য–ব্যক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষের মন-মননের, রুচি-বুদ্ধির, আনন্দ-যন্ত্রণার অভিব্যক্তির বাহন। সে অভিব্যক্তিতে তখন বিশেষ ব্যক্তি থাকে, সমাজ বা সাধারণ মানুষ থাকে না।

অতএব, ভাষার মন-মনন-অনুভব জড়িত অভিব্যক্তিই ব্যক্তিক ভাষাশৈলী বা স্টাইল। সূচিত শব্দে বাক্যে, বক্তব্যে বিন্যস্ত উক্তিই শ্রুতিমধুর হয় এবং বক্তব্য যৌক্তিক কিংবা রসাত্মক হলেই হয় হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্য তথা কাব্য হচ্ছে সেই রসাত্মক বাক্য বা বক্তব্য। সূচিত শব্দের সুবিন্যাসের যে সুষমধ্বনি ও বাকের সামগ্রিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়, তাই সাধারণের উচ্চারিত বা লিখিত বাক্য থেকে কবি শিল্পীর উচ্চারিত বা রচিত বাক্যকে বিশিষ্ট করে তোলে। যেমন, চেহারা যেমন ভূতের মতন। তেমনি অতিঘোর নির্বোধ। কিংবা শুধু দুই বিঘে মোর ভুঁই ছিল আর সব ঋণে গেছে। কথাগুলো ঃ

ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর,
শুধু বিঘে দুই, ছিল মোর ভুঁই, আর সব গেছে ঋণে,

– এভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে সুষম ধ্বনিবদ্ধ হয়ে হয়েছে কবিতার চরণ। মানুষের কোন ভাব-অনুভব, কোন চিন্তা-চেতনাই নতুন নয়। কেননা বিশেষ শ্রেণীর প্রাণিসত্তা হিসেবে তাবৎ মানুষের ইন্দ্রিয়জ চেতনা ও চাহিদা সচেতন ও অবচেতন অবস্থায় জাগ্রত কিংবা সুপ্ত থাকে দেশ-কালের প্রতিবেশে সম্ভব–এ উপলব্ধির ফলে। অতএব, বিশেষ দেশের ও কালের এবং বিশেষ শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক প্রতিবেশ থেকেই মানুষের ভাব-অনুভবের চিন্তা-চেতনার ভয়-ভরসার প্রয়োজনবৃদ্ধির ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম। এগুলোতে সবার সমান অধিকার থাকলেও রুচি বুদ্ধির মাত্রাভেদে মানুষের মানস-প্রবণতা বা কামনা-বাসনা, অভিপ্রায়-অভিলাষ থাকে বিশেষ ক্ষেত্রে, বিষয়ে ও বস্তুতে সীমিত। তাই সম-অবস্থানের ও সমরুচি বুদ্ধির লোক তাদের চারদিকে সবকিছু দেখে বটে, কিন্তু সবকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না, কেবল স্ব-স্ব মানসপ্রবণতা বশেই বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই জন্যই সমবিদ্যার দুই লোকের মধ্যে একজন সিনেমা দেখে পায় আনন্দ, অন্যজন সেমিনার শুনে হয় তৃপ্ত। কারুর আসক্তি জুয়ায়, কারুর মদে, কারুর বা লাম্পট্যে সুখ। অনুসৃতির উৎস এ-ই। দেশকাল প্রতিবেশ ও ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ কোন চিন্তা-চেতনা অনুভব উপলব্ধি থাকতে পারে না। সবটাই প্রতিবেশে দৃশ্য, অদৃশ্যভাবে রোগজীবাণুর মতই ভাসমান। বলেছি, কোন ভাব-চিন্তা-বিষয়ই, কোন কামনা-বাসনাই নতুন নয়, কেবল প্রতি নতুন মানুষের চোখে পৃথিবীটা, জীবনটা, জীবনে অনুভব উপলব্ধিটা নতুন। তাই সে নতুনভাবে পুরোনো জগতে পুরোনো জীবনচেতনার নতুন উপলব্ধির নিরিখে যাচাই ও ঝালাই করে। তাতেই সবটাই নিত্যনবরূপে প্রতিভাত হয় জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে অনুসৃত ও অনুকৃত ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণ ও তাই নব প্রয়োজনে নতুন তাৎপর্য ও লাবণ্য লাভ করে।

নাট্যকার শেকস্‌পীয়ারের প্রায় সব নাটকের গল্পই পড়ে ও শুনে পাওয়া এবং তা'ও ব্রিটেনের সীমায় নিবদ্ধ নয়–গোটা য়ুরোপ থেকে নেয়া। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী কাব্য কিংবা বউঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি উপন্যাস, বাল্মীকি প্রতিভা, বিসর্জনাদি নাটক এবং গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যগুলোর ইতিবৃত্ত মহাভারত, পুরাণ, জাতক প্রভৃতি থেকে নেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প, কিংবদন্তী, কাহিনী বা সত্য মিথ্যা বৃত্তান্ত। তাই বলে শেকস্‌পীয়ার-রবীন্দ্রনাথ কি অনুকারক-অনুসারক!

অতএব, প্রতিবেশ নিরপেক্ষ জীবন ও জীবনচেতনা নেই, তাই মানুষকে বাস্তবজীবনে ও মনোজীবনে অতীতের রীতি-নীতির, আচার-আচরণের, ভাব অনুভবের, চিন্তা-চেতনার, উপযোগ-উপলব্ধির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব স্বীকার করতেই হবে। শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য ক্ষেত্রে অনুকৃতি ও অনুসৃতি শাস্ত্রের ও সমাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মতই স্বাভাবিক। এমনকি পুরানোর বিরুদ্ধে দ্রোহতেও প্রকাশ পায় অনুসৃতির জ্বালা ও প্রভাব।

আশৈশব মানুষ যা দেখে, শোনে, জানে তার প্রভাব থেকে জীবনে কখনো মুক্তি পায় না, অবচেতন মনেও দাগ থেকে যায়। কাজেই অতীত ও ঐতিহ্য পরোক্ষ হলেও মানুষের জীবন ও মন নিয়ন্ত্রণ করে লঘু-গুরুভাবে। কোন প্রতিভাবান দ্রোহীও অতীতের সবটা ছুড়ে বা মুছে ফেলতে পারে না। দ্রোহী নবী অবতারেরাই তার প্রমাণ।

কাজেই লেখকরাও স্ব-কালে প্রচলিত বাক্‌ধারা, প্রবাদ, প্রবচন, সুভাষিত বুলি এবং ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ইতিকথা প্রভৃতি সবকিছু থেকেই স্ব স্ব প্রয়োজনে ভাব-ভাষাবিষয়কে গ্রহণ করেন। এবং একই প্রয়োজনে বিদ্বান লেখকেরা বিদেশী ভাষায় ব্যক্ত ভাব, বর্ণিত বিষয় এবং প্রযুক্ত শব্দও গ্রহণ বরণ করেন। এককথায় চিরকাল ইন্দ্রিয়জ ও মনোজ ভাব-অনুভব এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞা একত্রিত হয়ে, মিশ্রিত হয়ে, রূপান্তরিত ও রসান্তরিত হয়ে নবমাত্রায়, নতুন আকারে, নবতর প্রকারে প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিজনের প্রতিজন্মের প্রতিদেশে প্রতিমানুষের সচেতন অনুভবের ও মননের ফসলরূপে। যেহেতু জ্ঞানের বাইরে সব মানবিক ভাব-অনুভব পুরোনোই কেবল উৎকর্য-অপকর্থ ব্যক্তির সামর্থ্যও জীবন দৃষ্টি ভেদে। আর ভাষায় ভঙ্গিতে মতে-মন্তব্যে রূপভেদ ঘটে স্থানিক কালিক ও প্রাতিবেশিক প্রভাবে। তাই যে কোন উত্তরসূরির চিন্তায়-চেতনায়, ভাবে-অনুভবে পূর্বসূরির ভাবের আভাস, চরণের অনুকৃতি, বক্তব্যের সাদৃশ্য বিরূপ প্রতিরূপ কমবেশি মেলে।

অতএব, শিল্পী-সাহিত্যিক, স্থাপতি-ভাস্কর প্রভৃতি সবাই ঐতিহ্যের ও পূর্বসূরির কাছে কম-বেশি ঋণী থাকেনই। এ তাৎপর্যে রবীন্দ্রনাথ মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, জাতক কাহিনী, দৈশিক ইতিবৃত্ত, কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত কবি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, ব্রাউনিং প্রভৃতি ইংরেজি কবির কাছে তার অলঙ্কার ও বিষয়বস্তুর জন্যে ঋণী, তেমন ঋণী দুনিয়ার তাবৎ কবি। কাজেই নজরুলও সে অর্থেই রবীন্দ্রনাথের, সত্যেন্দ্রনাথের ও হুইটম্যানের অনুকারক বা তাঁদের কাছে ঋণী, কিংবা জীবানন্দ দাস, ফররুখ আহমদ প্রমুখ নজরুলের অনুসারক। নজরুলের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব গভীর, সম্ভবত রবীন্দ্র-সঙ্গীত তিনি কণ্ঠে ও স্মৃতিতে বেশি ধারণ করেছিলেন বলেই। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আর হুইটম্যানেই পেয়েছিলন তাঁর আবেগের ও বক্তব্যের সমর্থন ও সাদৃশ্য। জীবনানন্দ কবিতায় নবযুগের ভাব-ভাষা শব্দ ভঙ্গি সন্ধানে নজরুলেই আশ্রয় করেছিলেন। অন্য কয়েকজন কবিও তাঁকেই করেছিলেন শব্দে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্যে-বক্তব্যে অনুসরণ। তবু পার্থক্য কি সামান্য, স্ব-স্ব সত্তার ছাপ কি কম, ভাব-ভাষা-ছন্দ-ভঙ্গি-ধ্বনি কি অভিন্ন? গুণ-মান-মাত্রার ভেদ কি দুর্লক্ষ্য?

অতএব, তুলনামূলক আলোচনা জ্ঞানের ও জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তিব্যঞ্জক বটে, কিন্তু মূল্যায়নের সহায়ক নয়। যে কোন কবি তাঁর অভিব্যক্তির প্রতি পাঠককে যতটুকু আকৃষ্ট করেন, ততটুকই তার সাফল্য। যে শ্রেণীর পাঠক তার রচনার অনুরাগী, তাঁর কবিতার মূল্যও কেবল সে শ্রেণীর কাছে এবং কবিরূপে তাঁর স্বীকৃতিও তাদের কাছেই। সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সমেতই তিনি এক শ্রেণীর সমঝদারের কাছে সার্থক কবি। তাঁর কবিতা তাদের কাছেই অমৃত আর তিনি অমর। জগতে কয়জনইবা মহৎ কবি, কয়জনইবা দেশকাল জয়ী জনপ্রিয় কবি সাহিতিক। এত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নজরুল ইসলাম বহু বহু কালে বাঙলার, বাঙালীর ও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ হিসেবে অবশ্য স্মরণীয় থাকবেন, তাঁর শক্তির অব্যবহারের জন্যে নিন্দা করতেও তাঁকে স্মরণ করতে হবে, পড়তে হবে তাঁর গদ্য-পদ্য সব রকমের রচনার কিছু কিছু। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভক্তরূপে না হোক অরিরূপে নজরুলের আলোচকের স্মরণকারীর অভাব হবে না কখনো। এ সৌভাগ্যই বা হয় কয়জনের। জীবৎকালে নগণ্য আর মৃত্যুর পরে বিস্মৃত থাকাইতো অধিকাংশের প্রয়াসের পরিণাম।

কাব্যের তথা লেখার বিষয়বস্তুর ও বক্তব্যের সাময়িকতার জন্যে মূল্য কালান্তরে ও স্থানান্তরে না থাকলেও একটা বিশেষ দেশ-কালের সমাজের আনন্দযন্ত্রণার সমস্যা-সঙ্কটের সাক্ষ্য হিসেবে ঐতিহাসিক ও সমাজতান্ত্রিক মূল্য থাকে চিরস্থির ও অক্ষয়। কেননা, এ কবি কালন্তর, যুগন্ধর, স্বকালের সাক্ষ্য ও ইতিহাস তাঁর কাব্য।

AMARBOI.COM

৩. কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ

১. কাজী নজরুল ইসলামের শাস্ত্র, সমাজ ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু ঋজু বাঞ্ছা ছিল–যা যে-কোন সাধারণ সচেতন মানুষের থাকেই। কুসংস্কার ও কুআচারমুক্ত শাস্ত্রানুগত্য, দুষ্ট-দুর্জন বিহীন এবং দুর্নীতি, দুঃশাসন ও শোষণ-পীড়নমুক্ত সমাজ আর বিদেশীর শাসন-শোষণমুক্ত স্বদেশ–এসব তাঁর বাঞ্ছা মাত্র, মতাদর্শ নয়। বলতে গেলে এসব ক্ষেত্রে নজরুলের কোন সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট মত-পথ ছিল না, শাস্ত্র কি এবং কেন, সমাজের ও ব্যক্তির সত্তা ও স্বার্থ কিরূপ, শাসক স্বদেশী-স্বজাতি ও স্বজন হলেই দেশ বা মানুষ স্বাধীন হয় কিনা–এর প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তার মনে কোন দিনই জাগেনি। তিনি সারা জাগ্রত-জীবনে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও সংগ্রামের বাণী ও সংকল্প উচ্চারণ করেছেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহের আয়োজনে, বিপ্লবের প্রয়োজনে এবং সংগ্রামের উদ্যোগে কি কি পুঁজি ও পরিকল্পনা থাকা পূর্বশর্ত, তা কখনো তাঁর চিন্তায়, কথায় ও কাজে আভাসিত হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়-ভরসার প্রেরণায় যে কল্পনানির্ভর বিশ্বাসের উদ্ভব, সে বিশ্বাসের ও বিশ্বাসজাত আচার-আচরণের সমষ্টিই শাস্ত্র। শাস্ত্রমানা মানুষ ইহ-পরলোকে প্রসারিত জীবনে তাই মুক্তির অনুগত হতে ভয় পায়, সে-মানুষের কাছে যুক্তির আবেদন যে বৃথা তা নজরুল বোঝেননি বলেই বার বার শাস্ত্রের উপর বিবেককে ঠাঁই দেয়ার জন্যে বৃথা আবেদন জানিয়েছেন। মূলে ব্যক্তিসত্তার নিরাপদ স্থিতি ও বিকাশের জন্যেই যৌথজীবন অঙ্গীকার করে ব্যক্তির দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ক নিয়ম-নীতি মানার শর্তে 'সমাজ' গঠিত হলেও, ব্যক্তির ও সমাজের সত্তার ও স্বার্থের সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করা কখনো সম্ভব হয়নি। ফলে কখনো লঙ্ঘিত হয়েছে সমাজনীতি, কখনো পীড়িত হয়েছে ব্যক্তি। এভাবে প্রবহমান জীবনে কখনো শাস্ত্রের ভূত মানুষের ঘাড়ে চেপে তাকে করেছে অচল, কখনো সমাজের দানব মানুষের ভেঙেছে ঘাড়।

আর স্বাধীনতা অর্থে নজরুল স্থূলভাবে বুঝেছেন ব্রিটিশ বিতাড়ন, আর দারিদ্র্য দূর করবার পন্থা হিসেবে সাম্যের কথা বললেও এর তাৎপর্য চেতনা তাঁর তেমন ছিল না–তাই এতে তাঁর প্রত্যয়ও ছিল না স্থির। উদ্দীপনা সঞ্চারক তাঁর কোন কোন কবিতায় সেজন্য (রক্তাম্বরধারিণী মা, হরকালী, উদ্বোধন, অভয়মন্ত্র, জাগৃহি) দেবতা-বিধাতা ও সত্যই প্রেরণার প্রতীক। তাঁর প্রথম গদ্য রচনা 'ব্যথার দান' থেকেই শুরু করা যাক। এ গল্পে নারীর প্রতি আকর্ষণ যেভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে, তা প্রেমে উত্তীর্ণ হয়নি, মোহের স্তরেই রয়ে গেছে, না পাওয়ার অসহ্য যন্ত্রণার নায়ককে ঘর ছাড়তে হয়েছে, এমনি অবস্থায় শরৎচন্দ্রের দেবদাস বেশ্যাসক্ত ও মদ্যপ হয়েছিল, নজরুলের নায়ক দারা যুদ্ধে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপের মতো পরোক্ষ আত্মহননের উদ্যোগ নিয়েছিল। 'বাঁধনহারা' ও সুতীব্র অনুরাগের সাক্ষ্য, প্রেমের সাক্ষ্য নয়। 'মৃত্যুক্ষুধা'য় কিম্বা 'কুহেলিকায়' স্বদেশ ও স্বজাতি চেতনা মুখ্য বটে, তবে বিপ্লব সন্ত্রাস এবং মুক্তি অন্বেষা অনির্দেশ্য আবেগতাড়িত উচ্চারিত সংকল্প বিশেষ কেজো কর্মসূচি নয়। অশ্রুসায়রে চড়াপড়া বেদনার মহাভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে ও বিপ্লবে মুক্তি আনয়ন সম্ভব এবং বাঞ্ছিতও কবি কেবল এটুকুতেই দৃঢ়বিশ্বাসী। অবশ্য কবিরা সাধারণভাবে জাতির কল্যাণে জাতীয় জীবনে উদ্দীপক বাণীর উদগাতা হিসেবেই তাঁদের ভূমিকা পালন করেন। কবিরা দেখবেন স্বপ্ন, আঁকবেন মানচিত্র। কবিস্বপ্ন ও কবিকল্পিত চিত্র বাস্তবে রূপায়িত করবে বহুজনহিত ও বহুজনমুখকামী আদর্শবাদী মানবদরদী বীর কর্মীরা। সে দিক দিয়ে নজরুলের বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়। তবে অন্য কবি-লিখিয়েরা যেখানে পার্বণিক প্রয়োজনে ও তাৎক্ষণিক আবেগে দেশ-জাত-মানুষ-সমাজ-সম্বন্ধে কিছু রচনা করেছেন। সেখানে নজরুল ইসলাম দেশ-জাতি-সমাজ মানুষের হিতব্রতী হয়েই তাদের দুঃখমোচনের অঙ্গীকার নিয়েই ধরেছিলেন কলম। তাই তাঁর কাছে প্রত্যাশা যেমন বেশি ছিল, দাবিও ছিল তেমনি জোরালো। যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকের ক্ষেত্রে তার নেতৃত্ব ও ভূমিকা বিশৃঙ্খল হলেও কখনো নির্লক্ষ্য ছিল না বলেই তা অনন্য ও অসামান্য। গোড়ার দিককার দশ বারো বছর ধরে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে রচনার মাধ্যমে সংগ্রামী চেতনা দানে ছিলেন নিষ্ঠ–নিরত।

খুব সচেতনভাবে না হলেও তিনি বুঝেছিলেন রাজনৈতিক মুক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু নয়। স্বাধীন হবার জন্যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে এবং স্বাধীনতা উপভোগ করার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের মানুষের যোগ্যতা অর্জন জরুরী। তাই তিনি যুগপৎ শাস্ত্রের, কুসংস্কারের, দারিদ্র্যের, অশিক্ষার ও সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন থেকে দেশবাসীর ও স্বধর্মীর মুক্তির পথনির্দেশেও ছিলেন মুখর এবং সক্রিয়। এজন্যেই নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক ও চিন্তাচেতনা ও চরিত্র্যের স্বরূপ বুঝতে হলে তাঁর শাস্ত্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, স্বাধীনতাবোধ ও আর্থসামাজিক শোষণ-পীড়নের প্রতিরোধ উপায়চেতনা সম্বন্ধেও যুগপৎ আলোচনা আবশ্যিক। লক্ষণীয় যে নজরুল এসব দ্রোহে-আন্দোলনে-সংগ্রামেও 'সত্য'কেই পরম সাধ্য বলে জেনেছেন।

২. রাশিয়ায় সোভিয়েতদের সাফল্যের ফলে মার্কস-এঙ্গেলস্ লেনিনের মতবাদের প্রভাবে একটা বিপ্লবীচেতনা ভারতবর্ষেও মন্থরগতিতে প্রসার লাভ করেছিল। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এমনকি সাম্যবাদ, সমাজবাদও আফ্রো-এশিয়ায় ও ল্যাটিন আমেরিকায় মানুষকে নতুন স্বপ্নে, আশায় ও উদ্দীপনায় সাহসী ও উদ্যোগী করে তুলছিল। যন্ত্রশক্তির ও প্রযুক্তির প্রসারে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের নীতি নিয়মের মূল্যবোধ হচ্ছিল শিথিল। ডারউইন, মার্কস, পরে ফ্রয়েডও মানুষের মনে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-বুদ্ধির প্রসারে, ভূতুড়ে বিশ্বাস পরিহারে সহায়তা করছিল। কোলকাতায় নজরুল ইসলামও পেয়েছিলেন এমনি মানস-প্রতিবেশ কিছুটা, যদিও য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে দর্শনে রাজনীতিক ইতিহাসে প্রত্যক্ষ বিচরণের স্বল্পতার কিংবা অভাবের ফলে বিশ্বাস-সংস্কারের ভূতুড়ে উপদ্রব থেকে তাঁর মন-বুদ্ধি-বিবেক কখনো মুক্তি পায়নি। তবু অমিত প্রাণশক্তির প্রতীক বেহিসেবি বেপরোয়া অকুতোভয় উচ্ছল সামুদ্রিক তরঙ্গ প্রতিম অতিক্রান্ত কৈশোরে নবযৌবনে বাঙলা সাহিতের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় 'সব কটা জানালা খুলে নতুনের হাওয়া প্রথম যিনি সবেগে বইয়ে দিলেন, তিনি নজরুল ইসলাম' (কালের পুতুল)। রাজনীতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুন যুগের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন নজরুল ইসলামই। কবির চিন্তা-চেতনায় রাজনীতিক মত-পথ কিংবা সাধন-পদ্ধতি কোন সুস্পষ্ট মূর্তরূপ না পেলেও, বারো বছরে যুগ ধরে তিনি উচ্চকণ্ঠে উদাত্তস্বরে দ্রোহের, বিপ্লবের, সংগ্রামের বাণী অবিরাম অবিশ্রাম উচ্চারণ করেছেন। স্বীকার করতেই হবে যে বিপ্লবের একটা প্রবল রঙিন এষণা তাঁর ছিল। তার কণ্ঠেই শাস্ত্রিক ও সামাজিক কুসংস্কারের, শোষণ-পীড়নের, দুর্নীতি-দুঃশাসনের, সমকালীন জীবনবিরোধী নীতি-আদর্শের প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সরল কবি অকপটে বলেছেন (সাহিত্যে) 'আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলতে চেয়েছি। আমি যা অনুভব করেছি, তা-ই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না।' তাঁর কাব্য তাই 'নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সরব প্রকাশ... বেদনাতুরের কান্না।' তার দ্রোহ-বিপ্লব বাণীও তাই 'নিখিল আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রণা চিৎকার।' অবশ্য নজরুলের স্বভাবের মধ্যেই ছিল বন্ধনভীরুতা ও আদিম আরণ্য স্বাধীনতার তথা স্বেচ্ছাচলনে অনুরাগ। নজরুল মূলত ছিলেন সংবেদনশীল পরদুঃখকাতর (বাল্যে পাখির বন্ধনে ব্যাকুল নজরুল স্মর্তব্য)। এগুণই তাঁকে মানবদরদী করে–করে মানবতায় আস্থাশীল এবং তা-ই দেশ-কালের প্রভাবে সাম্যবাদে অনুরাগ জাগায়–যদিও সাম্যবাদের মর্ম ও মূল্য কোনটাই তাঁর সম্যক অধিগত ছিল না, জানবার বুঝবার চেষ্টাও ছিল না কখনো–এমনকি 'লাঙ্গল', 'ধূমকেতু' পরিচালনার সময়েও। এবং বলা বাহুল্য নিহিলিণ্ট বা নৈরাজ্যবাদীও তিনি নন। এ-ও বাহ্য, আসলে আশৈশবের পরিবেশ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কারবশে তিনি ইসলামী শিক্ষার গুণ-মান-মাহাত্ম্যও গভীর অনুরাগে ও পরম মমতায় মনের মধ্যে সারা জাগ্রত জীবনে জিইয়ে রেখেছিলেন। তাই ইব্রাহীম খাঁকে লিখিত এক পত্রে নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন, ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ। ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমিতো স্বীকার করিই... আমার বহু লেখার মধ্যে দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমাগান করেছি' (সোনার শিকল)।

৩. নজরুল প্রত্যক্ষভাবে দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমেই রাজনীতিচর্চা শুরু করেন। ১৯২০ সালে এ. কে. ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক নবযুগে' পত্রিকা সম্পাদনাকালেই পত্রিকার নীতির অনুগত তাঁর বক্তব্য অভিব্যক্তি পায়। ১৯২২ সনের ১২ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত তাঁর 'ধূমকেতু'। পত্রিকাতেই তাঁর মনের, মতের ও পথের স্বাধীন ও নির্ভীক প্রকাশ ঘটতে থাকে। পত্রিকার আদর্শ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক (সারথি) বলেন, 'দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী মেকি, তা সব দূর করতে ধূমকেতু আগুনের সম্মার্জন (রুদ্রমঙ্গল রচনাবলী, পৃঃ ৬৯০)। এ পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্যে নজরুলকে ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

'ধূমকেতু'তেই সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা দাবি করা হয়। 'সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। পূর্ণস্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম কানুন বাধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে' (রচনাবলী, ১ম খণ্ড, রুদ্র মঙ্গল, পৃঃ ৬৯৭, ধূমকেতু পথ)। 'ধূমকেতুর' আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল–'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য' (আমার পথ, রুদ্রমঙ্গল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯০)। এ উদ্দেশ্যেও ফাঁকি বা কাপট্য ছিল না, তার প্রমাণ রুদ্র মঙ্গলের রচনাগুলো।

১৯২৫ সনে নজরুল ইসলামের, হেমন্ত কুমার সরকারের, কুতুবউদ্দীন আহমেদের ও শামসুদ্দীন হোসায়নের উদ্যোগে 'The labour swaraj party of the Indian National Congress' নামে এক সমিতি গঠিত হয়। এরই মুখপত্র হয় 'লাঙ্গল' নামের পত্রিকা। প্রধান পরিচালক হন নজরুল ইসলাম (নজরুল প্রসঙ্গে স্মৃতিকথা মুজফফর আহমদ)। এ পত্রিকায় সাম্যের বাণীও উচ্চারিত হয়। কবি বলেন–যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান। গাহি সাম্যের গান।'

'সর্বহারা' কাব্যের শ্রমিকের গান, কৃষাণের গান, সাম্যবাদী, চোর ডাকাত, কুলি মজুর, মানুষ প্রভৃতিতে– কবির নিজের কথায়– দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি।'–দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী দরিদ্র মোর ভাই।'

'ধূমকেতু'তে নজরুলও যন্ত্রযুগে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শোষণ সম্বন্ধীয় মার্কসের উক্তির Naked (নগ্ন) Shameless (নির্লজ্জ) Direct (প্রত্যক্ষ) 'Brutal' (পাশব) Exploitation (শোষণ) অনুসরণে বলেছেন–"রেল স্টীমার, বিদ্যুৎগাড়ি, কল-কারখানা মানুষের আরামের জন্য সৃষ্টি হইতে লাগিল। (আর) কোটি কোটি মানুষ ... অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য পশুর দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগল। কোটি কোটি জীবনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে লাগল।' এই সূত্রে চোর ডাকাত কুলি মজুর কবিতা স্মর্তব্য। দুঃখী মানুষের কথা বলেছেন বলেই রুশ লেখক দস্তয়ভস্কি ও ম্যাক্সিম গোর্কি ছিলেন নজরুলের প্রিয় লেখক। প্রথমোক্তজন সাহিত্যে এনেছেন, তাঁর মতে–'বেদনার মহাপ্লাবন' আর দ্বিতীয় জনের সাহিত্যে আবির্ভাব বেগবান তুফানের বা সাইক্লোনের মতো। কার্ল মার্কসও ছিলেন নজরুলের চোখে 'ঋষি', কেননা সামন্ত যুগের মারণমন্ত্র উচ্চারিত তাঁর মুখেই।

লাঙ্গলে শ্রমিক সমিতির সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত কর্মসূচি ও আদর্শ-উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছিল। সে সব সম্ভবত নজরুলের চিন্তা-চেতনার ফসল নয়, তবে তাতে যে তাঁর সম্মতি ছিল তা বলাই বাহুল্য। 'রুদ্রমঙ্গলে' কবি বলেছেন–'হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা, তোমার হাতের এ লাঙ্গল অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক–উলটে ফেলুক। আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ্গ এ উৎপীড়নের প্রাসাদ, ধুলায় লুটাও অর্থপিশাচ বলদর্পীর শির, ছোড় হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তে মাখা লালে লাল ঝাণ্ডা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়েয় তলায় আন' (রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৮৭–৮৮)।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলে থাকেন বটে, আধুনিককালে ঈশ্বরগুপ্তে (১৮১২–৫৯), রঙ্গলালে, হেমচন্দ্রে, বঙ্কিমচন্দ্রে স্বদেশ-স্বজাতিপ্রীতির উন্মেষ এবং দ্বিজেন্দ্রলালে, গিরিশ ঘোষে, ক্ষিরোদ প্রসাদে, রবীন্দ্রনাথে, মুকুন্দ দাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে আরো অনেকের মতো স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ অভিব্যক্তি পায়। দেশকালের প্রতিবেশে প্রতীচ্য বিদ্যার প্রভাবে সত্যেন্দ্রনাথে (১৮৮২–১৯২২) জাগে দলিত-শোষিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-দীন-দুর্বল মানুষের প্রতি সহানুভূতি। আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তে (১৮৮৮–১৯৫২) জাগে মানবতার অবমাননা দর্শনে এক প্রকারের মানসদ্রোহ–কাব্যে যার প্রকাশ ঘটে ব্যঙ্গবিদ্রুপে ও কান্নাভরা ছদ্ম পরিহাসে। তাঁর কাব্যের নামগুলোও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ রূপক-সাংকেতিক তাৎপর্যময় : মরুশিখা, মরুমায়া, মরীচিকা।

নজরুলে এ স্বজাত্য ও স্বাদেশিক চেতনা, দলিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-শোষিত মানবতার প্রতি দরদ, তাদের দুঃখযন্ত্রণামোচন লক্ষ্যে, তাদের আর্থিক-সামাজিক শৈল্পিক নৈতিক মুক্তির জন্যে সর্বাত্মক জেহাদ ঘোষণা ছিল কবি ধর্ম এবং বাস্তবে লেখায় ও সংবাদপত্র মাধ্যমে বাঙলাদেশে সংগ্রাম পরিচালনা করেন–অরবিন্দ ঘোষকে বাদ দিলে– কেবল নজরুল ইসলামই। অন্য কবি লেখকদের কাছে যা ছিল পার্বণিক ও সাময়িক প্রয়োজনের ও উত্তেজনার বিষয়, নজরুলের কাছে তা-ই জীবনের ব্রত। এখানে এ-ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ সমাজে সংসারে নানারকম শোষণ-পীড়ন-অবক্ষয় দেখে বিচলিত হয়ে তাঁর 'বলাকা' কাব্যে কয়েকটি কবিতায় তরুণদের এবং সে সঙ্গে নিজেকেও (সবুজের অভিযান, শঙ্খ) দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তথ্য প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করবার জন্য প্রবুদ্ধ করার প্রয়াসী হন। রবীন্দ্রনাথের নৈতিক আবেদন ছিল বিবেক ও বিচার বুদ্ধির কাছে। তাই সে কণ্ঠ উদাত্ত ও উচ্চ ছিল না। নজরুলের লক্ষ্য ছিল মানুষের ইন্দ্রিয়জ অনুভবের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ও বাস্তবে কার্যকর উত্তেজনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দীপনা দান। তাই তাঁর আবেদন স্থূলকথায় উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত সরাসরি রক্তে জ্বালাধরা খুনচাপা শ্লোগান স্বরূপ।

সেদিনকার পরিবেশ আর প্রয়োজনেও ছিল নজরুলের দ্রোহীমনের ও জনকল্যাণবাঞ্ছার অনুকূল। ১৯২০ সনে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব, ১৯১৯ সনের রাওলাড আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল), ১৯১৯ সনে মন্টেগুচেমসফোর্ড রিপোর্টজাত অসন্তোষ, ১৯২২ সনের আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯২৫ সনের দক্ষিণেশ্বর বোমা কারখানার খবর, ১৯২৯ সনের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, ১৯৩০ সনে চট্টগ্রামের সূর্য সেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ, ১৯৩০-৩২ সনের গোলটেবিলে বৈঠক প্রভৃতি রাজনীতিক চেতনা ও সমাধান-সন্ধান তীব্র-তীক্ষ্ণ করেছিল। তাছাড়াও ছিল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের ইংরেজ প্রশাসন হত্যার প্রয়াসজাত গণরোমাঞ্চ।

সন্ত্রাসবাদী চেতনা, ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সনের কোলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন স্বায়ত্তশাসন দাবি, ১৯০৮ সনের রাজদ্রোহমূলক সভা ও সংবাদ দমন আইন, ১৯০৮ সনের ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর জজ হত্যার প্রয়াস, ওই বছরের মানিকতলায় বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন, সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ সংগ্রহের জন্যে ডাকাতি, রাহাজানি, বোমা তৈরি মামলার আসামীদের মামলা, সন্ত্রাসবাদী ভি.ডি. সাভারকার, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, গণেশ সাভারকার প্রভৃতির গুপ্ত কর্মকাণ্ড ও ১৯২১ সনের কয়েকবার শ্রমিক ধর্মঘট ও মোপলা বিদ্রোহ রাজনীতিক আকাশ বাতাস তপ্ত করার ক্ষেত্রে ইন্ধনস্বরূপ হয়েছিল। জনজাগরণ করেছিল ত্বরান্বিত।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' নামের প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, এই ডায়ারের মত দুর্দান্ত কসাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে এমন কুকুরের মত করিয়া না মারিত তাহা হইলে কি আজিকার মত আমাদের এই হিম নিরেট প্রাণ অভিমান ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত–না আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মত গর্জিয়া উঠিতে পারিত?' (যুগবাণী)।

অগ্নিবীণায়, বিশের বাঁশীতে, ভাঙার গানে, সাম্যবাদীতে, সর্বহারায়, ফণি মনসায়, জিঞ্জিরে, সন্ধ্যায়, সিন্ধুহিল্লোলে, প্রলয় শিখায়, নতুন চাঁদে বা রাজনীতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক আর্থিক বিষয়ে কবির মত ও মন্তব্য জুলুম ও জেহাদ এবং স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতার সঙ্গে গণমানবের শোষণবঞ্চনা ও লাঞ্ছনা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প সক্ষোভ সক্রোধ ও সদরদ অভিব্যক্ত হয়েছে।

ধূমকেতু ও লাঙলের মতো গণবাণীতেও নজরুল ইসলাম নিছক সাম্যবাদী, সমাজবাদী নন, কিংবা নাস্তিক নিহিলিস্টও নন। তত্ত্ব জানবার বুঝবার আগ্রহ কিংবা ধৈর্য তাঁর ছিল না। তিনি ঈশ্বরবাদী সত্য বা সত্যরূপী স্রষ্টার অনুগত। শাস্ত্রের অন্ধ অনুকারকে তিনি ঘৃণা করেন বটে, শাস্ত্রের নির্যাসে আস্থা তাঁর আছেই। তিনি মানুষের জাতে, জন্মে, বর্ণে, ধর্মে এবং অবস্থায় অবস্থানে পার্থক্য স্বীকার করেও আর্থিক ব্যবহারিক ও আচারিক সাম্যের, সমতার ও সমদৃষ্টির এবং সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার সহযোগিতার সহাবস্থান নীতির প্রবক্তা। সত্তার ও বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও যেখানে (ও যেভাবে) মিলেছে হিন্দু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধ, খ্রীস্টান। রোমান্টিক কবি বাস্তব জীবনের রূঢ় সমস্যার সমাধানে হৃদয়ের ভূমিকা মানেন ঃ

এই হৃদয়ই সেই নীলাচল, কাশী মথুরা বৃন্দাবন
বুদ্ধ গয়া, এ জেরুজালেম, মদিনা, কাবা ভবন।
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের সন্ধান।
(মানুষ, মায়া মুকুর, অমৃতের সন্তান প্রভৃতি কবিতা ও প্রবন্ধ স্মর্তব্য)

বলাবাহুল্য বাস্তবে আস্তিক মানুষ কখনও বিধর্মী বিজাতি বিভাষী বিদেশীকে এভাবে হৃদয়ের বন্ধুরূপে বরণ করে ঠাঁই দিতে পারে না। আস্তিক্য কার্যত দলচেতনারই নামান্তর। তাই ভক্তের চোখে ভগবানের প্রতিরূপ হিসেবে সৃস্টি মাত্রই প্রিয়–মুখে উচ্চারিত ও উদার বাণী কখনো কারুর বুকের সত্য হয়ে ওঠে না, কেননা এ উক্তিই শাস্ত্রসম্মত আস্তিক্য বিরোধী। আর একটি কথা, নজরুলের পাপের প্রতি ঘৃণা থাকলেও হতভাগ্য পাপীর প্রতি রয়েছে অসীম করুণা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি। 'পাপ' বারাঙ্গনা' প্রভৃতি কবিতা তার প্রমাণ। 'যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই, কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল কেহ সে ঘৃণ্য নহে।'

৪. শাস্ত্র ও নজরুল ইসলাম ঃ কাজী নজরুল ইসলাম শাস্ত্র বিরোধী ছিলেন না। শাস্ত্রে তাঁর আস্থাও ছিল গভীর। কেননা তিনি ছিলেন আস্তিক। স্রষ্টাতে রসুলে ও কোরআনেই সে-আস্থা-সীমিত ছিল না, অলৌকিকতায়, দারু-টানা-ঝাঁড়-ফোঁক-তাবিজ-কবচ-মন্ত্র-মাদলীতে তাঁর বিশ্বাস গভীর ছিল বলেই ভূতে-ভগবানে সমমাত্রায় ছিল তাঁর ভয়ভক্তি। মহামানবতত্ত্বেও ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। এ সবকিছুই যে শুধু তাঁর পারিবারিক সামাজিক রীতিনীতি হিসেবেই তাঁর জীবনাচার প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়, তাঁর হৃদয়াবেগনিঃসৃত ও মননপ্রসূত রচনাতেও এসবের তথ্য হিসেবে সানন্দ, সশ্রদ্ধ ঠাঁই হয়েছে। তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক আমাদের এ ধারণার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ বহন করছে।

এ সত্ত্বেও তাঁর কাঙ্ক্ষ্য ছিল আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর নগুরে সমাজে মানুষের মনে যুক্তি-বুদ্ধির বিকাশ, যাতে স্বকালের স্বদেশের, স্বজাতির রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থিক জীবনে আধুনিকতা আনয়নে তথা দেশের মানুষের গুণ-মান, যুগোপযোগী করে উন্নীত করা সহজ হয়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে, দারিদ্র্য ঘোচানোর জন্যে, দুর্জনের দুর্বৃত্তের শোষন-পীড়ন মুক্ত সমাজ গড়ার জন্যে তিনি এসব জরুরী বলে মনে করেছিলেন। এ যে তাঁর চিন্তা ভাবনা মনীষার বা উপলব্ধির প্রসূন, তা নয়। নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান ও লোকশ্রুতি থেকেই এ ধারণার উদ্ভব। এজন্যে তিনি ধর্ম ভালো, ধর্মধ্বজী ও ধর্মব্যবসায়ীরা মন্দ, শাস্ত্র কল্যাণকর বিধিনিষেধের আকর, শাস্ত্রী শঠ-নির্বোধ–এমনি একটা মত পোষণ করতেন মনের গভীরে। তাই মৌলবীকে মৌ-লোভী বলেন, গালাগালি দেন মোল্লা পুরুতকে,–নিন্দা করেন টুপি-টিকির। এ যে তাঁর যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকজাত নয়, নিতান্ত চালু মৌখিক রীতির কাব্যিক বা লিখিত অনুস্মৃতি তা তাঁর বাস্তবে প্রায়োগিক আচরণ থেকেই বোঝা যায়। এসব মত-মন্তব্য আবেগ প্রসূত, কোন সমাজবিজ্ঞানীর কিংবা রাজনীতিবিদের বিবেচনা প্রসূত নয়। তাই কবি বুঝতে পারেননি যে কোন আস্তিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষই শাস্ত্রের ক্ষেত্রে, যুক্তি বুদ্ধির পুরো অনুগত হতে পারে না। উদারতার দিগন্ত সে যতই বৃদ্ধি করুক না কেন, তাতে বিশ্বাসের দুর্গের প্রসার ঘটে বটে, কিন্তু বিশ্বাসমুক্তি ঘটে না। তাই মোল্লা খাইয়ে বামুন ভোজনের ফল পেতে পারে না কোন হিন্দু যেমন, অমুসলমানকে ফিৎরা জাকাত দিয়ে তেমনি সওয়াব আশা করতে পারে না কোন মুমিন। আস্তিকের উদারতায়, মানবতায়ও বাধা-নিষেধের বেড়া থাকে। মানুষকে নির্বিশেষ মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা কোন আস্তিক বা শাস্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে কোথাও কখনও সম্ভব হবে না। কারণ তার বিবেক, বুদ্ধি, মুক্তিকৃপা-করুণা শাস্ত্র শাসিত। অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বোধ ও দায়িত্ব কর্তব্য চেতনা শাস্ত্রজাত ও শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত।

কাজেই কবি যখন বলেন 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নাই কিছু মহীয়ান'—তখন তিনি দুনিয়ার যাবতীয় শাস্ত্রবিরোধী কথাই বলেন—যা কোন আস্তিকের গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি মানুষের হৃদয়েই ঈশ্বরের অবস্থান। কাজেই 'হৃদয়ের চেয়ে তথা মসজিদ মন্দির গির্জা মঠ পবিত্রতর কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নয়'—এমনি উক্তিও তাই উচ্চারণের সঙ্গেই অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

কাজেই কবি যখন হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রত্যাশায় তাদের সদবুদ্ধি বাতান, 'তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি চক্রে জুতে... পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী' কিংবা 'এই সব ধর্মপাপীদের দেউলে পশে', অথবা 'মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার।'—তখন তাতে সায় দেবার লোক মেলে না। বা কবি যখন বলেন, 'শাস্ত্র-শকুন, জ্ঞান-মজুরদের কবল মুক্ত হয়ে :

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম আফিম নেশা
ধ্বংস করেছি ধর্ম যাজকী পেশা।
ভাঙি মন্দির ভাঙি মসজিদ
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত
এক মানবের একই রক্ত মেশা
সংস্কারের জগদ্দল পাষাণ
তুলিয়া বিশ্বে আমরা করেছি ত্রাণ। (বিংশ শতাব্দী)

তখন আস্তিক মানুষ কেবলই ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়, অথবা উপহাসে উড়ায়, এর মধ্যে কোন শ্রেয়স দেখে না। সবাক, সবোধ জীবনের প্রান্তপর্বেও কবি 'গোড়ামি ধর্ম নয়' (শেষ সওগাত) নামের কবিতায় গোঁড়ামি পরিহারের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।

৫. মুসলিম জাগরণ : আমরা আগেও বলেছি, কাজী নজরুল ইসলামের মনের উদ্দেশ্য, মুখের কথায় ও বুকের সত্যে কোন সঙ্গতি শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল না। ফলে কথায় কাজে ও বিশ্বাসে ছিল সার্বক্ষণিক অসঙ্গতি, এমনকি বৈপরীত্যও। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে নানা অবস্থায় ও অবস্থানেও পরিব্যক্ত তাঁর মতে ও মন্তব্যে তাই অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য সুলভ। তিনি লেখক-জীবনে মতে, পথে, বিশ্বাসে, আচরণে সব সময়েই বহুধা বিভক্ত পাপড়িপ্রায় বিযুক্ত সত্তায় (Split personality) (তে) আত্মপ্রকাশ করেছেন।

কোন রচনায় তিনি সাম্যবাদী, কোন রচনায় ইসলামী সাম্যে বিশ্বাসী, কোন রচনায় তিনি আস্তিক ও নিরপেক্ষ পিতৃবৎ ঈশ্বরকাম্য সন্তান বা সৃষ্ট মানব সাম্যে আস্থাবান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কখনো বা তিনি রক্তঝরা বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, কখনো তিনি কেবলই শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত বাঙালীর একজন, কখনো বা তিনি পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ বিতাড়নকামী ভারতীয় কবি। কখনো তিনি দ্রোহী, কখনো সংগ্রামী, কখনো বিপ্লবী, কখনো সমাজ সংস্কারক, কখনো বিশ্বমানবতার বাহক ও প্রচারক। এ মানুষই আন্তরিকভাবে সাম্প্রদায়িক মিলনকামী, স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে এ মৈত্রী ও সহযোগিতা-আবশ্যিক জেনেই। আবার তিনিই বাস্তবে অসম্ভব অনভিপ্রেত জেনেও দুনিয়ার সব অজ্ঞ ও আবেগপ্রবণ মুসলিমের মতো, দেশ-কাল-জাত-জন্ম-বর্ণ-সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা এবং আর্থিক শৈক্ষিক রাষ্ট্রিক অবস্থান নির্বিশেষে বিশ্ব মুসলিমের অভিন্ন ঐহিক-পারত্রিক লক্ষ্যে ও আদর্শিক অভিন্নতায়, ঐক্যে মৈত্র্যে ও ভ্রাতৃত্বে গভীরভাবে আশৈশবের সংস্কার বশে আস্থাবান। কবি যখন ইসলামের ঐতিহ্যে ও মুসলিমদের ইতিহাসে মানস বিচরণ করেন, তখন তাকে সময় ও ভূগোল শাসিত কোন বিশেষ দেশ-কাল-জাতির অবস্থানের বলে ক্বচিৎ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তখন তিনি কেবলই মুসলমান। আর কিছু নন, আর কেউ নন, এবং তখন তিনি ইসলামের ও মুসলিমের হৃতগৌরবে ক্ষুব্ধ, ঐতিহ্য স্মরণে স্ফীত বক্ষ, জাগরণ গানে চারণ কবি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় সমাজ পরিবর্তনের ও ভাষা পরিবর্তনের একটা আকাঙ্ক্ষা প্রায় সব দেশেই লঘু-গুরুভাবে দেখা দিয়েছিল। নজরুল ইসলাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাঙলাদেশে মূর্ত করে তুললেন তাঁর চিন্তা-চেতনায়। মূর্তি দিলেন তাঁর গানে গল্পে কবিতায় উপন্যাসে। জনগণের মনের কথা, প্রত্যাশার কথা, দাবির কথা সময়োপযোগী ভাব-ভাষা-ভঙ্গিতে অভিব্যক্তি পেল তাঁর কলমে। তিনি হলেন জনগণের আপন কবি। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের মতো পর্বতপ্রমাণ সুউচ্চ সুবিস্তৃত ব্যক্তিকে এড়িয়ে ছাড়িয়ে অসামান্য লোকপ্রিয়তার তুঙ্গে অধিষ্ঠিত হলেন নজরুল প্রথম আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এই জনপ্রিয়তা কেবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে তুল্য। সেদিন তাই নজরুল চেতনার অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য, তাঁর মত-পথের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুধারূপ তাঁর সত্তার পাপড়িসুলভ বিমুক্তি আবেগমুগ্ধ অভিভূত আনন্দিত আপ্লুত পাঠকচক্রে বহুকাল ধরা পড়েনি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না বলে, আমরা এখানে অনেক কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম। এতে বিশ্বমুসলিমগত প্রাণ কবি নজরুল ইসলামের সমকালীন মুসলিমের দুঃখ, দৈন্যের, পরাধীনতার অনগ্রসরতার জন্যে উদ্বেগ, বেদনাবোধ, ক্ষোভ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি নতুন যুগের প্রসাদের আশা আর আশ্বাসের বাণীও তাতে অভিব্যক্তি পেয়েছে। এখানে তিনি যথার্থই মুসলিমদের পতনে উৎকণ্ঠ কবি হালী, ইকবাল, হাফিজজালন্ধরীর মতোই জাতীয় কবির ভূমিকা পালন করেছেন। স্বজাতি হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন জামালউদ্দীন আফগানীর কিংবা স্যার সৈয়দ আহমদের মতোই। তাঁর বীরস্তুতি প্রবণতার মূলেও রয়েছে মনগত লক্ষ্যে ঐক্য।

মুসলিম জাগরণ ঃ

১.	আনোয়ার	দুনিয়াতে মুসলিম আজ' পোষা জানোয়ার/শুধু বুনো জানোয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

		ইসলামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই/ খুন-খেকো তলওয়ার আজ শুধু রণ চায়।
২.	রণভেরী	তোর মান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়। ধরে ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম পাঞ্জায়। কর কোরবান আজ তোর জান্ দিল্ আল্লার নামে ভাই দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই। মোর অসি বুকে বরি, হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই।
৩.	শাতিল আরব (ইরাক)	খঞ্জরে ঝরে ঋজুর সম হেথা লাখো দেশ ভক্ত শির/ কে জানিত কবে বঙ্গবাহিনী তোমারও দুঃখে 'জননী আমার' বলিয়া ফেলিবে/ তপ্তনীর রক্তক্ষীর/ পরাধীনা। একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দুফোঁটা ভক্তবীর।
৪.	খেয়াপারের তরণী :	কাণ্ডারী আহমদ, তরীতরা পাথেয় লাশরিক আল্লাহ্।
৫.	কোরবানী :	আজ শোর উঠে জোর, খুন দে, জান দে, শির দে বৎস শোন ওরে শক্তি হস্তে মুক্তি/ আজাদী মেলে না পস্তানোয় ওরে হুঙ্কারে ভাঙ্গি গড়া ভীম কারা লড়বো রণ মরণ। ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই যে খুন মোচন (এর সঙ্গে বিষের বাঁশীর 'জাগৃহি' তুলনীয়)
৬.	মোহররম :	ত্যাগ চাই মসিয়া ক্রন্দন চাই না উষ্ণীষ কোরানের হাতে তেগ আরবীর দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির... শমসের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা ...হুঁশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দারী হাঁক।
৭.	ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম :	নাই তাজ/তাই লাজ/ ওরে মুসলিম খর্জুর শীষে তোরা সাজ। বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন ইসরাফিলের শিঙা।
৮.	শাহিদী ঈদ :	রাখিতে ইজ্জত ইসলামের শির চাই তোর, তোর ছেলের দেবে কি? কে আছ মুসলমান?
৯.	জিঞ্জীর :	মিসেস এম. রহমান : নারী নর-দাসী বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারোমাস শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই করে নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ্ যত চোরে।
১০.	নকীব	জাগো দুর্বল, জাগো ক্ষুধা/ক্ষীণ/ জাগিছে কৃষাণ ধুলোয় মলিন/ জাগে গৃহহীন পরাধীন/ জাগে মজলুম বদনসীব/ আজ জীবনের নব উত্থান।
১১.	খালেদ	খালেদ খালেদ! রি রি করে পরাধীনতার ব্যথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

		বিষ যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চষে চাইনা মেহ্দী, তুমি এসো বীর হাতে নিয়ে শমসের।
১২.	সুবহ্ উম্মেদ	মুসলিম জগতের জাগরণ দেখে লেখা : জেগেছে আরব ইরান তুরান, মরক্কো আফগান মেসের এয় খোদা! এই জাগরণ রোলে/ এ মেষের দেশেও জাগাও ফের।
১৩.	ঈদ মোবারক	ইসলাম বলে সকলের তরে মোরা সবাই সুখ, দুঃখ সমভাগে করে নেব সকলে ভাই নাই অধিকার সঞ্চয়ের। কারো আঁখি জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ? দুজনার হবে বুলন্দ নসীব, লাখে লাখে হবে বদনসীব এ নহে বিধান ইসলামের।
১৪.	ভোরের সানাই (সন্ধ্যা কাব্য)	আবার খালেদ তারিক মুসা/আনল কি খুন-রঙিন উষা/ লা শরিক আল্লাহ মন্ত্রের/ নামল কি বান পাহাড় তুরে।
১৫.	যৌবন জল তরঙ্গ :	যে তরবারির পুণ্যে আবার সত্যেরে তোরা দানিবি তখত/ যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন মানেনি কখনো, আজো মানিবে না, বৃদ্ধত্বের এই শাসন। ... আমরা সৃজিব নতুন জগৎ আমরা গাহিব নতুন গান।
১৬.	বীর সর্দার পহ্লবী	এ সূত্রে স্মরণ করেছেন কামাল পাশা, আমানুল্লাহ, শেখ সনৌসী প্রভৃতি নেতাকেও। ওঠরে নওজোয়ান/ শোনরে পাতিয়া কান নয়া জামানার মিনারে মিনারে নব উষার আজান।

আজ যখন 'দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে/ দীন ইসলামী লাল মশাল/ ওরে বেখবর, তুইও উঠ জেগে/ তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।

অথবা, বেজেছে নাকাড়া-হাঁকে নকীবের তূর্য/হুঁশিয়ার ইসলাম ডোবে তব সূর্য। এবং নতুন চাঁদ কাব্যের আজাদে; শেষ সওগাত কাব্যের 'মোহররমে', এবং আরো কয়েকটি কবিতায়ও জাগরণ বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

কাজেই এক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের ঐতিহ্যের বৃথা আস্ফালন ছিল না, ছিল না গৌরব-গর্ব সর্বস্ব স্মৃতির বৃথা রোমন্থন। তিনি চেয়েছিলেন যুগ-প্রয়োজনে মুসলিমদের আত্মার জাগরণ এবং বৈষয়িক, ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রিক উন্নয়ন। সব ক্ষেত্রেই এবং সর্বাংশেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন যুগজিজ্ঞাসার ও যুগদাবির প্রবক্তা কবি, সমকালের চিন্তা-চেতনার ধারক, নবযুগের বাণী বাহক নজরুল ইসলাম স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বকালের কবি–বৃহত্তম সংজ্ঞায়, শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত মানবের ও মানবতার কবি। তাই তিনি এক্ষেত্রে বক্তব্য-প্রধান কবিতার কবি–শিল্প-সুন্দর ললিত ভঙ্গিকুশল কবি নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস, রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ তরান্বিত করাই ছিল তাঁর ব্রত। এ যুগদাবির, যুগযন্ত্রণার ও যুগসমস্যার কবি–এমনকি প্রেমের ক্ষেত্রেও কেবলই হৃদয়-ঘটিত জীবনযন্ত্রণারই অভিব্যক্তি দিয়েছেন প্রেমের গানে ও কবিতায়। এ তাৎপর্য নজরুল ইসলাম কবিতায় কিংবা পদ্যরচনায় আত্মপ্রকাশে আন্তরিক ও অকপট, স্বাভবিক ও অপরিস্রুত। শৈল্পিক লাবণ্য দান লক্ষ্যে কৃত্রিম পরিশীলন প্রয়াসে তিনি বীতরাগ। তাই বলে তাঁকে স্বভাবকবি বলা যাবে না।

৬. হিন্দু মুসলিম মিলন প্রয়াসে : হিন্দু-মুসলিমের শাস্ত্রীয় ও মানস চেতনার ক্ষেত্রে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান জেনেও, তিনিই বাঙলাদেশে সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে একমাত্র মানুষ, যিনি অসচেতন মুহূর্তেও বিধর্মী-বিদ্বেষ চিন্তায় চেতনায় কথায় কাজে প্রকাশ করেননি। অর্থাৎ সামাজিক, শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসম অবস্থানের হিন্দু-মুসলিমকে তাঁর সমকালে ঐক্যবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব জেনেও তিনি বিরোধ-বিবাদ বিদ্বেষের মধ্যেও হিন্দু-মুসলিমে মিলন প্রতীক, 'হ্যান্ডসেক' করাতে ছিলেন ব্রতী। তোয়াজ তিরস্কারে তাদের কল্যাণকর মিলনে প্রণোদনা-প্রবর্তনা দিয়েছেন অনেক গানে, কবিতায়, ভাষণে ও রচনায়।

তাঁর ভাষায় 'হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব–অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মত জমা হয়ে আছে–এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।'

(বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ, ১১৪১ সন)।

তবু নজরুল ইসলাম দ্বৈতসত্তা মুক্ত ছিলেন না–মুসলিম সত্তায়–তিনি বিশ্ব-মুসলিম চেতনায় প্রবুদ্ধ, আবার বাঙালী ও ভারতীয় চেতনায় ছিলেন রাজনীতি ক্ষেত্রে অভিন্ন লক্ষ্যে হিন্দু মুসলিম মিলনে, সহযোগিতায় ও যৌথ সংগ্রামের প্রয়োজনে আস্থাবান। তাই অনেক কবিতায় আকুল আহ্বান রয়েছে দেশবাসীর প্রতি।

বন্দনা গান	:	(বিষের বাঁশী)। শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারি ভাঙ্গিতে নিখিল অধীনতা পাশ, মেলে যদি কারা বরিব তাই জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদের এই বক্ষ মাঝ মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয় গান।
চরকার গান	:	হিন্দু মুসলিম দুই দোসর (চরকা) তাদের মিলন সূত্র...
জাতের বজ্জাতি	:	জাতের নামে বজ্জাতি সব... এক জাতিকে একশ খান।
সত্যমন্ত্র	:	পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর বিধির বিধান সত্য হোক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

.... জাতের চেয়ে মানুষ সত্য, অধিক সত্য প্রাণের টান/ প্রাণঘরে সব এক সমান।

মিলন গান — (ভাঙ্গার গান) তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু ডাকাত লুটছে ধান।
গোবর গাধা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙ্গে খায় শেয়াল।

শত্রু পরে পরে — অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ রজ্জু পাশ ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে হিন্দু মুসলিমিন।... বদনা-গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি? শত্রুর গোরে গলাগলি কর আবার হিন্দু-সুমলমান।

হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ — জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু মুসলমান যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, গড়ে মন্দির চূড়া সেই লাঠি কালিই প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ-গুঁড়া প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ।

সাম্য (সর্বহারা) : এখানে রাজা প্রজা নাই, নাই দরিদ্র ধনী/নাইকো এখানে ধর্মের ভেদ, শাস্ত্রের কোলাহল পাদরী পুরুত মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।

৭. মনুষ্য মহিমা : য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের নির্যাস এবং পরিণামে পরম অবদান ছিল মানুষে এবং ঐহিকতায় গুরুত্ব ও মহিমা আরোপ। নিয়মে ও নিয়তির ক্রীড়নক প্রাচ্যের মানুষের ব্যাষ্টি হিসেবে কোন মূল্য মর্যাদা তেমন স্বীকৃত ছিল না কোন কালেই। মধ্যযুগে ভারতের 'সন্ত' মতে ও বাঙলার চৈতন্য-চোখে দেবে-ধর্মে সমর্পিতচিত্ত মানুষই ছিল মর্যাদার ও মহিমার অধিকারী। আর কৃপা ও করুণা তো অপমানুষের জন্যেই, যা মূল্য ও মর্যাদা বিহীনতার বিকল্পমাত্র, যা গুণ-মান-মাহাত্ম্য শূন্যতায় প্রাপ্য। ইতোপূর্বে শাস্ত্রিক নির্দেশে মৌহূর্তিক আবেগে কিংবা পার্বণিক প্রয়োজনে মানবমাহাত্ম্য এদেশে কারো কারো মুখে কখনো কখনো উচ্চ ও উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হলেও তা কখনো সুপরিলক্ষিত সংকল্প-দৃঢ় প্রত্যয়ে ঋদ্ধ আবেগপুষ্ট ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে বাস্তবে স্বীকৃতির ও আচরণে রূপায়ণের বিঘোষিত অঙ্গীকার পায়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙলায় তথা ভারতের মার্কস-এঙ্গেলসের স্বপ্নের ও লেনিনের সংকল্পের রূপায়ণে অনুপ্রাণিত ও আশ্বস্ত কবি কাজী নজরুল ইসলামই সর্বপ্রথম শোষিত, দলিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষের হয়ে শাস্ত্রে, সমাজে, সরকারে ও রাষ্ট্রে তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন বিশ বছর বয়সে কলম হাতে নিয়েই। নিজের মধ্যে মানবপ্রেম বিশেষ করে দীন দুর্বল দুস্থ মানবপ্রীতি না থাকলে কবিত্ব প্রকাশের কৃত্রিম অবলম্বন হিসেবে তা এমনি ক্ষোভ, রোষ, দরদ ও বেদনা মিশ্রিত হয়ে অভিব্যক্ত হতে পারত না। অকৃত্রিম বলে বক্তব্য এমন যৌক্তিক ও প্রায়োগিক, এমন ঋজু, স্থূল ও বাস্তব, ভাষা এমন জোরালো ও অপরিশীলিত, কণ্ঠ এমন উচ্চ, আবেগ এমন তীব্র ও গভীর, অনুভূতি এমন স্বচ্ছ যে বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে নজরুল ইসলামকেই যথার্থ ও অকৃত্রিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষিত বঞ্চিত দলিত লাঞ্ছিত গণমানবের যথার্থ সর্বাত্মক মুক্তিকামী কবি বলে স্বীকার করতে হয়। এ অর্থে এ যুগের নবমানবতার উদ্‌গাতা কবিও এদেশে তিনিই। মানব-মহিমাও এমন একান্তভাবে, এমন অকৃত্রিম গভীর আগ্রহে, এমন উদাত্ত ও উচ্চকণ্ঠে ইতোপূর্বে বাঙলাদেশের বাঙলা ভাষায় কেউ কখনো প্রচার করেননি। নারী-পুরুষ, পাপী-তাপী, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, লম্পট প্রভৃতি নানা দোষে দুষ্ট নির্গুণ, নির্বোধ নিষ্ঠুর মানুষকে ইতোপূর্বে এমন নিঃসংশয়ে, আদরে, করুণায়, নিঃসঙ্কোচে সামাজিকভাবে কেউ কখনো গ্রহণ করেননি। তবে আমরা জানি, যে কোন মহৎ কথা, সত্য কথা কিংবা নতুন কথা বার বার উচ্চারণে তার চমক ও তাৎপর্য হারিয়ে আটপৌরে হয়ে যায়। পুনরাবৃত্ত হয়ে নজরুলের বাণীরও চাকচিক্য ও প্রভাব মন্দমন্থর হয়ে গিয়েছিল। কেবল পুনরাবৃত্তির দোষে নয়, অনুভূতির স্থূলতা ও বৈচিত্র্যহীন বদ্ধতাও এর জন্য অনেকটা দায়ী।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বাণীর দূরাগত ধ্বনির প্রভাবে তিনি জুলুম-জালিম বিহীন শোষণ-পীড়নমুক্ত মানুষের সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তা-চেতনার ও বোধ-বুদ্ধির জগতে মার্কসবাদ কোন সুস্পষ্টরূপ পায়নি, ফলে তার উচ্চারিত সাম্যের আবেদনে, শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা মুক্তির সংগ্রামে ঐহিকতাসর্বস্ব বল-বুদ্ধি-বিবেক নির্ভরতা ছিল না, ছিল আল্লাহ-ভগবানের দোহাই, ছিল ধর্মধ্বজী কপট মোল্লা-পুরুত পাদরী-ভিক্ষুক কলবমুক্ত বিশুদ্ধ শাস্ত্রানুগত্য। ফলে গণমানবের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর বিঘোষিত নীতি আদর্শ না ছিল মার্কস-লেনিন সমর্থিত, না ছিল শাস্ত্রসম্মত। তাই তাঁর কবিতা পড়তে ও শুনতে ভাল হলেও, প্রণোদিত ব্যক্তির পক্ষে কার্যকরভাবে অনুসরণ করা ছিল অসম্ভব। এ কারণেই বাস্তব ক্ষেত্রে মার্কস-লেনিন-মাও-সে-তুঙের বাণীর মতো কবির বাণী কোন পথের দিশা দিতে পারেনি, পারেনি হতে পাথেয়।

তবু নজরুলের উচ্চারিত গণমুক্তির বাণী সাহিত্যেক্ষত্রে তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও অনুসরণে সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এবং বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তাঁর বাণী সংগ্রামী বামপন্থীদের কম-বেশি আজও মানস-মদদ জোগাচ্ছে।

মনুষ্য-মহিমা উচ্চারিত কিছু চরণ :

১. মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

২. তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়।

(মানুষের ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।

৩. কেননা, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো (মানুষ)।

৪. বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি।

নর যদি রাখে নারীরে বন্দী... ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।

৫. বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস/ নারী নরদাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারোমাস (জিঞ্জির)।

৬. আমি সেদিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল/ আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।

৭. তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু, নাই মানুষের দাবী মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক জেন্দাবেস্তা গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত সখ–
কিন্তু তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান সকল শাস্ত্রে খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।

৯. কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

৮. বিদ্রোহ-বিপ্লব-সংগ্রাম :

বড়-ছোট, পাপী-তাপী ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা এবং সবার জন্যে সমানাধিকার ও সমসুযোগ দাবি করা এক হিসেবে ব্যক্তি মানুষকে মানবিক বোধের, মনুষ্যত্বের ও মানবতার চরম ও পরম বিকাশ বলেই মানতে হবে। নজরুল ইসলাম সন্ত দরবেশ ছিলেন না, মৌল মানবাধিকার সম্বন্ধে তাঁর এ স্বচ্ছ উপলব্ধি এবং নির্বিশেষ মানুষের কল্যাণে, শাস্ত্রে-সমাজে-সংসারে ও রাষ্ট্রে তার আক্ষরিক প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা কাজী নজরুল ইসলামের মনুষ্যত্বেরই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। অক্লান্তভাবে এবং একান্তভাবে সাগ্রহে তিনি কলমের মাধ্যমে বাস্তব সংগ্রাম চালিয়েছিলেন বহু বছর। ব্যাধির উন্মেষের কারণে হোক, কিংবা অন্য কোন মানসিক কারণে হোক শেষ কয় বছর তাঁর এ সংগ্রাম অবহেলা কিংবা বিরতি ঘটেছিল বটে, কিন্তু মানব প্রীতি, মানুষের কল্যাণ-চিন্তা নির্বাক-নিষ্ক্রিয় হওয়ার পূর্বমুহূর্ত অবধি তাঁর চেতনায় প্রাধান্য পেয়েছিল।

তাঁর বিদ্রোহ-বিপ্লব ও জীবনপণ সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল দুটো। একটা বিদেশী বিজাতি বিজ্ঞানী ব্রিটিশ শাসন-শোষণ থেকে স্বদেশে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন, অন্যটি স্বদেশের নির্বিশেষে মানুষকে বিদেশী স্বদেশী শোষণমুক্ত করে মৌল মানবিক নীতির বাস্তবায়নে শাস্ত্রে-সমাজে-সরকারে ও রাষ্ট্রে তাদের অধিকার দান।

এক্ষেত্রে তাঁর জেহাদের সংগ্রামের সম্বলস্থল ছিল মূলত একটিই, তা হচ্ছে ন্যায়-বুদ্ধি। আগেও বলেছি, যেহেতু তিনি মার্কস-লেনিন ব্যাখ্যাত পুঁজি, শ্রেণী সংগ্রামে, উৎপাদন, বণ্টন, উদ্বৃত্ত মূল্য প্রভৃতি তত্ত্ব জানবার, বুঝবার কিংবা প্রয়োগ করবার প্রয়াসী ছিলেন না, এবং যেহেতু তাঁর জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা ঐহিকতা সর্বস্ব ছিল না, সেহেতু তাঁর 'ন্যায়বুদ্ধি'ও একান্ত প্রত্যয় ঋদ্ধ হয়ে একমুখো ও অমোঘ হতে পারেনি, ফলে তার আবেদন ছিল বহুলাংশে মানুষের আবেগ ও বিবেকের কাছে–এবং বলা বাহুল্য দুটোই হৃদয়বৃত্তি নির্ভর। মনমস্তিষ্ক যেভাবে প্রত্যয়দৃঢ় তত্ত্বোপলব্ধি ঘটায়, সুনিশ্চিত মত পথের দিশা হয়, আবেগ তেমন স্থায়ী বোধের জগতে পৌঁছায় না। ফলে কাজী নজরুল ইসলাম-উচ্চারিত বিদ্রোহের বিপ্লবের ও সংগ্রামের বাণীতে এগুলোর আবশ্যিকতার কথা আছে বটে, কিন্তু প্রয়োগপন্থার বা সুনির্দিষ্ট হাতিয়ারের নির্দেশ নেই। তাই তিনি দোহাই উচ্চারণ করেছেন ঈশ্বরের ও শাস্ত্রের, আবেদন জানিয়েছেন মানুষের ন্যায় বুদ্ধির ও বিবেকের কাছে। উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দানের জন্যে মনে যখন যে যুক্তি ও উপমা-উৎপেক্ষা জেগেছে, তখনই তা যে কোন বিষয় বা প্রসঙ্গ অবলম্বনে পরিব্যক্ত হয়েছে। এ কারণেই পুনরাবৃত্তি বেড়েছে, সংযমের, সংহতির পরিমিতিবোধের পীড়াদায়ক অভাব প্রায় সর্বত্রই দৃশ্যমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার জন্য, তিনি শাসক ব্রিটিশ বিদ্বেষ যেমন ছড়িয়েছেন তাঁর কবিতায়, তেমনি শাস্ত্রিক ও সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীস্বার্থগত যেসব বাধা স্বদেশবাসীর সম্প্রীতির ও যৌথ প্রয়াসের অন্তরায়, সেগুলো অপসারণের জন্যেও লিখেছেন অজস্র। আস্তিক নজরুল ইসলাম শাস্ত্র মানেন, আল্লাহ-ভগবানে তাঁর আনুগত্য গভীর। যদিও প্রলয়শিখা কাব্যে কমিউনিস্ট মতের প্রভাবে 'বিংশ শতাব্দী' কবিতায় আবেগতাড়িত কবি হঠাৎ উচ্চারণ করেছেন—

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম আফিম নেশা
এক মানবের একই রক্ত মেশা—ইত্যাদি।

এটা কবির মনের কথাও নয়, নিজের কথাও নয়, এখানে কম্যুনিস্টদের জবানীই কবিতায় পরিব্যক্ত।

তিনি কেবল টুপী-টিকিধারী সাম্প্রদায়িক নেতাদের খপ্পর এবং স্বার্থবাজ ধর্মব্যবসায়ী আচারসর্বস্ব মূর্খ মোল্লা-পুরুত-পাদরী-ভিক্ষুক কবল-মুক্ত হয়ে শাস্ত্রের নামে, সমাজের নিয়মনীতির নামে চালু মানুষে মানুষে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা সৃষ্টির সহায় মিথ্যা বিশ্বাস-সংস্কার রীতিনীতি বর্জনের ও নির্বিশেষে মানুষকে স্বাধিকার দানের জন্যেই প্রবর্তনা দিতে চেয়েছেন জনসাধারণকে।

যেহেতু সাধারণ মানুষ স্ব-সৃষ্ট পরিবারের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেই বাঁচে, সেহেতু সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিক স্বার্থ চেতনা তার জীবন-ভাবনায় কিংবা জগৎ-চেতনায় গুরুত্ব কিংবা ঠাঁই পায় না। এ কারণেই শাস্ত্রের নির্দেশ, সমাজের চাপ কিংবা প্রশাসনিক হুকুম-হুমকি ও ব্যক্তিজীবনে সাধারণভাবে অবহেলা পায়। মানুষ সমস্বার্থে, সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে স্বেচ্ছায় রাজি হয় না, যদিও চেতন বা অবচেতনভাবে জানে ও মানে সে স্ব-স্ব জীবনের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্যেই, শান্তি-স্বস্তির জন্যেই সুনাগরিক সুলভ যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করে সহাবস্থান করাই বাঞ্ছিত এবং আবশ্যিকও। তাই নজরুল ইসলামের জীবৎকালে হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রয়াস হয়েছে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ, শোষিত-দলিত-বঞ্চিত মানুষের স্বাধিকারও হয়নি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর বাঞ্ছিত পথে আসেনি স্বাধীনতাও। অবশ্য মানামানির ক্ষেত্রে মানুষ স্ব-স্ব ঐহিক প্রয়োজনেই সুযোগ সুবিধা লাভ লক্ষ্যে নবী অবতার মানে। আপাত স্বার্থই মানামানির নির্ধারক। তাই এ বাঙলাদেশেই চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল মানুষকে করতে পারেনি সহাবস্থানে সম্মত, পারেনি জাতিদ্বেষণা কিংবা দাঙ্গা লোপ করতে। বিদ্বেষের বৈষম্যের ব্যবধানের প্রাচীর রয়ে গেছে আজো দৃঢ় ও সুউচ্চ। তবু এমন মানবপ্রেমিক ব্যক্তিই মানুষের ও মনুষ্যত্বের আদর্শ।

বিপ্লব, দ্রোহ, সংগ্রাম জ্ঞাপক কবিতাংশ :

১. প্রলয়োল্লাস : বিপ্লবের মাধ্যমেই নতুন প্রতিষ্ঠা : ভাঙার পর গড়া— 'ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখীর ঝড়'— বিপ্লব আসে ঝড় ঝঞ্ঝার মতো। তাই বিপ্লবীরা হচ্ছে— প্রলয় নেশায় নৃত্য পাগল, এবং তাই তারা—, 'প্রলয় বয়েও আসছে হেসে।' তাই— 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রলয় নতুন সৃজন বেদন আসছে নবীন–জীবনহারা অসুন্দর করতে ছেদন।'– (প্রলয়োল্লাস)

২. বিদ্রোহী : মহাবিদ্রোহী... রণিবে না। ইত্যাদি

ধূমকেতু : আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে
বিপ্লব আনি' বিদ্রোহ করি।

রক্তাম্বর ধারিণী মা : জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে,
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

আগমনী ছোটে রক্ত ফোয়ারা বহ্নির বান রে/
ঐ অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য সেনা যত
হত আহত করে যে দেবতা সত্য (তাই আজ) ক্ষিপ্ত রক্ত সুরায়।
শাশ্বত নহে দানব শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর
নাই দানব নাই অসুর
চাইনে সুর, চাই মানব।

কামাল পাশা আজাদ মানুষ বন্দী করে অধীন করে স্বাধীন দেশ।
পরের মুল্লুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত
তাই, তাদের তরে বরাদ্দ তাই আঘাত শুধু আঘাত।

সেবক নাজাত পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-খাঁচা।
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।

বোধন অত্যাচারে আর উৎপীড়নে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত
যদি রয় তব সত্য সাধনা স্বাধীন ও জীবন হবেই ব্যক্ত
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে।

উদ্বোধন দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি/ভিক্ষুকের এ লজ্জাবৃত্তি বিনাশ
জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ দাও মুক্তি গরব।

অভয় মন্ত্র : তুই নির্ভর কর আপনার পর
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর।
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন আছে তার আছে ক্ষয় বল
নাহি ভয়, নাহি ভয়।

আত্মশক্তি এস বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তিবুদ্ধ বীর
আন উলঙ্গ সত্য কৃপাণ, বিজলী ঝলক ন্যায়-অসির

মরণ বরণ এই মরণ ভীতু মানুষ-মেষের ভয় করগো হরণ।
হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে/ এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে।

AmarBoi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দী-বন্দনা ললাটে লাঞ্ছনা রক্ত চন্দন ত্রিশ কোটি এই মানব কল্লোলে।

মুক্তি সেবকের গান : আজ কারায় যারা তাদের তরে
গৌরবে বুক উঠুক ভরে রে।

শিকল-পরার গান : এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবরে বিকল।

যুগান্তরের গান : নবযুগ এল ঐ, এল রক্ত-যুগান্তর রে
বল জয় সত্যের জয়।
জাগা ফের দেশ-জোড়া প্রাণ
দে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে–।

পাগল পথিক : শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়?

বিদ্রোহীর বাণী : বুকের ভিতর ছ'পাই ন'পাই মুখে বলিস স্বরাজ চাই।
কর্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ ফরাজ ছল কেবল।
আমরা জানি সোজা কথা–পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ।

'অভিশাপ' 'ঝড়' কবিতায়ও 'বিদ্রোহী' কবিতার আদল রয়েছে।
যাই হেরিনু-প্রলয় তুফান বন্যা, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী সর্বনাশ
বহে তাহে রক্ত গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত নিকাশ,
আমি ঝড়, জুলুমের জিঞ্জীর বাজে মম পায় বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ।

WWW.AMARBOI.COM

ভাঙ্গার গান : কারার ঐ লৌহ কপাট–

জাগরণী : কোটি বীরসুত ঐ হের ধায়/ মৃত্যু তোরণ দ্বার পানে।
পুরুষ সিংহ জাগোরে সত্য মানব জাগোরে
বাধা-বন্ধন-ভয়-হারা হও, সত্য মুক্তি মন্ত্র গাও।

দুঃশাসনের রক্ত-পানে (ভাঙ্গার গান)– দুঃশাসনের রক্ত চাই।
জালিমের মোরা ফেলাই লাশ/ রাজা রাজড়ার সর্বনাশ

সাম্যবাদী : এ সাম্যবাদী আস্তিক। অতএব এ সাম্যবাদী কমিউনিস্ট নন–উদার মানববাদী।
কোরান পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক
জেন্দাবেস্তা গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত সখ
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
তোমার হৃদয় বিশ্ব দেউল সকলের অবতার। (ঈশ্বর)

ঈশ্বর সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি।

মানুষ গাহি সাম্যের গান।
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
মহামানবের মহাবেদনার আজি মহা উত্থান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপী	যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই আমরা তো ছার–তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ যে টলমল।
চোর-ডাকাত	চোর ডাকাতের করিছে বিচার কোন সে ধর্মরাজ? বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দুস্য আজ? ছোটদের সব চুরি করে –গাহি যক্ষের জয়।
বারাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী নারী :	(আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদ নাই) বিশ্বে ... অর্ধেক তার নর।
রাজা প্রজা	সমবেত রাজকণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয়।
সাম্য	এখানে রাজা প্রজা নাই, দরিদ্র ধনী। নাইকো এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল পাদরী পুরুত মোল্লাভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।
কুলি-মজুর	দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ একের অসম্মান/ নিখিল মানব জাতির লজ্জা–সকলের অপমান। ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার।
সর্বহারা :	কৃষকের গান : এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়। –ওরে দেখবে এবার সত্য জগৎ চাষার কত বল।
শ্রমিকের গান	এইবার শেষ কপাল ঠুকে পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে
ধীবরের গান	এবার দৈত্য দানব ধরব ভাই/ ভাঙাতে জাল ফেলে
ছাত্রদলের গান	সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়–আমরা করি ভুল রক্তে করি পথ পিছল। মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ শতাব্দীর।
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার	কে আছ যোয়ান, হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ। হিন্দু না ওরা মুসলমান? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী তব সম্মুখে– পুনর্বার।
ফরিয়াদ	ভাই-এর মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়। মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান জয় নিপীড়িত প্রাণ।
আমার কৈফিয়ত	দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে। রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রার্থনা করো–যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত
লেখায় তাদের সর্বনাশ।

প্রার্থনা — হে মৌনী জনগণ বেদনা বিমোচন যুগসেনা নায়ক জাগো জ্যোতির্ময়।

ফণিমনসা/ সব্যসাচী : ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয় চাপাপ্রাচী

মুক্তিকাম : স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম
সুপ্তবঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম

সাবধানী ঘন্টা — রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা
রুধির নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা।

রক্ত পতাকার গান : শীতের শ্বাসের বিদ্রূপ করি ফোটে কুসুম
নববসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম
অতীতের ঐ দশা সহস্র বছরের স্থান মৃত্যু বাণ
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।

অন্তর ন্যাশনাল : জাগো অনশন বন্দী, ওঠ রে যত
জগতে লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।

জাগরতূর্য — ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর অধিকারী
ওঠ, ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত।
উহারা ক'জন? তোরা অগহন সকল শক্তিধারী।

অগ্রপথিক (জিঞ্জীর) : আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান।
এক বেদনার কমরেড ভাই মোরা সবাই সকল দেশের মোরা সকল ।

'সন্ধ্যা' কাব্যে রয়েছে জাগরণ ও উদ্দীপনার কবিতা। 'সন্ধ্যা' কবিতায় জাতীয়তাবাদী কবি আরব-তুর্কী-মুঘল বিজয়কে স্মরণ করেছেন বিদেশীর দাসরূপে :

পরাধীনতার দাসত্বের অভিশাপ রূপে– সাত'শ বছর ধরি
পূর্ব তোরণ দুয়ারে চাহিয়া জাগিতেছে শর্বরী
যে পরাজয়ের গ্লানি মুখে রাখি ডুবিল সন্ধ্যা রবি
সে গ্লানি মুছিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ হরি।

তরুণ তাপস — রাঙা পথের ভাঙা ব্রতী অগ্রপথিক দল
নামরে ধুলায়–বর্তমানের মর্ত্য পানে চল।

আমি গাহি তারি গান — দৃপ্তি দম্ভে যে যৌবন আজ ধরি অসি খরশান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন বন্দনা (এটি চাষী মজুর বৃত্তিজীবীর বন্দনা গান)।
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।

ভোরের পাখী : তরুণ ও তারুণ্যের বন্দনা।

কালবৈশাখীর আবাহন : দধীচির হাড়ের বজ্রবহ্নি বারে বারে যথা নিবিয়া যায়।
– নাই বৈশাখীর ঝড় হেথায়।

'নগদ কথা' কবিতায় রয়েছে তিরস্কার।
যুদ্ধ ভূমির ত্যাগ করে সব/ ধরা দিলি দেব দরজায়।

জাগরণ এদের কানে মন্ত্র দেবে, এদের তোরা বোঝা
এরাই আবার করতে পারে বাঁকা কপাল সোজা
নতুন যুগে নতুন নকীব, বাজা নতুন বাঁশী।

'জীবন ও যৌবন' কবিতায় কৃষিকর্মে উৎসাহ দেয়া হয়েছে :
(বৃষ্টির ফলে) জাগরণের লাগল ছোঁয়াচ মাঠে মাঠে তেপান্তরে
শ্যামল তৃণাঙ্কুরে তারা উঠল বেঁচে নতুন করি।

তরুণের গান : ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে
জরাজীর্ণের যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর বেশে,

চল্ চল্ চল্ : নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীবে দানিব নতুন প্রাণ/ বাহুতে নবীন বল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমাজ সংস্কারক রূপে বন্দিত।

অন্ধ স্বদেশ দেবতা (নবীন মৃত্যু যাত্রী)– তোদের রক্তে রাঙা উষা আসে
পোহাইতেছে বিভাবরী।

তর্পণ (দেশবন্ধুর ৪র্থ বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত)–
ঘুচাও ঘুচাও জাতের লজ্জা মরণ পাতে।

প্রলয়শিখা কাব্যে প্রলয় শিখা–আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতের সে পথ বিলাপ,
সজল আকাশ উঠিয়াছি তাই বজ্র শায়ক ইন্দ্রচাপ।

হবে জয় : অসম সাহসে আমরা অসীম সম্ভাবনায় পথে ছুটিয়া চলেছি।
পোহাবে রাত্রি, গাহিবে যাত্রী নব আলোকের জয়।

পূজা অভিনয় : দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ, দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ
বিশহাতে করে লুণ্ঠন তবু ভরে নাক ওর ক্ষুধিত বুক।
হয়ত গোকুলে বাড়িছে সে আজ, উহারা কল্য বধিবে যে।

ভূত ভাগানোর গান : ও ভূত যেই দেখেছে মন্দির তোর
নাই দেবতা নাচছে ইতর
আর মন্ত্র শুধু দন্ত বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে
তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানিচক্রে জুতে'।

মোহান্তের মোহ এই সব ধর্মযোগী/দেবতায় করেছে দাগী মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তের গান — কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে বসে
সে যে পাপের ঘন্টা বাজায় পাপীদের দেউলে পশে।

পথের দিশা
(ফণিমনষা) — মসজিদে আর মন্দিরে ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার
রে অগ্রদূত, ভাঙ্গতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?

আয় বেহেশতে — কে যাবি আয় (জিঞ্জীর) :
শাস্ত্র শকুন জ্ঞান মজুর যেতে নারে
সেই হুরপরীর শরাব সাকীর গুলিস্তাঁয়।

জগলুল, আমানুল্লাহ, উমর ফারুক প্রভৃতি কবিতাও প্রেরণা ও জাগরণের উৎস হিসেবে স্মরণীয়।

বিংশ শতাব্দী — (প্রলয় শিখা কাব্যে) :
কাটিয়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম নেশা
ধ্বংস করেছি ধর্ম যাজকী পেশা।
ভাঙ্গি মন্দির, ভাঙ্গি মসজিদ
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত–
এক মানবের একই রক্ত নেশা।
সংস্কারের জঞ্জাল পাষাণ। তুলিয়া বিশ্বে আমরা করেছি ত্রাণ।

ভারতী আরতী, বহ্নিশিখা, সময় সঙ্গীত, চাষার গান ও গান কবিতায় রয়েছে শক্তি ও উদ্দীপনা কামনায় দেবতার স্তুতি।

নবভারতের হলদিঘাট, যতীনদাস, বিংশ শতাব্দী, শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র, রক্ততিলক প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে বোধন বাণী।

'চন্দ্র বিন্দু' কাব্যের জাগো শঙ্খচক্র পদ্মধারী, বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা, নাহি ভয়, কারা, পাষাণ ভেদী, আজি শৃঙ্খলে জাগো হে রুদ্র প্রভৃতি গান এবং তার কমিক গানগুলোও স্বদেশ-স্বজাতি প্রাণতাজাত কবিতা।

– বিশ্ববাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো।

'নতুন চাঁদ' কাব্যের দুর্বার যৌবন, ওঠরে চাষী, কৃষকের ঈদ, শিখা, আজাদ, ঈদের চাঁদ এবং 'শেষ সওগাত' কাব্যের জাগো সৈনিক আত্মা, নবাগত, উৎপাত, বন্ধুরা ফিরে এস, নারী, নিত্য প্রবল হও, আগ্নেয়গিরি, বাঙলার যৌবন, ভয় করিও না হে মানবাত্মা, কোথাও সে পূর্ণ যোগী, বড়দিন, নবযুগ, মোহররম প্রভৃতি কবিতা অগ্নিবীণা-বিষের বাঁশীর যুগ স্মরণ করিয়ে দিলেও এসব কবিতায় আগের মতো তেমন প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, যৌবনের আবেগ, বুকের সাহস, মনের জোর, কণ্ঠের বজ্রকাঠিন্য, বাণীর উদাত্ত ঔদ্ধত্য কিংবা বেপরওয়া আস্ফালন যেন নেই, যেন নিতান্ত পূর্বের অভ্যাসবশে গুণে-মানে-মাত্রায় হীন-ক্ষীণ প্রত্যয়ে, সাহসে ও কণ্ঠে মৃদু৩ান উত্তেজক-উদ্দীপক বাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর সুস্থ জীবনের ও দুর্বল চেতনার প্রান্তপর্বে। হয়তো রোগের কালো হাতের মৃদু স্পর্শ তিনি তখন অনুভব করেছেন চৈতন্যের গভীরে হাল্কা স্বপ্নের স্রোতের মতো। তাই তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনকার কবিতা ঐশ-মদদের প্রার্থনা উচ্চারণ মাত্র–রণহুঙ্কার নয়। শেষ সওগাত কাব্যের আর কতদিন? ডুবিয়ো না আশাতরী, বকরীদ, আল্লাহর রাহে ভিক্ষা দাও প্রভৃতি কবিতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যেমন, প্রভু আর কত দিন
তোমার প্রথম বেহেশত পৃথিবী রহিবে গ্লানি মলিন। (আর কত দিন?)

কিংবা, হে নবযুগের নব অভিযান সেনাদল, শোন সবে
এ তরীর কাণ্ডারী আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান
বিশ্বাস রাখো তাঁর শক্তিতে, এ তাহার অভিমান (ডুবিবে না তরী)

অথবা, রাজনীতি নয় মুক্তির পথ এক তাঁর (আল্লাহর্) পথ ধরে
... মানুষেরে ভ্রাতা ভাবিলে অমনি আল্লাহ যান সরে।

আর, নির্যাতিতের আল্লাহ তিনি, কোন জাতি নাই তার
যুগে যুগে যারে উৎপীড়কেরে তাঁহার প্রবল মার।
(একি আল্লাহর কৃপা নয়)

পূর্বের 'সাম্যবাদী'র কবির মুখে এখন উচ্চারিত হয় :

আমরা বলিব, সাম্য-শান্তি, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ। (এক আল্লাহ জিন্দাবাদ)

এখানেই শেষ নয়, আরো আছে :

আল্লাহ ভগবানের আমরা যদি আশ্রয় পাই
সেই সে পরম অভয়াশ্রয়ে মৃত্যুর ভয় নাই। (বোমার ভয়)

'উনিশশ' বিশের নজরুল আর উনিশ', চল্লিশের নজরুলে কত পার্থক্য! বিশের প্রদীপ্ত যৌবন নজরুলের অতিক্রান্ত যৌবনে কি করুণ-কাতর পরিণতি! ট্যাজেডী আর কাকে বলে!

স্বচ্ছন্দবিহারী ছাগল অন্যের ইচ্ছায় চালিত হয়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে চায় না। তাই ছাগলকে কোথাও নিতে হলে একজনকে দড়ি ধরে টানতে হয়, এবং অন্যজনকে পিছন থেকে ঠেলে তাড়িয়ে নিতে হয়। আর ভেড়াকে মুক্ত অবস্থায় যদৃচ্ছা চালিত করা চলে অনায়াসেই। নজরুল ইসলামও ভয়বিপদের ক্ষেত্রে মানুষের এই ছাগ-স্বভাবের এবং লাভ-লোভের প্রেরণার এই মেষগতির খবর রাখতেন। তিনি জানতেন ও বুঝতেন যে মানুষকে ভয় বিপদ ত্যাগের পথে নামাতে হলে কেবল আহ্বানে সাড়া সম্মতি মেলে না, কেজো উপায় হচ্ছে উদ্দীপনা ও উত্তেজনা সঞ্চার করা। আর অনুপ্রেরণা উত্তেজনা জিইয়ে রাখার জন্য, অঙ্গীকারে ও সঙ্কল্পে অটল রাখার জন্য চাই ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও নেতৃত্বের আকর্ষণ। তাই নজরুল ইসলাম একাধারে যুগপৎ উদ্দীপনা-উত্তেজনাগর্ভ সংগ্রামী আহ্বানের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব মহিমা প্রশস্তিও উচ্চারণ করেছেন। এ সূত্রে তাঁর নেতা, নায়ক, মহাপুরুষ ও দেবতা প্রশস্তিমূলক কবিতা গুলো স্মর্তব্য। যেমন ঃ রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, কামাল-পাশা, আনোয়ার, খেয়াপারের তরণী [অগ্নিবীণা], ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম, জাগৃহি, পাগলপথিক [বিষের বাঁশী], আত্মপ্রয়াণগীতি, চিত্তনামা [চিত্তরঞ্জন দাস], আনন্দময়ীর আগমনে, অশ্বিনীকুমার, আর খালেদ, জগলুল, আমানুল্লাহ, উমর ফরুক (জিঞ্জির) রীফসর্দার, যতীন দাস প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সংগ্রামে আহ্বান কালে আস্তিক মানুষের আস্থা অর্জনের জন্যেই হয়তো ঐশ-শক্তিনির্ভর আস্তিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঘন ঘন 'দেবতা, বিধাতা ও সত্য' এর দোহাই উচ্চারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নজরুলের আল্লাহতে, কালীতে, ভূতে, যোগে ও তন্ত্রে বিশ্বাস তাঁর উদার মতের ও সহিষ্ণুতার সাক্ষ্য নয়, বাঞ্ছিত ফল লাভে দেবকৃপাকামী নিয়তিবাদী আবাল্য সংস্কারাচ্ছন্ন অলৌকিক কেরামতিতে বিশ্বাসপ্রবণ এক ভীরু মানুষের দুর্বলচিত্তের পরিচায়ক মাত্র।

কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা সেই আবেগ তাড়িত বন্ধনভীরু উদ্দাম বিপ্লবী যোদ্ধা হিসেবেই প্রত্যক্ষকরি তাঁর উপন্যাস তিনটেতেও। বাঁধনহারার (১৯২৭) নায়ক নূরুল হুদা, কুহেলিকার (১৯৩১) জাহাঙ্গীর এবং মৃত্যুক্ষুধার (১৯২৭–৩০) নায়ক আনসার মূলে আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক বাস্তব বুদ্ধিবিহীন প্রাণধর্মের প্রাচুর্যে দুরন্ত ও অস্থির। স্বদেশ-স্বসমাজ-স্বজাতিপ্রীতি যে তাদের মজ্জাগত তা-ই নয়, কেবল তারা অভিমানী ও প্রেমিক, আবার সাহসী ও সংগ্রামী। বলাবাহুল্য এ তিন নায়কই স্বরূপে স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। নূরুল হুদা তো লম্বাচুল ও গেরুয়াধারী। ব্যক্তিগত আশা-হতাশা যেমন তাদের বিচলিত বিব্রত করে, তেমনি স্বদেশ-স্বজাতি তথা গণমানবও তাদের সংবেদনশীল সাড়া জায়গায়। ফলে নজরুলের উপন্যাসে নারী ও পুরুষ, প্রিয়া ও পৃথিবী, ভূমি ও ভূমা, বাস্তব ও কল্পনা, সৃষ্টি ও বিনাশ, জগৎ ও জীবন, সমাজ ও সংগ্রাম এক অন্ধ আবেগের অসঙ্গত আলো-আঁধারি তৈরি করেছে। নায়কদেরও একজন অনাথ [নূরুল হুদা], আর একজন জারজ [জাহাঙ্গীর]। জাহাঙ্গীর অবশ্য আত্মপরিচয়ের ধাক্কা সামলে নিয়েছে, সে 'গোরা' হতে হতেও হয়নি, বিপ্লবী থেকে গেছে প্রমথের প্রভাবে। নূরুল হুদার মধ্যে রয়েছে অনির্দেশ্য জ্বালা ও দ্রোহ এবং মানুষের খুন ঝরানোর লক্ষ্যে যুদ্ধ যাবার মতো আত্মহনন প্রবণতা। প্রায় অকারণেই কিংবা অনাথ হওয়ার জন্যে সামান্য ক্ষোভেই সে স্রষ্টাদ্রোহী। সে বলে, "দুঃখকে পাওয়ার জন্যই আমি এমন করে বেরিয়েছি ঃ এই বেয়াড়া আনন্দই আমাদের পাগল করলে।" সে বলে, "মানুষকে আঘাত করে, হত্যা করেই আমার আনন্দ। আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুষমনী মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর।" আবার অন্যত্র বলছে, "বিদ্রোহটাতো অভিমান আর ক্রোধের রূপান্তর। ছেলে যদি রেগে বাপকে বাপ না বলে, বা মাকে মা না বলে, তাহলে কি সত্যি তার পিতার পিতৃত্ব মাতার মাতৃত্ব মিথ্যা হয়ে যায়?" অন্যত্র নায়ক বলছে, "আমি চাচ্ছিলাম আগুন, শুধু আগুন–সারা বিশ্বের আকাশে বাতাসে বাইরে ভিতরে আগুন, আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমার বিশ্বগ্রাসী আগুন নিয়ে। আরো চাচ্ছিলাম মানুষের খুন। (আবার) এই মানুষেরই এতটুকু দুঃখ দেখে সময় সময় আমার বুক সাহারার মতো হা হা করে উঠে।" (পত্র সং ৯)।

বাঁধনহারাতেই সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতি কিংবা সৈনিকের তথা সংগ্রামীর যোগ্যতা সম্বন্ধে নজরুল ভাবতে শুরু করেছেন। "এই ছোঁয়াছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দু সমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তাহলে হিন্দু মুসলমানের একদিন মিল হয়ে যাবে। সিপাহীর দিল হবে শক্তপাথর, বুক হবে পাহাড়ের মতন অটল। আর বুক হবে অশনির মতো কঠোর।" রাবেয়াকে লেখা সাহসিকার পত্রে ধর্ম সম্বন্ধে নজরুলের ধারণা ও মত স্পষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠেছে– "সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তন সত্যের পথ।.. আমি তো কোনো ধর্মের বাইরের খোলসটাকে ধরে নেই। গোঁড়া ধার্মিকদের ভুল তো এখানেই।"

বলাবাহুল্য এসব প্রলাপ-প্রায় উক্তি পত্রোপন্যাসের কোন শ্রীবৃদ্ধি না করলেও কবি নজরুলের যে প্রথম বয়স থেকেই অবচেতনভাবেই এক অনির্দেশ্য বৈনাশিক প্রেরণায় দ্রোহপ্রবণ–তাঁর এ মনস্তত্ত্ব বাঁধনহারায় সুস্পষ্ট। কিছু পরবর্তীকালের শাস্ত্রসমাজ সরকার রাষ্ট্র ভাঙ্গাগড়ার পরিকল্পিত জীবনব্রত হিসেবেই তাঁর অন্তরের এই আগুন ওই জ্বালা ও দ্রোহ অভিব্যক্তি পায়।

তাঁর গল্প 'রিক্তের বেদনে'ও (১৯২৪) নায়ক যুদ্ধে স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেমজ জ্বালা জুড়ানোর জন্যেই যাওয়া। তবু সেখানেও নায়ক চরিত্রে নজরুলই আভাসিত। জননী জন্মভূমি মঙ্গলের জন্যে... অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা– আমার ভাইরা (রিক্তের বেদন)।

কুহেলিকার নায়ক জাহাঙ্গীর সন্ত্রাসবাদী, বাঙলা-সাহিত্যের অঙ্গনে সশস্ত্র বিদ্রোহে স্বাধীনতার স্বপ্ন সরাসরি জাগে কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যেই। এদিক দিয়ে তিনি পথিকৃৎ। শরৎচন্দ্রের পথের দাবী; সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী কিংবা মনোজ বসুর ভুলি নাই গুণে মানে মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ হলেও, পথ দেখানোর গৌরব কাজী নজরুল ইসলামের প্রাপ্য। শিল্পগুণে কিংবা উপন্যাস হিসেবে সার্থক না হলেও 'কুহেলিকা' যথার্থই রাজনৈতিক উপন্যাস। –এ হিসেবে এ উপন্যাস বাঙলা কথা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের দিশা দিয়েছিল, মিটিয়েছিল অক্ষমতাভরে হলেও কালের দাবি, সেদিনকার বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙলা তথা ভারতে স্বাধীনতার যে স্পৃহা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভীরু মনে জেগেছিল, তাকেই ভাষা দিয়েছিলেন বিপ্লবী বিদ্রোহী স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাঙাগড়ার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এতে সেদিনকার বাঙলার তথা ভারতের রাজনীতি ও সামাজিক জীবনের বাস্তব সমস্যা আর চালু চিন্তা চেতনা হয়েছিল রূপায়িত–রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভূমিকা, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ও সম্পর্ক, অহিংসা ও রাজনীতিক প্রভাব, বিপ্লবীদের হিন্দু চেতনা ও মুসলিমদের সম্পর্ক তাদের দ্বিধা ও সংশয় সর্বোপরি লেখকের যথাশীঘ্র স্বাধীন স্বদেশ দেখার ও গড়ার আগ্রহ আমাদের মুগ্ধ করে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ বিপ্লবী অনিমেষ বলছে– "জাহাঙ্গীরকে আমাদের বলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না (অন্যদের সম্বন্ধে) আমরা বিপ্লবী, কিন্তু গোঁড়ামীকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি– ধর্ম বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি। ধর্মের নামে হিন্দু মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির ও বৃদ্ধির জন্যে দায়ী করা হয়েছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে। মুসলিমদের আরব-ইরানমুখিতা সম্বন্ধে ভেবেছেন এবং হিন্দু বিপ্লবীর মুখেই সমাধান দিয়েছেন যে, মাটি ওদের ফুলে ফলে শস্যে জলে জননীর অধিক স্নেহে লালন পালন করেছে... সেই মাটির ঋণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। ... আর ধর্ম ওদের অস্থিমজ্জার সৃষ্টি।"..."দেশপ্রেম ওদের মধ্যে জাগেনি–ওদের নেতা নেই বলে।"

মৃত্যুক্ষুধা হল নিঃস্ব নির্যাতিত, শোষিত, পীড়িত, দলিত-লাঞ্ছিত মানবতার আলেখ্য।–নিঃস্ব দিনমজুরের এবং কৃষ্ণনগরের খ্রীস্টান-মুসলিম নিম্নতম মানের জীবনযাত্রার, দুঃখ-যন্ত্রণার, সমস্যা-সংকটের বাস্তবচিত্র দানের প্রয়াস রয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুক্ষুধায়। দেশী লোকের দারিদ্র্যের বৃদ্ধি এবং খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রসারও তিনি 'কারণ-করণ' হিসেবে দেখিয়েছেন। এদিক দিয়ে নজরুলের এ বইতে গণসাহিত্যের সূচনা লক্ষণীয়। তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও সহযাত্রী কয়লাখনির কুলি মজুরের জীবনের চিত্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথা এ সূত্রে স্মর্তব্য।

তাছাড়া গোটা ভারতের মুক্তি-কামনা হয়েছে প্রবল, তাই বেদনা-করুণ কণ্ঠে উচ্চরিত হয়েছে, আনসারের মুখে, 'আমার ভারতবর্ষ ভারতেরই এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পরপদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ, যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন তীর্থ।' কুহেলিকার নায়ক সন্ত্রাসবাদী আর 'মৃত্যুক্ষুধার' নায়ক সাম্যবাদী, সাম্যবাদ-সন্ত্রাসবাদ দুটোই হয়েছে নজরুরে হাতে নন্দিত। যা 'ঘরে বাইরের' ও 'চার অধ্যায়ে'র রবীন্দ্রনাথের কিংবা 'পথের দাবী'র শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সমাজ-পরিবর্তনের প্রয়োজন সাহিত্যে এ প্রথম আভাসিত হল এবং সে পরিবর্তন আনবে সর্বহারা চাষী-মজুরেরা।

'ব্যথার দান' (১৯২২), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪), ও 'ঘুমের ঘোরে ও হেনা' (১৯৩১) গল্পের নায়করাও সাহসী যোদ্ধা এবং দেশ, মানুষ ও জীবন সচেতন। 'হেনা' গল্পের নায়ক সোহরাব বলে, 'আমি যাচ্ছি মুক্তদেশের আগুনে পুড়তে। তার ভিতরে আগুন, আমি চাই তার বাইরেও আগুন জ্বলুক।'

বাঈজি সন্তান, জারজ জাহাঙ্গীর, বারাঙ্গনা প্রভৃতি এ সঙ্গে স্মরণীয়। সমাজে হীনপতিত ঘৃণ্য মানুষও কবির দেয়া সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত নয়। লেটোর গানে এবং কৈশোরে করুণায় বিগলিত কবির 'বন্দী পাখী' কবিতায়ও কবি-লেখক কাজী নজরুল ইসলামের সত্তার উত্তরকালের প্রকটিত লক্ষণগুলো লঘু-গুরুভাবে অভিব্যক্তি পেয়েছে। দুস্থ দলিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তি অন্বেষা, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনবাঞ্ছা, পাপীতাপী, জারজ-পতিত অস্পৃশ্য মানুষের মূল্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস, স্বদেশে আর্থ সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠালক্ষ্যে সংগ্রামের সংকল্প সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান তত্ত্বে হিন্দু মুসলিমকে চেতনা দান, এই মানবপ্রেমিক বহু জনহিত ও বহুজনসুখকামী, বিদ্রোহী, বিপ্লবী, সংগ্রামী কবির বাল্যে কৈশোরে ও তাঁর চিন্তাচেতনায় অঙ্কুরিত হয়েছিল, দেখা যায় এসব মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল রক্ত-মাংসের মতোই তাঁর সত্তার, তাঁর আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ, উৎস ও আধার।

তাই কাব্য বা সাহিত্য তাঁর কৃত্রিম অনুশীলনের মনোবিলাসের বিষয় ছিল না, ছিল সত্তার ও আত্মার, আদর্শের ও আকাঙ্ক্ষার, দায়িত্বের ও কর্তব্যের অভিব্যক্তিদানের মাধ্যম ও অবলম্বন। একজন মানবপ্রেমিক দায়িত্ব সচেতন মানুষের বা নাগরিকের কাছে–একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকবান কবি-মনীষী-মনস্বীর কাছে যা' প্রত্যাশিত, নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে একাগ্রচিত্তে তা প্রায় আক্ষরিকভাবে পূরণ করেছেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি অসামর্থ্যের ফল, অবহেলার সাক্ষ্য নয়। এদিক দিয়ে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অসামান্যতা ও অনন্যতা অবশ্য স্বীকার্য। তাঁর মর্ত্যে আবির্ভাব ভালোবাসা দেয়ার এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে মানুষকে আহ্বান জানানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রত নিয়েই তা তিনি তাঁর কথায় ও কাজে প্রমাণ করে গেছেন। এ জন্যেই ছন্দে ও প্রবন্ধে, গল্পে ও উপন্যাসে সর্বত্র তাঁর একই দাবি ও লক্ষ্য উচ্চারিত। নজরুল ছিলেন গণমানবের স্বশাসন ও স্বাধিকারকামী, আর রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুশাসন ও সুপোষণের পক্ষপাতী।

নজরুল ইসলামের কবিস্বভাব ঃ শক্তিপূজা

আমরা জানি প্রাণীমাত্রই কায়িক ও মানসিক সুপ্ত শক্তির আকর। ওই জড় শক্তিকে সচেতন অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকটিত, বিকশিত ও প্রয়োগসম্ভব করে তুলতে হয়। মানুষ প্রয়োজনে কিংবা সখের বশে কুকুর, হাতী, ঘোড়া, বানর, পায়রা-বাজ প্রভৃতি পশুপাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের বোধবুদ্ধিকে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে দৈহিকভাবে মানুষের পক্ষে অসাধ্য কাজে লাগিয়েছে।

পরিমিত দৈহিক ও মানসিক শ্রম যে মানুষের দেহ-মনের স্থিতি ও স্বাস্থ্যের জন্যে আবশ্যিক, তা মানুষ ঠেকে ও ঠকে অনেক আগেই শিখেছে। শারীর অনুশীলনও যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্যদান করে মানুষকে আপাত অসাধ্য সাধনে সক্ষম সমর্থ করে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায়-পর্বতারোহণে, বক্সিং যুযুৎসু কেরাতে, সমুদ্র গভীরে সন্তরণে কিংবা আকাশচারিতায়, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

আর মানসিক শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ-বিকাশ দেখা যায় মানুষের রোগের লক্ষণ নির্ণয়ে, প্রতিষেধক আবিষ্কারে, যন্ত্রের উদ্ভাবনে, গণিত-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চায় ও প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও তথ্য উদ্ঘাটনে। প্রাণীর দেহের ও মনের শক্তি অনুশীলনে, অপ্রয়োগে সারা জীবন গুপ্ত ও জড়ই থেকে যায়। আত্মবিস্তারের প্রেরণায় কিংবা পরিবেশের চাপে অথবা অন্য কারুর প্রবর্তনায় এ শক্তির সচেতন অনুশীলনেই এ শক্তি আয়ত্ত করে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

প্রত্যেক মানুষেরই স্বভাবের জগতের ও জীবনের, কর্মের ও ভোগের এক বা একাধিক দিক বা বিষয়ে আকর্ষণ থাকে। কারুর সব বিষয়ে বা বহু বিষয়ে সমান আসক্তি কিংবা আগ্রহ থাকে না। শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে এমনকি যৌবনেও অন্তর্মুখী চেতনার মানুষ না হলে কেউ তার নিজের এ মানস প্রবণতা উপলব্ধি করে তার যথার্থ অনুশীলনে কিংবা প্রয়োগে আগ্রহী বা যত্নবান হয় না। তাই তাদের জীবনে বাঞ্ছিত মানস তৃপ্তি ও ব্যবহারিক সাফল্য আসে না।

অবচেতনভাবেই কবি নজরুল ইসলাম আবাল্য তাঁর বুকের মধ্যে লালন করতেন এক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ো শক্তি। সে শক্তির বেগ বা গতি ছিল তাঁর বোধাতীত–স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি বলে এক অন্ধ আবেগে তিনি চালিত হয়েছেন সারা সুস্থ জীবনে। আর কেবল প্রশ্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথের মতোই 'আমি আমারে চিনিনে, আমার আলয় কই'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক প্রভাতে রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক মুক্তি ঘটেছিল হৃদয়ারণ্য থেকে এবং তখন থেকেই উচ্ছৃঙ্খল, তিনি ইতি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলেন–চেয়েছিলেন অগাধ বাসনা ও অসীম আশা নিয়ে জগৎ দেখতে ও প্রাণ ঢালতে আর করুণাগান গাইতে।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান। (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতো পথ খুঁজে পেয়েছিলেন–এবং সারা জীবন দেশ-কাল মানুষের কাছে এবং পাশে থেকেও আপন মনের মাধুরী নিয়ে আপন পথে চলেছেন, সৎ প্রতিবেশীর মতোই অন্যের আনন্দে যন্ত্রণায় চোখ তুলে তাকিয়েছেন।

নজরুল ইসলাম কবি জীবনের উষালগ্নে এমন কিছু স্থির লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেননি যদিও তাঁর মুখে শুনি–'আমি আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ' (বিদ্রোহী)। বয়োধর্মে কামেপ্রেমে উদ্বেলিত হয়েছেন অন্য কবিদের মতোই, কিন্তু তাতেও গোড়া থেকেই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার, না পাওয়ার, পেয়ে হারানোর আর অতৃপ্তির হুল ও শূল তাঁকে চিরকালই অস্থির ও যন্ত্রণাকাতর রেখেছিল। তাঁর গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে কবিতায় ও গানে তা সর্বত্র সুপ্রকট।

নজরুল ছিলেন এক দুরন্ত, দুর্দম, দুর্জয়, অন্ধ ঝড়ো শক্তির আধার; বিরাট বিপুল, বিশাল ভয়ঙ্কর অনন্য, অসামান্য রোমহর্ষক বিস্ময়কর যা কিছু, তার প্রতিই ছিল তাঁর অমোঘ আকর্ষণ। এ আকর্ষণ অনেকটা অবুঝ দূরন্ত কৌতূহলী অকুতোভয় শিশুর আকর্ষণের মতো।

উর্মিমুখর মহাসাগরের কল-কল্লোলকে দেয়াল বদ্ধ রাখলে তা যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝার বেগে দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়বার জন্যে ক্ষুব্ধ গর্জনে এদিকে সেদিকে ছুটোছুটি করবে, কাঙ্ক্ষামত্ত কবিও যেন চাওয়া পাওয়ার আবেগ তরঙ্গে মধুর ব্যাকুলতায় আত্মপ্রকাশ করছেন কখনো আলাপে, কখনো বিলাপে, কখনো বা প্রলাপে আর কখনো ক্ষোভে, কখনো বেদনায়, কখনো অকারণ উল্লাসে, কখনো বা আকুতি তাড়িত উচ্ছ্বাস। তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা-আকুতি পূর্তির লক্ষ্যে–মহাসাগরের পরিসরে, ক্ষুব্ধ ফণীর রোষে ঝঞ্ঝাতাড়িত তুঙ্গ-তরঙ্গ রূপে যেন দিক-বিদিকে ছুটে যেতে চায়–ফেটে পড়তে চায়–কখনো দ্রোহের, কখনো মত্ততার কখনো বা উল্লাসের উচ্ছ্বাসিত আবেগের আকারে। আলো আসন্ন ও সুনিশ্চিত জেনে প্রাতঃভ্রমণকারী যেমন প্রাক-উষার আঁধারকে গ্রাহ্য করে না, কবি নজরুলকেও আপাত নৈরাশ্যে হৃতোদ্যম মনে হলেও, স্বরূপে তিনি বেপরওয়া দুরন্ত প্রাণ-শক্তির আধার এ কবি নির্ভীক আর অধ্যবসায়ী। তাই আপাত ক্ষোভ, রোষ, কান্না ও হতাশা তাঁকে জগৎজিজ্ঞাসা কিংবা জীবন-কাঙ্ক্ষা থেকে নিরস্ত করতে পারে নি। ফলে ব্যর্থতা স্বীকার করেও হতাশার হাহাকার ধ্বনিত করেও তিনি বারবার নতুন চেতনায়, জিজ্ঞাসায় ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়েছেন। এভাবেই আমরা তাঁর থেকে পেয়েছি বিদ্রোহী, ধূমকেতু, ঝড়, পূজারিণী, সিন্ধু, অনামিকা প্রভৃতি। এগুলোর প্রত্যেকটি রচনাকালে নজরুলের চিত্ত ছিল চঞ্চল, মন ছিল অস্থির, ক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড, বেদনা ছিল গভীর, যন্ত্রণা ছিল তীব্র আর আবেগ ছিল অমিত। এসব কবিতায় ঘটেছে কবিচিত্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথার্থ আন্তরিক, ঐকান্তিক ও আকস্মিক প্রকাশ। এগুলোর উৎসের সঙ্গে ছিল না জড়িত কোন পার্বণিক ও ফরমায়েসী অনুরোধ।

এ কথাগুলো বলতে হচ্ছে এ জন্যে যে আমরা জানি, নজরুলের অধিকাংশ রচনা সযত্ন প্রকাশ বিকাশ পায়নি, কবিচিত্তের চাঞ্চল্যই যে এর জন্যে দায়ী তা নয়, অন্য কারণও ছিল, নজরুল লেখাকেই করেছিলেন পেশা, বিত্তবান কিংবা সচ্ছল কবি লেখাজীবী হয়েও ইচ্ছে করলে মর্জি-মেজাজ আবেগ-অনুভূতির অনুগত থাকতে পারেন, কিন্তু দরিদ্র লেখকের পক্ষে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চাপ উপেক্ষা করা অসম্ভব। অর্থোপার্জনের হাতিয়ার হয় যখন লেখনী, তখন তার দায়ে পড়ে সদা চালু থাকার ফলে দায় সারা রচনার সংখ্যাই বাড়ে।

নজরুলের ছিল খোরপোষের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর দায়, তাই তাঁর পক্ষে ধীরে লেখা, ভেবে লেখা, যত্নে লেখা বাস্তব কারণেই ছিল অসম্ভব। নবযৌবনের প্রথম দশ বছর তবু নাম-যশের প্রেরণায় রচনা গুণে-মানে-মহাত্ম্যে-প্রশংসনীয় করে তোলার চেষ্টা ছিল, কিন্তু ত্রিশোত্তর বয়সে ও কালে আশাতীত প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সংসারও যখন বড় হচ্ছিল, তখন ফরমায়েসের ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাগ রচনায় মন দিলেন বেশি। বলতে গেলে ১৯৩২ সনের পরে উৎকর্ষ দূরে থাক, তার রচনা গুণে মানে বরং ৬ ান হতে থাকে।

নজরুল রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি আবিষ্কার এখন আর নিন্দা অবজ্ঞার অভিব্যক্তি নয়, বরং প্রিয়জনের অভাবিত ব্যর্থতায় অপ্রত্যাশিত আকস্মিক অসাফল্যে যে বেদনাবোধ ও ক্ষোভ জাগে, এ তারই প্রকাশ, এ সহানুভূতিরই অন্যনাম ও অন্যরূপ।

লক্ষ করলে দেখা যাবে উপযুক্ত কবিতাগুলোর মধ্যে চেতনার চমক, আবেগের দ্যুতিময় প্রকাশ, স্তবকের স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকলেও ভাবসত্যের ঐক্য নেই, নেই অনুভবের পারম্পর্য।

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ললিত-প্রাঞ্জল ভাষায় আবেগাশ্রিত একখানি অধ্যাত্ম দর্শনের গ্রন্থ লিখেছিলেন... তা অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের প্রিয় হয়েছিল। মোহিত লাল মজুমদারও ছিলেন ওই 'অভয়ের কথা'র একজন বিমুগ্ধ পাঠক। সম্ভবত তার 'আমি' চেতনার উৎস ওই 'অভয়ের কথা'ই। মোহিত লালের কাব্যাত্মক গদ্য রচনাটিতে 'আমি'র বা 'অহঙে'-র তাত্ত্বিক স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস আছে, অন্য কথায় ওইটি একটি আত্মবোধমূলক রচনা–অবলম্বন প্রাচীন দেশী-বিদেশী উপকথা, কাব্য, পুরাণ ও অধ্যাত্মতত্ত্ব। 'আমি'র দুটো অংশ। দুটো অংশেই রয়েছে লঘু-গুরু চেতনার বন্ধুরতা–মান মাত্রার অসমতা চড়াই-উৎরাই। মাঝে মাঝে ভাব বিশদ করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত পূর্ণাঙ্গ বাক্যগুলো রচনার ধ্বনি সৌন্দর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে রসাভাস ঘটিয়েছে। প্রথমাংশে আছে প্রত্যয়ের ও শক্তি সাহসের দীপ্তি, শেষাংশে রয়েছে আত্ম দৈন্যের গ্লানিমা। পরিণামে 'আমি'র যে-স্বরূপে আত্মোপলব্ধি ঘটেছে তা এই :

'অমৃত কি তাহা জানি না, কিন্তু যেন তাহার আভাস পাইয়াছি। জননীর পয়োধর, শিশুর অধরপুট ও প্রণয়িনীর বাহুবেষ্টন অন্য জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তখন ধরণীর ধূলি হতে আকাশের পানে চাহিতে ইচ্ছা করে; অন্তরের মধ্যে যে বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বোধ হয়। কে বলিবে সে কি মোহ–সে কি ভ্রান্তি? কিন্তু আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনের অশ্রু দেখিলে, আমার অশ্রু শুকাইয়া যায়, আর একজনের হাসি দেখিলে মৃত্যু ভয় থাকে না। আর একজনের হাত ধরিলে অনায়াসে অদৃষ্টকে পরিহাস করিতে পারি। এ মদিরা পান করিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তখন কুটিরাঙ্গণে পৌর্ণমাসীর জ্যোস্নালোক ব্যর্থ মনে হয় না। একটি চাহনি, একটি চুম্বন, একটু হাসি, একটু অশ্রুজল পাগল করিয়া দেয়। পৃথিবী ঘুরিয়া যাক, আকাশ চন্দ্র তারকা লইয়া ছিঁড়িয়া পড়ুক আমার আবেগ প্রশমিত হইবার নয়। আমি তখন কণ্ঠে কালকুট ধারণা করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি।

'আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিরাটকে আমি ধারণ করিতে পারি। আমি মরণশীল, কিন্তু অমৃত আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। আমি দুর্বল, কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি ধরণীকে নব কলেবর প্রদান করে। আমি অন্ধ কিন্তু উর্ধ্ব হইতে আমার মুখে যে আলোক আসিয়া পড়ে তাহাতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া যায়। কে বলিবে, আমি কে? এ সমস্যার কে সমাধান করিবে।' (মুজফফর আহমদ–উদ্ধৃত 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতি কথা', পৃঃ– ২০২)

মোহিত লাল মজুমদারের এ রচনা একটি নৈর্ব্যক্তিক জীবন জিজ্ঞাসাজাত। এখানে 'মানুষের সুপ্ত ও সম্ভাব্য শক্তির বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিকাশের ও প্রকাশের স্বরূপ অনুধাবনের ও উপলব্ধির তাত্ত্বিক প্রয়াস বা কৌতূহল সুপ্রকট। মোহিত লালের 'আমি' নজরুলকে মোহিত লাল স্বয়ং পড়ে শুনিয়েছিলেন, ১৯২০ সনের নভেম্বর মাসের কোন এক বিকেলে মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে। কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখেন ১৯২১ সনের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

প্রত্যেক মানুষের মন-মত-আচার-আচরণ সমাজপ্রতিবেশের অন্যান্য মানুষের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাবেই গড়ে ওঠে। কোন আচরণ, কোন রুচি, কোন মত, কাল বা কাদের প্রভাবে অনুকরণে অনুসরণে গড়ে তুলেছি, তা গুরুত্ব দিই না বলে, স্মরণে রাখিনে বটে, কিন্তু কারুর না কারুর প্রভাব অবশ্যই ছিল। এ তাৎপর্যে কোন মানুষেরই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে মৌলিক কিছু থাকে না। চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ বিস্তার স্থান-কাল-অবস্থান ও প্রয়োজন প্রভাবিত।

এখানে আরো একটি কথা বলা নেওয়া দরকার। মানুষ কিছু দেখা মাত্রই নির্বিচারে গ্রহণ-বরণ করে না। প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব রুচি ও মানসপ্রবণতা অনুসারে সমরুচির ও সম-প্রবণতার মানুষেরই ভাব-চিন্তা কর্ম আচরণ অনুসরণ বা অসুনরণ করে। সূক্ষ্মতর তাৎপর্যে এ অনুকরণ অনুসরণ নয়–সম বা সহ মন মত রুচির মানুষের সদৃশ্য চিন্তা কর্ম-আচরণের অভিব্যক্তি মাত্র।

মোহিত লালের রচনার 'আমিত্ব' রেশটি নজরুলের মনের গভীরে নিশ্চয়ই প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। কেননা, নজরুলের স্বভাবেই ছিল ওই অহংবোধ। গোড়া থেকেই তা-ই নজরুলের চিন্তা-চেতনার চালু নীতি নিয়ম, রীতি রেওয়াজ ভঙ্গের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নিয়ম-রীতি মানার যৌক্তিকতা ও বৈধতা সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ছিলই। 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বৈশাখীর ঝড়– ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর– প্রলয় নূতন সৃজন বেদন'–এ ধ্বংসে প্রলয়ে-অনাগত নতুন সৃষ্টির ও সুন্দরের দেখা এমনি অতৃপ্তি অতুষ্ট ও জিজ্ঞাসু আত্মপ্রত্যয়ী দ্রোহীর পক্ষেই সম্ভব।

মোহিত লালের 'আমি' হচ্ছে সাধারণভাবে মনুষ্য সত্তার স্বরূপ ও উপলব্ধিমূলক রচনা আর নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী'তে একান্তভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে অস্বীকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতিক্ষুব্ধ আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি মানুষের নিজের গুণ-মান-মাহাত্ম্য প্রচারমূলক আস্ফালন। অন্যেরা এ ব্যক্তির শক্তি-সাহস-কৃতি অবহেলা বা অস্বীকার করছে বলেই যেন ইনি উচ্চ কণ্ঠে সদম্ভে সদর্পে আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-সংকল্প ঘোষণা করছেন। এ ঠিক আত্মবোধমূলক রচনা নয়। এর মধ্যে এক প্রকার ডনকুইকসোটী রয়েছে। এটুকু কল্পনা করে না নিলে এটি পাগলের প্রলাপ হয়ে থাকত। শেষ অবধি তা' লক্ষ্য নির্দিষ্ট অর্থবহ সার্থক সঙ্কল্পগর্ভ কবিতা হয়েছে, শেষ স্তবকে স্পষ্ট উচ্চারণে তাঁর জীবনের লক্ষ্য বিঘোষিত হয়েছে বলেই এ কবিতার চমক, নতুনত্ব, আঙ্গিক রূপকল্পের অপ্রত্যাশিত আয়োজন এমন ঝড়োগতি, এমন বজ্রদৃপ্ত কণ্ঠ, এমন উদ্ধত বাণী, ইতোপূর্বে কেউ কোথাও দেখেনি-শোনেনি বলেই এ কাব্যের কথাবস্তু, ভাবসত্য, কবি-ভাষা কেউ খুঁটিয়ে দেখার কৌতূহল বোধ করে না। এক শোভা-সৌন্দর্য-পাবণ্য-ওজ্জ্বল্য হচ্ছে বিচিত্র রঙিন দীপালীর ঝাড়ের মতো।

অথচ অনুপুঙ্খ বিচারে দেখা যাবে 'আমি' বৃহৎ পটে সত্তার সর্বাত্মক রূপ প্রকটের প্রয়াস আর 'বিদ্রোহী' শারীর-জীবনে সাধ্য বিষয়ে আত্মশক্তির ও আত্মগরিমার আস্ফালনে সীমিত। মোহিত লালের চেতনা অপার্থিব অধ্যাত্মসীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। আর নজরুলের চেতনা পার্থিব, ঐহিক ও দৃষ্টিগ্রাহ্য কাম্য জীবনস্বপ্ন কাজেই মোহিত লালের চেতনার পরিধি ভূলোকে দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত। নজরুলের চেতনা ভূমি ও ভোগমুখী। দুটোর মধ্যে উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে কিছু মিল থাকলেও পার্থক্য মৌলিক, লক্ষ্য ভিন্ন, সাফল্যও মেরুকৃত। 'আমি' দর্শন, আর 'বিদ্রোহী' কাব্য। কাজেই দুটোই মৌলিক রচনা। যে-অর্থে 'আমি' অভয়ের কথা দ্বারা অনুপ্রাণিত, সে-অর্থেই কেবল 'বিদ্রোহী' কবির চিত্তলোক পরোক্ষ 'অহং' অনুরণিত। তাই ঘটেছে 'আমি' শোনায় ও বিদ্রোহী রচনায় প্রায় বছর কালের ব্যবধান। অনুকারী এত দীর্ঘকাল একটি রচনার প্রভাবের আবেগ ধরে রাখতে পারে না। এ 'আমি' বিস্মৃতির পরেরকার রচনা। তা ছাড়া পূর্বেই বলেছি ভাব-সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভিন্ন।

নজরুলের কবি-রক্তেই ছিল শক্তির প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি। তাই তাঁর বল-বীর্য কিংবা নেতৃ-বীর বন্দনা বিষয়ক কবিতায় শক্তির ও শক্তিমানের স্তুতিই পেয়েছে প্রকাশ। অতএব শক্তির ও শক্তিমানের প্রতি তাঁর চারিত্রিক আকর্ষণই ছিল অপ্রতিরোধ্য। আর তাঁর হাতে রণতূর্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। রণতো শক্তিরই প্রদর্শনী। আগের যুগে এমনি আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী উচ্চাভিলাষী লোকই গড়ত রাজ্য, হত দিক বিজয়ী। বিদ্রোহী কবিতায় তিন প্রকারের শক্তি প্রতীক রয়েছে, প্রকৃতি, প্রাণ আরোপিত গুণ এবং প্রাণী-দেবতা ও মানুষ।

প্রকৃতি ঃ হিমাদ্রি শিখর, মহাকাশ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, ভূলোক দ্যুলোক গোলোক, খোদার আরশ, মহাপ্রলয়, সাইক্লোন, ধ্বংস, বৈশাখী এলোকেশ ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ববহ্নি, অগ্নিপাথার, ভূমিকম্প, শনি, ধূমকেতু, জ্বালা, চণ্ডী, রণদা, নভ, জটাজলি।

দেবতা, মানুষ, জন্তু ঃ রুদ্র ভগবান, বিশ্ববিধাত্রী, নটরাজ, ভীম, ধূর্জটি, বিশ্ববিধাত্রীর বিদ্রোহী সুত, ভগবান বুক, ইন্দ্রাণীসুত, ব্যোমকেশ, গঙ্গোত্রী, সন্ন্যাসী, সুরসৈনিক, যুবরাজ, বেদুইন, চেঙ্গিস, খেয়ালী বিধি, দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র, শিষ্য, চিরশিশু, চিরকিশোর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোররাক, উচ্চৈশ্রবা, বাসুকী, খড়্গকৃপাণ, জিব্রাইল, দেবশিশু, অর্ফিয়াসের বাঁশরী, শ্যামের হাতের বাঁশরী, হাবিয়া দোজক, স্বর্গ-নরক, বিষ্ণুবক্ষ, যুগলকন্যা, ফণী, জাহান্নাম, মৃন্ময়, জগদীশ্বর-ঈশ্বর, পুরুষোত্তম সত্য, বিস্ময়, অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য, পরশুরামের কুঠার, বলরামের হল।

প্রতীক ঃ অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল, ছন্দ, জীবনানন্দ, হাম্বীর, ছায়ানট, হিন্দোল, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, উন্মাদ, মহামারী, ভীতি, শাসন-ত্রাসন, সংহার, উষ্ণ, প্রাণের পেয়ালা, মদ, হোমশিখা, পৃথ্বীর অভিশাপ, জমদগ্নি, যজ্ঞ, পুরোহিত, অগ্নি, সৃষ্টি, ধ্বংস, লোকালয়, শ্মশান, অবসান, নিশাবসান, কৃষ্ণকণ্ঠ, বজ্র, ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহাহুঙ্কার, পিনাকপাণির ডমরু, ত্রিশুল, ধর্মরাজের দণ্ড, মহাশঙ্খ, প্রণবনাদ, দাবানলদাহ, হাসি-উল্লাস, সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস, মহাভয়, দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস, অরুণ খুনের তরুণ, বিধির দর্পহারী, প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, বারিধির মাহ কল্লোল, উচ্ছ্বল জল ছলছল, চলউর্মির হিন্দোল দোল, কুমারীর বেণী, তন্বীনয়নে বহ্নি, ষোড়শীর হৃদিসরসিজ, উদাসীর উন্মন মন, বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হুতাশীর হা-হুতাশ, গৃহহারার বঞ্চিত ব্যথা, অবমানিতের মরমবেদন, বিষজ্বালা, অভিমানী হিয়ার কাতরতা ব্যথা, কুমারীর চুম্বন-বোর কম্পন, চকিত চাহনি, চপল মেয়ের ভালোবাসা, কঁকন চুড়ির কন-কন, পল্লী বাণার আঁচর-কাঁচলি নিচোর, উত্তরী বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস, পূরবী হাওয়া, গভীর রাগিনী, বেণু বীণে গান, নিদাঘ-তিয়াসা, রৌদ্ররুদ্র রবি, মরুনির্ঝর, শ্যামলিমা ছায়াছবি, উত্থান, পতন, চেতন, বিশ্বতোরণে বৈজয়ন্তী, মানব বিজয় কেতন, বন্যা, মানব-দানব দেবতার ভয়, উত্তাল, তুঙ্গ, ভয়াল, বিবসন, মুক্ত, সত্য, সৈন্য।

এ কবিতা অফুরন্ত অপ্রতিরোধ্য প্রাণের প্রবল আবেগ তাড়িত দিশেহারা এক চঞ্চল তরুণের প্রাণশক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে বেড়ানোর চিত্র। এত শক্তি নিয়ে কি হবে, কি করবে স্থির করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। তাই কখনো সৃষ্টির; কখনো ধ্বংসের কখনো লালনের আবার কখনো দুর্বল মুহূর্তে ভালোবাসার আবেগে অস্থির। প্রথম দিকে আত্ম-পরিচিতি ঘোষণায় এ শক্তি নিষ্ঠুর! কঠোর ধ্বংসমুখী, এবং শক্তির স্বরূপ সন্ধানে আগ্রহী, মধ্যে স্বরূপ-উপলব্ধির উল্লাসে শক্তির বৈচিত্র্য নিরূপণে প্রয়াসী, এবং শেষে শক্তির প্রয়োগে অত্যাচারী দমনের উৎপীড়িতের ক্রন্দন নিবারণের সাফল্যে শান্ত হওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটি বিন্যস্ত বটে, স্তবকগুলো সমমাপেরও নয়, অভিন্ন ভাবসূত্রেও গাঁথা নয়। প্রথম স্তবকে রয়েছে আত্মস্বরূপের ও শক্তির ঘোষণা। দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতে শক্তির আস্ফালন থাকলেও 'আমি নৃত্য পাগল ছন্দ। আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ' বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ছদ্ম-কাঠিন্যের আবরণ ঘুচে যায়–এক কোমলপ্রাণ আনন্দসুন্দর মানুষের সন্ধান মেলে। তৃতীয় স্তবকে তাঁর আত্মোপলব্ধি অনেকটা ঋজু–– 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য'। অর্থাৎ তিনি আসলে কঠোরে কোমলে গড়া মানুষ–বজ্রাদপি কঠোরাণি, কোমলানি কুসুমাদপি।

চতুর্থ স্তবকে আবার নতুন করে গর্জে ওঠেন–রোষকষায়িত অগ্নিচক্ষু উন্মীলিত করে যেন নেপথ্যবাসী কোন প্রতিপক্ষকে ধমক বা হুমকি দিতে থাকেন উপমা-রূপক উৎপ্রেক্ষায় আত্মশক্তির পরিচয় দিয়ে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যুবরাজ/ আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস/ আমি বজ্র/ ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার/ ইত্যাদি।

পঞ্চম স্তবকে তিনি কড়ি থেকে আকস্মিকভাবে কোমলে নেমে শ্রোতাকে চমৎকৃত করে দেন। তিনি তখন গৃহকোণের, আঙিনার পল্লীর পুকুরঘাটের তরুণ পুরুষ, কখনো প্রেমিক, কখনো ব্যথার ব্যথী, কখনো আনন্দিত পুলকিত বন্ধনমুক্ত মনের যুবক ঃ 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'।

ষষ্ঠ স্তবকে পূর্ণ মাত্রার গর্জনমুখর ঘোষণা না থাকলেও, এখানেও বিদ্রোহী আত্ম-প্রত্যয় নিয়েই দৃঢ়কণ্ঠে আত্ম-পরিচয় দিয়ে চলেছেন :

একাধারে 'আমি আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ববহ্নি, কালানল... আমি
অর্ফিয়াসের বাঁশরী.. আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।'

এখানেও বিদ্রোহীর মধুর ও রুদ্র রূপ সমভাবে প্রকটিত।

সপ্তম স্তবকে বিদ্রোহী শক্তি প্রয়োগের স্থির লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। তিনি তাঁর অফুরন্ত দুর্দম আত্মশক্তিকে অত্যাচারীর উচ্ছেদ কর্মে করবেন নিয়োজিত, উৎপীড়ন মুক্ত করবেন নির্যাতিতদের। সমাজও করবেন পরিবর্তিত, প্রথমে ভাঙবেন, পরে গড়বেন ঃ

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন।
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

সবাই জানেন, স্তবকগুলো ভাবের অসঙ্গতিতে, স্ববিরোধে ত্রুটিপূর্ণ। এ যুগের সরকারী অঙ্গীকারের ও বহবাড়ম্বরের মতো, বিদ্রোহীর বহু বিবিধ ও বিচিত্র বাগাড়ম্বর অবশেষে এক মহৎ সঙ্কল্পে ও অঙ্গীকারে সুসমাপ্ত হয়েছে।

AMARBOI.COM

রণহুঙ্কারের সঙ্গে এমনি সঙ্কল্প পরিব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন উদ্দীপক কবিতায়– কামাল পাশায়, আগমনীতে, শাত্-ইল-আরবে, রক্তাম্বর ধারিণী মা-এ, ধূমকেতুতে, প্রলয়োল্লাসে, কোরবানীতে। আলোচ্য বিদ্রোহী কবিতায় ভাবগত ধারাবাহিকতা ব্যাহত হলেও অন্য এক বিবেচনায় কবিতাটি যেমন যুগান্তকর সৃষ্টির অসামান্য স্বাক্ষর, তেমনি কবিও অনন্য ও বিস্ময়কর শক্তির, নৈপুণ্যের আর সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নিতান্ত তরুণ কবি-লেখক জীবনের প্রায় শুরুতেই এক কঠিন স্তবকবদ্ধ বাক-প্রতিমা নির্মাণ কার্যে স্থপতির মতো, ভাস্করের মতো, নিপুণ কুমোরের মতো শব্দচয়নে, বাক্‌বিন্যাসে অলঙ্কার প্রয়োগে, সুষম ধ্বনি সৃষ্টিতে অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর এ শক্তি পাঠক অবচেতনভাবেই অনুভব করে এই একটি কবিতার ভিত্তিতেই তাঁকে 'বিদ্রোহী'র বিদ্রোহী কবি বলে আখ্যাত করেন। ভাবে ভাষায় ছন্দে এমন কবিতা আগে ছিল না। পরেও হয়নি। এ একক ও অনুপম। এক একটা চরণ, এক একটা চিত্রকল্প বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে হীরক খণ্ডের মতো, মুক্তার পাঁতির মতো, স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত রবিরশ্মির মতো দীপ্তি ছড়ায়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে এ কবিতা কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রতিফলিত অরুণ প্রভার মতো মনোহর।

মোহিতলালের 'আমি' চেতনার পরিসরে বিস্তৃত তাত্ত্বিক-আধ্যাত্মিক জগতে ব্যাপ্ত, নজরুলে এ চেতনা ভূ-লগ্ন বাস্তব জীবন-স্বপ্নে সীমিত। মোহিতলালে কথার মারপ্যাঁচ আছে, মননের গভীরতা আছে, কিন্তু রচনার সৌন্দর্য নেই, নজরুলের এ কবিতায় যে মনোহর চমক ও চাকচিক্য আছে, তা আমাদের কাব্যজগতে দুর্লভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিতলালের উপলব্ধি সম্পূর্ণ ও সংশয়মুক্ত নয়। ভাব ও জ্ঞান বিশ্বপরিক্রমার পরেও তাঁর জিজ্ঞাসা থেকেই যায়, যেখান থেকে শুরু লাটিমের মতো ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে সেখানেই রয়ে গেছে–তাই তার শেষ কথা–'কে বলিবে আমি কে? এ সমস্যার সমাধান কে করিবে?'

আর আত্মশক্তির সন্ধান পেয়েই আত্মোপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্তব্য মুহূর্তেই স্থির করে ফেলেছিলেন–'আমি ঢালিব করুণা ধারা/ আমি বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা'। –কবি করুণা বিলিয়ে করুণার বাণী প্রচার করেই তাঁর মনুষ্যজীবন সার্থক করবেন। এ হচ্ছে আমাদের দৈশিক ঐতিহ্যে সাধু-সন্ন্যাসী-শ্রমণ-শ্রাবক-ভিক্ষু-ফকির-দরবেশের লোকসেবা ব্রত–তথা জীবনে সাধ্য মহত্তম ঐহিক-পারত্রিক কর্ম। নজরুলও আত্মোপলব্ধির মুহূর্তে নিজের অমিত শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র বির্ধারণ করেছেন। যেহেতু এ শক্তির উৎস আত্মপ্রত্যয় ও বুকের সাহস, অর্থাৎ এ শক্তি একান্তই ভূ-লগ্ন দেহ-মনের। কাজেই এ শক্তি বীর্যবান পুরুষের। মানবতায় উদ্বুদ্ধ এ বীরপুরুষ তাই মানুষকে জুলুমমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ ব্রতই গ্রহণ করেছেন :

আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ্ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,–

মুক্তকছন্দ রবীন্দ্রনাথের বটে, কিন্তু প্রয়োগে পার্থক্য কত। এ কারণে তা অনুকৃত নয়–আত্মীকৃত। তাই বিষয়ভেদে, ধ্বনিভেদে স্বতন্ত্র–রবীন্দ্রনাথে যা শরতের নদী প্রবাহ, নজরুলে তা ঝড়ো সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গর্জন কিংবা কান্না। অতএব, মোহিতলাল, নরুজল ও রবীন্দ্রনাথের চেতনার ক্ষেত্রে তিন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পুরুষ।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

ঝড়-ঝঞ্ঝা, ধূমকেতু, শক্তি-প্রতীক দেবতা, বীর-বীরত্ব প্রভৃতি যা কিছু, যে কেউ শক্তিমত্ত ভয়ঙ্কর, সে-ই যৌবনে নজরুলের আত্মবোধনের, উল্লাসের অনুপ্রেরণার ও কর্ম প্রণোদনার উৎস। তাঁর প্রলয়োল্লাসে প্রথম যৌবনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে যে চিত্র তা' এই :

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে–
ধূম্র ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর।
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ॥

প্রলয় নেশায় নৃত্যপাগল, ধমক হেনে, আগল ভেঙে, মৃত্যুগহন অন্ধকূপে মহাকালের চণ্ডরূপে, (ধূমকেতুর) ধূম্রধূপে, বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে প্রলয়ের– ধ্বংসের যে ভয়ঙ্কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতা আসছেন, কবি তাঁকে জয়ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাবার জন্যে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর ডর-ভয়, শঙ্কা-ত্রাস কিছুই নেই, বরং তাঁর উল্লাসের সীমা নেই, সেই-সর্ববিধ্বংসী শক্তির আগমন সম্ভাবনায়। কেননা এ শক্তি প্রলয়ঙ্কর হলেও শিবমঙ্গলময়। তাই তিনি জরায় মরায় মুমূর্ষুদের এবং জীবনহারা অসুন্দরের বিনাশ করে নতুন করে সৃষ্টি করবেন– সাজাবেন এ সমাজকে –এ 'প্রলয় নতুন সৃজন-বেদন' মাত্র। কাজেই মাভৈঃ। ওই 'বিদ্রোহী' ও 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতায় স্বশক্তির আস্ফালন করলেও কবি স্বসঙ্কল্পে স্থির থাকেননি–শক্তিমান দেবতার ও বীরের স্তুতি-বন্দনায় ও আবাহনেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন জুলুম-মুক্ত জীবন ও সমাজ গঠনে সহায়ক বা মূলশক্তি ও কর্মীরূপে, কেবল প্রেরণাদায়ক শক্তিরূপে নয়। অগ্নিবীণার অন্তর্গত কবিতাগুলোতে মানুষ দৈবনির্ভর দেবতার অভিপ্রায় চালিত।

'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতায় 'বিদ্রোহী' ও 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার 'ভাবগত রেশ রয়েছে, সাদৃশ্য আছে, আছে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার দূরাগত ধ্বনিও :

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার ভাঙ্গা কল্লোলে!
এবং ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে পিনাকপাণির শূল আসে
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে।

এখানেও প্রলয়োল্লাসের রেশ মেলে :

মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে।

বিদ্রোহীর আদলে এখানেও রূপবতী তরুণের মন টানে। বসন্তে 'মদন মারে খুন-মাখা তূণ' শুধু তা-ই নয়, নারীর দুঃখ-বেদনায় তরুণ কবির 'চোখে জল আসে'। সৃষ্টির ও সংহারের দেবতা রুদ্র-চণ্ড শিব কবির আদর্শ শক্তিপ্রতীক। তাই পিনাক ও শূলপাণি–সগুণ-নির্গুণ শিবই তাঁর শক্তির ও যুক্তির অবলম্বন–চেতনার উদ্দীপক।

কবির দৃঢ় বিশ্বাস পুরোনোক ধ্বংস বা নির্মূল না করলে নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্র মেলে না, তাই তিনি প্রলয়কামী–তাই চণ্ড চণ্ডীর তিনি ভক্ত। শিব-দুর্গার আবাহন তাই জরুরী। এখন থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নও কবির লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তাই 'রক্তাম্বর ধারিণী মা' কবিতায় কিংবা 'আগমনী' কবিতায় তা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অভিব্যক্তি পেয়েছে। সর্বত্রই কবি অনুধ্যান করেছেন দেবতার প্রলয়ঙ্কর শক্তির। রক্ত ঝরানো, আগুন জ্বালানো, বন্যা ছোটানো, ঝঞ্ঝা বহানো, মৃত্যু ঘটানো ও ভগ্ন বানানোই আবশ্যিক মনে করেন নতুন মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ও স্বস্তি-সুখের জন্যে। তাই জ্বালানোয় পোড়ানোয় হননে-বিনাশে তাঁর এত আগ্রহ, এত উল্লাস। তাঁর বিশ্বাস, এ হত্যায়–ধ্বংসে নিষ্ঠুরতা নেই, পাপ নেই। এ আসলে করুণারই অপর রূপ। কেননা স্থায়ী উপকার করবার জন্যেই এ আপাত-নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন। এ যেন চিকিৎসকের অস্ত্রোপচার।

শ্বেত বসন ছেড়ে রক্তাম্বর পরে এ ধ্বংস প্রতীক রূপে আবির্ভূত হয়ে বিনাশের মত্ত উৎসবে মেতে উঠবার জন্যে কবি দেবতাকে আবাহন করছেন। তাঁর সিন্দুর হোক জ্বলন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল চিতা, তাঁর এলোকেশ হোক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ভীম বৈশাখী তুফান, তাঁর খড়্গ-রক্ত হোক স্রষ্টার, বুকে লাল ফিতা, তাঁর চরণাঘাতে বিশ্ব রক্ত-বান উদ্গার করুক, তাঁর কাঁকন হোক শত্রুসূদন বিষ্ণু চক্র, তাঁর গলার হার হোক ফাঁস, তাঁর রোষ-কষায়িত নয়নে ধূমকেতু-জ্বালা প্রতিভাত হোক। তাঁর মেখলা হোক চাবুক, এবং এমনি করে আবার দনুজ-দলনী অশিব-নাগিনী চণ্ডীরূপ ধরে জালিমের বুকের খুন ঝরিয়ে তিনিই 'ধ্বংসের বুকে'...'সৃষ্টির নব পূর্ণিমা' আনতে পারবেন। অতএব, নজরুল নর-বিধ্বংসী রক্তাক্ত বিপ্লবে আস্থাবান।

বিশ্বযুদ্ধের ও রুশ বিপ্লবের পটে কবির মনের মধ্যে সর্বক্ষণ রক্তাক্ত-বিপ্লবের কামনা জাগরূক বলেই 'আগমনী' কবিতায় এবং অন্যত্র কবি দশমহাবিদ্যার দশভুজা দশপ্রহরণ-ধারিণী অসুরদলনী কালীচণ্ডী-দুর্গা-মাতঙ্গী-বগলা-ছিন্নমস্তা প্রভৃতি বহুরূপিণী শক্তির আবির্ভাব কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানেই সেই ভয়ঙ্কর রূপ ও অবস্থা। রণরঙ্গিনী বেশে খোলা তলোয়ার হাতে পৃথিবী রথচক্রের ও সৈন্যের পদভারে প্রকম্পিত করে ঝঞ্ঝার ক্ষোভে-রোষে ও বেগে বুকে-মুখে-চোখে রোষ হুতাশন জ্বেলে তিনি আসছেন—

আর ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দোলে
যম-বরুণ কি কল-কল্লোল চলে উতরোল
ধ্বংসে মাতিয়া, তাথিয়া তাথিয়া
নাচিয়া রঙ্গে। চরণ ভঙ্গে
সৃষ্টি সে টলে টলমল।

এখানেও—রক্ত উদরি আর ফেনা বিষ প্রবাহেও রণরঙ্গিণী মায়ের সেই করুণাময়ী রূপ দেখা যায়। তাঁর আকাশ-জোড়া আয়ত নয়নে করুণা অশ্রু ছলছল করে। তবু নব সৃষ্টির প্রয়োজনে দানব—অসুর দলনরূপ হনন উৎসবে—

ঐ অসুর—পশুর মিথ্যা দৈত্য সেনা—যত
হত আহত করে রে দেবতা সত্য
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল মাতাল রক্ত-সুরায়
ত্রস্তবিধাতা
মত্ত পাগল পিণাক-পাণি স-ত্রিশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরায়
ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত-সুরায়।

ফলে ছোটে রক্ত ফোয়ারা, বয়ে যায় বহ্নির বাণ, এবং চিতার উপরে চিতা সারি।—দেখে কবির শোক নয়,—জেগেছ উল্লাস। কেননা,

মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানবশক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর।

সমাজ-শাসন পরিবর্তনে আগ্রহী কবি এমনি দিবাস্বপ্ন দেখেও উল্লসিত হন দুর্গার আবাহনে। এ সূত্রে 'ভাঙার গান' কাব্যে দুঃশাসনের রক্তপান ও জাগরণী কবিতাও স্মর্তব্য।

রণ-বিপ্লব-রক্ত-ঝড়-ঝঞ্ঝা-প্রলয় তুফান-বন্যা-ধূমকেতু আর শক্তি দেবতা ও শক্তিমান সাহসী পুরুষ নজরুলের কল্পনাকে ১৯৩২-৩৩ সন অবধি সর্বদা উদ্দীপ্ত করেছে। সদ্য কোলকাতায় ফেরত তরুণ কবি বিশ্বযুদ্ধের ও রুশবিপ্লবের কথা নিরাপদ দূরত্বে বসে শুনে শুনে রণ-রক্ত-মৃত্যু সম্বন্ধে একটা বল-বীর্য শক্তি-সাহস বিষয়ক উল্লাসকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোম্যান্টিক ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল–রক্তঝরা সংগ্রাম ব্যতীত ব্রিটিশ বিতাড়ন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে, বরীন্দ্রনাথ সশস্ত্র সংগ্রামে কিংবা কংগ্রেসী আন্দোলনে বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ সিংহ বিতাড়ন অসম্ভব বলেই মানতেন। তাই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃথা বলেই জানতেন। এ কারণে 'সভ্যতার সঙ্কট' নামের তাঁর শেষ লেখায়ও ব্রিটিশ সরকারের ও ব্রিটিশ রাজার ন্যায়বুদ্ধির কাছেই সুশাসনের আবেদন জানিয়েছিলেন।

নজরুল অসুর-সূদন শক্তিদেবতা হর-কালী বা শিব-দুর্গাকে তাঁর সংগ্রামী চেতনার, শক্তির ও সাহসের প্রতীকী অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামী কবিতায় এঁদেরকে বারবার তিনি স্মরণ ও শরণ করেছেন। 'আনন্দময়ীর আগমন' কবিতায় পরাধীনতার জন্যে স্বদেশী হিন্দু-মুসলিমের নিবীর্যতার, কাপুরুষতার, ব্রিটিশ তোষণের, চাটুকারিতার ও সংগ্রামবিমুখতার জন্যে যুগপৎ গ্লানি, ক্ষোভ, রোষ, ঘৃণা ও ধিক্কার প্রকাশ করেছেন। আর ব্রিটিশ বিতাড়নে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার সহায়তা কামনা করেছেন এই বলে :

আজ ভারতে-মর্ত্যে দানব মানব পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া...
পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব জুতো...
নির্বীর্য ভারতবাসীও–মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডাণ্ডা-গুঁতো
উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি।–
ফলে, আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চ্যাচায় শুধু 'দোহাই হুজুর, মলাম মলাম।'
এমনি দুর্দিনে, মাগো তোর এ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি বিনা উপায় নেই।
অতএব, রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?...
হান তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্ত দে মা রক্ত দেখা।

স্মরণীয় 'ধূমকেতুর পথ' নামের সম্পাদকীয়তে নজরুল অবিচল হাতে স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন সর্ব প্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। উল্লেখ্য যে, তখনো ভারতের কংগ্রেস বা কোন রাজনীতিক দলই পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করার মতো সাহস সঞ্চয় কিংবা মনস্থির করেনি। 'বিদ্রোহীর বাণী' নামের কবিতায়ও উক্ত হয়েছে 'পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ' (বিশের বাঁশী কাব্য)। উক্ত রূপেই কবি আত্মসাধনের জন্য এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবর্তনা দানের জন্য নানাভাবে দেবতার-শিব-দুর্গার আবাহন করেছেন।

॥ ৩ ॥

এবার প্রকৃতি কিভাবে কবি-চেতনায় ও কবি-কল্পনায় ঠাঁই করে নিয়েছে, প্রকৃতি কিভাবে তাঁর চিন্তায় কর্মে ও আচরণে প্রণোদনা প্রবর্তনের ভূমিকা পালন করেছে তা-ও দেখা যাবে। ভয়ঙ্কর মহাশক্তির প্রতীক হিসেবে ধূমকেতু ও ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ) কবিতা দুটোই এখানে আমাদের আলোচ্য।

'ধূমকেতু' অমঙ্গলের ও মন্দ শক্তির প্রতীক। বিদ্রোহীর মতোই এ কবিতায় ধূমকেতু স্বয়ং আত্মরক্ষার প্রবক্তা। এবং 'বিদ্রোহী'র মতোই অসম স্তবকে মুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচিত। ধূমকেতুর আত্মপরিচয় এই : 'আমি স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু, আমি মহাবিপ্লব হেতু, আমার ললাটে জ্বলে সাতশ' নরকাগ্নির সমতাপের আগুন, আমি অশিবতিক্ত অভিশাপ, আমি মর্ত্যে মরুপ্রতীক, আমি সর্বনাশের ঝাণ্ডা, শূন্যে ঘুরে বেড়াই। আমি বিষ-ধূমবাণ হানি, আমিই উল্কা-অশনি-বৃষ্টি করি, আমি বিপ্লব আনি, বিদ্রোহ করি, আমি বিশ্বমাতার শোকাগ্নি, আমি গন্ধকধূম, এসিড, পটাস, মোনছাল, আমি প্রলয়শিশ্। আমার' এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে'। কেননা, 'ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা'।

বিধির অভিশাপ স্বরূপ এ ধূমকেতু এক প্রলয়ঙ্কর মহাবিধ্বংসী শক্তি। এর মধ্যে হরের পিনাকের, ইন্দ্রের দম্ভোলির, ত্রিশূলের, বাশুলি বজ্রের, তুফান-ঝঞ্ঝা-সাইক্লোনের শক্তি মিশেছে। এর পুচ্ছে কোটি নাগ-শিশু উদ্গারে বিষফুৎকার। এ ধূমকেতুও প্রলয়-উল্লাসে রয়েছে মেতে। এ নিষ্ঠুর শক্তি ক্ষোভে-রোষে আবেগে বিনাশ কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। রয়ে সয়ে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে প্রতিহিংসার উল্লাস-সুখ উপভোগ করে নির্মম প্রসন্নতায় :

কাল-বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার
তখনি রক্ত শোষে না রে তার,
দৃষ্টি সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্র চণ্ড সুখে
পুচ্ছ সাপটি খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুকে,
তেমনি করিয়া ভগবানে আমি
দৃষ্টি সীমায় রাখি দিনযামী
ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হাসি পিশাচের হাসি
এই অগ্নি-বাঘিনী আমি সে-সর্বনাশী।
আজ রক্ত মাতাল উল্লাসে মাতিরে
মম পুচ্ছে ঠিকরে দশগুণ ভাতি,
রক্ত রুদ্র উল্লাসে মাতিরে।
ভগবান? সে-তো হাতের শিকার! মুখে ফেনা উঠে মরে।

বলেছি, সেখানেই শক্তি, কবির বিমুগ্ধ দৃষ্টি সেখানেই।

মন্দশক্তি প্রতীক ধূমকেতুও আসে ভাগ্যবান মর্ত্য-ভগবানদের বিনাশ করার জন্যেই। কথায় বলে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'। এবং পাপ যে বাপকেও ছাড়ে না, পরিণাম কর্মফল ভোগ করতেই হয়, এমনি একটা ধারণা আভাসিত হয়েছে এ কবিতায়। বিবেক বিরোধী কাজে লিপ্ত শোষক-পীড়ক-শাসক মানুষেই ভয় পায় ধূমকেতুকে বল-বিত্ত-বৃত্তি হারানোর আশঙ্কায়। নিঃস্ব বরং বিত্তবান ও শক্তিমান মানুষের বিপর্যয় স্বস্তি কিংবা মুক্তির আশ্বাস পায়। তাই সবাই নয়, কেবল 'আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁপে ত্রাসে'। এ কবিতায় কবির মনের গভীর কন্দরে স্থিত সুপ্ত প্রতিহিংসা বৃত্তি পরোক্ষে প্রকটিত হয়েছে। শোষক নির্যাতক শক্তির বিপর্যয় ঘটায় বলেই মন্দশক্তি 'ধূমকেতু' কবির আকর্ষণের ও আকাঙ্ক্ষার পাত্র— ধূমকেতুর হাতে কবির, দারিদ্র্যের বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। ফলত ধূমকেতু কেবল মর্ত্যের শক্তিমান ও বিত্তবানদের ভয়ের হেতু। এ জন্যই মন্দ শক্তির ধূমকেতুর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ নয়, বরং মনের গভীরে একটা সমর্থনের ভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। কেননা এ আপাত মন্দশক্তি স্বরূপে সমাজ-সংসারের দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত শোষক পীড়কদেরই কেবল অরি বা ক্ষতিকারক।

তাঁর আর একটি কবিতার নাম 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ)। উল্লেখ্য যে কবি দ্রোহী, বিপ্লবী রণ-রক্ত প্রিয়। ঝঞ্ঝা-তুফান-বন্যা প্রভৃতি যা' কিছু সংহারক সব কিছুই তাঁর প্রিয়, ভয়ঙ্কর-প্রলয়ঙ্করেই তাঁর আসক্তি। এ জন্যেই তাঁর বইয়েরও নাম : অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, ফণীমনসা, প্রলয়শিখা, জুলফিকার, দশমহাবিদ্যা, রুদ্র মঙ্গল; পত্রিকার নাম ধূমকেতু, সন্তানের নাম সব্যসাচী। তাঁর দেবতা সংহারক রুদ্র হর ও চণ্ডী-কালী-দুর্গা-রূপিণী শক্তি, তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়কও তাই সংগ্রামী, বিপ্লবী অথবা সৈনিক। মানুষের মধ্যেও যাঁরা সাহসে, সংগ্রামে, ত্যাগে, চরিত্রে ও আদর্শে অটল কেবল তাঁরাই পেয়েছেন তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি-বন্দনা।

ঝড়ও ভয়ঙ্কর বৈনাশিক শক্তি, তার যেমনি অপ্রতিরোধ্য দুর্দম শক্তি, তেমনি তীব্র - তীক্ষ্ণ দ্রুতগতি। কবির ভাষায় ঝড় 'মায়াবী দৈত্য শিশু, সে ছুটে চলে অনির্দেশ অনর্থ সন্ধানে। আর তার অক্ষৌহিণী সেনা হচ্ছে 'প্রলয় তুফান বন্যা, মড়ক দুর্ভিক্ষ মহামারী সর্বনাশ'। গগনে পবনে ও প্রান্তরে সমুদ্রে-সৈকতে অনন্ত ভক্ষক মহানাগ ঝড় হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ ও তূরীয়গতি নিয়ে প্রলয়-পথিক হয়ে দিকে দিকে মারী-মরু রচে।

কবিতাটি সুদীর্ঘ। প্রথমদিককার তর্জন-গর্জন-আস্ফালন ও আত্মশক্তি পরিচিতি আর পরবর্তী বা প্রান্তিক অংশে পরিব্যক্ত অভিপ্রায় তেমন স্বাভাবিক ও সমঞ্জস নয়। তাছাড়া ঝড়ের একটি সুষম সংহত সামগ্রিক চিত্ররূপও কবির মানসদৃষ্টিতে ছিল না, তাই বিশৃঙ্খলভাবে টুকরো চিত্রাঙ্কনে কবিতার সামষ্টিক অবয়ব যেমন শ্রীহীন হয়েছে, তেমনি ভাবগত রসাভাসও ঘটেছে। উচ্চ-তুচ্ছ প্রায় সর্বত্র অঙ্গে ও অন্তরে একাকার হয়ে গেছে।

আমরা 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও দেখেছি, একজন প্রবল প্রতাপ পুরুষ যখন বজ্রকঠোর কণ্ঠে, আত্মশক্তির কিংবা অঙ্গীকারের কথা বলছে, তখন মুহূর্ত পরে আকস্মিকভাবে এণাক্ষী তন্বী তরুণী হয় তাঁর মনের মুকুরে আবির্ভূতা। তা ছাড়া তাঁর সব ধ্বংসের, সব প্রলয়ের, সব ভয়ঙ্করের, সব হুমকির হামলার আড়ালে, মূলে ও লক্ষ্য থাকে কল্যাণ। তাই কবি বলেই রেখেছেন ঃ 'ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল বৈশাখীর ঝড়/ ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর,–প্রলয় নতুন সৃজন বেদন' মাত্র। ঐ ভাঙাগড়াকে ভেঙে আবার গড়তে জানে সে। চিরসুন্দর তাঁর খেলা এবং কাল-ভয়ঙ্করের বেশেই আসেন সেই চিরসুন্দর কল্যাণের দেবতা।

'ঝড়' কবিতায়ও দৈত্য, শিশু, প্রলয়-তুফান-বন্যা-মড়ক-দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সর্বনাশ, রাহু, হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ অনন্ত ভক্ষক মহানাগ প্রভৃতি মহাবৈনাশিক শক্তি প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও ঝড় স্বরূপে দ্বিরূপী ঃ 'আমি ঝড়, পদতলে আতঙ্ক-কুঞ্জর, হস্তে মোর মাভৈঃ অঙ্কুশ'। এ ঝড় সমুদ্রে তুঙ্গ তরঙ্গ তোলে, জলোচ্ছ্বাস ঘটায়, ঘরবাড়ি তরুলতা ভূমিসাৎ করে, তার পায়ে জুলুমের জিঞ্জীর-মঞ্জীর বাজে বটে, সেবারতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী মা প্রকৃতিকে অসম্মানে উপেক্ষা করেন বটে। কিন্তু সেই মহাপ্রলয়ঙ্কর ঝড়েও থাকে আসক্তির নেশা, সে-ও শোনে প্রিয়ার আহ্বান–'প্রিয়া মোর এলোমেলো গেয়ে গান আগে চলে, ঘূর্ণিবালা হাসির হর্‌রা হানি বলে 'মনোচোর' ও অতএব, 'আমি ঝড়, হুল্লোড়ের সেনাপতি, খেলি মৃত্যু-খেলা ঘূর্ণনীয়া প্রিয়া-সাথে'। এবং 'মম প্রাণ-রঙ্গে মাতি নিখিলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখী-প্রাণ মুহুর্মুহু মাতে।' যদিও বাহ্যত দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব-জ্বলন্ত প্রলাপ ভূমিকম্প জ্বরজ্বর থরথর ধরিত্রীর মুখে, তবু স্বরূপে 'শিবের সুন্দর ধ্রুব আঁখি/ যমের আরক্ত ঘোর মশাল নয়ন দ্বীপ সম রথে। অতএব, বাহ্যত ধ্বংসকামী হলেও স্বরূপে ঝড় মানুষকে শেখায় বিপ্লব, যোগায় সাহস, প্রণোদনা দেয় লড়াইয়ের– ইঙ্গিত দেয় লাল ঘোড়া ছুটানোর ঃ

আমি বলি, ছুটে চল, প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা হাতে, –
হে নবীন পুরুষ
স্কন্ধে তোল উদ্ধত বিদ্রোহ ধ্বজা, কণ্টক-অশঙ্করে নির্ভীক
আমি বলি, বিশ্বগোলা নিয়ে খেল লুফোলুফি খেলা
বীর নিক বিপ্লবের লাল ঘোড়া
ভীরু নিক পারে-ধাওয়া পলায়ন ভেলা।
আমি বলি প্রাণানন্দে পিয়ে নে রে বীর
জীবন-বসনা দিয়া প্রাণ ভরে মৃত্যু-ঘন ক্ষীর।
আমি বলি নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বালাকুণ্ড সূর্যের
হাম্মামে।

আবার সেই আকস্মিকতা, আবার মনের মুকুরে নারীর উদয় ঃ

সহসা কম্পিত কণ্ঠ-ক্রন্দন শুনি কার–
সজল কাজল পক্ষকে সিক্ত-বসনা একা ভিজে
বিরহিণী কপোতিনী-এলোকেশে কালোমেঘে পিজে।
নবোদিভন্ন কুঁড়ি-কদম্বের ঘর যৌবন ব্যথায়
জেগেছে বালার বুকে এক বুক ব্যথা আর কথা।
– ইত্যাদি।

সহসা আবার খাপছাড়াভাবে বলে উঠেন কবি :

ঝড় নাই কোথায়?
বন্ধুরা, বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ
ঐ শোনো, শোনো তার রেষার চিক্কুর
ঐ তার ক্ষুর হানা মেঘে।

এক হিসেবে এ কবিতায় গ্রন্থি শিথিল, ভাব অসংলগ্ন, এবং বক্তব্যও অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত। নজরুলের অপরিশ্রুত, দুর্বল রচনার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে এ কবিতা। ছায়ানট কাব্যের অন্তর্গত 'পুবের হাওয়া' শীর্ষক 'ঝড়' তরঙ্গে রয়েছে আস্ফালন। তবে, তা যদিও গোড়ায় 'আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয় পথিক/ অসহ-যৌবন দাহে লেলিহান শিখা' তবু তা ঘূর্ণী পরীর খপ্পরে পড়ে মধ্যপথে হয়েছে পথভ্রষ্ট ও দুর্বল।

আগেই বলেছি, শক্তি ও শক্তিমানের প্রতি কবির আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। শিব-দুর্গা, ধূমকেতু-ঝড় বন্দনা সেই শক্তিপূজাই– যা প্রথমে পচা পুরাতন ধ্বংস করে নূতন সৃষ্টির ঠাঁই করে দেয়। এ জন্যেই ধ্বংস মাত্রই কবির কাছে সৃজন প্রতীক। এ জন্যেই ভয়াল প্রলয়ঙ্কর শক্তির উন্মেষে প্রকাশে অনুধ্যানে কবির এত উল্লাস, এত আগ্রহ। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ মানুষ ধ্বংসের, নিষ্ঠুরতার, হত্যার পেছনে মঙ্গল চেতনা প্রত্যক্ষ কিংবা কল্পনা করিনে, সেজন্যে ঝঞ্ঝাঝা-খরা বন্যা আগুন-মহামারী-দুর্ভিক্ষ কিংবা রণ-রক্ত-হত্যা প্রভৃতি আমাদের কাছে কেবলই অন্যায়, অমানবিক, অনভিপ্রেত বৈনাশিক ঘটনা, কর্ম ও আচরণ। পুনর্নির্মাণের সামর্থ্যও পরিকল্পনা-বিরহী জীর্ণ ঘরের পতন দৈন্য দুর্দশার লক্ষণ ও ফল বলেই, ঘরের আকস্মিক পতন অনিকেতের শোক-দুঃখের কারণ। কিন্তু নবনির্মাণের জন্যে পুরোনো ঘরভাঙা আনন্দ উৎসবের কাজ। রণ-রক্ত-বিপ্লব সম্বন্ধে নজরুলের ধারণা এই শেষোক্ত শ্রেণীর। 'বাজে সৃষ্টির উল্লাসে ঘন ইসরাফিলের শিঙা'। তাঁর ধারণা পুরোনো নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ না ভাঙলে, শোষক-পীড়কদের রক্তঝরা সংগ্রামে পরাভূত না করলে, ব্রিটিশ বিতাড়নে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু না করলে বাঞ্ছিত রাষ্ট্র, সমাজ, জীবন ও জীবিকা রচনা করা কখনো সম্ভব হবে না। তাই ধ্বংস তাঁর কাম্য। নির্মম নিষ্ঠুরতা তাঁর অভিপ্রেত, দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কর্মার উচ্ছেদ তাঁর বাঞ্ছিত, জুলুমের অবসান কেবল শক্তি প্রয়োগেই সম্ভব বলেই তাঁর ধারণা। এ ধারণা থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটেনি কখনো। ফলে ব্যক্তি মানুষেও যখন তিনি আত্মপ্রত্যয়, সাহস, বাহুবল, আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামী চেতনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তখন তাকেই তিনি স্নেহ-শ্রদ্ধা ভক্তি-বন্দনা করেছেন। এমনি শ্রদ্ধায়-স্নেহে-ভক্তিতে নজরুল ইসলাম একেবারে বিনয়ে বিগলিত হয়ে যেতেন। তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রের কথাগুলোই তার সাক্ষ্য।

অগ্নিবীণার কামাল পাশা, আনোয়ারা, রণভেরী, শাত্-ইল্ আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মোহররম প্রভৃতি কবিতায় এবং বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনসা, জিঞ্জীর, সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু প্রভৃতি কাব্যে ঘন ঘন তরুণদের প্রবুদ্ধ-উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস যেমন আছে, তেমনি আছে দেশবাসীর ভীরুতার, নিষ্ক্রিয়তার, পরাধীনতার গ্লানিবোধ, হীনতার, সংগ্রাম বিমুখতার, ব্রিটিশ তোষণ-নীতির জন্যে ক্ষোভের, রোষের ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রকাশ, তেমনি আছে ব্যক্তির ও বীরের উদ্দেশে স্তুতি ও প্রশস্তি।

কামাল পাশা কবিতায় রয়েছে দুঃসাহসী বিজয়ী বীরবন্দনা। হিংস্র পশুসম জালিম অত্যাচারীর রক্তস্নাত –

আসমানের ঐ আঙরাখা
খুন-খারাবীর রঙমাখা
কি খুবসুরৎ বাঃ রে বা।
দেশ বাঁচাতে আপনারি জান শেষ করেছে
সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হল মরে।
সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হোক না ভাই এ কারবালা ময়দান– তাতে কি।

একালের একটি সংগ্রামী গানের কলিও প্রায় এরূপ :

রক্তেই যদি ফোটে জীবনের ফুল, ফুটুক না।

'আনোয়ার' কবিতায় কবি বলেন,

ব্যথাহত বিদ্রোহী দিল্ নাচে ঝঞ্ঝায়,
খুন-খেকো তল্ওয়ার আজ শুধু রণ চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রণভেরী' কবিতায়ও একই প্রকার প্রণোদনা দিয়েছেন কবি :

তোর জান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়।

'শাত্-ইল্ আরব' কবির কাছে প্রিয়, পূত ও স্মরণীয়। কারণ এখানেই

শহীদের লোহু দিলীরের খুন ঢেলেছে আরব বীর

এবং শমশের হাতে আঁসু আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর।

'খেয়াপারের তরণী'তে কবি 'বিষাণে বজ্রের গর্জনে প্রলয়ের আহ্বান' শুনে এবং 'মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ' দেখে উদ্দীপিত। কেননা তিনি জানেন এ সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী লোকদের তরী নির্ভীক চিত্তে প্রলয়ের নৃত্যে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র অনায়াসে অতিক্রম করবে। 'কোরবানী'তেও সেই একই আহ্বান :

আজ শোর ওঠে জোর, 'খুন দে, জান দে, শির দে বৎস' শোন
এতো, ওরে হত্যা নয় আজ সত্য-গ্রহ শক্তির উদ্বোধন।
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ।

'মোহররমে' ও সেই হাঁক :

শির দেগা, নেহি দেগা আমামা।

যদি কলিজা কাবাবসম ভুনে মরু রোদ্দুর। শমসের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।

AMARBOI.COM

মুসলিম ঐতিহ্য সম্পৃক্ত কবিতাগুলো আরব-ইরানী আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে আরবী ফারসী শব্দবহুল করা হয়েছে। 'বিষের বাঁশী'—এ কাব্য নামটিও লক্ষ্য করার মতো, বিষ মাত্রই জীবন বিধ্বংসী, এ আমাদের আপাত ধারণায়। কিন্তু বিষ প্রতিষেধকও। বিষেই হয় বিষক্ষয়। কেয়ামত বা সৃষ্টির বিনাশ-বিলোপ ঘোষণা করবেন ইসরাফিল, তাঁর 'শিঙা' বা বাঁশী ফুকলেই হবে কেয়ামত। এ হচ্ছে সেমেটিক ও মুসলিম বিশ্বাস। কবি কিন্তু সেই ফেরেস্তা ইসরাফিলের শিঙাতেও বিনাশের পরে সৃষ্টির ঘোষণাও বাজে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, তাই বলেন : 'বাজে নব-সৃষ্টির উল্লাসে ঘন ইসরাফিলের শিঙা' (ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম)। প্রলয় বিষাণেও রয়েছে সৃষ্টির শক্তি। ধ্বংস যে করে সৃষ্টি করার শক্তিও সে রাখে, বিশেষত কবি যে-কোন ধ্বংস প্রতীক ভয়ঙ্করে অন্তর্নিহিত কল্যাণ-উদ্দেশ্য অনুভব করেন। এ বিষয়ে তাঁর আস্থা এত প্রবল যে তিনি বৈনাশিক শক্তির ও বিনাশের আড়ালে নব স্রষ্টাকে ও সব সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করেন। নতুন সৃষ্টির জন্যেই ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী এসে পুরোনো জীর্ণ-জড়-পচা-গলা সৃষ্টি অপসারিত করে নব সৃষ্টির জন্যে ঠাঁই করে দেয়, তরুলতার পুরোনো জীর্ণ পাতা ঝরে যেমন তরুলতার বৃদ্ধির ও নব পল্লবের জন্য জীবন নিশ্চিত করে তোলে, মনুষ্য ইতিহাসেও কবি ওই একই নিয়মের আবর্তন প্রত্যক্ষ করেন এবং এ নিয়মের যাথার্থ্যে দৃঢ় আস্থা রাখেন। সৃষ্টির ও পালন-পোষণের দেবতা হর-গৌরী যুগপৎ অসুর-সূদনও। এ পুরাণতত্ত্বই নজরুল ইসলামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তার বিশ্বাসের ও আশ্বাসের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় তত্ত্বের উৎস হরগৌরী বা শিবদুর্গাই। এভাবেই কবির দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, সৃষ্টির ও সংহারের শক্তির উৎস ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। অর্থাৎ এক কল্যাণ-শক্তি বা মঙ্গলময় শক্তি শুভ সুন্দর নব সৃষ্টির জন্যে পাপ ও পঙ্কিল দোষ-দুষ্ট জীর্ণ সৃষ্টিকে বিলোপ করে। গীতার সেই বাণী কবির প্রত্যয় দৃঢ় করেছে 'যদা যদা ধর্মস্য গ্লানি— বিনাশায় দুষ্কৃতাম সম্ভাবামি যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগে'। সেমেটিক ঐতিহ্য কিংবদন্তী চালু রয়েছে যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির পূর্বে আরো নানা জাতের উপাসক সৃষ্টি করেছিলেন কয়েক বার, কিন্তু তারা ঈশ্বরের আনুগত্য পরিহার করে নানা দুষ্কর্মে আসক্ত হওয়ায় ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করে নতুন উপাসক মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই নজরুল ইসলামের এমনি ধারণা গড়ে ওঠার ও লালনের পেছনে শাস্ত্রীয় ভিত্তিও ছিল। তাই তাঁর চোখে ধ্বংস রণ-রক্ত প্রাণনাশ প্রভৃতি 'সৃজন-বেদন' মাত্র। এ মনোভাবের প্রভাবই রণ-রক্ত-দৃশ্য কবি নজরুলকে উল্লাসিত করে। 'জাগৃহি' কবিতায় এমনি প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস উল্লাসেরই অভিব্যক্তির চিত্র মেলে :

হর হর হর শঙ্কর হর হর ব্যোম–
একি ঘন রণ-বোল ছায় চরাচর ব্যোম
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক
ঘন প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব হাঁক
ধুধু দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ-যাগ
হানে কাল্-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল নাগ।
আজ ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল
ঐ ভাঙলো আগল ওরে ভাঙলো আগল।...
দোলে হিন্দোলে ভীম্-তালে সৃষ্টি ধাতার
বুকে বিশ্বপাতার বহে রক্ত-পাথার।
ঘোর নির্ঘোষে 'মার মার' দৈত্য, অসুর
প্রেত রক্ত-পিশাচ, রণ দুর্মদ সুর।...
কাল বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি
রণ-উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি।
উর 'পরে হার দোলে নরমুণ্ড মালা
করে খড়্গ ভয়াল, আঁখে বহ্নি জ্বালা।
নিয়া রক্ত পানের কি অগস্ত্যতৃষা
নাচে ছিন্ন সে মস্তামা নাইক দিশা।
দে রে রক্ত দে, রক্ত দে, রণে ক্রন্দন....
শুধু অগ্নিশিখা, ধুধু অগ্নিশিখা...
শুধু রক্ত-পাথার, শুধু রক্ত ফেনা।

'সেবক' কবিতায় কবি আহ্বান জানিয়েছেন সে-সব বীরদের :

শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।

সূর্য নিনাদ, উদ্বোধন, অভয়-মন্ত্র, আত্মশক্তি, মরণ-বরণ, বন্দী বন্দনা, বন্দনাগান, মুক্তি সেবকের গান প্রভৃতি বিষের বাঁশীর সব কবিতায় তরুণদের প্রবুদ্ধ করার–অনুপ্রাণিত করার দৃপ্ত প্রয়াস রয়েছে :

তুই নির্ভর কর আপনার "পর
আপন পতাকা কান্ধে তুলে ধর।
বল্ 'আমি আছি' আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জয়
বল্ নাহি ভয় নাহি ভয়, বল মাভৈঃ মাভৈঃ। (অভয়মন্ত্র)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিষের বাঁশী' কাব্যে 'মুক্তপিঞ্জর' কবিতাটিই কেবল অন্তর্মুখী আত্ম-দর্শনমূলক আপাত সদৃশ কিন্তু ভিন্ন সুরের কবিতা :

কোন্ চপলার কেশ-জাল
কখন জড়াতে ছিল গতি-মত্ত আমার চরণে
লৌহ-বেড়ী যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কন
বন্ধনে।
শত্রুপুরী মুক্ত আমি আপন পাষাণ পুরে আজি বন্দী ভাই।

'ভাঙার গান' কাব্যের 'কারার ঐ লৌহ কপাট' আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এ কবিতার বা গানের ভাব-ভাষা-সুর ও আবেদন বাঙলাভাষী মাত্রেরই বুকে গ্রথিত রয়েছে অবিমোচ্যভাবে। মিলনগান, ঝোড়ো গান, মোহান্তের মোহ অন্তের গান, ল্যাবেণ্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত, সুপার বন্দনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা, কিন্তু এগুলোতে হুল ও শূল দু-ই-বর্তমান।

আর পূর্ণচন্দ্র দাস সম্বন্ধীয় 'পূর্ণ অভিনন্দন' কিংবা 'দুঃশাসনের রক্তপান' অথবা 'শাহিদী ঈদ' কবিতার আবেদনও তুচ্ছ নয়। সাম্যবাদী ও সর্বহারা কাব্য দুটোতো বটেই, ফণীমনসারও সবটা বীর রসের রুদ্র-আহ্বানের কাব্য নয়। আর পরবর্তী পর্যায়ে রচিত সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা ও চন্দ্রবিন্দু কাব্যে চিত্তের সে দুরন্ত দুর্দম আবেগ নেই, কণ্ঠের নেই জোর, বাণীরও তেমন দৃপ্তি ও দীপ্তি নেই, বয়োধর্মের কিংবা কবির শারীর স্বাস্থ্যের প্রভাবে আদর্শে-উদ্দেশ্যে এবং বক্তব্যেও অনুবৃত্তি থাকলেও সেই যৌবনের আবেগ, কণ্ঠের সেই গর্জনকল্প-উচ্চারণ, আত্মপ্রত্যয়ীর সে আস্ফালন অলঙ্কারের চমক, ভঙ্গির দৃপ্তি, বাণীর দীপ্তি—যেন হারিয়ে গেছে।

এ স্তরে কবি নজরুল ইসলাম আর কেবল স্বাধীনতাকামী নন, নিঃস্ব নিরন্ন গণমানবের আর্থ-সামাজিক মুক্তিই মুখ্য এবং তাদের আশু-মুক্তির জন্যেই সে সংগ্রাম আবশ্যিক তা' উপলব্ধি করেন। যদিও পরাধীনতার গ্লানি তিনি কখনো বিস্মৃত হননি, পরিহার করেননি স্বাধীনতার সংগ্রাম। ফলে সাম্যবাদী ও সর্বহারা গণমানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির জন্যে রচিত আন্দোলনমূলক কবিতার সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থনাম-ই এর সাক্ষ্য। এ সময়ের পত্রিকা 'লাঙলও' ছিল তাই শ্রমিক প্রজা স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১লা পৌষ ১৩৩২ সন মুতাবেক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ সনে। সে সংখ্যাতে পত্রিকাপ্রকাশগোষ্ঠীর বা দলের উদ্দেশ্য ও দাবি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছিল :

"নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ্য লাভই এ দলের উদ্দেশ্য।

আধুনিক কল-কারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস,—লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তি রূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরমস্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন বিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের উপর বর্তিবে— এ পল্লীতন্ত্র ভদ্র-শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা জানি, কবি নজরুল ইসলাম কখনো কোন স্থির রাজনীতিক আদর্শে নিষ্ঠ ছিলেন না। তত্ত্বগত সাম্যবাদ কিংবা সমাজবাদ তিনি জানতেন না, বুঝতেনও না, তবে বাস্তবে সমাজতন্ত্র তাঁরও ছিল অভিপ্রেত, যদিও অন্যত্র বলেছি,–বুর্জোয়া ভোগে-উপভোগে ছিল তাঁর আসক্তি, আর ইসলামে ছিল বিশ্বাস। পুরোনো ভূতে-ভগবানে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, শাস্ত্রে-সমাজে আস্থাও ছিল বিপন্ন ব্যক্তি নজরুলে অটুট। কাজেই সঙ্গগুণে শোনা রাজনীতিক মত-পথেরই ছিলেন তিনি অনিয়মিত অনুসারী। এ জন্যে সাম্যবাদীর কিংবা সর্বহারার কবিতাগুলোতে কম্যুনিস্টচরিত্র নেই, আছে ভূতে ভগবানে বিশ্বাসী মানব ও মানবতাবাদী আস্তিকের আবেদন-আকুতি।

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান–
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার। –

তাই এ হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোন মন্দির কাবা নেই।

ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য প্রভৃতি উদার মানবতাবাদী হিউম্যানিস্টের লেখা– কম্যুনিস্টের নয়। কেবল কুলি মজুর কবিতার :

'আসিতেছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।'–

কথা কয়টিই কবিমুখে বিপ্লবীর মতো উচচারিত। এমনি কবিতা হচ্ছে 'সর্বহারা' কাব্যের কৃষাণের গান :

আজ চারিদিক হতে ধনিক বণিক শোষণ কারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইক আমার হাত
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল।
তাই এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।

'শ্রমিকের গানে'-ও এই একই সংকল্প অভিব্যক্ত :

এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দলবিরে আয় মজুর দল।
এই বারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে।

ধীবরের গানে–

এবার দৈত্য দানব ধরব রে ভাই–
– কাটব অসুর এলে।

'ফরিয়াদ' কবিতায়–

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা শঙ্কা নাহিক আর
'মরিয়া'-র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার মার'

কবির শেষ কথা – শেষ সংকল্প :

রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রার্থনা করো– যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।
(আমার কৈফিয়ৎ)

'ফণীমনসা' কাব্যেও উত্তেজনা-উদ্দীপনা-প্রবর্তনমূলক কয়েকটি কবিতা রয়েছে, যদিও কবির কণ্ঠে আগের জোর, বুকে আগের মতো আবেগ এবং প্রাণের আকুতিও আগের মতো গভীর নয়। 'সব্যসাচী' কবিতায় কবি আশ্বস্ত রাখতে চেয়েছেন :

নব-যৌবন-জল তরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী–
কংস-কারায় কংস-হন্তী জন্মিছে অনাগত।–
নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফন্ত্র ুনী।

'প্রবর্তকের ঘুর চাকায়'-ও সে-প্রবোধবাণী :

আয়, তরুণ আয়/ অরুণ/ আয় দারুণ দৈন্যতায়
ভয় কি আয়/ ঐ যা অভয়-হাত দেখায়
রামধনুর লাল শাঁখায়।

'মুক্তিকামে' রয়েছে আহ্বান :

স্বাগত বঙ্গে বঙ্গে মুক্তিকাম।
সুপ্তবঙ্গ জাগুক আবার সুপ্ত স্বাধীন সংগ্রাম।
শোনাও সাগর-জাগর সিন্ধু-ভৈরবী গান ভয়-হরণ।

বিদায় মাভৈঃ বাঙলায় মহাত্মা, হেমপ্রভা, অশ্বিনীকুমার, জাগর তূর্য, যুগের আলো প্রভৃতি একই ধরনের কবিতা। আর 'পথের দিশা', 'যা শত্রু পরে পরে' ও 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতা ঐক্যকামী কবির চির-অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্বাক্ষর বহন করছে।

জিঞ্জীর-কাব্যের 'অগ্রপথিক' কবিতায় জনসেবী সংগ্রামী তরুণের ও তারুণ্যের বন্দনা রয়েছে, উদাত্ত আহ্বানে উদ্দীপিত করেছেন তরুণদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে :

তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল
করুণা নয়– ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল!
নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিনী শস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর।

'সন্ধ্যা', 'প্রলয়শিখা' ও 'চন্দ্রবিন্দু' কাব্যত্রয়ের কোন কোন কবিতায় সংগ্রামের আহ্বান রয়েছে বটে, কিন্তু সে-আহ্বানে আস্থার মাত্রা যেন কম, বরং যেন নৈরাশ্যের শ্রান্তি, এবং ব্যর্থতার গ্লানির আভাস রয়েছে কোন কোন কবিতায়। এ জন্যে এগুলোতে যেন কণ্ঠক্ষীণ, বক্তব্য ঔজ্জ্বল্য বিরহী, গতানুগতিক। মনে হয় যেন চির অভ্যাস বশে উত্তেজনার, উদ্দীপনার, অনুপ্রেরণার বাণী উচ্চারণ করছেন। অর্থাৎ আগের মতো উগ্র-তীব্র-তীক্ষ্ণ 'ওয়ার ক্রাই' বা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব নেই। সন্ধ্যা কাব্যের সন্ধ্যা, তরুণ, তাপস, আমি গাই তারি গান, কাল বৈশাখী, জাগরণ, তরুণের গান প্রভৃতি কবিতায় প্রাণের উষ্ণতা যেন নেই। তবু চল চল চল বা যৌবন-জল-তরঙ্গ কবিতা দুটোতে আকস্মিক প্রাণ-তরঙ্গ অনুভব করে পাঠক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব যৌবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল। (চল্‌চল্‌চল্‌)

এই যৌবন-জল তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ?...
যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন–
মানে কি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান
সম্ভ্রম-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।

'প্রলয় শিখা' কাব্যেও রয়েছে কবির পূর্বেকার সংগ্রামী চেতনার লেশ ও রেশ। সংঘর্ষ-সংঘাত-সংগ্রাম-বিপ্লব-সম্ভাবনা মুখর দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে কবি নতুন করে বিপ্লবীর, সংগ্রামীর আশু-সাফল্য সম্বন্ধে আশাবাদী হয়ে নিজের মধ্যে উত্তেজনা ও উল্লাসবোধ করছেন :

বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয় নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটনাথ কাল-ভৈরবীর তাথৈ থৈ
সে নৃত্য বেগে ললাটে অগ্নিপ্রলয় শিখ
ছড়ায়ে পড়িল হের রে আজিকে দিগ্বিদিক।
সহস্র-ফণা বাসুকীর সম বহ্নি সে
শ্বসিয়া ফিরিছে জরজর ধরা সে বিষে।
নবীন রুদ্র আমাদের তনু-মনে জাগে
সে প্রলয়-শিখা রক্ত উদয়ারুণ রাগে।
মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেব অভিশাপ দৈত্যত্রাস
দশদিক জুড়ি জ্বলিয়া উঠেছে প্রলয়-বহ্নি সর্বনাশ।
উর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের বহ্নি শিখা অনির্বাণ,
জতুগৃহদাহ-অন্তে কবির জ্যোতির স্বর্গে মহাপ্রয়াণ।

(প্রলয়শিখা)

এমনি কবিতা হচ্ছে নব ভারতের হলদিঘাটও। যতীন দাস এবং কিয়ৎ পরিমাণে 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র', 'হবে জয়' কবিতায় হতাশকে আশ্বস্ত ও উদ্দীপিত করার প্রয়াস রয়েছে :

তড়িত-প্রদীপ জ্বালাইয়া আসে তোমরা বরষা ধারা
তোমাদের জলে সব ধুলোমাটি নিমেষে হইবে হারা।
তাজা জীবন্ত যৌবন-অভিযান-সেনা মোরা আছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকম্পের সাগরের মত সুখে প্রাণ উঠে নাচি।..
মোরা যুবা দল, সকল আগল ভাঙিতে চলেছি ছুটি।
(হবে জয়)

অনুরূপ ভাবের জাগরণ গীতি হচ্ছে 'বিংশ শতাব্দী ও রক্ত-তিলক'। কবি আশাবাদী:

দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ,
বিশ হাতে করে লুণ্ঠন তবু ভরে নাক ও ওর ক্ষুধিত বুক।
হয়ত গোকুলে বাড়িছে সে আজ, উহারে কল্য বধিবে যে।

'নতুন চাঁদ' কাব্যের 'ওঠ রে চাষী' কবিতাও এখানে স্মর্তব্য।

সে কবিতায় শোষণের তালিকা রয়েছে :

তোর হাঁড়ির ভাতে দিন রাত দস্যু দেয় হাত
তোর রক্ত চুষে হল বণিক,
হল ধনীর জাত।

'বহ্নিশিখা' কবিতায় একাধারে বাঞ্ছা প্রার্থনা আর শক্তি-আবাহন উদাত্ত কণ্ঠে হয়েছে উচ্চারিত :

মেলি শতদিকে শত লেলিহান রসনা
জাগো বহ্নি-শিখা স্বাহা দিগ্‌বসনা।
জাগো রুদ্রের ললাটের রক্ত-অনল,
জাগো উদয়-প্রান্তের ঊষা রক্ত শিখা–
জাগো ক্রোধাগ্নি অবমানিতের বক্ষে–
জাগো শোকাগ্নি নিরশ্রু রাঙা চক্ষে।
জাগো অগ্নি-সিন্ধু-মথন হলাহল।

'চন্দ্রবিন্দু' গানের সংকলন গ্রন্থ বটে, তবে কয়েকটি গানে শক্তির আবাহন এবং সংগ্রামের আগ্রহ ও আহ্বান রয়েছে। সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য রচনা নয়। আর কমিক গানের আচরণে নিহিত বিদ্রূপের হুল ও ক্ষোভের অদৃশ্য ধারা। এই কমিক-কবিতাতেই তাঁর রাজনীতিক হতাশার, ক্ষোভের, রোষের ও বিরক্তির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি রয়েছে। শাসিত স্বদেশী নেতার ও শাসক ব্রিটিশের ছদ্ম হিতৈষণা, শাস্ত্রীর, সমাজসর্দারের, রাজনীতিক-নেতার চিন্তায়-চরিত্রে কর্মে-আচরণে যে অসঙ্গতি প্রকট, তা-ই নিরুপায় নিরস্ত্র নির্বল কবিকে বিদ্রূপের কষাঘাত হানার পথ গ্রহণে প্ররোচিত করেছে। তৌবা, শ্রীচরণ ভরসা, প্যাক্ট, সর্দাবিল, লীগ অব-নেশনস্, ডোমিনিয়ন স্টেটাস, দে গরুর গা ধুইয়ে, সাহেব ও মোসাহেব, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, প্রাথমিক বিল প্রভৃতি সমকালীন সাড়া জাগানো, বিক্ষোভ জাগানো ও বিরক্তি বাড়ানো সব রাজনীতিক ও সামাজিক ঘটনা ও আচরণ নিয়ে লেখা কবিতা ও গান।

তেল নিঃশেষ হওয়ার মুখে প্রদীপের শিখা নাকি একবার প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে, কবি নজরুল ইসলামেও হৃত-চেতনার প্রবল পুনরাবির্ভাব লক্ষ করি 'নতুন চাঁদ' কাব্যের কিছু কবিতার মধ্যে। এখানেও নৌজোয়ানকে, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মত-পথের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুন সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্মকলহ ক্লেদ
রবে না লোভ রবে না ক্ষোভ অহঙ্কার
প্রলয় পয়োধি এক নায়ে হইব পার। (নতুন চাঁদ)
কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে
হে পরম সুন্দরের পূজারী। হবে তাহা বিনাশিতে।
(অভয় সুন্দর)
জাগো দুর্মদ যৌবন। এসো তুফান যেমন আসে
সুমুখে যা যাবে দলে চলে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি....
বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণ খোলা হাসি।
(দুর্বার যৌবন)
তোর রক্ত শুষে হল বণিক, হল ধনীর জাত–
তোর পাঁজরার ঐ হাড় হবে তাই যুদ্ধের তলোয়ার।
(ওঠ রে চাষী)
যৌবনের রাগ-রক্ত লেলিহান শিখা
জ্বলিয়া উঠিবে কবে ভারতে আবার। (শিখা)

'শেষ সওগাত' নামে সংকলিত কবিতা সংগ্রহেও রয়েছে গণমুক্তি বা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রবর্তনাদায়ক কবিতা। আসলে নতুন চাঁদ থেকে শেষ সওগাত অবধি রচিত কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম অতি মাত্রায় আল্লাহ-নির্ভর এবং লক্ষ্য তাঁর মুখ্যত মুসলিম সমাজ। আল্লাহর ও ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলিমদের শোষণ-পীড়ন প্রতারণামুক্ত সমাজ ও চরিত্র গঠনের জন্য প্রার্থনা ও আবেদন জানিয়েছেন তিনি আল্লাহর ও মানুষের কাছে। 'নতুন চাঁদ' কাব্যের মোবারকবাদ, কৃষকের ঈদ, আজাদ, ঈদের চাঁদ এবং 'জিঞ্জীর' কাব্য ছাড়াও শেষ সওগাতের 'ভয় করিও না হে মানবাত্মা, এ কি আল্লাহর কৃপা নয়, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' গোঁড়ামি ধর্ম নয়, নিত্য প্রবল হও, আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও প্রভৃতি মুসলিমদের উদ্দেশ্যেই লেখা।

জাগো সৈনিক আত্মা! জাগো রে দুর্মদ যৌবন!
আকাশ পৃথিবী আলোড়ি ভয়াল-প্রভঞ্জন।
রক্ত বসনা বিস্ফারি আসে করাল ভয়ঙ্কর।
পরাধীন শৃঙ্খল-কবলিত পতিত এ ভারতের
এসো যৌবন রণ-রস-ঘন হাতে লয়ে শম্‌শের।
(জাগো সৈনিক আত্মা)

কাজী নজরুল ইসলাম একবার আত্মপক্ষ সমর্থনে 'আমার কৈফিয়ৎ' নামের প্রখ্যাত কবিতাটি লিখেছিলেন। আবার একই কৈফিয়ৎ শুনতে পাই শেষ সওগাতের 'কোন আপনার হানি হেলা' কবিতায়। তিনি জবাব দিয়েছেন তাঁর লেখা সম্বন্ধীয় অনুযোগের:

কোন্ অকারণ অভিমানে আপনারে হানো অবহেলা?
আপন সৃষ্টি করিছ যে নাশ সেদিকে তোমার দৃষ্টি নাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেও সেই একই জবাব :

এই ক্ষুধিত ভিক্ষুকের আজীবন পদ-সেবা করি
প্রায়শ্চিত্ত মোর ভোগের পূর্ণ করিয়া যেন মরি।

শেষ সওগাতেও 'মোহররম' নামে একটি কবিতা রয়েছে। এখানে স্বধর্মীর সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ, সংঘাত-সংঘর্ষ প্রভৃতির জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। এখানেও 'কোরবানীর'র মতো 'বক্‌রীদ' নামের কবিতা রয়েছে, এখানেও আছে ত্যাগের তাৎপর্য নির্ভর নসিহত।

এ-সব কবিতা ছাড়াও তাঁর সমকালীন যে-সব ব্যক্তির মধ্যে সংগ্রামী চেতনা, আদর্শ নিষ্ঠা, চারিত্রিক দার্ঢ্য, সাহস ও শক্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কবিতা লিখে কিংবা বই উৎসর্গ করে তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, বেগম এম. রহমান, মুজফফর আহমদ, কুতুবউদ্দীন আহমদ, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের নামে তিনি কবিতা বা বই উৎসর্গ করেছেন। যদিও এঁদের মত অভিন্ন নয়। তাঁর কবি-স্বভাবে এমনি করে চিরকাল শক্তি ও শক্তিমান পূজার আসক্তি ও আগ্রহ জড়িয়ে ছিল।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে, শোষণ-পীড়নমুক্ত সমাজ গড়ার জন্যে যে সংগ্রাম ও বিপ্লব প্রয়োজন, তাঁর পুঁজিও হচ্ছে শক্তি। সে শক্তির উৎস ও প্রতীকরূপে কবি জেনেছেন তিনটে শক্তিকে। একটি দৈবশক্তি অসুর-সূদন রুদ্র শিবকে, দনুজমর্দিনী দশরূপা গৌরী-কালী-দুর্গা নাম্নী শক্তি দেবতাকে। আর প্রকৃতি রাজ্যে ঝড়-খরা বন্যা মারী-ধূমকেতু ও অগ্নিকে এবং সংকল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ সাহসী সংগ্রামী, সচ্চরিত্র মাটি-মানুষ প্রেমী ও সেবী মানুষকে বিশেষ করে তরুণদেরকে।

কবি বাহুবল, মনোবল ও সশস্ত্র লড়াইকেই অভীষ্ট সিদ্ধির ও সাফল্যের উপায় বলে জেনেছেন ও মেনেছেন। সেদিক দিয়ে কবির চিন্তা চেতনা নিতান্ত স্থূল মাত্রার ও একান্ত শারীর মানের এবং নেহাত সংকীর্ণ সড়কেই প্রবহমান। তাই প্রথম থেকে শেষ কবিতা অবধি কবি পরিবেশিত উত্তেজক ও উদ্দীপক বাণীর আবেদন শ্রোতা-পাঠকের বুকের আবেগ-উচ্ছ্বাসই সাময়িকভাবে তরঙ্গায়িত করে–চিত্তের গভীরে প্রোথিত হয় না। এ আবেদনে, এ উচ্চারিত রণহুঙ্কারে, এ প্রণোদনাবাক্যে বুদ্ধিবৃত্তির কিংবা মানবজাত পথ-পদ্ধতির কোন সংলগ্নতা নেই। অর্থাৎ কবি গায়ের জোর ও আবেগ প্রসূত আস্ফালন সম্বল আন্দোলনে ও সংগ্রামে আস্থা রাখেন, নীতি নিয়ম-কৌশলের কিংবা পথ-পদ্ধতির সূক্ষ্মতার কোন গুরুত্ব চিন্তাও করেন না। তাই তিনি কখনো সন্ত্রাসবাদী, কখনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সমর্থক, কখনো সমাজবাদী, কখনো সাম্যকামী, কখনো বা গণতান্ত্রিক আবার কখনো বা বীর বা নায়কপন্থী; কিন্তু সব সময়েই আস্তিক ও দৈবানুগত। রবীন্দ্রনাথেরও বীরবন্দনামূলক, মাটি-মানুষ প্রেমী ও সেবী তরুণদের প্রতি আহ্বানজ্ঞাপক, শক্তি আবাহনমুখী কিছু কবিতা রয়েছে বলাকায় ও অন্যত্র। এরূপ উদ্দীপক উত্তেজক কবিতা সংখ্যায় কম এবং অনুচ্চ অথচ দৃঢ় ও দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত তাঁর প্রণোদনা বাণীর আবেদন ছিল শ্রোতা-পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির, নৈতিক-চেতনার ও বিবেকের কাছে; ভাষা ছিল মেঘমন্দ্রের মতো, বাক্যগুলো তীব্রগতি তীক্ষ্ণ তীরের মতো মর্মভেদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের বাণী গর্জনমুখর এবং বজ্র-বিদ্যুতের মতো চমকে চমৎকার। তাই উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠককে মুগ্ধ করে, অভিভূতির আবেগ আনে, কিন্তু যুক্তির ও মননের জোর নেই বলে তাঁর কবিতা পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট ও একঘেয়ে। তাছাড়া অসম্বৃত্ত লঘু-গুরুভারের অনিয়ন্ত্রিত সমাবেশে আবেগের মাত্রা ও মান বাণীর সুষম বিন্যাস ও অর্থসঙ্গতি বারবার প্রায় সব কবিতাতেই ব্যাহত হয়েছে। একই বিষয়ে প্রকৃতিকে, দেবতাকে ও মানুষকে রূপকল্প হিসেবে গ্রহণ করে রণ-রক্ত হত্যা বিন্যাসে উল্লাস প্রকাশ করে এক জীবনের স্বল্প পরিসরে ডজন ডজন কবিতা লেখা পাঠক-শ্রোতার রুচির ও ধৈর্য্যের উপর এক প্রকারের জুলুম মাত্র।

আমরা জানি, একজন কবির কেবল সংবেদনশীল হলেই চলে না, তাঁর অনুভবের সত্যতা, গভীরতা বিচিত্রতা ও ব্যাপকতা থাকাও আবশ্যিক। তেমনি মনের ও মনীষার এবং বিদ্যা-বুদ্ধির ও বিশ্বাসের আর বিবেকের ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ও সমর্থন থাকা চাই উচ্চারিত বাকপ্রতিমায়। বাণী হবে মুক্তাগর্ভ ঝিনুক, হবে ভাবগর্ভ বাক্-ব্রহ্ম। আদর্শ গভীর ও সর্বজনীনে অনুভূতি-ঋদ্ধ সুন্দর কবিতা লোকগ্রাহ্য হয়ে শাস্ত্রের মর্যাদা পায়। প্রমাণ বাইবেলের সলোমনের সাম্‌স্ ও ঋক্ বেদের সূক্ত। নজরুলের সংগ্রামী বিপ্লবী কবিতা নিতান্ত ঋজু, ভাবে-ভাষায় ভঙ্গিতে নয়, শুধু, উপমা-রূপক উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কার ও প্রায় কবিতাতেই সামান্য ভিন্নরূপে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রত্যেক উঁচু মাত্রার ও প্রত্যাশিত মানের কবির একটা জীবন দর্শন থাকে—সূক্ষ্ম জগৎ-চেতনার ও জীবন ভাবনার একটা বিশেষ মার্গ, একটা বিশেষ ধারা প্রায়ই ভালো রচনায় প্রবহমান থাকে। নজরুলেরও তা আছে, এবং তা একান্তভাবে স্বকালের, স্বদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত স্বাধীনতা ও শোষণমুক্ত গণসমাজ সম্পর্কিত। যে-আনুভূতিক জীবনোপলব্ধি থাকে তা তাতে অনুপস্থিত। এতে অবশ্য অনুভবের প্রসারে গভীরতর কোন জগৎ ভাবনা কিংবা জীবন জিজ্ঞাসা নেই। তিনি স্বকালের স্বদেশের মানুষের স্বাধিকার দাবির চারণ কবি। তাঁর চিন্তা-চেতনা তাই মাটি-ছোঁয়া বাস্তব জীবনলগ্ন। এ কবি ব্যবহারিক জীবনের কাণ্ডারী, মানস-জীবনের ভাণ্ডারী নন। তাঁর প্রেম-তৃষ্ণা ও প্রেম-চেতনার মধ্যেও নেই শরীরোত্তর কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনাও চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্রানুগত এবং যুক্তির নয়, বিশ্বাসের সংকীর্ণ সড়ক আশ্রিত। স্ব-উপলব্ধ কিছু নেই। অতএব নজরুল ইসলাম মহৎ ভাবের, উচ্চতর মনীষার, গভীর অনুভবের মহৎ কবি নন। তিনি মাটির ও মানুষের ঐহিক জীবনে দেশে-কালে দুস্থ লোককাম্য, সেবা ও ত্যাগপ্রবণ গণহিতৈষী সাহসী ও সংগ্রামী কবি, কাম-প্রেম-ভালোবাসার কবি।

যেহেতু আজো আমাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানবিক জীবনে কোন সমস্যারই সমাধান হয়নি, তাই আজো তাঁর বাণী, তাঁর সংগ্রামী চেতনা তাঁর বিপ্লব প্রবণতা—তাঁর অভিপ্রেত রক্তাক্ত সংগ্রাম আমাদের প্রেরণার উৎস। তাই তিনি আমাদের আজো প্রয়োজনের প্রিয় কবি। প্রাতে না হলেও তাঁকে আমাদের দুঃখের যন্ত্রণার ক্ষোভের প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের জীবনে প্রত্যহ স্মরণ ও শরণ করতে হয়। তাই জয়তু কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের কবি স্বভাব ঃ প্রেম-তৃষ্ণা

বিদ্রোহী কবিতায় কবি ঘোষণা করেছিলেন—'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য'। আমরা আগে তাঁর শক্তিপূজায় আসক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণ-তূর্যের স্বরূপ জেনেছি। এবার তাঁর 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী'র স্বরূপ জানব। অনুপ্রাসের ধ্বনিমধুর এ 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী' ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রেমিক কৃষ্ণ-শোণিতের ও কৃষ্ণের বাঁকা বাঁশীই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ 'বাঁকা বাঁশী' প্রণয়-চেতনা প্রকাশের প্রণয়-আহ্বানের, হৃদয়োস্থিত প্রেমের অভিব্যক্তি দানের মাধ্যম, অবলম্বন ও যন্ত্র।

আমরা জানি, নজরুল মানসিক গঠনের দিক দিয়ে মুখ্যত একাধারে ও যুগপৎ স্বাধীনতাকামী ও শোষণমুক্ত সমাজকামী বজ্র-কঠোর সংগ্রামী এবং প্রেম-স্নেহ-মমতা ভিখেরী কুসুম-কোমল অন্তরের অধৈর্য-অবুঝ অভিমানী কিশোর। তিনি রণ-হুঙ্কারে যেমন প্রচণ্ড, প্রেম নিবেদনে তেমনি অতি বিগলিত চিত্তবিনয়ী। রণ ক্ষেত্রে তিনি ক্ষোভে-রোষে শক্তিতে-সংকল্পে দেব-দৈত্য নরত্রাস, প্রণয় জগতে আবার তিনিই ব্যর্থতায় প্রত্যাখ্যানে ক্ষোভে কান্নায় যেন অসহায় অভিমানী কিশোর। নজরুল সাহিত্যে কবি নজরুল ইসলামের এই দুই রূপে অতি মুখ্য হয়ে সুপ্রকট বলেই এমনি ভাষায় দ্বিধাবিভক্ত করে নজরুলকে দেখানোর আগ্রহ জেগেছে আমাদের। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমরা উপলব্ধি করব যে এতেও কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনন্যতা কিছুই নেই। কেননা প্রাণী মাত্রেরই রয়েছে দ্বিবিধ ক্ষুধা : দৈহিক ও মানসিক। দৈহিক ক্ষুধা দেহ সংরক্ষণের জন্যেই আবশ্যিক বলে জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যু মুহূর্ত অবধি তা' একইভাবে উপস্থিত থাকে এবং সে-ক্ষুধা মেটাতেই হয়। অপরটির উৎসও শরীরের উষ্ণরক্ত হলেও তার উদ্ভব কৈশোরে, প্রাবল্য যৌবনে-প্রৌঢ়ত্বে এবং দেহগত বিনাশ বার্ধক্যে, যদিও মানস তৃষ্ণা থেকেই যায় আমৃত্যু। অতএব পেটের ক্ষুধা পরিমিতি মানে, এ ক্ষুধা আশুতোষ, এ ক্ষুধা ঘিরে কোন দর্শন গড়ে ওঠেনি, দেহের হ্রাসবৃদ্ধি-পুষ্টি লালন সম্পৃক্ত ক্ষুধা নিবৃত্তি বিষয়ক বিজ্ঞানও তেমন গুরুত্ব পায় না বার্ধক্যের পূর্বে।

কিন্তু মানস-তৃষ্ণা মানুষকে অবচেতন ও সচেতন দুইভাবেই বিচলিত করেছে—ভাবিয়েছে। এ চেতনা মানব সত্তা প্রাপ্তির সমকালীন ও সহজাত। এ মনোজতৃষ্ণা কামে-প্রেমে সীমিত ভাবচিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্তি পায়। সিগমন্ড ফ্রয়েড যা যা জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন ও বলেছিলেন এবং ফ্রয়েডীয় তত্ত্বেরও যাচাই-বাছাইয়ের পরে এখনকার মনোবিজ্ঞানীরা যা যা বলেছেন, সেগুলোরও কোনটাই ঋজু অনুভব-উপলব্ধিগত নয়—বিস্ময়করভাবে জটিল। আমরা অজ্ঞ অনধিকারী, আমরা তাই সুররিয়ালিজমে, চিন্তাপ্রবাহ তত্ত্বে, অস্তিত্ববাদ কিংবা অবদমিত প্রবৃত্তি তত্ত্বে জীবনের গতি-প্রকৃতি-প্রবৃত্তি রহস্য জানতে বুঝতে সমর্থ হব না।

'কাম' যে প্রকৃতিজগতে প্রজনন প্রেষণা—এ সত্য চির-স্বীকৃত। কিন্তু মানুষ কৃত্রিমভাবে যৌন-সম্ভোগ করে বলেই মানুষের সমাজে ওই ঋজু ও অনন্য লক্ষ্য মৈথুন গোড়া থেকেই প্রায় সর্বপ্রকার সমস্যার উৎস হয়ে থেকেছে। আমরা জীবনে প্রতিফলিত রূপের ঐতিহাসিক তথ্যের ধারা অনুসরণে আমাদের জীবনে ইন্দ্রিয়জ বৃত্তি-প্রবৃত্তি হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাম-প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ ও চিন্তার ধারা অনুসরণ করব নজরুল চিত্তের কাম-প্রেমের স্তর, মাত্রা, মান, মাপ তুলনায় জানবার-বুঝবার সুবিধের জন্যেই।

মানুষের আনুভূমিক জীবনের স্বরূপ সন্ধান শুরু হয়েছে সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই। আনুভূমিক জীবনের বিকাশ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সচেতনতাও অনেক পুরোনো। এ জীবনের ভিত্তি ও বাহন যে রতি তা উপলব্ধি করতে কিংবা অবচেতনভাবে জীবনকে ও জীবনাচারকে রতির অনুগত করে রচনা করতে মানুষ আগ্রহী হয়েছে সভ্যতার উষাকাল থেকেই।

তত্ত্ববিদের কাছে যা-ই হোক, সাধারণের অনুভবে কামে ও প্রেমে পার্থক্য সূক্ষ্ম ও সামান্য। মনের আবেগ ও দেহের পুলক নিবারণের জন্যেই ক্ষণকালীন যে শারীর মিলন তার নাম কাম, আর মনের আবেগ ও দেহের পুলক যদি বিপরীত লিঙ্গের কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অবলম্বন করে বা কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যাকে ছাড়া তা' নিবৃত্ত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, যাকে গোটা পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য নয় কেবল, যার সান্নিধ্য সম্মতি ও অনুরাগ জীবনকে ঐশ্বর্য ও বেঁচে থাকা সার্থক বলে প্রতীয়মান করে, যাকে জীবনে সঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে না পেলে জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে, এমনকি আত্মহনন বাঞ্ছিত হয়ে ওঠে, তার নামই প্রেম। এক কথায় কামপঙ্কে পঙ্কজ হচ্ছে প্রেম। অতএব কামৈকেই, একক নিষ্ঠতাই প্রেম, যাকে দেখলে তরে না দেখলে মরে-বৈষ্ণব কবির ভাষায় যার রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, প্রতি অঙ্গ কাঁদে, হিয়ার পরশ লাগি হিয়া কাঁদে, যার প্রতি অনুরাগ বাখানিতে প্রেমিক তিলে তিলে নিজেকে নতুন করে অনুভব করে।

রূপ বা গুণ অথবা রূপ ও গুণ ভিত্তিক পারস্পরিক আসক্তিই হচ্ছে প্রেমের বীজ। বুনো বর্বর মানুষেও এ আসক্তির প্রবলতা ছিল। অর্থাৎ প্রেম সংস্কৃতি সভ্যতার দান নয়। নারী নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি প্রতিরোধক বিবাহ প্রথা বরং প্রেমের মুক্ত উন্মেষের, বিকাশের ও অবাধ মিলনের বাধাই। সমাজ-স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনেই নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ সংযত ও প্রতিরোধ করা লক্ষ্যেই পাপ-চেতনা, অপরাধবোধ ও নীতিচ্যুতির ধারণা জাগিয়ে দেয়া হয়েছে সমাজ-সদস্য মানুষের মধ্যে। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত ও লিপিবদ্ধ পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলোয় বর্ণিত বিষয়ও তাই নারীর প্রতি আসক্তি ও নারী-হরণ সম্পৃক্ত। রূপসী নারীকেন্দ্রী রূপকথা উপকথাতো পৃথিবীতে অসংখ্য। প্রাণী মাত্রেরই অবশ্য ভোজন, মৈথুন ও নিদ্রা বা বিশ্রাম বা সুপ্তিভিত্তিক জীবন। এবং এতে প্রাণী মাত্রেরই জন্মগত অধিকার ও প্রয়োজন। আদম-হাওয়ার স্বর্গচ্যুতি ঘটেছিল এ যৌন আকর্ষণ জনিত পাপের ফলেই। আদম সন্তান হাবিল-কাবিল বৃত্তান্ত এ সূত্রে উল্লেখ্য। হিন্দু-পুরাণেও দেখি নারীর প্রতি যৌনাকর্ষণে দেব-মানবে কোন পার্থক্য নেই। বুনো, বর্বর ও ভব্য মানুষের এ ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটেনি। নারী নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত লঘু-গুরুভাবে ও বিভিন্ন ধরনে চলছেই। মানুষের আদি-ইর্ষা অসূয়া ও রিরংসা জাত। তারপর সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় 'জরুর' সঙ্গে জমিও দ্বন্দ্ব সংঘাতের, প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হয়েছে। যৌথ জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিবাদ-বিচ্ছিন্নতা এড়ানোর জন্যে আদিকালে মানুষের চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। বিবাহ প্রথা প্রবর্তন করেও মানুষের যৌনজীবন নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র হতে আট প্রকারের বিয়ে সমাজের স্বীকৃতি আদায় করেছিল-তাতে হরণ, ধর্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতিও ছিল। আকস্মিকভাবে ধরে নারীকে বহন করে ঘরে আনা হত বলেই স্ত্রীর নাম হয়েছিল 'বধূ'। অনার্য কন্যাদের দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে বধূ করা হত বলে বধূরা আর্য স্বামীকে সম্বোধন করত 'আর্যপুত্র' নামে। গোত্রীয় সংহতি রক্ষার লক্ষ্যেই স্বপরিবারে স্ববংশে ও স্বগোত্রে বিবাহ যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি আবার বৈধও রয়েছে অভিন্ন লক্ষ্যে। এ ট্যাবু-টোটেমেও কাম-প্রেম সংযত রাখা যায়নি বাঞ্ছিত মাত্রায়। তাই এখানেই মানুষের সমস্যার শেষ বা সমাধান হয়নি, রতি নিয়ন্ত্রণে-নিরোধেও চলেছিল সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়াস। জীবনের ঐহিক পারত্রিক সুখের ও মুক্তির পন্থা হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে রতি নিরোধ সাধনা। আমাদের দেহবাদী-দেহাত্মবাদী কায়া সাধন তত্ত্বের উদ্ভবের মূলেও রয়েছে ওই মৈথুন আসক্তি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত দেহ-মন। ওই মৈথুন সম্পৃক্ত রহস্য সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসারই প্রসূন হচ্ছে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র দর্শন। ভারতবর্ষে দেহের, মৈথুনের, রতি-রমণ পদ্ধতির কাম-প্রেমের যেরূপ গুরুত্বে শাস্ত্রিক, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অনুশীলন হয়েছিল, এমনটি পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় নি। কেবল পুরাণ-উপনিষদ-সাংখ্য যোগ তন্ত্র শাস্ত্র নয়, বাৎসায়নের কামশাস্ত্র থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সহজিয়ার রাধাতত্ত্ব অবধি সবটাই ওই মৈথুনতত্ত্ব ভিত্তিক।[১]

তত্ত্ববিদের চোখে যা-ই হোক, সাধারণের অনুভবে কামে ও প্রেমে পার্থক্য সামান্য এবং বিজ্ঞানীর চোখে দুই-ই নিরেট জৈবিক বৃত্তি। কৈশোর থেকে প্রৌঢ় বয়স অবধি মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে কাম-প্রেমের লঘু-গুরু লীলা চালু থাকে। কাজেই কাম মানুষের প্রবলতম বৃত্তি। সে বৃত্তি অভিব্যক্তি পায় প্রেমরূপ এবং কামনা কখনো দেহ, প্রীতি ও ভক্তিরূপে। সবার চেতনায় প্রেমের প্রভাব থাকলেও সবার জীবনে প্রেম প্রকাশ ও বিকাশ পায় না। অবদমিত ও অবচেতন বাঞ্ছা তখন পরোক্ষ উপায় খোঁজে উপভোগের। শৃঙ্গার তথা রতিরস তাই কর্ম ও কলার মুখ্য অবলম্বন হয়েছে। এ কারণেই আদি মানুষের সমাজে Art ও Ritual ছিল অভিন্ন। অন্ন ও আনন্দ প্রয়াস, কর্ম ও ধর্ম সাধনা এক ধারায় ছিল একাকার। রাগ-বিরাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গতি পেয়েছে জীবন।

আদি কৃষিজীবী সমাজে মৈথুন ছিল ফসল উৎপাদনের প্রতীক ও সহায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত সমাজে আজো তা অবিলুপ্ত। এদেশের ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে এ তত্ত্ব—বাজসনেয়ি সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যকে, মহাভারতে ও ছান্দোগ্যে। এ তত্ত্বের ক্রমবিকাশে পাই সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র এবং সহজিয়া, বাউল, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, লিঙ্গায়েত প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়। অতএব দেবতত্ত্বের ও মানবমনের বিকাশ ধারায় রূপ ও প্রতিবোধের দান গভীর ও ব্যাপক।

শিল্প-সাহিত্যের সব শাখাই রূপ ও রতিভিত্তিক। অন্য কথায় রূপ ও রতি একাধারে কারণ ও কার্য এবং বীজ ও ফল। এ দৃষ্টিতে রূপ ও রতির অনুধ্যানেরই প্রসূন মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

চিত্র ও মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প, নাচ ও গান, কবিতা ও গাথা, ধর্ম ও দর্শন, রূপকথা ও উপন্যাস সবকিছুই ক্রমবিকাশ লাভ করেছে রূপ-রতি ভিত্তি করে। বলতে গেলে মানুষের জীবন ধারায় থাকে কাম ও প্রেমেরই বিচিত্র বিকাশ। এর প্রকাশ প্রতিবেশ

---

১ আহমদ শরীফ, বাউলতত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভর। সে জন্যে এর অভিব্যক্তি ও বিকাশ সরল ও একরঙা হয়নি। জীবনপ্রবাহ ঝর্ণাধারার মতোই উপল ও বাঁক মেনে চলে। তাই জীবনে আসে বৈচিত্র্য, বিকৃতি ও বক্রতা।

জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্র, মূর্তি, সাহিত্য, নৃত্য ও সঙ্গীত তাই প্রেম-প্রতীক। এমনকি বহু ধর্ম আর দর্শনও প্রেমবাদী। পৃথিবীব্যাপী আদি সমাজে মানুষের মনে ও মননে, কর্মে ও ধর্মে শৃঙ্গারই পেয়েছে প্রাধান্য। শৃঙ্গারের নামই তাই আদিরস। সভ্যতার ও সংস্কৃতির এক বিশেষ স্তরে জীবনের ক্ষেত্রে এ আদি রসের বিচিত্র ও বহুধা প্রভাব স্বীকার করে ধন্য হয়েছে মানুষ, ধন্য করেছে দেবতাদের। গ্রীক ও হিন্দু পুরাণ তার সাক্ষ্য।

পরকীয়াতেই প্রেমের স্ফূর্তি। তবু সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে দাম্পত্য প্রেমকেই আদর্শ ও মহিমান্বিত করবার প্রয়াস চলল। এই নৈতিক চেতনার যুগেই আমাদের দেশে হর-গৌরী, ইন্দ্র-সচী, রাম-সীতা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতির দাম্পত্য প্রেমের মহিমা কীর্তনচ্ছলে নিজেদের প্রণয়াকৃতি প্রকাশ করেছে মানুষ। কিন্তু এই কৃত্রিম প্রয়াসে তৃষ্ণা মেটেনি, ভরে ওঠেনি তার বুক। তাই আবার পরকীয়া রসে সিক্ত হয়েই প্রস্ফুটিত হল তার চিত্ত-উৎপল। এই রসেই তার হৃৎ-কমলে সঞ্চিত হল মধু, সৃষ্টি হল মহিমান্বিত। মানুষের অবদমিত ও অবচেতন বাঞ্ছা, অপূর্ণতার আকুতি গানে গাথায়, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, চিত্রে, নৃত্যে, প্রতিমায়, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় আজো অভিব্যক্তি পাচ্ছে বিচিত্র ও বর্ণালি হয়ে।

ইউসুফ-জোলেখা, লাইলী মজনু, শিরি-ফরহাদ, কৃষ্ণ-নাপ্পিনাই বা রাধা-কৃষ্ণ এ প্রেম প্রকাশের আদর্শ এবং বিকাশের অবলম্বন হয়ে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মানুষের মনের আকুতি মিটিয়েছে। সমাজ-কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে নৈতিক চেতনা যতই প্রবল হয়েছে, ততই ততই সূক্ষ্ম অনুভবের স্তরে উন্নীত হয়েছে মূল প্রয়োজন, বাস্তব চাহিদা পেয়েছে মানসোপভোগে চরিতার্থতা। তাই বাস্তব জীবনে যা পাপ (Sin) যা নৈতিক দোষ (Vice) ও সামাজিক অপরাধ (Crime) এবং সে-হেতু ঘৃণ্য ও পরিহার্য, ভাবলোকে তা-ই আত্মার উল্লাস জাগায়। এ জীবনে কেবল আনন্দানুভবের উৎস হয়ে থাকেনি, পারত্রিক সুখ-স্বপ্নেরও আধার হয়েছে।

দেহে রূপ, রূপে কাম, কামে প্রেম আর প্রেমেই আত্মার মুক্তি। সুফী-বৈষ্ণবের এ ধারণা একদিনে গড়ে ওঠেনি। মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকে বিস্তর, বাধা থাকে দুর্লঙ্ঘ্য। বাঞ্ছিত বস্তুমাত্রই দুর্লভ ও দুঃসাধ্য। অথবা দুর্লভ না হলে কিছু বাঞ্ছনীয় হয় না। কাজেই তার জন্যে দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি ও প্রয়াস প্রয়োজন। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই এ সাধনার সম্বল। হৃদয়ে দাহ ও চোখে অশ্রু প্রেমিকের নিয়তি। আর মিলনাকাঙ্ক্ষা তথা বিরহবোধই তার প্রেরণা ও সামর্থ্যের উৎস। এই জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিরহী আত্মার কান্নায় করুণ।

এই রূপ ও রতি, কাম ও প্রেমবাঞ্ছা অভিব্যক্তি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীতে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এগুলোতে অধ্যাত্মতত্ত্ব ছিল না। এ দৈহিক প্রেম ঐহিক জীবনে আনন্দিত স্বপ্ন জাগানোতেই ছিল সীমিত। চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পরে এ সঙ্গীত পারত্রিক ত্রাণের অবলম্বন হল। তখন অপ্রাকৃত ও হৃৎবৃন্দাবনে জীবাত্মা রূপিণী রাধার ও পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুধ্যান ও আস্বাদনই এর অপার্থিব মহৎ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এভাবে প্রেমকে তত্ত্বের অনুগত করে রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রেমকে করা হল মহিমান্বিত ও অনন্য। চৈতন্য-পূর্ব যুগে গোটা ভারতব্যাপী যা ছিল শৃঙ্গার রস উপভোগের বাহন, চৈতন্যোত্তরকালে তা-ই হল অধ্যাত্মরসের আকর। বৈষ্ণব পদাবলীর সব আয়োজনই ওই চিরবিরহ বোধকে ধ্বনিত করার জন্যই অভিব্যক্তি দিয়ে স্বস্তিসুখ পাবার জন্যেই।

॥ ২ ॥

গোটা ভারতবর্ষ আদিকাল থেকেই জীবনে সমাজে বেদে-পুরাণে উপনিষদে, রূপকথায় উপকথায়, সাংখ্যে-যোগে-তন্ত্রে-বৌদ্ধে বিভিন্ন যানে কামশাস্ত্রে বৈষ্ণবে সহজিয়ায়-বাউলে কাম-প্রেম শাস্ত্রিক-দার্শনিক আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ও মূল্যে মহিমান্বিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যুগের ও আধুনিক কালের সাহিত্যে কামপ্রেম কথা প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতে যেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক নীতি-রুচির বাধা ছিল। আবার কামে-প্রেমে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-চেতনাও সযত্নে লালন করা হত। এমনকি হয়তো এখনো হয়। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ কন্যা, তাই ব্রাহ্মণ নদের চাঁদের সঙ্গে তার প্রেম গর্হিত নয়। বিয়ে হলেও জাত-ধর্ম-বর্ণ ঠিকই থাকত। বঙ্কিমচন্দ্রও কপালকুণ্ডলাকে অপহৃত ব্রাহ্মণ কন্যা করে রেখেছিলেন, ফলে নবকুমারের সঙ্গে বিয়েতে জাতে-জন্মে-বর্ণে-ধর্মে অসঙ্গতি থাকেনি, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে আপাত খ্রীস্টান কন্যা ভারতীর দেহে রয়েছে ব্রাহ্মণের রক্ত, অতএব ব্রাহ্মণ সন্তান অপূর্বের সঙ্গে ভারতীর প্রেম যদি বিয়ে পর্যন্ত গড়াত, তা হলে কারুর জাত-বর্ণ-নষ্ট হত না, কেবল সামান্য গোময়ই মিলনের পথ করত প্রশস্ত ও উন্মুক্ত।

আমাদের মধ্যযুগের প্রণয়োপাখ্যানে সাধারণভাবে রাজপুত্র রাজকন্যার প্রেম-কাম-সম্ভোগ পাপ, সামাজিক নিন্দা ও সাংস্কৃতিক কদর্যতা মুক্ত থাকত ধর্ম সাক্ষী গান্ধর্ব বিয়ের তথা অঙ্গীকারের ও মালা বদলের গোপন আনুষ্ঠানিকতায়। আমাদের সাহিত্যে অসবর্ণ প্রেম ছিল না, দেহ-স্পর্শেরও ছিল না নিয়ম, বিধর্মীর সঙ্গে প্রেমে জাত-ধর্ম খোয়াতে হত। চন্দ্রাবতীর প্রেমিক বলছে : 'দেব পূজার ফুল তুমি/ তুমি গঙ্গার পানি/ আমি যদি ছুঁই কন্যা / হইবা পাতকিনী।'

আরো বিস্ময়ের কথা রোমন্টিক গীতিকবিতা প্লাবিত উনিশ শতকের য়ুরোপ দেখেও য়ুরোপীয় বহু ভাষাবিদ প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি স্নাত আমাদের প্রথম উল্লেখ্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন প্রেমের কবিতা রচনা করেননি। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এ বিষয়ে উদাসীন, হেম নবীনের কাব্য এ ক্ষেত্রে প্রায় বন্ধ্যা, ভীরু হৃদয়। বিহারী লাল পত্নী প্রেমের কবিতা লেখা শুরু করে স্বদেশ স্বকালের মানুষের নীতি-রুচি চেতনা মর্যাদা রক্ষার প্রয়াসী ছিলেন। 'আহা এই মুখখানি/প্রেমভরা মুখখানি/ত্রিলোক সৌন্দর্য আমায় কে দিল আনিয়া'– এভাবে শুরু করে তিনি পরিণামে সৌন্দর্য স্বরূপার অনুধ্যানে প্রায় নিরীশ্বর-নিঃস্বর্গ জীবনবাদী মর্ত্য প্রেমিক হয়েও মরমী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সমকালীন প্রতীচ্য গীতিকবিতার আত্ম ও অবয়ব তাঁর অনায়ত্তই রইল। অক্ষয়কুমার বড়ালও পরকীয়া নারী প্রেম এড়িয়ে জাত-ধর্ম-রুচি রক্ষা করে পত্নী-প্রেমের বিলাপে তাঁর প্রণয়-তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন 'এষা' কাব্যে। দেবেন্দ্রনাথ সেন যদিও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চিরদিন চিরদিন/প্রেমের পূজরী আমি/প্রেমের পূজারী'। – তবু নিঃশঙ্ক-নিঃসংকোচ উচ্ছ্বাস অনুপস্থিত তাঁর কবিতায় আর রবীন্দ্রনাথের প্রেম-গীতিতে মর্ত্যের কোন শারীর নারীকেই খুঁজে পাওয়া ভার–কায়া ধরতে ধরতে যেন ছায়া হয়ে যায়। বিমূর্ত নারীও স্বর্গের কি মর্ত্যের দেবী কি মানবী সহজে ধারণা করা যায় না। তাঁর পুরুষও 'তোমার পরশ অমৃত সরস/ তোমার নয়নে দিব্য বিভা'/ বলে কাম-প্রেম এড়িয়ে চলে, সৌন্দর্য রূপা রূপসী নারীর পদপ্রান্তে পুষ্প ধনু রেখে কামদেবও পালায়। উর্বশীকে পুরুষেরা অনুভব করে কিন্তু স্বরূপে দেখেও না, পায়ও না। 'ভালো বাস প্রেমে হও বলি/ চেয়ো না তাহারে।' কেননা, 'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব।' এ সূত্রে রাজা, অরূপরতন, শাপমোচন প্রভৃতি গীতিনাট্য উল্লেখ্য। আর নিষ্ফল কামনা, সুরদাসের প্রার্থনা, অনন্ত প্রেম প্রভৃতিই রবীন্দ্র প্রেমতত্ত্ব ধারক কবিতা।

বলতে গেলে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে কাম-প্রেমের কথা উচ্চকণ্ঠে নিঃসংকোচে উচ্চারণ করেন এক স্বল্প শিক্ষিত সাহসী ছোট কবি। তিনি ঢাকার ভাওয়ালের গোবিন্দ দাস। স্থূল কামকেও তিনি তাঁর কবিতায় শিল্প-সম্মত বিষয়ের মর্যাদা দিয়েছিলেন যার বহুল প্রয়োগ ও উচ্চারণ আমরা ত্রিশোত্তর দ্রোহীদের মধ্যে পেয়েছি :

আয় বালিকা খেলবি যদি এ এক নতুন খেলা
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারো এ এক নতুন খেলা।

গোবিন্দ দাস আরো ঘোষণা করলেন যে, কামে-প্রেমে জড়ানো আসক্তিই প্রেম। 'আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমজ্জাসহ' গোবিন্দ দাসকে এ সাহসী নির্ভীক দৃঢ় পয়লা কদমে এগিয়ে আসতে দেখে নির্ভয়ে কি সঙ্কোচের সঙ্গে কৈফিয়ত পেশ করে শারীর প্রেমের মহিমা-মাধুর্য কীর্তন ও প্রচারে এগিয়ে এলেন আরো কয়েকজন। এদের প্রধান হচ্ছেন মোহিতলাল মজুমদার। 'আমি কবি অন্তহীন রূপের পূজারী।' তাঁর ইরানী মেয়ে কবিতায় রূপসীর রূপ-লাবণ্যের বর্ণনায় তাঁর অসংকোচ দেহরীতির পরিচয় মেলে। তিনি বলেছেন :

১. দেহী আমি মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ ভিখারী
পরশ রসিক আমি। আলো নাই, আছে শুধু প্রাণের আরাম (স্পর্শ রসিক)।
২. অরূপ-রূপের উপাসনা–সে যে অন্ধের অনাচার (একখানি চিত্র দেখিয়া)।
৩. ইন্দ্রিয় গীতায়/ রচিনু তনুর স্মৃতি। (ফুল ও পাখী)।
৪. নারীর পূজার তরেই সে যে রাজার বিভব মাগে। (নারী)।
৫. আমি কবি, অন্তহীন প্রেমের পূজারী
রূপ আগে পরে ভালোবাসা (রতি ও আবৃতি)।
৬. যে রূপের পিপাসায় প্রেম হল জীবন অধিক (প্রেম ও জীবন)।
৭. সুন্দর লাগি ভালোবাসা মোর, অন্তর আঁখি ফুটে (রূপ-তান্ত্রিক)।
৮. আমি মদনের রচিনু দেউল দেহের দেহেলী 'পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ ফুল সাজাইনু থরে থরে (স্মরগরল)।

মোহিতলালের কবিতায় হৃদয়াবেগের চেয়ে তত্ত্বোদগীরণের আগ্রহ ছিল বেশি। অতৃপ্তি ও প্রণয়োৎকণ্ঠা মোহিতলালের কবিতায় অনুপস্থিত নয় বটে, তিনি শারীর প্রেমের কথা উচ্চকণ্ঠে বলতে চেয়েও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছেন এবং পরিণামে দেহাতীত, আত্মপাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোচনের লক্ষ্যে আস্থাবান ও অনুতপ্ত। তবু সংকোচ তাঁর যেন ঘোচে না। তাই আত্মপক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দেন :

১. আমার পিরীতি দেহরীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত
ভুস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ (স্মরগরল)

২. ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা
লাখ লাখ যুগে আঁখি জুড়াল না
দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন সঙ্গীত।
তুলঃ জনম অবধি হাম রূপ নেহারুলু লাখ লাখ যুগ:... ইত্যাদি।

৩. যৌবন দেহের ব্যাধি রূপ যেন তাহারি বিকার। (নিষ্কৃতি)।

৪. ঘুচিল সংশয় মোহ– সত্য আর সুন্দরের ছল বুঝিলাম দু-ই মিথ্যা। (প্রকাশ)।

৫. রুদ্রের সাথে রতির সাধনা করিয়াছি একাসনে
প্রাণের পিপাসা আঁখিতে ভরেছি রূপের অন্বেষণে।

কবি আরো জানেন :

৬. রূপসীরে করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালোবাসে কবি
রূপ নহে সেই রস রতি, নয় সে শুধু আরতি
মনের নিশিথে সে-যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি
সে তো নহে ভোগ প্রয়োজন। (রতি ও আরতি)

এমনি কথা, দেহাতীত প্রেমতত্ত্ব রয়েছে বিস্মরণীয়, পান্থ, মাধবী, রূপমোহ, নিশিভোর, নতুন আলো প্রভৃতি কবিতায়।

মোহিতলালের চেতনায় রূপতৃষ্ণা ও কাম-প্রেম কখনো পার্থিব ও কায়িক, কখনো অপার্থিব ও বিমূর্ত। এক কথায় মোহিতলাল কখনো দ্বিধামুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর কাব্যে ভূমা ও ভূমি, প্রিয়া ও পৃথিবী, রূপ ও রূপ কখনো কায়াময় কখনো বা ছায়ামাত্র, কখনো শারীর সম্ভোগ প্রবণ, কখনো বা কল্পবিলাসী রূপ-জিজ্ঞাসু তাত্ত্বিকমাত্র। অতএব, মোহিতলাল শারীর ও মানস ভোগ-উপভোগ ক্ষেত্রে দিশেহারা। যদিও অন্তিমে তাঁকে দেহাতীত রূপ ও ভোগবাদী বলে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়।

সুতরাং গোবিন্দ দাসের পরে যথার্থ শারীর প্রেমের প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী কবি হিসেবে আমরা কাজী নজরুল ইসলামকেই এবং তাঁর সমকালীন ত্রিশের কয়েকজন কবিকে পাচ্ছি। আমরা জানি যে নজরুল ইসলাম তাঁর স্বকালের দেশের ও সমাজের সচেতন কবি। তাই তাঁকে বলা হত 'যুগের ও হুযুগের কবি।' তাঁর সংগ্রামী বিপ্লবী-চিন্তা-চেতনা ঋদ্ধ উদ্দীপনা-প্রণোদনা সঞ্চারী কবিতা যেমন মাটি-ছোঁয়া সমাজ-সংলগ্ন, মনন-মনীষায় সূক্ষ্ম কিংবা উর্ধ্বগ নয়, তেমনি তাঁর প্রেম বিষয়ক কবিতা এবং গানও স্বতোস্থূল ও প্রাথমিক অনুভূতি ব্যঞ্জক। এসব কবিতায় ক্ষণে ক্ষণে আকাশ-পানে ডানা মেলার আগ্রহ প্রকাশ পেলেও এসব কবিতা ও গান নিমগ্ন-শারীর, ঘরোয়া ও ব্যক্তিক রয়ে গেছে। ভূমি ছেড়ে ভূমার দিকে, মাটির মানুষ ছেড়ে পরীলোকে তাঁর প্রেম-চেতনা পক্ষবিস্তারে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত নজরুলের আনুভূমিক জীবনে কোন সূক্ষ্ম, গভীর, ব্যাপক ও দার্শনিক উপলব্ধি ছিল না, সে-শক্তিই ছিল না তাঁর। ফলে গতানুগতিক শাস্ত্রীয় বিশ্বাসলব্ধ তত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যতীত অন্য কোন জীবন-তত্ত্ব তাঁর বোধগত হয়নি কখনো। এজন্যেই বাস্তব জীবনে যেমন তিনি আস্তিক্যে ও নাস্তিক্যে, ইসলাম ও কম্যুনিজমে, ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে, সন্ত্রাসবাদে, কংগ্রেসী নীতিতে ও অহিংসায়, বাঙালী বা ভারতীয় ও নির্ভূগোল মুসলিম চেতনায় কোন পার্থক্য বুঝতেন না, তাই যখন যা মুখ্য ও প্রয়োজন তা-ই হতেন তিনি। মতে-পথে-কর্মে আচরণে তিনি ছিলেন বহুরূপী। সদিচ্ছা ও আকোই ছিল কবি নজরুল ইসলামের পুঁজি। কোন ইচ্ছার স্বরূপ চেতনা কিংবা পূর্ণ উপলব্ধি যেমন ছিল না তাঁর তেমনি ছিল না কোন আবেগ-অশ্বের দুর্বার যথেচ্ছ গতি নিয়ন্ত্রের রাশ তাঁর হাতে। তাই প্রণয়-গীতিতে এবং প্রেম কবিতায়ও তাঁকে আকৃতিপিষ্ট বেদনাক্লিষ্ট, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দীপ্ত, না পাওয়ার হতাশা পীড়িত, প্রত্যাখ্যান ক্ষুব্ধ, আশ্বাসে প্রীত, আহ্বানে বিগলিত, অনুগ্রহে কৃতজ্ঞ, প্রতারণায় রুষ্ট, ব্যর্থতায় যন্ত্রণাগ্রস্ত মানুষ হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। সংগ্রামী কবি হিসেবে তিনি বজ্রকণ্ঠে দেব-দৈত্য-ত্রাস-রণ হুঙ্কার ছাড়েন, আর সেই একই ব্যক্তি প্রণয় জগতে মুখ্যত আকুল অস্থির অসহায় রোরুদ্যমান ক্ষুব্ধ অভিমানী। বাস্তবে ব্যক্তিগত জীবনেও কবি কামুক ও প্রেমিক ছিলেন। কাব্য ক্ষেত্রে তাঁকে রূপ পিপাসু এবং প্রেমের ও সৌন্দর্যের কবি হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি। নজরুলের প্রণয় গাথার রূপ হচ্ছে বিরহ–না পাওয়ার বিরহ, পেয়ে হারানোজাত বিরহ, প্রত্যাখ্যান জাত বিরহ ও বিরহের অপর নাম অনুরাগ, অপূর্তির বাঞ্ছিত অপ্রাপ্তির তৃষ্ণা, অতৃপ্তির আকুতি-বেদনা যন্ত্রণা। নিষ্ঠুর বেদরদী মানুষ নয়–তাঁর এ বিরহ বধুর বিবাগী পথিক জীবনে তাঁর বেদনার দোসর ও সহানুভূতিশীল আশ্রয় হয়েছে প্রকৃতি। আকুতি-আকুল, বেদনা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতির মধ্যে তাঁর বেদনার প্রতিচ্ছবি পরিব্যাপ্ত দেখেছেন। যেমন :

ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার আদুল ঢল ঢল কায়া।
আমলকী বন ঝিমায় ব্যথায়/ঘনায় কাঁদন গগন সীমায়।

পরিশীলিত না হলেও নজরুল ছিলেন অস্থি-মজ্জায় ষোল আনা রোমান্টিক। আমরা জানি, বিরহেই প্রাণের ধন প্রেয়সীকে হৃদয়গত করে, মনের স্বচ্ছল দৃষ্টিতে, হৃদয়ের উষ্ণসান্নিধ্যে পরিপূর্ণ করে পাওয়া যায়। তাইতো প্রেয়সীর অপর নাম মানসী।

নয়নের কাছে যবে রহ তুমি/ মনোমাঝে তোমা নাহি পাই
নয়ন হইতে দূরেতে রহিলে/ মনোমাঝে তব ঠাঁই।
মন ও নয়ন–এ দুইয়ের মাঝে/ সার গণি তাই মনে
মিলনের চেয়ে বিরহ সতত/ মিলায় প্রাণের ধনে।

(আলতাফ হোসেন— হালী-অনুবাদ)

কাজেই প্রেমানুভূতি বিরহেই পয়া লালন ও বিকাশ। মহৎ ও গভীর প্রেম মাত্রই বিরহ-সম্ভব ও বিচ্ছেদ সম্ভূত। আমাদের 'রাগানুগ' শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব পদাবলীর সব আয়োজনের লক্ষ্য তো ওই প্রেম ও বিরহ বোধকে তার বৈচিত্র্য ও গভীরতায় বিস্তারে ও বিকাশে স্বরূপে উপলব্ধি করা ও করানো। প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকৃতি যে বিভিন্ন অবস্থায় ও অবস্থানে, নানা কারণে ও প্রয়োজনে কত বিচিত্র ও বিবিধ, প্রমূর্ত ও বিমূর্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে–অভিব্যক্ত হয় তার দুনিয়া-দুর্লভ নিদর্শন হচ্ছে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী। একাধারে যুগপৎ পার্থিব হয়েও অপার্থিব, কায়িক হয়েও কাল্পনিক, মানবের হয়েও অমরের, মর্ত্যের হয়েও স্বর্গের, দৈহিক হয়েও মানসিক, উপভোগের হয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসনার–এ প্রণয়গীতিগুলো বিশ্বমানবের চিরন্তন মানবসম্পদ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শিল্প তাই বিরহ বিধুর ও ট্র্যাজেডী :

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান
অন্তরে অন্তর কান্দে কিবা করে প্রাণ।

কিংবা রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

অথবা সখি! কি কহসি অনুভব মোয়–
সেহি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোই!

এ আকৃতি অশেষ ও চিরন্তন। নজরুল বাঙলার ও বাঙলা সাহিত্যের এ ঐশ্বর্য অন্য অনেকের মতোই আয়ত্ত করতে পারেন নি। নজরুল ও শেলী-কীটসের প্রেম কবিতার সঙ্গে নয় কেবল, তাঁদের ব্যক্তিজীবনের প্রণয় বৃত্তান্তও জেনেছিলেন। কিন্তু বক্তব্যের ও সৌষ্ঠবের মানে-মাত্রায়-মাপে তিনি তাঁদের স্তরে উন্নীত হন নি, তবে আবেগে তাঁদের অতিক্রম করেছিলেন অবশ্যই। অতএব নজরুলের রোমান্টিকতা সুনিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে শিল্পপ্রসূ হয়নি তেমন–উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছ অভিব্যক্তিতে হয়েছে অবসিত। নজরুলের ছিল স্থূল কামনা।

আমি চুমোয় চুমোয় ডুবাবো এই সকল দেহ মম। (পরশ পূজা)

বা, তরুলতা পশুপাখী সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্ব কামনাতে
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি
সকলের মাঝে আমি, সকলের প্রেমে মোর গতি।
আমি কাম, তুমি হলে রতি
তরুণ-তরুণী-বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ পতি। (অনামিকা)

এ যেন গণকবির দেহলগ্ন কামে গণ-উপলব্ধির ঘোষণা। কিংবা, 'সেই বিনোদ বেণী বাঁধিয়া দে'। ইত্যাদি–

এত অশ্লীল যে দোর-ধরে রাস্তায় দাঁড়ানো বারাঙ্গনার মন, মতলব ও দেহ মানবচক্ষে চিত্রার্পিত হয়ে ওঠে। কবি অত্যন্ত প্রকৃতি বা স্বভাব অনুগত ভাবুক–আদিম জৈবসত্তা ও চেতনা কেন্দ্রী চিত্রাঙ্কনে তিনি নিঃসঙ্কোচ। এক্ষেত্রে তিনি অনুভবে ও চেতনার অনুশীলনে মাটির বুকেই কুমড়ো-তরমুজের লতার মতোই আত্মবিস্তার করেছেন–ভাবপ্রতীক চিত্রী হননি। রুচি ও মনীষা যুক্ত না হলে আবেগকে কেবল ধ্বনি মধুর ছন্দ ও শব্দে অবয়ব দিলে যে মহৎ বাক্‌প্রতিমা কিংবা বুদ্ধি ও বিশ্বাস-গ্রাহ্য বাণী হয় না, তার প্রমাণ নজরুলের অধিকাংশ কবিতা যেমন–'আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে/ বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে।' বাণীবদ্ধ সুন্দর সুষম পূর্ণাঙ্গ কবিতা নজরুলের সত্যিই দুর্লভ, উচ্চতুচ্ছের সমাবেশে ান ও মূল্যহীন হয়ে গেছে। তবে স্বীকার করতেই হবে চরণের, অলঙ্কারের ও সুষম স্তবকের চমক ও দ্যুতিদীপ্তি মেলে প্রায় সর্বত্রই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম বলেছেন বটে, 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'। এ অস্থিরচিত্ত আস্ফালনপ্রবণ-বীর বিপ্লবী সত্তা-স্বরূপে ছিলেন দুর্বলচিত্ত। তাই ঝড়-রক্ত-আগুনের ও লাল ঝান্ড্রার কথার ফাঁকে অস্থির হয়ে শুনতে পান অসহায় নারীর করুণ ক্রন্দন, 'আর যেন নাহি পাই জোর/ চলা পায়ে মোর, ও বাজা আমারো বুকে বাজে' । বা, 'তুমিই অসিতে মোর বাজাও বাঁশী'। কিংবা হতাশ বীর বলেন, 'রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে হঙ্কারিয়া উঠে তাই/ কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি?' যদিও কবি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেছেন, তাঁর প্রিয়া হবে তাঁরই সৃষ্টি:

তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহঙ্কার।

কিংবা তুমি আমার আঁকা ছবি
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।

কিন্তু এমনি কোন 'মানসী' তিনি সৃষ্টি করতে পারেন নি, কেননা যৌবনতীর দেহবিজড়িত রূপ তাঁর কাম-প্রেরণা জাগিয়েছে মাত্র, একনিষ্ঠতায় প্রেমে উত্তরণ ঘটেনি তাঁর। তাই তিনি সেই স্থূল অনুভব উপলব্ধিতে থেকেছেন চিরস্থির :

প্রেম-সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
প্রেম এক, প্রেমিক সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পিব সেই প্রেম/ সে শরাব লোহু (অনামিকা)

এ উক্তির পরে সন্দেহ থাকে না যে এ কবি একজন কামুক, কামকে, কামজ আকর্ষণকেই তিনি প্রেম বলে জানেন। ইনি প্রেমী নন; প্রেম বোঝেনই না। ইনি ফুল সন্ধানী মধুকর মাত্র। এ উপলব্ধির পরে কোন প্রেমিকাকে ছলনাময়ী কিংবা দ্বিচারিণী বলার অধিকার থাকে না কবির। তবু নারীর প্রতি সে অভিযোগ অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। মাঝে মাঝে না-বুঝে হাওয়াই তত্ত্বের প্রলাপোক্তি করেছেন মাত্র। যেমন :

তোমারে দেহের তীরে পাবার দূরাশা
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে–
যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন
যা কিছু চুম্বন দিয়ে করেছি সুন্দর।

তার প্রমাণ 'দোলনচাঁপা' থেকে গান অবধি সর্বত্র দেহগত রূপেই হয়েছেন আকৃষ্ট এবং তাতে মানসোপভোগের আভাসমাত্র নেই। আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে দেহ-চেতনার কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

১. ঐ আঁখি, ঐ মুখ
ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,
ঐ তব অপরূপ রূপ....
চিনি সব চিনি।

২. (তুমি) কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকি
(পূজারিণী)

৩. বঁধুর বুকের পরশনে / আমার পরশ আনবে মনে–
বিষিয়ে ও-বুক উঠবে। (অভিশাপ)

৪. সখি, নতুন ঘরে গিয়ে আমায় পড়বে কি আর মনে। (পিছু ডাক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. বুকে রেখে চুমবে কি মুখ নয়ন-জলে গলে। (আশা)
৬. আবার কখন আসবে ফিরে সে আশাতে জাগব রাত। (আশান্বিতা)
৭. অধর নিস্‌পিস্/ নধর কিস্‌মিস্ /রাতুল তুলতুল কপোল। (প্রিয়ার রূপ)
৮. মিলবে নাকি শিথিল তোমার বাহুর পরশন। (মানিনী)
৯. (মোর) পিয়াসী মন তোমার ঠোঁটের একটি গোপনে চুমারি (প্রণয় নিবেদন)
১০. আর পারিনে সাধতে লো সই এক ফোঁটা ওই ছুড়িকে। (ফুল-কুঁড়ি)
১১. তার নিধুবন-উন্মন /ঠোঁটে কাঁপে-চুম্বন/বুকে পীন যৌবন, উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম-কণ্টক ব্রণ মহুয়া কুঁড়ি (মাধবী-প্রলাপ) /

এ-ও সত্য যে ক্বচিৎ কদাচিত আকস্মিকভাবে দেহগত প্রেম দেহাতীত চিরন্তন অনুভবের স্তরে ডানা মেলেছে, কিন্তু পাখা-ভাঙা পাখীর মতো আবার তেমনি আকস্মিকভাবেই ভূ-লগ্ন হয়েছে। কবিও এ বিষয়ে সচেতন ঃ 'উড়িবারে চাই যত জ্যোতিদীপ্ত মুক্ত নভঃ পানে/ অবসাদ-ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে' (মুক্ত পিঞ্জর— বিষের বাঁশী)

১. আমার প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায়ে আলতা পরায়।
(আলতা স্মৃতি, ছায়ানট)

২. বিস্ময়ে রহিনু চাহি ও মুখের পানে
কি যেন রহস্য তুমি –কী যেন কে জানে।
(তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চক্রবাক)

৩. যোদের মাঝারে শত জনমের শত সে জলধি বহে।
(সাজিয়াছ বর, চক্রবাক)

৪. অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা পরে
স্বপনে পাইয়া তোমা স্বপনে হারাই বারে বারে! অরূপালো!
জন্ম জন্মান্তর ধরি, লোকে লোকান্তরে তোমা করেছি আরতি
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি।
যেখানে দেখেছি রূপ, করেছি বন্দনা প্রিয়া তোমারেই স্মরি।
রূপে রূপে অরূপা খুঁজেছি তোমায়।
(অনামিকা, সিন্ধু হিন্দোল)

এখানে কবিবল্লভের 'সখি কি কহসি অনুভব মোর, রবীন্দ্রনাথের 'অনন্ত প্রেম' (মানসী) ও 'মানসসুন্দরী' (সোনার তরী) পাঠকের অবশ্যই মনে পড়বে। উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর আদলেই সম্ভবত নজরুলের পূজারিণী ও অনামিকা রচিত হয় 'প্রেমতত্ত্ব' হিসেবে। সে যুগে শাহাদাৎ হোসেন, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন ও আবদুল কাদিরও এমনি স্ব স্ব প্রেম-দর্শন জ্ঞাপক এক একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন।

৫. কেবলি রহস্য হায়, রহস্য কেবল
পার নাই সীমা নাই অগাধ অতল।
বা এ যেন স্বপনে দেখা কবে কার মুখ,
এ যেন কেবলি সুখ, কেবলি বলি এ দুখ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যেন চেনার সাথে অচেনা মিশা।

(তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চক্রবাক)

৬. আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়। (আপন পিয়াসী, ছায়ানট)

৭. আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ-মন-মৃগমম
আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা। (পূজারিণী)

লক্ষণীয় যে একই কবিতায় রূপসীকে কিংবা প্রেয়সীকে ঘিরে সম্ভোগ-চেতনা যেমন অভিব্যক্তি পাচ্ছে, তেমনি পাচ্ছে দেহাতীত প্রেম-স্বরূপ জিজ্ঞাসা। এ নিশ্চয়ই স্বস্থ ও সুস্থ চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তি নয়। এ এক অস্থির দিশেহারা বিমূঢ় রূপমুগ্ধ কামুকের অথবা প্রেমীর অসংলগ্ন উক্তি।

শারীর প্রেমে আস্থাবান কবি মুখে বলেছেন বটে, 'চাই না তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে'–কবি প্রিয়াকে দেবী বানাতে চান নি, 'মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটিরে' (এ মোর অহঙ্কার–চক্রবাক) কিন্তু দেবীর মতো চরণ সেবাই ছিল তাঁর প্রিয়াতোষণের পদ্ধতি। তার কারণ–কবি প্রেমী বটে, কিন্তু আত্ম-প্রত্যয়হীন ও আত্মসম্মান বোধশূন্য কিংবা পৌরুষ বা ব্যক্তিত্ব বিরহী, যৌবনদৃপ্ত হিসেবে যৌবনবতী তরুণীর কাছে কাম-প্রেমের দাবি নিয়ে উপস্থিত হবার সাহস নেই তাঁর। তাঁর আবেদন কাম-প্রেম পিপাসু কোন নারীর কাছে নয়। তিনি প্রণয়প্রার্থী বটে, কিন্তু যোগ্যতায় অর্জনে আস্থাবান নন, তাই নারীর করুণার কাছেই তাঁর আবেদন। ফলে এ কবি প্রণয়-কামী পদলেহী,–চরণ বন্দনায়, চরণ চুম্বনে বশ করতে বা প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের প্রয়াসী :

১. এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙুল চুমে।
চরণ আঘাত করলে রেগে
এমনি তোমার পদ্ম পায়ের আঘাত-সোহাগ দিয়ো
দিয়ো। (ব্যথা-গরব, দোলনচাঁপা)

২. এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণতলে। (সমর্পণ)

৩. আমার বিজয়কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে। (বিজয়িনী)

এটা কি পুরুষে শোভা পায়! শারীর প্রেমী ও দুর্বলচিত্ত বলেই প্রেমের স্থায়িত্বে তাঁর আস্থা ছিল না কখনো। যদিও অনর্থক অচিন্ত্য উক্তি মাঝে মধ্যে অসঙ্গতভাবে নিঃসৃত হয়েছে :

বল, প্রেম করে না দুর্বল ওরে, করে মহীয়ান। (সিন্ধু)

অথচ অন্যত্র বহুবার বলেছেন :

১. পথে বিপথে কতই আমার নিত্য নতুন বাঁধন এসে যাচে,
কাছে এসেই এমনি তারা পুড়ে মরে আমার আগুন আঁচে।
(চিরন্তনী প্রিয়া)

২. হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়
ভাল না বাসিতে হৃদয় শুকায়। (গান–৩৫/ চোখের চাতক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. গানের পাখী বসেছিলাম দু'দিন পাখার 'পর

(গোপন প্রিয়া–সিন্ধু হিন্দোল)

৪. তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক।

(তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চক্রবাক)

৫. তোমায় আমায় পথের দেখা
ঐ দেখাতে দুইটি হিয়ায়। জাগল প্রেমের গভীর রেখা।

(সিন্ধু হিন্দোল)

৬. ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি/ ক্ষমিও সে অপরাধ (গান, বুলবুল)

৭. মুগ্ধ ওদের নেই কোন দোষ, আমিই ওগো ধরা দিয়ে মরি,
... আমিই তৃপ্তিহারা (লক্ষ্মীছাড়া–ছায়ানট)

আবার নারীকেও তেমন বিশ্বাস করেন না। ঈর্ষা-অসূয়াও তাঁর রিরংসা-দ্রষ্টা বুকে জ্বালা ধরায় :

১. (তুমি) কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখো কিছু বাকি

(পূজারিণী)

২. বঁধুর বুকের পরশনে/ আমার পরশ আনবে মনে/ বিষিয়ে ও বুক উঠবে।

(অভিশাপ)

৩. সখি নতুন ঘরে গিয়ে আমায় পড়বে কি মনে। (পিছু ডাক)

৪. মর্মমূলে হান্‌লে আমায় অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ছুরি...
নতুন রাজায় বরেছিল আহা যো যেদিন পরেছিলে!
আমার হেলায় হত্যা করে দাঁড়িয়ে আমার রক্ত-বুকে
অধর-আঙুর নিঙড়েছিলে সখার তৃষ্ণা-শুষ্ক মুখে।

(দোলনচাঁপা)

৫. প্রাণ নিয়া এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়।

৬. এ যে মিথ্যা মায়াবিনী/ ঘরে ডেকে মারে/ এ যে ক্রূর নিষাদের ফাঁদ।

মানতেই হবে যে প্রণয়-গান ও কবিতার ক্ষেত্রে নজরুল নতুনও নন, তেমন বিশিষ্টও নন। তাঁর প্রণয়-সঙ্গীত বড় স্থূল–কল্পনা কম, বাস্তবে যে স্থূল নারী-চেতনা একজন তরুণে সম্ভব ও স্বাভাবিক, তার উর্ধ্বে কবির পদচারণা ক্বচিৎ ও আকস্মিকমাত্র এবং তা সে কারণে পারম্পর্য বা ভাব সঙ্গতিহীনও। শারীর প্রেমেও ঘন ঘন পূজা, চরণ-সেবা, রাজা, দেবতা এবং অসুন্দর, অশিব, মিথ্যা, অকল্যাণ প্রভৃতি প্রণয় প্রসঙ্গে অসঙ্গত উচ্চারণ রসাভাস ঘটিয়েছে মাত্র। তাই এ ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিক এবং একান্তই ব্যক্তি রয়ে গেছেন চেতনায় ও বক্তব্যে, সর্বজনীন প্রতিনিধিত্ব নেই সর্বত্র। শারীর প্রেমও কোন তত্ত্ব হিসেবে শিল্পসম্মত মানস-প্রতিষ্ঠা পায়নি। আবেগে উদ্বেলও নন তিনি সর্বত্র। একটা রোমান্টিক বিরহ বিলাস তথা অভ্রান্তির বেদনাবিলাস একটু চটুল কথার ফোয়ারা, একটা লঘু মেজাজের ও চটুল ছন্দের পরীক্ষায় প্রেম-বাণী উচ্চারণ কিংবা রূপাসক্তির প্রকাশও রয়েছে অনেক কবিতায়। কাজেই তাঁর প্রেমকবিতায় অন্তরের সত্য, হৃদয়ের গভীর ও বাস্তব অনুভূতি, উদ্বেলিত মানুষের আকুলতা ক্বচিৎ অভিব্যক্তি পেয়েছে। এ জন্যই নির্লক্ষ্য, পারম্পর্যহীন, স্ববিরোধী, বিপ্রতীপ চেতনা ও উক্তি একই কবিতায়ও মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলনে তাঁর আগ্রহ প্রবল বটে, কিন্তু তৃপ্তি নেই। এ অতৃপ্তি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমলের, আর মানসীর যুগের (নিষ্ফল কামনা, সুরদাসের প্রার্থনা) কবিতার মতো কোন তত্ত্বান্বেষী নয়—তৃপ্তি সন্ধানীও নয়। অনির্দেশ্য অনুভূতির কিংবা অস্বস্তি-অতৃপ্তির সন্ধানীও নয়। অনির্দেশ্য অনুভূতির কিংবা অস্বস্তি অতৃপ্তির অচেতন প্রেরণায় আকুলি-বিকুলি করা মাত্র। তাঁর সংগ্রামের ও রণহুঙ্কারের মধ্যে একটা বাস্তব লক্ষ্য সব সময় উচ্চারিত ও স্পষ্টই থেকেছে, কিন্তু তাঁর প্রণয় রাজ্যে তাঁর অভিযান ও অভিমান নির্লক্ষ্য। যেন লিখতে হয় বলেই লিখেছেন প্রেম বিষয়ক কবিতা। তবে দুটোই আবেগ প্রসূন, তাই চিরবিদ্রোহী ও চিরবিরহী উৎসে ও উচ্চারণে অভিন্ন এবং অবুঝ দুর্মদ কবির স্বভাবজ। দুটোতেই রয়েছে অন্তর্নিহিত উল্লাস-সংগ্রামের অঙ্গীকার, কথায় কথায় রক্ত-ঝরানো আর প্রণয় যাচ্ঞায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ অভিমান হতাশ ভাবভেদে একই মনের এপিঠ-ওপিঠ।[১] নজরুলের প্রেম চেতনায় কৈশোরিক অপরিণতি ও আবেগ বাহুল্য রয়ে গেছে। কোন বিষয়কে অবলম্বন করে কোন দার্শনিক উপলব্ধিতে তাঁর উত্তরণ ঘটেনি, অথচ তাঁর মতো শক্তিমান কবিতে তা প্রত্যাশিত ছিল।

এই কৈশোরিক আদর্শ বিলাসবেশে রোমান্টিক বেদনানুভূতির আগ্রহ তার প্রথম যুগের গল্পেও মেলে, "প্রিয়তমের কাছ থেকে আঘাত পাওয়াতে যে কত নিবিড় মাধুরী, তা বেদনাতুর ছাড়া কে বুঝবে?" ব্যথার দান কবিতায়ও রয়েছে এর প্রতিধ্বনি :

একটি শুধু বেদনা মাণিক আমার মনের মণি কোঠায়
সেই তো আমার বিজন ঘরে দুঃখ রাতের আঁধার টুটায়।

বেদনা-বিলাসী নজরুল যদিও গল্পে বলিয়াছেন ঃ 'কামনা আর প্রেম'—দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা, আর প্রেম হচ্ছে ধীর প্রশান্ত ও চিরন্তন (ব্যথার দান)। এ কখনো তাঁর পরিণত বয়সেও অর্থাৎ যৌবনোত্তর বয়সেও বোধগত হয়নি— অন্তত তাঁর কাব্যে তার কোন স্পষ্ট ধারণার নজির নেই। নারীর প্রসন্ন দৃষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য নারীর চরণ চুম্বন তাঁর কাছে নারী বশ করার একটা প্রায়োগিক উপায় ছিল বটে, কিন্তু প্রণয়ক্ষেত্রে নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল না। তাই ক্ষোভে, রোষে অনুযোগে তিনি নারীকে মনের দিক দিয়ে হেঁয়ালি, কুহেলিকা, মায়াবিনী ও ছলনাময়ী বলেই নিন্দা করেছেন বার বার।

জীবনে যখন যৌবন-ক্ষুধা জাগে, তখন ক্ষণে ক্ষণে কাজ ভোলানো যে বেদনা মধুর অনুভূতি মনে দোলা দিয়ে যায়, তার অপরূপ অভিব্যক্তি রয়েছে এ কয়টি চরণে :

১. খুঁজে ফিরি কোথা হতে এই ব্যথা-ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে
আকাশ ও বাতাস, ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে
কাঁদে বুকে উগ্র সুখে যৌবন জ্বালায় জাগা অতৃপ্ত বিধাতা

২. হু হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস উদাস
কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে? (পূজারিণী)

৩. পরাণের ক্ষুধা দেহের দু'তীরে করিতেছে কানাকানি।
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দনা। (ভীরু, জিঞ্জীর)

---

১ 'বাউলতত্ত্ব' – আহমদ শরীফ দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. দূরের প্রিয়া! পাই নি তোমায় তাই এ কাঁদন রোল।
কূল মেলে না, তাই দরিয়ায় উঠিতেছে ঢেউ দোল।
– তোমায় পেলে থামত বাঁশী
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠেছে বাঁশীর রোল।
(গোপন প্রিয়া, সিন্ধু হিন্দোল)

৫. যে-বিরহে গ্রহ-তারা শূন্যে নিশিদিন ঘুরে মরে।
(শীতের সিন্ধু, চক্রবাক)

৬. কী যেন কী নাই কিসের অভাব এ বুকে ব্যথা বিধুর।
(সাজিয়াছি বর, চক্রবাক)

৭. এ কি তৃষ্ণা অনন্ত অপার
কোথা তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথা মোর তৃষ্ণা হরা
প্রেম–সিন্ধু অনাদি পাথার (পূজারিণী)

প্রণয় গান তো মিলনগীতি নয়, মিলনাকাঙ্ক্ষার আকুতিবাহন, অনুরাগের আবেগপ্রসূন, বিরহের-বিচ্ছেদের-প্রত্যাখ্যানের-না পাওয়ার, অবহেলার অনাদরের ক্ষোভের, যন্ত্রণার অনুযোগের ও কান্নার অভিব্যক্তি। তাই প্রণয় কবিতা-প্রেমগীতি মাত্রই বেদনা বিলাস মাত্র। 'জন্ম তার বেদনার দহে', কিংবা পূর্বরাগ-অনুরাগের হৃদয়ারণ্যে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া / এসেছে পরাণ মম....
কত যে বেদনা সে কেহ বুঝে না
কত যে আকুল আশা
কত যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা। (উচ্ছৃঙ্খল, মানসী)

প্রণয় কবিতা বা গান তাই বেদনার কান্নার দীর্ঘশ্বাসের স্মৃতির রোমন্থন মাত্র। তাই, রবীন্দ্রনাথ যেমন মানসীর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন এই উপলব্ধি থেকে যে :

তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে
আজো নাই শেষ রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছ তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীণ
তোমার আঁখির আলো। (কৃতজ্ঞ, পূরবী)

তেমনি উপলব্ধি পরিণামে নজরুলেরও হয়েছিল :

ভালোবাসার ছলে আমায় তোমার নামে গান গাওয়ালে
চাঁদের মতন সুদূর থেকে সাগরে মোর দোল খাওয়ালে।
কাননে মোর ফুল ফুটিয়ে উড়ে গেলে গানের পাখী
যুগে যুগে আমায় তুমি এমনি করে পথ চাওয়ালে। (বনগীতি)

'অনামিকা' কবিতায় কবি স্বীকারই করেছেন যে বিরহেই প্রেমানুভূতির স্ফূর্তি ও পূর্তি ঘটে। কবি তাই প্রেম পেয়েও মিলনের মধ্যেও সে বিরহবোধের অনুশীলন করেছেন : 'স্বপ্নসহচরী/ আমার পাওয়ার বুকে না পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া, অনন্ত যৌবনা বালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরন্তন বাসনা সঙ্গিনী/সৃষ্টি-দিন হতে কাঁদ বাসনার অন্তরালে বসি/ ধরা নাহি দিলে দেহে'।

প্রণয়ানুভূতির বিভিন্ন অভিব্যক্তির অনুষঙ্গ ও অবলম্বন হিসেবে বার বার প্রকৃতিও এসেছে। এবং সে-সব উপমারূপক উৎপেক্ষার সৌন্দর্যের দ্যুতি, পেলবতার স্নিগ্ধতা, এবং সুভাষণের চমকও রয়েছে :

১. পুবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউ-এর বনে দীঘল শ্বাসে
২. স্বপন পারের বিদেশিনীর হিম ছোঁওয়া যায় নয়ন চুমে।
৩. আকাশ-ডোবা বিদায় ব্যথা।
৪. আলো রাধা যে-কালোতে নিত্য মরণ যাচে।
৫. তিমির প্রদীপ জ্বালো।
৬. দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির লাগি।
৭. সেথায় আঁধার-বাসর-ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি।
৮. শুনিবে আমারি সেই ক্রন্দন, সে গান প্রভাতে সাঁঝে।
৯. যে-বিরহে গ্রহতারা শূন্যে নিশি দিন/ঘুরে মরে।
১০. সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাকবে নত চোখে।
১১. ব্যথায় বিবশ গুলঞ্চ ফুল/ মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল।
১২. উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া।
১৩. পথ চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়।
১৪. আজি নীপ-বালিকার ভীরু শিহরণে
যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছলছল মুখে
কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে –
তোমারে পড়িছে মনে।
১৫. তাল-তমালের বুকে কাছে কে ব্যথিত দাঁড়িয়ে আছে।
ভেজা-পাতায় ঐ কাঁপে তার আদুল ঢলঢল কায়া।
তার ছায়া দোলে অতল কালো শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়
আমলকী বন ঝিমায় ব্যথায় ঘনায় গগন সীমায়।
১৬. হয়তো তোমার পাব দেখা
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা।
১৭. আজ দিগ বালিকার আঁখি পাতা অনেক দূরের কানন-ছায়ে
কাঁপছে অভিমানে।
১৮. ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়/ নামলো কাজল-কালো মায়া
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায় তারি সজল আলো-ছায়া।
১৯. ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস মাঠের মত।
২০. হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত।
২১. অস্ত আকাশ অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি/ কাঁদিতেছে চাঁদ।
২২. ঝাউ শাখে সিক্ত বায়ু রিক্ততার বাণী/ কয়ে গেল, দুলে দুলে কাঁদিল বনানী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রূপ বহু বহু চোখ-ছোঁয়া উপমা রূপক উৎপেক্ষা 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি' রূপে সুষম ব্যবহারে উজ্জ্বল হয়ে মুক্তোর মতো, হীরের টুকরোর মতো তাঁর কাব্যাঙ্গ ও সঙ্গীতে ছড়িয়ে রয়েছে। লক্ষণীয় যে-মন প্রকৃতির এরূপ দেখে তার নিবাস চোখের কোলেই। নজরুলে 'টক বগিয়ে খুন হাসে' শ্রেণীর বিমূর্ত অনুভূতি-প্রতীক 'বাকপ্রতিমা' সুলভ নয়,-বিরল বলেই দুর্লক্ষ্য।

সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থগুলো বাদ দিলে নজরুল রচিত প্রেম বিষয়ক কবিতার সংকলন রয়েছে দোলন চাঁপায় (১৯২৩), ছায়ানটে (১৯২৪), পুবের হাওয়ায় (১৯২৫), সিন্ধু হিন্দোলে (১৯২৭), চক্রবাকে (১৯২৯), এবং নতুন চাঁদে (১৯৪৫)। কবি রচিত প্রেমের কবিতার সবগুলো আন্তরিকতায়, বক্তব্যে, ভাব-সৌন্দর্যে সমমাত্রার ও সমমাপের নয়। দোদুল দুল (প্রিয়ার রূপ, বাদল দিনে প্রভৃতি ছায়ানটের অনেক কবিতা) জাতীয় কবিতা ছন্দ সৃষ্টির বা ধ্বনি মাধুর্য পরীক্ষার কাব্য। প্রণয়তত্ত্বালোচনায় এগুলো নিতান্ত তুচ্ছ। সুন্দর কবিতা হচ্ছে বেলাশেষে, পথহারা, ব্যথাগরব, উপেক্ষিত, অবেলার ডাক, অভিশাপ, আশান্বিতা, পিছু ডাক প্রভৃতি। আর ভালোয়-মন্দয়, তালে-বেতালে, আবেগে-উচ্ছ্বাসে স্ববিরোধে-রসাভাসে কবির প্রেম দর্শন হচ্ছে 'পূজারিণী' কবিতা।

ছায়ানটের চৈতী হাওয়া অনুরাগ স্মৃতি মধুর সুন্দর কবিতা। বেদনা-অভিমান, নিশীথ-প্রীতম, অবেলায়, হারমানা হার, লক্ষ্মীছাড়া, শেষের গান, চিরন্তনী প্রিয়া, পরশ পূজা, অনানতা, শায়ক-বেঁধা পাখী, হারামণি, প্রতীক, মানসবধূ, দহন-মালা, বিদায় বেলায়, মরমী, মুক্তিবার, প্রতিবেশিনী, ছল-কুমারী, স্তব্ধ বাদল, (পূবের হাওয়াও ঝড় নয়, রূপ মোহ) আলতা স্মৃতি প্রভৃতি ভালো ও মাঝারি কবিতা।

'পূর্বের হাওয়া' হালকা ও কৃত্রিম রচনার সমষ্টি। সিন্ধু হিন্দোলের প্রথম কবিতা সিন্ধুর তিনটে তরঙ্গই হচ্ছে কবির বিরহ বিলাপ কাব্য। সিন্ধুতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে কবি স্বচিত্তের ক্ষোভ, রোষ, অপমান, ব্যথা ও যন্ত্রণা পরিব্যক্ত করেছেন। ভাব-ভাষা, ছন্দ অলঙ্কার ঋদ্ধ হয়ে উর্মিমুখর সমুদ্রের মতো গর্জনে কিংবা আর্তনাদে যেন ছটফট করছেন। নানা ত্রুটি, অতিশয়োক্তি ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও এ তিন-তরঙ্গ-কবিতার একটা সামগ্রিক সৌন্দর্য রয়েছে যা পড়তে ও শুনতে ভালো লাগে। 'অনামিকা' 'পূজারিণী'র মতোই অপর একটি প্রণয়তত্ত্ব কবিতা। কবিকে জানা-বোঝার জন্যে জরুরী ছিল এমনি কবিতা। অন্যান্য ভালো কবিতা হচ্ছে গোপন প্রিয়া, ছন্দগুণে-পাঠ্য হচ্ছে বাসন্তী, ফালগুনী ও মাধবী প্রলাপ কবিতা তিনটে। চক্রবাকেও রয়েছে ভালো কবিতা :

হয়তো জাগিয়া দেখিব প্রভাতে, আমারি আঁখির আগে
তুমি যাচিতেছ নবীন সাথীর প্রেম নব অনুরাগে।

তোমারে পড়িছে মনে, স্তব্ধরাতে, বাতায়ন-পাশ, গুবাক তরুর সারি, কর্ণফুলী, শীতের সিন্ধু, পথচারী, মিলন মোহনায়, গানের আড়াল, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, হিংসাতুর, সাজিয়াছি বর, মৃত্যুর উৎসবে, অপরাধ শুধু মনে থাক, আড়াল, নদী পারের মেয়ে, নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতা। অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বটে, তবে 'চক্রবাক'ই নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রণয় কবিতার সংকলন কাব্য,-এ কাব্য এক কথায় কবির প্রণয় ঘটিত দীর্ঘশ্বাসের কাব্য। বেদনা-বিধুর ও স্মৃতি রোমন্থন-মধুর এ কাব্যও নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ও উচ্চমানের কবিত্বের নিদর্শন। নতুন চাঁদ কাব্যের 'চিরজনমের প্রিয়া' এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার কবিতা তুমি' নামের কবিতা দুটোও স্মরণীয়। এর পরে কবির উক্তি অমোঘ বাস্তব হয়ে উঠেছিল :

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না
কোলাহল করি সারাদিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিস্বভাব ও তাঁর প্রেম-তৃষ্ণা 'পরিক্রমা' শেষ করলাম। কবি মাত্রই 'রূপসীরে করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালোবাসে কবি'। তাই তিনি বলেন–

কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়
চিরকালের প্রিয়া আমায় ডাকছে ইশারায়! (এ মোর অহঙ্কার)

আমরা নজরুলের কাব্যে কবির দৃষ্টিতে সেই রূপসীর ও প্রেয়সীর রূপ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলাম। নজরুল ছিলেন অশেষ শক্তিধর কবি। তাই তাঁর প্রতি পাঠকের মনোযোগ বেশি, প্রত্যাশা অশেষ। সে কারণে তাঁর ত্রুটিও ভক্ত-স্বজনের উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত ক্ষোভের, বেদনার, সমালোচনার ও অনুযোগের বিষয় হয়। আমাদের আলোচনায়ও সেই অনুযোগই প্রাধান্য পেয়েছে। ঝড় লাগে মহীরুহে, দূর্বাকে তা স্পর্শও করে না, বড়ো কবির তিলমাত্র ত্রুটি তাল হয়ে, তুচ্ছ ভুল উচ্চ হয়ে ওঠে–সর্বাঙ্গ অপরূপ-অসামান্য-অনন্য বলেই সামান্য খুঁতও দৃষ্টি এড়ায় না।

AMARBOI.COM

নজরুলের কবিভাষা ঃ পুরাণ ও প্রকৃতি

মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুভাষণাসক্তি তার সহজাত স্বভাবের অন্তর্গত। তাই মানবসত্তার স্বাতন্ত্র্যের গোড়া থেকেই সে সৌন্দর্য চর্চা করে আসছে প্রায় অচেতন, অবচেতন ও সচেতনভাবেই। দৃষ্টি-গ্রাহ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্য থেকেই সে সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করে। এক্ষেত্রে প্রাকৃত পদার্থ ও জীব-উদ্ভিদই ছিল গোড়া থেকেই তার আদর্শ ও অনুকরণীয়। আভাসে-ইঙ্গিতে যখন মনের সব অনুভূতির, আকাঙ্ক্ষার ও প্রয়োজনো বিষয় সাথী, সহচর ও সহকর্মীকে জানাতে বোঝাতে পারত না, তখন এঁকেই প্রমূর্ত করে তার মনের কথা, প্রয়োজনের কথা জানিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। এর ফলেই সে হয়েছে চিত্রী, চিত্র-লিপির উদ্ভবও ঘটেছে এভাবেই। এঁকে বস্তু বা বস্তু সম্বন্ধীয় নির্দেশ দেয়া সহজ না হলেও ছিল সম্ভব। আমার জন্যে আম পেড়ে দাও— এটা হাত চোখ-মুখের ইঙ্গিতে বোঝানো সম্ভব। কাছের ও পাশের মানুষকে, কিন্তু দূরের মানুষের বেলায় এ পদ্ধতি অচল। আবার কাছের-পাশের কিংবা দূরের মানুষকে মনের বিমূর্ত অনুভূতি জানানো-বোঝানো ছিল অসম্ভব। যেমন, সেই আদিম ও চির-জিজ্ঞাসা, জগৎ কি? জীবন কি? এ প্রশ্ন ভাষা তথা ধ্বনি উচ্চারণ ছাড়া করা সেদিনও সম্ভব ছিল না–আজো সম্ভব নয়। কাজেই প্রত্যক্ষ মানুষকে চক্ষুগ্রাহ্য জীব-উদ্ভিদ-বস্তু প্রভৃতি জাতীয় বিষণ্ন চোখ-মুখ-হাতের ভঙ্গি দিয়ে কিছু কিছু জানানো-বোঝানো সম্ভব হলেও বাদ-বাকি অসংখ্য মনের কথা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবের কথা, প্রয়োজনের কথা, অতীত-ভবিষ্যতের কথা অনুপস্থিত মানুষকে তো নয়ই, উপস্থিত মানুষকেও জানানো-বোঝানো যেত না।

প্রকৃতি থেকে ধ্বনি সংগ্রহ ও অনুকরণ করে চারপাশের দৃশ্য সবগুলোর নাম দিয়ে বা নমুনা নির্দেশ করা সম্ভব হলেও বিমূর্ত ভাব প্রকাশক ধ্বনি সৃষ্টি করা সহজ ছিল না কখনো। মনন-মনীষার অনুশীলনে ও বিকাশের ফলে ক্রমে ভাষার প্রকাশশক্তি বাড়তে থাকে। ফলে বুনো-বর্বর ও ভব্য সমাজে ভাষার প্রকাশশক্তি সম্ভব শব্দ-সম্ভারের সংখ্যাগত ও ব্যঞ্জনাগত পার্থক্য আসমান-জমিনের মতো ব্যাপক ও গভীর হতে থাকে বটে, কিন্তু ভাষায় শব্দ সৃষ্টিতে ও শব্দকে ব্যঞ্জনাঋদ্ধ করতে বুনো-বর্বর ও ভব্য সমাজে আগ্রহের ও প্রয়াসের অভাব ছিল না কখনো।

এজন্যেই মানুষের অলক্ষ্যে মানুষেরই অচেতন, অবচেতন ও সচেতন সৌন্দর্যপ্রীতি মানুষের ভাষায় ব্যঞ্জন-ঋদ্ধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপকল্প, রূপক, ঘরোয়া আটপৌরে ব্যবহারেও ঠাঁই করে নিয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যায় নিতান্ত তুচ্ছ কথাও আমরা রূঢ়তা, অশ্লীলতা, স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা এড়িয়ে সৌন্দর্যের ও সুভাষণের আবরণেও আভরণে জড়িয়ে ব্যক্ত করি। 'চাল নেই' এ শূন্যতার লজ্জা কিংবা রূঢ়তা এড়িয়ে 'চাল বাড়ন্ত' কিংবা 'বরকত' বলা, পায়ের মলাদির নির্দেশ করতে মজলিসে 'শির-খাড়ু' বলা বা গরু গালে দেয়া, দুটো ভাত নাকে-মুখে দেয়া, বুকে বা পিঠে ছুরি বসানো, দুটো চাল ফুটিয়ে নেয়া, মাথায় হাত বুলানো, পিঠ চাপড়ে দেয়া, কিছু মুখে দেয়া, খরচ করা, চোখ বুলানো, এক গ্লাস পানি গড়িয়ে দেয়া, লোক না থাকা, জমিতে লাঙল দেয়া, ঘর করা, ঘর বাঁধা, ঘর ভাঙা, মাছে-ভাতে থাকা, ডাল-ভাত জোটা, গা করা, গা জ্বালা, পিত্তি জ্বলা, এমনি প্রায় প্রত্যেকটি ঘরোয়া কথা সালঙ্কার উচ্চারণ করি। বাতাসের মধ্যে ডুবে থেকেও যেমন আমরা তার অস্তিত্ব ভুলে থাকি, তেমনি সালঙ্কার সুভাষণে আমাদের উচ্চারিত ভাষা নামের ধ্বনিকে সজ্জিত ও আবৃত রেখেও আমরা তা' কখনো সচেতনভাবে লক্ষ্যই করিনে।

মানুষের সৃষ্ট এক একটা শব্দ বলতে গেলে এক একটা কবিতার মতোই আবেগ, অনুভূতি, মনন ও মনীষাসাধ্য সৃষ্টি। যেমন চাঁদকে সুধাংশু, হিতাংশু, শশধর, শশাঙ্ক, শাশোদর নামে অভিহিত করতে সৌন্দর্যানুভূতির, কল্পনার, আবেগের, শিল্প-দৃষ্টির, মননের, মনীষার ও সৃষ্টিশীল শক্তির প্রয়োজন হয়েছে।

সম্ভবত কৌতূহলীর দৃষ্টির পর্যবেক্ষণ প্রবণতা থেকেই হেঁয়ালি বা ধাঁধার উদ্ভব। জিজ্ঞাসু মন ও দৃষ্টি দিয়ে ব্যক্তির, বস্তুর, প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার এবং তা অন্য জনের দৃষ্টিগোচর ও চিত্তগত করার জন্যেই ওই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গত লক্ষণগুলো ঘুরিয়ে 'প্যাঁচিয়ে বর্ণনা করে কিংবা সংজ্ঞাবদ্ধ করে উপস্থাপন করে অন্যের কৌতূহল ও প্রতিযোগী চেতনা উদ্রিক্ত ও উদ্দীপিত করাই ছিল হেঁয়ালি বা ধাঁধা তৈরীর উৎসাহের মূলে। ধাঁধাজাতীয় ছড়া-বচনের উদ্ভব ঘটে সম্ভবত এভাবেই। দৃষ্টির সঙ্গে মনের, মননের, বিস্ময়ের, আবিষ্কারের আনন্দের, রসবোধের এবং সর্বোপরি সৃষ্টি-সামর্থ্যের ও আবেগের যোগ না থাকলে এমনি ভূয়োদর্শন-প্রসূন মিলত না। এক হিসেবে ধাঁধা-হেঁয়ালির বিকাশেই কবিতার উদ্ভব বলা অসমীচীন নয়। বৈদিক-শ্লোকে-সুক্তে হেঁয়ালির সমগুণই বর্তমান। মানুষের জিজ্ঞাসু ও রস-দৃষ্টিতে যা কিছু অনন্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়করররূপে ধরা পড়েছে, যা কিছু পঞ্চইন্দ্রিয় গোচর হয়ে জ্ঞানের ও উপলব্ধির বিস্তার ঘটিয়েছে, যা কিছু অনুভূত হয়ে মৌহূর্তিক আবেগ সৃষ্টি করেছে, তা-ই মানুষের বক্তব্য হয়ে চিত্তলোকে সঞ্চিত হয়েছে, এবং বাণীবদ্ধ হয়ে অভিব্যক্তি পেয়ে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে তা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশেছে।

কবি মনীষীরা হচ্ছেন প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার মানুষ। তাই তাঁদের স্বকালের মানুষ তাঁদের বুঝতে পারেন না। এ জন্যেই উঁচু মানের নতুন চিন্তা কিংবা নতুন মাত্রার, আঙ্গিকের ও বক্তব্যের নতুন কবিতা স্বকালের অধিকাংশ পাঠককে কেবল চটিয়েই দেয়। আমাদের কালেও তাই নতুন চিন্তা প্রসৃত সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি সহজে পাঠক-গ্রাহ্য হয় না। মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র এবং নজরুলাদি ত্রিশের লেখকরা, কিংবা রামমোহন-অক্ষয়কুমার এবং কম্যুনিস্ট লেখকরা তাই ছিলেন অনেক কাল নিন্দিত। এবং নিন্দার কারণগুলো অযৌক্তিক ও হাস্যকর বলে একালে বিনা তর্কেই বাতিল হয়ে গেছে। আজো অভিনব ও তির্যক রূপক-রূপকল্প-বাকপ্রতিমা হেঁয়ালির মতোই অজানা অবোধ্য অর্থশূন্য প্রলাপোক্তি বলে প্রতীয়মান হয়; যেমন অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ, সাতটি তারার তিমির, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন, তিমির প্রদীপ, ঘুমের সবুজ বন, টগবগিয়ে খুন হাসে, পাখির নীড়ের মতো চোখ, একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে। ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী। চিকুরের পাকা ধানে, –এমনি বহু বহু বাকপ্রতিমা বা রূপপ্রতীক স্বল্পসচেতন পিছিয়ে পড়া পাঠককে বিরক্ত-বিরূপ করে। নতুনাভিসারী শক্তিমান তরুণ কবি-লেখকরা নতুন নতুন ভাবকল্প, রূপপ্রতীক, সাংকেতিক বাকপ্রতিমা সূক্ষ্মতর রূপ ও রস সাদৃশ্যভিত্তিক শব্দাবয়ব তৈরী করে বয়স্ক পাঠকদের অনীহা জাগান। কিন্তু পরপ্রজন্মের পাঠকদের যেন ওই সব জটিল রূপকল্প জন্মসূত্রেই এসে যায় আয়ত্তে।

কবিতাদি সাহিত্য হচ্ছে কলা। তাই কলা স্রষ্টার কাজই হচ্ছে তুচ্ছকে উচ্চ, উচ্চকে তুচ্ছ করে, প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ করে, বাস্তবকে রূপকাশ্রিত করে, সরলকে জটিল করে, ক্রূর-কুৎসিতকে সুন্দর করে, অপ্রিয়কে প্রিয় করে, কঠিনকে কোমল করে, প্রয়োজনকে আকর্ষণীয় করে, সত্যকে যৌক্তিক করে, বিষয়কে সুমিষ্ট করে, তিক্তকে তরল করে, এবং 'ভর্ৎসনাকে ব্যঙ্গে, নিন্দাকে বিদ্রূপে লোকগ্রাহ্য রস-রুচি জড়িত করে পরিবেশন করা। অভিব্যক্তির মাধুর্য, শোভনতা, যৌক্তিকতা অলঙ্কার যোগে মনোজ্ঞ করে তোলাই হচ্ছে শিল্পকর্ম। কাজেই সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্যে বক্তব্যের সালঙ্কার প্রকাশই হচ্ছে কবিত্ব। এক্ষেত্রে মানে, মাত্রায়, সূক্ষ্মতায় ও সৌন্দর্যে যাঁর রচনা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে তিনিই পান শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান, শ্রদ্ধা ও খ্যাতি। তাঁর কাব্যই হয় সর্বজন স্বীকৃতমানের। এ জন্যেই শ্রেষ্ঠত্বের অন্য এক পরিমাপক হচ্ছে কবি-ভাষার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিশীল অনন্যতা। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল এবং নতুনতর ধারায় জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণুদে ও সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের কবি-ভাষা স্বল্পশক্তির কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আবার এসব প্রধানরাও দেশী-বিদেশি শক্তিমান ও জনপ্রিয় প্রখ্যাত কবিদের অনুকরণ-অনুসরণ করেছেন। যেহেতু এমনি প্রভাব ও অনুকরণ স্বাভাবিক ও আত্ম-নির্মাণে আবশ্যিক এবং চিরকাল ঐতিহ্য নামে এ প্রভাব স্বীকার আবর্তিত হয়েই আসছে সব সাহিত্যে, সেহেতু অবিকল নকল নিন্দনীয় ও অপরাধ হলেও আত্মীকরণে সাফল্য ব্যক্তিক কৃতিত্ব রূপেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়করক্রপে ধরা পড়েছে, যা কিছু পঞ্চইন্দ্রিয় গোচর হয়ে জ্ঞানের ও উপলব্ধির বিস্তার ঘটিয়েছে, যা কিছু অনুভূত হয়ে মৌহূর্তিক আবেগ সৃষ্টি করেছে, তা-ই মানুষের বক্তব্য হয়ে চিত্তলোকে সঞ্চিত হয়েছে, এবং বাণীবদ্ধ হয়ে অভিব্যক্তি পেয়ে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে তা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশেছে।

কবি মনীষীরা হচ্ছেন প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার মানুষ। তাই তাঁদের স্বকালের মানুষ তাঁদের বুঝতে পারেন না। এ জন্যেই উঁচু মানের নতুন চিন্তা কিংবা নতুন মাত্রার, আঙ্গিকের ও বক্তব্যের নতুন কবিতা স্বকালের অধিকাংশ পাঠককে কেবল চটিয়েই দেয়। আমাদের কালেও তাই নতুন চিন্তা প্রসূত সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি সহজে পাঠক-গ্রাহ্য হয় না। মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র এবং নজরুলাদি ত্রিশের লেখকরা, কিংবা রামমোহন-অক্ষয়কুমার এবং কম্যুনিস্ট লেখকরা তাই ছিলেন অনেক কাল নিন্দিত। এবং নিন্দার কারণগুলো অযৌক্তিক ও হাস্যকর বলে একালে বিনা তর্কেই বাতিল হয়ে গেছে। আজো অভিনব ও তির্যক রূপক-রূপকল্প-বাকপ্রতিমা হেঁয়ালির মতোই অজানা অবোধ্য অর্থশূন্য প্রলাপোক্তি বলে প্রতীয়মান হয়; যেমন অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ, সাতটি তারার তিমির, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন, তিমির প্রদীপ, ঘুমের সবুজ বন, টগবগিয়ে খুন হাসে, পাখির নীড়ের মতো চোখ, একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে। ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী। চিকুরের পাকা ধানে, —এমনি বহু বহু বাকপ্রতিমা বা রূপপ্রতীক স্বল্পসচেতন পিছিয়ে পড়া পাঠককে বিরক্ত-বিরূপ করে। নতুনাভিসারী শক্তিমান তরুণ কবি-লেখকরা নতুন নতুন ভাবকল্প, রূপপ্রতীক, সাংকেতিক বাকপ্রতিমা সূক্ষ্মতর রূপ ও রস সাদৃশ্যভিত্তিক শব্দাবয়ব তৈরী করে বয়স্ক পাঠকদের অনীহা জাগান। কিন্তু পরপ্রজন্মের পাঠকদের যেন ওই সব জটিল রূপকল্প জন্মসূত্রেই এসে যায় আয়ত্তে।

কবিতাদি সাহিত্য হচ্ছে কলা। তাই কলা স্রষ্টার কাজই হচ্ছে তুচ্ছকে উচ্চ, উচ্চকে তুচ্ছ করে, প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ করে, বাস্তবকে রূপকাশ্রিত করে, সরলকে জটিল করে, ক্রূর-কুৎসিতকে সুন্দর করে, অপ্রিয়কে প্রিয় করে, কঠিনকে কোমল করে, প্রয়োজনকে আকর্ষণীয় করে, সত্যকে যৌক্তিক করে, বিষয়কে সুমিষ্ট করে, তিক্তকে তরল করে, এবং 'ভর্ৎসনাকে ব্যঙ্গে, নিন্দাকে বিদ্রূপে লোকগ্রাহ্য রস-রুচি জড়িত করে পরিবেশন করা। অভিব্যক্তির মাধুর্য, শোভনতা, যৌক্তিকতা অলঙ্কার যোগে মনোজ্ঞ করে তোলাই হচ্ছে শিল্পকর্ম। কাজেই সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্যে বক্তব্যের সালঙ্কার প্রকাশই হচ্ছে কবিত্ব। এক্ষেত্রে মানে, মাত্রায়, সূক্ষ্মতায় ও সৌন্দর্যে যাঁর রচনা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে তিনিই পান শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান, শ্রদ্ধা ও খ্যাতি। তাঁর কাব্যই হয় সর্বজন স্বীকৃতমানের। এ জন্যেই শ্রেষ্ঠত্বের অন্য এক পরিমাপক হচ্ছে কবি-ভাষার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিশীল অনন্যতা। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল এবং নতুনতর ধারায় জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণুদে ও সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের কবি-ভাষা স্বল্পশক্তির কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আবার এসব প্রধানরাও দেশী-বিদেশি শক্তিমান ও জনপ্রিয় প্রখ্যাত কবিদের অনুকরণ-অনুসরণ করেছেন। যেহেতু এমনি প্রভাব ও অনুকরণ স্বাভাবিক ও আত্ম-নির্মাণে আবশ্যিক এবং চিরকাল ঐতিহ্য নামে এ প্রভাব স্বীকার আবর্তিত হয়েই আসছে সব সাহিত্যে, সেহেতু অবিকল নকল নিন্দনীয় ও অপরাধ হলেও আত্মীকরণে সাফল্য ব্যক্তিক কৃতিত্ব রূপেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশান্তরে অলঙ্কার নতুন রুচির লাবণ্যে, নতুন তাৎপর্যের ঐশ্বর্যে ও নতুন ব্যঞ্জনার সম্পদে নতুনতর সত্তালাভ করে, নতুন হয়ে ওঠে। এজন্যেই আলির জুলফিকার, পরশুরামের কুঠার কিংবা 'মাইন, টর্পেডো, বোমা' একই উদ্দেশ্যে একই যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে। এ-কালে ইংরেজী সাহিত্যে টি. এস. এলিঅটে, বাঙলায় মধুসূদনে, নজরুল, বিষ্ণুদে, সমর সেনে পুরাণপ্রীতি বেশি। এঁদের মধ্যে নজরুলে পুরাণ প্রয়োগ সব চেয়ে অধিক। অলঙ্কার ভাবেয় নিষ্ঠ-নির্দিষ্ট বাহন-ভাবমূর্তির অবয়ব সজ্জার আভরণ। আর সূচিত শব্দ হচ্ছে নির্মাণের উপকরণ—ইট-পাথর-চূর্ণ-সুরকী চিনর মাটি।

নজরুল ইসলাম দেদার আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দ আর বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন তাঁর বিদ্রোহ-বিপ্লবাত্মক উদ্দীপনা-উত্তেজনা-প্রেরণা-প্রবর্তনা সঞ্চারক কবিতায় ও গানে। নজরুল ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে শত শত মাইল দূরে করাচিস্থ নিরাপদ সামরিক জীবনে ফারসী ভাষা-সাহিত্যের বিশেষ করে হাফিজ-উমরের কাব্যানুশীলন করেছিলেন, আর মুসলিম হিসেবে ঘরোয়া ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে নিত্য ব্যবহৃত আরবী-ফারসী বহু বহু শব্দ তো জানাই ছিল তাঁর। ফলে আয়ত্ত ও ঐতিহ্যসূত্রে অজস্র আরবী-ফারসী শব্দের সঞ্চয় ছিল তাঁর। আর শক্তিমান স্বভাবকবি হিসেবে সুপ্রয়োগে ছিল তাঁর সহজাত নৈপুণ্য। এসূত্রে উল্লেখ্য যে ভারতে তথা বাঙলায় একটি আরবী শব্দও সোজাসুজি বাঙলা ভাষায় প্রবেশাধিকার পায়নি। সব আরবী শব্দই ফারসী ভাষাভুক্ত হয়েই গৃহীত হয়েছে বাঙলা ভাষায়। কারণ স-অর্থ আরবী শব্দের তথা ভাষার সঙ্গে লিখিত বাঙলা না-জানা মাদ্রাসায় পড়া আলিমদেরই হয়েছিল পরিচয়—তা-ও মানে-মতলবে ফারসী-উর্দু ভাষায়, লিখিত হাসিয়ার টীকা-ভাষ্য মাধ্যমে। তাই ভারতীয়দের বা বাঙালীদের গোড়া থেকেই কখনো আরবীর সঙ্গে আজ-অবধি প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়নি। প্রমাণ ইসলামে বিশ্বাসের মৌল শর্ত ও স্বীকৃতিমূলক শব্দগুলোই ইরান হয়ে ফারসী ভাষায় তর্জমা হয়ে এসেছে। আল্লাহ্, রসুল-নবী, জান্নাত, জাহান্নাম মলক, মসলিম, মুমীন, লায়লা প্রভৃতি খোদা, পয়গম্বর, ভেহেস্ত, দোজখ, ফেরেস্তা, মুসলমান, ইমানদার, শব প্রভৃতি হয়েই চালু হয়েছে আমাদের মধ্যে। 'আরবী' ভাষা ও ইসলাম যাদের চোখে অভিন্ন, তাদের এ-ও জানা উচিত যে আরবী ও ইব্রীয় বা হিব্রু ভাষা বাঙলা-উড়িয়া-আসামীর মতো ঘনিষ্ঠ ও অভিন্ন মূল এবং কতেকাংশে আরামীয়ও (সিরীয় ভাষা) ভাষা প্রভা-প্রভাবিত। 'আল্লাহ' আরামীয় শব্দ, ইলাহ্-ইলাহি হচ্ছে আরবী এবং ইলোই হচ্ছে হিব্রু এবং প্রাচীন ইব্রীয় হচ্ছে ইয়াহভা (যেহোভা)। এবং এ মুহূর্তেও আরবী ইহুদী, খ্রীস্টান ও মুসলিমদের মাতৃভাষা। আর ইহুদী-খ্রীস্টান শাস্ত্র-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য যেহেতু ইসলামের চেয়ে যথাক্রমে আড়াই হাজার ও পাঁচশ বছরের প্রাচীন, সেহেতু আরবী ভাষায়-সংস্কৃতিতে ওদের প্রভাব ও দান বেশি। সাক্ষ্যস্বরূপ এ সূত্রে মুসলিম শাস্ত্রে ও আচারে-আচরণে 'সুন্নত-ই-ইব্রাহিম'-এর প্রভাব ও গুরুত্ব স্মর্তব্য।

আবার এ-ও লক্ষণীয় যে নজরুল যত্রতত্র আরবী-ফারসী-হিন্দি শব্দ প্রয়োগ করেন নি। ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক কবিতায় ও গানেই কেবল সচেতনভাবে মুসলিম শাস্ত্র-সংস্কৃতির আচার-আচরণের পরিবেশ সৃষ্টি লক্ষ্যেই ওই সব শব্দ ব্যবহৃত। কিংবা 'বিদ্রোহী'র মতো কিছু উদ্দীপনাজনক কবিতায় হিন্দু-মুসলিম-পুরাণ-ঐতিহ্য সাধ্যমত সমভাবে প্রয়োগের প্রয়াস রয়েছে। অন্যান্য কবিতায় বাঙলা কবিতার ভাষা দৈশিক, চালু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রীতি অবলম্বন করেছেন কবি। নজরুল এমনি ভাষারীতির বা বিদেশী শব্দ প্রয়োগরীতির প্রবর্তকও নন। আঠারো শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি— সম্ভবত গোটা মধ্যযুগেরও —ভারতচন্দ্র রায় তাঁর অন্নদামঙ্গলের মানসিংহ খণ্ডে এবং সত্য নারায়ণ পাঁচালি রচকগণ ফারসী-হিন্দী মিশ্রিত বাঙলা তৈরী করতে থাকেন যথাক্রমে মুসলিম শাসকের দরবারী আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে ও অবাঙালী মুসলিম পীর-নারায়ণ সত্যের ও তাঁর চেলাদের কথোপকথনে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত মিশ্রভাষা দেখানোর জন্যেই। এমনি হিন্দুস্তানী মিশ্রিত বাঙলা ব্যবহার করেছেন হাওড়া-হুগলী-কোলকাতার-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে অবাঙালী বংশধর বটতলা সাহিত্য লিখিয়েরা। এ ভাষা ও সাহিত্য দোভাষী-ভাষা ও দোভাষী সাহিত্য নামে অভিহিত। এ দোভাষী রীতির অন্যতম ভাষা হিন্দুস্তানীতে আগেই ফারসী-আরবী শব্দ গৃহীত ও আত্মীকৃত হয়েছিল, দোভাষীতে কোন নতুন ফারসী-আরবী শব্দ সরাসরি গৃহীত হয়নি। কাজেই আরবী-ফারসী-হিন্দী-সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণ থাকলেও ওই মিশ্ররীতির দোভাষী নাম অসঙ্গত নয়। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম বিষয়ক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার দেদার ফারসী (ও তৎভুক্ত আরবী) শব্দ ব্যবহার করেছেন মুসলিম জীবন ও সমাজ প্রতিবেশ সৃষ্টির কাব্যিক প্রয়োজনে। (দিলদার, নাদির শাহ, নূরজাহান, আরঙ্গজেব, রুবাই, বেদুঈন, ইরানী, গজল প্রভৃতি কবিতায়)।

অতএব, নজরুল এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এঁদেরই অনুসরণ করেছিলেন। আশৈশব মুসলিম মোল্লা ঘরে ও সমাজে লালিত বলেই ওই দুই হিন্দু কবির কৃত্রিম অনুশীলনে ও প্রয়োগে যে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা ছিল, তা নজরুলের সুনিপুণ সহজ প্রয়োগে দেখা যায় নি। 'দাঁড়ি মুখে সারী গান লাশরিক আল্লা'--এমনি চরণই তো মুগ্ধ ও গুণগ্রাহী মোহিতলালকে নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পরে জীবনানন্দ দাশও তাঁর প্রথম দিককার কবিতায় মোহিত-নজরুলের অনুকরণে, অনেক আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার করেন। এও লক্ষণীয় যে নজরুলে নতুন আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের প্রয়োগ বেশি নেই, পুরোনো প্রচলিত শব্দই বেশি, তবু তাঁর প্রয়োগে এগুলোর জৌলুস এবং চমক বেড়েছে, আমাদের সাহিত্য পাঠক বাঙালীর অনভ্যস্ত চোখে-মনে আকস্মিক ঝিলিক দেয় বলে।

অবশ্য নজরুলেও যে আরবী-ফারসী-হিন্দীর সর্বত্র সুপ্রয়োগ রয়েছে, তা নয়, মাঝে মধ্য অসঙ্গতি ও অর্থান্তর ঘটেছে প্রয়োগে। নজরুলের কবিতায় অর্থগত বা ভাব ও ব্যঞ্জনাগত অসঙ্গতি বিরল নয়। দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

(ক) নীলসিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,—
আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।

দুটো চরণই ধ্বনি-সুন্দর কবিতাঙ্গ। কানে ভালো লাগে বলেই, অর্থগ্রাহ্য হল কি-না, সে-কথা মনেই জাগে না। এবং এ দুটো চরণ আদপেই বাঙলা নয়। হিন্দি-উর্দু কবিতাংশ মাত্র। যেহেতু বাঙালীরা সাদৃশ্যসূত্রে হিন্দি বোঝেই, সেহেতু এ চরণ দুটোর ধ্বনি-মাধুর্য তাদের মন হরণ করে, মুগ্ধচিত্তে ভাষা সম্বন্ধে প্রশ্নই জাগে না। তাছাড়া আসমান তো নীল বা নীলাভ থাকবেই, হরিৎ বা দুনিয়াটাই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘর্ষে রক্তলাল-পলাশ-লাল হয়। কারবালা হত্যা-কাণ্ডে দুনিয়া তা-ই হয়েছে। এখানে চির অপরিবর্তিত নীল আকাশের উল্লেখের সঙ্গতি বা সার্থকতা কি। দ্বিতীয় চরণে খুন ও খুনিয়া যথাক্রমে হত্যা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যাকারী অর্থে ব্যবহৃত। যদিও খুন-সঙ্গে রক্ত এবং খুনিয়াতে খুন-এর সঙ্গে বাঙলা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে রক্তপাতকারী বা হত্যাকারী অভিধা লাভ করেছে।

(খ) হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
কন্টক-মুকুট শোভা।

কবিতায় ব্যক্ত বিলাপোক্তির, আর্তনাদের ও কান্নার সঙ্গে সূচনায় পরিব্যক্ত এ উপলব্ধি বা সিদ্ধান্তের সঙ্গতি আছে কি।

–কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর।
মোর অধিকার আনন্দের নাহি নাহি।
দারিদ্র্য অসহ পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ।
আমার দুয়ার ধরি।
ও যেন কাঁদিছে শুধু নাই কিছু নাই।

শোর, সালাম কামাল, সাব্বাস, শমসের, দুষমন, একদম, বুজদিল, বিলকুল, সাফ, পাঁও, তুক্, খুন, হর্দম, যিগর, আসমান, আজাদ, বদ্নসিব, বরাত, খাবার, কল্লা, মুর্গী, তাজী, মর্দ, গাজী, মোল্লা, কুলমুলুক, নেস্তনাবুদ, জের, গোস্বা, পিরহান, জোর, শহীদ, দোস্ত, কলজে, কসাই, জান, খুবসুরৎ, ময়দান, জালিম, মুর্দা, কিল্লা, ফলে, পরওয়া, বেহেস্ত, রৌশন, জামাল, জোশ, শোহরত, নওয়াজি, আব, জমজম, জানোয়ার, সালাম, জখমী, সিপাহ্সালার, কালাম, দিলওয়ার, তলওয়ার, আফসোস, বখ্ত, সুমসাম, দুনিয়া, দিল, জিঞ্জির, খিঞ্জীর, গিদ্ধড়, গর্দান, জোরওয়ার, জেরবার, মুশকিল, কঞ্জুস, হুঁস, বেইমান, বিয়াবান, পস্তান, দরিয়া, দিকদার, লোহ্, সম্ঝায়, পঞ্জা, কবজা, খুন, দিলীর, গোর্দা, শেরবব্বর, কোরবান, দ্বীন, খোশরোজ, রোজ, আমামা, গোস্তাখীর, জুলফিকার, হায়দারী, হাঁক, গুল, কিয়ামত, জান্নাত, শাফায়ত, জোরবার, আরশ, লাল, পয়মাল, বরবাদ, কাৎরা, আফতাব, মর্শিয়া, জহুর, কমবখ্ত, দাদ্, নকীব, তসলিম, আওয়াজ, মুঝদা, আঞ্জাম, তাঞ্জাম, ফিরদৌস, হাম্মাম, বাগেবাগ, কওসর, তামাম, সামান, মশগুল, গুলজার, গুলসান, গুলফাম, তেগ, খুশী, হুরী, নূর, কুরসী, সবজা, জীন, ওক্ত, সাবেঈন, তাবেঈন, জওহর, খারেজিন, গওহর, মারহাবা, বান্দা, বোরহান, রুহ, দরদ, নার্গিস, নালা, দরাজ, দস্ত, মাহবুব, কবুতর, হাসব, জুলুম, সওদাগর, ফজুল, নজুম, সিজদা, রহম, দুম্বা, প্রভৃতি বিভাষার শব্দের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়-প্রতিবেশে সুষম ও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ ব্যবহার রয়েছে নজরুলের কাব্যে ও গানে।

নজরুলের কবি ভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সূচিত শব্দের সুবিন্যাস প্রবণতা। অনুপ্রাসে নজরুলের আসক্তি ছিল প্রবল। কবিতায় অর্থ-গৌরবের চেয়ে, ধ্বনি মাধুর্য তাঁর অধিক কাম্য ছিল। তবু শক্তিমান কবি বলেই তাঁর তৈরী দ্বি-শাব্দিক (দ্বৈশাব্দিক), ত্রিশাব্দিক, (ত্রৈশাব্দিক) কিংবা বহু-শাব্দিক বাক্প্রতিমা, কিংবা চরিত্রলক্ষণ হয়েই কবিতার চরণে চরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছে। যেমন শাস্ত্র-শকুন, মন-মৌমাছি, বোলতা-ব্যাকুল, শরম-শাড়ি, মন-মৃগ, মানুষ, মেষ, কশাই-কঠিন, তুফান-তাজী, কান্না-কাতর, তেজ-তপন, শোক-সাহারা, শাওন-সাঁজ কিংবা পরশ-সুধা, মুক্তি-তোরণ, খোদা-কোদ-দেমাকী, আঁখি-পাখী, খুন-রঙিন, বসন-শাসন অথবা পুরুষ-পরশ-সুধা, কুকুর-কুরু-নেতা, মরণ-হরণ-শরণ, চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন, থিরবিজুরী-উজল, সুচিত সুষম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর সুপ্রযুক্ত বাক্-খণ্ড। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে জিঞ্জীর কাব্যান্তর্গত 'সুবহ্ উম্মেদ' (পূর্বাশা) নামে গোটা কবিতাটি সযত্নে অনুপ্রাস-সজ্জিত; নজরুল কাব্যের ও গানের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের মধ্য মিল ও অনুপ্রাস সুলভ।

কবির এ দ্বিশাব্দিক, ত্রিশাব্দিক ও বহুশাব্দিক বাক্-খণ্ড তৈরীর বন্ধন সূত্র হয়েছে 'হাইফেন'। নজরুলের এ 'হাইফেন' প্রীতি মজ্জা-গত। এ আবেগপ্রবণ কবি কিছুতেই এক শব্দে তাঁর অনুভবের আবেগ ও স্বরূপ পূর্ণভাবে যেন অভিব্যক্ত করতে পারছেন না। প্রকাশের আকুলতা থেকেই যেন এক একটি বাক্খণ্ডের জন্ম। ব্যাকুল বিচলিত কবি 'আপনি না বুঝে, বুঝাতে পারে না' গোছের উদ্বেলিত অবস্থায় এসব বাক্খণ্ড তৈরী করেছেন। তাই এ কবিভাষা তাঁর কবি স্বভাব থেকেই উৎসারিত। এ-ও বাঙলা সাহিত্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক। কেননা, এটি কবির বিশেষ মানস-লক্ষণের পরিচায়ক। গোড়া থেকেই 'হাইফেন'-কবলে পড়েছিলেন, তাই কেবল কবিতা নির্মাণে নয়, কাব্য নাম চয়নেও 'হাইফেন'-কে করেছেন অবলম্বন ঃ অগ্নি-বীণা, দোলন-চাঁপা, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, প্রলয়-শিখা, মরু-ভাস্কর। গদ্য গ্রন্থের নামও 'হাইফেন' বদ্ধ : বাঁধন-হারা, মৃত্যু-ক্ষুধা। গান ও সংকলন গ্রন্থগুলোও ঃ নজরুল-গীতিকা সুর-সাকী, বন-গীত, গুল-বাগিচা প্রভৃতি। অবশ্য সীমিত সংখ্যায় মোহিতলালে এবং গোড়ার দিকে অনুকারক জীবনানন্দ দাশেও 'হাইফেন' প্রয়োগে বাক্খণ্ড নির্মাণ ও প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য প্রয়োজনে দু'দশটা এমনি হাইফেনবদ্ধ শব্দাবলী সবার রচনায় মেলে। সংগ্রামপ্রসূন রণ-রক্ত-অগ্নিপ্রতীক বাক্খণ্ড বা বন্ধনে তাঁর নির্মিত বাক্খণ্ড উত্তেজিত মানুষের আবেগ চালিত অনর্গল বক্তৃতার মতো করে তুলছে তাঁর কবিতাগুলোকে। আবেগের উত্তাপে মুখে যেন তাঁর খই ফুটছে, পটকার মতো গর্জে উঠছে যেন এক একটি কথা। যেমন অগ্নিঋষি, বহ্নি-বাগ, অগ্নি-মরু, অগ্নি-সুর, রক্ত-শিখা, প্রলয়-নেশা, বজ্র-শিখা, রক্ত-তড়িৎ, বজ্র-গান, রৌদ্র-রুদ্র, অগ্নি-পাথার, রোষ-হুতাশন, রক্ত-তড়িৎ, বজ্র-গান, রৌদ্র- রুদ্র, অগ্নি-পাথর, রোষ-হুতাশন, রক্ত-অশ্ব, অগ্নি-ফণী, রক্ত-পাথার বহ্নি-বীর্য প্রভৃতি যেমন তাঁর চিত্রকল্প নির্মাণ দক্ষতার পরিচায়ক, তেমনি অসম্বৃত আবেগেরও প্রমাণক। নজরুলের দ্রোহ-বিপ্লব-সংগ্রাম-ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জন, শোষণমুক্তি, দুঃশাসনের অবসান, কুসংস্কার বর্জন, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয়- সাম্প্রদায়িকতার বিলুপ্তি প্রভৃতি লক্ষ্যে। এসূত্রে মনে রাখা দরকার যে এ হচ্ছে কবির মসী-যুদ্ধ। মসী-অসির মতো তাৎক্ষণিক ফলপ্রসূ। যেহেতু নজরুল ইসলামের প্রত্যয়ে ও আস্থায় দৃঢ়তা কিংবা একনিষ্ঠতা ছিল না, সেহেতু বিশৃঙ্খলা-বিতীপ বিশ্বাস ও সংকল্প, আদর্শ ও লক্ষ্য অবিরলভাবে তাঁর রচনায় হর-হামেশা অভিব্যক্তি পেয়েছে। এতে অমনোযোগী ও নিষ্ঠ পাঠক বিভ্রান্ত হয়।

কবিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নজরুল প্রাচীন প্রচলিত ধারার সঙ্গে তাঁর সমকালীন প্রতিষ্ঠিত কবিদের প্রভাব ও রীতি যেমন তাঁর স্বীকৃতি পেয়েছে, তাঁর সমবয়সী সহযাত্রীদের নতুনতর মত-পথের ও ভাষা-ভঙ্গির তাঁর উপর প্রত্যাশিত প্রভাব পড়েনি। পড়লে নজরুল চেতনা আরো কিছুটা প্রসারিত, সূক্ষ্মায়িত ও পরিমার্জিত হত, এবং কাব্যের আঙ্গিকে ও শব্দ বিন্যাসে যুদ্ধোত্তর নতুন কালের নতুন আবরণ ও আভরণ শোভা পেত। ব্যতিক্রমও অবশ্যই আছে, যেমন–রৌদ্র দ্বন্দ্বের গান, তেমন একটি প্রতীক রূপক রচনা যা আধুনিক ও নিখুঁত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোর লাগি জাগে ফুল
নদী ধায় সাগর যেমন
চকোর চায় চাঁদ, চাতক মেঘ
যারে চায় তারেই চায় এ মন।

চাঁদ-চকোর, চাতক-জলদ, চখা-চখীর বিরহ, চাঁদের কলঙ্ক প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে হিন্দু-পুরাণ ও মুসলিম ঐতিহ্য মিশ্রিত হয়ে তাঁর কাব্য নতুন লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে বটে, তবে সবটাই অতীতাশ্রয়ী হওয়ায়, উপমাদি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কবির পশ্চাৎ-চেতনা যত প্রকট, সম্মুখ দৃষ্টি তত স্পষ্ট নয়। যদিও তাঁর এ অতীতাবলম্বন কেবল বর্তমানকে নির্মাণ ও ব্যাখ্যা করার জন্যেই।

ঐতিহ্যের বা পুরাণের প্রয়োগ কাব্যে দু'ভাবে হতে পারে, এক তাৎপর্য ও ব্যাঞ্জনাঋদ্ধ শাস্ত্র-সংস্কৃতিপ্রতীক শব্দ প্রয়োগে আর কবিতার বিষয়ে ও ভাবে ঐতিহ্যের কিংবা পুরাণের সামষ্টিক বা সামগ্রিক আবহ সৃষ্টিতে। সামগ্রিকতার নমুনা এরূপ :

হারুত-মারুত ফেরেশতাদের গৌরব রবি-শশী
ধরার ধুলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি।
(পাপ। সাম্যবাদী)

বা উর্‌জ্ য়্যামেন নজদ হেজাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহ্‌রান স্মরি কাহার বিরাট নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হিহি সাল্লাম'।
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুরপরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম
টরে কাঁখের কলসে কওসর ভর
হাতে আর জমজম জাম।

(ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম)

এবং এলকি আল্-বিরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী
খুশীর এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিঁরী
লাল-এ লায়লি লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালী
(খোশ আমদেদ। জিঞ্জীর)

আবার, খালেদ মুসা আনল কি খুন-রঙিন ভূষা।
(ভোরের সানাই। সন্ধ্যা)

আবু বকর ওসমান ওমর আলী হায়দার
দাঁড়ী এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মল্লা
দাঁড়ী মুখে সারি গান 'লাশরিক আল্লা'।
(খেয়াপারের তরণী)

কিংবা বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক আজমে করেছে ধন্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীর প্রসূদেশ হল বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দমীর মর্দবীর
শাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে শিকল পদ্ধতির।

(শাত-ইল-আরব)

এবং স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচিপুত্র হল মহাবীর দ্রোণ
কুমারীর ছেলে বিশ্বপূজ্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ
কানীন পুত্র কর্ণ হৈল দানবীর মহারথী
স্বর্গ হইতে পতিত গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়
তাঁদেরি পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণামে যায়।
| মুনি হল শুনি সত্যকাম সে জারজ ওই লালা-শিশু|
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার-মহাপ্রেমিক সে যিশু।

(বারানা। সাম্যবাদী)

অন্যত্র মথুরায় গিয়া শ্যাম রাধিকায় ভুলেছিল যবে
বন-মাঝে একাকিনী দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে
বিষাদিনী শকুন্তলা কেঁদেছিল এই সুরে বনে
সঙ্গোপনে। (পূজারিণী)

অথবা দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত-শতদলবাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বর ধারিণী মা
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা। (রক্তাম্বরধারিণী মা)

আর ঐ ডম্বরু-ঢোলে ডিমিডিমি বোলে
ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দ্যোলে,
যম-বরুণ কি কল-কল্লোলে চলে উতরোলে
ধ্বংসে মাতিয়া, তাথিয়া তাথিয়া
নাচিয়া রঙ্গে। চরণ-তঙ্গে
সৃষ্টি সে টলে টলমল। (আগমনী)

আবার বিদ্রোহী, কোরবানী, ঝড় প্রভৃতি কবিতায়ও সাম্যবাদী কাব্যে ঘটেছে হিন্দু-মুসলিম এতিহ্য-পুরাণের মিশ্রণ :

১. এই রণভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহাগীতা
এই মাঠে হল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।

২. আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর বিশ্বের সম্পদ। (সাম্যবাদী)

৩. ভূলোক দ্যুলাক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি
বিশ্ববিধাত্রীর
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার
আমি ইস্রাফিল শিঙ্গার মহাহুঙ্কার!
আমি পিনাক-পাণির ডম্বরু, ত্রিশূল
ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ
আমি প্রণবনাদ প্রচণ্ড।
আমি ক্ষ্যাপা-দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র শিষ্য।
তাজি বোররাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
ধরি বাসুকীর ঝাপটি
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি।
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী। (বিদ্রোহী)

বাক্যে তো বটেই, বিশেষ্যে বা নামপদেও চিত্রকল্পের ও ঐতিহ্যের বিশেষ্য বা দূর-বিথারী ব্যঞ্জনা থাকে। যেমন– ওঙ্কার, দুর্বাসা, কৃষ্ণ, সীতা, ঊষা, চণ্ডী, কালী, দশমহাবিদ্যা, পলাশী, পানিপথ, পরশুরামের কুঠার, হিমাদ্রি, আরশ, কুরশী, শাত-ইল-আরব, কোরবানী, টর্পেডো, মাইন, চেঙ্গিস, যমুনা, পিনাক-পাণি, ত্রিপুরারি, গৈরিকবস্ত্র, লাল-ঘোড়া, ত্রিনয়ন, প্রণবনাদ, শয়তান, হায়দরী হাঁক, মদন, শহীদ, জুলফিকার, শিব, হর, রুদ্র, দুলদুল, আমামা, মর্সিয়া, বৃন্দাবন, পদ্ম, রক্তজবা, গোলাপ, মন্দির-মসজিদ-গির্জা-মঠ-বিহার-সিনাগগ, উউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরিঁ-ফরহাদ, নল-দময়ন্তী, সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতি তার প্রমাণ।

বাক্যে ঃ দাও দুশমন দুর্গ-বিদারী দু'ধারী জুলফিকার।
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার।
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী।
ছিল একদিন, —আমার সোহাগে গলিয়া যমুনা হতে
নিবেদিত নীল পদ্মের মত ভাসিতে প্রেমের স্রোতে।
নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রুজলে।
ছুটিয়া চলিছে মরু-বকৌলি নীল দরিয়ার পানি।
মরু-সাইমুম-তাঞ্জামে চড়ি কোন পরীবানু আসে ।

কবিতায় ছন্দস্রষ্টা সূচিত শব্দের সুষম ধ্বনির অর্থাৎ অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের পরেই তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ শব্দের ভূমিকা নির্ধারিত। এ ভূমিকা মুখ্যত উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা। অলঙ্কার ও চিত্রকল্প, রূপক-সাংকেতিক আবহ এবং প্রতীকী বাকপ্রতিমা নির্ভর। প্রতীচী প্রভাবিত আধুনিক গীতি কবিতায় উপমাদি অলঙ্কার, চিত্রকল্প ও বাকপ্রতিমা প্রভৃতির প্রধান অবলম্বন প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথে আমরা তা-ই দেখতে পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির অবয়বের অন্তরে নিহিত ও অবলিপ্ত বিমূর্ত রূপকেই রবীন্দ্রনাথ মানস-গোচর করে তুলেছেন। আর সত্যেন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন বস্তুর রূপের জৌলুস। মোহিতলাল প্রিয়া ও পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধকে জীবন ও যৌবন সম্পদ রূপে বরণ করে বহিরূপের ও বহির্জগতের মূল্য-মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন্ আর নজরুল সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল আর রবীন্দ্রনাথ কবির সাধ্যানুসারে অনুসৃত হয়েছেন। তবে যেহেতু স্থিতি ও স্থিরতা, ধীরতা ও নীরবতা এবং প্রশান্তি ও প্রসন্নতা ছিল নজরুলের স্বভাব বিরুদ্ধ, সেহেতু আবেগতাড়িত নজরুলে পূর্বসূরির প্রকৃতি, বস্তু ও ঐতিহ্য-চেতনা কবিতার অঙ্গে ও অন্তরে রণ-রক্ত-বন্যা-খরা-অগ্নি-মহামারী-ঝড়-ধূমকেতু প্রভৃতির গতি-প্রকৃতি, রীতি-নিয়ম, রোষ-ক্ষোভ, দ্রোহ-বেদনা, রূপ-স্বরূপ নিয়ে বিচিত্রভাবে তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে অবলীলায় ও অনায়াসে। তাই কবি স্বয়ং বলেন, 'কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা' এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলতে চেয়েছি। আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি, ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না।' (কবি নজরুল : আতাউর রহমান, ১ম সং, পৃঃ ২৬/১৯৬৮)

'আমি যা ভাল বুঝি, যা সত্য বুঝি, শুধু সেইটুকুই প্রকাশ করব।'

(ধূমকেতুর পথ)

'আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে– যা মিথ্যা কলুষিত পুরাতন, পচা– সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।' (উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, আতাউর রহমান, পৃঃ ২৭)

'আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কন্যা' (শিখা গোষ্ঠীর আবুল হোসেনকে লিখিত পত্র)

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর
বিপ্লব দেবতা ঐ শিয়রে তোমার
পথে পথে খুঁড়িয়াছে মিথ্যার পরিখা
চোখে মুখে লিখিয়াছে ভণ্ডামীর নীতি-বাণী-লিখা

কোনদিক দেখি নাই চলিয়াছি আগে
লঙ্ঘি বাধা লঙ্ঘিয়া নিষেধ
মানিনিকো কোরান-পুরাণ-শাস্ত্র মানিনিকো বেদ।

এত দায়িত্ব, এত ব্রত ও এত চিত্তবিক্ষোভ নিয়ে কবিতা রচনা করতে হয়েছে বলেই কবি সংযত আবেগে চাপা উচ্ছ্বাসে মনীষা প্রয়োগে মননের ও মনস্বিতার সংমিশ্রণে নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত ও কল্পনা-মনন-মনীষা বিজড়িত কবিতা রচনা করার মতো ধৈর্য ও অবসর আয়ত্তে রাখতে পারেন নি। স্বভাবকবি বলেই 'প্রকৃতি' কবির সংবেদনশীল হৃদয়-মন হরণ করেছিল, ভরে তুলেছিল। বিশেষত প্রেমের শান্ত-সুন্দর পেলব প্রকৃতি সহমর্মিতায় ও সহানুভূতিতে কবির নিত্যসাথী।

কাব্য-শরীর গড়ে তোলে ছন্দ, অলঙ্কার হচ্ছে কাব্যের স্বাস্থ্য ও লাবণ্য আর কাব্যিভূত অনুভব, উপলব্ধি ও মনীষাই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ। সে-জন্যেই অলঙ্কার হচ্ছে কবি ভাষা। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার-উপমা-রূপক-উৎপেক্ষা-শ্লেষ-যমকাদির সঙ্গে চিত্রকল্প ও তার অনুষঙ্গ প্রতীক। বাক্প্রতিমা ও প্রতী কী সংকেতাদি মিলে যে সহৃদয় ব্যক্তির সংবেদনশীল মনে আক্ষরিক মানের অতিরিক্ত আনন্দ-বেদনার যে-কল্লোল-কোলাহল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্তলোকে অনুরনণ তোলে, তা হচ্ছে শক্তিমান কবির শিল্প-সুন্দর কবিতার অবদান। এ যে অভিধাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য এ-ই হচ্ছে কবিসৃষ্ট কবিভাষা, কবিতার ভাষা। কবিতা পাঠে বাচ্যার্থের বাইরে এ অনির্বচনীয় অনুভূতিকে বা অনুরণনকে দেশী-বিদেশী আলঙ্কারিকরা ব্যাঙ্গার্থে, বক্রোক্তি (ভামহ) Hightened Language (ক্রিস্টোফার কড্ওয়েল) কবির কাজই হচ্ছে শব্দে তাঁর আবেগ ও অভিপ্রায় আরোপ করা। এ আবেগ প্রসূত ও রোম্যান্টিক কল্পনাজাত অভিপ্রায় যুক্ত হয়ে শব্দ বা বাক্‌খণ্ড হয়ে ওঠে এক একটি প্রমূর্ত খণ্ডচিত্র যা মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে তাই কাব্যের সংজ্ঞা হচ্ছে 'রসাত্মক বাক্যম' কাব্যম 'এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য হচ্ছে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' পরম উপলব্ধির ও চরম প্রাপ্তির সুখ ও আনন্দ। অতএব কাব্যরস আনন্দস্বরূপ।

জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
স্নিগ্ধ সজল মেঘ কজ্জ্বল দিবসে।
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী রজনী।
চল্‌চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।
নির্বাণহীন অঙ্গারসম নিশিদিন শুধু জ্বলে।

এ চরণগুলো পড়ামাত্রই এক একটি ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। যেহেতু রবীন্দ্র অলঙ্কারের আকর ছিল প্রকৃতিই, সেহেতু রবীন্দ্রনাথের কিছু অলঙ্কার, চিত্রকল্প ও বাক্‌প্রতিমা আদর্শ হিসেবে এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে রবীন্দ্র-চেতনা বিমূর্ত অনুভব বিহারী, তাই তাঁর তৈরি অলঙ্কারও রোম্যান্টিক কল্পনা-মনীষা-মনন ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ সম্ভব ও সম্ভূত।

AMARBOI.COM

১। ঘিরি তার চারপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে সাগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার। (বিজয়িনী)

এখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের :
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজে ছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী,
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি। (শাশ্বতী ঃ অর্কেস্ট্রা স্মর্তব্য)

২. বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকাশি।
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।

৩. (পদ্মা) শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি সায়াহ্ন আলোকে শুয়ে আছে। (মানসসুন্দরী)

৪. তোমারি কটাক্ষ ঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে।
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু--মাঝে তরঙ্গের দল
শস্য শীর্ষে শিহরিয়া উঠে ধরার অঞ্চল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তব স্তানহার হতে নভস্তলে পড়ে তারা–
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষো মাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা (উর্বশী)

৫. একবিন্দু নয়নের জল। কালের কপোল তলে শুভ্র সমজ্জ্বল এ তাজমহল।
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
প্রেমের করুণ কোমলতা। ফুটিল তা। সৌন্দর্যের পুষ্প
পুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে। (শাহজাহান)

৬. মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি। (বলাকা)
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল
তৃণ দল
মাটির আকাশ' পরে ঝাপটিছে ডানা। (বলাকা)

৭. যেন দীর্ঘ জলচর। রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে।
বক্রশীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্য ক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো। (সুখ ঃ চিত্রা)

৮. (ঐ আসে) ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

৯. শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস। কলাপের মতো করিছে বিকাশ
(নববর্ষা)

১০. নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে।
(ক্যামেলিয়া ঃ পুনশ্চ)

১১. আমার ভালবাসা। যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের
মতো (হারানো মন-শ্যামলী)

১২. বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎ চঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখীর মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠলো যেন কেশর ফোলা সিংহ।
(পৃথিবী ঃ পত্রপুট)

এবার নজরুলের রোম্যান্টিক অনুভবে-চেতনায় ও কল্পনায় চেতন-প্রকৃতির রূপ-স্বরূপ :

১. আকাশ-গাঙ্গে জাগবে জোয়ার। রঙের রাঙা বান।

২. দুধ-হাসি হাসে হে হেথা সদা কচি ঘাস
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ।

৩. উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া।

৪. তরুণ নয়নসম আকাশ আনীল।

৫. পাখী উড়ে, আঁকা যেন আকাশ-পটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. শ্রাবণ মেঘের আড়াল টানিয়া গগনে কাঁদিছে রবি।

৭. বাজ পড়া তালতরুসম এক বৃন্তহীন। দাঁড়ায়ে বৃদ্ধ মত্তালিব।

৮. পড়ে গো উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়
সে বেড়ায় হীরক নড়ে। আলো তার ঠিকরে পড়ে।

৯. খুঁজে ফিরি কোথা হতে এই ব্যথা-ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে
আকাশ বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্তঘন দীর্ঘশ্বাসে।
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা।

১০. কালো মেয়ের কাজল চোখের পাগল চাওয়ার ইঙ্গিত।

১১. পান করে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র শারাব।

১২. এবার আমার জ্যোতিগেহে তিমির প্রদীপ জ্বালো
আনো অগ্নি-বিহীন-দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো।

১৩. নয়ন আমার তামস তন্দ্রালসে। ঢুলে পড়ুক সবুজ রসে।

১৪. নিখিল-গহন-তিমির-তমাল গাছে ;
কালো কালার উজল নয়ন নাচে,
আলো-রাধা যে কালাতে নিত্য মরণ যাচে
ওগো আনো আমার সেই যমুনার জলবিজুলির আলো।

১৫. বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর।

১৬. সেথা যেতে নারে বুঢঢা পীর। শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর।

১৭. তবুও বিদায়-পথে কাননে কাননে কদম কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে।

১৮. দিবা চলে যায় বলাকা-পাখায়। (বুলবুল)

১৯. হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত।

২০. সবুজ শোবার ঢেউ খেলে যায়–
হেমন্তের ঐ শিশির নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠল মেতে।

২১. কুমারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রুসম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।

২২. (মেঘরূপী সিন্ধু) হেসে ওঠে তৃণে শস্যে-দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে হিম-কণা আনন্দাশ্রু ভার।

২৩. সাঝের আকাশ মায়ের মতন ডাকবে নত চোখে।

২৪. ঘর দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস মাঠে।

২৫. বেদনা-হলুদবৃন্ত কামনা আমার
শেফালীর মত শুভ্র সুরভি বিথার
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম।
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছল ছল
করে ওঠে সার হিয়া শিশির সজল
টলটল ধরণীর মত করুণায়।
ম্লান মুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের গানে, গদ্যে এবং কবিতায় এমনি অসংখ্য মুক্তোর মতো, হীরক খণ্ডের মতো, চুমকীর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অলঙ্কার। নজরুলের রচনায় সামগ্রিক ও সামষ্টিক সৌন্দর্য-সামঞ্জস্য কম বটে, কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্য অঢেল অজস্র।

আগেই বলেছি, কাব্যদেহের ভিত্তি বা কাঠামো হচ্ছে ছন্দ। কাজেই ছন্দই হচ্ছে কাব্য-শরীর আর সে-শরীরের স্বাস্থ্য হচ্ছে অলঙ্কারের লাবণ্য এবং কাব্যের প্রাণ হচ্ছে অনুভব-কল্পনা-মনীষার সম্মিলিত ও সমন্বিত দীপ্তি। এরূপে ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার যোগে কবিতা হয়ে ওঠে এক নিখুঁত নিটোল রূপের ও রসের প্রতিমা। গাঢ় অনুভবের আবেশে এবং কল্পনার ঔজ্জ্বল্যে আর মনীষার দীপ্তিতে এক একটি কবিতা সেই চিরপুরাতন ফুল-পাখী-প্রেম-প্রকৃতি, মিলন-বিরহ সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও এক একটি অনন্য অপরূপও নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। অতএব ছন্দও কবি-ভাষার অংশ। এ জন্যে আমরা এখানে নজরুলের সৃষ্ট ছন্দের কিছু কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করব মাত্র। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব না।

কবিতার ছন্দের ও সঙ্গীতের সুরের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম কঠিনকেই বরণ করেছিলেন, সহজের প্রতি আসক্ত হননি। মাত্রা-বৃত্ত ছন্দই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। স্বরবৃত্তেও ছিল তাঁর অনুরাগ, অক্ষরবৃত্ত তিনি বলতে গেলে ক্বচিৎই প্রয়োগ করেছেন। গানের জগতেও তিনি ছিলেন রাগ রাগিণীতে ভক্ত। তাঁর গান যেমন রাগ প্রধান, তাঁর শব্দ চয়নও কখনো গানেও তরল ছিল না। উল্লেখ্য যে রবীন্দ্র সঙ্গীত মুখ্যত বাণীপ্রধান, আর নজরুল সঙ্গীত স্বচ্ছত, রাগপ্রধান। গানের বাণীতে রবীন্দ্রনাথ আকাশচারী, আর নজরুল মর্ত্যবিহারী।

AMARBOI.COM

নজরুল ইসলাম যে অসম্বৃত প্রবল আবেগতাড়িত অসংযত বাঁধন ছেঁড়া বিদ্রোহী, বিপ্লবী ছিলেন, নতুনের কাঙ্ক্ষী ছিলেন, পুরোনো নিয়ম শৃঙ্খল ভাঙায় আগ্রহী ছিলেন, তার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর কবিতায় ছন্দ প্রয়োগে এবং সঙ্গীতে সুর যোজনায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো তাঁর উৎসাহ ছিল দেশী-বিদেশী কাব্যে, ছন্দে ও সুরে যে-সব বৈচিত্র্য রয়েছে, সে-গুলো বাঙলায় প্রয়োগ করার। নজরুল ইসলামের আকর্ষণ ছিল মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, কিন্তু তিনি চালু নিয়মে সে-ছন্দ ব্যবহার করেন নি, তাঁর মাত্রাবৃত্ত আবেগচালিত। তাই অসম চরণে, অসম পর্বে, অসম স্তবকে অভিব্যক্তি পেয়েছে কবির আবেগ, উচ্ছ্বাস ও আস্ফালন-ক্ষোভ-রোষ-দ্রোহ কিংবা প্রেম-রণ-রক্ত তৃষ্ণা। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'মুক্তকছন্দ'ই ছিল তাঁর প্রিয়। তাই তিনি অক্ষরবৃত্তে, মাত্রাবৃত্তে ও স্বরবৃত্তে তাঁর উদ্বেলিত হৃদয়ের আর্তি-আকুতি অকুণ্ঠ ভাষায় ও চরণ-শৃঙ্খল-মুক্ত ছন্দে অভিব্যক্ত করেছেন।

আশ্চর্য সাহসের ও সাফল্যের সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত এ তরুণ অসম চরণের ও অসম স্তবকের প্রবহমান মাত্রা-বৃত্তের প্রয়োগে কলম ধরেন। পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয় ও দক্ষতা না থাকলেও এ অসম্ভব হত। তার প্রমাণ তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী কবিরা। বলতে গেলে এ শক্তি অনন্য নয় শুধু, অসামান্যও বটে। তাঁর পছন্দের ছন্দ না হলেও প্রবহমান সমিল কিন্তু অসমচরণের ও অসমপর্বের অক্ষরবৃত্তের 'মুক্তকছন্দ' ব্যবহারেও ছিল এ আবেগচালিত কবির আনন্দ ও নৈপুণ্য।

স্বরবৃত্তের সুনিপুণ প্রয়োগেও তাঁর কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। মাত্রা হ্রস্ব-দীর্ঘ করে উচ্চারণে সযত্ন সচেতনতা তেমন প্রয়োজন হয় না। এ-ও কবির দক্ষতার পরিমাপক ও পরিচায়ক। নজরুলের ধ্বনিচেতনা ছিল প্রবল ও তীক্ষ্ণ। তাই সুষমধ্বনির সৌন্দর্য সৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বৃদ্ধির জন্যে তিনি সর্বত্র অনুপ্রাসের এবং সাধ্যমত মধ্যমিলের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সযত্ন-সচেতন প্রয়াসে তাঁর সৃষ্ট ছন্দে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট। নজরুল কাব্যে ছন্দোগত ত্রুটি বেশি নেই। তবে গোঁজামিল আছে এখানে সেখানে। অসম মাত্রার চরণও কম নয়। এবার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা তুলে ধরছি :

কোথাকার আঁখি হতে সরিল পাষাণ যবনিকা
তারি আঁখি-দীপ্তি-শিখা রক্ত-রবি রূপে হেরি ভরিল উদয়- ললাটিকা
পড়িল গগনঢাকে কাঠি,
জ্যোতির্লোক হতে ঝরা করুণা-ধারায় ডুবে গেল ধরা-মা'র
স্নেহ শুষ্কমাটি,
পাষাণ-পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল—
বাহিরিল কোন্ বার্তা নিয়া পুনঃ মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল।
দৈত্যাগার দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ রোষে হাঁকিল প্রহরী।
কাঁদিল পাষাণে পড়ি
সদ্য ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল!
মুক্তি মার খেয়ে কাঁদে পাষাণ-প্রাসাদ-দ্বারে আহত অর্গল
শুনিলাম, মম পিছে পিছে যেন তরঙ্গিছে নিখিল বন্দীর ব্যথা-শ্বাস—
মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।
(মুক্ত পিঞ্জর। বিষের বাঁশী)

এতে গর্জন নেই বটে, তবে গুরু-গম্ভীর মেঘমন্দ্র আছে, গতি ধীর, কণ্ঠ দৃঢ়, উচ্চারণ স্পষ্ট এবং চিত্র নিখুঁত, নিটোল ও পূর্ণ, বক্তব্য সালঙ্কার ও প্রমূর্ত, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। আর একটি দৃষ্টান্ত :

এত দিনে অ-বেলায়
প্রিয়তম।
ধূলি অন্ধ ঘূর্ণিসম
দিবাযামী
যবে আমি
নেচে ফিরি 'রুধিরাক্ত মরণ খেলায়—
এতদিনে অ-বেলায়
জানিলাম, আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি।
পূজারিণী।
ঐ কণ্ঠ, ও-কপোত-কাঁদানো রাগিণী,
ঐ আঁখি, ঐ মুখ,
ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,
ঐ তব অপরূপ রূপ,
ঐ তব দোলা-দোলা গতি-নৃত্য দুষ্ট দুল রাজহংসীজিনি—
চিনি সব চিনি। (পূজারিণী)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সুদীর্ঘ কবিতাটির সাজানোটা মোটেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ-কাঠামোর মতো নয়। নাটকের সংলাপের মতো এ কবিতায় কোথাও এমন চরণ ও স্তবক রয়েছে, যা আপাত দৃষ্টে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে ভ্রম জন্মে :

খুঁজি ফিরি, কোথা হতে এই ব্যথা-ভাবাতুর মদ-গন্ধ আসে
আকাশ-বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর ঘন দীর্ঘ শ্বাসে।
কেঁদে ওঠে লতাপাতা,
ফুল পাখী নদী-জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা। (পূজারিণী)

অক্ষরবৃত্তের আর দুটো উহাহরণ :

বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ, এত জ্বালা?
কে দিল না প্রতিদান? কে ছিঁড়িল মালা?
কে সে গরবিনী বালা? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান। (সিন্ধু। ২য় তরঙ্গ)

বেদনা-হলুদ বৃন্ত কামনা আমার
শেফালীর মত শুভ্র সুরভি বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
দলবৃন্ত ভাঙশাখা কাঠুরিয়া সম।
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছল ছল
করে ওঠে সারা হিয়া শিশির সজল
টলটল ধরণীর মত করুণায়।
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়।
করুণা নীহার বিন্দু। ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে। স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের কল্যাণের। তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল অমৃতে কি ফল?

এ সমিল নির্বিঘ্ন গতি প্রবহমান পয়ার স্বল্পশক্তির কবির পক্ষে সহজে সম্ভব হয় না। শব্দে-ধ্বনিতে চিত্রকল্পে ও বাকপ্রতিমায় এ অংশ চমৎকার।

এবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন দিচ্ছি :

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস হা-হুতাশ
আমি হুতাশীর!
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চিরগৃহহারা যত পথিকের
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ-জ্বালা প্রিয়-লাঞ্ছিত
বুকেগতি ফের
আমি অভিমানী, চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ
কুমারীর।
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন্‌কন্‌
(বিদ্রোহী)

মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অসম চরণে ও অসম পর্বে মুক্তাক্ষর সমন্বিত কঠিন ও গম্ভীর ধ্বনি সমাবেশে এমনি গর্জন-তর্জন-আস্ফালন ও করুণ-কোমল দরদী উচ্চারণ বাঙলা সাহিত্যে নজরুলের বিশেষ ও অনন্য অবদান। কাব্যক্ষেত্রে নবাগত তারুণ্যে এ সাহস ও সাফল্য, এ আত্মবিশ্বাস ও নৈপুণ্য বিস্ময়কর। চরণগুলোর প্রায় সর্বত্র দৃশ্য ও অদৃশ্য অনুপ্রাসধ্বনি গৌরবেও এ কবিতাকে করেছে অসামান্য নিয়মিত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত কবিতা :

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে –
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন। (খেয়াপারের তরণী)

অথবা, তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান।
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিমান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার। (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

পাঁচ মাত্রার নিখুঁত চাল :

মৃণাল-হাত। নয়ন-পাত
গালের টোল। চিবুক দোল
সকল কাজ। করায় ভুল
প্রিয়ার মোর। কোথায় ভুল ?
কোথায় তুল। কোথায় তুল ?
স্বরূপ তার। অতুল তুল
রাহুর তুল। কোথায় তুল'
দোদুল দুল। দোদুল দুল। (দোদুল দুল। দোলনচাঁপা)

সাত মাত্রার চাল :

আদর-গরগর
বাদর-দরদর
এ-তনু ডর ডর
কাঁপিছে থর থর
নয়ন ঢল-ঢল
সজল ছল-ছল
কাজল কালো জল
ঝরলো ঝর ঝর। (বাদল দিনে। ছায়ানট)

অথবা, নাসায় তিল ফুল
হাসায় বিলকুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়ান ছলছল উদাস
দৃষ্টিচোর চোর
মিষ্টি ঘোর-ঘোর
বয়ান ঢল্‌ঢল্‌ হুতাশ। (প্রিয়ার রূপ। ছায়ানট)

পাঁচ মাত্রার–কিংবা :

রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরম-কথা
পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ঐ শরম-নতা। [ছায়ানট]

বা, চার মাত্রার :

বনে বনে দূরে দূরে
ছল করে সুরে সুরে
এত করে ঝুরে ঝুরে
কে আমায় যাচিল ? (কার বাঁশী বাজিল। ছায়ানট)

স্বরবৃত্ত ছন্দের চটুল চাল :

খেলেগো ফুল্লশিশু, ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়,
পড়েগো উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়।
সে বেড়ায় হীরক নড়ে,
আলো তার ঠিকরে পড়ে।

অথবা, বয়ে যায় গন্ধ শিলায় ঝর্ণা নহর লহরী লীলায়,
যেতে সে খোশবু পানি ছিটায় ফুলের মহলায়।
পাখী সব শিশ্‌ দিয়ে যায় কিসমিসেরই বল্লরীতে,
আকাশ আর বনদেবীতে মন বিনিময় নীল হরিতে

(শৈশবলীলা। মরুভাস্কর)

কিংবা, বাদলা কালো সিন্ধু আমার কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুটলো উষার মুখটি অরুণ ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়,
জমলো আসর বর্ষাবাসর, লাও সাকী লাও ভর-পিয়ালায়

বা, দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপ্টা নাকেই বাজতো সাতটা শাঁখ,
দিদিমা তাই থাবড়া মেরে ধাব্‌ড়া করেছেন
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাড্যাং।

(খাঁদুদাদু। ঝিঙেফুল)

এবং, শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,
নিল ঢেউ-এর ভাঙলে বুক,—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন্ পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন দেবতার কোনসে পাষাণ তল?
(চৈতী হাওয়া। ছায়ানট)

অন্যত্র, তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।
আপন জেনে হাত বাড়ালো—
আকাশ বাতাস প্রভাত আলো,
বিদায় বেলায় সন্ধ্যা-তারা
পূর্বের অরুণ-রবি—
তুমি ভালোবাসো বলে ভালোবাসে সবি। (কবি-বাণী। দোলনচাঁপা)

বা, যেদিন আমি থাকব নাক থাকবে আমার গান
বলবে সবাই, 'কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?
আকাশ ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রা হারা
সখার সাথে জাগবে রাতে, চাইবে আকাশে
আমার গানে পড়বে মনে আমায় আভাসে।
(এ মোর অহঙ্কার। চক্রবাক)

AMARBOI.COM

দেখা যাচ্ছে প্রণয়-কথা স্বরবৃত্তেও ফোটে চমৎকারভাবে। বাক্যে অনুপ্রাস :

১. মরা মরককো মরিয়া হইয়া মাতিয়াছে করি মরণ পণ।
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া। (সুবহ্-উম্মেদ। জিঞ্জীর)

২. আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল
আমি অজয় অময় অক্ষয় আমি অব্যয়। (বিদ্রোহী)

৩. কদম্ব তমাল তাল পিয়াল তলায়
দাদুরীর আদুরী কাজরী। (ঝড়)

৪. গহন বাঁধার আঁধার বাঁধা কারায়।
(পথহারা। দোলনচাঁপা)

৫. নীল নলিনীর নীলিম অণু। (নীলপরী। ছায়ানট)
মধ্যমিল দহন-বনে গহন-চারী (উৎসর্গ। অগ্নিবীণা)
দিলওয়ার তুমি জোর তলওয়ার হানো। (আনোয়ারা। অগ্নিবীণা)
মোরা অসিবুকে ধরি হাসিমুখে মরি। (রণভেরী)
তবে বাজহ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়।
(রণভেরী)
আজ জল্লাদ নয়, প্রহলদ সম মোল্লা খুনবদন। (কোরবানী)
সে কি দমকি দমকি ধমকি ধমকি –
রণ ঝনঝন ঝন রণ রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁকে লাখে লাখে। ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে।
লাল গৈরিক গায় সৈনিক ধায় তালে তালে
তাতা থৈ থৈ থৈ থৈ খল-খল-খল
নাচে রণ রঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে
ধ্বংসে মাতিয়া, তাথিয়া তাথিয়া
নাচিয়া রঙ্গে। চরণ ভঙ্গে। (আগমনী)

প্রায় সর্বত্র অনুপ্রাসের ও মধ্যমিলের কবিতা হচ্ছে 'সুব্‌হ্‌ উম্মোদ' ঃ (জিঞ্জীর)

এল কি আরব-আহবে আবার মূর্ত মর্ত্য-মোর্তজা?
হিজরত করে হজরত ফিরে এল এ মেদিনী মদিনা ফের?
সিজদা করিল নিজ্‌দ হেজাজ আবার কাবার মসজিদে
মাজার ফাড়িয়া উঠিল হাজার জিন্দান-ভাঙা জিন্দা-বীর!
গারত হইল করদ হোসেন—
ঘোষিল ওহদ, 'আল্লা আহদ'—
মনে হল এল ভক্ত বেলাল—
বিরান মুলুক ইরাণও সাহসা। ইত্যাদি।

কবি নজরুর ইসলামের কাব্যের দোষ-গুণ সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি, তা একালের রস-রুচি-চেতনা থেকেই উৎসারিত। আমাদের একালও অবশ্য অবসিত প্রায়, কেননা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে নতুন কালও শুরু হয়েই গেছে।

পঞ্চাশ বছর আগে নজরুল ও নজরুল কাব্যের মূলায়ন পদ্ধতি ও পরিমাপক ছিল ভিন্নরূপ। কালের ধারায় প্রজন্মে প্রজন্মে তাঁর এবং তাঁর কাব্যের ও সঙ্গীতের মূল্যায়নের পদ্ধতি, মান, মাত্রা ও মাপক বদলে গেছে। নজরুল জনপ্রিয় হয়েছেন, তাঁকে হিংসা-ঈর্ষা-ঘৃণা-অবজ্ঞা করার লোক নেই কেউ কোথাও। এখন তাঁর খ্যাতি-প্রভাবিত। এখন নজরুল মুসলিমদের গৌরব গর্বের কবি, ভারতের জাতীয় কবি, গণ-মানবের কবি, গণ-সংগ্রামের কবি, বিদ্রোহর কবি, বিপ্লবের কবি, প্রাচ্যে জাগরণের চারণ কবি, গানের কবি, সুরের কবি, জুলুমমুক্ত মানবতার কবি।

নিরক্ষর-আকীর্ণ দেশে এখনো পুরোনো রস-রুচির মানুষই অধিক। এখনো গণ-মানব শোষণ-শাসন-পীড়ন মুক্তি প্রতীক্ষু। কাজেই নজরুল সাহিত্যের উপযোগ ও ভূমিকা এখনো আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। নজরুলের সঙ্গীত-সুরের সমঝদারও অসংখ্য। অতএব আরো অনাগত অনেকদিন ধরে নজরুল এমনি নিত্য স্মরণীয় ও শরেণ্য হয়ে থাকবেন বাঙলাভাষী সমাজে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট -১

নজরুল গ্রন্থপঞ্জী

(প্রকাশকালানুক্রমিক)			বাঙলা সাল খ্রীস্টাব্দ
১.	ব্যথার দান	(গল্প)	১৩২৮/১৯২২
২.	অগ্নিবীণা	(কবিতা সংকলন)	১৩২৯/১৯২২
৩.	যুগবাণী	(নিবন্ধ)	১৩২৯/১৯২২
৪.	রাজবন্দীর জবানবন্দী	(আদালতে পেশকৃত)	১৩২৯/১৯২২
		(পুস্তকাকারে)	১৯২৩
৫.	দোলনচাঁপা	(কবিতা সংকলন)	১৩৩০/১৯২৩
৬.	বিষের বাঁশী	(কবিতা সংকলন)	১৩৩১/১৯২৪
৭.	ভাঙ্গার গান	(কবিতা সংকলন)	১৩৩১/১৯২৪
৮.	রিক্তের বেদন	(গল্প)	১৩৩১/১৯২৫
৯.	চিত্তনামা	(কবিতা সংকলন)	
		(চিত্তরঞ্জনদাস স্মরণে)	১৩৩২/১৯২৫
১০.	ছায়ানট	(কবিতা সংকলন)	১৩৩২/১৯২৫
১১.	সাম্যবাদী	(কবিতা সংকলন)	১৩৩১/১৯২৫
১২.	পূবের হাওয়া	(কবিতা সংকলন)	১৩৩২/১৯২৬
১৩.	ঝিঙেফুল	(শিশুপাঠ্য কবিতা)	১৩৩২/১৯২৬
১৪.	দুর্দিনের যাত্রী	(নিবন্ধ)	১৩৩৩/১৯২৫
১৫.	সর্বহারা	(কবিতা সংকলন)	১৩৩৩/১৯২৬
১৬.	রুদ্রমঙ্গল	(নিবন্ধ)	১৩৩৪/১৯২৭
১৭.	ফণীমনসা	(কবিতা সংকলন)	১৩৩৪/১৯২৭
১৮.	বাঁধন হারা	(পত্রোপন্যাস)	১৩৩৪/১৯২৭
১৯.	সঞ্চিতা	(নির্বাচিত কবিতা সংকলন)	১৩৩৫/১৯২৮
২০.	বুলবুল	(গীতি সংকলন)	১৩৩৫/১৯২৮
২১.	জিঞ্জীর	(কবিতা সংকলন)	১৩৩৫/১৯২৮
২২.	চক্রবাক	(কবিতা সংকলন)	১৩৩৬/১৯২৯
২৩.	সন্ধ্যা	(কবিতা সংকলন)	১৩৩৬/১৯২৯
২৪.	চোখের চাতক	(গীতি সংকলন)	১৩৩৬/১৯২৯
২৫.	মৃত্যুক্ষুধা	(উপন্যাস)	১৩৩৬/১৯৩০
২৬.	রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	(কবিতা অনুবাদ)	১৩৩৭/১৯৩০
২৭.	নজরুল গীতিকা	(গীতি সংকলন)	১৩৩৭/১৯৩০
২৮.	ঝিলিমিলি	(নাটিকা)	১৩৩৭/১৯৩০
২৯.	প্রলয়শিখা	(কবিতা সংকলন)	১৩৩৭/১৯৩০
৩০.	কুহেলিকা	(উপন্যাস)	১৩৩৮/১৯৩১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১. নজরুল স্বরলিপি	(কিছু গানের স্বরলিপি)	১৩৩৮/১৯৩১
৩২. চন্দ্রবিন্দু	(গীতি সংকলন)	১৩৩৮/১৯৩১
৩৩. শিউলিমালা	(গল্প)	১৩৩৮/১৯৩১
৩৪. আলেয়া	(গীতিনাট্য)	১৩৩৮/১৯৩১
৩৫. সুরসাকী	(গীতি সংকলন)	১৩৩৯/১৯৩২
৩৬. বনগীতি	(গীতি সংকলন)	১৩৩৯/১৯৩২
৩৭. জুলফিকার	(গীতি সংকলন)	১৩৩৯/১৯৩২
৩৮. পুতুলের বিয়ে	(নাটিকা কবিতা সংকলন)	১৩৪০/১৯৩৩
৩৯. সাত ভাই চম্পা	(কবিতা সংকলন)	১৩৪০/১৯৩৩
৪০. গুলবাগিচা	(গীতি সংকলন)	১৩৪০/১৯৩৩
৪১. কাব্যে আমপারা	(কুরআনের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ)	১৩৪০/১৯৩৩
৪২. গীতিশতদল	(গীতি সংকলন)	১৩৪১/১৯৩৪
৪৩. সুরলিপি	(স্বরলিপি সংকলন)	১৩৪১/১৯৩৪
৪৪. সুরমুকুর	(ওই)	১৩৪১/১৯৩৪
৪৫. গানের মালা	(গীতি সংকলন)	১৩৪১/১৯৩৪
৪৬. সিন্ধু-হিন্দোল	(কবিতা সংকলন)	১৩৪১/১৯৩৪
৪৭. নির্ঝর	(কবিতা সংকলন)	১৩৪৫/১৯৩৯

(কবি নির্বাক হওয়ার পরে প্রকাশিত গ্রন্থ)

৪৮. নতুন চাঁদ	(কবিতা সংকলন)	১৩৫১/১৯৪৫
৪৯. মরুভাস্কর	(কাব্যে রসুল চরিত্র)	১৩৫৭/১৯৫১
৫০. বুলবুল	(২য় খণ্ড গীতি সংকলন)	১৩৬৯/১৯৫৩
৫১. সঞ্চয়ন	(নির্বাচিত কবিতা সংকলন)	১৩৬২/১৯৫৫
৫২. শেষ সওগাত	(কবিতা সংকলন)	১৩৬৫/১৯৫৮
৫৩. জুলফিকার	(২য় খণ্ড গীতি সংকলন)	১৩৮৪/১৯৭৭
৫৪. রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	(কাব্য অনুবাদ)	১৩৬৬/১৯৫৯
৫৫. মধুমালা	(নাটক)	১৩৬৫/১৯৬০(১৯৬৫)
৫৬. ঝড়	(কবিতা সংকলন)	১৩৬৭/১৯৬১
৫৭. ধূমকেতু	(নিবন্ধ)	১৩৬৭/১৯৬১
৫৮. রাঙাজবা	(শ্যামাসঙ্গীত)	১৩৭৩/১৯৬৬

দেবীস্তুতি, হরপ্রিয়া, দশমহাবিদ্যা, ইসলামী সঙ্গীতাঞ্জলি এবং

(ক) নজরুল রচনাবলী (১-৫ খণ্ড) আবদুল কাদির সম্পাদিত (১৯৬৬-৮৪)

(খ) নজরুল গীতি (প্রাপ্ত সব গানের সংকলন) আবদুল আজিজ আল-আমান সংকলিত (১৯৭৮)

(গ) নজরুল রচনাসম্ভার (১-৫ খণ্ড) আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত ১৩৭২-৮০ (১৯৬৫-৭৩) (১ম খণ্ড আবদুল কাদির সম্পাদিত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট – ২
নজরুল বিষয়ক গ্রন্থাবলী

১. বাঙলা সাহিত্যে নজরুল — আজহারউদ্দীন খান, ১৩৮০
২. নজরুল জীবনী — আবদুল কাদির, ১৩৪৮
৩. কাজী নজরুল — প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৭৩
৪. কাজী নজরুল প্রসঙ্গে— মুজফফর আহমদ, ১৩৬৬
৫. নজরুল চরিতমানস— সুশীলকুমার গুপ্ত, ১৩৭০
৬. কবি নজরুল—সংস্কৃতি পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৬৪/১৯৫৭
৭. কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, ১৯৭৩
৮. নজরুলের প্রসঙ্গে কারাগারে—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, ১৩৭৭
৯. নজরুল পরিক্রমা—আবদুল আজিজ আল-আমান, ১৩৭৬
১০. জৈষ্ঠ্যের ঝড়—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ১৩৭৬/১৯৬৯
১১. কবি নজরুল—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ১৯৬০
১২. কেউ ভোলে কেউ ভোলে না—শৈলজানন্দ মুখার্জী, ১৩৭৫/১৯৬৮
১৩. আমার বন্ধু নজরুল — ঐ
১৪. নজরুল স্মৃতি— বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, ১৯৭৮
১৫. নজরুল কথা — ঐ ফু ১৩৮০ ফু
১৬. কাজী নজরুল ইসলাম — বসুধা চক্রবর্তী, ১৯৬৮
১৭. নজরুল কথা — শান্তিপদ সিংহ, ১৯৭২
১৮. ধূমকেতুর নজরুল — আবদুল আজিজ আল-আমান, ১৯৭২
১৯. বিদ্রোহী কবি নজরুল — বিশ্ব বিশ্বাস
২০. নজরুল প্রতিভা পরিচিতি — অশোককুমার মিত্র, ১৯৬৯
২১. নজরুল কথা — বিশ্বনাথ দে, ১৩৮০
২২. নজরুল কাব্যগীতি — বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন ঃ বাঁধন সেনগুপ্ত, '৭৬
২৩. নজরুল স্মৃতিমাল্য — হরিপদ ঘোষ, ১৩৮৩
২৪. বিধাতার অভূতপূর্ব সৃষ্টি — জিতেন্দ্রনাথ বানার্জী, ১৯৬৯
২৫. রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাঙলাদেশে — রঘুবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৭২
২৬. Kazi Nazrul Islam — Basatha Chakravarti, 1968
২৭. যাদের দেখেছি — জসীমউদ্দীন
২৮. যাঁদের দেখেছি (২য় পর্ব) — হেমেন্দকুমার, ১৩৫৯
২৯. শ্রদ্ধাস্পদেষু— নলিনীকুমার সরকার, ১৩৬৪
৩০. আত্মস্মৃতি (২য় খণ্ড) — সজনীকান্ত দাস, ১৩৮৪
৩১. কল্লোল যুগ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ১৩৬০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) — সুকুমার সেন, ১৯৭১
৩৩. চলমান জীবন (২য় পর্ব) — পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৬২
৩৪. অতীত দিনের স্মৃতি — আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ১৯৬৮
৩৫. কালের পুতুল — বুদ্ধদেব বসু, ১৩৫৯
৩৬. সাহিত্য চর্চা — ঐ
৩৭. বিদ্রোহী কবি নজরুল — আবুল ফজল, ১৯৭১
৩৮. যুগস্রষ্টা নজরুল — খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, ১৯৬৮
৩৯. নজরুলকে যেমন দেখেছি — শামসুন নাহার মাহমুদ, ১৩৬৫
৪০. নজরুর জীবনের শেষ অধ্যায় — সুফী জুলফিকার হায়দার, ১৯৮৪
৪১. নজরুল পরিচিতি —পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৩৬৬
৪২. আমার শিল্পী জীবনের কথা —আব্বাস উদ্দীন, ১৯৬০
৪৩. অগ্নিবীণা বাজান যিনি — অশোক গুহ, ১৩৭০
৪৪. শব্দধানুকী নজরুর ইসরাম —শাহাবুদ্দীন আহমদ, ১৯৭০
৪৫. নজরুল ইসলাম — মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, ১৯৬৯
৪৬. বিদ্রোহী নজরুল নীরব আজি — সুফী জুলফিকার হায়দার
৪৭. নজরুল কাব্যে শব্দ— শাহাবুদ্দীন আহমদ
৪৮. নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা — মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ১৯৬৩
৪৯. বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য — মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ১৩৭২
৫০. নজরুল কাব্যে শিল্পরূপ — মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ১৩৮০
৫১. নজরুল সাহিত্য দর্শন — শাহাবুদ্দীন আহমদ, ১৯৭৬
৫২. নজরুল সাহিত্য দর্শন — শাহাবুদ্দীন আহমদ, ১৯৭৬
৫৩. কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা — সৈয়দ আলী আহসান, '৭৮
৫৪. নজরুল ইসলাম ঃ কবি ও কবিতা — আবদুল মান্নান সৈয়দ , '৭৭
৫৫. নজরুল নির্দেশিকা — রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯
৫৬. কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা — রফিকুল ইসলাম, ১৯৮২
৫৭. নজরুলগীতি সন্ধানে —আবদুস সাত্তার
৫৮. নজরুল সাহিত্য — মীর আবুল হোসেন, সম্পাদিত, ১৩৭৭
৫৯. নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় — সৈয়দ আলী আশরাফ, ১৯৬৭
৬০. নজরুল প্রতিভা— মোবাশ্বের আলী, ১৯৬৯
৬১. কবি নজরুল — আতাউর রহমান, ১৯৬৮
৬২. নজরুলজীবনী — রফিকুল ইসলাম, ১৯৭২
৬৩. নজরুল কাব্যে রাজনীতি — আমীর হোসেন চৌধুরী
৬৪. নজরুলের বিচার — গাজী শামসুর রহমান
৬৫. আমার জানা নজরুল— মীজানুর রহমান
৬৬. Kazi Nazrul Islam —Mizanur Rahman

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৭. নজরুলমানস সমীক্ষা — জি. এম. হালিম
৬৮. Introducing Nazrul Islam — Sirazul Islam Chowdhury, 1974
৬৯. নজরুল সমীক্ষা— মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ১৩৭৯
৭০. নজরুর সাহিত্যের নব মূল্যায়ন— দবিরুদ্দীন আহমেদ
৭১. সংস্কৃতি কথার 'নজরুল প্রতিভা'— সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী
৭২. বিদ্রোহী শিল্পী নজরুল — সুবোধ চক্রবর্তী, ১৩৭৭
৭৩. জীবন শিল্পী নজরুল — বন্দে আলী মিয়া, ১৩৭৮
৭৪. বিদ্রোহী কবি নজরুল — লক্ষণ কুমার বিশ্বাস, ১৯৭৮
৭৫. কুমিল্লায় নজরুল — এম, আবদুল কুদ্দুস, ১৯৭৬
৭৬. নজরুলের প্রেমের কবিতা — এম.এ. মজিদ, ১৩৭৮
৭৭. নজরুলের প্রতিভা — কাজী আবদুল ওদুদ, ১৯৪৯
৭৮. নজরুলের অন্বেষা — রাজিয়া সুলতানা, ১৩৭৬/১৯৬৯
৭৯. কাজী নজরুলের গান — নারায়ণ চৌধুরী
৮০. নজরুলের গীতি প্রসঙ্গ — করুণাময় গোস্বামী, ১৯৭৮
৮১. কথাশিল্পী নজরুল — রাজিয়া সুলতানা, ১৯৭৫
৮২. গদ্যশিল্পী নজরুল— সৈকত আসগর
৮৩. নজরুল এক বিস্ময় — রামজীবন আচার্য
৮৪. নজরুলকাব্য পরিচয় — মধুসূদন বসু, ১৯৭৫
৮৫. নজরুল গদ্য সমীক্ষা — মুহম্মদ মজিরউদ্দীন
৮৬. নজরুলগীতির নানাদিক — শম্ভুনাথ গোস্বামী
৮৭. নজরুল কাব্য পরিচিতি — কাজী মোতাহার হোসেন, ১৯৭৫*
৮৮. রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় সং, ১৯৭৮/১৯৫৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবতা ও গণমুক্তি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসকন্যা

ডক্টর প্রথমা রায় মণ্ডল

বধূমাতা

ইসমত আরা মাহমুদ

রহিমা নেছার

পুত্র

যাহেদ করিম

এসব প্রিয়নামাঙ্কিত হৃদয়
যখন হবে অনস্তিত্বে অলীক
তারপরেও কিছুকাল তার রেশ
এখানে থাকুক অঙ্কিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবতা ও গণমুক্তি

আমার এ লেখায় কোন বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় মিলবে না। থাকবে না কোন দার্শনিক তত্ত্ব। আমরা সুপ্রাচীন সভ্যজাতি বলে গর্ব করি, উঁচুমানের শাস্ত্রিক সংস্কৃতিরও গৌরব করি আমরা। বাঞ্ছিত মাত্রার মানবিক অনুভবের ও প্রত্যাশিত মানের নৈতিক-চেতনার মানুষ বলেও আমরা দাবি করি, অহংকার করি আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-শাস্ত্র-শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-বিজ্ঞান-দর্শনের। তবু জীবজগতের একটা প্রাণী-প্রজাতি মানুষ হিসেবে বিগত কয়েক হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন মননে-চিন্তনে-অনুশীলনেও আমাদের মনুষ্যত্ব, মানবিকতা বা মানবতা প্রত্যাশিত মানে ও মাত্রায় বিকাশ-বিস্তার পায়নি, হয়নি গণমানব ভাতে-কাপড়ে অভাবমুক্ত, শিক্ষায় স্বাস্থ্যে পুষ্ট, পায়নি অনাহার-অপুষ্টি-অস্বাস্থ্য-অনক্ষরতা-অপমৃত্যুর কবলমুক্তির নিশ্চয়তা। আদিকাল থেকেই জনগণের জীবনে প্রশান্তি-প্রবৃদ্ধি-প্রগতি কোথাও দেখা দেয়নি কখনো। এখানে ব্যতিক্রম বিবেচ্য নয়। সেজন্যে ক্ষোভ ও বেদনাই মুখ্যত অভিব্যক্তি পেয়েছে এ রচনায়। এখানে আমার পরিব্যক্ত কথাগুলো সামাজিক ও রাষ্ট্রিক, জাতিক ও নৈতিক পর্যায়ের আত্মসমীক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজকাল দুনিয়াব্যাপী সর্বত্র মানবতা, মানবিকতা, মানববাদ প্রভৃতি পরিভাষা বহুল ব্যবহৃত। বলতে গেলে আজকের নীতিশাস্ত্রী, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং মানবহিতকামীরা উক্ত সব গভীর তাৎপর্যময় শব্দযোগেই রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থ, বিশ্বশান্তি, সহাবস্থান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করে থাকেন। অতএব, নির্বিশেষে মানবকল্যাণ প্রেরণার উৎস হচ্ছে ওই মানবতা, মানবিকতা বা মানববাদ নিষ্ঠা। অবশ্য প্রাণী হিসেবে মানুষের উদ্ভবকাল থেকেই মানুষই হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সমস্যা-সম্পদ চেতনার, কাম-প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মমতার, দান-প্রতিদানের, ঈর্ষা-অসূয়ার, ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষ-সংঘাতের অবলম্বন। উক্ত সব মানসিক ও কায়িক অভিব্যক্তির মূলে রয়েছে শারীর প্রাণী হিসেবে ব্যক্তি মানুষের আত্মরক্ষার, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিকাশের গরজ। এ চেতনার ও লক্ষ্যের শেকড় হচ্ছে প্রাণী হিসেবে মানুষের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি।

জগতের তাবৎ প্রাণীর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তার আঙ্গিক অবয়ব। তার দুটো হাতই তার সর্বপ্রকার উন্নতির ও উৎকর্ষের কারণ। সহজে খাদ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে রাখতে পারে বলেই, অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা দান করতে পারে বলেই, দু'হাত প্রয়োগে খাদ্য, পানীয় ও নিবাস তৈরি করা সম্ভব ছিল বলেই, যৌথ স্বার্থে, যৌথ শক্তির ও হাতিয়ারের ব্যবহার সম্ভব ও সহজ হল বলেই দলবদ্ধ মানুষের জীবনযাত্রায় ও জীবনাচারে স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্যে তাদের চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে করে উদ্যোগী। এ চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের বাসনা প্রসূত আভাস ও আভাষ পরিণামে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাত্যহিক জীবনে অতি প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশে প্রতীক ও বস্তুনির্দেশক ধ্বনির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে।

পৃথিবীর নানাস্থানের বিভিন্ন কৌমের, গোষ্ঠীর ও গোত্রের উদ্যোগী ব্যক্তি-মানুষের কালিক ও ক্রমিক আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে বুনো, বর্বর ও ভব্য সমাজগুলো ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকে মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের প্রতিকূলতায় ও উদ্যোগী মানুষের অভাবে কিংবা বুদ্ধিমান মানুষের স্বল্পতার দরুন মানুষের ক্রমবিকাশ সর্বত্র বাঞ্ছিত মাপে-মানে-মাত্রায় ও বৈচিত্র্যে ঘটেনি। প্রায়-আদিম স্তরের মানব সমাজ যেমন আজো রয়েছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট বিকশিত চিত্ত-চেতনার মানুষও আজ সুলভ। অবশ্য জ্ঞান শক্তি ও নৈপুণ্য বাড়ায়, অনিচ্ছুক ব্যক্তির মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায় না।

প্রাণী-মাত্রেরই দেহে-মনে থাকে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশের শক্তি। স্ব-শিক্ষিত জিজ্ঞাসু ও কাঙ্ক্ষী অনুশীলনপ্রবণ ব্যক্তিমানুষই নতুন ভাব-চিন্তা-হাতিয়ার, আর বস্তু উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করে। অন্যরা তা অনুকরণে-অনুসরণে কর্মে-আচরণে প্রয়োগ করে তাকে গৌত্রিক দৈশিক কিংবা জাতিক আচার-সংস্কৃতি-সভ্যতার নিদর্শনে পরিণত করে। এভাবে একের অর্থাৎ ব্যক্তিক মনীষার দান জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য হয়ে ওঠে। প্রাণী-মাত্রেরই সুপ্ত ও সম্ভাব্য শক্তির ও বুদ্ধির প্রকাশ-বিকাশের জন্যে প্রশিক্ষণ আবশ্যিক। পাখি-পশুরাও ইঙ্গিতে মানুষের অভিপ্রায় বুঝবার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে। একালে দেখা যাচ্ছে পশু-পাখি-কীটপতঙ্গ-মৎস্য-সরীসৃপ প্রভৃতি জল-স্থল-আকাশচারী প্রাণী-মাত্রেই প্রশিক্ষণ পেয়ে বিস্ময়কর চেতনার, শক্তির, কর্মের ও আচরণের পরিচয় দেয়। ভয়-ভরসা ও কাঙ্ক্ষাজড়িত চিন্তা ও কায়িক শ্রমই হচ্ছে মানব প্রজাতির আত্মবিকাশের [দৈহিক-মানসিক] কারণ। সমাজবদ্ধ সাক্ষর নিরক্ষর মানুষও দেখে-শুনে-জেনে কিংবা পদ্ধতিবদ্ধ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পেয়েই দৈহিক মানসিক শক্তির অনুশীলনে সুপ্ত আত্মশক্তির প্রকাশ বিকাশ ঘটায়। বিজ্ঞানীরা ও বিদ্বানরা বলেন মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ভাবতে ও অনুমান করতে পারে, কিন্তু অন্য প্রাণী কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বল্পপরিসর বর্তমান সম্বন্ধেই সচেতন থাকে।

ভৌগোলিক অবস্থানজাত বিচিত্র আবহাওয়ার প্রতিবেশে প্রাপ্ত সামগ্রীনির্ভর জীবনের অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে, ট্যাবু-টোটেমে, জগৎচেতনায় ও জীবনভাবনায় ঘটেছে বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পরিবেষ্টনীগত ভয়-ভরসা সম্পৃক্ত কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কার জাত অরি-মিত্র শক্তিতে আস্থা ও নির্ভরতা মানুষের শাস্ত্রিক ও আচারিক জীবন গড়ে তুলেছে।

এমনিভাবে প্রাণিজগতে মনুষ্য প্রজাতি মনের ও হাতের সৃষ্টিশীলতায় তথা চিন্তার ও কর্মের ফসল উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও নির্মাণযোগে রচনা করেছে কৃত্রিম জীবন ও জীবিকা। প্রকৃতিকে সে করেছে দাস কিংবা বশ। আজ মানুষ আলো-বাতাস-ঝড়-খরা-রোদ-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করে কঠিন পাথুরে ঘর তৈরি করে অদ্ভুত সব যন্ত্র দিয়ে শ্রমে ও কর্মে জগতে ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে বিপ্লব, দূরকে করেছে নিকট, গৃহকোণে বসে যন্ত্রযোগে গোটা ধরাকে হাতে-ধরা সরার মতো প্রত্যক্ষ করা, জানা, শোনা, বোঝা ও লেনদেন করা সম্ভব এবং পৃথিবী পরিক্রম-পর্যটন করাও সম্ভব কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। রোগের প্রতিষেধকও আজ তার প্রায় হাতের মুঠোয়। তাই মানুষ হচ্ছে জীবজগতে শ্রেষ্ঠতম প্রজাতি। এরই বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষসূচক নাম মনুষ্যত্ব বা মানবতা। এ বিকাশই সংস্কৃতি-সভ্যতা নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিহিত। এ মনুষ্যত্বের উন্মেষ, বিকাশ এ উৎকর্ষ আঞ্চলিক ও গৌত্রিক। তাই আজো বুনো, বর্বর ও ভব্য—এ তিন স্থূল পরিচয়ে বিশ্বমানব চিহ্নিত ও বিভক্ত।

গোড়ার দিকে ফলমূল-মৃগয়াজীবী মানুষ ছিল নিঃস্ব ও নিঃসম্বল। পাত্র ছিল না যে পানি ধরে রাখবে, বিশেষ খাদ্যে নিত্য অভ্যস্ত ছিল না যে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখবে। পশু যত বড়ই হোক, পচন রোধ করা সম্ভব ছিল না বলে, ফেলে যেতে বা অন্যদের দিয়ে দিতে আপত্তি ছিল না, তাই তারা ছিল যাযাবর, আর সঞ্চয়-সংরক্ষণের উপায় ছিল না বলেই তারা দলে চললেও দ্বন্দ্ব ছিল না তাদের মধ্যে।

পরে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও নির্দিষ্ট প্রকারের খাদ্যবস্তু গবাদি শস্যের [যেমন গৃহপোষ্য পশু] বা প্রাণীর উৎপাদন, পালন ও পোষণ সম্ভব হল, তখন থেকেই শুরু হল স্ব স্ব কৌমের, গোত্রের, গোষ্ঠীর, গ্রামের ও ভাষার সহচর সহযোগী মানুষের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখে প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন কৌমের, গোত্রের, গোষ্ঠীর, গ্রামের ও ভাষার মানুষের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রাম। দলের জান-মাল-মানের সংরক্ষণ ও দলের অভিভাবক-পরিচালক হিসেবে দলপতি বা গোত্রপতি কিংবা গোষ্ঠীনেতা হিসেবে সর্দার শাসনের শুরু এভাবেই।

এ গোত্র বা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্যে বিভিন্ন ট্যাবু-টোটেম-যাদু বিশ্বাস চালু করতে হয়। তার মধ্যে একটি: বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক স্বগোত্রে নিবদ্ধ রাখা কিংবা সগোত্রে নিষিদ্ধ করা। পশ্চিম এশিয়ায় চালু ছিল প্রথমটি, আর ভারতের কোন কোন গোত্রে চালু ছিল দ্বিতীয়টি।

AMARBOI.COM

কিন্তু এতেও ব্যক্তিক ও পারিবারিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়ানো যায়নি। কারণ মানুষের রয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিস্তারের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব তথা ক্ষমতা ও মান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। এর নাম জিগীষা। এ জিগীষাই জীবনপ্রেরণা, চলমানতার ও গতিশীলতার উৎস। আদিতে ক্ষমতা অর্জনের উপায় ছিল দুটো: বাহুবল ও বুদ্ধিবল। শক্তি, সাহস, বুদ্ধি ও জিগীষাই মানুষকে করে ক্ষমতার অধিকারী। বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির এবং সংকল্পের সঙ্গে উদ্যোগ-আয়োজনের যোগ হলে সাফল্য হয় নিশ্চিত।

কাজেই প্রাপ্তিলক্ষ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি চলছিলই খাদ্যের, খাদ্য-প্রতীক সম্পদের ও যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে। বৈদিক সাহিত্যে যেমন ইন্দ্রের দস্যুবৃত্তির সগর্ব বর্ণনা রয়েছে, সাহিত্যজগতের রূপকথায় এবং মহাকাব্যেও তেমনি রূপসী নারীর অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বই বর্ণিত। গত শতক অবধি নির্ভীক যোদ্ধা ও রূপসীতে আসক্ত জিগীষু পুরুষই (সিভলরি, ডুয়েল, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন স্মর্তব্য) ছিল সমাজে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, ইতিহাসে নায়ক-পৌরুষপ্রতীক আদর্শ মানুষ। নারী ও পৃথিবী বীরভোগ্যা—এ আপ্তবাক্য সনাতন। যুগান্তরে কেবল হিটলার-মুসোলিনীই হচ্ছে নিন্দিত।

কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, হাতিয়ারের উৎকর্ষ, জনগণের মধ্যে বুদ্ধির ও চেতনার বিকাশ এবং জীবিকাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উৎপাদনে-বণ্টনে জটিলতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে কৌম-গোষ্ঠী-গোত্র জীবনে যেসব জটিলতা ও সমস্যা দেখা দেয়, যূথবদ্ধ জীবনে তার সমাধানকল্পেই সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবিশ্বাস, ট্যাবু-টোটেম বিশ্বাস-সংস্কার ছাপিয়ে স্বকালের স্বস্থানের দলগুলোর নিরাপদে সহাবস্থানের উপায় ও ব্যবস্থা হিসেবেই জগৎ ও জীবন নিয়ন্ত্রক সর্বশক্তিমান অদৃশ্য শক্তির ভয়-ভরসা সযুক্তি প্রচার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্থানিক ও কালিক সমস্যা বিমোচনে সচেষ্ট হন। এ পুরুষ-প্রোক্ত নীতি-নিয়মই আস্তিক মানুষের ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনের সর্বপ্রকার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর নাম শাস্ত্র। শাস্ত্র অবলম্বনে বা ধারণে জীবনচালিত বলে এর নাম আমাদের ভাষায় ধর্ম। শাস্ত্রমানা বা শাস্ত্রধৃত মানুষ ধার্মিক নামে অভিহিত। শাস্ত্র মানুষের মন-বুদ্ধি-রুচি-আকাঙ্ক্ষা-লোভ-অধিকার-দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ন্ত্রক-নিয়ামক শক্তি। শাস্ত্রী-মোল্লা-রাব্বী-শ্রমণ-শ্রাবক-পীর-পুরোত-সন্ন্যাসী-দরবেশ সবাই চিরকাল পূজ্য পরান্নজীবী ও শ্রদ্ধেয় ভিক্ষাজীবী। কিন্তু এ আসমানী শক্তির শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের ভরসার দোহাইও কোন কাজে লাগেনি। প্রলোভন প্রবল হলে হেন পাপ, অপকর্ম করে না এমন আস্তিক চিরকালই বিরলতায় দুর্লভ। ব্যতিক্রম কেবল নিয়মকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কাজেই জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত চাহিদার সর্ব ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি কিংবা ঘৃণা-হিংসা-ঈর্ষা-অসূয়া-রিরংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব উপস্থিত ছিল—আজো যেমন অবিলুপ্ত। এর মধ্যেই মানবচিন্তা-চেতনার, বুদ্ধি-কৌশলের ক্রমবিবর্তনে ও উৎকর্ষে কালিক ও স্থানিক জীবন-জীবিকার চাহিদানুগ রূপান্তর ঘটেছে শাস্ত্রে, সমাজে, শাসনে-শোষণে-পালনে-পোষণে গ্রহণ-বর্জনের বিচিত্র পথে। এ বাস্তব প্রয়োজনেই এবং যুক্তি-বুদ্ধির উৎকর্ষে ঐশ অভিপ্রায়ে ও বাণীতে আস্থা রেখেও মানুষ বারবার স্থানে স্থানে কালে কালে বদলিয়েছে শাস্ত্র, পালটিয়েছে স্রষ্টার ও ন্যায়ের ধারণা, ফলে ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়েছে শাস্ত্রিক ও আচারিক নীতি-নিয়ম নতুন কালে নবোদ্ভূত সমস্যার ও চাহিদার আলোকে। অধিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা ও তত্ত্ব-দর্শনের উন্মেষ-বিকাশ-বিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে এভাবেই। প্রতি প্রজন্মেই জীবন ও সমাজ কিছু না কিছু নতুন রূপ নেয়। এ চলমানতারই বা গতিশীলতারই দান। প্রতি নবসূর্যের উদয়ে প্রতিমানুষই চেতন বা অচেতনভাবে জগৎকে ও জীবনকে নতুনভাবে অনুভব করে। তাই চলমান জীবনের পথের বাঁকে বাঁকে দেখা দেয় নতুন সমস্যা, মেলে নতুন সম্পদ। কাজেই সমাধানের ও প্রয়োগের উপায় চিন্তা করতেই হয়।

সেই উদ্ভাবিত উপায়, আবিষ্কৃত কৌশলই চলমান ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে পুঁজি-পাথেয়। অতীত ও ঐতিহ্য মানুষের স্বকালের স্বসমাজের কোন সমস্যারই সমাধানে, কোন অভাব পূরণে প্রত্যক্ষে তো নয়ই, পরোক্ষেও কোন সহায়তা করে না। প্রমাণ-ঐতিহ্যঋদ্ধ মিশর-আশসিরিয়া-ইলাম-চীন-ব্যাবিলোন-গ্রীক-রোমের কালিক পতন। মানুষের দেহে হাত পা চোখের অবস্থানই সাক্ষ্যপ্রমাণ দেয় যে জীবন বর্তমানে ও ভবিষ্যতে স্থিত, হৃত অতীতে নয়। স্বকাল ও স্বভূমভিত্তিক জীবনের নিয়ন্ত্রক ও দিশারী হচ্ছে উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা, শক্তি, সাহস নিয়ে প্রয়োজনানুগ উদ্যোগে আয়োজনে নিষ্ঠ-নিরত থাকার দায়িত্বের ও কর্তব্যের স্বীকৃতি। জীবনের চালিকাশক্তি হচ্ছে অভাববোধ, আকাঙ্ক্ষা পূর্তির আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, জিগীষা, পুরাতনে বিরাগ, নতুন কিছুর সৃষ্টি বা প্রাপ্তি বাঞ্ছা। এসব চিন্তা-চেতনা যেসব বুদ্ধিমানকে প্রণোদনা দেয়, তাদেরই কেউ কেউ উদ্ভাবক-আবিষ্কারক ও নির্মাতারূপে মানব সংস্কৃতি-সভ্যতার স্রষ্টা।

জিগীষা মানব প্রজাতির সহজাত প্রবৃত্তিগত ঈর্ষা ও অভিব্যক্ত আচরণ, যারা আত্মপ্রত্যয়ী ও সাহসী তারা বাস্তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণকে পণ করে বা রেখে অপরের ধন, জন, সম্পত্তি রাজ্য, পদ, ক্ষমতা হস্তগত বা দখল করার যুদ্ধে নামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মবিশ্বাস ও শক্তি-সাহস বিরহী অন্যরা যে-কোন প্রকার ক্রীড়ার (তাস-দাবা-ক্রিকেট-কুস্তি-ফুটবল-হকি-জুয়া, দৌড় প্রভৃতির) মাধ্যমে ওই প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার বাসনা চরিতার্থ করে। যেমন পশু-পাখি-মৎস্য শিকারে মানুষ তার জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করে। আত্মপ্রসারকামী সাহসী লিপ্সু শক্তিমানই ভীরু-দুর্বল-স্বল্পবুদ্ধি মানুষের জান-মালের, গতরের মালিক হয়ে চালু করল দাসপ্রথা, বশ করল দুর্বলকে। গোষ্ঠীর সংরক্ষক সর্দারও ক্রমে হয়ে উঠল স্বৈরশাসক। পুরোহিতের ও শাহ-সামন্ততন্ত্রের রাজার, রাজ্যের উদ্ভব এভাবেই। তারপর গণচেতনার, গণদাবির ও গণদ্রোহের মুখে ক্রমে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক এবং সংলগ্ন-অসংলগ্নভাবে আমাদের মূল বিষয় আলোচনার সহায়ক হবে অনুমানে উপর্যুক্ত কথাগুলো বলে রাখলাম।

২

অবয়বের দিক দিয়ে দ্বিপদ মানুষ পশু, কীট, সরীসৃপ ও জলজ প্রাণী থেকে পৃথক। আবার দ্বিপদ হলেও দ্বিকর থাকায় পাখি প্রজাতি তার সদৃশ নয়। ওই দ্বিকরকে সম্বল, সম্পদ, পুঁজিরূপে প্রয়োগ করার সুবিধা পেয়ে মানুষ প্রকৃতির আনুগত্য অস্বীকার করে কৃত্রিম উপায়ে রচনা করেছে তার জীবন ও জীবিকা, প্রকৃতি আজ তার দাস ও বশ। ওই দুটো হাতই প্রাণিজগতে মানুষকে অনন্য ও অসামান্য করে তুলেছে। অন্য প্রাণীদের হাত না থাকায় খাদ্য সংগ্রহ-সংরক্ষণ-সঞ্চয় করতে পারে না বলে তারা প্রায় সর্বক্ষণ উদরপূর্তির ধান্ধায় ঘোরে। সহজ সমাধান পেয়ে মুখ-মন-বুদ্ধি ও হাত প্রয়োগে মানুষ তার জীবনে সুখ-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ-আরাম সঞ্চারে যা কিছু প্রয়োজন ও বাঞ্ছিত, তার সব কিছু উদ্ভাবনে আবিষ্কারে নির্মাণে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে ও দিচ্ছে।

আবার আদিকাল থেকেই কাঙ্ক্ষী মানুষের ওই হাতের কাজ বিচিত্র ও ব্যাপক হচ্ছিল বলেই তার পক্ষে জনবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন সম্ভব ছিল না, ফল-মূল-মৃগয়াজীবীদের জীবনেও খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা লক্ষ্যে যাযাবর জীবনে অজ্ঞাত পথে বিপদসঙ্কুল নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যেও যূথবদ্ধ দলগত জীবন কাম্য হয়ে উঠেছিল। আজো মানুষ দেশকালাধীন সমাজচ্যুত হয়ে বাঁচতে পারে না। মনুষ্যসঙ্গ তার জীবনে আবশ্যিক।

সমাজবদ্ধ থাকা মানেই স্ব স্ব জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা লক্ষ্যে স্ব স্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের উক্ত-অনুক্ত চুক্তি বা অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। জলে-স্থলে-আকাশে যেসব প্রাণী দলে-পালে-ঝাঁকে চলে সর্দারের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় তাদের মধ্যেও প্রকৃতি-প্রবৃত্তিগতভাবেই কিছু নীতি-নিয়ম কর্ম-আচরণ নির্দিষ্ট থাকে—উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি, বালিহাঁস, ধানখেকো পাখি ও পতঙ্গ, বুনোহাতী, অরণ্যচারী গরু-মোষ, ইলিশাদি বিভিন্ন মাছ প্রভৃতি তার প্রমাণ।

দ্বিপদ-দ্বিকর মানব প্রজাতির মন-বুদ্ধি-রুচি-কাঙ্ক্ষা ও সর্বপ্রকার প্রয়োজন স্বসৃষ্ট হওয়ায় মানুষের শাস্ত্রিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বহু প্রকারের নীতি-নিয়মের প্রয়োজন হয়েছে সহযোগিতার সহাবস্থানের অঙ্গীকারে শ্রম ও সামগ্রী বিনিময়যোগে জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বাঁচার ও বাঁচাবার লক্ষ্যে। এজন্যে প্রয়োজন নীতি-নিয়মের অনুগত, স্বভাবে সংযত মানুষের আধিক্যে গঠিত সমাজ। শাস্ত্রের, শাসকের বা সমাজের প্রবর্তিত-প্রচলিত বিধি-নিষেধ, নীতি-নিয়ম, রীতি-পদ্ধতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানা মানুষ ধার্মিক, সৎ ও সুনাগরিক নামে অভিহিত হয়। এমনি মানুষই শাস্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র বাঞ্ছিত 'ভালো' মানুষ। এই ভালোত্ব আবার ধার্মিকতার, নৈতিকতার ও সততার নামান্তর।

সততা যদি ঐহিক কিংবা পারত্রিক শাস্তিভীতিজাত হয়, তা হলে সে সততার নৈতিক-সামাজিক-চারিত্রিক মূল্য সামান্য। আর সততা যদি হয় আত্মপ্রত্যয়, আত্মসম্মান ও সংযম-রুচি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রসূত, তা হলে তার মূল্য মর্যাদা অনেক। তখন তা নৈতিকতারই একটি মুখ্য অংশ। দুর্বল মানুষের সততা প্রভাবপ্রসূ নয় বলে বন্ধ্যা।

ধার্মিকতা যদি হয় তাৎপর্যবিহীন আশৈশবলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণের অন্ধানুকরণ-অনুসরণ মাত্র, তবে তা কেবল ধরে রাখে, পিছুটান দেয়, ভরেও তোলে না, এগিয়েও দেয় না, কেবল স্থির, বিকৃত ও বন্ধ্যা করে রাখে। তা হলে এই শাস্ত্রিক ধর্ম পরিহার্য। বস্তুত এ কারণে শাস্ত্র ও শাস্ত্রনীতি বারবার বর্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে দুনিয়ার সর্বত্র। পশ্চিম এশিয়ার নবীবাদ ও ভারতের অবতারবাদ তার সাক্ষ্য। ইতিহাসের সাক্ষ্য দেখা-বোঝা যায় যে, কালান্তরে তাৎপর্য-চেতনাহীন নির্লক্ষ্য আচারিক-পার্বণিক বিশ্বাস-সংস্কারপুষ্ট ধর্মশাস্ত্র জাগতিক জীবনে কেবল ক্ষতির, বন্ধ্যাত্বের, বিভেদের, দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষের-হানাহানির কারণই হয়েছে। কাজেই ধর্মমত বা শাস্ত্র প্রবর্তক-প্রচারকের স্বকালের ও স্বস্থানের সমস্যা ও প্রয়োজন উদ্ভূত বলেই কালান্তরে-স্থানান্তরে তার কোন উপযোগিতা-উপকারিতা অবশিষ্ট থাকেনি। অনেক ধর্ম আবার উদ্ভব স্থানে বিলুপ্ত হলেও বিদেশে বিভাষীর মধ্যে অলৌকিক মহিমাধর রূপেই কেবল টিকে থাকে। জৈন-বৌদ্ধ-ইহুদী-খ্রীস্টান-জোরস্তুরীয় ধর্ম তার প্রমাণ।

AMARBOI.COM

পরিবর্তিত পরিবেশে স্থানিক কালিক প্রয়োজনে আর্থ-সামাজিক নিয়ম পরিবর্তনের গরজ অনুভব করেছে যখন, তখন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনীষা সম্পন্ন গণহিতকামী সাহসী মানুষ পিতৃপুরুষের শাস্ত্রের ও সমাজের নীতি নিয়ম দ্রোহী হয়ে নতুন শাস্ত্র ও সমাজনীতি প্রবর্তন করেছেন। এভাবে বারবার দেশে দেশে পুরোনো শাস্ত্রের বিলোপ ও নতুন শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। তাই ধর্মশাস্ত্র মাত্রই দ্রোহীর দান। আবার যারা নতুন ধর্মশাস্ত্র বরণ করেছে তারাও পিতৃপুরুষের শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহী। এ তাৎপর্যে আমরাও দ্রোহীর ও সমকাল সচেতন মানুষের বংশধর। কাজেই জীবন-জীবিকার কালিক চাহিদা পূরণের গরজে পুরোনো শাস্ত্রের ও সমাজের নীতি-নিয়ম বর্জনে আমাদের ঐতিহ্যগত প্রথা, পরম্পরাগত অধিকার ও প্রয়োজন রয়েছে।

যৌথ জীবনে বাঞ্ছিত বা আদর্শ সমাজ-সদস্যে কাম্যগুণ হচ্ছে সংযমে, সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের মানসিকতা ও যোগ্যতা। শাস্ত্রের আনুগত্যে, ধর্মভাবের অনুশীলনে এ বাঞ্ছিত গুণ অর্জন সম্ভব বলে মনে করেছেন, এখনও করেন একদল, অন্যদল এর সঙ্গে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও আবশ্যিক ও বিশেষ কেজো বলে মানেন, যুক্তিবাদী ভিন্ন একদল তীক্ষ্ণ তীব্র গভীর নীতিচেতনা ও নীতিনিষ্ঠাই মানুষকে অহম সচেতন, আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, বিবেকবান ধীরবুদ্ধির, স্থিরসংকল্পের মানুষরূপে তৈরি করে বলে বিশ্বাস করেন। অহং চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসংযমই মানুষকে নৈতিকতানিষ্ঠ করে। এ তিন গুণ মূলত মনুষ্যত্ব—অন্যসব সদগুণ এ তিনটের উপজাত। মানবতা এর শ্রেষ্ঠ প্রসূন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনির্দিষ্ট আত্মিক-সামাজিক প্রয়োজনে অনুশীলনলব্ধ বাঞ্ছিত মানবগুণই মানবতা বা মনুষ্যত্ব। স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, সৌজন্যে-সহৃদয়তা, কৃপা-করুণা, দান-দাক্ষিণ্য, প্রতিবেশীর দুঃখ-যন্ত্রণায়, রোগে-শোকে সহানুভূতি ও সমমর্মিতা, দুস্থ-রুগ্নের সেবায় আগ্রহ, ক্ষমা-তিতিক্ষা, সংযম-নির্লোভতা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাম্যে আস্থা, মৌল মানবাধিকারের স্বীকৃতি, চালু শাস্ত্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধি-নিষেধের প্রতি আনুগত্য, যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেকের অনুগত থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, অন্যায়-অপকর্মের প্রতিবাদ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ প্রয়াস, গৃহগত জীবনে আত্মীয়-স্বজন পরিজনের পালনে পোষণে প্রত্যাশিত দায়িত্ব পালন, যে দুঃখ-যন্ত্রণা, বিপদ-ক্ষতি প্রভৃতি নিজের জন্যে কাম্য নয়, তা অপরের জীবনেও কথায়-কাজে ঘটানোর নিমিত্ত না হওয়া, শুধু অন্যায় শাসন-শোষণ-পীড়ন থেকেই নয়, অশিক্ষা ও অবিদ্যা, নিঃস্বতা, দারিদ্র্য, নিরাশ্রয়তা, রুগ্নতা, পঙ্গুতা, অপ্রীতি, স্বভাব দোষ, ঘৃণা হিংসা ঈর্ষা অসূয়া, রিরংসা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানবসৃষ্ট ও প্রকৃতিদত্ত জুলুম থেকে মানব মুক্তির ও নিরাপত্তার যৌক্তিকতা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে যথাশক্তি পরিব্যক্ত করাই হচ্ছে মানবতা। অহং-এর গুরুত্বসচেতন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বিবেকবান, ব্যক্তিক অনুশীলনে স্বশিক্ষিত মানুষই কেবল এসব গুণ অর্জনে আগ্রহী হয়। সংসার-বিরাগী কিছু মানুষই–যারা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনীষা যোগে জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্বন্ধে একটা তাত্ত্বিক-দার্শনিক ধারণা লাভ করেছে, উক্ত অনেক গুণের আধার হয়ে ওঠে। তারাই কেবল জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-পাপী-তাপী-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে দুঃখী বিপন্ন মানুষের প্রতি থাকে সহানুভূতিশীল। সংস্কারবশে মোক্ষলক্ষ্যে গতানুগতিক ধারায় যারা সাধু-সন্ন্যাসী-শ্রমন-ভিক্ষু-ব্রহ্মচারী-শ্রাবক-সন্ত-দরবেশ-পাদরী হয়, তাদের মধ্যে এসব গুণ থাকে না। আজো মানবতা সভ্য সংস্কৃতিবান মানুষেও তাই সুদুর্লভ। যা দেখতে শুনতে করতে বলতে কুৎসিত, তা-ই পরিহার করা, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করাই হচ্ছে সংস্কৃতিমানতা। এখনো সভ্য শিক্ষিতের জগতে, সমাজে ও জীবনে প্রাণী সুলভ প্রাকৃতিক ও প্রাবৃত্তিকি ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণই প্রধান ও প্রকট। তাই মানুষের সমাজের আদিম সমস্যার ও সঙ্কটের আজো অবসান ঘটেনি। দুরারোগ্য আধি-ব্যাধির মতো সময়-সুযোগমতো তা উগ্ররূপে দেখা দেয়। তখন তার এতকালের শাস্ত্র-শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য সব মিথ্যে হয়ে যায়, আদি অকৃত্রিম জীব হিসেবেই সে ব্যক্তি বা দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তার কর্মে-আচরণে। তখন সেই আপ্তবাক্যই সত্য হয়ে ওঠে 'জানামি ধর্মং ন চ প্রবৃত্তি। জানামি অধর্মং ন- চ নিবৃত্তি।'

৩

জীবজগতের একটি প্রজাতি হিসেবে মানুষ আজো বেশি পরিমাণে সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত। তাই তার মানবতা বা মনুষ্যত্ব ক্ষীণ, কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে অনুপস্থিত। এ কারণেই মানুষ ভালোও নয় মন্দও নয়, কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারো জন্যে ভালো, কারো জন্যে মন্দ, কারো প্রতি ভালো, কারো প্রতি মন্দ, কারো কাছে ভালো, কারো কাছে মন্দ। নরহন্তা দস্যুও স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী, ভক্তিমান পুত্র। এ ভালোত্ব-মন্দত্ব অবশ্যই আপেক্ষিক স্বার্থ, রুচি ও জীবনদৃষ্টি সম্পৃক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে সব কথা বলা যাবে না, তার প্রয়োজনও নেই। কেবল দু'চারটে সাক্ষ্য-প্রমাণই আমাদের ধারণার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করবে। মানুষের [পুরুষের অপত্য কৃত্রিম, অবৈধ সন্তান হত্যায় কিংবা অস্বীকারে বেদনাবোধ করে না] অপত্য স্নেহ প্রাণিজগতের স্তরেই রয়ে গেছে, অনুশীলনজাত বিস্তার লাভ করেনি। তাই এতিম ভাইপো-ভাগ্নে পুত্রবৎ লালন পায় না। ব্যতিক্রম কেবল নিঃসন্তান চাচা-মামা। অসংখ্য মানুষের কামও প্রেমে উন্নীত হয়নি, দুস্থ-ইল্লত মানুষের প্রতি ঘৃণা অবজ্ঞাও কমেনি তেমনি। ঘা-খাওয়া মানুষের ক্রোধ আজো প্রতিহিংসায় তৃপ্তি খোঁজে নির্বিচারে। লোভ প্রলোভন আজো প্রায় অপ্রতিরোধ্য এবং প্রায় সর্বপ্রকার ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক-নৈতিক অবাঞ্ছিত কর্ম-আচরণের কারণ। লোভ অনুশীলনপ্রসূত সংযমে সুপ্ত রাখার সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ আজো পরিশীলিত রুচি-সংস্কৃতির মানুষের শ্রেণীসমাজেও দুর্লভ। আজো যুক্তি বুদ্ধি প্রজ্ঞা বিবেক বিবেচনা প্রয়োগে ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ নিয়ন্ত্রণ বা চালিত করার লোক 'লাখে-না মিলয় এক'। মানুষ কর্মে আচরণে আজো ভালো কিংবা মন্দ লাগা জাত আবেগতাড়িত। এমনি আবেগই তার ইচ্ছা–আকাঙ্ক্ষারূপী জীবনপ্রেরণা, তার জীবনে চালিকাশক্তি। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধির জন্যে মানুষের মধ্যে রয়েছে আত্মপ্রত্যয় ও সাহস অনুযায়ী লঘু গুরুভাবে জিগীষা-জয় তাকে সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি দেয়, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। এবং ক্ষমতার প্রয়োগ প্রায়ই জুলুমরূপে প্রকটিত হয়। কেননা ন্যায়ানুগ বা আইনসম্মত বিধিসঙ্গত ক্ষমতা প্রয়োগে তৃপ্তি বা শক্তির সুখ অনুভব সম্ভব হয় না। তাই ক্ষমতার প্রয়োগ সাধারণভাবে জোর-জুলুমের নামান্তর। ব্যক্তিক জীবনে এ ক্ষমতাই ব্যক্তির গৌরব-গর্বের, মান-যশের উৎস ও অবলম্বন। আর না বললেও চলে যে ঘৃণা-হিংসা-ঈর্ষা মুক্ত মানুষ জগতে চিরকালই সুদুর্লভ। আর স্বার্থপরতা তো সর্বজনীন, মান, যশ, গ্রহশান্তি, পাপভীতি, পুণ্যার্জন প্রভৃতির প্রয়োজনেই কেবল দানের হস্ত প্রসারিত হয়। উপর্যুক্ত সব ভাব চিন্তা আবেগ অনুভূতি ও কর্ম-আচরণ প্রাণীসুলভ, স্বসৃষ্ট জীবনাচারজাত নয়। এগুলোর প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ভাব চিন্তা কর্ম আচরণই হচ্ছে মানবতা বা মনুষ্যত্ব।

৪

এবার মনুষ্যত্বের বা মানবতার অভাবের বা অপূর্ণতার কথা বলি। দৈহিক শক্তিতে প্রবল মতলববাজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহসী মানুষই দেহে মনে মতলবে দুর্বল স্থূলবুদ্ধি মানুষকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে তার হুকুম-হুমকি-হামলার আয়ত্তে আনে। তখনো সম্পদ-প্রতীক মুদ্রা চালু হয়নি। আদি সমাজে উৎপাদন লক্ষ্যে শ্রমপুঁজি সংগ্রহ কেবল এভাবেই সম্ভব ছিল। কাজেই দাসপ্রথার উদ্ভব ঘটে এ প্রয়োজনেই। ভারতে আসমানী দোহাই দিয়ে মানুষকে বিনা আয়াসে চির অনুগত অস্পৃশ্য নিম্নবৃত্তিজীবী রাখা হয়েছিল—এ দাসপ্রথারও অধম। এভাবে মানুষ হল গৃহপালিত পশু পাখির চেয়েও কেজো কিন্তু তুচ্ছ। কুকুর-বেড়ালেরও আদর কদর ছিল কিন্তু দাস মানুষের তা প্রাপ্য ছিল না। যন্ত্রযুগে হাতিয়ারের উৎকর্ষে ও বৈচিত্র্যে উৎপাদনপদ্ধতিতে ও বণ্টনে-বাণিজ্যে জীবিকাক্ষেত্রে যে যুগান্তকর পরিবর্তন এল, জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে ও মুদ্রার বহুল প্রচলনে শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ে ও প্রয়োগে যে বিপ্লব ঘটল, তাতে উনিশ-বিশ শতকে দাসপ্রথা অকেজো হয়ে গেল। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য আন্দোলনেই বিশ্বব্যাপী দাসপ্রথা বিরোধী জনমত গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে অর্থকর নয় বলেই বিনা আন্দোলনেই চোখের আড়ালে দাসপ্রথা উঠে গেছে, টের পাওয়া যায়নি। তার আগে কয়েক হাজার বছর ধরে বুনো পশুর মতো মানুষকে লুটে নিয়ে, পাখির মতো ফাঁদে ধরে, গরু-ছাগলের বাজারে বেচা-কেনা করে বেড়াত ধনীরা। আর গরু-ঘোড়া-মোষের মতোই কায়িক শ্রমে নিযুক্ত থাকত দাস-কৃষিকর্মে, পশুপালনে ও সামগ্রী নির্মাণে এবং কঠিন শ্রম, ধৈর্য ও নৈপুণ্য সাধ্য অন্য সর্বপ্রকার কর্মে। তাদের স্বল্পাহারক্লিষ্ট দেহের রক্ত ঘর্ম হয়ে তাল-খেজুরের রসের মতো ঝরত, ভেজাত মাটি। কাজে সামান্য ক্রটির বা অবহেলার জন্যে তাদের পিঠে পড়ত চাবুক, পীড়ন-মুক্তির জন্যে পালাবে আশঙ্কায় তাদের রাখতও সার্বক্ষণিক কড়া পাহারায়, তেমন গোঁয়ারদের শৃঙ্খলিতও রাখত, রাখত পায়ে বেড়ি দিয়ে। তবু চিরকাল কিছু দাস দ্রোহ করে মরিয়া হয়ে মনিবের নির্যাতনের জবাব দিয়ে 'মনুষ্য' নামের ইজ্জত রক্ষা করেছে, কালে কালে ও স্থানে স্থানে।

দাসপ্রথা উঠে গেলেও মানবগোষ্ঠীর মনোভাবের কিংবা জীবনদৃষ্টির কোন বিবর্তন ঘটেনি। মুদ্রা-মজুরীতে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিও তারা ব্যবহার করছিল পূর্বের মতোই। তাদেরও খাটাত দিনে রাতে আঠারো ঘণ্টা। ১৮৮৬ সনে শিকাগোতে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শ্রমের সময়-পরিসর কমাতে বাধ্য করেছিল মালিকদের। তারপর থেকে দুনিয়াব্যাপী মজুরেরা প্রায় নিত্যই তাদের অশন-বসন-নিবাস-নিদান সংক্রান্ত ও সম্পৃক্ত ন্যায্য মজুরীর দাবিতে আপোসহীন বিরামহীন সংগ্রাম করে চলেছে। লুট-শোষণপটু মুনাফাখোর মালিক-মনিব-সরকাররা টলার ভান করেও উদ্বৃত্ত আত্মসাতে অটল থাকে। এরা শ্রমিকদের আজো যন্ত্র সম্পৃক্ত মানবেতর জীবই মনে করে, মানুষের মর্যাদা দিতে অন্তর থেকেই নারাজ। এদের চোখে মজুরেরা শিক্ষা সংস্কৃতিহীন বুনো স্বভাবের গোঁয়ার প্রাকৃতজন মাত্র।

গোষ্ঠীগতভাবে আমাদের মধ্যে যে মানবতা জাগেনি— কলি হয়েই রয়েছে, তা গৃহভৃত্য-ভৃত্যা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এবং তাদের প্রতি আমাদের আচরণ থেকেও বোঝা যায়। ব্যতিক্রম হয়তো অবশ্যই রয়েছে কিছু পরিবারে, কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় দুধ, ফল, মূল, ফলার দূরে থাক, মনিবগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক অন্নব্যঞ্জনেও ভৃত্যের অধিকার থাকে না, তার জন্যে নিকৃষ্ট চালের ভাত আর তুচ্ছ ও স্বল্প মূল্যের শাক তরকারির আলাদা ব্যবস্থা থাকে, মনিবগোষ্ঠীর চোখে সে এমনই ছোটলোক যে দু'চার বছরের শিশুকেও নাম ধরে ডাকার কিংবা 'তুমি' বলার অধিকার পায় না। শুনেছি ঘরের ভেতরে মেঝে বসে টিভি দেখার অনুমতিও থাকে না কোন কোন বাড়িতে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা তাকে ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি খাটায়। এ ক্ষেত্রে শিকাগোর মজুরের বুকের রক্ত বৃথা গেছে, এ আঠারো ঘণ্টার দৈনিক কর্মজীবনে শান্তি স্বস্তি সম্মান যে থাকে, তাও নয়, হুকুম হুমকি ভর্ৎসনাও নিত্য প্রাপ্তির তালিকায় থাকে। ক্রীতদাস আর এমনকি মানসিক ও শারীরিক পীড়ন পেত! দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের ভৃত্য থাকা সত্ত্বেও অসুখে বিসুখে মনিবগোষ্ঠীর কারো থেকে সেবাশুশ্রূষা কিংবা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্য আশা করা যায় না। বড়জোর হাসপাতালের আউটডোরে পাঠায়। এরপরেও কি বলব ১৯৮৯ সনেও আমাদের মানবিক গুণের কিছুমাত্র বিকাশ ঘটেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন রূপকথায় কাব্যে-মহাকাব্যে পুরাণে-ইতিবৃত্তে আমরা শক্তিধর দেবতাদের কথাই বেশি করে পাই, মানুষকেও পাই, সে মানুষ বাদশাহ উজির কোটাল সওদাগরেই সীমিত, তার নিচে নামেনি। রাজপুত্র লক্ষ লক্ষ লোকলস্কর নিয়ে স্বপ্নে কিংবা তস্‌বীরে দৃষ্ট অজ্ঞাত রূপসীর সন্ধানে সমুদ্র পাড়ি দিল, পথে ঝড়ের মুখে নৌবহর ডুবল, সব মানুষ মরল, কেবল তক্তা-সম্বল রাজকুমার পৌঁছে গেল উপকূললগ্ন অরণ্যে। শাহ্‌জাদার ভোগ-উপভোগের যোগানদার, সেবাদাস, হুকুমবরদার লক্ষ লক্ষ সহচর অনুচর লোক-লস্কর যে মরল, তাদেরও স্ত্রী বিধবা হল, সন্তান হল অনাথ, মা-বাবা হল হৃতপুত্র। তাদের কথা কবি-কথক কেউ সকরুণ কণ্ঠে একবারও উচ্চারণ করেনি, পাঠকশ্রোতার মনেও জাগেনি তাদের অপমৃত্যুর জন্যে কোন ক্ষণিকবেদনা। আজো সাহিত্যে নায়ক-নায়িকা প্রধান। ১৯৮৯ সনেও ঢাকার রেডিও-টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রগুলো খানদান-সচেতন জমিদার প্রধান, যদিও বাঙালী মুসলিম সমাজে দুটোই ছিল দুর্লভ। এ হচ্ছে সামন্তযুগের সমাজের প্রতি দেশ-কাল বিরোধী অপরিস্রুত মানসিক বা রোমান্টিক আকর্ষণের স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের সামন্ত-মানসিকতাদুষ্ট বুর্জোয়াসাহিত্যে আজো গণমানব প্রত্যাশিত অবস্থানে অনুপস্থিত।

বাঙলাদেশের দশ কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত তিন কোটি মানুষ নিঃস্ব এবং দিনমজুরী নির্ভর। এদের মধ্যে ভিক্ষাজীবীর পরিজন হবে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ লাখ। এ ন্যূনাধিক তিন কোটি মানুষের ঘুম-ভাঙা প্রভাতের প্রার্থনা কি!— ধন নয়, মান নয়, শান্তি স্বস্তি আনন্দ আরাম সুখ প্রভৃতিও নয়, প্রার্থিত কেবল একটিই, মর্মোত্থিত করুণ প্রার্থনা- আল্লাহ আজ যেন কাজ জোটে, আজ যেন ক্ষুধার অন্ন মেলে। সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে যে অনিশ্চিত শ্রমজীবীতা ও ভিক্ষাজীবীতা চলে আসছে, শ্রম ও ভিক্ষাজীবী কোটি কোটি মানুষ জন্ম-জীবন-মৃত্যু-অনাহার-অপুষ্টির, রোগ মহামারীর, ঝড় ঝঞ্ঝা খরা রোদ বৃষ্টির শিকার হয়ে অকালে অপমৃত্যু বরণ করছে, জীবনে যারা সাচ্ছল্য-স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ নিশ্চিতভাবে একদিনও উপভোগ করল না, সেই হতভাগ্যদের বিপুল জনস্রোত চিরকাল অভাবজাত দুঃখ-যন্ত্রণার ও জীবন-জীবিকার অনিশ্চয়তাসমুদ্রে নিঃস্ব নিরুপায়-নির্লক্ষ্য নিরাশ দেহমন নিয়ে ভাসছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে এদের কাজে ও ভাত-কাপড়ে অধিকার স্বীকৃত ও নিশ্চিত হলেও বিশ্বের সামন্তপুঁজি কিংবা বাণিজ্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বা সমাজে এদের কি কোন সুরাহা হয়েছে? দু'চারটি জনকল্যাণবাদী রাষ্ট্রেও এদের সব দুঃখ ঘোচেনি। এ মানুষের প্রতি শাস্ত্রানুগত্যবশে, নৈতিক দায়িত্ববোধে কিংবা মৌলমানব অধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ এ দেশের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা অথবা সরকার কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করে কি!

তাৎপর্যচেতনারিক্ত বলেই ব্যক্তিমনে প্রতিবেশীর প্রতি, স্বধর্মীর প্রতি, কাঙালের প্রতি সর্বোপরি মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় দেশনা একটা হার্দ্যিক সম্পর্কহীন যান্ত্রিক ও কৃত্রিম আচারে-আচরণে-অনুষ্ঠানে-পালাপার্বণে-উৎসবে পর্যবসিত হয়েছে। তাই শুক্রবারে ছাড়া ভিক্ষা মেলে না, জাকাত মেলে বছরে একদিনে একবারে এবং ফিতরাও তাই। যেন ওই তিনদিন ছাড়া বছরের আর তিনশ' বাষট্টি দিন ওদের ক্ষুধা থাকে না, মা বাপের মৃত্যুদিনে ছাড়া কারো ঘরে কাঙালের সহজে এক মুঠো ভাত জোটে না। একি মানবতা-মানবিকতা, না বিবেক-বিবেচনাহীন যান্ত্রিক আচারনিষ্ঠা? মানুষের কাছে আজো মানুষ নির্বিশেষের প্রাণ মন হৃদয়ের মূল্য অস্বীকৃত। তাই সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃস্ব রুগ্ন পঙ্গু মানুষের বাঁচার অধিকারও বাস্তবে কার্যত স্বীকৃত নয়। এরপরেও কি বলব আমাদের মানবতার ও মানবিকতার, মনুষ্যে প্রত্যাশিত চেতনার ও গুণের বিকাশ হয়েছে?

জন্মসূত্রে জননী, যৌন সম্পর্কে জায়া এবং বাৎসল্যবশে কন্যা পুরুষ নির্বিশেষের প্রাণপ্রিয়। তবু আদিকাল থেকেই যেন নারী পুরুষ শাসিত-শোষিত গৃহপোষ্য আবশ্যিক প্রাণীমাত্র। মাতৃকেন্দ্রিক তথা নারী-প্রধান সমাজের কথা কেতাবে পড়া যায় বটে, তবে কোন স্পষ্ট ধারণা মেলে না। তার পূর্ণাঙ্গরূপ সম্বন্ধে কার্যকরতা সম্বন্ধেও যৌক্তিক চিত্র দুর্লভ। তবে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ যে বিবাহপ্রথা চালু হবার আগে আবশ্যিক ছিল ব্যক্তিকে যৌথ জীবনে শনাক্ত করার গরজেই, তা বোঝা যায়। পরে সন্তানের মালিক হয় পুরুষ, তার পরিচয় নির্দিষ্ট হয় পিতার নামেই। দুনিয়ার সব ভাষাই পুরুষসৃষ্ট ও পুরুষ নির্দেশক। শব্দের আকার ইকার বদলে কিংবা শব্দের কলেবর বৃদ্ধি করেই তৈরী করতে হয় নারী-নির্দেশক শব্দ বা পদ। এতেই বোঝা যায় ঘরে সংসারে সমাজে রাষ্ট্রে এদের প্রাধান্য ছিল না কখনো, যদিও প্রকৃতিদ্রোহী মানব প্রজাতির স্বতন্ত্র জীবন ও কৃত্রিম জীবিকা রচনার আরম্ভমুহূর্ত থেকেই নারীর শ্রম ও অবদান উপেক্ষণীয় ছিল না কখনো। বিশ্বাস-ভরসার অভয় শরণ যে জননী, প্রাণের আরাম যে জায়া, সে-জাতের প্রতি পুরুষ মনের এ অবজ্ঞার ও তাচ্ছিল্যের, অনাস্থার ও অশ্রদ্ধার বাস্তব-বাহ্য ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে নিশ্চয়ই। এমন দিনও ছিল, যখন নারীর ও দাসের ও শূদ্রের আত্মার অস্তিত্বই স্বীকৃত হত না। আমেরিকায় এমন শ্বেতকায় মনীষীও রয়েছে, যারা নিগ্রোদের মনে করে মননে মস্তিষ্কে আধামানুষ।

নারী 'প্রিয়া' হয়েও যেন প্রতিদ্বন্দ্বী, পরিজন হয়েও প্রতিযোগী, স্বজন হয়েও স্বতন্ত্র, সাথী হয়েও শাসিত, ঘরে-সংসারে-সমাজে নারী-পুরুষে সর্বত্র একটা দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিপক্ষতা রয়েছে। জগতের সর্বত্র ও সব ভাষায় নারী সম্বন্ধে চালু রূপকথায়, উপকথায়-সাহিত্যে, প্রবাদে প্রবচনে কিংবদন্তীতে নারীর মন-মনীষা, বৃত্তি-প্রবৃত্তি স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা, অনাস্থা ও নিন্দাই প্রকাশ পেয়েছে। নারী কায়ায় খাটো, শক্তিতে হীন, চিত্তে চঞ্চল, আবেগে উদ্বেল, ইন্দ্রিয়ে তীক্ষ্ণ, অনুভবে গভীর, ছলনায় পাকা, বাকে পটু, মানীষায় লঘু, বোধিতে তরল, সিদ্ধান্তে সরল। আবার হিংসায়-ঘৃণায়-ঈর্ষায়-অসূয়ায়-রিরংসায় ও প্রতিহিংসা প্রবণতায় নাগিনী-বাঘিনী ও হঠকারিণী। আবার আবেগ চালিতা বলেই সহজেই মুগ্ধা জিগীষু নারী প্রেম-প্রতারণার শিকার। রতিরমণে নারী নিষ্ক্রিয় সম্ভোগে যেন ভোগ্যা মাত্র। এসব নানা কারণে আত্মপ্রত্যয়ী, সাহসী, ধীরবুদ্ধির ও স্থিরবিশ্বাসের পুরুষ উত্তম্মন্যতাবশে নারীকে গৃহগত প্রয়োজনীয় প্রাণী ও সম্ভোগপাত্রী তথা পুরুষভোগ্য প্রাণী মাত্র মনে করে। ভারতে বিশেষ করে বাঙলায় নারী-দেবতার পূজক হয়েও বাঙালী নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়নি। তাদের কাছেও, বিবাহের মন্ত্রে উঁচুমানের তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও—নারী রতিভোগ্য সন্তান-উৎপাদক যন্ত্রমাত্র। আর মুসলমানেরা শাস্ত্রে নারীর অধিকার ও ঘরে সম্মানিত অবস্থান স্বীকৃত বলে যতই তুষ্টির ও তৃপ্তির বাণী উচ্চারণ করুক না কেন, পুরুষের সম্ভোগার্থ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকারের মধ্যেই নারীর ও নারীত্বের চরম অবমাননা প্রকট হয়ে রয়েছে। কাবিন তো দেহ-সম্ভোগের দাম। নারী-পুরুষের সম্পর্ক এখানে সমান নয়,– সম্ভোগ্যা-সম্ভোগীর। মহাভারতীয় বৃত্তান্তেও দেখি দ্রৌপদী-পঞ্চপুরুষভোগ্যা মাত্র। সন্তান-ধারণ করে বলে সামাজিক প্রয়োজনে জনক নির্ধারণ আবশ্যিক বলে পুরুষের একাধিপত্যের ও একক সম্ভোগ্যের স্বীকৃতি রূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্রোক্ত 'সতীত্ব' সংস্কার বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে। নারী মনে এভাবে নারীসত্তার বিলোপ ঘটিয়ে তাকে পুরুষ-সম্ভোগ্যা, পুরুষসেবিনী গৃহ-পরিচালিকা প্রাণীতে পরিণত করেছে পুরুষেরা স্বার্থেই, নারী তো জননক্ষেত্র মাত্র, তাই সন্তানে নেই তার অধিকার।

স্বামীভোগ্য বলেই উচ্ছিষ্ট অকেজো নারীকে হিন্দুসমাজে পুড়িয়ে মারা হত। আজো পুরুষ-স্পৃষ্টা বলেই বিধবাবিবাহ ঘৃণ্য। কি অযৌক্তিক, অবিবেকী নির্মম অমানবিক মনোভাব পুরুষভোগ্য নারীর প্রতি। এ জাতীয় লোকাচার ও শাস্ত্রীয় বিধান ১৯৮৯ সনেও সগর্বে অনুসৃত। এ-ও কি মানবতা! নারী যে পুরুষভোগ্য প্রাণীমাত্র, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ কেবল সতীদাহে, বালবৈধব্যে ও পুরুষের অসংখ্য বিবাহে নয়, স্বামীর মৃত্যু মুহূর্তে নারীর শাড়ি-অলংকার খুলে নিয়ে নারীকে শ্রীহীনা করার শাস্ত্রিক-সামাজিক প্রথাপদ্ধতিতেও স্বীকৃত ও সমর্থিত। ঘরে ঘরে নারী-পুরুষে আপাত অভিন্ন স্বার্থে একত্রে বাস করে, একে অপরের জন্যে মমতা ও দায়িত্ববশে প্রাণও দিতে পারে। তবু দু'টো জাত স্বতন্ত্র, একজন শাসক-পালক, অপর জন শাসিত-পোষিত। স্বামীবাচক যত শব্দ আছে, সবগুলোই তাই মালিক-মনিব বা পূজ্যজ্ঞাপক। হাজার হাজার বছরের আশৈশব লালিত শাস্ত্রিক পারিবারিক সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারবশে নারীও আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান হারিয়ে, স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্য খুইয়ে প্রথমে পিতার পরে স্বামী-পুত্রের আশ্রিত হয়ে থাকে। অর্থে-সম্পদে ঋদ্ধ থাকলেও মানসিক বল-ভরসার জন্যে তার পুরুষ অভিভাবক যেন জরুরী। পুরুষ-বৃক্ষে নারী যেন লতা। এ কালেও উচ্চ শিক্ষিতা বড় চাকুরে কনে, সমান বা ছোট চাকুরে কিংবা বেকার স্বামী থেকে সম্ভোগ-চুক্তিপত্র কাবিনে মোট অঙ্কের অর্থ লিখিয়ে আত্মবিক্রয় করতে লজ্জাবোধ করে না। অখ্যাত স্বামীর নাম স্বনামে যুক্ত করে হয় কৃতার্থ। আজো গ্রামের গৃহস্থ বধূর ও শহরের শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূর পারিবারিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও পরিবারের অবস্থানগত মর্যাদা অভিন্ন। ম্যাসিডোনিয়ার একটি প্রাচীন লোকগীতিতে বধূর দায়িত্ব-কর্তব্যের এক নিখুঁত রেখাচিত্র রয়েছে :

তুমি যথেষ্ট দিন বালিকা থেকেছ
যথেষ্ট দীর্ঘ বেণী বেঁধেছ
এখন থেকে অপেক্ষা করবে
হাট থেকে শ্বশুরের ফেরার জন্য
ক্ষেত থেকে স্বামীর ফেরার জন্য
বন থেকে ভাশুরের ফেরার জন্য
আঁধার কারাগার–
তোমার বাহুর উপরে ভারী লোহা
মাথার উপরে ভারী বোঝা
আঁধার কারাগার তোমার স্বামী
ভারী লোহা তোমার শিশু
ভারী বোঝা তোমার গৃহ।*

প্রাণী প্রজাতি হিসেবে একটা বিশেষ বয়সে প্রকৃতির নিয়মেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া হিসেবে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক অপ্রতিরোধ্য ও আবশ্যিক। প্রকৃতির নিয়মেই রতিরমণে সক্রিয় উদ্যোগ আসে পুরুষ থেকেই। ফলে নারী কেবল নিষ্ক্রিয় সম্ভোগ পাত্রী রূপেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষের কাছে পরিচিতা। কামে-প্রেমে যৌবনবতী রূপসীই কাম্য, সবাই রূপসী নয়। কাজেই নারীর অধিকার নিয়ে পুরুষে পুরুষে অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ঘটেছে। যৌথ জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যেই চালু হয়েছে বিবাহপ্রথা। বিবাহের পরে বিবাহিতা নারীতে বা পুরুষে যেন কেউ আসক্ত না হয়, সেজন্যই বিবাহমাত্রই সমাজস্বীকৃত সামাজিক-শাস্ত্রিক প্রকাশ্য অনুষ্ঠান। তারপর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মনুষ্যসমাজের নারীরূপা অর্ধেক মানুষ লোহার জুতায় বাঁধা চীনা মেয়েদের মতো, খাঁচায় বদ্ধ পাখির মতো মন-মনীষার বিকাশরুদ্ধ গৃহবন্দীর এক অস্বাভাবিক-অমানবিক কাঙ্ক্ষাহীন জীবনে হয়েছিল অভ্যস্ত। পৃথিবীর অর্ধেক মানব-শক্তির কি অশেষ অপচয়। অথচ শাণিত বুদ্ধিতে সাহসে কিংবা যুদ্ধে ও শাসনে অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর সুযোগপ্রাপ্ত নারীরা রেখেছে।

তা ছাড়া বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রযুগের শুরু থেকেই ঘরে-বাইরে বদলাচ্ছে জীবনদৃষ্টি, ভাঙছে শাস্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ, ছিঁড়ছে সমাজে নীতি-নিয়মের বন্ধন, জীবনাচারে আসছে বৈচিত্র্য, পালটে যাচ্ছে জীবিকাপদ্ধতি, বিশ্বাস-সংস্কারের নিগড়ও টুটছে। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে যন্ত্র প্রভাবে জগৎ ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে চিন্তার ও চেতনার, দৃষ্টির ও লক্ষ্যের, নীতির ও নিয়মের পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, সমস্যাসংকুল জীবনের ও জীবিকার প্রতিবেশে জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে দেশ-কালের উপযোগী নতুন মূল্যবোধজাত নতুন নীতি প্রবর্তিত হল। প্রয়োজন, উপযোগ ও যুক্তিই হল এ নীতি-পদ্ধতির ভিত্তি। যন্ত্রচালিত ও প্রভাবিত নতুন জীবনদৃষ্টিতে, জীবিকাব্যবস্থায় স্কুলে-কলেজে, কলে-কারখানায়, দরবারে-দপ্তরে, বেচায়-কেনায় সর্বত্র নারী-পুরুষের সহাবস্থান, সহযোগিতা, সহচারিতা অপরিহার্য হয়ে উঠল।

AMARBOI.COM

কাজেই পরনারী-পরপুরুষ সংসর্গ এড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে এ কালে। আর আমরা জানি, ভাল লাগলেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, এটি জীবনসত্য ও যৌবনধর্ম। তাই, এযুগে স্বামীত্বের, সতীত্বের, বিবাহের ও দাম্পত্যের সনাতন শাস্ত্রিক, নৈতিক ও সামাজিক ধারণা বর্জন করে বাস্তব পরিস্থিতির ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবে মানা সম্ভব স্বতো-উদ্ভূত নতুন নীতি-নিয়ম, যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি সমন্বিত করে বরণ করতেই হয়েছে প্রতীচ্য জগতে। অধবা-বিধবার সন্তান কিংবা সধবার অবৈধ সন্তান আজকাল প্রতীচ্য দেশে সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাচ্ছে। মহাভারতের নায়কেরা-ব্যাস, ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, শান্তনু, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, সত্যকাম, পঞ্চপাণ্ডব প্রমুখের জন্ম বৈধ দাম্পত্যে হয়নি, সত্যবতী, কুন্তী প্রভৃতিও ছিলেন না প্রচলিত অর্থে সতী। তাছাড়া গোটা দুনিয়ায় এখনকার মানুষমাত্রই 'বিবাহপ্রথা' চালু হওয়ার পূর্বেকার তথ্যকথিত বেজন্মার বংশধর। সাড়ে তিনশ বছর ধরে আমেরিকায় মনিব-ভোগ্য নিগ্রোনারীর সন্তানেরাও ছিল বেজন্মা। সে কারণে মানব ধর্মের তথা মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। এ যুগে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক-দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্র [১৯০৫-৮০] ও সিমোন দ্য বোভেয়ার [১৯০৮-৮৬] এ যুগসম্মত দাম্পত্যের বা সহবাসের আদর্শ রেখে গেছেন। এমনি জুড়ির সংখ্যাই ক্রমে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলরা এমনি প্রীতিপছন্দ ভিত্তিক কণ্ঠীবদলে বিবাহ প্রথা অন্তত সাড়ে চারশ বছর আগে থেকেই এ বাঙলাদেশেই চালু করেছে। এবং বিরাগে দাম্পত্য বর্জন-বিলোপও ছিল সহজ ও অবাধ। এক সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবরণ যোগাড় করতে পারেনি বলে মানুষ নিরাবরণ ছিল, পরে বিশেষ তত্ত্ব ও তাৎপর্য বোধগত করে মানুষ নগ্নতা বরণ করেছে— নাগা সন্ন্যাসী, বুরহান ফকির, দিগম্বর জৈন শ্রমণ ও য়ুরোপীয় ন্যুডিস্ট তার প্রমাণ। একালে প্রতীচ্যজগতে নারীর পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে যে স্বাবলম্বন-স্বপোষণ ও স্বাধীনতা আমরা লক্ষ করছি, তাও পৃথিবীর নানা স্থানে নানা রূপে চালু ছিল। আজ কেবল নতুন প্রয়োজনে, নতুন তাৎপর্যে তা নতুনভাবে চালু করতে হচ্ছে মাত্র। সুচিবায়ু ছাড়তে হবে, রিরংসা প্রসূত ঈর্ষা-অসূয়া সংযত করতে হবে। হতে হবে সহিষ্ণু। থাকতে হবে গ্রহিষ্ণুতা। অতএব পরিবারে, সমাজে জীবিকায় রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের সমকক্ষতার স্বীকৃতিতে নারী ও পুরুষ সত্তার পূর্ণাঙ্গতার ও স্বাধীনতার অঙ্গীকারে সহযোগিতায় সহচারিতায় সহাবস্থান করতেই হবে নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায়। মন-মনীষার বিকাশে আকাঙ্ক্ষার ও জিজ্ঞাসার প্রসারে, উৎপাদক ও ব্যবহার্য হাতিয়ার যন্ত্রের সামগ্রীর বৃদ্ধিতে উৎকর্ষে ও বৈচিত্র্যে জীবনের কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে মানুষ পুরোনো শাস্ত্রিক বিধিনিষেধ, সামাজিক নীতি-নিয়ম, রাষ্ট্রিক আইন-কানুন, ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণ, রীতি-পদ্ধতি পরিহার করে কোনদিন ঠকেনি বরং সংস্কৃতি-সভ্যতায়, চিন্তা-চেতনায়, সাচ্ছল্যে-স্বাচ্ছন্দ্যে, সৌকর্যে এগিয়েছে, ইতিহাসের সাক্ষ্যে তা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়। অতএব, মা ভৈঃ।

দাস প্রথার শুরু থেকেই মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় সব ফল-ফসল সম্পৃক্ত কাজ ও সব নির্মাণ কার্য করেছে শ্রমিকেরাই, দুনিয়ার যাবতীয় নির্মিত সামগ্রী ওই নিঃস্ব নিরক্ষর কিন্তু সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনপ্রবণ নিপুণ শ্রমিকদেরই দান। মাটির ও ধাতব দ্রব্য সামগ্রী, চিত্রিত, উৎকীর্ণ চারু-কারু-দারুশিল্প কর্ম, স্থাপত্য ভাস্কর্য, বাদ্যযন্ত্র, মসলিন আদি সর্বপ্রকার রেশমী ও সুতী পোশাক, জলযান, স্থলশকট প্রভৃতি মানুষের যাবতীয় ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী ভারতের অস্পৃশ্য ও স্পৃশ্য বৃত্তিজীবী নিঃস্ব নির্বিত্ত অনাহার অর্ধাহার ক্লিষ্ট কোপীণসার শ্রমজীবী মানুষের দান। ওরাই ছিল নির্মাতা ও যোগানদার, আর ভোগ-উপভোগের, ব্যবহারের মালিক ছিল ধনে-জনে-বুদ্ধিতে প্রবল শ্রেণীর মানুষ। আজকের রাজ-সূতার-কারখানাশ্রমিকের কিংবা চা বাগানের কুলির মতোই যে তাজমহল কিংবা রাজার প্রাসাদ, ধনীর ইমারত তৈরী করেছে, তাঁতে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন তৈরী করছে, তার বাড়িতে ছিল না একখণ্ড ইট পাথর, ছিল না ভাত কাপড়, গায়ে ছিল না আবরণ। এমনি পীড়ন শোষণ চলে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। এ নিশ্চয়ই মানব ধর্মানুগ তথা মানবে প্রত্যাশিত আচরণ নয়। এ হচ্ছে প্রাণীসুলভ প্রবৃত্তি চালিত কর্ম ও আচরণ। এ ক্ষেত্রে আজো আমাদের শিক্ষিতদেরও মনোভাব তথা চিন্তা-চেতনা মানবিক নয়। আমাদের মধ্যে মানবিকতা বা মানবতার উন্মেষ হলেও আজো যে বাঞ্ছিত বিকাশ হয়নি, আজকের গণমানবের অবস্থা তার সাক্ষ্য।

আমাদের দেশেও গণমানবের রয়েছে চারটি মতলববাজ লুটেরা শত্রু—

১. ঠিকেদার ব্যবসাদার কারখানাদার যারা আমাদের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, ভেজালে, মৌজুতে, চোরাচালানে, পাচারে তারা মুদ্রা-প্রতীক আর্থিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

২. মুৎসুদ্দি সরকার যা বিদেশীর ঋণে দানে অনুদানে আত্মপুষ্টি ও দলতুষ্টি লক্ষ্যে কূটমতলববাজ বিদেশী অভিভাবকের নির্দেশিত নীতি-নিয়মে শাসন চালায় বলে গণহিত সাধনে অক্ষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. ঘুষপ্রবণ ও কর্তাভজা আমলা— এরা যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক বিসর্জন দিয়ে চালু নীতি-নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে অর্থের বিনিময়ে কিংবা দুষ্ট কর্তার অভিপ্রায়ক্রমে সর্বপ্রকার অন্যায় অপকর্ম করে দীন দুর্বল অসহায় কোটি কোটি সরল নিরপরাধ মানুষের জান-মাল-নিরাপত্তা বিপন্ন করে। দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্তদের আইন-শৃঙ্খলা ভাঙার ও অপরাধ করার বর্ধিষ্ণু প্রবণতার জন্যে এ প্রশাসনাদি সরকারী অফিসের নানা শাখা-প্রশাখায় নিযুক্ত আমলারাই দায়ী। এদেরই প্রশ্রয়ে ক্ষমতাবান মুৎসুদ্দি ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিচালক তথাকথিত নির্বাচিত অসাধু মোড়ল-মাতব্বরেরা জনজীবনে জান-মাল-মান-সম্পদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ত্রাতা না হয়ে হয়েছে ত্রাসস্রষ্টা। এরা নামে জনসেবী, কাজে জনশোষক ও জনপীড়ক। এখানেও অনুপস্থিত মানবিকতা ও নৈতিকতা। প্রাণীর জোর-জুলুমের প্রাবৃত্তিক ধর্মই এখানে প্রশাসককাম্য।

৪. বাকী থাকল প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক দল—বহুজনহিত-বহুজনসুখ এদের চিন্তা-চেতনা-আদর্শের ও লক্ষ্যের বাইরে। ভোটের ও বক্তৃতার প্রয়োজনেই এদের থাকে জনগণের সঙ্গে পার্বণিক সংযোগ। অনায়াসে অর্থ-বিত্ত-মান-যশ-ক্ষমতা লাভের লোভে এরা ভোল পালটায়, বোল বদলায়। এরা বেহায়া-বেশরম, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় এদের নেই। এরা নিঃসংকোচে দলছুট হয়ে নয়াপ্রভুর পদ লেহনে, কসিদা লেখনে কিংবা চরণ-চারণে পটু। এদের সদা পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক কর্মসূচী ভাঁওতাবাজিমাত্র। এ চরিত্রে ও আচরণে আত্মপ্রকাশও কি মানবিকতা?

এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখ্য যে কৃপায় করুণায় দানে-দাক্ষিণ্যে সনাতন সংস্কারবশে মানুষ মহত্ত্ব-মহিমা আরোপ করে বলে দুস্থমানবতার ছদ্মসেবক হয়ে এক শ্রেণীর গণশোষক উদ্বৃত্তভোগী শহুরে শিক্ষিত ধনী রোটারী-লায়ন ক্লাবের নামে পাঁচতারা হোটেলে খেয়ে দাতারূপে শহরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনহিত কর্মে আত্মপ্রচার করে শোষিতদের রোষের স্থলে তারিফ কুড়োতে ব্যস্ত। এ হচ্ছে তাদের পক্ষে দান-বিলাস, আর জনগণের চোখে 'গোরু মেরে জুতা দান'। অথচ শহুরে শিক্ষিত জনগণও এদের উদারতায় দানশীলতায় ও মহত্ত্বে মুগ্ধ। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে!

বহিঃশত্রুকে প্রতিরোধ প্রতিহত করার জন্যে এবং রাজদ্রোহীকে দমন করার প্রয়োজনে সৈন্যদল পোষার রীতি প্রাগৈতিহাসিক। এদের কাজ হচ্ছে শত্রু হত্যা। সৈনিকবৃত্তিধারীও পররাজ্যে ভাড়াটে সৈনিক রূপে কাজ করে। কাজেই দেশপ্রেম থাকা আবশ্যিক নয়, যার নিমক খাই প্রাণপণ করে তার কাজ তথা তার পক্ষে মারামারি করি—এ-ই হচ্ছে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার উৎস ও অঙ্গীকার। তাই নরহত্যাকে তারা পাপকর্ম বলে মানে না। বরং পুণ্য নিমকহালালিতে— অঙ্গীকার পালনে। কিন্তু বিবেক বলে, আমি অন্যের স্বার্থে অন্যের হয়ে অন্যের পক্ষে নরহত্যা কেন করব— যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, যে আমার ক্ষতি করেনি? নিতান্ত খোরপোশের বিনিময়ে অর্থের প্রয়োজনে সৈনিক হওয়াতে নৈতিক যুক্তি আছে কি? এমন দিন কি মানবতার নামে আসবে না, যেদিন অন্যায় বলেই মানুষ সৈনিক হতে, যুদ্ধ করতে অস্বীকার করবে? ন্যায়বিরোধী অযৌক্তিক, অনৈতিক অপকর্ম করার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি অমানবিক, মনুষ্যত্ব বিরোধী? এসব প্রশ্নও এ যুগে মীমাংসার অপেক্ষায় রয়েছে। কেননা, আমরা জানি সরকার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈনিক ছাড়া সারা পৃথিবীর সব মানুষই আজ যুদ্ধভীরু—তাই যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী। এ এক জায়গায় অন্তত মানবতা-মানবিকতার কলি ফুটেছে, মনে হয়।

আমরা দেখলাম চিরকাল বুনো-বর্বর ও ভব্য সমাজে শক্তিতে ও বুদ্ধিতে প্রবল শ্রেণীর মানুষেরা শ্রেণী-স্বার্থেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতির রকমফের মান-মাপ নিরূপণ নির্ধারণ করেছে— শাস্ত্রের সমাজের সরকারের এমন কি মানবতার দোহাইও উচ্চারণ করে। তাই পরাক্রান্ত রাজা অন্যের দেশ কাড়লে, সম্পদ লুট করলে, নরহত্যা করলে কোন পাপ হয় বলে দুনিয়ার কোন ঐশ কেতাবেও লেখে না। অথচ সাধারণ ব্যক্তি পরের দেহ-মন-বিত্ত-বেসাত প্রভৃতির উপর কোন জুলুম করলে তার ঐহিক, দৈহিক ও পারত্রিক ত্রিমুখী শাস্তি অবশ্যম্ভাবী [অনৈতিকতা, অপরাধ ও পাপ vice, crime, sin, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও পারত্রিক অপরাধ]। ব্রাহ্মণ নরহত্যা করেও মাথা মুড়িয়ে পাপ ও অপরাধমুক্ত হত, অন্যদের দিতে হতো প্রাণ। শাহ-সামন্ত ও পুরোহিততন্ত্রের রূপ-স্বরূপ সবারই জানা। আসমানী জুজুর ভয় জাগিয়ে শক্তিমান বুদ্ধিমানেরা মনুষ্য সমাজকে অনুগত গড্ডালিকা করে রেখেছিল, বলতে গেলে য়ুরোপেও আঠারো শত অবধি।

সতেরো শতক থেকে এক সামন্তের স্থলে যখন বিদ্যা-বিত্ত-অর্থবান ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী লক্ষ বুর্জোয়া গড়ে উঠল, তখন স্বার্থরক্ষার জন্যে ক্ষমতায় ভাগ বসানোর প্রয়োজনে পুরোহিতের ও রাজার ক্ষমতা সীমিত করার মানসিক ও সামাজিক-প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হল। দু'পক্ষই এতকাল যা যা করেছে সবটাই ঈশ্বরের, মানবতার ও জনহিতের নামেই করেছে। এদের ন্যায়বোধে ও শাস্ত্রানুগত্যে ছিল এ কালের মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির যাদুবুলির মতো ফাঁকির ফাঁদ। তাই গণমানবের শোষণ-পীড়নমুক্তি ঘটেনি, আদর কদরও বেশী হয়নি লালিত কুকুর-বেড়ালের চেয়ে।

AMARBOI.COM

আস্তিক মানুষের মন-বুদ্ধি-যুক্তি-আদর্শ দিগ্‌দড়ি দিয়ে সুদূর অতীতের সঙ্গে বাঁধা, কারো চোখে জ্ঞান-চিন্তার আধার ওল্ড টেস্টামেন্ট, কারো কাছে গীতা, কারো জন্য জেন্দাবেস্তা, কারো বিবেচনায় ত্রিপিটক, কারো ধারণায় নিউটেস্টামেন্ট, কারো যুক্তিতে কুরআন। এরা কেউ স্বকালে মানসবিহার করে না। চিন্তা-চেতনায় এদের সমকালীনতা নেই। ন্যায়-নীতি-নিয়ম-আদর্শের ক্ষেত্রে এরা দেড় থেকে আড়াই-তিন হাজার বছর আগেকার জগতের বাসিন্দা। তাই এ কালের মানবিক-সামাজিক-আর্থিক-রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধান পন্থাও এদের অচিন্ত্য। কেবল ডাস্ ক্যাপিটাল পন্থীরাই কাল-সচেতন।

৫.

গোষ্ঠী বা জাতিগতভাবে মনুষ্যত্বের, মানবিকগুণের, মানবতাবোধের প্রত্যাশিত বিকাশ ও উন্নয়ন যে ঘটেনি, ফলে দুস্থ-দুর্বল শোষিত-পীড়িত গণমানবের যে জুলুমমুক্তি ঘটেনি, তারা যে মৌল মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে, তা-ই বলতে চেয়েছি নানা প্রত্যক্ষ বাস্তব সাক্ষ্য প্রমাণযোগে। নইলে আমরা জানি, মানব প্রজাতি যৌথজীবনের শুরু থেকেই সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে, ফ্রাটি-ক্ল্যান-গোত্র-কৌম-গোষ্ঠীপতিরা, সমাজ সর্দারেরা, নবী-অবতারেরা, সাধু-সন্তরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তাশীল মনীষীরা মানবপ্রেমীরা যুগে যুগে দেশে দেশে গোত্রে গোত্রে স্বাধিকারে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের প্রবর্তনা দিয়ে আসছেন। বলেছেন ভালো হও, ভালো করো, ভালো বাস, ভালবাসা চাও, নিজে বাঁচ, অন্যকেও বাঁচতে দাও। বলেছেন মানুষ নিয়েই জীবন। দ্বন্দ্বে-মিলনে, প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, রাগে-বিরাগে-মানুষের এই যৌথ জীবন, সামাজিক জীবন ছন্দোময়, তরঙ্গ-দোলায় কল্লোলিত। মানুষের এ মানবপ্রেম, এ মানবিকগুণের বিস্তার মাঝে মাঝে দেশে দেশে কালে কালে মাপে-মানে-মাত্রায় মানবপ্রেম ছাড়িয়ে গোটা জীবজগতের প্রতি প্রসারিত হয়েছে। মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গদেরও জীবনের মূল্য ও বাঁচার অধিকার স্বীকার করেছেন, জল-স্থল-আকাশচারী জীবে দয়া ছিল যিশুরও। সৃষ্টিকে ভালোবেসে স্রষ্টাপ্রেমে দীক্ষা নেয়ার বাণীও সুপ্রাচীন। জীবে দয়া করে যেই জন/সে জন সেবিছে ঈশ্বর—এমনি কথা এ সেদিনও এ দেশে উচ্চারিত হয়েছে। সবার উপরে মানুষ সত্য/ তাহার উপরে নাই/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই/ নাই কিছু মহীয়ান/ নর সে পরম দেব, নর সে ঈশ্বর/ মানবসেবাই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর উপাসনা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা কর/ গরীবকে তার প্রাপ্য জাকাত দাও। এমনি হাজারো বাণীতে ও কিছু কিছু মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে মানবিকতার, মানবতার-ও মানববাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দেশে দেশে কালে কালে। আজো মানুষের উপর অমানবিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাবার মতো নিষ্ঠুর অমানুষ যেমন মেলে, তেমনি জল-স্থল-আকাশচারী প্রাণীকুল রক্ষার জন্যে তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্যে জীবহত্যা বন্ধ করার লক্ষ্যে নিরামিষ খাদ্যে উৎসাহ দান করেছিলেন গৌতম, আমিষ খাদ্য নিষিদ্ধ করেছিলেন মহাবীর। দেশে দেশে দরদী মানুষরা সংস্থা-সমিতির মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক বোধি-হৃদয় বৃত্তির কাছ আকুল আবেদন জানাচ্ছে। জগতে বহু বহু জ্ঞানী-গুণী-মনীষী-দার্শনিক-সাহিত্যিক-চিন্তানায়ক, সংস্কৃতিকর্মী, মানবসেবী, রাষ্ট্রচিন্তক মানুষের মানবিকগুণের, মানবতার, মানববাদের ও মনুষ্যসম্ভব মানসশক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্যে নানাভাবে প্রবর্তনা দানের চেষ্টায় রয়েছেন।

কিন্তু প্রত্যাশিত মাপের মানের ও মাত্রার ফল মেলে না এ কারণে যে, প্রতিটি শিশু নতুন প্রাণী, নতুন মানুষ। এ শিশু পিতৃধনে ধনী হলেও, পিতৃগুণে গুণান্বিত হয় না, গান্ধীর ছেলে হরিজন প্রেমী অহিংসা-প্রচারক নেতা হয় না, রবীন্দ্রনাথের সন্তান হয় না কবি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির উল্লাসজাত আবেশে চাঁড়াল আম্বেদকরকে, চামার জগজীবনকে মন্ত্রী বানালেও তাঁদের স্বজাতরা আজো ঘৃণ্য অস্পৃশ্য। ফলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতিগতভাবে মানবিকগুণ, মানবতাবোধ, মানবপ্রীতি, মানবকল্যাণচেতনা সমাজে ও রাষ্ট্রে পারদের মতো ঘন ঘন ওঠানামা করে, মাপে মানে মাত্রায় স্থির থাকে না, তলানিতে যা স্থির, তা কাজে লাগে না। মানবের চিন্তা-চেতনার, সংস্কৃতি-সভ্যতার গতি-প্রকৃতি অনেকটা উপকূলপ্লাবী সমুদ্র-তরঙ্গের মতো দ্রুত এগিয়ে এসেও আবার হটে যায়, নেমে যায়, তাই অগ্রগতি হয় মন্থর।

একালে কেবল কম্যুনিস্টরাই আদর্শানুগত্যবশে মানববাদী হয়েছে। ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ মৌল মানবিক অধিকার পেয়ে স্বাধিকারে সম ও সহ স্বার্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় জীবনে-জীবিকায় অশনে-বসনে নিবাসে-নিদানে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে নির্বিবাদে সহাবস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। তবু সমাজতান্ত্রিক দেশেও সমাজবাদে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের রয়েছে ভীতি বা অনীহা। তারা শাস্ত্রে শ্রদ্ধার ও বাকস্বাধীনতার দাবিদার। তারা নাস্তিক্য ও বাকনিয়ন্ত্রণ বিরোধী। তাই সমাজতন্ত্রে তাদের আপত্তি। তারা দেখে-শুনে-বুঝে-ভুগেও মানে না যে চালু শাস্ত্র সমাজ সরকার তথা শাস্ত্রিক সামাজিক রাষ্ট্রিক নীতি-নিয়ম, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি বিরোধী কোন উচ্চারিত মত-মন্তব্য কিংবা অনুসৃত পথ-পদ্ধতি দুনিয়ার কোন স্বৈর শাহ্-সামন্ত কিংবা গণতান্ত্রিক সরকারও সহ্য করে না, করেনি, করবে না। সব রকমের সরকারই বিরুদ্ধবাদীকে ও বিপরীতকর্মীকে ধরে বাঁধে মারে ও কাটে। কাজেই এ যুক্তি অচল। আসলে যে মাত্রায় মানব দুঃখকাতর এ মানবকল্যাণকামী হলে সহজে সানন্দে সমাজ পরিবর্তনে রাজি এবং শোষণ জুলুম-মুক্তি লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মানুষ উৎসাহী হয়, সে মাপের মানের মাত্রার উপলব্ধিসম্পন্ন মানববাদী মানুষের সংখ্যা দেশে দেশে স্বল্প, তাই গণমানব আজো সর্বপ্রকারে ও জীবন-জীবিকায় সর্বক্ষেত্রে স্বাধিকার বঞ্চিত শোষিত-দলিত-পীড়িত। এ মুহূর্তে বাঙলাদেশে শতকরা আশি/ পঁচাশিজন মানুষ জীবন-যাত্রার নিম্নতম আবশ্যিক উপকরণের অভাবে অমানবিক তথা মানবেতর স্তরে জীবন যাপন করে।

প্রতিকারের উপায় কি? আমরা জানি এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার সব শাস্ত্রই ব্যর্থ হয়েছে, সামন্ত-বুর্জোয়ার নৈতিকচেতনা কেবল কৃপা-করুণায়, দান-দাক্ষিণ্যে তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে। ন্যায়-নীতি-আদর্শের প্রভাবও ফলপ্রসূ হয়নি, সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসও প্রভাবিত করতে পারেনি শাসক-শোষক গোষ্ঠীকে। যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা আবেগজড়িত ও উপলব্ধিগত না হলে মানুষ ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে তা রূপায়িত তথা বাস্তবায়িত করতে পারে না এবং গোষ্ঠী বা জাতিগতভাবে এমন অনুভূতি উপলব্ধি স্বাভাবিক নয়। এদিকে রোগকবলিত মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্যে প্রতিষেধক শৈল্যের ও ঔষধের আবিষ্কার ও উৎকর্ষ সাধনে বিজ্ঞানী ও সরকার সদা নিরত, অন্যদিকেও এ বিজ্ঞানী ও সরকারই পৃথিবী বিধ্বংসী প্রাণবিনাশী অস্ত্র নির্মাণে সদা-উৎসাহী। এ-ও হেগেলীয় ডাইলেকটিস বা দ্বন্দ্ববাদের অন্যরূপ। এ-ও মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক জড়তত্ত্বের অন্তর্গত। ঔষধ ও মারণাস্ত্র, রেডক্রস ও যুদ্ধ দুটোই কি মানবিকতার ও মানবতার প্রসূন? তাই প্রবলের বিপ্লবাত্মক কেজো ভূমিকা আবশ্যিক সমাজ পরিবর্তনের জন্যে।

সমাজবাদ-বিদ্বেষীরা অবশ্য সামন্ত-বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্র [এথিকস] বর্জন করে নতুন কোন দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক নৈতিকতা অঙ্গীকারে অবলম্বনে ও প্রচারে জুলুমমুক্ত সমাজের ভাত-কাপড়ের তথা অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধায়ক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু কিছু পুঁজিবাদী 'কল্যাণরাষ্ট্র' দেখে মনে হয় তা বাস্তবে সম্ভব হবে না। ইমানুয়েল কান্ট, জি, ই, ম্যুর, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ দার্শনিক প্রচারিত এবং তাঁদের পূর্বের ও পরের দার্শনিক লিউ টলস্টয়, রোমা রঁলা প্রমুখ মানববাদীপ্রোক্ত নীতি ও নৈতিকতা তত্ত্ব কোন নতুন সামাজিক-রাষ্ট্রিক-মানবিক মূল্যবোধ বাস্তবে মানুষের বোধ-বোধিগত করাতে পারেনি। তাই এসব প্রয়াসের ফল আশু তো নয়ই, ভাবীকালেও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিতব্য বলে আস্থা রাখা স্বেচ্ছায় বিড়ম্বনাকে বরণ করারই নামান্তর। আর অ্যা মোর‍্যাল [a-moral] ইমমোর‍্যাল [immoral] ও মোরাল [moral] — ও তো আপেক্ষিক ধারণামাত্র। দেশ, গোষ্ঠী বা জাতিগতভাবে মানবতার বিকাশ ও অভিব্যক্তি না ঘটলে গণমুক্তি তথা সর্বাত্মক মানবমুক্তি ঋজুপথে সম্ভব হবে না কখনো। তাই মানববাদীর উদ্যোগে সংঘটিত বিপ্লবই কেবল গণ-মানবের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে পারে।

গোবিন্দ দেব স্মারক বক্তৃতা, ১৯৮৭

কেতকীকুশারী ডাইসনকৃত অনুবাদ, জিজ্ঞাসায় [৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৩ সন] প্রকাশিত তাঁর 'বহুমাত্রিক নারী আন্দোলনের অভিমুখে' (পৃঃ ২৭২) থেকে উদ্ধৃত।

আবর্তিত সমাজের আজকের সঙ্কট

মধ্যযুগে তথা সামন্তযুগে জীবনযাত্রায় বিকাশ-বৈচিত্র্য ছিল দুর্লক্ষ্য। কারণ জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় হাতিয়ারে ছিল না উৎকর্ষ, তাই উৎপাদনেও ছিল না বৈচিত্র্য, প্রসার ছিল না সম্পদ ও পণ্য বিনিময়ের। জনগণের জীবন ছিল গাঁয়ের সীমায় নিবদ্ধ, হাট-বাজার-গঞ্জ-ঘাটই তাদের বহির্বিশ্ব। সাক্ষরশিক্ষা ছিল উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে নিবদ্ধ। তাও ছিল কিছু নির্দিষ্ট তথ্যে, তত্ত্বে ও সত্যে সীমিত। ফলে মানুষের বাহ্য জীবন ও আচরণ যেমন ছিল শাস্ত্র, সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত, মনোজগৎও ছিল শাস্ত্রোক্ত জীবনদর্শনে আবর্তিত। তাই আচারিক জীবন যেমন ছিল প্রথাসিদ্ধ নীতি-নিয়ম-রীতির অনুগত একঘেয়ে, মনোজীবনেও তেমনি ছিল ভূতে-ভগবানে সমান আস্থা, ভয় ও ভরসা। মন্ত্র-মাদুলী, তুক-তাক, দারু-টোনা, বান-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক ছিল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্তির, আপদ-বিপদ-শঙ্কা-সঙ্কট মুক্তির অবলম্বন। কাজেই সেকালের সমাজে আবর্তনই ছিল, বিবর্তন ছিল অদৃশ্য।

তবু কদাচিৎ কখনো দ্রোহের আকারে ভূ-কম্পের মতো, অগ্ন্যুৎপাতের মতো দেখা দিত ভাব-বিপ্লব, বিচলিত করত গণমন, তরঙ্গ-তাড়িত হত অটল সমাজ, ভাঙত মন, বর্জিত হত শাস্ত্র, গড়ে উঠত নতুন শাস্ত্র ও সমাজ। এভাবেই এগিয়েছে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ, বিকশিত হয়েছে মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতা, প্রসার পেয়েছে মনন, বিকাশ-বিস্তার পেয়েছে অনুভবের জগৎ।

তবু মানুষের সে ভাব-চিন্তার, মন-মননের, আকাঙ্ক্ষার অনুভবের পরিসর ও পরিধি ছিল সংকীর্ণ। তাই শাস্ত্রে-সংস্কারে-বিশ্বাসে-বোধে-বিবেচনায়, ইতরে-ভদ্রে, সাক্ষরে-নিরক্ষরে, বোকায়-বুদ্ধিমানে চেতনাগত পার্থক্য ও তারতম্য ছিল সামান্য। এ বোধগত ও শ্রেয়োবুদ্ধিগত সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য ছিল মানে-মাপে-মাত্রায় প্রায় অভিন্ন। তাই শাস্ত্রী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ন্ত্রিত ও সর্দার-শাসিত সমাজে সাধারণভাবে প্রায় সর্বপ্রকার শাস্ত্রিক-সামাজিক আচারে-আচরণে নীতি-নিয়ম-রীতি-পদ্ধতিগত শৃঙ্খলামানা মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি, ফলে শাসন করা, শৃঙ্খলা রাখা ছিল সহজ।

মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল এক অর্থে গণসাহিত্য অর্থাৎ সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-দরিদ্র উচ্চ ও নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের আয়ত্তে অর্থাৎ শ্রুতিগোচর ও বোধগত। কারণ সাহিত্য ছিল ঘটনার বর্ণনা ও বিবৃতিমূলক। আর লৌকিক, শারীর কিংবা আধ্যাত্মিক প্রেম-কাম কথা আর গানও ছিল বোধগত। ফলে বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা সত্ত্বেও শাস্ত্রিক, নৈতিক ও মানসিক পার্থক্য ছিল সামান্য। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কিংবা দৌলত উজির বাহরামের লায়লী মজনু, সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ, আলাউলের পদ্মাবতী, কাজী দৌলতের সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী ছিল জনসাধারণের সাহিত্য। বাউল-বৈষ্ণব-গাজন-গম্ভীরা-জারি-সারি-ভাটিয়ালিও ছিল গণোপভোগ্য গান।

আকস্মিকভাবে ইংরেজী ভাষা মাধ্যমে নতুন জ্ঞান-বৃক্ষের সন্ধান মিলে গেল। ফোর্ট উইলিয়ামের প্রভাবে রামমোহনের নেতৃত্বে ও প্রবর্তনায়, সে বৃক্ষফলে আকর্ষণ জাগল শিক্ষিত লোকের। বিপ্লব কিংবা বিপর্যয় ঘটল আমাদের মন-মননের, যুক্তি-বুদ্ধি-রুচির জগতে। মধ্যযুগীয় বিদ্বান মুনশী-মৌলবী-পণ্ডিত অভ্যস্ত মানসিক ও মননের দেয়াল অতিক্রমণে ছিল অসমর্থ।

নতুন চিন্তা-চেতনা ছিল নতুন জগৎ-চেতনা ও জীবনদর্শন। আমরা পেলাম দেশদুর্লভ নতুন মন-বুদ্ধি-যুক্তি-রুচি সম্পন্ন ও য়ুরোপীয় আচার-আচরণ প্রিয় শিক্ষিত মানুষ। কোলকাতা গড়ে উঠছে লন্ডনের আদলে।

দেশের মানুষের সাহিত্য সৃষ্টির বাহন ছিল পদ্য। কোলকাতার প্রতীচ্য প্রভাবিত মানুষের ভাষা হল গদ্য। এখন থেকে মনে-মেজাজে, রুচিতে-সংস্কৃতিতে, জীবনদৃষ্টিতে ও জীবনাচারে, বৃত্তিবেসাতে দেশে দু'টো বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে উঠল। মনে-মতে, সাহিত্যে, শিল্পে, জীবনবোধে-শ্রেয়োচেতনায় গড়ে উঠল বিচ্ছেদের ও ব্যবধানের দুর্ভেদ্য দেয়াল। পুরোনো সাহিত্য-শিল্প-রুচি-সংস্কৃতি আচার-আচরণ হল ইংরেজী শিক্ষিতদের কাছে অবজ্ঞেয় ও পরিহার্য। আর শহুরে শিক্ষিতদের সৃষ্ট ভাষা-সাহিত্য-শিল্প আর জীবনাচার রইল মুনশী-মৌলবী-পণ্ডিতদেরও পক্ষে অবোধ্য ও আনায়ত্ত আর অনক্ষর জনগণ শহুরে শিক্ষিতদের কাছে তো তখন অপরিচিত অবজ্ঞেয় বিভাষী বিজাতি। জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে সম্পর্কও হল শাসক-শাসিতের, শোষক-শোষিতের, বঞ্চক, বঞ্চিতের, অনাত্মীয়ের, অপরিচয়ের ও বিপক্ষের।

আশ্চর্য এ মানসিক, সামাজিক, ভাষিক, সাহিত্যিক, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক বিভক্তি ও বিচ্ছেদ কখনো শিক্ষিতদের চেতনায় ও বিবেচনায় গুরুত্ব পায়নি। সেঔদাসীন্য আজকের এ মুহূর্তেও শতকরা আটানব্বই জনের মধ্যেই দৃঢ়মূল।

পূর্বেকার একাত্মতা ও আত্মীয়তা হারিয়ে গেছে। স্বার্থের ও অনুভবের ঐক্য নেই। হাটে-বাজারে, গাঁয়ে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে দুপক্ষ সারাদিনই নানা কর্মোপলক্ষে একত্র হয় ক্রেতা-বিক্রেতা, হুকুমদাতা-আজ্ঞাবাহী, প্রভু-ভৃত্য, বান্দা-মনিব, দাতা-গ্রহীতারূপে, কিন্তু পরিচয় হয় না-জানাজানি হয় না, সুখ-দুঃখের কথা বিনিময় হয় না– সম্পর্কটা একান্তই যান্ত্রিক-রবোটের মতোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে বর্ণে-বিত্তে-জাতে-ধর্মে শত পার্থক্য সত্ত্বেও দৈশিক, সামাজিক, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক, আচারিক ও মানসিক সামঞ্জস্য-সাদৃশ্যজাত একটা সামগ্রিক-চেতনার বা সত্তানুভবের বা অভিন্নমূল রসুনের মতো সামাজিক অবয়বের অবিচ্ছেদ্যতার অবচেতন বন্ধন ছিল।

যদিও স্থায়ীনিবাস আর সম্পদ সঞ্চয়, রক্ষণ এবং বৃদ্ধিচেতনার উন্মেষকাল থেকেই অবশ্য অননুভূত শ্রেণীদ্বন্দ্ব চলছিল। বিধর্ম ও বিধর্মীর প্রতিও মানসিক বা নিষ্ক্রিয় অবজ্ঞা-ঈর্ষাও ছিল, কিন্তু তা সচেতন সংঘর্ষ-সংঘাতের রূপ নিয়েছে একালেই।

মধ্যযুগে অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষ ছিল প্রকৃতি-নির্ভর। ঝড়-ঝঞ্ঝা–খরা-বৃষ্টি-বন্যা তাদের ভাত-কাপড়ের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত, তাই তারা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে বলি-পূজা-শিরণী-মানত যোগে আবেদন-নিবেদন-প্রার্থনা জানাত অদৃশ্য অরি-মিত্র আসমানী শক্তির কাছে। কোন দুঃখ-দুর্ভাগ্যের জন্যেই নালিশ ছিল না তাদের কোন মর্ত্য মানবের বিরুদ্ধে, কৃতজ্ঞতাও ছিল না কারো প্রতি কোন প্রাপ্তি সুখের জন্যে। সবটাই ছিল নিয়তির লীলা। এভাবেই তারা ভয়ে-ভরসায়, সুখে-দুঃখে অনুগত থাকত দৈবশক্তির। প্রবোধ পেত সর্বনাশের পরেও।

কিন্তু আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তায়-চেতনায়, যুক্তিতে-বুদ্ধিতে ঋদ্ধ মানুষ এখন মানুষকেই মানুষের সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখের, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কারণ বলে জেনেছে। তাই আজ সব মানুষের দাবিই সরকারের ও সমাজের কাছে, বিশ্বমানবের কাছে পেশ করা হয় ন্যায়ের, অধিকারের, মানবিকতার ও মানবতার নামে। যা ছিল এক সময়ে আসমানী শক্তির কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্যের বিষয়, পূজা-প্রার্থনাই ছিল যে কৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তা-ই এখন দাবি হিসেবে পেশ করা হয় সরকারের, সমাজের ও মানবতার কাছে। এখন দাবি করার ও মেটাবার উপায় অনেক, এর জন্যেই প্রায়ই দ্রোহের, আন্দোলনের, কাড়াকাড়ির, মারামারির ও হানাহানির প্রয়োজন হয়। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত চলছেই দুনিয়াব্যাপী।

মধ্যযুগে শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে, বিত্তবানে-বিত্তহীনে মানসিক ও বৈষয়িক ব্যবধান-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-শ্রদ্ধা-ঘৃণা সত্ত্বেও— এমন দুস্তর-দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না– কেননা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাদের ধারণা মাত্রাভেদ মেনেও ছিল অভিন্ন।

তখন শিল্প বিপ্লব ঘটেনি। বাণিজ্যের ও বাণিজ্য-পুঁজির এমন বিশ্বব্যাপী বিস্তার ঘটেনি। গ্রামের হাট-বাজারেই ঘটত তাদের বিশ্বদর্শন, পণ্যবিনিময় নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল নিস্তরঙ্গ। আকস্মিক ঝটিতি উঠতি-পড়তি ছিল না সেই আয়-ব্যয়ের জগতে। হঠাৎ ধনী হওয়া কিংবা হঠাৎ পথে বসা সম্ভব ছিল না। শিক্ষালয় ও শিক্ষিত যেমন দুর্লক্ষ্য ছিল, তেমনি নিতান্ত বিরল ছিল সরকারী ও সওদাগরী অফিস, কাজেই দফতরে চাকুরে ছিল না হাজারে হাজারে বা লক্ষে লক্ষে। যন্ত্র ছিল না, যন্ত্রোৎপাদিত-যন্ত্রে নির্মিত ভোগ্য সামগ্রীও ছিল না এতো। নিতান্ত ভাত-কাপড় নির্ভর ছিল জীবন। তাই বস্তুগত চাহিদা তখনো বহু ও বিচিত্র হয়ে ওঠেনি। কাজেই আসমানী শক্তি নিয়ন্ত্রিত নিয়তি নির্দিষ্ট জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা-অভাব বিধিদত্ত বলে মেনে বিধি-বিধাতার আরো অনুগত থেকে গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করে করুণা-কল্যাণময় ঈশ্বরের রুদ্ররোষমুক্ত হতে চাইত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রের ও প্রযুক্তির প্রসারে, উৎকর্ষে ও বাহুল্যে, জনসংখ্যা স্ফীতির ফলে শিল্প কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রী বাহুল্যে ও বৈচিত্র্যে, বিশ্ব-বাণিজ্যের ও বাণিজ্যপুঁজির বিস্তারে শিক্ষিত ও কুশল চাকুরে-শ্রমিকের বৃদ্ধিতে, ভোগ-উপভোগের ক্ষেত্রে চাহিদার বিস্তারে দুনিয়ার সর্বত্র জনজীবন জটিল, ব্যয়বহুল, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংকুল হয়ে উঠেছে। এখন নানা কারণে সতর্ক-অসতর্ক, চালাক-সরল, বিদ্বান-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান নির্বিশেষে যে-কারো আকস্মিক কারণে উঠতি-পড়তি-ঝরতি নিয়তি হতে পারে।

য়ুরোপীয় প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা জগৎ-জীবন-মানুষ, মানসিকতা ও মানবতা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রীয় ও অধিবিদ্যাপ্রসূত দার্শনিক ধ্যান-ধারণা পালটে দিল, বিশ্বাস-সংস্কারের স্থান প্রায়ক্ষেত্রেই দখল করল জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা। ফলে জীবনের তাৎপর্য গেল বদলে, দেশ, মানুষ, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ন্যায়বোধও গেল পালটে। দেশে-মানুষে-সমাজে-রাষ্ট্রে ব্যক্তি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার বোধ নতুন বিকাশ-বিস্তার পেল। তাতে শিক্ষিত শহুরে বিত্তবান মানুষদের স্বাতন্ত্র্যচেতনা ঘৃণ্য ও বিকৃতভাবে পেল বৃদ্ধি। ফলে দেশ বলতে, জাতি বলতে, মানুষ ও মানবতা বলতে, রাষ্ট্র বলতে কেবল শিক্ষিতদের সমাজকেই বোঝায়। তাই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, যানবাহন, উদ্যান-স্টেডিয়াম, চাকুরী, অবসরভাতা, হাসপাতাল, চিকিৎসাভাতা, ছাত্রবৃত্তি, রেডিও-টিভি সবকিছু শিক্ষিতদের প্রয়োজনে ও সেবার জন্যে সৃষ্ট। শিক্ষিত-বিত্তবান নিয়ন্ত্রিত সরকার স্বশ্রেণীর মানুষের বিলাসের–প্রমোদের প্রসাধনের সামগ্রী মৌজুদ রাখাই দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মানে। এমনি করে এতোকাল সব আয়োজনের মূলে ছিল বিত্তবান শহুরে শিক্ষিতদের প্রয়োজন।

যন্ত্রনির্ভরতার প্রসারে অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব-নিরন্ন গণমানব ও চাষী-কুলি-মজুর ও মিল-মজদুর রূপে নগর-বন্দরের পরিবেশ প্রতিবেশ পেয়ে স্বশিক্ষিত ও সচেতন হয়ে উঠেছে। এখন তারাও মানবাধিকারকামী হয়ে আস্ফালন করছে 'আপন প্রাপ্য অধিকার চায়, তার লাগি দেবে লাল রুধির'। এরাও দুঃখ-পীড়ন-শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে বুর্জোয়াজীবনে উন্নয়ন ও উত্তরণ বাঞ্ছাবশে সন্তানকে স্কুলে-কলেজে পাঠাচ্ছে। তারা এসে শহরে ভীড় করছে, বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, পূর্ব প্রজন্মের শিক্ষিতরা একে উপদ্রব, সংকট কিংবা ঝামেলা ভাবছে স্ব স্ব যুক্তি-বুদ্ধি অনুসারে। তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্তির কিংবা প্রয়োজন মেটাবার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য নেই মুৎসুদ্দি সরকারের।

গোটা দুনিয়ায় পৃথিবীটা স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিতের ভোগ-উপভোগের স্বর্গরাজ্য ছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ভাগীদার শিক্ষিত লোকের শহুরে ভীড়, যন্ত্রের উৎকর্ষে ও প্রসারে অজ্ঞতায় অন্ধ গেঁয়ো মূর্খেরও জ্ঞানচক্ষুর উন্মিলন প্রভৃতির ফলে ফাঁকির ফাঁক ধরা পড়েছে সে-চোখে। এখন নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে শাসনে শোষণে বঞ্চনায় লুট করার উপায় প্রায় নেই-ই।

ইউরোপে শিক্ষার প্রসারের ও দুটো মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে গণমানবদের ঠকানো আর সহজে সম্ভব থাকেনি। তাই সেখানে পুঁজিবাদীরাও গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র চালাচ্ছে। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং রাষ্ট্রে গণদায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার চেতনার অভাব শাসক-শোষক গোষ্ঠীকে এখনো স্বৈরাচারী লুটেরা করে রেখেছে। কাজেই সে সব এলাকায় তথাকথিত গণতন্ত্র-প্রজাতন্ত্র বিদ্যায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিত্তে ঋদ্ধ জোর-জুলুমবাজ বিবেকহীন ধূর্ত সাহসী নেতার ও দলের কবলিত হয়ে বীভৎস স্বেচ্ছাতান্ত্রিক দুঃশাসন-ব্যবস্থার রূপ নেয় যার অপর নাম ত্রাস ও জুলুমতন্ত্র। ফলে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশে রাজনীতি প্রায়ই কাড়াকাড়ির, রক্তাক্ত মারামারির ও পরিকল্পিত হানাহানির বৃত্তান্তমাত্র।

দুষ্টবুদ্ধি পরাশক্তির মদদ, আর্থিক সাহায্য, অস্ত্র এবং যন্ত্রনির্ভর কোন অনুন্নত দেশেই অর্থ-বিত্ত-খ্যাতি। ক্ষমতাকামী মুৎসুদ্দি ছাড়া মাটি-মানুষপ্রেমী দেশসেবী কেউ ক্ষমতার আসনে সাধারণত বসতে বা থাকতে পারে না। বাঙলাদেশেও তাই রাজনীতিক অস্থিরতা ও বর্বর স্বেচ্ছাচার, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সংকট, দুঃশাসনিক নৈরাজ্য ও নীতি-নিয়ম-রীতির বিকৃতি-বিলুপ্তি, জনজীবনে ও জীবিকায় আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক এমনকি সম্পদের ও শরীরের নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে একদিকে এনেছে একটা ভয়ংকর ও মারাত্মক নৈরাজ্য ও অবসাদ, অন্যদিকে দৈহিক শক্তিতে ঋদ্ধ, মানসিক সম্পদে নিঃস্ব, বয়সে মৃত্যুচিন্তাশূন্য তরুণ-প্রৌঢ়দের করেছে বেপরোয়া লুটেরা। এরা সরকারের ও আমলার অদৃশ্য প্রশ্রয়ে গাঁয়ে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে সর্বত্র ঠিকেদার-সওদাগর, আড়তদার-দোকানদার-কারখানাদার, সরকারী-বেসরকারী প্রশাসক এবং মস্তান হিসেবে যে-কোন উদ্দিষ্ট মানুষের জান-মাল-গর্দানের মালিক। আমরা জলে কিংবা অরণ্যে বাস করি না বটে, কিন্তু আমরা মাৎস্যন্যায় ও জঙ্গলনীতির শিকার।

মানবিকতা ও মানবতাবিরোধী বলে রক্তাক্ত মারামারি ও হানাহানি আমাদের কাছে ঘৃণ্য ও পরিহার্য। 'সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না' বলে সমাজে পরিবর্তন লক্ষ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের উচ্ছেদের জন্যে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছায় কেবল রক্তাক্ত বিপ্লব আবশ্যিক বলে মনে করি। নইলে আমরা অন্য সর্বপ্রকার হত্যাবিরোধী। এতো কিছু সত্ত্বেও আমরা জানি, বুঝি এবং মানি যে দুনিয়ায় সামগ্রিকভাবে মানুষের মনুষ্যত্বের ও মানবতার বিকাশ-বিস্তার ঘটছে। মানুষ এক প্রকার মানসিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক পূর্ণতার দিকে মন্থরগতিতে এগুচ্ছে। এমনকি আমরাও। কিছুদিন আগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতায় ডক্টর পেইন্টান বাঙালী মনীষার অবক্ষয়ের জন্যে আফসোস ও একালের বাঙালীর নিন্দা করেছেন। আসলে বাঙালী হিন্দুর বিদ্যাবত্তা ও মানসোৎকর্ষ বাড়ছে। উনিশ শতকের শিক্ষিত-বিরল কোলকাতায় যে কয়জন চিৎপ্রকর্ষে ও মনীষায় অনন্য হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্ঞান-প্রজ্ঞা মনীষায় চিন্তা-কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোভা পেতেন; আর বিস্মিত জনগণের বরণীয়, শরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে ছিলেন। এ'রা পেয়েছিলেন নতুনের, বিরলতার, অনন্যতার ও পথিকৃতের গৌরব ও সম্মান। এখন এমনি বিদ্যা-বিত্তের, দান-দাক্ষিণ্যের, গণহিতৈষণার, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনীষার ও মনস্বিতার মানুষ কিংবা বিজ্ঞানী-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক অনেকতার দরুনই অনন্য অসামান্য রূপে খ্যাত বা চিহ্নিত নন। তাই ডক্টর পেইন্টানের মত-মন্তব্য অযথার্থ। আমাদের বাঙলাদেশেও চিন্তার ও কর্মের, সাহিত্যের ও শিল্পের, রাজনীতির ও সমাজহিতৈষণার ক্ষেত্রে কেবল প্রথম বলেই অনেক সাধারণ ও সামান্য ব্যক্তিও গৌরবগর্বী মুসলিম সমাজে অনন্য রূপে প্রখ্যাত এবং জন্ম-মৃত্যুদিনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ তাঁদের চেয়ে বিদ্যায়-বিত্তে-গুণে-মানে-মনে-মননে-মনীষায় এবং কৃতিতে উৎকর্ষ লাভ করেছেন, তেমন মানুষ আজকের সমাজে বিরল নয় বরং সব ক্ষেত্রেই বহু। কাজেই আমাদেরও মন্থরগতিতে হলেও বিকাশ ঘটছেই।

প্রায় সব রাষ্ট্রেই সংকট দেখা দিয়েছে জনবহুলতার ও চিরবঞ্চিত শোষিত কিন্তু অধুনা সচেতন ও জ্ঞান চক্ষুলন গণমানবের অধিকার দাবির বৈচিত্র্যে ও বাহুল্যে। জীবিকার্জনে মানুষ মাত্রেরই রয়েছে জন্মগত অধিকার। এই মৌল মানবিক অধিকার স্বীকারে ও দানে সরকারের অসামর্থ্য মানুষকে করেছে বিক্ষুব্ধ, বে-পরোয়া, নীতি-নিয়ম দ্রোহী, চোর-জালিয়াত-খুনী-দস্যু-জালিম। এবং তা কারণে-অকারণে সংক্রামক হয়ে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন করেছে বিকৃত, অসুস্থ এবং আপন্ন আপদে বিব্রত, অনিশ্চিত ও শঙ্কিত।

মানুষ বাঁচে আশা নিয়ে। মানুষ বাঁচে বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভর করবার মতো প্রিয়পাত্রকে অবলম্বন করে। মানুষ বাঁচে ভালোবাসা পেয়ে এবং দিয়ে। এগুলোর অভাব ঘটামাত্রই দিশেহারা অসহায় মানুষ অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করে।

মানুষ বাল্যে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন রচনা করে, যৌবনে বিরুদ্ধ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তা যথাসম্ভব বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। আজ প্রায় পৃথিবীব্যাপী আত্মপ্রত্যয়হীন সাহসরিক্ত বালক-কিশোর-যুবক জীবনসংগ্রামে জয়ের, আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা না দেখে আফিমে-কোকেনে-হেরোইনে-মারিজুয়ানায় স্বল্প যন্ত্রণায় আত্মহত্যার উপায় খুঁজে নিয়েছে।

এ সমস্যা মুখ্যত এখনকার মধ্যবিত্তের বা মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত শহুরে পরিবারের। আমরা জানি, শ্রম-শ্রান্তি দূর করার জন্যে, নিত্যকার নিস্তরঙ্গ জীবনের একঘেয়েমি এড়ানোর জন্যে কিংবা পরশ্রমজীবী বেকার বিত্তবান মানুষের নিষ্ক্রিয় অবসর বিনোদনের জন্যে নেশার প্রয়োজনীয়তা চিরকালই অনুভূত হয়েছে। সোমরস, ধেনো-তেলো-কাঁজি-মদ, তামাক, খৈনি, সাদা, জর্দা, বিড়ি-সিগার, (চুরুট), সিগারেট, নস্য, পান সুপারি, হরীতকী, আমলকী, যষ্টিমধু, গাঁজা, চরস, আফিম প্রভৃতি নানারকমের নেশাধরা শ্রান্তি-ক্লান্তি যন্ত্রণা-বেদনা নাশক কিংবা আনন্দবর্ধক, ফূর্তি সঞ্চারক-সামগ্রী মানুষ চিরকালই সেবন করেছে। বেশ্যাসক্তি, খেলাধুলা, তাস-জুয়া আড্ডাও একই প্রয়োজনের প্রসূন।

বলেছি সমাজের নিম্নবিত্তের পেশা-শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ এবং উচ্চবিত্তের প্রমোদপ্রিয় মানুষ চিরকালই নেশা-নির্ভর। কেবল অভাব ও প্রাচুর্যবিহীন নীতি-নিয়ম-শাস্ত্র ও রীতিনিষ্ঠ স্বল্পবিত্ত নিস্তরঙ্গ মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই নেশা, বিশেষ করে সুরাপান ছিল গর্হিত। কেননা অনাড়ম্বর জীবনাচারে তাদের অর্থ-বিত্ত ছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত সীমার নিচে এবং ন্যূনতম চাহিদা রেখার উপরে। তাদের মাটি-লগ্ন জীবনে তাই পতন যেমন ছিল না মারাত্মক, তেমনি উত্থানও ছিল না কখনো আকাশছোঁয়া।

যন্ত্রনির্ভর এ যুগে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শিক্ষিতজনের বহুলতা প্রভৃতি কারণে উপার্জনের সীমিত ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গেছে বেড়ে। সেখানে বিদ্যা-বিত্ত-বুদ্ধিতে, সাহসে, কৌশলে ও ধূর্ততায় যে যোগ্যতর বা প্রবল সেই প্রতিষ্ঠা পায়। হার-মানা অন্যরা প্রথমে ক্ষুব্ধ পরে হতাশ ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে নিরুপায় দিশেহারা ভবঘুরে জীবনে চিত্তলোকে হৃদয়গত মানবিকতার ও মানবতার বিলুপ্তি ঘটিয়ে খুন-খারাবির মাধ্যমে কেড়ে মেরে হেনে বাঁচার পথ বেছে নেয়। তারাই ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ভুলে থাকার জন্যে, সাহসী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্ঠুর হওয়ার জন্যে নেশা করে। তেমন মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী আত্মবিনাশী নেশা মেলে কোকেন-হেরোইন-মারিজুয়ানা-আফিমে। কেবল সমাজ পরিবর্তনেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এ আধি-ব্যাধি স্বল্পসংখ্যকে সীমিত রাখতে পারা যাবে বলে মনে হয়। অন্যত্র সংক্রামক রোগের মতোই এর ব্যাপক বিস্তার ঘটবে বলেই আশংকা করি। কেউ অভাবে এবং কেউ স্বভাবে নেশাপ্রিয় হবেই।

তবু আমরা আশাবাদী। আমরা জানি, বুঝি এবং মানি যে মানুষের স্বভাবেই এবং যৌথ জীবনে ও সমাজে এমন একটা অদৃশ্য ও অবচেতন শক্তি রয়েছে যা আকস্মিকভাবে প্রকট হয়ে গৌত্রিক, সামাজিক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে আসন্ন বিনাশ মুহূর্তে প্রতিকারে ও প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস যোগায়, পথ দেখায়। এ জন্যে একটা দেশের গোত্রের বা রাষ্ট্রের মানুষ ঔষধির মতো জাড়ে বিলুপ্তপ্রায় হয়েও বসন্তে শির উঁচু করে দাঁড়ায়, প্রাণের ঋদ্ধিতে সুন্দর হয়— শক্তিমান হয়, হয় ফলপ্রসূও।

আমরা এ-ও জানি যে পরিবেশের চাপে মানুষ দায়ে পড়েই সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারবদ্ধ হবেই। তবে তা অনুন্নত দেশে নিকট ভবিষ্যতে হবে না— দূর ভাবীকালের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

AMARBOI.COM

যুগান্ত লক্ষণ ঃ চেতনার রূপান্তর

এ কালে দেশ দুনিয়ায় পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী নির্বিশেষে সবাই গণতন্ত্র অঙ্গীকার করেছে। মানে-মাপে-মাত্রায় অবশ্য পার্থক্য রয়েই গেছে। যেমন সমাজতন্ত্রে দলীয় গণতন্ত্রই স্বীকৃত। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় জঙ্গী নায়কশাসকরাও গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়। বংশানুক্রমিক রাজার রাজ্যেও তাই এ যুগে গণতন্ত্র অচল নয়।

তাৎপর্যের দিক দিয়ে ব্যক্তি মানুষ মাত্রই গণ আঁধা কানা খোঁড়া ধনী নির্ধন নিঃস্ব, সাক্ষর-নিরক্ষর, চাষী-মজুর-ছোট-বড়ো-বৃত্তিজীবী, নারী-পুরুষ, অচিহ্নিত অনভিযুক্ত চোর ডাকাত লম্পট জুয়াড়ি জোচ্চোর জালিম জালিয়াত নির্বিশেষে সব মানুষই গণ। ভোটে সবারই সম অধিকার। অতএব গণতন্ত্র এক অর্থে মানবতন্ত্র। নির্বিশেষ ব্যক্তিকে কেবল মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে দেশে তার অভিন্ন নাগরিক তথা রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকার করে তাকে মানুষ হিসেবে মৌল মানবিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখার অঙ্গীকারই গণতন্ত্র। জাত-জন্ম বর্ণ-ধর্ম-সামর্থ্য-যোগ্যতা স্বভাব-চরিত্র-বিদ্যা-বিত্ত-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-দোষ-গুণ-রূপ-লিঙ্গ, বিশ্বাস সংস্কার মত পথ রুচি সংস্কৃতি, ভাষা অঞ্চল প্রভৃতি দিয়ে নয়, ব্যক্তি কেবল জীবন্ত মানব হিসেবেই থাকবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিচিত এ-ই হচ্ছে মৌল-মানবিক অধিকারের ভিত্তি।

কাজেই গণতন্ত্রের তাৎপর্যচেতনারিক্ত সুরুচি-সংস্কৃতিহীন স্থূলবুদ্ধি মানুষই কেবল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চল-বিদ্যা-বিত্ত-বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির স্বতন্ত্র্যের ও বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে মানুষকে চিহ্নিত করার মানসিকতা রূপ মধ্যযুগীয় বর্বরতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিহার করতে পারেনি। তারাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাস্ত্রমতের পার্থক্যে গুরুত্ব দিয়ে উনজনের উপর অধিজনের বর্বর জুলুম চালায় জীবন-জীবিকার এবং সমাজ-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে।

কোন পশু-পাখি-সরীসৃপ ফুল-ফল, ধর্ম-আচার প্রভৃতিকে জাতীয় প্রতীক রূপে চিহ্নিত করে প্রাচীন টোটেম-ট্যাবু বিশ্বাসের অনুগত থাকা, উদ্যান-গ্রন্থাগার-সৌধ-নদী-পর্বতকে জাতীয় গৌরব-গর্বের অবলম্বন করা, জাতীয় কবি, চিত্রী, লেখক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক রূপে সম্মানিত করা আপাত দৃষ্টিতে ঐতিহ্যচেতনা সংস্কৃতিমানতা, গুণগ্রাহিতা মূল্যমান সচেতনতা বলে প্রতীয়মান হলেও স্বরূপে এ এক প্রকার স্বাতন্ত্র্য ও সংকীর্ণ গোষ্ঠী চেতনারই অভিব্যক্তি। এ মানস প্রবণতা দেশ-জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-বিদ্যা-বিত্ত-স্বভাব-চরিত্র-বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির উর্ধ্বে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেব বিবেচনা করার উদারতা বিরোধী।

গণতন্ত্রের মূলতত্ত্বই হচ্ছে স্বশ্রেণীর প্রাণী হিসেবেই মানুষকে স্বাধিকারে ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার অঙ্গীকার। এখানে একমাত্র বিবেচ্য ব্যক্তির দোষ-গুণ, বিশ্বাস-সামর্থ্য নয়। কাজেই গোষ্ঠীচেতনা বশে অধিজনের ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা, অধিজনের ঐতিহ্যকে রাষ্ট্রিক ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি উনজনের প্রতি মানসিক জুলুম বলেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বর্বর মনের পরিচায়কমাত্র।

তা ছাড়া ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হওয়ামাত্রই নারীসমাজ সহশিক্ষা, বিজ্ঞাপন, নাচ-গান অভিনয় ও অফিসের চাকরী থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা। অমুসলিম হবে জিম্মি। তখন কেবল পুরুষ মুসলমান হবে দেশের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। নারী বর্জিত রেডিও টেলিভিশন সিনেমা নাটক হবে অচল। য়ুরোপীয় আদলে ও সম্পর্কে চালু আইন-কানুন, সামরিক পোশাক, হাতিয়ার, পদ-বিন্যাস ও নাম প্রভৃতি [স্বসংস্কৃতি বিরোধী বলে] হবে অবাঞ্ছিত ও বর্জনীয়। য়ুরোপীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য শাস্ত্র ও শরিয়া বিরোধী, তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কৃত ও নির্মিত যন্ত্র এবং চিকিৎসাবিদ্যা আর ঔষধ নাসরার অবদান বলেই হবে পরিহার্য। ব্যাঙ্কের ও বাণিজ্যের নানা নীতি-নিয়মও হবে বর্জনীয়।

শরিয়া অনুগ জীবন-জীবিকা-সমাজ-রাষ্ট্র রচনা ও পরিচালনা কি এ যুগে সম্ভব? তা হলে নির্বোধ নিরক্ষরের কেবল ভোট যোগাড়ের জন্যে লোক ঠকানো ধর্মধ্বজা কেন? রাজনীতিকদের কি বিবেকবান মানবপ্রেমী লোকসেবী মানুষ হতে নেই? কেবলই কি অর্থ-বিত্ত-খ্যাতি ক্ষমতাই তাদের লক্ষ্য ও বিবেচ্য থাকবে?

আজকের জগতে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার অনুন্নত ও দরিদ্র রাষ্ট্রে পরাশক্তির মদদ ও অর্থপুষ্ট এবং পরাশক্তির হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার ও হামলাভীরু মুৎসুদ্দি সরকারই শাসন প্রশাসন চালায়, এ সরকারই স্বস্বার্থ ও প্রভুর অভিপ্রায় অনুগ নীতি দুর্নীতি-নিয়ম-রীতি চালু রাখে।

উচ্চারিত অঙ্গীকারে ও আশ্বাসে তারা গণসেবক বটে, কিন্তু বুকে পোষা লক্ষ্যে তারা বৃত্তি-বিত্ত-খ্যাতি-ক্ষমতা লোভী, মান-যশ ভোগী এবং অপরের জান-মাল-গর্দানকামী মানবিক গুণরিক্ত ছল-চাতুরী নিপুণ ধূর্ত প্রাণী মাত্র। তাই তারা করে না এবং পারে না হেন অপকর্ম নেই। এমনি মানুষই আমাদেরও দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, আমাদের জীবন জীবিকার নিয়ন্ত্রক, আমাদের অশন-বসন, নিবাস-নিদান ও শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ামক। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অজ্ঞতার নিঃস্বতার হতাশার সুযোগ নিয়ে আমাদের ইহজাগতিক জীবনে প্রতারণার প্রবঞ্চনার উত্তম উপায় হিসেবে নিয়েছে পারত্রিক সুখ-স্বপ্নের বাহন ধর্মভাবের নেশাধরানো রাষ্ট্রধর্ম নামের হাওয়াই বটিকার মাহাত্ম্য কীর্তনে জনগণকে আশ্বস্ত রাখার নীতি। এ হচ্ছে বিভ্রান্ত জনগণকে ভিন্নমনস্ক রেখে একান্তভাবে ক্ষমতা দখলে রাখার তথা ভোটের রাজনীতি।

অথচ দেশের মানুষের আজকের জীবিকাসমস্যা এ নয়। অশন-বসন-নিবাস-নিদানের ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সমস্যার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, সম্পর্ক নেই নতুন প্রজন্মের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যসঙ্কটের সঙ্গেও। ভাত-কাপড়ের সঙ্কট-সমস্যার সঙ্গে আজকের কিশোর তরুণের আধির মহসঙ্কটও যুক্ত হয়েছে গোটা পৃথিবীর সর্বত্র। আজ ব্যক্তির, সমাজের ও সরকারের মুখ্য দায়িত্ব হচ্ছে এই আসন্ন ও আপন্ন সমস্যা-সঙ্কট বিমোচনে মন-মনন নিয়োগ করে উপায় উদ্ভাবন করা।

২

যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত এ যুগের ঐহিক জীবনসচেতন মানুষ যতটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক, ততটা ধর্মপ্রবণ নয়। তার প্রমাণ জীবনাচারের সর্বক্ষেত্রে শাস্ত্রানুগত্যে শৈথিল্য ও শাস্ত্রীয় নীতি-নিয়ম লঙ্ঘনের দৃশ্যমান আত্যন্তিক আগ্রহ। বস্তুত যেসব নীতি-নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি এবং ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ প্রাত্যহিক জীবনে গতির ও প্রগতির সহায়ক বলে শহুরে শিক্ষিত লোকেরা জানে, বুঝে ও মানে, সে সবের পুরোটা কিংবা অনেকখানিই যে-কোন শাস্ত্রবিরোধী, অন্তত শাস্ত্রসমর্থিত নয়। কেননা, শাস্ত্রগুলোর উদ্ভব সভ্যতার শৈশব-বাল্যকৈশোরকালের তথা ছয় হাজার থেকে দেড় হাজার বছর আগেকার। গত চারশ 'বছরে বিশেষ করে গত দেড়শ' বছরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের এবং বৈদ্যুতিক ও পারমাণবিক যন্ত্রের ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে, আর ডারুইন-মার্কস-ফ্রয়েড মনোজগতে বিশ্বাস-সংস্কারের দুর্গ বিধ্বংসী যে জ্ঞান-মনন-বিজ্ঞানজাত বিপ্লব ঘটিয়েছেন তার প্রভাবে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই হয়েছে ইহজাগতিক জীবনে আকৃষ্ট ও আস্থাবান, পারত্রিক জীবনের অস্তিত্বে জেগেছে তাদের সন্দেহ, সংশয় ও অনাস্থা। এ অবস্থায় এবং সামাজিক অবস্থানে থেকে যারা ধর্মবিশ্বাসের ও শাস্ত্রাচারের অনুগত, তারা মানসজীবনে মধ্যযুগ অতিক্রম করে স্বকালে উপস্থিত হতে পারেনি। পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে স্বকালীন প্রগতির পথে বাধা বলেই তারা সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়— সম্পদ নয়। এমন মানুষের আধিক্য যে রাষ্ট্রে সে রাষ্ট্রে স্বৈরাচার ও দুর্নীতি বেশি থাকে।

আমাদের মতে অনুন্নত দেশে প্রধান সমস্যা শিক্ষায়-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অর্থে-সম্পদে যন্ত্রে-প্রযুক্তিতে অনগ্রসরতা ও প্রজন্মক্রমে লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার আচ্ছন্নতা। আর প্রতীচ্যে গুরুতর মানবসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রাগ্রসরতা। গত সাড়ে চারশ বছর ধরে আবিষ্কার উদ্ভাবনপ্রবণ য়ুরোপই গোটা বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-শিল্পাদি চারু-কারু ললিত ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যকলার এবং রোগ প্রতিষেধকের, বস্ত্রর, বাণিজ্যের, যন্ত্রের ও কৃৎকৌশলের এমনকি ফ্যাশনেরও স্রষ্টা, ধারক, বাহক ও প্রচারক। আর পৃথিবীর অন্য সবাই ভোগ-উপভোগের ক্ষেত্রে তাদের অনুকারক মাত্র।

প্রতীচীর মানুষেরা পাতালের সীমানা এবং আকাশের কিনারা খুঁজে পেয়েছে। অভাব মোচন লক্ষ্যে প্রাপ্তির, সুখের ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষাই মানুষের জীবন-প্রেরণা। স্বপ্ন সাধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবায়ন বাঞ্ছাই জোগায় কর্মোদ্যম। প্রতীচীর স্বল্পসাধের ও সীমিত ক্ষুধার সাধারণ মানুষ অল্প বিস্তর সব সাধ, সব ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবার পারিবেশিক কারণেই সুযোগ পায় বলেই তাদের কৈশোরে যৌবনে আর কোন জগৎ-জিজ্ঞাসা ও জীবন-ভাবনা থাকে না। অথচ সাধ, স্বপ্ন, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাই সর্বপ্রকার উদ্যম-উদ্যোগের উৎস। শিক্ষার ও স্বাক্ষরতার প্রসারে দেখার মতো দৃষ্টি, জানার মতো জ্ঞান এবং বোঝার মতো বুদ্ধি মান-মাপ-মাত্রাভেদ সত্ত্বেও রয়েছে সবারই। পছন্দমতো কাজ পাওয়ার ও মনের মতো জীবন রচনার আর উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তীব্র, তীক্ষ্ণ, দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য দুর্জয়। বিদ্যার বুদ্ধির সাহসের সংকল্পের ও সম্পদের জোর যাদের নেই, হৃত আকর্ষণ, হৃত স্বপ্ন ও হৃত সাধ, হৃত আত্মপ্রত্যয় ও কাঙ্ক্ষা উদ্যম-উদ্যোগরিক্ত হয়ে তাদের কেউ কেউ বিকৃত জীবনাচারে আসক্ত, কেউ কেউ মাদকসেবনে আত্মবিনাশপ্রবণ।

বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভর করবার এবং ভালোবাসবার মতো আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুর আকর্ষণেই মানুষ তার জীবনকে ও জগৎকে ভালোবাসে, বাঁচার আগ্রহ রাখে, মৃত্যুকে ভয় পায়। আবার ওই স্বজনদের প্রতি মমতাবশে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগে, সেবায় স্বাচ্ছন্দ্য দানে আনন্দ-আরাম বর্ধনে তাদের সুখী রাখার যে আগ্রহ জাগে, সে আগ্রহবশেই কর্মোদ্যম আসে, যেমন আমরা আমাদের অনুন্নত অনগ্রসর সমাজে পরিবারের প্রয়োজনকেই নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিই— অনেক ত্যাগ স্বীকার করি। কিন্তু প্রতীচীর রাষ্ট্রগুলো জনগণকে অনাহারে অপমৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব ও ব্যবস্থা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করায় সেসব রাষ্ট্রে মা-বাবা-ভাই-বোন-ছেলে-মেয়ে-বর-বধূর প্রতি পারিবারিক তথা মানবিক কোন দায়িত্ব পালনও এখনকার দিনে আবশ্যিক নয়, ফলে অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে নয় কেবল, মমতার বন্ধনও শিথিল কিংবা বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে এখনকার সংজ্ঞায় ও তাৎপর্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনায় মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কে পরিবার অতীতের ও পরিহার্য ঐতিহ্যের বিষয় হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে কেবল পরিচিত-প্রতিবেশীসুলভ সামাজিক সৌজন্যের সম্পর্ক।

মানুষের সমাজে মন-রুচি-বুদ্ধি-জ্ঞানের ও ভোগ-উপভোগ চেতনার ক্ষেত্রে আজকে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত সংহত পৃথিবীতে বৈষম্যের দুস্তর ব্যবধান ঘুচে গেছে— রেডিয়ো টিভি সিনেমা পত্রপত্রিকা প্রভৃতির বহুলতার ফলে এবং অজ্ঞতার ও স্বৈরসামন্ত যুগের সেই ভোগ-উপভোগের ক্ষেত্রে ছোটলোক-বড়লোকের অধিকার ভেদও গেছে ঘুচে। এখন কেবল সাধ ও সাধ্যের মধ্যে অর্থ-সম্পদগত ব্যবধানই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য চেতনার তীব্রতাও মানুষকে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাভিলাষী করেছে। অথচ বাঞ্ছিত মানের, মাপের মাত্রার কাজ-পদ-অর্থ-বিত্ত পাওয়াও সহজ নয়। ফলে দাম্পত্য জীবনের ঝুঁকি নেয়ার সাহস হারাচ্ছে, দাম্পত্যে জাগছে অনীহা ও ভীতি। তাই 'জিউ ও পিও' তত্ত্ব অঙ্গীকার করে দায়-দায়িত্ব মুক্ত 'লিভ টুগেদার'ই শ্রেয় বলে মানছে। দাম্পত্যও এখন কোন পবিত্র দৃঢ় শাস্ত্রানুগ বন্ধন নয়। পুনঃ পুনঃ বিয়ে ও তালাক এখন দাম্পত্যকে করেছে ঠুনকো ও গ্লানিকর সহাবস্থান মাত্র, সন্তানদের করেছে পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধহীন। দাম্পত্য হয়েছে ভঙ্গুর সাময়িক প্রায়োজনিক ও প্রায়োগিক যৌনসম্ভোগ চুক্তিমাত্র। এর সামাজিক ও নৈতিক মূল্য সামান্য কিংবা শূন্য। দাম্পত্যের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে আত্মীয়সমাজ, বংশ, জাতি, কুটুম্ব চাচা-মামা-খালু-ফুফা। সে-আত্মীয় সম্পর্কটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে যাবে, লোপ পাবে। এ সব দেখে শুনে নতুন প্রজন্মের তরুণদের মনে জেগেছে দাম্পত্যে অনীহা ও ঘৃণা। প্রেম অনাস্থা, কামে পাশব স্থূলতাই এ বোধের পরিণাম। এর ফলে কিশোর-তরুণ হচ্ছে মানসিকভাবে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক, আধি তাদের পেয়ে বসেছে, তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হচ্ছে সমকামী। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ পাচ্ছে লোপ। সন্তান সৃষ্টির মাধমে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা যাচ্ছে উবে— প্রতীচ্য দেশে জনসংখ্যা শুধু 'এইডসে' নয়, মা-বাবা হওয়ার অনীহার ফলেও কমবে— ক্রমে লোপ পেতেও পারে লূৎ নবীর সোডোমের আদ ও সামুদ গোত্রের মতো। জ্বালাযন্ত্রণার একটু স্বস্তির সুখের ও আনন্দের জন্যে এরা অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে, ছটফট করছে। পাচ্ছে না তাই নেশা করে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময় কাটাচ্ছে, আয়ু কমাচ্ছে। আকর্ষণ, আনন্দ ও আত্মপ্রত্যয়রিক্ত কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীর বিকৃত জীবন চেতনা, আদি আবিষ্ট আচরণ, মাদকাসক্তি, সমকামিতা, সমাজ-সংস্কৃতি দ্রোহিতা, রুচিবিকৃতি ও আনন্দ-অন্বেষা, তৃপ্তি ও তুষ্টি সন্ধান প্রতীচ্য রাষ্ট্রে অচিরে অসমাধ্য সামাজিক নৈতিক সাংস্কৃতিক ও প্রাশাসনিক সঙ্কট-সমস্যারূপে প্রকট হয়ে উঠবে, পুরোনো শাস্ত্র, নীতি-নিয়ম, জীবনের ও সমাজের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও রুচিগত কাঠামো ধসে পড়বে, ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধ কোন প্রয়োজনে, আদর্শে ও নীতি-নিয়মে কি হবে, কোন পদ্ধতির হবে এখনি তা কেউ অনুমানও করতে পারবে না। কেবল সবাই এটুকু জানে, ব্যক্তিজীবন চেতনার প্রভাবে নতুন পৃথিবীর নতুন জীবনাচার ও নতুন সমাজসম্পর্ক এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। ভালোমন্দ যাচাই করার যোগ্যতা প্রবীণদের নেই, তবে নতুন যান্ত্রিক ও মানসিক প্রতিবেশে সব কিছু হবে নতুন, কেবলই নতুন। জনগোষ্ঠীর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত এমনি আমূল পরিবর্তনকে যুগান্তর বা কালান্তর বলে এ ক্ষেত্রে একে সম্ভবত পৌরাণিক তাৎপর্যে মন্বন্তরও বলা যাবে।

AMARBOI.COM

৩

ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষালাভের মুহূর্ত থেকেই— ১৭৫৭ থেকে নয়, উনিশ শতকের প্রত্যুষ থেকেই আমরা মনে-মননে, চিন্তায়-চেতনায়, ব্যবহারিক-বৈষয়িক-বাণিজ্যিক জীবনে, পোশাকে-আদবে, রুচি-সংস্কৃতি সম্পৃক্ত জীবনাচারে আমরা বুঝে না বুঝে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-শিল্পে-সাহিত্যে-স্থাপত্যে য়ুরোপের মুগ্ধ অনুকারী ও অনুসারী। আমাদের অনুকরণ-অনুসরণ ক্বচিৎ উপযোগ-উপলব্ধির ফল, প্রায়ই ফ্যাসানের সানন্দ অনুকৃতির প্রসূন। সিনেমা-রেডিয়ো-টেলিভিশন, বই-পত্র, অসংখ্য লোকের যাতায়াত প্রভৃতির ফলে সব ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য চেতনা আর অনুকরণ স্পৃহা মানুষের বেড়ে গেছে। ভালো পেতে হলে সদাসতর্ক থেকেও মন্দ মাঝারি ভেজাল সব সময়ে এড়ানো যায় না। তাই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ কল্যাণ চেতনা জাত অনুকরণ অনুসরণ কালে নানা ক্ষতিকর আচার-আচারণ ভোগ-উপভোগ সামগ্রীও অনুপ্রবিষ্ট ও অভ্যাসগত হয়ে পড়ে। এ সব অনুন্নত দেশে আসে বিদ্যা ও বিত্তবান সমাজে পরিচিত খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রতিপত্তিশীল সংস্কৃতিমান পরিবারের মাধ্যমেই। পরে সাধারণ্যে ও অসঙ্গতভাবে অনুকৃত হয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। হিরোইন-কোকেন-মারিজুয়ানা প্রভৃতি মাদক আসক্তিও বড়ঘরের তরুণ-তরুণী থেকে এদেশে সাধারণ বালক-কিশোর-যুবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসপাতালের তরুণ ডাক্তারে তরুণী নার্সে ছড়িয়ে পড়ছে। এ নেশা-আসক্তি বড়লোকের ও বড়ঘরের দান।

ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটে ক্ষমতার অপব্যবহারে, জুলুমে, বিলাসে, অপচয়ে এবং কৃপায়, করুণায় দানে ও দাক্ষিণ্যে। ঐশ্বর্য ভোগ-উপভোগের জন্যে মদ-মাগ-জুয়া, আমোদ-আনন্দের জন্যে নাচ-গান-সাহিত্য ছাড়া উপায়ান্তর সাধারণভাবে আগেও ছিল না, এখনো নেই। অতএব, ধনীঘরে অনন্ত অবসর যাপনের জন্যে খেলারূপে, আড্ডারূপে, আমোদ-প্রমোদরূপে, মদ-গাঁজা, চরস-আফিম-শরাব রূপে, যৌন সম্ভোগরূপে, মৃগ-মৎস্য শিকাররূপে নানা নেশার প্রয়োজন ছিলই। এ সব আবহমান কাল থেকে দুনিয়ার সর্বত্র লঘু-গুরুভাবে চলে আসছে। এরা জিগীষা মেটায় খেলায়-জুয়ায়-মামলায় ও দাঙ্গায়।

নিম্নবৃত্তির নিম্নবিত্তের মানুষের চির দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিরাকাঙ্ক্ষা জীবন-যন্ত্রণা সহনীয় করার লক্ষ্যে তারাও সান্ধ্য অবসরে ধেনো [ভেতো], তেলো [তাড়ি] মদে, কাঁজিতে, গাঁজায়, চরসে, আফিমে শ্রম-শান্তি, অভাব-যন্ত্রণা ভুলে থাকবার চেষ্টা করেছে চিরকাল। আর করেছে কামে প্রেমে নাচে গানে বাজনায় আমোদের ও আনন্দের আয়োজন। আর জিগীষা মিটিয়েছে খেলায় জুয়ায় তাসে পাশায় আড্ডায়। এমনি করে শ্রমনির্ভর নিঃস্ব জীবন কাটছে প্রজন্মক্রমে। এরাই শ্রম-শ্রান্তি, শারীর, ক্লান্তি ও মানসিক গ্লানি লাঘব লক্ষ্যে খৈনি-তামাক-বিড়ি-সিগারেট-পানসুপারী ও চা আশ্রয়ী হয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

উচ্চ ও নিম্ন এ দু'শ্রেণীর মাঝখানে রয়েছে বিপুল সংখ্যার এক মধ্যশ্রেণী। এদের নিম্নপ্রান্তে রয়েছে ভিক্ষাজীবী ও দিনমজুর, মধ্যে রয়েছে খেয়ে পরে বাঁচা এবং ভাত কাপড়ে বাঁচানোর মতো সামান্য ভূসম্পদ, চাষাবাদ কিংবা কোন সামান্য আয়ের বৃত্তি বেসাত। উচ্চ সীমায় রয়েছে স্বচ্ছন্দে সচ্ছলভাবে চলবার মতো অর্থ-সম্পদ। এরাই মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত। উনিশ শতকের আগে এদের জীবিকা ও আর্থিক ক্ষেত্রে তেমন উঠতি পড়তি ঝরতি ছিল না। এদের ছিল নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবন, চিন্তা-চেতনার ও স্বপ্ন-সাধের জগৎ ছিল অঞ্চলের দিগন্তে সীমিত। তাই এরাই শাস্ত্রীয় আচারের অনুগত, ভূত-প্রেত-জিনভীরু। সমাজের নীতি-নিয়ম শাসিত এবং পাপ-পুণ্য-নিন্দার গুরুত্ব সচেতন, সর্বপ্রকারে নীতিনিষ্ঠ ও সংযমপ্রবণ। যৌথজীবনে সমাজস্বাস্থ্য রক্ষায় ছিল তারা চিরসতর্ক ও নিষ্ঠ। সামাজিকভাবে গর্হিত বলে তাদের মধ্যে গাঁজারু-নেশারু-লম্পট তুলনায় ছিল নগণ্য। যদিও নাচ-গান-বাজনা-কথকতা-যাত্রা-তাস-পাশা-আড্ডা-জুয়া ছিল বিনোদনের অবলম্বন এবং নানা ক্রীড়া-মামলা-দাঙ্গা ছিল তাদেরও জিগীষাবৃত্তির অবলম্বন। লঘু নেশা মানসিক স্বস্তিরও ছিল সম্বল। তাই আমলকী-হরীতকী-যষ্টিমধু-পানসুপারীর সেবনও ছিল নেশা-আসক্তির মতোই।

ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজী শিক্ষার ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন ধারার প্রবর্তনের, নতুন প্রাশাসনিক বিন্যাসের ফলে মধ্য শ্রেণীর জীবিকাক্ষেত্র প্রায় আমূল পরিবর্তিত হল, প্রসারিত হল অভাবিত ও আকস্মিকভাবে। বিদ্যায়-বিত্তে বেসাতে এদের বিকাশ-সম্ভাবনা হল অশেষ। এভাবে গৃহস্থরা হয়ে উঠল সামন্ত-বুর্জোয়া, চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষার ধারক-বাহক-প্রচারক হয়ে উঠল বিদ্বান ও বিত্তবান শহুরে কিছু লোক। মদ-মাগ-জুয়ায় আসক্তি তাদেরও হল status symbol বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রতীক। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার প্রসার ছিল মন্থর, অর্থের প্রবাহ ছিল ক্ষীণ, জিলার প্রশাসন কেন্দ্রগুলো তখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহুরে হাওয়া থেকে বঞ্চিত। কোলকাতা ছাড়া শহুর ছিল না তখন। তাই সামন্ত-বুর্জোয়া-বিদ্বান-বিত্তবানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। বিদ্যর ও বাণিজ্য বেসাতের বিস্তারে নগর বন্দর হয়ে উঠেছে কর্মমুখর ও জনবহুল। প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশা-হতাশা, উঠতি-পড়তি-ঝরতি চক্রবৎ আবর্তিত হচ্ছে সর্বক্ষণ। এখানে যে উঠছে সে হচ্ছে বিলাসী আমুদে নেশারু। যে হারছে সে ও জ্বালা ভুলবার জন্যে হচ্ছে মাদকাসক্ত। যে-কিশোর তরুণ জীবনের স্বপ্নের ও সাধের বাস্তবায়ন সম্ভাবনার আভাস পাচ্ছে না, সে এ নৈরাশ্যের জ্বালা জুড়াবার জন্যে, নিরুদ্যম জীবনের যন্ত্রণা উপশমের জন্যে গাঁজা-চরস-আফিম-কোকেন-হিরোইন-মারিজুয়ানা সেবন করছে। আধিগ্রস্ত হয়ে শোভন সামাজিক আচার-আচরণ, নীতি-নিয়ম-সংস্কার পরিহার করে প্রবীণের দৃষ্টিকটু বিকৃতি-রুচি-সংস্কৃতি-ফ্যাশন ও নতুন তথাকথিত বিকৃত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ চালু করছে— পুরোনোর প্রতি তাচ্ছিল্য ও প্রবীণের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর জন্যেই।

লঘু-গুরু কারণ থাকলেও মানতেই হবে, এসব ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ ততটা বাস্তব পরিবেশ ও সমস্যাজাত নয়, যতটা প্রতীচীর অনুকরণ বিলাস প্রসূত। তাই এ আধি এখনো শহরের এলাকা ও পরিবার বিশেষে সীমিত। সংক্রামক রোগের মতো এ নেশাও অবশ্যই সংক্রামক। প্রতিরোধ প্রয়াসের অভাবে এ মাদকাসক্তি দ্রুত ছড়াবে গাঁয়ে গঞ্জেও। মাদক-সেবনে শারীর স্বাস্থ্যগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শারীর বিদ্যাবিদদের সম্যক জ্ঞান ছিল না। ফলে লঘু-নেশার প্রতি মানুষের তেমন ঘৃণা-অবজ্ঞা ছিল না। কেবল হিতাহিত জ্ঞান বুদ্ধি হারায় বলে মদ্যপকে, ধনসম্পদরিক্ত হয় বলে জুয়াড়িকে এবং সমাজ স্বাস্থ্য নষ্ট করে বলে লম্পটকে মানুষ ঘৃণা করত। আফিম-কোকেন-হেরোইন-মারিজুয়ানা জীবনবিনাশী বলে এবং কর্কটরোগের উৎস বলে তামাক-বিড়ি-সিগার-সিগারেট-জর্দা-সাদা পরিহার্য মনে করে লোকে।

কিন্তু জীবনে নেশাসক্তি প্রয়োজন। হরীতকী-আমলকী-পানসুপারী-যষ্টিমধু-খৈনি চিবানোর নেশা হোক, কাম-প্রেম হোক, নাচ-গান-বাজনার নেশা হোক, তাস-পাশা-টেনিস-ক্রিকেট-ফুটবল-গলফ হোক, যাত্রা-নাটক-সিনেমা হোক, জুয়া-আড্ডা-পরচর্চা-মামলা দলাদলি হোক-শ্রান্তি ক্লান্তি গ্লানি ভুলবার একটা অবলম্বন চাই-ই চাই। তা হলে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে কেবল ব্যক্তি-জীবন বিনাশী ও সমাজ-স্বাস্থ্য বিধ্বংসী মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিবারণ। কিন্তু তার আগে এ আসক্তির কারণ বিলোপে প্রয়াসী হতে হবে সমাজকে ও সরকারকে।

তবু অবশ্য শাস্ত্রিক, নৈতিক ও সামাজিক নীতি-নিয়মে যখন মানুষ আস্থা হারাচ্ছে, তখন যুগান্ত অবশ্যই আসন্ন। যুগান্ত লক্ষণ চেতনার রূপান্তর রূপে এখন প্রতীচ্য দেশে প্রকট ও প্রবল এবং ক্রমপ্রসারমুখী, আর সে আচার-আচরণ-অনাস্থার তরঙ্গাভিঘাত অনুন্নত দেশেও অনুভূত হচ্ছে মৃদু মন্দভাবে। শিক্ষার প্রসারে সে ঢেউ এ দেশও ভাসাবে। কালগত প্রাণ-মন-মনীষার দাবি মিটাতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির রূপান্তর প্রসঙ্গে

আগুনের যেমন নিরবলম্ব কোন স্থিতি ও রূপ নেই, চিন্তা-চেতনারও তেমনি নিরবলম্ব বা নির্বাহন কোন অস্তিত্ব নেই। আমরা জানি, চিন্তা-চেতনা তথা অনুভব মাত্রই জগৎ প্রতিবেশে জীবন-জীবিকা ও জীবনাচার সম্পৃক্ত, কাজেই চিন্তা-চেতনার উৎসও অনুভূত বা উপলব্ধ জীবন। অনুভব ও উপলব্ধি প্রমূর্ত হয় বাকবাহনে তথা শব্দে বাক্যে অর্থাৎ ভাষায়। অতএব এক বিশেষ তাৎপর্যে ভাষাই জীবন। কেননা জীবন তো অনুভবের সমষ্টি মাত্র, অন্যকথায় চেতনাপ্রবাহ-ই তো জীবন। বিশেষ স্থানের ও কালের পরিসরে শাস্ত্রিক, নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক অবস্থা ও অবস্থানগত অনুভব-উপলব্ধি রূপ চেতনাই জীবন। এ চেতনার, অনুভবের ও উপলব্ধির বাহন হচ্ছে বস্তু বা ভাব নির্দেশক ধ্বনি, যার অন্য নাম শব্দ। আর এ ধ্বনি, শব্দ বা বাক্যই রয়েছে সর্বপ্রকার সৃষ্টির ও বিকাশ-বিবর্তনের মূলে। 'logos' 'ওম্' 'Word 'কূন'-ই তাই সৃষ্টিমূল আদি ধ্বনি। এ শক্তিগর্ভ ধ্বনির গুরুত্ব বুঝে ভারতে থেকে শব্দব্রহ্ম বা বাকব্রহ্ম বলা হয়েছে। ইহুদী-খ্রীস্টান-মুসলিমরাও জানে যেহোবা আল্লাহ-উচ্চারিত ধ্বনি বা বাক্ থেকেই যাবতীয় সৃষ্টি উদ্ভূত।

এক একটা মূল ভাষা স্থানে কালে ব্যক্তিকণ্ঠে বিকৃত-বিবর্তিত হয়ে বহু কথ্য উপভাষায় পরিণতি পায়। এ স্থানের কালের পরিসরে নিবদ্ধ ভাষায় শব্দ সম্ভার বৃদ্ধি পায় ব্যক্তি বিশেষের সূক্ষ্ম অনুভব, মনন, সৌন্দর্যবুদ্ধি, কল্পনা ও আবেগ বিজড়িত সৃষ্টির তথা উদ্ভাবনের ফলে। যেমন চাঁদের গুণনাম সুধাংশু, সিতাংশু, শীতাংশু, হিমাংশু কিংবা রূপনাম শশধর, শশোদর, শশাঙ্ক এক একটি কবিতার মতোই, দার্শনিক তত্ত্বের মতোই সৃষ্ট বাক্প্রতিমা। এমনি তাৎপর্যঋদ্ধ সূচিত শব্দের সুবিন্যাসে ও অন্বয়ে গড়ে ওঠে মন্ত্র, প্রবচন, আপ্তবাক্য, ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতিগর্ভ শাস্ত্র, সামাজিক নীতি-রীতি, প্রাশাসনিক বিধি-বিধান। বাঁধা-হেঁয়ালি-রূপক-সাংকেতিকসংখ্যা সীমিত, তাই সবারই নিত্য ব্যবহৃত [বিশেষ করে সাহিত্যিক-দার্শনিকদের], তবু প্রতি মুখে, প্রতি কণ্ঠে, প্রতি জনের লেখায় বিভিন্ন তাৎপর্যে রূপে, রসে ও ভঙ্গিতে বিচিত্র রূপে অভিব্যক্তি পায় প্রতিটি শব্দ। চন্দ্র-সূর্য যেমন একক বটে, কিন্তু বিশ্বের জীব-উদ্ভিদ প্রভৃতি সবাই বা সবকিছু চাঁদ বা সূর্যকে একক ও সমগ্রভাবে পায়। তেমনি ভাষাও বহুর হয়েও প্রত্যেকের একক সম্পদ।

ভাষার সুপ্রয়োগ যার আয়ত্তে, তার শক্তির সীমা নেই। সে-শক্তি প্রয়োগে একজন ব্যক্তি জনগণমনে যাদুর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ অর্থে সুলেখক ও সুবক্তা আবেগে হোক আর যুক্তিতে হোক মানুষকে সহজেই বশীভূত করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সময় ও শ্রম লাঘব করেছে, দুঃখ-দুর্দশা, দুঃসাধ্যতা ও অসামর্থ্য ঘুচিয়েছে। তবু তারা বিজ্ঞানীর নাম কিংবা প্রযুক্তির উপকার স্মরণ করে না। কিন্তু মনের খোরাক যোগায় বলে কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিকারের সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কৃতজ্ঞ অনুরাগী। অতএব ভাষাই জীবন যেমন, তেমনি যুগপৎ এটি শক্তিও। উদ্দিষ্ট প্রচারের, প্রচারণার, প্রেরণার, প্রবর্তনার, প্রণোদনার ও প্ররোচনার জন্যে যেকোন বিষয়ক অভিব্যক্তি কার্যকর বা ফলপ্রসূ করতে সুপ্রযুক্ত শব্দ বিন্যাসে সুগঠিত বাক্য আবেগে হৃদয়বেদী, মননে যুক্তিঋদ্ধ হয়ে বিশ্বাসদৃঢ় আদিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন হয়ে প্রভাবিত করে শ্রোতা-পাঠককে।

কিন্তু জগতে একক কারণে কিংবা একক গুণে বাঞ্ছিত ফল মেলে না। জ্ঞান ও বুদ্ধি, শক্তি ও সাহস, সংকল্প ও উদ্যোগ প্রয়োজনীয় পরিমাণে ও অনুপাতে না থাকলে আবার কোন প্রয়াসেই সিদ্ধি অর্জন সম্ভব হয় না। সুতরাং কেবল বুদ্ধি, সাহস ও সংকল্প থাকলেই বাঞ্ছিত জীবন যাপন করা চলে না। বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির এবং সংকল্পের সঙ্গে উদ্যোগের স্থিতির যৌগপত্যই কেবল বাঞ্ছার বাস্তবায়ন সম্ভব করে। বক্তা, বাগ্মী বা আলাপচারী হিসেবে বিশিষ্ট হলে কিংবা আকর্ষণীয় ভাষা-ভঙ্গির তথা শৈলীর আবেগসঞ্চারী কিংবা মননঋদ্ধ যুক্তিপুষ্ট লেখার রচক হলে উপযুক্ত গুণাধিকারী ব্যক্তি হয় অনন্য শক্তিধর।

গৃহকর্তার, সমাজসর্দারের, নেতার, বাগ্মীর ও লিখিয়ের এসব গুণ থাকা আবশ্যিক। স্থানে স্থানে কালে কালে এমনি গুণ সম্পন্ন লোকই পরিবার-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক লোকপাল, লোকমান্য ও বরেণ্যরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এর সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠা বা চারিত্রিক অবিচলতা থাকলে হয় সোনায় সোহাগা।

তবে পারিবেশিক ও প্রায়োজনিক কারণে মানুষ দেশে দেশে কালে কালে নানা আদর্শে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও বিচিত্র লক্ষ্যে তার জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস এবং সংকল্প-উদ্যোগ প্রয়োগ করেছে। আদি ও আদিম আরণ্য জীবনে বিরূপ জান্তব ও প্রাকৃত শক্তিকে দাস-বশ কিংবা বিনাশ-বিতাড়ন কাজে প্রয়োগ করেছে মানুষ এ সব শক্তি। পরে ক্ল্যান-কৌম-গোত্রীয় জীবনে প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ল্যান-কৌম-গোত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস-সংকল্প-উদ্যোগ আত্মরক্ষার ও আত্মবিস্তারের গরজে। যূথবদ্ধ গৌত্রিক জীবনে জীবনধারণের বস্তুগত উপকরণ-উপাদান সংগ্রহের স্থান ও পদ্ধতিগত কারণেই প্রয়োজন হত চুরি-ডাকাতি কিংবা মুখোমুখি আক্রমণের ও সংঘর্ষ-সংঘাতের, বৈদিক গোত্রপতি পুরন্দর ইন্দ্রগণের, সর্দারদের দায়িত্ব-কর্তব্যের এবং কর্ম-আচরণের বয়ানই এবং তাঁদের কাছে অন্ন ও পশু সম্পদ হরণ করে এনে দেয়ার প্রার্থনাই এর সাক্ষ্য।

যেহেতু মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ ও তার আকাঙ্ক্ষা পূর্তি লক্ষ্যেই নিয়োজিত এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্তির ও অপূর্তির আনন্দের ও বেদনার অনুভূতিসমষ্টিই জীবনানুভূতি বা জীবন, যেহেতু প্রতিবেশ প্রসূত ও প্রয়োজনানুগ জগৎ চেতনা ও জীবনভাবনা অনুযায়ী মানুষের ভাবনা-চিন্তা-কর্ম-আচরণ পরিচালিত, প্রযুক্ত, নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তবে রূপায়িত, ফলে সমাজবদ্ধ সভ্য সমাজে উন্মেষ কাল থেকেই ধনসম্পদে অধিকারগত তারতম্যের দরুন ধনবলে, জনবলে ও বুদ্ধিবলে যে বা যারা প্রবল নেতা, তারাই হয়েছে অন্যের উপর হুকুম-হুংকার-হুমকি-হামলার অধিকারী। জনগণের পালক-পোষক-শাসক-শোষক পীড়ক-পরিচালক হয়েছে তারাই। যেহেতু মানুষের আর্থিক অবস্থাই তার সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করত, সেহেতু শাসক-শোষক হিসেবে প্রবলের প্রতিষ্ঠা ছিল। সবল-দুর্বল শ্রেণী গড়ে ওঠে এভাবেই। যেহেতু জীবন ধারণের তথা জীবিকার বস্তুগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপকরণের উৎপাদনের পদ্ধতিই দেশের সামাজিক, রাজনীতিক, বৌদ্ধিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে, সেহেতু তার আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত সত্তাই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেভাবেই তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ অভিব্যক্তি পায়।

আরণ্য তথা বুনো-বর্বর-ভব্য যুগে জীবিকাক্ষেত্রে তথা উৎপাদন-বণ্টন ক্ষেত্রে দৈহিক, বৌদ্ধক বা গৌত্রিক প্রাবল্য-দৌর্বল্যই গোড়ায় নির্ধারণ করেছে শ্রেণীক অবস্থা ও অবস্থান।

ভাষা বিশেষ স্থানে ও কালে সর্বজনীন হয়েও আবার প্রত্যেক ব্যক্তির একক ব্যবহৃত সম্পদ। তাই প্রতি মানুষেরই রয়েছে স্বকীয় ভঙ্গি ও স্বতন্ত্র শৈলী। সামন্তযুগে মালিক শ্রেণীর প্রয়োগে এ ভাষা যে শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, আইন, শাসনপদ্ধতি, শাস্ত্র ও ইতিহাস তৈরী হয়েছে, তাতে তাদের অবস্থানগত চেতনার, প্রয়োজনের ও উদ্দেশ্যের, উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটেছে– সে সব রচনার চিন্তনে-মননে শ্রেণীর মানুষের প্রেয়ো বুদ্ধি ও শ্রেয়ো চিন্তা আর যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা পেয়েছে অভিব্যক্তি। জনগণ পারত্রিক জীবনে শাস্তিতে-শান্তিতে পুরস্কারে-তিরস্কারে আস্থাবান। ভয়তাড়িত ভরসাকামী ক্ষতিভীরু অজ্ঞ মানুষ শাস্ত্রাশ্রিত হয়ে অরিদেবতার ভয় ঘুচাতে এবং মিত্রদেবতার ভরসা পেতে চেয়েছে। বানানো শাস্ত্র তৈরী হয়েছে, মালিক পক্ষের শাসন-শোষণের প্রয়োজনে ও স্বার্থে। সেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে শাসিত শোষিত জনের আনুগত্য পাওয়া ও নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি মানানো ছিল সহজ। সামন্তযুগ ছিল ভূত-ভগবানে বিশ্বাস-সংস্কারের অলৌকিক অদৃশ্য ভয়-ভরসার ম্যাজিক যুগ— লজিক তখনো গণমনে অস্থিত। তখন যুক্তি নয়, মুখ্যত যাদুই করত জীবন-জীবিকা-ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত। তাই সৃষ্টি হয়েছে মৌখিক ও লিখিতভাবে ভৌতিক অলৌকিক অযৌক্তিক রোমান্টিক এবং আধ্যাত্মিক সব গান-গাথা-গল্প-কাহিনী-প্রবাদ-প্রবচন-আপ্তবাক্য এবং শাসন-শোষণ সহজ করার জন্যে বানানো হয়েছে প্রভু-গুরু-গুণীর আনুগত্য মহিমার ও ভূত-প্রেত-পিশাচ গন্ধর্ব জিন-পরী পশু-পাখি, সরীসৃপ, তরুলতা, দেবতা-অপদেবতার অস্তিত্বের ও শক্তির ভীতি-বিভীষিকা-ভরসা-স্বস্তির মানস প্রতিবেশ। তাই বুনো-বর্বর ও আদিভব্য বা সামন্তযুগের মানুষের যাদু বিশ্বাস-সংস্কারপুষ্ট জীবন ছিল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে অদ্ভুত ও অদৃশ্য কাল্পনিক শক্তির আনুগত্যে নিয়ন্ত্রিত জীবন। ফলে সামন্তযুগে (এবং বুর্জোয়া যুগেও) ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করত স্বর্গ-নরক-মোক্ষ নির্বাণ সম্পৃক্ত পাপের ভয় ও পুণ্যের পুরস্কারলোভ।

তবু প্রলোভন প্রবল হলে পাপভয় শাস্তিভয় নিন্দাভয় স্রোতের বা তরঙ্গের তোড়ে বালির বাঁধের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাই নিয়ম-নীতি রীতি-পদ্ধতির পাপ-পুণ্যের শৃঙ্খল ভাঙার লোক সব যুগেই ছিল অধিক। এক কথায় বুনো-বর্বর আদিভব্য ও সামন্তসমাজে বাস্তব জীবন কখনো গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত না হলেও অদৃশ্য আসমানী শক্তিকেই জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস-সংকল্প-উদ্যোগ প্রভৃতির নিয়ামক বলে জানত ও মানত নিয়তিনির্ভর অজ্ঞ মানুষ। সামন্তযুগে মানুষের মন-মনন নিয়ন্ত্রণ করত আকাশচারিতা। সামন্তযুগ ছিল এক অর্থে পুরোহিততান্ত্রিক। বিদ্যা ও বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভূয়ো দর্শনজাত মানসিক বিকাশের ও ঋদ্ধির ফলে য়ূরোপে যুগান্তর ঘটল, ডিভিনিটি ও হিউমিনিটির দ্বন্দ্বসংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। স্ব স্ব স্বার্থেই রাজারা হল গির্জার সনাতন আধিপত্য বিরোধী। অবশেষে মার্টিন লুথার রোমান ক্যাথলিক দুর্গের দেয়াল ভেঙে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক রাষ্ট্রিক অধিকার বিলোপ ত্বরান্বিত করলেন। নতুন নতুন ভূমি আবিষ্কারে ভৌগোলিক পৃথিবীও হল অনেক বড়। লোকজীবনে যাজক-পাদরী প্রভাব হল নিতান্ত সামান্য। পুরোহিততন্ত্রের হল অবসান। বিদ্বান ও বাণিজ্যের প্রসারে শুরু হল বিদ্বানের ও বিত্তবান বেণের যুগ। এরা ঐহিক জীবননিষ্ঠ বাস্তবতাপ্রবণ, বস্তুনিষ্ঠ পুঁজিবাদী। এরা বুর্জোয়া নামে খ্যাত। এরাও আস্তিক। গোঁড়ামিনিন্দক হলেও ধর্মকে তারা প্রয়োজনে আঁকড়ে থাকে এবং প্রয়োগ করে। অতএব এদের চালচলনে পরিবর্তন এলেও স্বার্থবুদ্ধি ও গণশোষণ রইল পূর্ববৎ।

যেখানে সামন্ত ছিল এক, সেখানে বুর্জোয়া হল হাজার। উপর কাঠামোর এ পরিবর্তনে গাঁয়ে-গঞ্জে লোকমনে বিশ্বাস-সংস্কারমুক্ত চিন্তা-চেতনার তেমন কোন উন্মেষ হল না বটে, তবে শহুরে শিক্ষিত সম্পদশালী মানুষের মনে যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনার ঠাঁই হচ্ছিল অধিকমাত্রায় এবং বিজ্ঞানে-প্রকৌশল-প্রযুক্তিরও হচ্ছিল প্রসার। বেণে বুর্জোয়ারা ছিল ভাববাদী, তাদের মর্ত্যপ্রীতিটা ছিল ভোগবাঞ্ছা প্রসূত, আর বস্তুবাদটা ছিল বৈষয়িক চেতনাজাত, তাই অদ্বান্দ্বিক। বুর্জোয়া-দর্শনও তাই ভাবাবাদী দর্শন, আস্তিক্য-নাস্তিক্যও তাই সামাজিক কোন বিপ্লব প্রসূ ছিল না।

স্থান ও কালগত কারণে যুক্তির, বুদ্ধির, বিবেকের, বিবেচনার অনুপ্রবেশে ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তির প্রভাবে বুর্জোয়া যুগের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসে রূপান্তর ও সামান্য ভাবান্তর ঘটলেও এতে ধর্মকে পরিহার্য আফিম, বিশ্বাস-সংস্কারকে আধিতুল্য পরিত্যাজ্য বলা হয়নি। বুর্জোয়া সাহিত্যে মানবতা-মানবিকতার, কৃপা-করুণার, দান-দাক্ষিণ্যের, সেবা-সহায়তার, উদারতার, সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার, সহাবস্থানের সুখের, স্বস্তির, শান্তির, আনন্দের, প্রীতির, হিতচেতনার মহিমা-মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হলেও পূর্বতন ভৌতিক-অলৌকিক-দৈবিক-আধ্যাত্মিক বিশ্বাস-সংস্কারের নীতি-রীতির, পাপ-পুণ্যের সহাবস্থানের দরুন তা জনমনে বাঞ্ছিত প্রভাব ফেলেনি। ফলে যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা আকস্মিক ক্ষণপ্রভার মতো চমকে দিলেও কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে বুর্জোয়া দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে গণকল্যাণ হয়নি– যদিও এ দর্শন, সাহিত্য ও শিল্প অনুভবের সূক্ষ্মতায়, যুক্তির তীক্ষ্ণতায়, উদারতায়, মানবতায়-মহত্ত্ব মহিমায় উঁচুমাপের— মানের ও মাত্রার। বুর্জোয়ারা দর্শনে তত্ত্ব কৈবল্য এবং শিল্পে সাহিত্যে রসকৈবল্যবাদে আস্থাবান। তাদের বস্তুনিষ্ঠা ও ইহলৌকিকতাও ভাববাদ প্রসূত।

দেশ, কাল ও গণপ্রয়োজন নিরপেক্ষ তাদের রসচর্চা, শিল্পচেতনা, মননশীলতা এ যুগের দুস্থ মানবতাকে কেবলই বিভ্রান্ত করে। বুর্জোয়ার কাছে আবয়বিক নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যই পায় গুরুত্ব। একেই তারা প্রগতি ও প্রাগ্রসরতা বলে জানে ও মানে।

গণমানবের জগৎ-চেতনা, জীবন-জীবিকাভাবনা জাত উপলব্ধির ও প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি দান লক্ষ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার, প্রভাবের রূপায়ণ এবং শোষণ-পীড়ন থেকে গণমানব মুক্তির উপায় নির্দেশক আর সংগ্রামে প্রণোদনাদায়ক-শিল্প-সাহিত্যে ও দর্শনই মানববাদীর, সমাজতন্ত্রীর বা কম্যুনিস্টের কাম্য। কৃষক-শ্রমিক-প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সহায়ক ও সমর্থক হবে এ দর্শন-শিল্প-সাহিত্য ও ইতিহাসের টীকা-ভাষ্য। মুশকিল হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা যতটা তত্ত্ব-জ্ঞানী ততটা মননশীল নন। দেশকালে পার্থক্যজাত ব্যবধান ও সমস্যা তাঁদের চেতনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় না। তাঁরা উনিশ শতকের যুরোপীয় বাস্তব সমাজ ও সমস্যাজাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মননপুষ্ট মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন নির্দেশিত সমস্যাকে ও সমাধানপন্থাকেই চিরসত্য-চিরপ্রযোজ্য 'ওহী'-বৎ মান্য করেন। তাঁরা সমস্যা বিশ্লেষণে ও সমাধান সন্ধানে কোন নতুন চিন্তা-চেতনাকে প্রশ্রয় দেন না। তাঁরাও চিন্তার ও পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে শাস্ত্রমানা পীর-গুরু-মোল্লা-পুরোতের মতোই শাস্ত্রমানা গুরুবাদী। তাঁদের কথায় ও লেখায় তাই নতুন যুক্তি-বুদ্ধি-পদ্ধতি প্রয়োগের চমক থাকে না, যুক্তিরূপে থাকে গুরু-উপগুরুর বাণীর ও বাক্যের উদ্ধৃতি। মার্কসীয় দর্শন-শিল্প-সাহিত্যও তাই পুচ্ছগ্রাহিতা ও গতানুগতিকতা দুষ্ট। তাঁদের প্রযুক্ত মার্কসের বাণীর, এঙ্গেলসের চিন্তার, লেনিনের আপ্তবাক্যের এবং মাও সে তুঙের টীকাভাষ্যের উদ্ধৃতি-অনুগ বলেই তাঁদের যুক্তির মাপে-মানে-মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। তাঁদের লেখাও যুক্তিতে কিংবা ভাষাশৈলীতে উৎকর্ষ লাভ করে না– হয় না আকর্ষণীয়। তাঁদের রচিত সাহিত্যে কিংবা অঙ্কিত চিত্রে অথবা ব্যবহৃত ভাষায়ও তাই বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব মেলে কৃচিৎ কখনো। দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত আজকের জগতে ও জীবনে সমাজ ও সমস্যা সমীক্ষণে, সমাধানপন্থা আবিষ্কারে নতুন চিন্তা-ভাবনা যোগে কেজো পথ-পদ্ধতি বের করতে হবে সরেজমিনে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে। নইলে কম্যুনিস্টদের চিন্তা-চেতনা, কর্ম-পদ্ধতি, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি সব কিছুই লাটিমের মতো আবর্তিত হবে, ফলপ্রসূ হবে না।

কাম্য গণসাহিত্য, গণশিল্প, গণসঙ্গীত এককথায় গণসংস্কৃতি বিকাশে বড় বাধা হচ্ছে সরকার-সমর্থিত বুর্জোয়াদের সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাব। এ প্রভাব বিনষ্ট করার জন্যে কম্যুনিস্ট সাহিত্যে নতুনতর যুক্তির ও চিন্তার, ভাষার ও ভঙ্গির মৌলিকতা প্রয়োজন। আমাদের বলন ও মনন উঁচুতর মাপের, মানের ও মাত্রার হওয়া চাই। ঐশ শাস্ত্রকে অস্বীকার ও বাতিল করেই ধর্মবিশ্বাসকে আফিম বলে নিন্দা করেই, নাস্তিক হয়েই দেশের, সমাজের, মানুষের, সব সনাতন বিশ্বাস-সংস্কারের, নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির মানসিক ও ব্যবহারিকভাবে সমূল সশেকড় বিলুপ্তি ঘটিয়ে অর্থসম্পদ ব্যবস্থা ও সমাজ পরিবর্তনই যাদের মূল লক্ষ্য, তারাই এখন ধর্ম স্বীকার ও অস্বীকার করেন। শাস্ত্রমানা জনগণকে কম্যুনিস্ট বাঞ্ছিত তত্ত্ব ও সংস্কৃতি এ উপায়ে গ্রহণ করানো যাবে কি?

গোড়ায় ধর্মবিশ্বাসকে আফিম বলে পরিহার করা হয়েছিল, দুর্বলচিত্ত কম্যুনিস্টরাই এখন তা সদম্ভে বরণ করেছে, চীনে রাশিয়ায় ধর্মসম্মেলন হয়। পশ্চাৎ-দৃষ্টি কখনো সম্মুখগতি দান করতে পারেই না। আস্তিকের শাস্ত্র প্রভাবিত সংস্কৃতি তো রয়েছেই, তাকে কম্যুনিস্ট বাঞ্ছিত সংস্কৃতি করা যাবে কি?

অতএব, সংস্কৃতির আরণ্য, ভব্য, সামন্ত, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত রূপ আমাদের সবারই স্বীকৃত এর ক্রম বিবর্তন, ক্রম বিকাশ ও ক্রমোন্নয়ন ধারাও আমাদের জানা। য়ুরোপের সঙ্গে তুলনায় বোঝা যায় আমাদের দেশে এখন সামন্তযুগ অবসিত, বুর্জোয়াযুগের শেকড় বিস্তৃত ও দৃঢ়মূল হচ্ছে। কিন্তু অজ্ঞ-অনক্ষর গ্রামবাসী যেমন মানসিকভাবে সামন্ত যুগ এড়াতে পারেনি, তেমতি ভূঁইফোঁড় বুর্জোয়ারাও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সামন্ত সংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই উদার মানবিক ও আদর্শনিষ্ঠ বুর্জোয়া মানবতা কিংবা গণতন্ত্র আজো এদেশে প্রায় অজ্ঞাত। তাই কম্যুনিস্ট সাফল্য এখনো সুদূরে। এখানে গণসংস্কৃতির উন্মেষ হলেও তা বিকাশ পথের সন্ধান পায়নি এখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা ছাড়া চালু বুর্জোয়া সংস্কৃতিও বিকৃতি পেয়ে তাদের পক্ষেও ক্ষতিকর অপসংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। তার কারণ অনেক এবং বিচিত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির দ্রুত ও বিচিত্র বিকাশ, শিক্ষার প্রসার, রেডিয়ো-টিভি যোগে গণবুদ্ধির ও চেতনার বিকাশ, নাস্তিকতা, ঐহিক জীবনপ্রীতি, বেকারসমস্যা, দারিদ্র্য, সংহত পৃথিবীতে ব্যক্তি মানুষের ভোগ-উপভোগ বাঞ্ছার মাপে-মানে-মাত্রায় বৃদ্ধি, ব্যক্তির স্বসত্তার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সচেতনতা এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আগ্রহের তীব্রতা, সনাতন নীতি-নিয়ম, রীতি-পদ্ধতির প্রতি তথা শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা, কাঙ্ক্ষা অপূর্তির ক্ষোভ, নব নব বিস্ময়ের ও জিজ্ঞাসার অভাব এবং রহস্য ভেদের কৌতূহল শূন্যতা প্রভৃতি মানুষকে ক্ষুব্ধ ও উদ্ধত, বেদেরেগ ও বেপরোয়া করে তুলেছে। অর্থ-বিত্তবান কল্যাণরাষ্ট্র তাই জনগণকে বশে-শাসনে শায়েস্তা রাখতে পারছে না। এ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত যুব-জনতা তৃতীয় বিশ্বে হয়েছে আরো প্রবল ও উচ্ছৃঙ্খল। তাই কেবল বামপন্থীর চোখেই যে অপসংস্কৃতির বিস্তার অসহ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা নয়, এখন শাস্ত্র, সমাজ রাষ্ট্র ব্যক্তি সবাই অপসংস্কৃতির শিকার। ফলে ভব্য মানুষ-নিন্দিত আরণ্য-সংস্কৃতি সামন্ত-নিন্দিত বুর্জোয়াসংস্কৃতি বা ঔপনিবেশিক প্রভাবদুষ্ট অনভিপ্রেত সংস্কৃতি, সনাতন শাস্ত্রিক সংস্কৃতি কিংবা বামপন্থী-নিন্দিত পরিহার্য বুর্জোয়াসংস্কৃতি বলে কিছু পৃথকভাবে জানা-বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আজকের লোকসঙ্গীত শহুরে শিক্ষিত লোকসৃষ্ট। গাঁয়ে শহরে সর্বত্র সবশ্রেণীর সংস্কৃতিই বিকৃত।

বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতার ও প্রয়োজনচেতনার আর ভোগলিপ্সার বৃদ্ধির ফলে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার ও নতুন নতুন যন্ত্রের নির্মাণ, প্রকৌশল-প্রযুক্তির উৎকর্ষ প্রভৃতির বদৌলত বামপন্থীদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত ও নিশ্চিত অনুমান মিথ্যা হয়ে গেছে, বুর্জোয়ার অবক্ষয় ও বিনাশ তাদের হিসেব মতো ত্বরান্বিত হয়নি। বুর্জোয়ারা টিকে গেছে, কম্যুনিস্টরা হয়েছে দিকভ্রান্ত– নতুন যেসব আর্থিক নৈতিক সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছে, সনাতন মূল্যবোধ নতুন চেতনার অভিঘাতে ভেঙেছে বা ভাঙছে বটে, কিন্তু দেশ-কাল-সমাজ-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নতুন মূল্যবোধ বা সর্বজনগ্রাহ্য রীতি-নীতি নিয়ম-পদ্ধতি বা মানবিক সহাবস্থান ও সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতা ভিত্তিক হয়ে ওঠেনি, এখনো বোঝা-পড়ার প্রয়োজনচেতনা জাগেনি সবার মধ্যে। কাজেই আমরা চেষ্টা করলেও এ উর্মিমুখর ক্রান্তিলগ্নে এ তরঙ্গক্ষুব্ধ আর্থিক-সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে আমরা অপসংস্কৃতি অপসারিত করে স্বস্থ ও সুস্থ সমাজ প্রতিবেশ গড়ে তুলতে পারব না। অবশ্য বিপ্লব সম্ভব হলে সমাজ-সংস্কৃতির বাঞ্ছিত রূপায়ণ অবশ্যই সম্ভব। কেননা অবিকৃত সংস্কৃতি দেশ-কাল-জীবিকা-হাতিয়ার সম্পৃক্ত অর্থাৎ দেশ-কালের পরিসরে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের তথা জীবন-চেতনার ও জীবনাচারের সামগ্রিক সামষ্টিক ও সামূহিক অভিব্যক্তি বা প্রতিফলনই সংস্কৃতি।

শিল্পপুঁজি বা বাণিজ্যপুঁজি নির্বিশেষে পুঁজিবাদী সমাজে তিনটে না হোক অন্তত দু'টো সংস্কৃতি– শোষক বুর্জোয়ার আর শোষিত শ্রমিক কৃষকের দুটো ঈষৎ বিসদৃশ সংস্কৃতি প্রবহমান ও সমান্তরাল থাকে। আবার অন্তর্নিহিত গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, বার্ণিক, স্থানিক নানা চেতনাও রাষ্ট্রাভ্যন্তরেও সংস্কৃতিকে বিভিন্ন ও বিচিত্র করে তোলে। অতএব, সামন্ত, বুর্জোয়া ও গণ-সংস্কৃতি বঞ্চক-বঞ্চিতের এ তিন মৌল বিভাগের আর্থ-সামাজিক-শৈক্ষিক-শাস্ত্রিক-গৌত্রিক নানা উপবিভাগ রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাজিক ও লজিক

গোড়ার দিকে আদিম মানুষেরা সর্বপ্রাণবাদে, যাদুবিশ্বাসে, ট্যাবু-টোটেমে আস্থা রাখত। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অজ্ঞতা-অসহায়তাজাত অলৌকিক অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ভয়-ভরসাই তাদের যুক্তি-বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়রিক্ত অস্বস্থ ও অসুস্থ মননে ছিল কল্পনার প্রশ্রয় ও যাদুশক্তি নির্ভরতা।

মননের ক্রমোৎকর্ষে যুক্তিঋদ্ধ কল্পনার প্রসারে ও হাতিয়ারের বিকাশে বিশেষ বিশ্বাস-সংস্কারজাত কিছু ভাব-চিন্তার, নীতি-নিয়মের অনুগত থেকে মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক জীবনে ও জীবনাচারে স্বস্থ হয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছে মানুষ। এ সব নীতি-নিয়মই প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত স্বীকৃতি পেয়েই ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের নিয়ামক আর নিয়ন্ত্রক হয়েছে। শাস্ত্র নামের এ নীতি-নিয়মের ও বিধি-নিষেধের উৎস এবং ভিত্তিই ছিল অদৃশ্য অলৌকিক অরি-মিত্র তথা কল্যাণ-অকল্যাণকর শক্তির ভয়-ভরসা। যুক্তি-বুদ্ধি-প্রমাণ নয়– কল্পনাজাত অনুমান ও অনুভূতিই ছিল এ বিশ্বাস-সংস্কারের উৎস।

প্রাকৃতিক প্রতিবেশে এবং নিয়তিনির্ভর ব্যবহারিক জীবনে আপাত ও তথাকথিত আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া নানা বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রকৃত কারণ-কার্য নিরূপণে অক্ষম অজ্ঞ বিমূঢ় মানুষ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাতাড়িত হয়ে কল্পনায়, অনুমানে ও অনুভবে প্রাতিভাসিক কারণ-কার্য আবিষ্কার করেছে। নিহিত তত্ত্ব, আপাত তথ্য এবং সত্য উপলব্ধির স্বস্তিতে তার স্ববুদ্ধিতে আস্থা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের শেকড়ও হয়েছে দৃঢ়মূল। যেমন ঃ আশীর্বাদ-অভিশাপ-পূর্বজন্মের কর্মফল প্রভৃতিতে কাকতালীয় কার্য-কারণে আস্থা, চন্দ্র-সূর্য-রাহুতত্ত্ব প্রভৃতি এমনি সব কল্পনার ও অনুমানের প্রসূন।

আসমানী অরি-মিত্র শক্তিই জীবন নিয়ন্ত্রণ করে— এ বিশ্বাস মানুষকে করেছে নিয়তিবাদী। নিয়তিবাদীমাত্রই আত্মপ্রত্যয়রিক্ত। ফলে সে অদৃষ্টে অনিশ্চয়তায় সমর্পিত চিত্ত। জীবন তার নির্লক্ষ্য-নিরুদ্দিষ্ট ভাসমান তৃণখণ্ড মাত্র। এমনি জীবনে সংকল্প বা অঙ্গীকার নেই কিংবা লক্ষ্যে উত্তরণ নেই।

বাঞ্ছাসিদ্ধির অবলম্বন ও অনুষঙ্গরূপেই নাকি যাদু বিশ্বাসের ও যাদু প্রক্রিয়ার উদ্ভব। তুক-তাকে, দারু-টোনায়, বাণ-উচ্চাটনে, তাবিজে-কবচে, মন্ত্রে-মাদুলীতে, ঝাড়ে-ফুঁকে, তাগায়-ধাতুর-পাথরের-রত্নের আঙটিতে আজো যাদু বিশ্বাস মানুষের দেহে-মনে বিজাড়িত, কর্মে-আচরণে প্রযুক্ত, বিপদ ও ক্ষতি ঠেকানোর আর প্রাপ্তির কাঙ্ক্ষা পূর্তির লক্ষ্যে। এ মানুষ কখনো আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বনির্ভর হতে পারে না। যা বাহুবলে, বুদ্ধি প্রয়োগে, শ্রমে, প্রয়াসে লভ্য নয়, যা ঘটা স্বাভাবিক নয়, যা পাওয়া সম্ভব নয়, তা-ই যাদু প্রয়োগে ঘটানো ও পাওয়া যায়– বিশ্বাসের এমনি প্ররোচনায় মানুষ আজো স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম যাদুশক্তি নির্ভর। জিগীষু বিষয়ী মানুষ পার্থিব তথা ঐহিক জীবনে লাভ-ক্ষতির ভয়-ভরসার ক্ষেত্রে কেবল দৈবশক্তির শরণ নেয়, স্বর্গ-মোক্ষ-নির্বাণ প্রাপ্তি লক্ষ্যে নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাদুকরেরা আজো কথায়-মুদ্রায় এবং হাত ছাপাই ও অঙ্গভঙ্গি যোগে দর্শক-শ্রোতাকে অভিভূত করে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলে জানা-মানা কর্ম-আচরণকে সম্ভব ও স্বাভাবিক বলে প্রত্যক্ষ ও প্রতিভাত করায়। চোখের পলকে ফুল-পাখি-টাকা বানায়, মানুষকে শূন্যে ঝুলায়, করাত দিয়ে কাটেন— এ সব কিছু প্রাতিভাসিক না হয়ে সত্য ও বাস্তব হলে যাদুকরেরাই হত দুনিয়ার বাদশাহ, মানুষের জান-মাল-গর্দানের মালিক, হত অলৌকিক শক্তিধর নবী-অবতার। এমন যুগও ছিল, যখন যাদুকরদের অলৌকিক শক্তিধর বলে মান্য করত, ভয় করত, ভরসা রাখত এবং প্রতারিত হত।

তিন-চার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা গোত্রের ও সমাজের জ্ঞানী-গুণী-মনীষীরা, নবী-অবতার নামের চিন্তানায়ক ও সমাজসংগঠকরা আর সংরক্ষক নেতারা সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের আবশ্যিকতার গুরুত্ব জানানো বোঝানো লক্ষ্যে জগৎ ও জীবন এবং ইহ ও পরকাল সম্পৃক্ত তাৎপর্যঋদ্ধ মঙ্গলকর এবং অনুভব-উপলব্ধিসাধ্য অনেক অনেক মহৎকথা, আপ্তবাক্য, নীতি-নিয়ম-আদর্শের প্রয়োজনীয়তার তত্ত্ব, ন্যায়-সত্যের মহিমা, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সততার ও সত্যনিষ্ঠার গুরুত্ব এবং জোর-জুলুম সম্বন্ধে সতর্কবাণী আর ক্ষমা-তিতিক্ষা স্নেহ-ভক্তি, প্রীতি-সহানুভূতি-দয়া-দান-কৃপা-করুণা-মৈত্রী প্রভৃতির মাহাত্ম্যকথা উচ্চারণ করেছেন, সেসব মৌখিক ভাষণ পরে লিপিবদ্ধ ও টীকাভাষ্যযুক্ত শাস্ত্রকথা মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, প্রাশাসনিক, নৈতিক, আদর্শিক ও আচারিক জীবনের নিয়ামক, নিয়ন্ত্রক তথা দিশারী হওয়ার ছিল। কিন্তু উক্ত সব নীতি নিয়ম-আদর্শ সম্পৃক্ত মঙ্গলকর মহৎ বাণী আজো পার্বণিক প্রয়োজনে মঠে-মন্দিরে-মসজিদে-বিহারে-গির্জায়-সিনাগগে উচ্চারিত ও অভিনন্দিত হয় বটে, মহৎ মানুষের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব, পরহিতে কৃত কর্ম ও আচরণ আমরা স্মরণ সভায় উচ্চারণ করে প্রশস্তি গাই বটে, কিন্তু কারো আটপৌরে জীবনে (ব্যতিক্রম ক্বচিৎ-কদাচিৎ মেলে) এ সবের অনুভূতি কিংবা প্রভাব দেখা যায় না। শাস্ত্রের গুরুত্ব মানুষ স্বীকার করে কিন্তু মানে না। তার কারণ তার চেতনায় ও দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ঐহিক জীবনই বাস্তব এবং ঐহিক জীবনের চাহিদা মেটানোই তার আশু দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেই সে জানে। বিষয়বিবাগী মানুষই তাই তার চোখে সজ্জন। অন্য বিষয়ী মানুষের আন্তরিকতায় ও সততায় সে প্রায়ই সন্দিহান। এ জন্যে তার প্রয়োজন শাস্ত্রোক্ত অঘটন ঘটানো— সম্ভব শক্তির সহায়তা। তাই তার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ ভয়-বিপদ-ক্ষতি ঠেকানো এবং বাঞ্ছাসিদ্ধি লক্ষ্যে সীমিত। তার প্রয়োজন সাধু-সন্ত-দরবেশ-সন্ন্যাসী-ভিক্ষু-ব্রহ্মচারীর আশীর্বাদে ও সহায়তায় এবং দৈব শক্তিতে, যাদু-শক্তি পুষ্ট মন্ত্রে-মাদুলীতে, ঝাড়ে-ফুঁকে অরি দেবতা-অপদেবতা তাড়ানো মানতে সিরনিতে স্তুতিতে ইষ্টশক্তির সহায়তা লাভ। পার্থিব জীবনে নগদ প্রাপ্তিলক্ষ্যে, ভয়-ভরসার উৎসরূপ শাস্ত্রাংশেই কেবল তার আকর্ষণ। এর সঙ্গে পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-সত্য চেতনার কোনই সম্পর্ক নেই। তাই চোর-ডাকাত-খুনী-জুয়াড়ী-জালিয়াত সবাই এ পথেই শাস্তি এড়াতে চায়। এমনি শাস্ত্রমানা আস্তিক মানুষ প্রলোভন প্রবল হলে করে না, করতে পারে না হেন অপকর্ম দুনিয়ায় নেই। এ ধরনের মানুষ বাস্তবে সাধারণভাবে প্রবৃত্তি চালিত। তাই আজ অবধি শাস্ত্র থেকে মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাশিত ফল পায়নি। তাই যিশু-বুদ্ধের অনুসারীরাও যুদ্ধবাজ আর হত্যাপ্রবণ। ক্ষমা ও কল্যাণবাঞ্ছা রয়েছে অপ্রযুক্ত। ফলে 'সব্বে সত্তা সুখী হোন্তু' বলার কিংবা একগালে চড় খেয়ে অন্যগাল এগিয়ে দেয়ার লোক এবং এগিয়ে দিলেও অনুতপ্ত ব্যক্তি জগতে সুদুর্লভ।

অতএব মহৎকথার, তত্ত্বকথার, অধ্যাত্মবার্তার কিংবা 'দেশনা'র ম্যাজিক প্রত্যাশিত ফলপ্রসূ হয়নি।

তাই মনে করি, এ যন্ত্র যুগে ও যন্ত্রজগতে ম্যাজিকের কাল অপগত এবং যুক্তিবাদে ভরসার কাল সমাগত। ব্যক্তির জ্ঞান-বৌধি-বিবেক-বিবেচনার মাপ-মান-মাত্রাভেদে যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হতে পারে বটে, তবে তা মানুষকে নীতি-নিয়ম ও মত-আদর্শ ভ্রষ্ট করে না। ভুলে ব্যর্থতায়ও প্রবোধ মেলে। যুক্তি-বিবেকও হয় না প্রবৃত্তি পরবশ। সামাজিক দায়বদ্ধ মানুষের ঐহিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যচেতনা অধ্যাত্মবোধ নিরপেক্ষ হয়েও জুলুমমুক্ত কর্মে আচরণে প্রেরণা-প্রবতবানা যোগাতে পারে। এমন মানুষই হয় সমাজবাঞ্ছিত সুজন— যার উপর অপর মানুষ নির্দ্বিধায় বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে পারে, নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারে।

যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা চালিত মানুষ যা ভাবতে বলতে শুনতে করতে কুৎসিত, যা প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে অপরের ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে জুলুমরূপে প্রতীয়মান হয়, যা দুর্বলের ক্ষতির এবং দুর্জনের প্ররোচণার কারণ হয়, সেসব থেকে বিরত থাকা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যুক্তিবাদী বিবেকবান বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে সম্ভব। এমন মানুষ ঐহিক জীবন ও বস্তুবাদী নাস্তিক হয়েও দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে, সততায় বাঞ্ছিত সজ্জন হতে পারে এবং হয়ও। কাজেই আর ম্যাজিক নয়, লজিকনিষ্ঠ হওয়া দরকার। লজিক কদাচিৎ দুষ্টলোকের প্রয়োগে ফ্যালাসির ফাঁদে পড়লেও লজিক চর্চা মানুষকে সাধারণভাবে ন্যায়নিষ্ঠ করবে— এমন আশাও বাতুলতা নয়। এ যুক্তিনিষ্ঠাই ফরাসী এনলাইটেনমেন্টের আলো, যুক্তিজাত বিচারনিষ্ঠাই এনলাইটেনমেন্ট।

আজকের অসুস্থ পৃথিবীতে মানুষের মানসিক আধি এবং সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যাধি ঘোচানোর লক্ষ্যে কেবল অর্থ-সম্পদের বৈষম্য বিদূরণ নয়, মনোজগতেও ভাববাদের পরিবর্তে যুক্তিবাদ, আইডিয়ালিজমের স্থলে রেশন্যালিজমের অবলম্বন আবশ্যিক। আইডিয়ালের পরিচর্যা অনেক হয়েছে। সব তাসের ঘরের কিংবা বালির বাঁধের মতো বৃথা ও ব্যর্থ হয়েছে। এবার রিয়্যালের চর্চা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে দুনিয়াব্যাপী জাত-বর্ণ-গোত্র-ধর্ম-মতবাদ ও রাষ্ট্রগত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং দাঙ্গা, হত্যা, যুদ্ধ, শোষণ কমানোর গরজে। অধিকাংশ অন্তত অর্ধেক মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদের তথা যুক্তিনিষ্ঠার শেকড় ছড়ানো গেলে বিপুল পুঁজির বুর্জোয়া রাষ্ট্রেও বিপ্লব আসন্ন ও সফল করা সম্ভব হতে পারে। গণমানবের মুক্তিসংগ্রামও এমনি পরিবেশে আশু সাফল্য লাভ করবে। সহিংস সশস্ত্র বিপ্লব মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রেও যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের আধিক্যে ইকুয়ালিটির সঙ্গে দ্রুত স্বাভাবিক লিবার্টিও উপভোগের যোগ্য হয়ে উঠবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় ও ভরসা

মুদ্রাযন্ত্র এদেশে চালু হওয়ার আগে গার্হস্থ্য ও শাস্ত্রিক-সামাজিক জীবনে অবশ্য জ্ঞাতব্য ও আচরণীয় বিষয়গুলো নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে শেখা-শেখানো চলত মুখে মুখে। ছড়া, প্রবচন, প্রবাদ, আপ্তবাক্য ও কিংবদন্তী সূত্রে জানা এবং ঘরে-ঘাটে, মাঠে-হাটে আর মেল-মজলিশে দেখা-শোনা-জানা নীতি-নিয়ম, আচার-আচরণই ছিল ব্যক্তি-মানুষের জীবনাচারে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। সে-যুগে স্বল্পশিক্ষিত গ্রামবাসী পণ্ডিত-মুন্‌শীরা ডাক-খনার মতো চাণক্য-সাদীর নামে সংস্কৃত-ফারসী শ্লোক আবৃত্তি করে আর স্থানীয় বুলিতে তার অনুবাদ ও ভাষ্য প্রচার করেও লোকশিক্ষায় সহায়তা করত। আড্ডার, আসরের ও বিশ্রামের স্থান ছিল গাছতলা।

স্কুলে-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাযন্ত্রের বদৌলত দৈনিক-সাময়িক পত্রের ও গ্রন্থের বহুলতার কারণে এবং এখনকার রেডিও-টিভির প্রভাবে সাক্ষর-নিরক্ষর, গ্রামীণ শহুরে নির্বিশেষে মানুষ পূর্বপ্রতিবেশ-পরিবেশ পরিহার করে এসেছে। এখন বয়োবৃদ্ধের জ্ঞানঋদ্ধ প্রজ্ঞাপুষ্ট বলে আদর কদর নেই। গুরু-পীর-থেরোর (স্থবিরের) যুগ অপগত। এতোকাল কিছু জ্ঞান গ্রন্থবদ্ধ ছিল বটে, তাও এ যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত যুগে ও জগতে কিছু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগে কম্প্যুটার নামের যন্ত্রবদ্ধ হয়ে অন্য সব মানুষের মগজ প্রয়োগে জ্ঞান-বুদ্ধির অনুশীলনে আগ্রহ নষ্ট করে তাদের নির্বেদ রোবটে উন্নীত করবে এমন আশা-আশঙ্কা হয়তো অমূলক নয়। সামান্য ক্যালকুলেটর যেমন ধারাপাতকেই নিপাত করেনি কেবল, লাঘব করছে মস্তিষ্কশ্রমও।

আমাদের বাল্যকালে ব্রিটিশ রাজত্বে শিক্ষার এমন দ্রুত প্রসার ছিল কল্পনাতীত। তাই আমাদের বাল্যকালেও পুরোনো লোকশিক্ষার রীতিপদ্ধতির ছিটে-ফোঁটার লেশ ও রেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ঘরে-বাইরে। ছাপা হরফে দেখার আগেই বাল্যকালে বোঝার বহুপূর্বেই কানে শুনেছিলাম মানুষের ষড়রিপুর কথা— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের ভয়ংকর পরিণামের কথা। বলা বাহুল্য তখন 'রিপু' শব্দের অর্থও অধিগত ছিল না। আর ইন্দ্রিয় সম্পর্কের চেতনা তো ছিলই না। তবু 'ক্রোধ'-এর রূপ অনুভব করা সম্ভব হত, কাম ছিল আবছা বোঝা রহস্য-রস, লোভ তো ছিল স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মোহ ছিল অজানা আর মদ-মাৎসর্য কৃচিৎ উচ্চারিত বলে ছিল অবোধ্য। মাৎমর্যতত্ত্ব আয়ত্তে আসে প্রবেশিকাস্তরে পড়ার সময়ে অশ্বিনী কুমার দত্তের উক্ত নামের লেখা পাঠের ফলে।

বয়ঃপ্রাপ্তির পরে, স্বতঃস্ফূর্ত একটা ধারণা কিংবা সিদ্ধান্ত মনে দানা বাঁধে। ইন্দ্রিয়জ কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মানুষের প্রাণীসুলভ বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রসূন। এগুলোর দমন-বিনাশন যেন জীবনের প্রসাদ বিমুখতার নামান্তর। সত্তার লালনের ও বিকাশের জন্যেই যেন এগুলো সংযমন, নিয়ন্ত্রণ ও সুপ্রয়োগ আবশ্যিক। আর 'মদ' কে অহং-চেতনায় তথা আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদাবোধে উন্নীত করলে এবং মাৎসর্যকে নিরুদ্যম অক্ষমের বা প্রতিদ্বন্দ্বীর হিংসা-ঘৃণার উর্ধ্বে প্রতিযোগীর ঈর্ষায় পরিণত করা গেলে উদ্যমশীল উদ্যোগী মানুষের আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। কাজেই ইন্দ্রিয়জ এসব অনুভবকে 'রিপু' বা মনুষ্যত্ব সংহারক শক্তি বলে উপেক্ষা-অবজ্ঞা করা বা দমন-উৎপাটনের ব্যর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপপ্রয়াস করা হিতবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ছেলেবেলায় জেনেছি চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক যোগেই রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ অনুভবগত হয়।

এ গুলোর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ কিংবা বিমিশ্র উপজাত হচ্ছে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য। আর এ গুলোর আপাত বিপরীত অদৃশ্য ফুল-ফল-ফসল হচ্ছে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ত্যাগ-তিতিক্ষা-ক্ষমা-উপচিকীর্ষা প্রভৃতি অরিপুর ও বাঞ্ছিত মিত্রের বা গুণের। অতএব, জীবনানুভূতির, সত্তার বিচিত্র বিকাশ-প্রকাশের মূলে রয়েছে সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির বাঞ্ছিত লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ। কাজেই পরিমিতিবোধই এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজনীয় পরিমিত প্রয়োগই ব্যক্তির পরিবারের সমাজে সরকারে ও রাষ্ট্রে কিংবা জীবিকা-ক্ষেত্রে আত্মরক্ষণের ও আত্মবিস্তারের পুঁজি ও পাথেয়, সুফলপ্রসূ নীতি ও রীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিপ্রতীপ উপমায় বিষয়টি বোধ হয় আরো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যায়— 'জলের এক নাম জীবন'— এর মানে এ নয় যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকলে কিংবা জলে কাউকে চুবিয়ে রাখলে তার স্বাস্থ্য সুষ্ঠু হবে বা আয়ু বাড়বে। তেমনি ইন্দ্রিয়জ অনুভব-ভীতি আর জীবনবিমুখতা হবে সমার্থক ও সমাত্মক। অতএব প্রয়োজনে স্থানিক-কালিক ও পাত্রিক প্রয়োগে ব্যক্তিসত্তার সুষম ও সুষ্ঠু বিকাশের ও পরিবারে সমাজে সরকারে রাষ্ট্রে কিংবা জীবিকাক্ষেত্রে যথাশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে তথাকথিত ষড়রিপুর পরিমিত লালন আবশ্যিক।

আমাদের আজকের উদ্দিষ্ট ও আলোচ্য বিষয় ছিল ভয় ও ভরসা। উপর্যুক্ত সব কথা এল আকস্মিকভাবেই।

মানুষের রয়েছে জিজীবিষা ও জিগীষা। দুটোই অহং তথা সত্তার স্বাতন্ত্র্য চেতনার ফল। কাজেই তার আত্মরক্ষণের, আত্মবিস্তারের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে চাই মান, খ্যাতি ও ক্ষমতা। আকাঙ্ক্ষা দেবে এসব অর্জনের প্রণোদনা, আকাঙ্ক্ষার মূলে থাকবে শক্তি, সাহস ও বিত্ত। ঘৃণা এড়ানোর জন্যে চাই মান, লজ্জা বিলোপের জন্যে চাই খ্যাতি আর ভয় তাগানোর জন্যে প্রয়োজন ক্ষমতার।

ভয় একটাও নয়, এক প্রকারেরও নয়। রোগভয়, মৃত্যুভয়, পাপভয়, লোকভয়, রাজভয়, সমাজভয়, ক্ষতির ভয়, অপ্রাপ্তির ভয়, অসাফল্যের ভয়, অকৃতকার্যতার ভয় প্রভৃতি অনেক। তেমনি ভয়বিজয়ী বলও বহু, যেমন বাহুবল, জনবল, অর্থবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, পুণ্যবল, বিত্তবল, মনোবল, চরিত্রবল প্রভৃতি। বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেকবান আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী মানুষ নির্ভর করে স্বশক্তির উপর। কর্তব্য স্থির করে সে তার নিজের অবস্থার ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। তার যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক ও বিত্তই তার সম্বল। কিন্তু এমন আত্মপ্রত্যয়-সাহস-জ্ঞান-প্রজ্ঞাবত্তা, এমন যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি-সংস্কৃতিমত্তা মানুষে সুদুর্লভ।

আর সাধারণ এমন কি মনীষা সম্পন্ন সব আত্মপ্রত্যয়বিরহী মানুষই বাহুবল, ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, এমনকি পুণ্যবল অবলম্বন করেই বাঁচতে চায়। তারা ভয়মুক্ত হতে চায় অন্যের ও অপরের শক্তির উপর ভরসা রেখেই। এ ক্ষেত্রে ভূতে-ভগবানে আস্থা ও ভরসাই তাদের পুঁজি ও পাথেয়। এসব মানুষের জীবন অদৃশ্য নিয়তি-নির্ভর অর্থাৎ অরিশক্তি ভীতি ও মিত্রশক্তি প্রীতিই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। তাই তারা সন্ত-সন্ন্যাসী-দরবেশ-দরগাহ আশ্রয়ী এবং তুক-তাক, দারু-টোনা, বাণ-উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গুরী-বলয়, তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতির কার্যকরতায় আস্থাবান। আত্মপ্রত্যয়হীন এ মানুষ বিপদে-সম্পদে এসবের প্রায় প্রাত্যহিক জীবনে ও জীবনাচারে ক্ষতি এড়ানো ও প্রাপ্তি লোভে নির্ভরশীল থাকে। ঐশশক্তিকেও এরা দোয়া-প্রার্থনা-মন্ত্রযোগে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত রাখার স্পর্ধা রাখে ও দাবি করে। এ্ তাদের আস্তিক্য বা ধর্মানুগত্য। সাধারণ ভাবে পাপভীত বা পুণ্যকামী তারা হয় না বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগে। অদৃশ্য অলৌকিক শক্তিতে তাদের এমন বিশ্বাস সর্বজনীন হলেও মূলত ব্যক্তিক। এ আস্থা ও আস্তিক্য জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা বিদ্বেষের জনক নয়। এ যথার্থই ব্যক্তিগত আস্তিক্য ও ধর্ম। মানুষের মন-মনন-চিন্তন এ আস্থার প্রভাববলয়ে নিবদ্ধ থাকলে ধর্ম-দ্বেষণার বীজ মনোভূমে অঙ্কুরিত হবার কারণ ঘটে না এবং ব্যক্তিগত স্তরে জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সহমর্মিতা সহানুভূতি সহযোগিতা বাড়ে। পীর-গুরু-সন্ত-দরবেশের শিষ্য-সতীর্থদের ভ্রাতৃত্ব এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। যেমন কাম-প্রেম-ব্যবসার ক্ষেত্রে নির্বিচার মিলন ঘটে।

কিন্তু সভ্য মানুষ দেশ-গোত্র ও ধর্ম সৃষ্টি-স্রষ্টা-জগৎ-জীবনের তাৎপর্যচেতনাও স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধিজাত জীবনাচার সম্পৃক্ত ধারণার সমষ্টি— এ তিনটেকে আত্ম - পরিচিতির তথা সত্তার ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি বলে মেনেছে। তাই আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বার্থ ও স্বাধিকার সংরক্ষণের জন্যে, কিংবা প্রবলের হুমকি-হামলা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে অথবা পরস্বাপহরণ উদ্দেশ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিকল্পে দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার অজুহাত হিসেবে রাষ্ট্রিক, গৌত্রিক, ধার্মিক স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার নামে দাঙ্গা-লড়াই বাধায়। এভাবে দেশ-গোত্র-ধর্ম তথা রাষ্ট্র-জাতি ও জীবনদর্শনগত পার্থ্যকের ও স্বতন্ত্রের নামে সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই মানুষ হানাহানি করে আসছে। মানুষের এতো বিদ্যা বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-নীতি-নিয়ম সবই এ ক্ষেত্রে এ মুহূর্ত অবধি বৃথা ও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। অথচ খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ব্যতীত প্রাণিজগতে ঝগড়া বিবাদ থাকলেও হত্যার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে হন্যে হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত বিরল। মানুষের ও মানবতার কি মহিমা!

ভয় ও ভরসা যেমন মানুষকে স্বতোই আস্তিক করেছে তেমনি তার অজ্ঞ-দুর্বল চিত্তে নানা অমানবিক তত্ত্ব-তথ্যের উদ্ভব ঘটিয়েছে-যা আজো আছে এবং মনে হয় চিরকাল অবিমোচ্য হয়ে থাকবে।

আশৈশব প্রাপ্ত ও লালিত বিশ্বাস-সংস্কার থেকে আত্মমুক্তির আপাত উপলব্ধ উপায় হচ্ছে কেবল সন্দেহের, জিজ্ঞাসার ও যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকের আনুগত্য।

যাদু, যুক্তি ও আধিমুক্তি

মানুষমাত্রই স্ব স্ব উপলব্ধির জগতেই মানসবিহার করে। এ তাৎপর্যেই 'মেন আর বোর্ন ফিলোসফারস'— মানুষ মাত্রই স্ব স্ব জীবন জগতের দার্শনিক। তার উপলব্ধিই তার নিদর্শন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ তার পারিবারিক. দৈশিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক ও শৈক্ষিক পরিবেশের মধ্যেই জন্মমুহূর্ত থেকে দেহে-মনে গড়ে ওঠে। নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল কারণে বিভিন্ন নীতি-নিয়ম আকীর্ণ জীবনে কোন দু'জন ব্যক্তির সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, নৈতিক অবস্থা ও অবস্থান অভিন্ন নয়। তাই যে কোন দু'জন মানুষের মধ্যে বাহ্যত সমঅবস্থানের হলেও, ভাবনা-চিন্তায়, কর্ম-আচরণে মাপে মানে মাত্রায় লঘু-গুরু পার্থক্য থাকেই।

এর মুখ্য কারণ মন-মত, কর্ম-আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় আশৈশব লব্ধ পরম্পরাগত শাস্ত্র নামের কল্পনা ও বিশ্বাসজাত নীতি-নিয়মের গতানুগতিক ও যান্ত্রিক মানস আনুগত্য, অনুসৃতি ও অনুকৃতি। এবং তা ঘরে ঘরে দেশে দেশে কালে কালে অভিন্ন থাকে না।

যদিও ভয়-ভরসাজাত শক্তিপূজাই মানবধর্ম, কাঙ্ক্ষাপূর্তি ও বিপদমুক্তি লক্ষ্যেই অদৃশ্য অমূর্ত কিংবা কল্পনাজাত প্রমূর্ত জীবন্ত শক্তির কাছে আত্মকথা নিবেদন আর ওই শক্তির মন গলিয়ে কৃপা কাড়ার জন্যেই আত্মসমর্পণ, তবু দেশে কালে গোত্রীয় কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে চেতনার ও হাতিয়ারের বিকাশে নব নব চাহিদা পূরণের জন্যেই পিতৃপুরুষের কিংবা মাতৃতন্ত্রের পরম্পরাগত শাস্ত্র ও নীতি-নিয়ম পরিহার করে মানুষ নতুন নতুন শাস্ত্র ও নীতি-নিয়ম বরণ করে নতুন নতুন শাস্ত্র ও নীতি-নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি গড়ে তুলেছে।

তাই দেশে দেশে কালে কালে ওই জীবন-নিয়ন্ত্রী শক্তিদেবতার রূপ-গুণের ধারণার উন্মেষ-বিকাশ ও বিলোপ ঘটেছে। আর ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে বিবর্তন।

এও মনে রাখতে হবে যে দেশে দেশে কালে কালে শাস্ত্র নির্মাতারা কিংবা সংস্কারকরা জ্ঞানী-গুণী জনহিতকামী প্রয়োজনসচেতন সমাজসর্দার হলেও, জনসমাজ তা না-ভেবে, না-জেনে না-বুঝেই শাস্ত্র ও নীতি-নিয়ম রূপেই মেনে চলে মাত্র ভয়-ভরসার উৎস হিসেবে। ফলে যা একের শ্রেয়োবুদ্ধিজাত চিন্তা-চেতনার প্রসূন, তা অন্যদের কাছে অবশ্যমান্য আচার মাত্র।

গোত্রগত বা গোষ্ঠীগত কিংবা দৈশিক সমাজস্বাস্থ্য ও নৈতিকচেতনা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার উপায় বা আংশিক ব্যবস্থা হিসেবে ওভাবেই গুরুত্ব পেয়েছে শাস্ত্র এবং এ মুহূর্তেও পাচ্ছে।

অথচ অজ্ঞ-অশিক্ষিত [জ্ঞানী-গুণী লক্ষে এক] নেতৃত্বমানা মানুষ শাস্ত্রের কিংবা নীতি-নিয়মের তাৎপর্য কখনো স্বরূপে উপলব্ধি করতে চায়ওনি, পারেওনি। ফলে বিচিত্র প্রতিবেশে মানুষ স্বশাস্ত্র বহির্ভূত আরো অনেক কল্পনার, বিশ্বাসের, সংস্কারের ও আচারের অনুগত হয়ে শাস্ত্রীয় স্বাজাত্য হারিয়েছে, দুনিয়াব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইহুদী-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিমের বিচিত্র ও বিবিধ বিশ্বাস-সংস্কারই তার প্রমাণ। ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বেকার দেশজ বাঙালী মুসলিমদের বিশ্বাসে শাস্ত্রীয় পালায়-পার্বণে, আচারে-আচরণে নামে ও পোশাকে গভীর ও ব্যাপকভাবে ছিল তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষের প্রভাব।[১]

এখনো সব প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়নি, যাবে না, বরং নতুন বৈশ্বিক প্রভাবে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে সব শাস্ত্রমানা আস্তিক মানুষই কল্পনার ও বিশ্বাসের এবং বিজ্ঞানের ও বাস্তবের বিপরীতধর্মী অনুভবের ও উপলব্ধির টানাপোড়নে মনে-মননে বিভ্রান্তির,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকৃতির, অসঙ্গতির শিকার হয়েছে। আস্তিক মানুষের চৈত্তিক, আচারিক ও চারিত্রিক অসামঞ্জস্যের ও মননে অস্থিরতার কারণ এ-ই।

ঐহিক-বৈষয়িক জীবনে লাভে-লোভে কিছু বরণ-বর্জন করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, কিন্তু কল্পনা-বিস্ময়জাত বিশ্বাসের দুর্গে সে অটল এবং কর্মবৎ আত্মনিহিত।

তাই প্রতিটি আস্তিকই জানে তারটা ছাড়া অন্য ধর্মগুলো ত্রুটিবহুল ও পরিহার্য। সহাবস্থানের প্রয়োজনে যদিও বক্তা বা লেখকরা পরম উদারতায় উচ্চকণ্ঠে বানিয়ে বলে যে, সব ধর্মের সারকথা একই। তবু অন্তরে তা বিশ্বাস করে না। সারকথা অবশ্যই এক, তবে তারা যে-অর্থে যা নির্দেশ করে, তা নয়। তারা বলে ইহ-পরলোকে প্রকৃত পাপ-পুণ্য সম্পৃক্ত জীবন জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তত্ত্বাশ্রিত স্রষ্টাতত্ত্বে তারা আস্থা রাখে। আসলে ভয়-ভরসার অবলম্বন শক্তিপূজাই তাদের লক্ষ্য। এ জন্যেই তাদের উপাস্য লক্ষ্যগত দিক দিয়ে অভিন্ন হলেও নামে-রূপে-গুণে-বিচার-বিবেচনায় অভিন্ন নয়। তাই আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিক-রাষ্ট্রিক জীবনে স্বার্থবাজ আস্তিকরা প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগীদের বিদেশী বিধর্মী বিজাতি বিভাষী বলে চিহ্নিত করে সংঘবদ্ধ দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। এ ব্যবস্থায় ও অবস্থায় সমাজে অর্থ-বিত্ত-পদ-ক্ষমতা-খ্যাতি লাভ করতে ঘা দিয়ে ও পেয়ে এগুতে হয়।

আধির চিকিৎসার জন্যে বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী অধ্যুষিত আধুনিক রাষ্ট্রে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-মত-পথ-রুচি-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সমস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকার করতে হবে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে। অঙ্গীকার দানের বা প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত হবে : ব্যক্তিজীবনের মর্যাদার ও স্বাতন্ত্র্যের, সামাজিক জীবনে সাম্যের ও স্বাধীনতার, মানসজীবনে চিন্তা-চেতনার অনুভব-উপলব্ধির অনন্যতার, জীবিকাক্ষেত্রে সমসুযোগের ও সুবিচারের, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্বনিষ্ঠার ও অধিকারচেতনার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি ও অকৃত্রিম বাস্তবায়ন। এ নীতি কার্যকর হলেই ফিলিপাইনের, ফিজির, শ্রীলংকার, ভারতের, পাকিস্তানের, বাঙলাদেশের, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের গোত্রীয় কোন্দলের ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দাঙ্গার অবসান হবে, অন্তত উগ্রতা ও ব্যাপ্তি হ্রাস পাবে। চীনে রাশিয়ায় যেমন তা কৃচিৎ প্রকট।

AMARBOI.COM

এ পর্যন্ত যা বললাম, তা আসলে এ যুক্তির ও যন্ত্রের যুগে, বিজ্ঞানের ও বাস্তববোধের প্রাধান্যের যুগে অচল। এ বিজ্ঞানের ও ঐহিক বাস্তবতার জগতে এবং যুক্তি ও যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত জীবনে কল্পনা, বিস্ময়, অজ্ঞতা ও বিশ্বাসপ্রসূত আসমানী অরি-মিত্র শক্তিও নিয়তি নির্ভর জীবনে আমাদের শাস্ত্রিক, সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সহিষ্ণু সহাবস্থান সম্ভব করবে বিজ্ঞানবুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠা, যন্ত্রনির্ভরতা তথা প্রকৌশল-প্রযুক্তি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ কাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ বলেই স্বীকৃত। কাজেই এ কালে আমাদের আগেকার জীবনভাবনা ও জগৎচেতনা চলবে না।

কয়েক হাজার বছর ধরে অজ্ঞ-ভীত-বিস্মিত-কাঙ্ক্ষী মানুষ কল্পনা ও অনুভব যোগে আসমান-জমিনের মধ্যেকার জীব-উদ্ভিদ-প্রকৃতির উদ্ভবতত্ত্বে জগতের ও জীবনের তাৎপর্য আবিষ্কারে ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে ছিল নিষ্ঠ। এভাবে তারা সর্বব্যাপারে ভুল তত্ত্বে, প্রাতিভাসিক তথ্যে এবং প্রতীয়মান সত্যে উপনীত হয়ে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধির আনন্দে ও তৃপ্তিতে তুষ্ট ছিল। তাদের মননে, অনুভবে ও উপলব্ধিতে যুক্তির ঠাঁই ছিল না। এবং এখনো নেই বলে তারা সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। পরম্পরাগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনায় বিশ্বাসে সংস্কারে আত্মসমর্পণ করে তারা ঐহিক-পারত্রিক জীবনে নিয়তিনির্ভর হয়ে আশ্বস্ত হতে চেয়েছে। এ প্রশ্নহীন অজিজ্ঞাসু মানুষকে এ নিশ্চিন্ততা আজ অবধি কোন শ্রেয়সের সন্ধান দেয়নি। ভাগ্যে ভরসাবান মানুষ তাই দৈবকৃপাকরুণাকামী হয়েই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিবাদ ছাড়িয়ে লীলাবাদী হয়ে আত্মপ্রবোধের নামে আত্মপ্রতারণাই করেছে, করছে।

আজো এরা বুঝতে চায় যে প্রতীচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বদৌলত তাদের অরি দেবতা ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী কিংবা আগ্নেয় অস্ত্রের প্রয়োগে অরণ্যে বাঘের জলে কুমীরের নেতা কালু রায় দক্ষিণ রায়-কালু গাজী বড়খাঁ গাজী মিথ্যা হয়ে গেছে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর নাম না নিয়েও অহিন্দু বিদ্যা ও বিত্ত লাভ করে, দরবেশ-দারগাহ আশ্রিত না হয়েও অমুসলিম জীবনে সঙ্কট এড়ায়। আর স্রষ্টা বা ঈশ্বর মানে না বলে আজো কোন নাস্তিক জীবনে কোন অসামান্য অলৌকিক বিপর্যয় কবলিত হয়নি। 'ক্রস' শরণ না করেও অখ্রিষ্টান বিপদমুক্ত হয়। আর কে অস্বীকার করবে যে সব পূজা-মানত-শিরনী-তাবিজ-কবচ-মন্ত্র-মাদুলী-তুক-তাক-ঝাড়-ফুঁক সত্ত্বেও অবাঞ্ছিত সব ঘটনা ঘটে যায়, হয়ে যায়, হয়ে যায় ক্ষয়-ক্ষতি, মৃত্যু। বিপদতারক যদি ঈশ্বর হন, তা হলে বিপদে ফেলে অরিশক্তি শয়তান এবং মারা-বাঁচানোর এ দ্বন্দ্বে কখনো ঈশ্বর জেতেন, কখনো বা শয়তান। আজো মানুষ এবং শিক্ষিত মানুষ চাঁদে পাওয়া পাগলে, জিনে-প্রেতে পাওয়া পাগলিনীতে বিশ্বাস রাখে, এবং বিশ্বাস করার লোক কম নয়। মানুষের পায়ে দলিত চাঁদ আজো তিথি-ক্ষণ-লগ্ন-শুভাশুভ প্রতীক। উদ্ভিদবিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী শৈব বেলপাতার এবং মুসলমান মেহদী পাতার পবিত্রতায় আস্থা রাখে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতম শিক্ষা ও উপাধি প্রাপ্ত মশহুর ডাক্তারের বাহুতে তাবিজ মাদুলী এবং আঙুলে মন্ত্রপূত রত্নাঙ্গুরীয় দেখা যায়। এদের বিজ্ঞান পড়া, প্রযুক্তি জানার প্রভাব কি এদের মনে-মননে? এদের সংস্কৃতি কি এবং কোন স্তরের? চিন্তা-চেতনায় যুক্তির, জ্ঞানে বিজ্ঞানে তথ্যের এবং জীবিকায় প্রযুক্তির আনুগত্য অঙ্গীকার না করলে কোন মানুষই, তিনি যত বিদ্বান বুদ্ধিমান হোন, সমকালে বাঞ্ছিত চিন্তা-চেতনা সংস্কৃতিসম্পন্ন হবার যোগ্য হবেন না।

বিশ্বাস-সংস্কার চালিত মানুষ যৌক্তিক চিন্তা-চেতনা বিরহী বলেই তার মননের, উপলব্ধির ও অনুভবের অভিব্যক্তিতে কোন যুক্তিপরম্পরা থাকে না এবং সে-সম্বন্ধে তার কোন সচেতনতাও নেই। তাই তার মনে প্রশ্ন জাগে না যে, যে-ঈশ্বর স্রষ্টা সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান-সর্বত্র যাঁর উপস্থিতি, তাঁর ওহিতে-বাণীতে-দেশনায়-নির্দেশে চিরন্তনতা ও সর্বজনীনতা নেই কেন দেশে দেশে কালে কালে জনে জনে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্ববিরোধী বা বিপরীত আদেশ-নির্দেশ, নীতি-নিয়ম, তত্ত্ব-তথ্য শেখালেন কেন মানুষকে! পরিবর্তন কি তাঁরও পক্ষে অপ্রতিরোধ্য। আর এ যদি তাঁর স্বৈর স্বেচ্ছা লীলাময়তা হয়, তা হলে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের দ্বান্দ্বিক অবস্থান প্রসূত লীলারই বা তাৎপর্য কি? স্রষ্টা-সৃষ্টি, উপাস্য-উপাসক, নিয়ন্তা-নিয়তি, নীতি-নিয়ম ও বিধি-নিষেধ তত্ত্বে যে বিচিত্র ও বিবিধ স্থূল সূক্ষ্ম অসঙ্গতি রয়েছে বলে জিজ্ঞাসু ও যুক্তিপ্রিয় মানুষ মনে করে, সে-ধারণা বিমোচনের উপায় বা পন্থা কি?

মানুষই স্ব স্ব জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগে স্রষ্টার স্বরূপ ও মতি-গতি-অভিপ্রায় আবিষ্কার করুক, এ যদি তাঁর বাঞ্ছিত হয়, তা হলে পুরোনো শাস্ত্র, নীতি-নিয়ম বর্জনের, নতুন শাস্ত্র-সমাজ গড়ার এবং স্রষ্টা ও শাস্ত্র দুটোই পরিহারের স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে বলে মানতে হয়, সে-ক্ষেত্রে সহাবস্থানের জন্যে পরমত সহিষ্ণুতার শক্তি ও উদারতা অঙ্গীকার করা মানুষমাত্রেরই পক্ষে আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বিশ্বাস-সংস্কার ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা যখন ভাষায় অভিব্যক্ত হয়, তখনো তা ন্যায়শাস্ত্রসম্মত হয় না, বৈজ্ঞানিক তথ্যও হয় অবহেলিত। অন্তত চারশ বছর ধরে জানি যে চাঁদ-সূর্যের উদয়াস্ত নেই, নেই সূর্যের দিবারাত্রি, যেমন নেই চাঁদের শুক্ল কিংবা কৃষ্ণ পক্ষ। দিবারাত্রি কিংবা শুক্ল-কৃষ্ণ পক্ষ আছে পৃথিবীর তার গতিময় অবস্থান ভেদে। জলতরঙ্গ সমুদ্রশক্তির সাক্ষ্য নয়, বায়ুর প্রভাবের প্রমাণ মাত্র। অনেক ঘটনার কারণ-কার্য জেনেও আমরা সাফল্য ও ব্যর্থতা ভাগ্যের উপর আরোপ করি। পাঠ্যবই যে শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে পড়েছে, সে পরীক্ষার খাতায় লিখলে অবশ্যই পাশ করবে। পড়েনি প্রয়োজনানুরূপ, নকলও করতে পারেনি প্রত্যাশিত মাত্রায়, ফেল করে দায়ী করে দুর্ভাগ্যকে। অথচ বিজ্ঞান বলে কার্য মাত্রেরই কারণ রয়েছে এবং কারণ করণে থাকে সমতাও। কার্যের আবশ্যিক কারণগুলোর উপস্থিতি হবে অবিকল্প, নিঃশর্ত ও অব্যবহিত পূর্ব ঘটনা invariable unconditional immediate antecedent. কার্য-কারণ চেতনাই জ্ঞান। এ জ্ঞানই যুক্তির উৎস। এ কার্য-কারণ সন্ধিৎসু যুক্তি এ কালের বিস্ময় কম্প্যুইটারেরও ভিত্তি। আমরা আশৈশব লব্ধ বিশ্বাসে সংস্কারে লালিত বলেই বিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধি বিচার বিবেচনা আমাদের ভাব চিন্তা কর্ম আচরণকে প্রভাবিত করে না। কোন যুক্তিই আমাদের স্বার্থবুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত বা নির্মূল করে না, দূর করে না আমাদের বিশ্বাস-সংস্কারকে। Rationalism অঙ্গীকার না করলে reasoning-এর গুরুত্ববোধ জাগেই না। অথচ কালের দাবি অনুসারে এ যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে ও জগতে মানুষের শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবন এমন কি জীবিকাগত জীবনাচার যুক্তির ও প্রযুক্তির, জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের অনুগত করে গড়ে তুলতেই হবে। নইলে নানা জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-মত-পথ-রুচি-বুদ্ধির স্বার্থের ও সংস্কারের মানুষ নিবাসিত একালের রাষ্ট্রে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থান নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন করা যাবে না।

আজ তাই যুক্তির ও প্রযুক্তির, জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের নিষ্ঠ অনুশীলনে যুক্তিসম্মত ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ আয়ত্ত করা জীবিকায় সমাজে সংস্কৃতিতে ও রাষ্ট্রে স্বস্তিতে সহাবস্থানের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী। যাদু বিশ্বাসের দিন অপগত, এখন যন্ত্রের ও যুক্তির যুগ। এখন যন্ত্রবাদে ও যুক্তিবাদে আস্থা রাখা, যন্ত্র ও যুক্তি নির্ভরতাই হচ্ছে দেহে মনে চিন্তায় কর্মে সমকালীনতার লক্ষণ। অতএব, যাদু-মন্ত্র-মাদুলীতে বিশ্বাস নয়, যুক্তি-প্রযুক্তি-জ্ঞান-বিজ্ঞানে আস্থাই মানুষের সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনে সঙ্কট ঘুচাবে, আনবে মুক্তি। তাই বিদ্যালয়ের ভেতরে বাইরে প্রত্যেক মানুষেরই যুক্তির ও প্রযুক্তির, জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের মানস অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরী। আধির একমাত্র প্রতিষেধক যুক্তি। কাজেই যুক্তির প্রয়োগই শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আধি মুক্তির একমাত্র উপায়। অশাস্ত্রিক আইন-কানুনের উৎসও যে ওই ন্যায়সম্মত যুক্তিই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নানা জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-মত-পথ-স্বার্থ-শ্রেণীর মানুষ নিয়ে গঠিত আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের গুণপ্রতীক হতে পারে রশুন। নিরুপদ্রবে শান্তিতে সহাবস্থান করতে হলে নাগরিকদের বিভিন্ন বিচিত্র হয়েও স্বভাবে ও লক্ষ্যে অভিন্ন মূল রশুনের মতো হতে হবে। রশুন একের মধ্যে বহু এবং বহু মিলে এক। অভিন্ন হয়েও ভিন্ন, ভিন্ন হয়েও সংহত। মূলে ও আবরণে অভিন্ন হয়েও রশুনের প্রতিটি কোষ স্বতন্ত্র সত্তায় সহাবস্থান করে। স্বতন্ত্র হয়েও স্বার্থে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্যে, প্রাণে ও উৎসে এক এবং অভিন্ন। নাগরিককেও রাষ্ট্রিক স্বার্থে ও লক্ষ্যে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তার হয়েও অভিন্ন একক রাষ্ট্রিক স্বার্থে ও জাতি-অভিন্ন চেতনায় সংহত ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

তথ্য নির্দেশ

১ ক. শরীয়তনামা নসরুল্লাহ খোন্দকার
খ. আত্মচরিত্রঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র, কলিকাতা [১৯৭৪]
গ. আঠারো শতকের চট্টগ্রামে মুসলিমদের দেশজ আচার সংস্কার–
মুহম্মদ এনামুল হক স্মারকগ্রন্থ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ১৯৮৪।

এ আধিমুক্তির উপায় কি

মুসলিম দেশ-কাল-জাত-বর্ণ মানে না। আল্লাহর বান্দা রসুলের উম্মত মাত্রই এক জাত ও পরস্পর আত্মীয়। 'কোরআন' সর্বজনীন ও চিরন্তন মানবদিশারী গ্রন্থ বলে দেশ বা কাল-আয়ত্তও নয়। কাজেই যে-কোন মুসলিম শাসনে কোনো মুসলিমই পরাধীন নয়, পরশোষিতও নয়। কেবল দৈশিক কিংবা ভাষিক অথবা গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা মুসলিম-চেতনাকে ছাপিয়ে প্রবল হলেই একজন বা একদল মুসলিম মুসলিমশাসিত রাষ্ট্রেও নিজেদের পরাধীন ও শোষিত গোত্র, দেশ, ভাষিক গোষ্ঠী হিসেবে ভাবতে পারে। সে-অবস্থায় তার জাতিসত্তার ও জাতীয়তার ভিত্তি হয় স্বগোত্র, স্বদেশ ও স্বভাষা।

বাঙালীরা গোড়ায় কেবল মুসলিম হিসেবেই গোটা ভারতবর্ষের মুসলিমদের জন্যে নিরাপদ বাসস্থানরূপে পাকিস্তান চেয়েছিল ও বানিয়েছিল। ব্রিটিশ-ভারতে রাজনীতিক যৌক্তিকতা হিসেবে পূর্বে ও পশ্চিমে দুই বিচ্ছিন্ন ভূ-খণ্ডে দু'টো পাকিস্তান হওয়ারই কথা ছিল। ১৯৪৬ সনের এপ্রিলে দিল্লী সম্মেলনে বেরাদরী আবেগ বশে বাঙালীরা অখণ্ড একক পাকিস্তান বানাতে রাজি হয়।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রবল পশ্চিম পাকিস্তানীর [বাস্তবে ভারতের উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী উচ্চবিদ্যার, উচ্চবৃত্তির রাজনীতিক-প্রশাসকদের এবং গুজরাটী ইসমাইলী-মেমন প্রভৃতি জাত বেণেদের] শাসনে-শোষণে-লুণ্ঠনে-বঞ্চনায় বিভ্রান্ত-বিক্ষুব্ধ বাঙালীরা রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের প্রশ্নে ক্ষোভকে ক্রোধে ও দাবি আদায়ের সংগ্রামে পরিণত করে। তখন তাদের সংগ্রামের উত্তেজক-উদ্দীপক জিগিরের বা শ্লোগানের উৎস হয় বাঙালীসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও বাঙলাভাষার গুরুত্ব। কাজেই বাঙালীসত্তা অঙ্গীকার করেই বাঙালী শোষণমুক্তি ও ভাষায় স্বাধিকার দাবি করেছিল। তার মুসলিম-চেতনা সমান্তরাল কিংবা প্রবল থাকলে সে কিছুতেই মুক্তিযুদ্ধ করতে পারত না। অতএব, 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে বাঙালীসত্তার জাগরণে। তাই মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পেরেছিল। ধর্মবিশ্বাস এবং হিন্দু বা মুসলিম জাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় সেদিন সমাজে-রাষ্ট্রে অস্বীকৃত ছিল, কেবল ধর্ম ও ধর্মীয় পরিচিতি ছিল একান্তই ব্যক্তিক এবং অসামাজিক ও অরাষ্ট্রিক।

সে-অবস্থায় মুসলিম বাঙালী কিংবা বাঙালী মুসলিম পরিচিতি মুক্তিযুদ্ধের, রাষ্ট্রাদর্শের ও দৈশিক জাতিসত্তার বিরুদ্ধ চেতনার পরিচায়ক। এটি অঙ্গীকার ভঙ্গের, আদর্শচ্যুতির ও জাতিসত্তার অস্বীকৃতির নামান্তর। বাস্তবে এ অঙ্গীকার বহু নেতা-উপনেতা, মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনীতিক দলও ভঙ্গ করেছেন নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে। মুক্তিযোদ্ধারা ও আওয়ামী জনগোষ্ঠী এখন আর ধর্মনিরপেক্ষতার কিংবা সমাজতন্ত্রের কথা বলে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক-বীমা-কল-কারখানাও এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ তথা বাকশাল সমর্থকদের ব্যক্তিক মালিকানাগত। এভাবে আদর্শচ্যুত দলছুট বেহায়া-বেশরম মতলববাজ স্বার্থসচেতন অর্থগৃধ্নু লুটেরার সংখ্যা সমাজে অপরিমেয় হয়ে উঠেছে।

এখন প্রায় সব ধূর্ত-দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত ছদ্মলোকসেবীরা অর্থ-বিত্ত-নাম-যশ-খ্যাতি অর্জনের সুযোগসন্ধানী এবং সে-কারণেই সুবিধাবাদী। তাই তাদের মত-মতি, উপায়-উপলক্ষ, পথ-পদ্ধতি অস্থির ও বহুরূপে বিচিত্র। এখন সেই সেক্যুলার সমাজবাদীরাই ইরাকী-সৌদী প্রবর্তনায় ও মুৎসুদ্দি-প্রচারণায় লাভে-লোভে হাওয়া বুঝে রাষ্ট্রীয় জীবনে সরকারী ইসলামী সমর্থক। বৈষয়িক জীবনে ইসলাম ভাঁওতাবাজির অবলম্বনমাত্র বলেই তাদের বুকে পোষা কাঙ্ক্ষায় ও মুখে-বলা কথায় এবং কর্মে ও আচরণে সঙ্গতি-সামঞ্জস্য থাকে না। অপরাধ, অপকর্ম ও পাপপ্রবণ এসবের চেতনায় ও কর্মে-আচরণে ইসলামী বিধি-নিষেধের ছিটেফোঁটাও তাই দুর্লক্ষ্য। ঠিকেদার-দোকানদার-কারখানাদার-আমলা-মন্ত্রীর সম্বন্ধে দুর্নীতিপ্রবণতার অভিযোগ কিংবা নিন্দা প্রায়ই শোনা যায়। এসব জন্মসূত্রে মুসলমান তরক্কীবাজদের সমর্থনে ও প্রচারণায় বাঙালীসত্তা, মুক্তিযুদ্ধচেতনা ও সমাজবাদ আজ প্রায় অবলুপ্ত। এখন দিকে দিকে আবার ইসলামপ্রীতিকে ব্যবসায়িক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রেডিয়ো-টিভি-মসজিদ-দরগাহ-মিলাদ-উরস-ইস্তেমা-তবলীগ মাধ্যমে তীব্র, তীক্ষ্ণ, ব্যাপক ও গভীর করবার অভিসন্ধিমূলক নীতি বাঙালিত্ব ও মুক্তিযোদ্ধাগর্বী সরকারপ্রধানই গ্রহণ করেছেন সগর্বে ও সগৌরবে।

এতেই প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে যে প্রত্যয়ে নয়, হুজুগ বশেই তারা বাঙালী ও সেক্যুলার সমাজতন্ত্রী হয়েছিল ১৯৭১-৭২ সনে। হুজুগতাড়িত মানুষের উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণে বাঙালীসত্তার গর্ব, বাঙলাভাষার মর্যাদার দাবি ও সেক্যুলার সমাজতন্ত্রের কাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হলেও তাতে আস্থার, প্রীতির ও প্রত্যয়ের লেশমাত্র ছিল না তাদের অন্তরে।

তাই ভাষা সংগ্রামের জয়-প্রতীক 'বাঙলা একাডেমী' জনগণের প্রতিষ্ঠান থাকেনি, সরকার-নিয়ন্ত্রিত সরকার-পরিচালিত সরকারী নীতি রূপায়ণসংস্থা মাত্র হয়ে গেল। প্রমাণ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানসূচী। শোক-শহীদ পার্বণরূপে কেবল সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক নিরুদ্দিষ্ট ও নিবর্ণ অনুষ্ঠানে আগ্রহ। এখানে শহীদের জন্যে পার্বণিক কান্না আছে কিন্তু গাজীদের ঠাঁই নেই। বাঙলা একাডেমী অঙ্গনেও জনগণের কোনো অধিকার নেই। সরকারী-নীতির মাপ বহির্ভূত স্বাধীন চিন্তা লেখায় ও কথায় প্রকাশ করার অধিকার তথা বাকের ও চিন্তার স্বাধীনতা বাঙলা একাডেমীতেও নেই। গণ-আন্দোলনের ২১ শে ফেব্রুয়ারী শোক-শোকরিয়া কিংবা শহীদ দিবসরূপে পালিত হয় সরকারী নির্দেশেই। মুক্তিযুদ্ধলব্ধ 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্র আজ রাজাকার, অব-সৈনিক আর আদর্শচ্যুত, দলছুট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধপ্রবণ দুর্নীতিবাজশাসিত। এমনকি মুক্তিযোদ্ধা সমিতিও এখন একটি সরকার-পোষ্য সরকার-নিয়ন্ত্রিত সরকারী সংস্থা। যুদ্ধ করে কারা, রাজত্ব করে কারা, দেশ সেবক হয়ে মজা লুটে কারা, সে প্রশ্ন কারো মনে জাগেই না। এখন ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মতো আমরা ভাষা-সংগ্রামের, মুক্তিযুদ্ধের, স্বাধীনতা অর্জনের আনন্দ, গৌরব ও প্রসাদ মনে মনে উপভোগ করেই তুষ্ট ও তৃপ্ত। দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কর্মারা স্বাধীনতার সব সুখ-সুবিধে ভোগ করছে আমাদের চোখের সামনেই, আমাদের বঞ্চিত ও প্রতারিত করেই। অকৃত্রিম প্রত্যয় ও দৃঢ় অঙ্গীকার ছিল না, তাই প্রত্যাশা পূরণ হল না কোনো ভাষা সংগ্রামীর, কোনো মুক্তিযোদ্ধার। এর সাক্ষ্য সমাজে সর্বত্র প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। যারা কেবল সেক্যুলার বাঙালী ছিল, তারা এখন কেবল মুসলমান কিংবা শুধু হিন্দু, বড়জোর বাঙলাদেশী মুসলমান বা হিন্দু অথবা মুসলিম বাঙালী কিংবা হিন্দু বাঙালী। এদের কেউ থাকল না সমাজবাদীও। গণতন্ত্রীও হল জঙ্গীতন্ত্রের সহযোগী বা সমর্থক। অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাও হল আদর্শচ্যুত, অঙ্গীকারভ্রষ্ট দলছুট দালাল-মুৎসুদ্দি। মনে সামন্ত, কথায় বুর্জোয়া, কাজে মতলববাজ লুটেরা হল ঠিকেদার, সওদাগর, কারখানাদার, আড়তদার, আমলা, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক আর সরকারী কৃপালিপ্সু মন্ত্রী। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে!

গোড়ায় আমরা প্রায় সবাই ছিলাম সাম্প্রদায়িক বা স্বধর্মীচেতনাঋদ্ধ পাকিস্তানকামী। আমাদের চেতনার গভীরে প্রোথিত ছিল এ স্বধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য-চেতনার শিকড়। তাই ১৯৭০-৭২ সনে আমরা দায়ে পড়ে হাওয়া বুঝে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল ছিল বলে মুখে উচ্চারণ করলেও অন্তরে এ ভুলের উপলব্ধি বা স্বীকৃতি ছিল না। যদি থাকত, তাহলে কেউ না কেউ অখণ্ড ভারতপন্থী কিংবা বাঙলাভাষীর ঐক্য, সংহতি এমনকি রাষ্ট্রিক মিলন কামনা করত। বাস্তবে শোষক পশ্চিম পাকিস্তানীদের তাড়িয়ে বিভাষীর শোষণমুক্ত স্বাধীন, সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র রাখাই ছিল অনুচ্চারিত কিন্তু চেতনার গভীরে লালিত বাসনা। ঘরে-বাইরে অমুসলিম বাঙালীরা তথা বাঙলাভাষীরা তা আঁচ করতে পেরেছিল। তাই তাদেরও চিন্ত-চেতনার প্রত্যাশিত কোনো রূপ কর্মে আচরণে প্রকাশ পায়নি।

ইসরাইল রাষ্ট্র যেমন দুনিয়ার ইহুদীমাত্রেরই জাতীয় গৌরবের, গর্বের, ভরসার, স্মরণের, সংহতির, স্বপ্নের, আকর্ষণের ও প্রেরণার উৎস ও অবলম্বন, স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশও তেমনি বাঙলাভাষী মাত্রেরই ভাষিক ও দৈশিক জাতিসত্তার এ জাতীয়তার, আত্মীয় ও ঐক্য চেতনার, অভিন্ন গৌরবের, গর্বের, স্বপ্নের, আকর্ষণের, সংহতিবোধের ভিত্তি ও ধারক হতে পারত। কিন্তু হয়নি। তার কারণ বঙ্গভঙ্গের মূলে ছিল বাঙলাভাষীদের মধ্যে ধর্মমতের পার্থক্যের ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য চেতনার গুরুত্ব। ভাষার, রক্তের, গাঁ-গঞ্জের, শহর-বন্দরের, রোদ-বৃষ্টির, শীত-বসন্তের, ঝড়-ঝঞ্ঝার, খরা-বন্যা-মারীর, হাট-ঘাটের, মাঠ-বাটের অভিন্নতা সেদিন কারো মনে মমতা জাগায়নি, করেনি কোনো আবেগ সঞ্চার। ধর্মমতের সেই স্বতন্ত্র্য স্বধর্মীর সেই জাতীয়তা এ মুহূর্তেও প্রবল। তাই ভারত রাষ্ট্রভুক্ত বাঙালী হিন্দুরা ভাষাভিত্তিক এ স্বাধীন-সার্বভৌম বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের গৌরব-গর্ব করতে আগ্রহী নয়, 'ভারতীয়' পরিচয়ে গর্বিত। বাঙলাদেশও অভিন্ন রাষ্ট্র গঠনে বিশ কোটি স্বভাষীকে সাদরে আহ্বান জানাতে উৎসাহী হবে না। এমনি চিন্তা-চেতনা প্রভাবিত মানুষের ভাঙা বাঁশের মতো 'পিরীতি ভাঙিয়া গেলে নাহি লাগে জোড়া' সেক্যুলার রাষ্ট্রেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এমনি ধরনের ভাঙামনে প্রীতির ফুল ফুটতে পারে, ধরতে পারে প্রীতির ফল। কিন্তু এসব হচ্ছে স্বাপ্নিকের আবেগের কথা। বাস্তব ইচ্ছার প্রসূন নয়।

যেহেতু মুমীনমাত্রই এই দেশকালহীন চিরন্তন সর্বজনীন অবিভাজ্য বিশ্বমুসলিম জাতিসত্তায় আস্থাবান, সেহেতু তার মুখ্য পরিচয় সে মুসলিম। দৈশিক-ভাষিক-গৌত্রিক-বর্ণিক পরিচয় তার মনে কোনো আবেগ সৃষ্টি করে না, তার কাছে তা মূল্য-মর্যাদাহীন, কেবল বিচ্ছিন্নতাজারক মাত্র। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙালী মুসলিম মনে যেসব রাজনীতিক উপসর্গ দেখা দিয়েছিল, আজ আবার প্রায় চল্লিশ বছর পরে সেগুলো ইয়াংকী-সৌদি প্রলোভনে বাসন্তী হাওয়া পেয়ে মুৎসুদ্দি প্রচারণায় ওষধির মতো গজিয়ে উঠছে। আবার বাঞ্ছিত হয়েছে তথাকথিত ইসলামী শাসন, আরবী-ফারসী মিশ্রিত খিচুড়ী বাঙলা, হাওয়াই তমদ্দুনপ্রীতি, সমাজতন্ত্রভীতি, বিধর্মীবিদ্বেষ। ইসরাইলকে দিয়ে আরবদের ঘাড় ভাঙালেও, জান-মাল ক্ষয় করলেও মার্কিন সরকার ও তার চাকরি, বৃত্তি এবং য়ুরোপীয় ভাষা আর সিনেমা ও য়ুরোপে নির্মিত যন্ত্র ও নানা সামগ্রী মুসলিমের প্রিয়।

এখন ঢাকায় বহু রাজনীতিক দলের মতে আমরা জাতে রাষ্ট্রিক বাঙলাদেশী মুসলিম বা হিন্দু— কেউ বাঙালী নই। আমাদের ধারণায় গত চল্লিশ বছরের মধ্যে আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ এবং জাতীয়তার রূপ এবং জাতীয়তার ভিত্তি ও নাম নিঃসংশয়ে স্থায়ীভাবে নিরূপিত নির্ধারিত হওয়া আবশ্যিক ছিল। কিন্তু এক এক মুৎসুদ্দি এক এক প্রভুর ইঙ্গিতে ও পরামর্শে নতুন নতুন অভিসন্ধি জাত নব নব সংজ্ঞায় জাতিসত্তা ও জাতিনাম নিরূপণে উৎসাহী হয়ে এমন একটি মৌলিক ও আবশ্যিক ধারণা অস্থির ও তরঙ্গতরল করে তোলে। ফলে জাতি সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে চিন্তায় চেতনায় ও লক্ষ্যে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে আত্মবিকাশের পথে ধীরবুদ্ধিতে ও স্থির বিশ্বাসে এগুতে পারে না। দৈশিক, ভাষিক, গৌত্রিক, ধার্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক ভিত্তিতে ও পরিচয়ে জাতিসত্তার ও জাতীয়তার সংস্কার, শিকড়, প্রত্যয়, স্বরূপ, সংজ্ঞা, ধারণা ও নাম গড়ে ওঠে। প্রাচীন রোমও আধুনিক যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রিক জাতীয়তার নিদর্শন, গৌত্রিক-ধার্মিক রাষ্ট্র ইসরাইল, গৌত্রিক-ভাষিক প্রদেশ তামিলনাড়ু, দৈশিক-ভাষিক রাষ্ট্র ফ্রান্স, বার্মা, ভাষিক রাষ্ট্র বাঙলাদেশ। রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তার নিদর্শন উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়ান, পূর্ব-পশ্চিম জার্মানী, পাঞ্জাবী-পূর্বপাঞ্জাবী, ভাষিক পরিচয়ে বাঙালী। আর সাধারণভাবে বাসভূম বা মাতৃভূমির নামেই বাসিন্দারা জাতিনাম ও ভাষানাম পায়। যেমন জাপান-জাপানী ভাষা-জাপানী মানুষ, তেমনি জার্মানী, জার্মান ভাষা, জার্মান মানুষ।

নৃতাত্ত্বিক মাপে বাঙালীরা মিশ্ররক্তের মানুষ, দৈশিক অবস্থানে এবং ভাষায় অভিন্নসত্তায় সংহত। নিবাস একাধিক রাষ্ট্রে বিস্তৃত, ধর্মে বিভিন্ন। তাই সংস্কৃতিতে আর জীবনদৃষ্টিতে পার্থক্যও দৃশ্যমান। শুধু বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে নয়, শাস্ত্রমানা মানুষ মাত্রেরই মধ্যে সংস্কৃতির ও জীবনবোধের এ স্থূল-সূক্ষ্ম পার্থক্য দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে এমনকি স্থানিক-কালিক পার্থক্যও রয়েছে ক্যাথলিকে-প্রোটেস্টানে, হীনযানে-মহাযানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিয়া-সুন্নীতে, শাক্তে-বৈষ্ণবে-লিঙ্গায়েতে-গাণপত্যে। ধর্মমতের ভিত্তিতে 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্রের অধিজনেরা যদি মুসলিম জাতি হয়, তা হলে অমুসলিমরা এ রাষ্ট্রে হবে জিম্মি, যা সমনাগরিকত্ব ও মৌল মানবিক অধিকারস্বীকৃত এ যুগে হবে ঘৃণ্য অমানবিক বর্বর মানসিকতার ও আচরণের পরিচায়ক। বলা বাহুল্য যে সমনাগরিকত্ব কেবল সেক্যুলার রাষ্ট্রেই সম্ভব ও স্বাভাবিক। প্রান্তিক অঞ্চলের গৌত্রিক জাতিসত্তার স্বীকৃতিতে এবং অধিজনের ভাষিক প্রাধান্যে গুরুত্ব দিয়ে বাঙালী জাতীয়তা অঙ্গীকার করলে এবং বাঙলাদেশ বহির্ভূত বিপুল সংখ্যক বাঙলাভাষীর কথা স্মরণে রাখলে ভাষার নাম বাঙলা, ভাষীর নাম বাঙালী ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম 'বাঙলাদেশ' রাখা সমীচীন, যেমন আরব উপদ্বীপবাসী আরব, ভাষা আরবী এবং রাষ্ট্রিক পরিচয়ে কেউ সৌদী, কেউ কোয়েতী, কেউ ইয়ামনী, আমরাও তেমনি যুগপৎ জাতিতে বাঙালী রাষ্ট্রিক পরিচয়ে বাঙলাদেশী থাকব। পশ্চিমবঙ্গের বাঙলাভাষীরাও অবশ্যই বাঙালী, রাষ্ট্রিক ভারতীয় মাত্র। রাষ্ট্র ভাঙে গড়ে, কিন্তু জাতিসত্তা চিরন্তন।

ইতিহাসের সাক্ষ্যে বলা যায় যে মুসলিমরা গোত্র ও পিতৃ পরিচয়ের চেয়েও বেশী পছন্দ করত জন্মভূমির পরিচয়ে অভিহিত হতে। মক্কী, মদনী, নিশাপুরী, সমরখন্দী, বুখারী, খোরাসানী, এলাহাবাদী, দেহলভী, ব্রেলভী, তাবরেজী, কনুঈ, কাবুলী, রুমী, আফগানী প্রভৃতি তার প্রমাণ। কিন্তু পাকিস্তানে কিছু বাঙালী মুসলিম, পাকিস্তানী ও পাকজবানী হতে আগ্রহী হয়েছিল। মধ্যযুগে ইজ্জতুল্লাহ তাঁর ফারসী গুলেবকাউলি কাব্যে নিজেকে ইজ্জতুলাহ 'বাঙালী' বলে পরিচয় দিয়ে গৌরব বোধ করেছেন। এমনি বাঙালী বাচির লোক আরো ছিলেন।

AMARBOI.COM

ব্রিটিশ আমলে বাঙলার তথা ভারতের মুসলিমরা প্রথম রাজনীতিক চেতনাজড়িত হয়ে তারা মুসলিম না বাঙালী বা ভারতীয়— আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে এ দ্বিধার, সংশয়ের ও প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। সেই সময় থেকে আজ অবধি তারা এ আধি থেকে নিঃসংশয়ে মুক্তি পায়নি। তাই রাজনীতিক চাল হিসাবে সত্তার স্বরূপ ও নাম নিয়ে অস্তিত্বের এ মারাত্মক খেলায় এক একটি দালালগোষ্ঠী ও মুৎসুদ্দি সরকার মেতে ওঠে। আর ক্ষণে ক্ষণে গর্জে বলে 'হিং টিং ছট'। যেমন পোষাপাখির মতো মন্ত্রীরা প্রভুর ইঙ্গিতে প্রভুর শেখানো বুলি ক্ষণে ক্ষণে আওড়ান 'বিদেশী সংস্কৃতি ও ভাব বর্জন কর'। তাঁরা ভুলে যান যে তাঁরা নিজেরাই বিদেশী শাস্ত্রের, শিক্ষার ও সংস্কৃতির সৃষ্টি এবং বিদেশীর কলা-কৌশল ও আবিষ্কার নির্মিত সামগ্রীনির্ভর।

আমরা সবাই জানি এ রাজনীতিক ও সরকারী ইসলামপ্রীতির মূলে রয়েছে প্রতাপে প্রবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হিন্দুবিদ্বেষ এবং মার্কসবাদভীতি। কাজেই এ আধি-কবলিত বাঙালীরা আমাদের যৌক্তিক সমাধান গ্রহণ করবে কি-না সন্দেহ। মনে হয় ইয়াংকী স্বার্থেই তাদের ঋণ-দান-অনুদান নির্ভর বাঙলাদেশে শীতকালের ঔষধির মতো এ আধি মরে মরেও বার বার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠবে। আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ ও জাতি পরিচিতি স্থায়ীভাবে নির্ণীত হবে না। তবু হতাশ হলে চলবে না। এ আধির নিদান কি ও এ আধি থেকে মুক্তির উপায় কি, তা ভেবেচিন্তে বের করতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতা

অসহায় মানুষ নিজেদের গরজেই আবিষ্কার করেছে স্রষ্টা তথা জীবননিয়ামক প্রভু তার অজ্ঞ অসমর্থ অসহায় জীবনে বিশ্বাসের ও ভরসার, ভয়মুক্তির ও নিরাপত্তার অবলম্বন হিসেবেই। আদি মানবের অজ্ঞতার অসহায়তার সে-স্তর ভব্য সভ্যমানুষ অনেক আগেই অতিক্রম করলেও ব্যক্তিমানুষের আজো ভয়তাড়ক ও ভরসাদাতা এক অদৃশ্য শক্তির সহায়তা প্রয়োজন হয় আশৈশব লব্ধ ও নিষ্ঠ লালনে পুষ্ট বিশ্বাস-সংস্কারপূর্ণ জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধিশূন্য মানসিক জীবনে। তার চাওয়ার ও পাওয়ার মধ্যেখানের বিঘ্নজাত না পাওয়ার, আকাঙ্ক্ষার অপূর্তির অনুভূতি থেকেই তার ভয়-ভরসার অরি-মিত্র অদৃশ্য নিয়তি শক্তির উদ্ভব। মূলত সব কার্যের অদৃশ্য অজানা 'কারণ'কেই তারা স্রষ্টা বলে মেনেছে। আমরা জানি, কারণ-বিহীন করণ বা কার্য নেই, সে-কারণ অবশ্য অনেকতায় বহু।

অতএব স্রষ্টা ও শাস্ত্র মানুষের মানসিক, বৈষয়িক ও সামাজিক প্রয়োজনেই স্থানিক ও কালিকভাবে তৈরি করেছে মানুষই। জ্ঞানের প্রসারে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে, যুক্তির প্রয়োগে এ স্রষ্টার ও শাস্ত্রের স্থানিক ও কালিক পরিবর্তন ঘটেছে, তত্ত্বের হয়েছে উৎকর্ষ, বেড়েছে বিশ্বাস-সংস্কার-যুক্তি-বুদ্ধি-গরজের মিশ্রণে তত্ত্বের জটিলতা, ভয়-ভরসা ভিত্তিক স্রষ্টা ও শাস্ত্র তত্ত্বে মিশেছে নানা কল্পনা ও বিশ্বাস প্রতীক উপশক্তি তুক-তাক, মন্ত্র-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ-মাদুলী প্রভৃতি প্রায়োগিক যাদু এবং বিভিন্ন টোটেম-ট্যাবু।

অতএব মাৎস্যন্যায় বিলোপ লক্ষ্যে প্রজারা মিলে গোপালকে যেমন রাজা বানাল, আদিকালের মানুষও তেমনি নিজেদের প্রয়োজনে স্রষ্টা ও শাস্ত্র বানিয়ে নিজেরাই তাঁদের অনুগত হল। যেমন আমরা শহীদমিনার তৈরি করে প্রমূর্ত ও পবিত্র জাতীয় ঐতিহ্য প্রতীক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক পার্বণ সৃষ্টি করেছি চিরকালের জন্যে। ইতোমধ্যে মানুষ জগতের ও জীবনের অনেক রহস্য আবিষ্কার করেছে, অনেক অনেক বিশ্বাস-সংস্কার আচার-আচরণ, মন্ত্র-মাদুলী, দেবতা-দানব (ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী) অহেতুক, অপ্রয়োজনীয়, নিষ্ফল ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু দুর্বলচিত্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকে ভরসা পায় না, তারা স্রষ্টা ও শাস্ত্র মানে, আচারে-আচরণে স্রষ্টার ও শাস্ত্রের আনুগত্যের রূপায়ণকেই তারা চর্যারূপে জানে ও মানে।

সবধর্মের উদ্ভবই স্থানিক ও কালিক, এ স্থানিক ও কালিক মানুষের সীমিত মানসিক শক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বিবেক-অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন প্রসূত ঈশ্বরের আনুগত্য সর্বজনীন করার আগ্রহই তাদেরকে প্রচার-প্রবণ করেছে, স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বসংস্কারের উদ্ভবও শৈশবে উন্মেষিত এবং লালিত আবেগ-অনুরাগই। অবশেষে আচারে-আচরণে পালা-পার্বণে প্রায়োগিক শাস্ত্রই মানুষের ঈশ্বরানুগত্য রূপে ব্যক্তিক ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। এতে কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি-উপলব্ধি থাকে না, প্রাজন্মক্রমিক তাৎপর্যরিক্ত আচার-আচরণ-চর্যা থাকে মাত্র। এ তখন একটা স্থূল বিশ্বাস-সংস্কার বা আশৈশব লালিত অভ্যাস মাত্র, ঈশ্বরতত্ত্ব হচ্ছে ইহ-পরজীবন নিয়ন্ত্রী এক পরমশক্তি। এ কৌম-গোত্র-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়-স্বধর্মীর জাতিচেতনার বন্ধনসূত্র। কাজেই ব্যক্তিমানুষের আরো হাজারো বিশ্বাস-সংস্কারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই ভিত্তিহীন হলেও এর গুরুত্ব ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে অসামান্য ও অবিমোচ্য। তাই স্বধর্মেই তথা শাস্ত্রেই তাদের সত্তার ও সম্বিতের স্থিতি-ঐহিক ও পারত্রিক উভয়ত। এ কারণেই ধর্মের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতায় সশ্রদ্ধ সহাবস্থান দুর্লভ। ইতিহাসের সাক্ষ্যেই জানি ধর্মমতের পার্থক্য জাত হানাহানি অন্য সবরকম দ্বন্দ্ব সংঘর্ষকে সংখ্যায় ও মাত্রায় ছাড়িয়ে গেছে।

দুনিয়ার দুর্বলচিত্ত বিশ্বাস-সংস্কার চালিত ভয়তাড়িত ও ভয়সাশ্রিত মানুষের সংখ্যা লক্ষে নিরানব্বই হাজার নয়শ নিরানব্বই জন। জ্ঞান-যুক্তি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আরো বিকাশে প্রসারে এ সংখ্যা অনেক হ্রাস পাবে বটে, তবু আপাত উদাসীনরাও শঙ্কা-সঙ্কট মুহূর্তে ঈশ্বরাশ্রিত ও মন্ত্র-মাদুলীরূপ যাদুনির্ভর হবে। কাজেই মানুষ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভাবে কখনো নাস্তিক হলেও ব্যক্তিক জীবনে সবাই নাস্তিক হবে বলে মনে হয় না।

আপাতত দেখা যাচ্ছে কম্যুনিস্ট শাসনে দীর্ঘকাল থেকেও বিশ্বাসে ও অঙ্গীকারে যারা অকম্যুনিস্ট তারা ব্যক্তিজীবনে সত্তার ও সম্বিতের গভীরে ভূতে-ভগবানে বিশ্বাস, নিয়তিতে আস্থা, স্বপ্নাদি অলৌকিক যাদু-টোনার সত্যতায় নির্ভরতা রাখে। কিন্তু কেবল ভূতে-ভগবানে, তুকে-তাকে, বানে-উচ্চটানে, মন্ত্রে-মাদুলীতে বিশ্বাস ব্যক্তিক বা সামাজিক জীবনে দ্বেষ-দ্বন্দ্বের কারণ হয় না। ঈশ্বর সম্পৃক্ত আচার-আচরণের পালা-পার্বণের সামাজিক লালন ও রূপায়ণই ঘটায় ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কিংবা জাতিগত লড়াই। কাজেই আস্তিক্যটা বজায় রেখে অর্থাৎ স্রষ্টায় বা ঈশ্বরে আস্থা রেখে শাস্ত্রিক আচার-আচরণ-পালা-পার্বণকে ব্যক্তিক বলে মেনে সামাজিকভাবে বর্জন করলেই কেবল বিধর্মী বিদ্বেষের বিলুপ্তি সম্ভব হবে। তখনই কেবল বিভিন্ন ঈশ্বরবাদীর সহিষ্ণুতায় সশ্রদ্ধ সহাবস্থান নির্বিঘ্ন হবে।

AMARBOI.COM

কিন্তু মানুষ নিজেদের গরজেই ভয়-ভরসা ন্যায় প্রতীক সর্বজনীন ও সার্বভৌম ঈশ্বর উদ্ভাবন করেছে জীবনে অভাবের ও আকাঙ্ক্ষার নির্বিঘ্ন পূর্তি লক্ষ্যে। এ জন্যেই স্বকল্পিত ঈশ্বরের স্তুতি-প্রশস্তি, তোয়াজ-তোষামোদ, উপাসনা-প্রার্থনা পদ্ধতিও তৈরি করেছে অর্থাৎ কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্য-প্রীতি-প্রসাদ পাবার জন্যে-অপর মানুষকে তার মন যে পদ্ধতিতে গলিয়ে বশ করা হয়, তেমনি পদ্ধতি প্রয়োগে স্বসৃষ্ট ঈশ্বরকেও তুষ্ট করা যায়— এ বিশ্বাসে স্তুতি-প্রশস্তি-চাটুকারিতা হয়েছে কাঙ্ক্ষাপূর্তির উপায়। মানুষের শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ-পালা-পার্বণ হয়েছে কাঙ্ক্ষাপূর্তির প্রায়োগিক দিক। তাই তারা শঙ্কা সঙ্কট উত্তরণ এবং কাঙ্ক্ষা বস্তু প্রাপ্তি লক্ষ্যে আচারসর্বস্ব। আর ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক লড়াই বাধে ওই আচারে অনুষ্ঠানে বাধাদানের আর প্রতিষ্ঠান ভাঙার ফলে। সব মানুষ বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-সমাজ তত্ত্বে বাঞ্ছিত মানের বিদ্যা অর্জন করলে এবং বিশ্বাসে আস্তিক হয়েও জ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠ হলে, তখন মনে হয় সমাজ স্বাস্থ্যের জন্যে, সম্প্রদায়গত জীবন নিরুপদ্রব রাখার জন্যে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থান করার অঙ্গীকার সহজেই করতে পারবে। মাপে-মানে-মাত্রায় বিশেষ বিদ্বান ও সংস্কৃতিমান মানুষের সহিষ্ণুতা, উদারতা ও সৌজন্য এ প্রত্যাশা জাগায়।

অথবা দেশ-কাল-গোত্রগত 'ঈশ্বর' চেতনাকে জিইয়ে রেখেও অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্বে আস্থা রেখেও বিভিন্ন দেশে কালে গোত্র ও ব্যক্তি উদ্ভাবিত শাস্ত্রের সত্যে, আচারে ও বিশ্বাসে বহু বহু ক্ষেত্রে মেরুর ব্যবধান ও বৈপরীত্য এবং কারণ-ক্রিয়ানিরূপণে অযৌক্তিক বৈচিত্র্য ও ব্যর্থতা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি যোগে অনুভব ও উপলব্ধি করে শাস্ত্র পরিহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার চেতনাও আস্তিক মানুষ নির্বিশেষকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বস্থ ও সুস্থ রাখতে পারে। স্রষ্টা তো কেবল মানুষই সৃষ্টি করেননি, বিশ্বের জীব-উদ্ভিদ-জল-বায়ু-অগ্নি মাটিও সৃষ্টি করেছেন, অন্যদের যদি আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্বে, প্রয়োজন ও শাস্ত্র না থাকে, তবে অন্যতম সৃষ্ট এবং প্রাণিজগতের একটি প্রজাতি মানুষেরই বা পূজা-ভজন থাকবে কেন? আমাদের বিশ্বাসে-সংস্কারে আরো নানা শক্তির লীলা ও ক্রিয়া রয়েছে। সেগুলোও আমাদের ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রণ করে যেমন, ভূত-প্রেত,-জিন-পরী-তুক-তাক, গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি প্রভাবিত দিন-ক্ষণ-তিথির শুভাশুভ, তাবিজ-কবচ, ঝাড়ফুঁক, ধাতু-পাথর প্রভৃতি। এগুলো নিয়ে সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক কিংবা দৈশিক-গৌত্রিক কোন দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, সংঘাত-সংঘর্ষের কারণ ঘটে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসটা এবং তাঁর সাধন ভজন-পূজন-আরাধন-উপাসনও তেমনি একান্ত ব্যক্তিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে মেনে নিলেও এ বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তিপুষ্ট ও জ্ঞানঋদ্ধ যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জগতে ও যন্ত্রের প্রসাদপুষ্ট যুগে ও জীবনে -মধ্যযুগ অবধি স্থানিক ও কালিক মানুষের ব্যক্তিক-সামাজিক জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে উদ্ভূত নীতি-নিয়ম-আদর্শ-উদ্দেশ্য রীতি-পদ্ধতি সম্বলিত শাস্ত্র উপযোগরিক্ত অনাবশ্যিক ও পরিহার্য বলেও বিবেচিত হচ্ছে। জ্ঞানবান যুক্তিবাদী সংস্কৃতিমান মানুষের পক্ষে বস্তুত অপেক্ষাকৃত অজ্ঞতার যুগে অসম্পূর্ণ জগৎ-চিন্তার ও জীবন-ভাবনার প্রসূন পুরোনো শাস্ত্র মানা সম্ভব হয়নি বলেই যুগে যুগে দেশে দেশে গোত্রে গোত্রে পুরোনো ধর্ম-শাস্ত্র বর্জিত হয়েছে, তৈরী হয়েছে স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী নতুন শাস্ত্র। তাই ঈশ্বরতত্ত্ব ও শাস্ত্র কখনো চিরন্তন ধারণায় স্থিত ছিল না। নতুন জ্ঞান, সম্বিৎ ও প্রয়োজন নতুন ঈশ্বরতত্ত্ব ও আচারিক শাস্ত্র তৈরি করেছে। ঈশ্বর তত্ত্বের ও শাস্ত্রের বিবর্তন ধারাও স্থানে কালে বিভিন্ন এবং সত্যের ও তত্ত্বের, আচার ও আচরণের বিধি-নিষেধের বৈপরীত্যে বিচিত্র। ঈশ্বর যদি অস্তিত্বে চিরন্তনও হন, শাস্ত্র কদাচ নয়—তা দেশে কালে মানুষের প্রয়োজনে উদ্ভূত, এবং কালান্তরে বিলুপ্ত, স্থানান্তরে প্রায়ই অগ্রাহ্য। তাই শাস্ত্র কখনো 'ঈশ্বর'-এর মতো স্বতঃসিদ্ধ নয়, নয় সর্বজনগ্রাহ্য। তাই আজকের মানুষ আস্তিক হলেও বহুজনহিত ও বহুজনসুখ বিরোধী বলেই শাস্ত্রিক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, আজকের বাঞ্ছিত জিগির বা স্লোগান হবে—স্রষ্টার অনুগত হোন, শাস্ত্রের নয়।

মানুষের বোধে বিরোধ ও অসঙ্গতি

আসমান-জমিন ও এদের মধ্যেকার ও ভিতরকার সবকিছু গড়ে ওঠার 'কারণ'কেই যদি অজ্ঞ মানুষ কল্পনায় ও অনুমানে স্রষ্টা বলে জানে ও মানে, তা হলে তা মর্ত্যজীবননিষ্ঠ মানবচেতনার ও চিন্তার, অনুভবের ও অনুমানের অভিন্নতার দরুন অধিজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবশে তাদের স্রষ্টাতত্ত্ব স্বীকার করে নেয়া যায়, যদিও জ্ঞান-যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে 'তথ্য' হিসেবে তা অপরিগ্রহ।

কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গতানুগতিক চিন্তা-চেতনায় প্রায় সব মানুষই অভিন্ন মতের হলেও, তাঁর রূপ-স্বরূপ, তাঁর শক্তির ও গুণের ধরন, তাঁর উদ্দেশ্য-অভিপ্রায়, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সৃষ্টের সম্পর্ক ও তাঁর প্রতি সৃষ্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জগতের ও জীবনের পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে স্থানিক-কালিক-গোত্রিক ধারণার বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য দেখে সন্দেহ থাকে না, যে এসব বিভিন্ন কালের, স্থানের ও গোত্রের মানুষের চাওয়া-পাওয়ার-সমস্যা-সংকটের পৃষ্ঠপটে ও পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনার, জ্ঞানের, বুদ্ধির, অনুভূতির ও উপলব্ধির স্তর মান ও মাত্রা অনুযায়ী অদৃশ্য রূপময় গুণময় শক্তিময় স্বৈর-স্বেচ্ছাময় ও লীলাময় স্রষ্টা কল্পিত ও পরিকল্পিত। কাজেই শাস্ত্রমাত্রেই স্থানিক-কালিক-গৌত্রিক তথা দলবদ্ধ সহযাত্রী সহযোগী সহবাসী মানুষের যৌথজীবনে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক প্রয়োজনে হয়েছে বানানো। মানুষের চলমান জীবনে বিকাশমান জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-অনুভব-উপলব্ধির ক্রম গভীরতার ও ব্যাপকতার ফলে, জীবিকা ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতার জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষার ও প্রয়াসের ক্রম বিকাশের দরুন শ্রমলাঘবকর নির্মিত হাতিয়ারের তথা যন্ত্রের ক্রমোৎকর্ষে, বৈচিত্র্যে ও সৌকর্যে মানুষের মনে-মননে মন্থর গতিতে হলেও ঘটেছে ভাবান্তর, গতিশীল সমাজে পুরোনো শাস্ত্রোক্ত ও শাস্ত্রসম্মত ভাব-চিন্তা-নীতি-আদর্শ ও নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি হয়েছে অকেজো-অপ্রয়োজনীয় বলে পরিহার্য, স্বকালের প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে প্রযোজ্য ও আচার্য শাস্ত্র। এভাবেই যুগে যুগে গোত্রে গোত্রে দেশে দেশে শাস্ত্র ও সমাজ মত-পথ বদলেছে বলেই বহু বহু শাস্ত্রের কালিক, স্থানিক ও গৌত্রিক উদ্ভব-বিলয় ঘটেছে।

যদিও স্রষ্টা সাকার কি নিরাকার, নারী কি পুরুষ, বাতাসের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অনুভবগত কিন্তু অদৃশ্য, আকাশচারী কি মর্ত্যবাসী, সচেতন বা অবচেতন কোন শক্তি, তাঁর অভিপ্রায় লক্ষ্য বা পরিণাম কি সে সম্বন্ধে মানুষ অতীতে কিংবা বর্তমানে কোথাও কখনো একমত ছিল না, নয় এবং হবেও না কখনো। কেননা নানা স্থানে ও কালে বিভিন্ন গোত্রের কোন কোন জ্ঞানী-গুণী-সাধক-সন্ত মানুষ ঈশ্বরোপলব্ধির, তাঁর নির্দেশ বা বাণী প্রাপ্তির, আর তাঁকে দর্শনের দাবি করলেও কেউ কেউ এবং স্থানিক অভিন্নতার দরুন (যেমন গ্রীসে, পশ্চিম এশিয়ায়-মিশরে-ভারতে) ধারণাগত ঈশ্বরসত্তার সাদৃশ্য থাকলেও গুণগত ধারণায় পার্থক্য ঘোচেনি। তবু স্রষ্টা বা ঈশ্বর নিয়ে মানুষের মধ্যে কল্পনা ও ধারণাগত মতভেদ থাকলেও তা কখনো কোথাও বিতর্কের বা বিবাদের কারণ হয়নি। সর্বদা ও সর্বত্র বিভেদ-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, পীড়ন-হনন-বিতাড়ন-পলায়ন প্রভৃতির কারণ হয়েছে ভিন্ন গোত্রের, স্থানের, সমাজের ও কালের শাস্ত্রে ঘৃণা-বিদ্বেষ-অবজ্ঞা নয় কেবল, স্বশাস্ত্রের টীকা-ভাষ্য-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে মতভেদ, গ্রহণ-বর্জন, মানা না-মানা, আচারিক আনুগত্য বা ঔদাসীন্য, কৌতূহলীর জিজ্ঞাসা-সন্দেহ-দ্রোহ প্রভৃতিও। আজো হয়নি তার অবসান।

এ-ও উল্লেখ্য যে মানুষের ধর্মানুগত্য ও শাস্ত্রানুশীলন মাত্রই আচারিক এবং সামষ্টিক তথা সামাজিক, ক্বচিৎ ব্যক্তিক ও আনুধ্যানিক। কাজেই শাস্ত্রোদ্দিষ্ট তত্ত্বও তাৎপর্য গতানুগতিক প্রাত্যহিক আচারে অনুশীলনে অনুষ্ঠানে এক সময়ে লোকস্মৃতিতে হারিয়ে যায়, একটা তত্ত্বশূন্য ও তাৎপর্যরিক্ত অভ্যাসে আবর্তিত হয় মাত্র। তখন মানুষ কেবল স্রষ্টা বা ঈশ্বরনিষ্ঠ থাকে না, নানা উপ ও অপশক্তি আশ্রিত হয় প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা-সঙ্কট, বিপদ-আপদ এড়ানোর-অতিক্রমণের এবং চাওয়া-পাওয়া সহজ ও নির্বিঘ্ন করার জন্যে। মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ-মন্ত্র-মাদুলী-রাশি-দিন-ক্ষণ-তিথি হাঁচি-হুচোট-টিকটিকি-সাধু-সন্ত–সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশ প্রভৃতি লৌকিক শাস্ত্র ও লোকাচারই মানুষের মন-মনন আর ঘরোয়া ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই জাতিক, গোষ্ঠিক, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ স্রষ্টা নন— শাস্ত্র, বিশেষ করে লোকাচারপ্রসূ লৌকিক শাস্ত্র। অতএব, স্রষ্টার প্রতি ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রতীক কেবল মানসিক আনুগত্যে যদি ধর্মমত সীমিত থাকত, শাস্ত্র তৈরি না হত, তা হলে দুনিয়ার মানুষের ধর্মবিশ্বাস বা শাস্ত্রানুগত্য জাত-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-অবজ্ঞা-সংঘর্ষ-সংঘাত-স্বাতন্ত্র্য চেতনার উন্মেষই ঘটত না। তখন কেবল অর্থসম্পদ বিত্ত বেসাত-খ্যাতি-ক্ষমতা প্রভৃতির জন্যে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা-অসূয়াই ঘটাত ব্যক্তিক, গোষ্ঠিক, গৌত্রিক, জাতিক বার্ণিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, তেমনি শোষক-শোষিত, পীড়ক-পীড়িতে, বঞ্চক-বঞ্চিতেও জাগাত ঘৃণা-বিদ্বেষ-ঈর্ষা-অবজ্ঞা এবং বাধাত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। কেননা জিগীষাই হচ্ছে জীবন-প্রেরণা। প্রতিষ্ঠাকামীর ও আত্মপ্রসারে উদ্যোগীর প্রতিযোগিতার স্পৃহায়, ঈর্ষ্যুর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রবণতাতেই প্রাণধর্মের প্রকাশ।

কাজেই জ্ঞান-বুদ্ধি-বোধিও মানুষকে নির্বিবাদ সহাবস্থানে প্রবর্তনা দেবে না। প্রাণধর্মের বিরোধী বলেই তা জীব-জীবনে সম্ভব হবে না কখনো। তবে বুদ্ধির-বোধির উৎকর্ষে প্রেয় ও শ্রেয়বাদীর সংখ্যাধিক্যে বিরোধ-বিবাদ কমবে অবশ্যই এবং হিংসা-প্রতিহিংসার প্রয়োগ-পদ্ধতি আর প্রকাশপন্থাও বদলাবে।

২

এবার হেতুতত্ত্বে তথা ক্রিয়ার, কার্যের, করণের ও ফলের হেতু বা কারণ সন্ধানে ফিরে আসি। প্রাকৃত জগতে কিংবা জীব জীবনে অথবা মানুষের চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে যা কিছু নিত্য ঘটে তার কারণ বা হেতু মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-বোধির অগোচর বলে মানুষের অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় বলে, তাকে মানুষেরা লীলাময় স্রষ্টার অবোধ্য লীলা বলে মেনে মনে প্রবোধ পায় এবং পার্থিব জীবনে অভিপ্রেত-অনভিপ্রেত যা কিছু ব্যক্তিজীবনে ঘটে, তাকেই অমোঘ নিয়তি বলে জানে ও মানে। ব্যক্তি মানুষের জিজ্ঞাসা, সন্দেহও, কৌতূহল, অধ্যবসায়, একাগ্র আগ্রহে ও সাধনায় মানুষ অনেক প্রাকৃত ক্রিয়ার কারণ আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে। প্রকৃতিজগতেও যে নিত্য দ্বন্দ্ব-মিলন-মিশ্রণ-সংঘর্ষ-সংঘাত চলছে তা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে উদ্ভব-বিনাশ আবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন অবস্থায় ও অবস্থানে বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের যোগে-বিয়োগে বস্তুর ও জীব-উদ্ভিদের রূপ-গুণ-শক্তি ও অবয়ব বদলায়-বাড়ে-কমে, — এসব অনেক তত্ত্ব ও তথ্য এখন মানুষের আয়ত্তে। আগেকার দিনে বুদ্ধিমানেরা নানা স্বার্থে ও উদ্দেশ্যে নানা কাল্পনিক তথ্য বলে বেড়াত–অন্যেরা অজ্ঞতার দরুন সভয়-বিস্ময়ে তা আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করত। যেমন গ্রীকদের দেবলীলা, ওরাক্যাল, কৈলাসে কায়াধারী শিবের সপত্নী-সসন্তান স্থিতি, অগস্ত্য মুনির নির্দেশে বিন্ধ্য পর্বতের শির অবনমন, মুসার লাঠির ছোঁয়ায় লোহিত সাগরের পানি অপসারণ, অগস্ত্যের গণ্ডূষে সাগরজল শোষণ, যিশুর মৃতে প্রাণ সঞ্চার— এখন এসব শ্রোত্ররসায়ন রূপকথা মাত্র। এখনকার রোগের নিদান-প্রতিষেধক-জানা মানুষের কাছে যমপ্রতীক রোষেরুদ্র ওলা ও শীতলাদেবী অনস্তিত্বে বিলীন। এখনকার মানুষের প্রাত্যহিক কর্মজীবনে রাশি গ্রহ নক্ষত্র দিন ক্ষণ তিথি মানা অসম্ভব বলেই এবং ক্ষতিও প্রত্যক্ষ নয় বলে এসবের প্রতি ভয়-ভক্তি-ভরসাও গুরুত্ব হারাচ্ছে–লোপ পাচ্ছে। নিছক ও নিখুঁত সত্য কথা এই যে কোন শাস্ত্রিক দলই তথা ধর্মসম্প্রদায়ই নিজের শাস্ত্রের সব অপ্রাকৃত ভৌতিক অলৌকিক, অযৌক্তিক-অবাস্তব-অসম্ভব বিশ্বাসের-সংস্কারের ঘটনায় রটনায় কিস্‌সায় কাহিনীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নাতীত ও গভীরভাবে আস্থাবান হলেও, অপর শাস্ত্রগুলোর সদৃশ বিশ্বাস-সংস্কার-ঘটনা-কিস্‌সা-কাহিনী শোনা বা জানামাত্রই অলৌকিক অবাস্তব অসম্ভব বলে বিশ্বাসে উপহাসে অবজ্ঞায় হেসে ওড়ায়। এতে কোন বিদ্যা-বুদ্ধি-বোধির পরিচয় মেলে না। স্বশাস্ত্র আশৈশব ভয়ে বিশ্বাসে লালিত বলেই তাতে প্রশ্নাতীত ও যুক্তিহীন আস্থা জন্মে, আর অজানা অপ্রয়োজনীয় পরশাস্ত্রে ভয় ভক্তি বিশ্বাস জন্মেনি বলে তার অসারতা ও অযৌক্তিকতা শোনামাত্রই উপলব্ধ হয়। মানুষের বিদ্যার-বুদ্ধির-বোধির-মনের-মননের ও বন্ধনের ও মুক্তির জীবনব্যাপী খেলা নাস্তিকের ও দার্শনিকের সকৌতুক ও উপভোগ্য মাত্র। কেননা চিন্তার ও বুদ্ধির এ অসঙ্গতি তারা কখনো উপলব্ধি করে না। বাস্তবে এ আধিমুক্তির উপায় নেই। তাই জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে ও শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান জাত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য চেতনা যে সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি করে, তার সমাধান-বিমোচন সহজ হয় না। আজো তা প্রায়ই রক্তক্ষরা ও সম্পদক্ষয়ী। ডারুইনের (১৮০৯–৮২) বিবর্তনবাদে, হেগেলের (১৭৭০–১৮৩১) দ্বন্দ্ববাদে, মার্কসের (১৮১৮–৮৩) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে, ফ্রয়েডের (১৮৫৬–১৯৪৩) মনোবিজ্ঞানে অধিকাংশ মানুষ যদি বৈজ্ঞানিক তথ্য বলে মেনে আস্থা রাখত, তা হলেও আমরা জ্ঞান-যুক্তি-প্রত্যক্ষবাদী হয়ে ভূত-প্রেত-দেও-দানু-জিন-পরীর প্রভাবমুক্ত হতে পারতাম। এবং এভাবে আধুনিক রাষ্ট্রে ভাববাদীসৃষ্ট শাস্ত্রিক, সামাজিক, ঐতিহ্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত মারাত্মক-রাষ্ট্রিক সমস্যা-সংকট-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়ানো যেত।

AMARBOI.COM

আগেকার দিনের অজ্ঞ মানুষ প্রাকৃতিক খরা ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি বন্যা ভূকম্প প্রভৃতিকে দৈব রোষমূলক ঘটনা বা ঐশ ক্রোধজাত গজব বলে জানত ও মানত। আজো অজ্ঞরা তা-ই জানে এবং তৃতীয় বিশ্বের মতলববাজ শাস্ত্রব্যবসায়ীরা ও লোকপ্রবঞ্চক রাজনীতিকরা আসমানী গজব বলেই প্রচার করে বিশ্বাস-সংস্কারের সত্যতা ও গুরুত্ব বাড়ায় আর নিজেদের দায়িত্ব এড়ায়। অথচ সংবৎসরের ঋতুগত খরা ঝড় ঘূর্ণিঝড় বন্যা ভূকম্প প্রভৃতি সাময়িক প্রাকৃতিক সংঘটনের সকারণ প্রায় নির্ভুল আঞ্চলিক পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব এবং সহজ।

মেঘ ওঠার কারণ নয় শুধু, কবে কখন কোন্ পথে মেঘের গতি এবং অঞ্চল বিশেষে বৃষ্টির মৌসুমী পরিমাণও বলে দেয়া যায়, যেমন ঝড়ের ঘূর্ণিঝড়ের দিন-ক্ষণের, গতিবেগের খবর অনেক আগেই জানিয়ে দেয়া যায়। অতএব, এসব হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থানগত আঞ্চলিক ও আর্তব প্রাকৃতিক ক্রিয়া, এতে দৈব ঐশ হুকুম প্রত্যক্ষ নয়। এগুলো গোটা পৃথিবীতে একই সময়ে ঘটে না কখনো। এ কালে এসব নিয়ে ভৌতিক ও অলৌকিক লীলা কল্পনা ও প্রচার দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত শহরে শিক্ষিত মতলববাজ শাস্ত্রিকের ও রাজনীতিকের দুষ্কর্মমাত্র।

অ্যাটমের ধারণা করা গ্রীসে ও ভারতে সুপ্রাচীন কালেই সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তা কোন গবেষণায় বা প্রয়োগে প্রবর্তনা দেয়নি তখন। এখন ইলেকট্রনের, প্রোটনের ও নুট্রেনের জ্ঞান মানুষকে আসমান-জমিনের ও তার মধ্যেকার সব কিছুর রহস্য উদঘাটনের প্রেরণা, প্রবর্তনা ও কুঞ্জি দিচ্ছে। উক্ত তিনটের কণা উপকণা আরো কত রকমের কত শক্তির আধার তা এখনো জানা যায়নি বটে, কিন্তু শিগগির সেসব তত্ত্ব-তথ্যও অবশ্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-বোধি-গবেষণা-ধৈর্য-অধ্যবসায় ও শ্রম-সাধনা প্রয়োগে জানা সম্ভব হবে।

ভূতে ভগবানে আরণ্য ও আসমানী বিশ্বাস-সংস্কার আদি কাল থেকে যে ভাববাদের তথা কাল্পনিক তত্ত্বদর্শনের উদ্ভব ও সর্বাত্মক প্রভাব ঘটিয়েছে, তার খপ্পর থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবে না, যদি না তাদের মধ্যে জ্ঞান-যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানবুদ্ধি জাগে। সাহিত্য দর্শন ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান অনধীত বলেই আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা, বিজ্ঞানবিদরা ও গবেষকরা সাধারণভাবে যতটা বিদ্বান হন, সে-অনুপাতে মনে মননে যুক্তিবাদী মনস্বী-মনীষী হন না জগৎ, জীবন ও সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে। তাই বাঞ্ছিত মানে, মাপে ও মাত্রায় আমাদের শিক্ষিত শহুরে জনগণেরও হাওয়াই ও কল্পিত বিশ্বাস-সংস্কার ঘোচেনি, গুরুত্ব কমেনি ভাববাদের।

ঐতিহ্য বনাম প্রগতিশীলতা

AMARBOI.COM

সময়নিয়মিত ও সময়নিয়ন্ত্রিত চলমান জীবনে প্রতিটি বর্তমান ক্ষণ মুহূর্তেই অতীত হয়ে যাচ্ছে, এবং দেহ-মনের উপর তার আপাত-অদৃশ্য ছাপ রেখে যাচ্ছে। এ তাৎপর্যে জীবনে অতীত আছে, ভবিষ্যৎও থাকে কিন্তু বর্তমান কেবল অপসৃয়মান মুহূর্তমাত্র। কাজেই জীবন মানে অতীত ক্ষণসমূহের সমষ্টি। এবং জীবনে ভবিষ্যৎ মাত্রই অনিশ্চিত এবং নতুন। কোন ভবিষ্যৎই অতীতের অবিকল অনুকৃতি ও অনুসৃতি নয়। মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ তথা জীবনাচার বা জীবনযাত্রা আপাতদৃষ্টিতে আবর্তিত বলে মনে হলেও বাস্তবে তা অলক্ষ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ও মন্থর গতিতে বিবর্তিত হচ্ছে। স্থূল দৃষ্টান্তেও এ তত্ত্ব ও তথ্য প্রমাণ করা যায়। যেমন আমাদের প্রজন্মক্রমে উচ্চারিত ভাষা তথা কথার ধরন, আমাদের খাদ্য ধান-চাল ও তার রূপ-গুণ-নাম বদলেছে, আমাদের মাছ-মাংস-তরকারী রান্নার রীতি-পদ্ধতিও কালে কালে স্থানে স্থানে যায় পালটে, আমাদের পোশাকেও রঙ-রূপ-আকৃতি-বৈচিত্র্য পেয়েছে ও পাচ্ছে। আমাদের ঘর-বাড়ির আকার-প্রকারও পরিবর্তন পায়, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আবহাওয়ার ও প্রাত্যহিক জীবনে প্রাপ্তব্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অনুগত জীবনের ও জীবনযাত্রার নীতি-নিয়ম, রীতি-পদ্ধতি বদলাতেই হয়। এমনিভাবে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বুদ্ধি-কৌশল, কাঙ্ক্ষা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধির ফলে স্থানিক, কালিক, গৌত্রিক ও সামাজিকভাবে মানুষের মন-মত, রুচি-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ-উদ্দেশ্য, বিশ্বাস-সংস্কার, জীবনাচার বদলে যায়, বিকাশ ও উৎকর্ষ পায়।

বাঞ্ছিত অভিধায় ঐতিহ্য মানে পূর্বপ্রজন্মের স্বদেশী-স্বধর্মী-স্বজাতির কেবল সৎ ও সুকৃতি এবং স্মরণীয় গৌরবময় কৃতি-কুকৃতি নয়। সুপ্রাচীন কালের ঐতিহ্যের স্মারক-ধারক ও গৌরবগর্বী একজন হিন্দু-বৌদ্ধ-ইহুদী ধর্মান্তরিত হলেই তার পূর্ব ঐতিহ্য তার কাছে মিথ্যে হয়ে যায়, তার নতুন ঐতিহ্য হয়ে ওঠে তার বৃত শাস্ত্রজাত ও সমাজধৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্য। কাজেই ঐতিহ্যেরই বা এমন মূল্য বা গুরুত্ব কি? ঐতিহ্যও তো বেচা-কেনার পণ্যের, গ্রহণ-বর্জনের সম্পদমাত্র। ঐতিহ্যের উপরই ব্যক্তির, সমাজের, জাতির ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং ঐতিহ্যই প্রেরণার পুঁজি, চেতনার আকার ও আদর্শের উৎস এবং চলার পথে পাথেয় বলে যে জ্ঞানী-গুণী-নেতারা ভারিক্কী চালে কাগুজে লেখায়, মেঠো বক্তৃতায় এবং বিদ্বানরা বিদ্যালয়ে প্রচার করে থাকেন, তার মধ্যে আর যা-ই থাক, জীবনের সত্য ও তথ্য নেই। এ তত্ত্বে সত্য ও সার কিছু থাকলে গ্রীস-মিশর-ব্যাবিলনের সভ্যতা-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধির বিলুপ্তি ঘটত না, আফ্রিকাবাসীরও থাকত না কোন উজ্জ্বল বিকাশমান ভবিষ্যৎ।

অতএব, মনুষ্যজীবনে স্থিতি নেই, আছে কেবল দৃশ্য-অদৃশ্য গতি। এ গতির আনুগত্যে ও অনুসরণেই, এ গতির সচেতন-সাগ্রহ অনুশীলনেই সুষ্ঠভাবে স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে সচেতন অনুভব-উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনে ভোগে-উপভোগে তৃপ্ত ও তুষ্ট হওয়া সম্ভব।

বহমান সময়তাড়িত জীবনও চলমান গতিশীল। এ তত্ত্ব মেনে নিলে জীবনের, সমাজের, জাতির ভিত অতীতে ও ঐতিহ্যে— এ ধারণা মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে যাবে। অক্ষমের আস্ফালনেই কেবল রয়েছে অতীতের ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব। প্রাণী মাত্রেরই গতি সম্মুখ দিকে। ফেলে আসা দিন-ক্ষণ ভুক্তাবশেষ ও বর্জিত সম্পদ চলমান ও গতিশীল জীবের, ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের নতুন চাহিদা মেটাতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে অতীতে বিলীন হচ্ছে। পিছুডাক ও পিছুটান সম্মুখ গতি প্রতিহত করে মাত্র। অতীত ও ঐতিহ্য মানুষকে কেবল ধরে রাখে, কেবল ভরে রাখে, সন্ধিৎসু-জিজ্ঞাসু করে না বলেই অতীতাশ্রয়ীরা ও ঐতিহ্যগর্বীরা প্রগতিভীরু, তারা আবর্তিত জীবনাচারে আস্থাবান। এবং গতিকে নয়, স্থিতিকেই জীবনে শ্রেয়স্কর ধ্রুব বলে জানে ও মানে। তাই সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশে, আবিষ্কারে- উদ্ভাবনে, নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষে স্থিতিপ্রবণ রক্ষণশীলদের কোথাও কোন দান নেই। অতীত হচ্ছে মৃত্যু ও বিনাশ প্রতীক, ভবিষ্যৎ জীবনের আহ্বান, কাঙ্ক্ষাপূর্তির আশ্বাস, কৌতূহলের, আবেগ-আকুলতা, জিজ্ঞাসার আগ্রহ এবং সংকল্পের, উদ্যমের, উদ্যোগের ও আয়োজনের প্রেরণা। স্থান-কাল সচেতনতাই, জীবনের চলমানতাই, পুরোনোর বর্জনশীলতাই, নতুনের গ্রহণ প্রবণতাই প্রকৃত জীবনচর্যা ও জীবনচর্চা। নইলে প্রাকৃতিক নিয়মে চলামানতা ও গতিশীলতা অন্ধের পথপরিক্রমা মাত্র। পুরোনো প্রাত্যহিকতায় আবর্তিত জীবনাচার ঘানির নিরীহ প্রাণীর নিরুদ্দিষ্ট গতিশীলতা মাত্র। প্রকৃতির জগতে আমরা তরুলতায় পুরোনো পাতা ঝরার ও নতুন পাতা গজানোর নিত্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম দেখি। মানুষও তার মনোজগতে ও ব্যবহারিক জীবনে পুরোনোকে পরিহার না করলে নতুনকে ঠাঁই দেবে কোথায়, নতুনকে বরণে বরণে বড় হবে–বিকশিত ও ঋদ্ধ হবে কি করে! স্বার্থেই জীবন ও সমাজ তো সর্বাত্মক ও সার্বক্ষণিক একাধারে ও যুগপৎ হরণ-পূরণের আধার।

পুরোনো শাস্ত্রিক-মানসিক-সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কার মুক্ত হয়ে স্ব স্ব অর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগে জীবনের প্রয়োজন নিরূপণ, উদ্দেশ্য নির্ণয় ও আদর্শ নির্দিষ্ট করা সম্ভব হলে, সে-স্বনির্ভর মানুষ নিজের পছন্দমতো পথ ও পথের দিশা খুঁজে-পেলে জীবনের সমস্যা-সঙ্কটও নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি অনুসারে সমাধানের ও উত্তরণের উপায় খুঁজে পায়। ব্যর্থ হলেও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি চালিত মানুষ প্রবোধ পায়। কিন্তু আশৈশব লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার চালিত মানুষ স্বনির্ভর হয়ে স্বনির্বাচিত পথে চলতে জানে না বলে অন্ধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো কেবল নিরূপ-নিরানন্দ যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মানুষ যদি ব্যক্তিগত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সামান্য-সীমিত হলেও স্ব স্ব জ্ঞান ও যুক্তি চালিত হয় এবং জীবনযাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আশ্রয়ী হয়, তাহলে সামাজিক জীবনে মিলবে স্বস্তি-শান্তি-নিরাপত্তা, রাষ্ট্রিক-প্রাশাসনিক জীবনে আইন-শৃঙ্খলার তথা বিধি-নিষেধের আনুগত্যজাত আর্থিক না হোক, প্রাশাসনিক ন্যায় পাবে বাস্তবে স্বীকৃতি। সমাজে ও সরকারে ন্যূনতম ন্যায় সম্বন্ধে মানুষ থাকবে নিশ্চিত। মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত দৃষ্টিই, জ্ঞান ও যুক্তিচালিত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণই আজকের বিশ্বে ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের নানা জটিল সমস্যা-সংকট অন্তত মাপে-মানে-মাত্রায় হ্রাস করতে পারে। মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রয়োগজাত সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমস্যা-সংকট কেবল জ্ঞান-যুক্তির পন্থায় এড়ানো সম্ভব। ঐতিহ্যচেতনা মানুষে মানুষে কেবল স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগায়, কেবল বিচ্ছেদ ঘটায়, বিচ্ছিন্নতা বাড়ায়, আর জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি মিলনের, সংযুক্ত থাকার, সংহতির, সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের সুফলসচেতন করে। আরণ্য মানবদের প্রমাণে এ-ও বোঝা যায় যে স্বাতন্ত্র্য চেতনাও বিজাতিবিদ্বেষ জাগায়, অপরের সহযোগিতায় আত্মবিকাশের ও আত্মোন্নয়নের স্পৃহা বিনষ্ট করে। অতএব স্বাতন্ত্র্যচেতনার তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা অবিকশিত মন-বুদ্ধির, চিন্তা-চেতনারই পরিচায়ক মাত্র। মানুষের মন-মননের, যুক্তি-বুদ্ধির, জ্ঞান-প্রজ্ঞার, বোধ-বৌধির, সংস্কৃতি-সভ্যতার দ্রুত উন্মেষ-বিকাশ সম্ভব হয়েছে আলাপে-পরিচয়ে, দ্বন্দ্বে-মিলনে, সহিষ্ণু-সহাবস্থানে, উদার সহযোগিতায়, একের অভিব্যক্ত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের বিনিময়ে, অনুকরণে, অনুসরণে— এক কথায় দেয়া-নেয়ার ফলে। কোন স্থানের, কালের ও গোত্রের মানুষের একক প্রয়াসে-প্রচেষ্টায় মানুষের মগজপ্রসূত বিচিত্র চিন্তা-চেতনারূপী মানসসম্পদ কিংবা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত নির্মিত আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত সামগ্রীর উদ্ভাবন-আবিষ্কার সম্ভব হত না কখনো।

মনুষ্যউচ্চারিত বিচিত্র ও বিবিধ তথ্যে ও তত্ত্বে এবং মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদে রয়েছে বিশ্বের নির্বিশেষ মানুষের মানবিক অধিকার। তাই মানুষের উদ্ভাবিত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে এবং আবিষ্কৃত-নির্মিত সম্পদে মানুষ মাত্রেরই রয়েছে অনুকরণের, অনুসরণের, গ্রহণের ও বর্জনের মানব-উত্তরাধিকার হিসেবে জন্মগত অধিকার— এ তথ্য ও সত্য অঙ্গীকার করে পৃথিবীর যেকোন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে প্রেয়স্ ও শ্রেয়সকে বরণ করার আগ্রহে সংকল্পে উদ্যমে ও উদ্যোগেই নিহিত থাকে স্বস্থ ও সুস্থ দেহ-মন-সমাজ-রাষ্ট্রের লাক্ষণিক পরিচয়। অতএব, গ্রহণশীলতার অপর নামই প্রগতিশীলতা।

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলে, আমরা তখন–

আত্মপ্রীতিই জীবনপ্রেরণা। প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু প্রীতি না থাকলে জীবন চলে না। বেঁচে থাকাই জীবন, বেঁচে থাকে যারা তারাই জীব। প্রাণের প্রতি, দেহের প্রতি প্রীতিই জীবনপ্রেরণা। প্রাণের স্থিতি দেহে, যে-দেহ টিকে থাকে আহারে, দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাতে হয় প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনেই। সুস্থ ও স্বস্থ প্রাণই সচল শারীর প্রাণীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জীব' নামে চিহ্নিত করে। জীবের সার্বক্ষণিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণই, তথা সর্বপ্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত চেতনাই— চেতনার সমষ্টিই জীবন।

প্রাণীর জীবিত থাকার মৌল প্রয়াসের নাম আত্মরক্ষণ প্রয়াস। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপদ হলেই আত্মরক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে জীব আত্মপুষ্টির, আত্মতুষ্টির ও আত্মতৃপ্তির জন্যে শক্তি-সামর্থ্যানুসারে আত্মপ্রসারে হয় আগ্রহী ও প্রয়াসী। আত্মপ্রসারের এ উদ্যোগ সাধারণভাবে দুর্বলের উপর হামলার আকারে হয় প্রকটিত। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ হামলা সার্বক্ষণিক। অন্য পশুপাখিদের মধ্যেও দ্বান্দ্বিক অবস্থানে মারামারি কাড়াকাড়ি ও হানাহানি কম নয়-সাপে-নেউলে, কাকে-শকুনে, শিয়ালে-কুকুরে, সিংহে-হাতিতে, বাঘে-মোষে আপাত অকারণ দ্বন্দ্ব চিরকালীন। এমন কি বহু বহু তরুলতাও স্বাধিকারপ্রমত্ত। তার কাছে পিঠে আর কাউকে পশতে ঘেঁষতে বা উপ্ত-অঙ্কুরিত হতে দেয় না। প্রাণী-খেকো তথা পোকা-মাকড় ও নানা গেছো কীট-পতঙ্গ এমনকি কোন কোন তরু-লতা তো সচল সচেতন প্রাণীর মতোই শিকার ধরায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। এদের হচ্ছে প্রকৃতির কোলে প্রাকৃত জীবন, এরা হচ্ছে সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিলালিত স্বভাবচালিত স্বাভাবিক আচরণদুষ্ট। প্রাণীরা কোন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-পরিচর্যা-পরিশীলন পেলে স্বভাব বদলায়-নতুন অভ্যাসের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি ও সংযম পায়। তার প্রমাণ মানুষলালিত প্রশিক্ষাণপ্রাপ্ত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণীরা বা জীবেরা। উদ্ভিদেরাও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলনে-মিশ্রণে, জল-মাটি-হাওয়ার প্রভাবে রূপ-গুণ বদলায়।

সব প্রাণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়, তাই তাদের বুনো ও প্রাবৃত্তিক স্বভাবও অভ্যাস থেকেই যায়। কিন্তু আঙ্গিক উৎকর্ষে ও সৌকর্যে মানুষ প্রাণিজগতে অনন্য বলে, মানুষ খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নয় শুধু, জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রেই পরনির্ভর নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপনে কিংবা সহযোগিতায় অসাধ্য সাধনে সমর্থ। তাই মানুষপ্রজাতি প্রাকৃত জীবনের অনুগত নয়, প্রকৃতি-বশ্যতা পরিহার করে প্রকৃতিকে বরং দাস ও বশ করে সে স্বনির্মিত হাতিয়ার যোগে স্বোদ্ভাবিত নিয়ম-পদ্ধতি প্রয়োগে স্বরচিত পরিবেশে প্রায় স্বাধীন জীবন ভোগ-উপভোগ করে। ভাষা সৃষ্টি, আগুন আবিষ্কার, নিবাস নির্মাণ, রোগের প্রতিষেধক সন্ধান, হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধন, জীবন-জীবিকায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও নির্মাণ, ধাতুর আবিষ্কার, নীতি-নিয়মের ও রীতি-পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রভৃতি যৌথ জীবনে ক্রমে ক্রমে সম্ভব হয়েছে, আজো হচ্ছে। প্রতিকূল পরিবেশে উদ্যমশীল উদ্যোগী কাঙ্ক্ষীসমাজে এ আবিষ্কার উদ্ভাবন হয়েছে দ্রুত, অন্য অনুকূল আরণ্য পরিবেশে নিরুদ্যম মানুষ আজো অন্য প্রাণিপ্রজাতির কাছাকাছিই রয়ে গেছে, গারিলা-শিমপাঞ্জি-হনুমানে আর পৃথিবীর নানা অঞ্চলের বুনোবর্বর মানুষে বিগত শতকেও পার্থক্য ছিল সামান্যই। ব্যবহারিক জীবনে তাদের আবিষ্কারে উদ্ভাবনে এ অসামর্থ্য তাদের মানসিক-দৈন্যের ও অনুশীলনরিক্ততার সাক্ষ্য বটে, কিন্তু তাদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা, তাদের রেখেছে অলৌকিক-আসমানী শক্তির একান্ত অনুগত ও নির্ভর। সেখানে জীবনানুভূতির ও জীবনযাত্রার প্রতিক্ষেত্রেই এক একটি অদৃশ্য শক্তি, উপশক্তি, অপশক্তি-যা ভূত, প্রেত, পিশাচ, জিন, পরী, দেবতা, উপদেবতা, অপদেবতা, রাক্ষস, দৈত্য-দানব-ড্রাগন প্রভৃতি নানা ট্যাবু-টোটেম রূপেও স্থানিক ও কালিক বিচিত্র নামে পরিচিত ও স্থিত। তার উপরও রয়েছে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি ও গতিজাত তিথি-দিন-ক্ষণ-লগ্ন প্রভৃতি মনুষ্য দেহ-মন-কর্ম-আচরণ ও কর্মফল, বাঞ্ছা ও সিদ্ধি নিয়ন্ত্রক নানা অদৃশ্য শক্তি। আসলে আসমানে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমিনে প্রাকৃতিক নিয়মে যা ঘটে অর্থাৎ ঘটনার, করণের বা কার্যের আদি অদৃশ্য ও অজ্ঞাত কারণকেই অজ্ঞতার দরুণ তারা স্রষ্টা বলে জেনেছে ও মেনেছে। কারণ অবশ্য অনেকতায় বহু ও বিচিত্র। তাই স্রষ্টা মেনেও তারা নানা শক্তি ও উপশক্তি মানে, সেগুলোই ভূত-প্রেত-পিশাচ-জিন-পরী-দেও-দানব-দেবতারূপে তোয়াজ স্তুতির পাত্র-পাত্রী হয়েছে। দুনিয়ার সব শাস্ত্রেই আদি কারণ স্রষ্টা জ্যোতির্ময় আলোস্বরূপ-অগ্নিময়ও যেমন তুর পর্বতে মুসা যেহোভাকে অগ্নিরূপে এবং তার আগে মিশরে প্রত্যাবর্তন পথে অগ্নিপ্রতীক ধূম্ররূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

অতএব জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধির উন্মেষে ও বিকাশে পরবর্তী কোন এক কালে স্থানিকভাবে কোন এক সার্বভৌম সর্বশক্তিমান সাকার বা নিরাকার নারী বা পুরুষস্রষ্টার ধারণা সম্ভব হলেও এমনকি যেহোভা-ব্রহ্ম-গড-খোদা-আল্লাহ নামে বন্দিত হলেও, সামাগ্রিকভাবে মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি ও অবলম্বন ছিল ভয়-ভক্তি-ভরসার নানা আরণ্য-আসমানী-দৈব দানবীয় অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তি ও নিয়তি।

জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞান-দর্শন ও অভিজ্ঞতা এবং বিচিত্র আবিষ্কার-উদ্ভাবন-প্রকৌশল-প্রযুক্তি ঋদ্ধ আকাশচারী গ্রহবিজয়ী আজকের এ মুহূর্তের সভ্য-ভব্য-শিক্ষিত-সংস্কৃতিমান বিশ্বমানবসমাজও জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি অসমর্থিত পূর্বেকার অজ্ঞতা-অসহায়তা পুষ্ট ও দুষ্ট কল্পিত বিশ্বাস ও আচার-সংস্কার নিষ্ঠ। শাস্ত্রের ও অপার্থিব অলৌকিক অজ্ঞেয় রহস্যাবৃত আধ্যাত্মিক ও সচেতন সুরসিক সার্বভৌম নিয়ন্ত্রী শক্তির প্রতি অবিচল আস্থা ও ভয়-ভক্তি-ভরসা বশে অনুগত ও অনুরক্ত। আশৈশব লব্ধ ঘরোয়া ও সামাজিক সংস্কারবশে ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনে পার্থিব ও পারলৌকিক ক্ষতির আশঙ্কায় এ বিষয়ে যুক্তির ঝুঁকি নিতে নারাজ। এ মানুষ ধার্মিক নয়-ধর্মভীরু, শাস্ত্রনিষ্ট নয়-শাস্ত্রভীত। যুক্তির তো নয়ই, বিশ্বাসেরও নয়-এ কেবল অনিশ্চিয়তার, সংশয়ের, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার, ধীরবুদ্ধি ও স্থির বিশ্বাসরিক্ত ও নিরাপত্তাপ্রবণ মনের স্বস্তিকামিতা প্রসূত আস্থা বা সমর্থন মাত্র। এ ভূতে-ভগবানে অভ্যস্ত আস্থাই আজো স্রষ্টা ও শাস্ত্রমানা জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তিকেও তথা সমাজকে নির্বিশেষে মানুষ হতে এবং ব্যক্তি অবিশেষে মানুষকে মানুষ রূপে দেখতে দেয়নি-দিচ্ছে না।

কল্পনা তথা অলৌকিক বিশ্বাসসংস্কার পুষ্ট ও দুষ্ট মানুষমাত্রেরই মানসজীবন নিতান্ত সকীর্ণ সড়কেই বহমান। বিশ্বাসের, সংস্কারের, আচারের ও স্বাতন্ত্র্যের নিগড়ে নিবদ্ধ ব্যক্তি ও সামাজ চিন্তায় চেতনায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সাধারণভাবে আবর্তিত জীবনধারায় অভ্যস্ত। কেবল আবেগের ক্ষেত্রেই মানুষ স্বাধীনভাবে আচরণ করে। নমুনা স্বরূপ আমার একটি বেদনা-করুণ অনুভবের কথা নিবেদন করছি সবিনয়।

আমার গাঁয়ের অনেক ব্যক্তিতো বটেই, বহু পরিবারও পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে, এ শতকের ষষ্টদশকে। ওদের শূন্য বাড়ি-ঘর-ভিটে দেখলে আমার মনে হাহাকার জাগত, অন্তরের গভীরে পেত এক অব্যক্ত কান্না, অথচ ওরা কেউ আমার ঘনিষ্ঠজন ছিল না। পরিচয়ও ছিল না সবার সঙ্গে। এখন পাড়াভরে যারা রয়েছে, সেসব অসংখ্য লোকের প্রতি আমার কোন দরদও নেই, বিদ্বেষও নেই। তাদের অস্তিত্বেও আমি উদাসীন। আর একটি করুণ আবেগের কথা এই, আমার বাল্যে আমাদের পরিবারে ছিলেন দাদা-দাদী, চার চাচা-চাচী, মা-বাবা এবং এ ভরা বাড়িতে আমরা ছিলাম আপন ও চাচাতো মিলে আঠারো ভাই বোন। এঁরাই ছিলেন আমার আত্মীয়-আত্মীয়া। এখন বিচ্ছিন্ন পরিবারে প্রায় সত্তর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশিজন রয়েছে আমার দাদিদাদীর প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী, কিন্তু আমার সন্তানেরা ছাড়া কেউ যেন আমার আপন নয়। পরিবারে এখন আমার কোন আত্মীয় নেই। কেননা আমার আত্মীয়দের ক্রমিক ও প্রাজন্মিক বিনাশে আমি নিঃসঙ্গ অসহায়, আমার জগৎ শূন্য-নিরানন্দ, ঘুম-ভাঙা গভীর রাতে আমার মন-প্রাণ আত্মীয় বিচ্ছেদের, বিরহের বেদনায় ছটফট করে, অথচ এঁদের আমার জীবনে আগে কখনো অপরিহার্য বা আবশ্যিক মনে হয়নি। ভালো হোক, মন্দ হোক অনুভূতির আবেগই মানুষের জীবনে খাঁটি। আবেগতাড়িত মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারো প্রতি ভালো, কারো প্রতি মন্দ, কারো জন্যে ভালো, কারো জন্যে মন্দ। আর সব ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কারের ও মতলবেরই রকমফের অভিব্যক্তিমাত্র। এজন্যেই মানুষ সাধারণভাবে শাস্ত্রিক, দৈশিক, ভাষিক ও গৌত্রিক পরিচয়ে চলে ও চালিত হয়। কিন্তু এ সবের কোনটাই ভব্য সমাজে মানুষকে যৌথ জীবনে বাঞ্ছিত স্ব স্ব স্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় স্বস্তিতে শান্তিতে সহাবস্থানের তেমন কোন প্রবর্তনা দেয়নি।

আদিকালের আদিম বুনো-বর্বর সমাজে মানুষকে যৌথভাবে প্রকৃতি ও প্রাণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচতে হত বলে তাদের মধ্যে ছিল গৌত্রীয় সংহতি, আর আধি-ব্যাধির প্রতিকারপন্থা বা প্রতিষেধক জানা ছিল না বলে অজ্ঞ অসহায় মানুষ ছিল দৈব ভয়-ভক্তি-ভরসা নির্ভর। দৈব ক্ষোভ-ক্রোধ-রোষ, কিংবা কৃপা-করুণা প্রাত্যহিক জীবনের সাফল্য-বিফলতায়, আধি-ব্যাধিতে, জন্ম-মৃত্যুতে তারা যেন প্রায় প্রত্যক্ষ করত, অনুভবও করত সেসব অদৃশ্য জীবননিয়ন্তাশক্তির প্রভাব। তাই জ্ঞান-বিশ্বাস-অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ই ছিল তাদের ন্যায়-অন্যায়-পাপ-পুণ্যবোধের উৎস ও দিশারী। অন্ধভাবে তাই তারা কিছু নীতি-নিয়ম রীতি-রেওয়াজ মেনে চলত ট্যাবু-টোটেম ও যাদুবিশ্বাস বশে। আর স্বল্পসংখ্যার গোত্রীয় সমাজে সর্দারতন্ত্রই ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত নিবারণ সংস্থা।

অজ্ঞ-অনক্ষর-অনভিজ্ঞ-অশিক্ষিত মানুষের সংস্কারমুক্তির উপায় নেই বললেই চলে। তবু এ যন্ত্রযুগে সিনেমা-রেডিয়ো-টেলিভিশন-নাটক-যাত্রা ও বক্তৃতা এবং ভূত-ভগবান নিরপেক্ষ কলকারখানার বাস্তব জ্ঞান মাধ্যমে মানুষ স্বশিক্ষিত হওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে। তা ছাড়া জিজ্ঞাসা-সন্দেহ-কৌতূহলশূন্য মনে-মননে লেখাপড়া কল্পনা-বিশ্বাস-সংস্কার থেকে মুক্তি ঘটায় না। স্থান-কালের, জীবন-জীবিকাপদ্ধতির প্রভাব বিশ্বাস-সংস্কারে নিষ্ঠা কিছুটা শিথিল করে মাত্র। এ কারণেই আজকের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর সমাজেও বিবেকবান ব্যক্তিও বাঞ্ছিত সংখ্যায় জ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠ নয়। ভূত-ভগবানের প্রভাব সবাই লঘু-গুরুভাবে স্বীকার করে, যুক্তিকে ও বিবেককে অনুগত রাখে বিশ্বাসের। আর আমৃত্যু নাস্তিক্যোটল স্থিতি কেবল ইহবাদী অভীক মানুষেই সম্ভব এবং সে-মানুষ চিরকালই থাকবে বিরলতায় করগণ্য।

উনিশশতক বা বিশশতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাবধি গোটা বিশ্বে মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচারণ নিয়ন্ত্রণ করত "লোকভয়" অর্থাৎ লোকনিন্দার বা সামাজিক অসহযোগের, ঘৃণার ও শাস্তির ভয়, পতিত হবার, নিঃসঙ্গ বা একঘরে হবার ভয়, সপরিবার সমাজচ্যুতির ভয়। এর ফলে সমাজে যৌথজীবনে স্ব স্ব স্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায়, শান্তিতে সহাবস্থান করার জন্যে নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি মানা লোকেরাই থাকত প্রবল। তাই সামাজিক সংহতি, নিয়মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, স্বস্তি, শান্তি আজকের মতো বিরল ছিল না গাঁয়ে ও শহরে-বন্দরে-মহল্লায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী মানুষের জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে শাস্ত্রিক, নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, পারিবারিক চিন্তা-চেতনার, নীতি-নিয়মের, রীতি-পদ্ধতির প্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে গুরু হয়েছে লঘু, উন্মেষ হয়েছে নতুন জীবনচেতনার ও জগৎদৃষ্টির, অনেক নীতি-রীতি হয়েছে বিলুপ্ত, নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বচেতনায় ও কর্তব্যবুদ্ধিতে এসেছে পরিবর্তন। মানুষের সঙ্গে মানুষের, নারীর সঙ্গে পুরুষের, আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে সম্পর্কে ও লৌকিকতায় তথা সৌজন্যে ঘটেছে বিবর্তন। সাহচর্যে নয় যূথবদ্ধতায় বা দলে নয়, স্বাতন্ত্র্যে বাঁচাই হয়েছে কাম্য, তাই পরিজন সমন্বিত পারিবারিক জীবন হয়েছে অবশ্য পরিহার্য। নির্দল নিঃসঙ্গ দাম্পত্যই কেবল প্রেয়। এককথায় জীবনযাত্রায় ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। সে-পরিবর্তন ব্যবহারিক ও মানসিক, নৈতিক ও আচারিক, পারিবারিক ও সামাজিক, শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক ও প্রাযুক্তিক। বর্ধিষ্ণু বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, প্রাকৌশলিক ও প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন, যন্ত্রনির্ভর জীবনযাত্রা যান্ত্রিক উৎপাদন-নির্মাণ ব্যবস্থা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিজীবনে এসে গেছে স্বনির্ভরতা, স্বতন্ত্রতা ও নিঃসঙ্গতা। গৃহগত প্রাত্যাহিক ও দৈহিক জীবনে যন্ত্রনির্ভরতা, আধিব্যাধির ক্ষেত্রে রোগের নিদান নির্ণয়ের ও প্রতিষেধক প্রাপ্তির সহজতা, হাসপাতালে সেবার ও চিকিৎসার নিশ্চিত ব্যবস্থা প্রভৃতি এ কালের মানুষকে সমাজানুগত্য থেকে আকস্মিকভাবে মুক্তি দিয়েছে। যদিও ভূতে-ভগবানে বিশ্বাসের থেকে, সংস্কার প্রসূত আচার-আচরণ থেকে মানুষের পুরো মুক্তি ঘটেনি, তবু শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যৌথচেতনা বা সংহতিবোধ কমে যাচ্ছে জীবিকাক্ষেত্রে নানাভাবে ব্যক্তি দ্রুত অনপেক্ষ হচ্ছে বলেই। তাছাড়া একালে মালিক-মজদুর নির্বিশেষে সবারই ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে অনুভবের ঘটেছে বিস্তৃতি ও গভীরতা আর আকাঙ্ক্ষার মান হয়েছে উঁচু। রুচি হয়েছে উন্নত, তাই চাহিদাও হয়েছে বহু ও বিচিত্র। সামন্ত যুগের দাস-মজুর বা ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবীদের মতো অর্থসম্পদের দৈন্য এ কালের দরিদ্রদের কাঙালপনা দেহে-মনে নিবদ্ধ রাখতে পারছে না। কাজেই আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের তীব্র-তীক্ষ্ণ লড়াই চলছে ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে দৃশ্যে ও অদৃশে। সাধকে সাধ্যগত করার সংকল্প-উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজন ও প্রয়াস আজকাল জীবিকাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপে দৈশিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক তথা বৈশ্বিক রূপ নিয়েছে। যে-দাম্পত্য মাধ্যমে একদিন পিতৃতান্ত্রিক ভব্য সভ্য সুশৃঙ্খল নীতি-নিয়ম নির্দিষ্ট পরিবার তথা আত্মীয়সমাজ গড়ে উঠছিল, আজ এ যুগে অর্থমূল্যে নিয়ন্ত্রিত জীবনে তা অচল হবার উপক্রম ঘটছে– তার স্থান নিচ্ছে অবিবাহ ও সহবাস নীতি ও রীতি। অভিন্ন আর্থিক প্রতিবেশে এ রীতি ছড়াবে বিশ্বময়। মানুষ, দেশ, রাষ্ট্র, সরকার সম্বন্ধেও দ্রুত বদলাচ্ছে মানুষের ধারণা। এ বিবর্তন প্রগতিশীল কি-না, সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এ গতি যে থামানো যাবে না– অন্য কোন শ্রেয়ো সনাতনী খাতে নৈতিক মূল্যমানে দোহাই দিয়ে বহানো যে যাবে না, সে–বিষয়ে মতবিরোধের আশঙ্কা সামান্য। এ কালের সাহিত্য, শিল্প, দর্শনও এগুচ্ছে এ পথেই।

১৯৮৯ সনে আমরা-বাঙলাদেশীরা অজ্ঞতার, অশিক্ষার, দারিদ্র্যের শিকার হয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মানবিক গুণরিক্ত অবিবেকী মুৎসুদ্দি দুঃশাসনে ও মাত্রাহীন শোষণে অবাঞ্ছিত অমানবিক প্রতিবেশে প্রায় মধ্যযুগীয় জীবন যাপনে হচ্ছি বাধ। আমাদের মনে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মননে-রুচি-বুদ্ধি-বিবেকে-শ্রেয়ো-চেতনায় রয়েছে মধ্যযুগীয় অপ্রাকৃত আসমানী বিশ্বাস-সংস্কার। আমাদের বাগানের সখ যেমন টব-বিলাসেই মিটে যায়। আমাদের প্রতীচ্য জ্ঞান-বিদ্যা-প্রজ্ঞা-রুচি-আর্দশ অনুসৃতি প্রভৃতিও তেমনি সনাতন শাস্ত্রিক নৈতিক বিশ্বাস-সংস্কারের চোরাবালিতে দিশে হারায় আমাদের দেশবাসীর শ্রেয়োকে গ্রহণ-বরণের অজ্ঞতা-অনক্ষরতাজাত মানসিক অসামর্থ্যের দরুন। তাই আমাদের প্রগতিপথ প্রায় রুদ্ধ। আর ফায়দা উঠায় মান-বিত্ত-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা লোভী মুৎসুদ্দি শাসক-প্রশাসক-ঠিকেদার-আড়তদার-কারখানাদার-সওদাগর প্রভৃতি প্রতারক, চোরাকারবারী-ভেজালদার যারা আমাদের অর্থসম্পদ ও প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। এদের কারো মাটি-মানুষের প্রতি মমতা নেই, নেই মানবিক দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি। ফলে প্রবৃত্তিচালিত ও অমার্জিত রুচিদুষ্ট, বিবেকরিক্ত এ সব শাসক-প্রশাসক এ যুগে য়ুরোপীয় আদলে ব্যবহারিক জীবনাচার রচনায় নিষ্ঠ থাকলেও মানসিক জীবনে রয়ে গেছে অজ্ঞতার ও অমানবিক জীবনধারণার মধ্যযুগে। ফলে এরা আজো অজ্ঞ অসহায় মানুষকে জগতে ও জীবনে ভূত-ভগবানের লীলার ও শক্তির প্রাত্যহিক প্রভাবের কথা বলে তাদের ভাত-কাপড়ের নিত্যকার অভাবের জন্যে যে সরকার-সদাগর ও শাসক-প্রশাসকরা দায়ী নয়, বরং লীলাপ্রিয় আসমানী নানা অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিই মানুষের সব দুঃখ-সুখের, আনন্দ-বেদনার, বিত্তের, প্রাচুর্য সুখের নিঃস্বতার, যন্ত্রণার আধি-ব্যাধির, খ্যাতি-ক্ষমতার দাতা ও বিধাতা, নিয়তি ও নিয়ন্তা নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমরা বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাই বটে, কিন্তু তার কোন বৌদ্ধিক বা যৌক্তিক প্রভাব আমাদের কল্পনার ও বিশ্বাসের মনোজগতের বহির্দ্বারে ঠেকিয়ে রাখি। তাই প্রাগ্রসর প্রতীচ্য মানুষ যখন মনে-মননে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিকেই কেবল সম্বল করছে আমরা এখনো কল্পনা, বিশ্বাস ও অলৌকিক রহস্যাশ্রিত থাকার প্রয়াস চালাই সচেতনভাবেই, যাতে সামন্ত-বুর্জোয়া শাসন-শোষণ চালানো সম্ভব হয় অজ্ঞ-রিক্ত গণমানুষের উপর। কাঙাল ভুঁইফোঁড়রা সুযোগ সুবিধে ও প্রশ্রয় পেয়ে নিষ্ঠুর লুটেরা হয় বিত্ত-বেসাতের ও খ্যাতি-ক্ষমতার ক্ষেত্রে। তাই যন্ত্র নির্ভর বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল জিজ্ঞাসা ও নতুন নতুন কাঙ্ক্ষাঋদ্ধ হয়ে, তখন আমরা গণপ্রতারণার ও আত্মপ্রবঞ্চনার নতুন নতুন উপায় খুঁজি।

আফ্রো-এশিয়ার ও লাতিন আমেরিকার সব দেশেই মানুষ আশৈশব লব্ধ ও অভ্যস্ত বিশ্বাস-সংস্কার বশে মনে করে যে মানুষের সব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির, সুখ-দুঃখের, জন্যে তার ব্যক্তিক নিয়তিই দায়ী, এর মধ্যে সমাজের ও সরকারের কোন দায়বদ্ধতা নেই। এ নিয়তিকে নড়াতে-সরাতে-বদলাতে হলে তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-কবচ, অঙ্গুলি, সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ-দরগাহ, খানকা-আখড়া-আশ্রম মঠ-মন্দির-মসজিদ-গির্জা-সিনাগগ, শ্রাবক-শ্রমণ-ভিক্ষু-ব্রহ্মচারী গ্রহ-নক্ষত্র-রাশি-দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্ন প্রভৃতির আনুকূল্য আবশ্যিক।

দুর্বলচিত্ত অজ্ঞ মানুষের এ বিশ্বাস-সংস্কারের সুযোগ নিয়ে বাঙলাদেশে নিতান্ত গণআস্থা ও জনপ্রিয়তা লাভের জন্যে ও দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে সরকারপ্রধান বারোমাসে তেরোবার যান হজে-ওমরায়, যান আটরশি-সর্সিনাদির পীর-দর্শনে, দেশ-বিদেশের দরগাহ আস্তানায়, নফল নামাজের ও মুনাজাতের ব্যবস্থা করেন নিতান্ত রাজনীতিক ঘটনার ও ব্যক্তির স্মারক পার্বণে। এমনকি বিদেশীর ঋণ-দান-দয়া পাবার জন্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোয়া-মুনাজাতের প্রয়োজন হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে মানুষের ব্যবহারিক সামাজিক প্রশাসনিক আর্থিক বৈষয়িক ব্যবসায়িক কর্মে আচরণেও যেন মানুষের কোন হাত নেই-সব যেন আসমানী অদৃশ্য-আলৌকিক শক্তির স্বৈর-স্বেচ্ছা-লীলা নিয়ন্ত্রিত। তাই আজ 'খরা ঝড় বন্যা সরকারের রোজগেরে তিন কন্যা'— বলে বিদ্রুপাত্মক ছড়া হয়েছে রচিত। দেশে দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্তের সংখ্যা বেড়েছে দেশে বেকার ও নিঃস্ব নিরুপায় মানুষের বহুলতার জন্যেই এবং সর্বপ্রকারে বিবেকহীন আত্মমর্যাদাবোধহীন দুর্নীতিপ্রবণ চাকুরের সংখ্যাধিক্যে। শাসনে-প্রশাসনে দায়িত্বে কর্তব্যে শৈথিল্য বৃদ্ধির ফলে এখানে নিহত হলে লোক শহীদ হয়, গায়ে চোট লাগলে পুলিশের অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, এখানে বসে থাকা সৈনিকরা শ্রেষ্ঠ সেবক ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমী। সর্বক্ষেত্রে ও সর্বব্যাপারে ভূঁইফোঁড় এ বাঙালীর চালের ও চাতুরীর বৈচিত্র্য অবশ্যস্বীকার্য। এখানে মিলাদ-মুনাজাত খরায় বৃষ্টি নামায়, ঝড় থামায়, বন্যা সরায়, ব্যক্তিকে নিয়তিনির্ভর করায়। মর্ত্যকে মন্ত্রাধীন করার, লৌকিককে আলৌকিক করে তোলার, পার্থিব বিষয়কে অপার্থিব শক্তি সম্পৃক্ত করার, মক্কা-মদিনা-সর্সিনা-আটরশি-সিলেট-বোগদাদকে সরকারের শাসনের প্রশাসনের নীতি নিয়মের উৎস করে তোলার এমন যাদু আগে আর এমন নৈপুণ্যে কে আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছে! ঘরে বসেই ভৌতিক পদ্ধতিতে ব্যালট বাক্সে ভোট পাঠানোই বা কে কবে কোথায় দেখেছে। দুনিয়াব্যাপী ঋণ-দান-দয়া-ভিক্ষার অনন্য অব্যর্থ কৌশল এবং সুনাম-সম্মানই বা আর কোন রাষ্ট্র অর্জন করেছে। জাত-ধর্ম-বর্ণ-বান্দা-মনিব নির্বিশেষে সমনাগরিকত্বের ভিত্তিতে একাধারে যুগপৎ ইসলামী ও সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই বা কে কবে কোথায় দেখেছে! ধন্য সরকার, ধন্য দেশ, ধন্য তার অধিবাসী।

AMARBOI.COM

বাঙলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে প্রথম ইসলামের শাস্ত্রীয়-সংস্কৃতি নিয়ে এলেন কাসিমপুত্র সেনানায়ক মুহম্মদ [৭১১-খ্রীঃ]। এর প্রভাবেই ঘটল দাক্ষিণাত্যে যুগান্তর।[১]

নতুন যুগে শঙ্কর [৭৮৮-৮২০খ্রীঃ] ইসলামের প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে আবিষ্কার করেন বিমূর্ত একক ব্রহ্মকে। আর শঙ্করের বেদান্তভাষ্যের প্রভাবে উদ্ভূত হয় দাক্ষিণাত্যে নয়-দশ শতকে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, বারো শতকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বারো-তেরো শতকে নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, তেরো শতকে মধ্বের বা মাধবের দ্বৈতবাদ, ষোলশতকে বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং চৈতন্যের অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। শাস্ত্রীয় চিন্তাজগতের এ বিপ্লবীদের সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। এঁরা মূলত তাত্ত্বিক-দার্শনিক। ইসলামী একেশ্বরবাদের অভিঘাতেই এঁদের চেতনায় এ আলোড়ন, চিন্তার এ উৎকর্ষ এবং মননের এ বিকাশ।

পরে আলপতিগীনের দৌহিত্র এবং সবুক্তিগীন-পুত্র মাহমুদ-[৯৯৮-খ্রীঃ থেকে সুলতান] ১০০১ সন থেকে বার বার অভিযান চালিয়ে ১০০৬ সনের মধ্যেই মুলতান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবধি অগ্রসর হন, এর পরে মুইজউদ্দীন মুহম্মাদ ঘোরী ১১৯০ সন থেকে রাজত্ব শুরু করেন আর ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীন আইবক দিল্লীর তখতে বসেন ১২০৬ সনে। এবারকার তুর্কীদের ছিল মিশর-ইরাক-ইরান ও মধ্য এশিয়ার সঞ্চিত ঐতিহ্য ও সমম্বিত সংস্কৃতি। এ সময়ে শাস্ত্রীয় ইসলামের চেয়ে সূফীবাদ নামে মরমীবাদই মুসলিমসমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কোরআন-হাদিস নির্দেশিত কর্ম-আচরণে নয়, চিত্তলোকে ঐশ-প্রেমের উন্মেষ-বিকাশ মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের, কৃপার ও মুক্তির সহজ পন্থার নামই হচ্ছে সূফীবাদ। যদিও এ-ও গুরু বা পীরকেন্দ্রী সাধনপন্থা বলে পীরভেদে পন্থা ও সিদ্ধি-চেতনা বা লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন।[২]

এঁদের প্রভাবে বৈষম্য-জর্জরিত উত্তর ভারতে কেবল ভাববিপ্লব নয়— সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটল শোষিত-বঞ্চিত-অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের ব্রাহ্মণ্য সমাজে এবং নির্জিত ও বিলোপোন্মুখ বৌদ্ধসমাজে। এদের দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহীরা বাহ্যত বিবাগী-বিরাগী মরমী বটে, কিন্তু স্বরূপে ব্রাহ্মণ্য শোষণ, পীড়ন ও শাসনদ্রোহী স্বাধিকার, স্বসম্মান ও স্বাতন্ত্র্য অর্জনের প্রয়াসী। তাই উত্তর ভারতের দ্রোহীরা সবাই নিম্নবর্ণের ভক্তিবাদী সন্ত। এঁরা ছিলেন মুদী, মুচি, মালি, সুতার, কুমার, নাপিত ও মেথর বৃত্তির লোক। কবীর ছিলেন তাঁতী, রবিদাস মুচি, সেন নাপিত, তুকারাম শূদ্র, ধর্মদাস মুদী, বর্ণহিন্দু হলেও নামদেব ছিলেন দর্জির এবং নানক ছিলেন রঙরেজের সন্তান। দাদূ ধূনকর, সুন্দর দাস বেণে, বিমান চাষী, তিরু বল্লভ পারিয়া আর রামানন্দ, একনাথ, রজবও ছিলেন না মানীঘরের সন্তান।

ধনে মনে কাঙাল বলে এ দ্রোহীরা ঐহিক জীবনবাদী হতে পারেনি— হয়েছে বৈরাগ্যবাদী।

কাজেই ইসলামী সামাজিক সাম্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এ দ্রোহের সূচনা আর সন্ত মতের এবং সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এঁরা কেবল সাধারণ তুর্কীর মধ্যে নয়, দিল্লীর শাহীমহলেও দেখেছেন, বাজারে ক্রীত দাস, স্বগুণে হচ্ছে প্রভুর জামাতা, সেনাপতি, অমাত্য এবং সুলতান। ব্যক্তিজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার এমন অনন্ত সম্ভাবনা জন্মসূত্রে সর্বপ্রকার অধিকারবঞ্চিত নির্দিষ্ট পেশায় নিবদ্ধ আত্মবিকাশের সম্ভাবনা-রিক্ত নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের দেশী মানুষকে বিচলিত করে। আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে যোগ্যতা অনুসারে আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই তাদের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহী করেছিল, এরা হল মরমী এবং ভক্তি ও সততাই হল ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সহজ ও ঋজু পথ। আগে এদের পারত্রিক মুক্তির উপায় ছিল দেব-দ্বিজে ভক্তি, এখন থেকে মুক্তির ও মোক্ষের পন্থা হল ঈশ্বরানুরাগ।

অতএব, আরববিজয়ে দক্ষিণ ভারতে এবং তুর্কীবিজয়ে উত্তর ভারতে যুগান্তর ঘটে অর্থাৎ পুরোনো যুগের অবসান এবং নতুন যুগের উন্মেষ সূচিত হয়। সে-যুগে কেবল জয়ে-পরাজয়ে শাসক-শাসিত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মাত্র চিন্তা-চেতনার, মন-মননের, মানসিক ও ব্যবহারিক আচার-সংস্কৃতির লেন-দেন হত। বন্দরে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমে দেশী-বিদেশীর তেমন পরিচয় ঘটত না, আজো হাটুরে পরিচয় চোখে-চোখেই থাকে সীমিত— অন্তরস্পর্শী হয় না। এ কারণেই ইংরেজের সঙ্গেই কেবল শাসক-শাসিত রূপে আমাদের পরিচয় নিবিড় হয়, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে— বাণিজ্যে বা পণ্যবিনিময়ে তা কখনো সম্ভব হয়নি কারুর সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরব-তুর্কীর অনুপ্রবেশোত্তর কালকে আমরা একালে [অর্থাৎ আধুনিক কালের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশক] 'মধ্যযুগ' বলে অভিহিত করি বটে, কিন্তু তাৎপর্যে এ য়ুরোপীয় সংজ্ঞায় য়ুরোপের ইতিহাসের 'মধ্যযুগ' নয়— বরং এক অর্থে রেনেসাঁস যুগ। কেননা, আরব-তুর্কী ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সংস্পর্শে, অভিঘাতে যে-ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়, মননে চিন্তনে যে তত্ত্বের ও তথ্যের প্রভাব পড়ে, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মোন্নয়নের, আত্মবিস্তারের যে অশেষ সম্ভাবনার ও আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটে অবজ্ঞেয় তুচ্ছ বৃত্তি-নিবদ্ধ প্রাজন্মক্রমিক দারিদ্র্যক্লিষ্ট আবর্তিত জীবনে, তাতে দ্রোহী সন্তদের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ছেড়ে এরা ভক্তিবাদী স্বাধীন স্বতন্ত্র সমাজ বা স্থানিক সম্প্রদায় গঠন করে মুক্তির স্বাদ ও স্বস্তির সুখ পেতে থাকে। যদিও হাতিয়ারের পরিবর্তনে উৎপাদন পদ্ধতির যান্ত্রিক উৎকর্ষ ও বিস্তার না ঘটায় য়ুরোপের শিল্পবিপ্লবের মতো কিছু তাদের পেশার বা আর্থিক জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটায়নি।

১৯৪৭-পূর্ব ভারতবর্ষ চিরকালই ছিল বিদেশী বিজিত দেশ। চিরকালই ভারতে নতুন চিন্তা-চেতনার ও সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে পরাজয়ের গ্লানী থেকেই, বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দ্বন্দ্বে-মিলনে, বিরাগে-অনুরাগে। ভারতবাসীর চিন্তা-চেতনায় উঠতি মানুষের উদ্যম নয়। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের আত্মরক্ষার সচেতন-অবচেতন প্রয়াসই ছিল ক্রিয়াশীল। এ হচ্ছে নিস্তরঙ্গ জীবনে আকস্মিক অভিঘাতে বিপন্ন ত্রস্ত মানুষের আর্তচিৎকারে জাগা ও বাঁচার প্রয়াস। সন্তধর্মে ও মতে তাই ইহজাগতিক উদ্যম-উদ্যোগ নেই– নেই জিগীষা, আছে কেবল নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব জীবন-প্রত্যাশা। দক্ষিণেও শঙ্কর থেকে বল্লভ অবধি সবাই ভক্তিবাদী মায়াবাদী বিরাগী-বিবাগী। এ জীবনদৃষ্টি স্বস্থ ও সুস্থ ঐহিক জীবন-চেতনা বিরোধী, কেননা এতে বৈচিত্র্যে বহুধা বিকশিতব্য জীবন-জীবিকা ও ভোগবাঞ্ছা নেই, তাই প্রয়াসও নেই। এ বৈরাগ্য-ভিত্তিক ভক্তিবাদে আকাশচারিতা আছে, মর্ত্যপ্রীতি নেই। এ নিরীহতা তাই গভীর তাৎপর্যে সমাজ-সংস্কৃতি-বিকাশের, শিক্ষা-বিস্তারের ও সম্পদ-সভ্যতা বৃদ্ধির পরিপন্থী।

বাঙলাদেশে তুর্কী বিজয়ের পূর্বেই শঙ্করের মায়া-জ্ঞানবাদ এবং দাক্ষিণাত্যের ভক্তিবাদ বাঙলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। গিরি-পুরী-ভারতী-আনন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুবাদী সন্ন্যাসীর বিচরণও ছিল অবিরল।

দরবেশেরও আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। অতএব দরিদ্র বাঙালীর আকাশচারিতায় ও দৈবশক্তি নির্ভরতায় যুক্ত হয়েছিল বৈরাগ্য প্রবণতাও। তাই ষোল শতকের উষালগ্নে দক্ষিণের ব্রহ্মতত্ত্ব ও উত্তরের ভক্তিবাদ ও সূফীমত প্রভাবিত সন্ত চৈতন্যের আবির্ভাব সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়েছিল। ভক্তিকে সূফী প্রভাবে প্রেমে উন্নয়ন চৈতন্যদেবের বিশেষ অবদান।

২

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর [১২০১-০৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে] বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই লক্ষ্মণ সেনের আমলে দেওতলায় শেখ জালালউদ্দিন তাবরেজী [১২০০-০২ খ্রীস্টব্দে] বাস করেন। এখানে লক্ষ্মণ সেনের দালান ও বাইশ হাজারী মসজিদ রয়েছে, হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'শেখ শুভোদয়ায়' বর্ণিত পীরমাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাহিনী, লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, উমাপতিধরের রচিত শ্লোকে বখতিয়ার খলজীর স্তুতি প্রভৃতির সাক্ষ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও প্রমাণে বোঝা যায় তুর্কী ও সূফীমত সম্বন্ধে নুদিয়া-লক্ষ্মণাবতী নগর একেবারে অজ্ঞ ছিল না।[৪]

আরব-ইরাক-ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত ইসলামপ্রচারকরা ভারতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সূফী দরবেশ রূপে আত্মপরিচয় দিয়ে ভারতের বৌদ্ধ-হিন্দু যোগীতান্ত্রিকদের মতোই অলৌকিক শক্তি তথা আত্মিক-আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করে ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর মতো বৈরাগ্যবাদী হয়ে এদেশে ইসলাম প্রচারে নিরত হন। এ নতুন মত প্রচারকদের একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্যবাদ, তথা নির্বিশেষ ব্যক্তিমানুষের স্বাধিকার ও সমাধিকার তত্ত্ব মুগ্ধ করল জনগণকে এবং এঁরা শাসক গোষ্ঠীভুক্ত নতুন ও বিদেশাগত বলেই এঁদের তুলনায় যোগী, তান্ত্রিক, শ্রমণ-শ্রাবক ভিক্ষু-জিন-সন্ন্যাসী প্রভৃতির আসমানী শক্তি ম্লান ও স্বল্প বলে প্রতিভাত হল জনগণের চোখে। তাই দেশের দেব-দ্বিজ বেদবাদী ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাদেরই সেবার, শ্রমের এবং ভোগ-উপভোগের সামগ্রীর যোগানদার নিম্নবর্ণের, নিম্নবৃত্তির এবং নিম্নবর্গের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-অবজ্ঞেয় পীড়িত শোষিত বঞ্চিত চিরনিঃস্ব অজ্ঞ অসহায় এবং ভোগ-উপভোগের সুখে ও সম্পদে চিরবঞ্চিত জনগণ আকৃষ্ট হল। ওইসব ইসলামপ্রচারক দরবেশদের প্রতি প্রাজন্মক্রমিক লাঞ্ছনা-মুক্তির আশ্বাসে এবং যোগ্যতানুসারে বৃত্তি বা জীবিকা গ্রহণে আত্মোন্নয়নের প্রত্যাশায়।[৫]

কোরআন-হাদিসের ইসলামে পীর বা গুরুবাদ নেই, বৌদ্ধ-খ্রীস্ট দর্শনের এবং ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ প্রভাবে সূফীতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে মিশরে-ইরাকে-ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। ইহুদী খ্রীস্টান এবং অদ্বৈতবাদী হানিফ গোত্রের প্রভাবে একেশ্বরবাদ ও মানবিক সাম্যবাদ অজ্ঞাত ছিল না মিশরে-আরবে-ইরানে-ইরাকে। তাই বাণীর ও নীতি-নিয়মের আপেক্ষিক উৎকর্ষে আকৃষ্ট গণমানুষেরা মদিনা থেকে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তান অবধি এবং বহুশতক ধরে ইরানী-গ্রীক-শক-হুন শাসিত ও প্রভাবিত মুলতান অবধি উত্তর-পশ্চিম ভারতেও গণধর্ম হিসাবে সহজেই ইসলাম গৃহীত হয়েছিল। এর পরে ব্রাহ্মণ্য ভারতে উচ্চবর্ণের, উচ্চবিদ্যার ও উচ্চবিত্তের ব্রাহ্মণ্য সমাজে ইসলামের অনুপ্রবেশ সহজ হয়নি, এমকি ক্বচিৎ সম্ভব হয়েছে। স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য বর্ণে-বর্গে ও বৃত্তিতে বিভক্ত ও প্রায় দাস-প্রভু সম্পর্কে বিন্যস্ত সমাজে উচ্চবর্ণের ও বিত্তের লোকের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ও অবস্থানে বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কায় কায়েমী স্বার্থেই বর্ণহিন্দুর পক্ষে জন্মগতভাবেই মানবসাম্যে ও সম্মানে আস্থাশীল ইসলাম পছন্দ ও বরণ করা সম্ভব ছিল না। ব্যবহারিক জীবনে সুবিধেভোগী এবং মানসিক জীবনে রক্ষণশীল সংকীর্ণ চিত্ত উচ্চবর্ণের গণসেবিত সমাজকে তাই ব্রাহ্মমতও তেমন আকৃষ্ট করেনি পরবর্তী কালেও। ইসলাম ছিল পূর্বপাঞ্জাব থেকে চট্টগ্রাম অবধি সর্বত্র সাধারণভাবে বর্ণহিন্দুত্রাস সমাজব্যবস্থা। প্রজন্মক্রমে হাজার হাজার বছর ধরে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধে মান-মর্যাদা ছেড়ে দাস-সেবক ছোটলোকের সঙ্গে একাকার হওয়ার বিভীষিকা তাদের পেয়ে বসেছিল। এ ইসলামভীতি সামন্ত-বুর্জোয়ার কম্যুনিজম ভীতির তুল্য। একে এড়িয়ে চলাই ছিল কায়েমী স্বার্থের অনুকূল ও কল্যাণকর। বহিরাগত সূফী-পীর-দরবেশ প্রচারকরা ছিলেন লোকচক্ষে সিদ্ধসাধক আসমানী বা অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ। এ ত্রিকাল-দ্রষ্টাদের সুপারিশে আল্লাহ পাপী-রুগ্ন-দুস্থের দুঃখ মোচন করেন, পূরণ করেন সর্বপ্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা। পরবর্তী কালের খ্রীস্টান মিশনারীদের মতোই তাঁদেরও ছিল খানকা-হুজরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[আখড়া আশ্রম] সরাই, লঙ্গরখানা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, এর উপর ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-দোয়া তো ছিলই। শহুরে লোকেরা চিরকালই স্বশিক্ষিত সতর্ক স্বল্পাবেগ হিসেবী মানুষ। তাই শহরে দরবেশদের প্রভাব ছিল স্বল্প। গাঁয়ে-গঞ্জে নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবৃত্তির অর্থ-সম্পদরিক্ত মানুষই অবজ্ঞামুক্তির, সম্মানের ও স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্বাচনে অর্থ-সম্পদ অর্জনের আশায় ও আশ্বাসে ক্রমে ক্রমে ইসলাম বরণ করতে থাকে। পীর-দরবেশ মাহাত্ম্যকথাও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমাদের বাঙলায় প্রথম পীর-মাহাত্ম্য কাব্য হচ্ছে তেরো শতকের উষাকালে হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'শোক শুভোদয়া'।

৩

চৌদ্দ শতকের আগেই বিভিন্ন পীরবাদী সূফী সম্প্রদায়ের দরবেশ বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের সাগরেদ ছিলেন সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে লিখিত তাঁর পত্র[৬] থেকে জানা যায়ঃ

> God be praised! What a good land is that Bengal where numerous saints and ascetics came from many directions and made it their habitation and home. For example at Devgaon, followers of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suhrwardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrwardi order are lying burried in Mahisum and this is the case, with saints of Jalalia order in Deotala. In Narkoti some fo the best copanions fo the Shaikh Ahmed Damishqi are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadar Khani order whose chief pupil was Hazrat Shaikh Sharfuddin Maneri is lying burried at Sonargaon. And then there was Hazrat Badr Alam and Badr Alam Zahidi. In short. in the country of Bengal what to speak of the cities there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrwardi order are dead and gone under earth but those still alive are also in fairly large number"

এতে বোঝা যায়, যে চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাঙলাদেশে সূফী প্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু যে কয়জন প্রাচীন সূফীর কাহিনী এবং খানকার ও দরগাহর খবর আমরা জানি, তাঁদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন বাবা আদম শহীদ।[৭] বিক্রমপুরস্থিত রামপালের এই আদম শহীদ বিক্রমপুরের এক সেন রাজা বল্লালের সমসাময়িক। আনন্দভট্ট রচিত 'বল্লাল চরিতম' সম্ভবত এঁরই জীবন চরিত[৮] - লক্ষ্মণ সেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লালসেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত 'বায়াদুমবা' (Bayadumba) সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি।[৯] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতো[১০] বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ঐ সময়ের।

চট্টগ্রামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম, বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং বদর-মোকান খ্যাত বদর শাহ্ বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচপীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এঁর অবস্থিতিকাল কারো মতো ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দ।[১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজীর নাম 'শেক শুভোদয়া'র সঙ্গে জড়িত। তিনিই হয়তো অমৃতকুণ্ডও অনুবাদ করেছিলেন আরবীতে।

আবদুর রহমান চিশতির মতো[১২] জালালউদ্দীন তাবরেজীর পুরো নাম ছিল আবুল কাসেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজী। তিনি শেখ শিহাবুদ্দিন সোহরওয়ার্দীর সাগরেদ ছিলেন[১৩]। তিনি কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, বাহাউদ্দীন জাকারিয়া, নিযামুদ্দীন মুগরা ও দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিসের (১২১০–৩৬) সমসাময়িক। জন্মস্থান তাব্রিজ থেকে দিল্লী এলে তাঁকে সুলতান ইলতুৎমিস অভ্যর্থনা করেন। এ তথ্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতে হবে জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙলায় আসেন নি।[১৪] কেউ কেউ আবার শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী ও সিলেটের জালালউদ্দীন কুনিয়াঈকে অভিন্ন মনে করেন। শেখ জালালউদ্দীন বহুল আলোচিত সূফী।[১৫] ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ্ সুলতান রুমী নামে এক সূফীর দরগাহ আছে। ইনি ৪৪৫ হিঃ বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালের দলিলসূত্রে দাবী করা হয়।[১৬] এক কোচ রাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ Gazetteer-এ উল্লেখ আছে।[১৭] কিন্তু আরো প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮] অতএব, উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দ শতকের লোক।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহ দৌলা শহীদের দরগাহ।[১৯] ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন।[২০] অতএব ইনি বারো-তেরো শতকের লোক।

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী ওর্ফে শাহরাহী পীরের দরগাহ্ রয়েছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রম কেশরীর সঙ্গে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে।

বগুড়ার মহাস্থান গড়ের শাহ সুলতান মাহি-আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙজীবের সনদসূত্রেও (১০৯৬ হিঃ ১৬৮৫-৮৬) মেলে।[২১] তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিল, তা এখনো শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।[২২] ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনে হয় মাহি-আসোয়ার (মৎস্যাকৃতি নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দ শতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোল শতকে পর্তুগীজেরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ্ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[২৩] ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম-উল-মুলক্ শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহীয়া ও তাঁর উস্তাদ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ্ সোনারগাঁয়ে (১২১০-৩৬, বা ১২৭০-৭১, কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রীস্টাব্দে)[২৪] এসেছিলেন। ইনি এবং 'মক্তুল হোসেনে' মুহম্মদ খান-বর্ণিত শেখ শরফুদ্দীন অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলবার উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ বদিউদ্দীন শাহ্ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু ইসহাক শামী। ইনি মুসা নবীর ভাই হারুনের বংশধর।[২৫] ইনিই সম্ভবত শূন্য পুরাণোক্ত 'নিরঞ্জনের রুম্মার' দম মাদার। এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদারবাড়ী, মাদার শাহ এবং দরগাহ সংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারী নাম, শাহ্ মাদারের স্মরণার্থ বাঁশ তোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সূফীর বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন।[২৬] মুখদুম জাহানিয়া জাহানগস্ত ওর্ফে জালালউদ্দীন সূরকপুশ (Surkpush) নামে এক দরবেশ বাঙলায় এসেছিলেন। জাহানগ্সতের মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে এবং উছে (UCHH) তাঁর সমাধি আছে।[২৭]

শেখ আখি সিরাজউদ্দীন উসমান নিযামুদ্দীন আউলিয়ার খলীফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। ইনি চৌদ্দ-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাঙলাদেশে চিশ্তিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশ্তিয়া পীরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা 'আলাহ', তাঁর পুত্র নূর কুতুব-ই আলমের সাগরেদরা নূরী[২৮] এবং আলাউলের খলীফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর সম্প্রদায়ের সূফীরা 'হোসেনী' নামে পরিচিত ছিল।[২৯] শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষযুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ-বিন ওলীদের বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হতেন। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নূর কুতুব-ই-আলম।

AMARBOI.COM

গণেশ-যাদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নূর কুতুব-ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার গণেশ কর্তৃক সোনার-গাঁয়ে নির্বাসিত ও পরে নিহত হন। নূর কুতুব-ই আলমের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ জাহিদও সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ওর্ফে যদু শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[৩০]

এঁরা ছাড়া শাহ সফিউদ্দীন, জাফর খান গাজী,[৩১] খান জাহান আলী, শাহ আনোয়ার কুলি হালবী, ইসমাইল গাজী, মোল্লা আতা, শাহ জালাল দাখিনী (মৃত্যু ১৪৭৬ খ্রীঃ)[৩২] শাহ মোয়াজ্জিম দানেশমন্দ ওর্ফে মৌলানা শাহ দৌলা (রাজশাহীঃ বাঘা)[৩৩] শাহ আলী বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরিদউদ্দীন শাহ,[৩৪] লঙ্গর শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহলঙ্কাপতি[৩৫] প্রভৃতি দরবেশের নাম উল্লেখ্য।

জালালুদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যু ১২২৫ খ্রীঃ), মখদুম জাহানিয়া (১৩০৭-৮৩) ও শাহজালাল কুনিয়াঈ (মৃত্যু ১৩৪৬) সোহরওয়াদীয়া মতবাদী ছিলেন। শেখ ফরিদউদ্দীন শখরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজুদ্দীন (মৃ. ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃ. ১৩৯৮) শেখ নাসিরুদ্দীন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশারাফ জাহাগীর সিমনানী, শেখ নূর কুতুব-ই- আলম (মৃ. ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফী ছিলেন।

শাহ সফীউদ্দীন (মৃত্যু ১২৯০-৯৫?) কলন্দরিয়া সূফী ছিলেন।

শাহ আল্লাহ্ মাদারিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশমন্দ নকশবন্দিয়া সুফী ছিলেন।[৩৬] ষোল শতক অবধি চট্টগ্রামের সুফী শাহ্ সুলতান বলখী (বায়জিদ?), শেখ ফরিদ, পীর বদর আলাম, কাতাল পীর, শাহ মসন্দর বা মোহসেন আউলিয়া, শাহপীর, শাহচাঁদ প্রমুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকুলের পীর শরফউদ্দীন থেকে সদরজাঁহা আবদুল ওহাব ওর্ফে শাহ্ ভিখারী অবধি অনেক পীর প্রখ্যাত।

আবার শাহ্ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ, আলাউল হক, নূর-কুতুব-ই-আলম, আশরাফ জাহাঁগীল সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলী খান, খান জাহান খান প্রমুখ সূফীরা রাজনীতি ও সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

আর্তের সেবা, কাঙাল ভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতি দ্বারাই সূফীরা গণমন জয় করেন।

দরবেশদের প্রচারে ও প্রচারণায় যে গাঁয়ের লোক সাগ্রহে ইসলাম বরণে এগিয়ে এসেছিল ভাববার তেমন কোন কারণ নেই, প্রজন্মক্রমে আশৈশব প্রাপ্ত শাস্ত্রীয় বিশ্বাস সমেত যে কোন দৈবিক-ভৌতিক-রাশিক-অলৌকিক বিশ্বাস সংস্কার পরিহার করা কোন ক্ষতিভীরু ও প্রাপ্তিলোভী মানুষের পক্ষে সহজে সম্ভব হয় না, নাস্তিক তাই দুনিয়াতে চিরকালই দুর্লভ। ইংরেজ আমলের সাক্ষ্যে বলা চলে নিতান্ত বাঁচার তাগিদে নিঃস্ব নিরন্ন নিরুপায় মানুষ শাসকগোষ্ঠীর জ্ঞাতি দরবেশের কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দোয়ায় বাঁচার নতুন উপায় প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নতুন ধর্ম বরণ করেছে। কাজেই ইসলামের প্রসার দ্রুত হয়নি। বাঙলার হিন্দু-বৌদ্ধজ মুসলিমদের অধিকাংশই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী। যেমন জুলহা [তাঁতী বৌদ্ধনাথযোগী] নিকারী [মাছ বিক্রেতা] কৈবর্ত [জেলে] মুলুদিঙ্গ [লবণ উৎপাদক] বেদে, কাগজী [কাগজ নির্মাতা] কাহার [পালকী বাহক] কসাই, মুজারী, বারুই [বরোজ-চাষী] তেলী, বাউল [বৌদ্ধ বজ্রসহজয়ানী] প্রভৃতি বহু ও বিবিধ প্রাজন্মক্রমিক বৃত্তিজীবীর অস্তিত্বই এর প্রমাণ।

প্রমাণে অনুমানে বোঝা যায়, তেরো শতকে গাঁয়ে-গঞ্জে ইসলাম প্রচার শুরু হলেও চোখে পড়ার মতো মুসলিম গাঁয়ে গাঁয়ে দুর্লভ ছিল, কয়েক পরিবার এক সঙ্গে রাজি না হলে একক পরিবারের পক্ষে নবধর্মে দীক্ষিত হওয়া বৈষয়িক সামাজিক কারণে অর্থাৎ হাটে-মাঠে ক্ষুব্ধ বিরূপ পাড়ার লোকের সহযোগিতাশূন্য হয়ে স্বাতন্ত্র্যে বাঁচা ছিল অসম্ভব। আমরা যদি অনুমান করি যে তেরো শতকে শতকরা একজন, চৌদ্দ শতকে তিনজন, পনেরো শতকে ছয়জন, ষোল শতকে বারোজন, সতেরো শতকে পনেরোজন, আঠারো শতকে বাইশজন তাহলে উনিশ শতকের শেষ পাদের শুরুতে [১৮৭১ সনে] উভয় বঙ্গে শতকরা ৩২/৩৩ জন মুসলিম পাওয়া সম্ভব।[৩৭]

এদের বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত জ্ঞাতিদেরও কোন লেখা-পড়ার অধিকার ও ঐতিহ্য ছিল না। সুনির্দিষ্ট বৃত্তিজীবীতে বিভক্ত ও বিন্যস্ত সমাজে পেশান্তরের সুযোগ সুবিধেও ছিল বিরল, তাই বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিম সমাজে বৃত্তি ও অর্থ সম্পদগত দুস্থতার দুরবস্থার এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তন ছিল দুর্লক্ষ্য, যদিও মুসলিম সমাজে ও মসজিদে অচ্ছুত ছিল না কেউ, তবু স্থানভেদে বৈবাহিক সম্বন্ধে আজলাফ-আতরাফ-আশরাফ ভেদ ছিল প্রায় দুস্তর। অবশ্য বিদ্যায় ও বিত্তে তথা কাঞ্চন কৌলিন্যে ও প্রতাপে প্রভাবে সেদিনও আশরাফ হওয়ার পথে বাধা ছিল সামান্য। ঐতিহ্য বা রেওয়াজ ছিল না বলে বিশেষত একালের মতো শিক্ষিত লোকের জন্য লক্ষ লক্ষ চাকরী ছিল না বলে প্রাজন্মক্রমিক নিস্তরঙ্গ পেশাজীবী পরিবারে কেউ সন্তানকে লেখাপড়া শেখানোর গরজ বোধ করত না। তবু সাক্ষরতার প্রতি সামাজিক মর্যাদাগত আকর্ষণ ছিল বলে, কেনা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচা, জমি-জমা সম্পর্কিত হিসেব-নিকাশের প্রয়োজন বোধে এবং কোরআন পড়ার ও নামাজ রোজা সম্বন্ধীয় আবশ্যিক নীতি-নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি জানার-জানানোর গরজচেতনা বশে কেউ কেউ সন্তানকে বিদ্যালয়ে মক্তবে পাঠশালায় পাঠাত।

এমন লোক ছিল হয়তো হাজারে একজন। এরাই মোল্লা, মুয়াজ্জিন, খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি, উকিল, মোক্তার, মুনশী-মৌলবী-আমিন প্রভৃতি এবং কিছু লোক দফতরের আদালতের নায়েব গোমস্তা-সরকার, পাটোয়ারী-মৃধা-বন্দুকশি, সিপাহি হত। এদের প্রাপ্য সবচেয়ে বড় চাকরী ছিল কাজীর ও ফৌজদারের পদ। বরং মোঙ্গল গোত্রীয় রাজ্যে-আরাকানে ত্রিপুরায় চট্টগ্রামের ও কুমিল্লার দেশজ মুসলিমদের অনেকেই বড় পদে শাসনকর্তা, সেনানী ও মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বাঙলার গৌড়ে ঢাকায় মুর্শিদাবাদে সুদীর্ঘ সাড়ে ছয়শ বছরের তুর্কী মুঘল শাসনে কোন দেশজ মুসলিম শাসক সেনানী উজির পদ পায়নি। ব্রিটিশ আমলে যেমন দেশী খ্রিস্টানের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক যোগ ছিল না, এমনকি গির্জাও ছিল না অভিন্ন, তুর্কী-মুঘল আমলেও তেমনি দেশজ মুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল না বিদেশাগত ও উত্তর ভারতীয় উত্তন্মন্য শাসক গোষ্ঠীর। এমনকি পলাশীর ও বাকসারের যুদ্ধের পরে বাঙলাস্থ অভিজাত বিদেশীরা উত্তর ভারতে চলে যায়। ক্বচিৎ কেউ নানা সুবিধে অসুবিধের কারণে থেকে যায়, বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে তেমন করগণ্য কিছু উর্দুভাষী এককালের বিত্তবান এবং আজো খান্দানী বা আভিজাত্যগর্বী পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আর রয়েছে গৌড় মুর্শিদাবাদে ঢাকায় চট্টগ্রামে ও হুগলী হাওড়া-কোলকাতা শহরে উত্তর ভারত থেকে তুর্কী-মুঘল আমলে নানা প্রয়োজনে আসা লোকগুলোই স্থায়ী বাসিন্দারূপে। এদেরই এখন অবজ্ঞায় উচ্চারিত নাম 'কুট্টি'।

AMARBOI.COM

৫

কোলকাতার মুর্শিদাবাদের এবং অন্যত্র নিবসিত উর্দুভাষী শিক্ষিত অভিজাত মুসলিমরাই নিজেদের বাঙলার মুসলিম বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। প্রমাণ দেওয়ান খান বাহাদুর ফজলে রাব্বীর[৩৮] গ্রন্থ এবং নওয়াব আবদুল লতিফের[৩৯] লিখিত উক্তি। লতিফ বাঙলাভাষী দেশজ মুসলিমদের 'ছোটলোক' মুসলিম বলেই জানতেন।

বাঙালী মুসলমান বলতে বাঙলাভাষী দেশজ ও বিদেশাগত শাসক গোষ্ঠীভুক্ত উর্দুভাষী— এ দুশ্রেণীর মুসলিমে পার্থক্য চেতনা নিয়ে একাল অবধি ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলিম বিদ্বানেরা মুসলিমদের আর্থিক, শৈক্ষিক, রাজনীতিক, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক বিষয় ও সমস্যা আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করেননি বলেই তাঁদের বহু গবেষণা ও সিদ্ধান্ত একালে বিভ্রান্তিই বাড়িয়েছে। তথ্যেও সত্য আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন ইংরেজ আমলে উর্দুভাষী অভিজাতরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে গোড়া থেকেই আগ্রহী ছিল। এদের অনুরোধেই মুর্শিদাবাদে ১৮২৪ সনে ইংরেজী প্রশাসনের বাহন হওয়ার আগেই ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র বিহারে পাটনায় অভিজাতরা কখনো ইংরেজী বিদ্যা বিরোধী ছিল না। বাঙলায় দেশজ মুসলিমদের শিক্ষার কোন ঐতিহ্য বা রেওয়াজ ছিল না বলে, ঘরের কাছে স্কুলও ছিল না বলে দরিদ্র অজ্ঞ নিরক্ষর পিতা পুত্রকে অপরিচিতের অনাত্মীয়ের শহরে পাঠাবার কথা ভাবতেও পারেনি। তাই ব্রিটিশ সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা সত্ত্বেও [কমিশন রিপোর্টগুলোয় নানা কারণ ও উপায় বিশ্লেষিত হওয়া সত্ত্বেও] উনিশ শতকে স্কুলে কলেজে [মহসিন কলেজেও] মুসলিম ছাত্র জোটেনি, এমনকি ১৭৮০ সনে অভিজাত উর্দুভাষীর দাবি ক্রমে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ও বাঙলাভাষী দেশজ মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষক ছিল দুর্লভ। W.W Hunter[৪০] Hundred and fifty years ago, it was Impossible for a muslim to be poor etc-ও এই মুঘল প্রশাসকগোষ্ঠীভুক্ত উর্দুভাষী ও ফারসী মুনশী মুসলিমকেই বোঝায়। ওয়াহাবীরা গোড়ায় ছিল ব্রিটিশ মিত্র, তীতুমীরের সংগ্রামের কাল থেকেই ওয়াহাবীরা ব্রিটিশ বিদ্বেষী হয় এবং ১৮৩৮ সনেই ইংরেজী প্রাশাসনিক ভাষা হিসেবে আইনসিদ্ধ হয়। আর স্যার সৈয়দ আহমদের প্রেরণায় ও প্রবর্তনায় ১৮৬০ সনের দিকে বাঙলার ও ভারতের মুসলিমদের ব্রিটিশ প্রীতি জাগে। কাজেই ইংরেজী শিক্ষা এড়ানোর ও বর্জনের অবকাশই ঘটেনি কারুর, যদিও ফরায়েজী-ওয়াহাবীদের কেউ কেউ, গাঁয়ে গঞ্জে কিছু কাল ইংরেজের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সহযোগিতা বর্জনের বৃথা আহ্বান জানিয়েছিল অজ্ঞ-অনক্ষর-শিক্ষায় অনীহ চাষী মজুর ও বৃত্তিজীবীদের প্রতি। সামগ্রিকভাবে এর কোন গুরুত্ব ছিলই না। আর ১৮৭০ সনের আগেই ওয়াহাবী বিচার অনুষ্ঠানকালেই ওয়াহাবীদের এবং ফরায়েজীদেরও ব্রিটিশ বিদ্বেষ অবসিত হয়।

অতএব তুর্কী-মুঘল ছিল গোটা পৃথিবীর সর্বত্র যেমন এখানেও অজ্ঞতার অনক্ষরতার ও অশিক্ষার অন্ধকার কিন্তু স্বাভাবিক যুগ। সেকালে সাক্ষর শিক্ষিত লোক লাখেও এক ছিল না, কেন না একালের মতো শিক্ষা জীবিকাক্ষেত্রে আবশ্যিক বা অপরিহার্য ছিল না। তাই ব্যক্তিগত আগ্রহ, জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলই ব্যক্তিকে বিদ্বান করত। শিক্ষার কোন সামাজিক তাগিদ ছিল না, কিছু বামুন কায়স্থ বৈদ্য জীবিকার প্রয়োজনে বিদ্যার্জন করত, তেমনি করত কিছু মোল্লা-মুয়াজ্জিন-মৌলবী-মুনশী-খোন্দকার শাস্ত্রীয় জীবিকার প্রয়োজনে। এ স্বল্প সংখ্যক মোল্লা পুরোত মৌলবী মুনশী পণ্ডিতরাই ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে ভদ্র শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী।

AMARBOI.com

৬

গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিমের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছিল, সামাজিক সাম্য ও স্বাধীনতা পেয়ে কেউ কেউ বিদ্যা এবং পেশাপরিবর্তন করে বিত্তও অর্জন করে সচ্ছল ভদ্র শিক্ষিত গৃহস্থও হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য বিদ্যা ও বিত্তবানরাই জমিদার মহাজন দোকানদার আড়তদার ও স্থানীয় প্রশাসক হিসাবে ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন গ্রাম-সর্দার। উনজন অজ্ঞ-অনক্ষর চাষী-মজুর ও ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী মুসলিমরা ছিল আর্থিক শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুর শাসিত পরিচালিত জন তুর্কী-মুঘল আমল থেকে ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল অবধি। এদের সম্বন্ধেই Robert Orme বলেছিলেন যে The Moors of Indostan may be divided into two kinds of people differing in every respect. Under the first are reckoned the descendants of the conquerors. The second rank of Moors comprehends all the descendants of converted gentoos-a miserable race as none but the most miserables of the gentoos castes are capable of changing their religion.[৪১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-মালী-চাঁড়াল-বাগদী-নাপিত-ধোপা রূপেও ছিল মুসলিমদের প্রাত্যহিক সেবায় ও সহযোগিতায় নিয়োজিত। কশবায়, ইকতায়, ইকনিমে, চাকলায় হয়তো তুর্কী-মুঘল প্রশাসক থাকত, কিন্তু গাঁয়ে গঞ্জে এরা নিশ্চয়ই দুর্লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের মতোই। এ পারস্পরিক নির্ভরতার জন্যেই পরস্পরের শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ কখনো কোথাও সক্রিয় হতে পারেনি। গাঁয়ে-গঞ্জে যদিও শিক্ষিত বিত্তবানদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থে 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে' এবং উনিশ-বিশ শতকের আগে শহরেও, কাজেই সাধারণভাবে গত সাড়ে সাতশ বছর ধরে গাঁয়ে হাটে-মাঠে অর্থে-বিত্তে শিক্ষায়-প্রশাসনে-পঞ্চায়েত অধিজন বর্ণহিন্দুরই ছিল নেতৃত্ব ও প্রাধান্য। অতএব ইংরেজ আমলেই দেশজ মুসলিমরা সরকারী চাকরী, অর্থ-সম্পদ ও শিক্ষার সুযোগ হারিয়ে আকস্মিকভাবে দরিদ্র ও অশিক্ষিত হয়ে পড়ে বলে যে বিশ্বাস চালু রয়েছে, তার মধ্যে কোন তথ্য বা সত্য নেই। আর এও সত্য নয় যে বহু বহু দেশজ মুসলিমের আয়মা মদদেমাস বা ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল, যা ছিল এবং যাদের ছিল তারা মোটামুটি মামলা মোকাদ্দমা করেও শেষ নিষ্পত্তিকাল ১৮৪৬ সন অবধি ভোগ দখল করেছে। ১৮৩৮ সনেও কাজীকমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মুসলমান এবং ১৮৬০ সন থেকে মুনশী উকিলের পেশা মন্দা ও বিলুপ্ত হতে থাকে থাকে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু উকিলের উপস্থিতির ফলেই। কাজেই শাসকগোষ্ঠীর মুসলিমরা আঠারো শতকের শেষ পাদে সামরিক পদ এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে [১৮৩২ সনের পর থেকে ডেপুটি মুন্সেফ পদ সৃষ্টির সময় থেকে] নানা বেসামরিক ও প্রাশাসনিক পদ হারায়। এদের অনেকেই উত্তর ভারতে চলে যায়। আর যে সব বিত্তবান সুবিধার বা অসুবিধার কারণে রয়ে যায়, তারাও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিত্তশালী, সম্মানিত অভিজাত উর্দুভাষী শিক্ষিত রূপেই দেশজ মুসলিমের নেতৃত্ব দিয়েছে ইংরেজ আমল থেকে পাকিস্তান যুগ অবধি।

এতে কিন্তু দেশজ অনক্ষর পেশাজীবী মুসলিম আর্থিকভাবে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিছু উকিল, কাজী, আমিন, নকলনবিশ অবশ্য ব্যতিক্রম। ব্রিটিশ আমলে প্রাশাসনিক পরিবর্তনের ফলে দেশজ মুসলিম জীবনে পৃথক কোন বিপর্যয় ঘটেনি, যা ঘটেছে তা হচ্ছে, গ্রামীণ পণ্য বিনিময় ভিত্তিক অর্থনীতি আকস্মিকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুঁজির ও পণ্যের খপ্পরে পড়ে এবং শিল্পকারখানায় নির্মিত বিভিন্ন পণ্যের প্রতিযোগিতায় আমাদের হস্তনির্মিত কুটির শিল্প বিলুপ্ত হল। বেকারত্বের শিকার হল গণমানব, দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা গ্রাস করল জনজীবন, কাঁচা টাকা নির্ভর হল জীবনযাত্রা। পাদটীকার পুঁজি না থাকলেও কাণ্ডজ্ঞান নির্ভর যৌক্তিক ও তাথ্যিক সাক্ষ্যে প্রমাণে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে দেশজ মুসলিমদের কেউ কখনো বখতিয়ার খলজির কাল থেকে মীরজাফরের কাল অবধি দরবারে উজির বা সেনানীরূপে কোন পদ পায়নি যোগ্যতার অভাবেই। আজো তুর্কী-মুঘল আমলের প্রাশাসনিক পদবীধারীরা সব হিন্দুই, দেশজ মুসলিম নয়— ক্বচিৎ কেউ কাজী, খোন্দকার, আমিন, পাটোয়ারী, মজুমদার, ফৌজদার মাত্র। দেশজ মুসলিমদের কেউ রাজনীতিক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতে পারেনি উচ্চবিত্তের, আভিজাত্যের ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে বা হীনম্মন্যতার ফলে। তাই ক্লাইব-হেসটিংসের আমল থেকেই মুর্শিদাবাদে কোলকাতায় ও অন্যত্র নিবসিত জমিদার উর্দুভাষীরাই অজ্ঞ অনক্ষর বা সাক্ষর স্বল্পশিক্ষিত ও বিদ্বান দেশজ মুসলিমের হয়ে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন নাজিমউদ্দীন-সোহরাওয়ার্দী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ আলী অবধি [উল্লেখ্য যে বিবাহসূত্রে এ.কে. ফজলুল হকও ছিলেন ঘরোয়া জীবনে উর্দুভাষী; অন্য অনেক উর্দুভাষী রাজনীতিক সুবিধের জন্যে মৌখিক বাঙলাও শিখেছিলেন বিশ শতকের প্রথমার্ধে] দেশজ মুসলিমদের সঙ্গে ভাষিক সামাজিক সাংস্কৃতিক কোন সম্বন্ধ সম্পর্ক ছিল না এসব উর্দুভাষী নেতাদের। কেবল স্বধর্মী বলেই এদের উপর ওঁদের স্ব-ঘোষিত অবাধ নেতৃত্বে ছিল মৌরসী অধিকার। ফলে দেশজ মুসলিমদের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন-প্রত্যাশা, সমস্যা-সম্বল সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না বলেই মুসলমানের পক্ষে শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শদানের কিংবা সরকারের কাছে মুসলিমদের হয়ে নানা দাবি জানানোর ক্ষেত্রে বার বার অজ্ঞতার ও বিভ্রান্তির কুফলই মিলেছে আঠারো-উনিশ শতকে।

৭

গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিমের সংখ্যা শাস্ত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা জাগানোর মতো বৃদ্ধি পেল সম্ভবত পনেরো শতকের শেষ পাদ থেকে। ষোল শতকে তাই আমার সূফী দরবেশের কাছে দীক্ষিত মুসলিমদের কোরআন হাদিস অনুগ ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের বাস্তবে রূপায়ণ প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি তাদের শাস্ত্রীয় তত্ত্ব এবং নিয়ম-নীতি ও রীতি-পদ্ধতি বিষয়ক রচনায়। এখন থেকেই পাথুরে প্রমাণ মিলছে মাদ্রাসায় শিক্ষিত দেশজ শাস্ত্রীয় ও শাস্ত্রবিদের আমিল-মৌলবী-পীরের। দেশজ বৌদ্ধ-হিন্দু যোগতন্ত্র প্রভাবিত সূফীবাদের সঙ্গে শরীয়তসম্মত ইসলামের এবং স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস-আচার-সংস্কারের অসঙ্গত অসামঞ্জস মিশ্রণে-সমন্বয়ে এক লৌকিক ইসলামই ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বাবধি বাঙলাদেশে প্রজন্মক্রমে চালু ছিল।[৪২] কোরআন হাদিস অনুগ বিশুদ্ধ ইসলাম বিশ্বাসে ও আচরণে মানা সম্ভবও ছিল না দুটো কারণে। প্রথমত শাস্ত্র ছিল আরবী ভাষায় লিখিত ও বিদেশীর বিভাষা আয়ত্ত করা বিদ্যালয়-বিরল সে যুগে কৃচিৎ কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল, আলিম-মৌলবী আজো সর্বত্র শত শত মেলে না। দ্বিতীয়ত স্থানিক কালিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে পরিবেশে মানুষ আশৈশব লালিত হয়, তার প্রভাব এড়াতে পারে না। শাস্ত্রীয়, গোত্রীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্যের, আচারের, সংস্কারের মিশ্র ও সমন্বিত প্রভাবেই মানুষের মন-মনন-আচার-আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে বাঙালীর ধর্ম সাধারণভাবে বিশুদ্ধ 'ইসলাম' নয়—'মুসলমানধর্ম', যাতে রয়েছে যুগপৎ শরীয়ত ও মারফত, কোরআন হাদিসের পাশে পীর-দরবেশ মন্ত্র-মাদুলী-তাবিজ-দোয়া-ঝাড়-ফুঁক-তুক-তাক।

৮

এমন যুগ দীর্ঘকাল ধরে ছিল যখন মানুষের ঐহিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণও মুখ্যত শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাই তাদের শিল্প-সাহিত্য, তত্ত্ব-দর্শন ও নীতিবোধ ছিল শাস্ত্রের অনুগত। তাই বাঙালী হিন্দুর ও মুসলমানের সাহিত্যের বিষয়বস্তুও ছিল পৃথক। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর শিল্প-সাহিত্য-দর্শন ও নীতিশাস্ত্র ছিল সংস্কৃত লিখিত। এগুলো শিক্ষিত লোকেরই— ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থেরই পড়ার ও অনুশীলনের বিষয়। অজ্ঞ, অনক্ষর জনগণেরও সাহিত্য-শিল্প-নীতি-দর্শনের ও নাচ-গান-বাদ্যের চর্চা ছিল-একালের পরিভাষায় তার নাম 'ফোকলোর'। এর সাহিত্যশাখার নাম 'লোকসাহিত্য'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক আবেগে-অনুভবে রচিত এবং অলিখিত ও ভণিতাহীন বলে আর মুখে মুখে বিকৃত বিবর্তিত-পল্লবিত ও পরিমার্জিত বলে লোকসাহিত্যকে 'গণরচনা' বলে অভিহিত করা হয়। স্থানিক বুলিতে রচিত, স্থানের সীমায় নিবদ্ধ শ্রুতি-স্মৃতি রূপে মুখে মুখে চালু এ সাহিত্যে ক্বচিৎ কখনো ভাবগত ঋদ্ধি এবং আলঙ্কারিক চমক থাকলেও মাপে-মানে মাত্রায় রুচির ও সংস্কৃতির শৈল্পিক উৎকর্ষ নেই বলে এ সাহিত্য শিল্প লোকের তথা প্রাকৃত জনের সাহিত্য বলেই এর নাম 'লোকসাহিত্য'— মানুষে আর হরিজনে যে পার্থক্য, সাহিত্যে-শিল্পে ও লোকসাহিত্যে-শিল্পে আর লোকের সে-পার্থক্য।

শিক্ষিত হিন্দুরা সংস্কৃতে রচিত সাহিত্য-শাস্ত্র-দর্শন-নীতিশাস্ত্র পড়ত বলেই জনগণকে লৌকিক দেবতা-উপদেবতার এবং কিছু সর্বজনীন নীতিকথা পড়িয়ে শোনানোর লক্ষ্যে প্রথমে মৌখিক কথকতার জন্যে ধামালী কাহিনী রূপে, পরে লিখিত পাঁচালীরূপে রচনা করেন। সাহিত্য রচনার গরজবোধ করেননি তাঁরা আঠারো শতক অবধি। এ ধামালী-পাঁচালী রচনারও ঐতিহাসিক ও প্রাতিবেশিক কারণ ছিল। বৌদ্ধবিলুপ্তির কালে নির্জিত বৌদ্ধেরা বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য সমাজাশ্রয়ী হয়ে তাদের শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কার চালু রাখার চেষ্টায় ছিল, শূন্যবাদী ধর্মঠাকুর পূজারী, নাথপন্থী, সহজপন্থী এবং যোগতান্ত্রিক সাধন পন্থী ও সাধারণ হিন্দু-মুসলিম বাউলরা এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধই।[৪৩] তারা, আদিনাথ-চন্দ্রনাথ, বৎসলা, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতাও হিন্দুদেবতা রূপে পূজিত হতে থাকেন।[৪৪]

৯

আদি ও আদিম সমাজে প্রজন্মক্রমে আশৈশব লব্ধ ও লালিত বিশ্বাস-সংস্কারের যেন মৃত্যু নেই। জ্ঞান-বুদ্ধি-সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের ফলে শীতকালীন ঔষধির মতো আপাত-লুপ্ত হলেও চিত্তলোকের গভীরে কোথাও এর জড় থেকে যায়, এবং ইহজাগতিক লাভ-ক্ষতির ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়রিক্ত দুর্বলচিত্ত মানুষের তা-ই অবলম্বন হয়। দৃঢ়মূল সে বিশ্বাস-সংস্কার জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিকে ছাপিয়ে জনচিত্ত প্রভাবিত ও পরিচালিত করে। মানুষ তখন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনালব্ধ সিদ্ধান্তে এবং নীতি-নিয়ম-আদর্শে স্থির থাকতে পারে না। এ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ কিংবা সহজাত প্রকৃতিই। একটা তুচ্ছ উপমায় হয়তো এর প্রকৃতি বোঝানো যায়। আমরা সব সাক্ষর ব্যক্তিই মুদ্রিত আদর্শ লিপি দেখে হরফ শিখি, কিন্তু আজ অবধি আমরা কেউ তা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণের কথা ভাবিনি, তথা কেউ নিষ্ঠ অনুকৃতির গুরুত্ব দিইনি, অজ্ঞাতেই স্ব স্ব লেখায় বর্ণ নির্মাণে হয়েছি স্বেচ্ছাচারী। জীবনের ক্ষেত্রেও মানুষ কখনো আক্ষরিক অর্থে শাস্ত্রের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে না, করতে পারে না, বিপন্ন বা প্রলুব্ধ হলেই আপাত-প্রেয় পন্থা বরণ করে।

আমাদের অস্ট্রিক দ্রাবিড় ভেড্ডিড কিংবা আলপাইনীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাও বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সামাজিকভাবে প্রকাশ্য জীবনে অঙ্গীকার করলেও তাদের মানসিক জীবনে প্রজন্ম ক্রমে শ্রুতিস্মৃতি রূপে প্রাপ্ত আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার কখনো পরিহার করতে পারেনি। বৌদ্ধবিলুপ্তির পরে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের শাসনের অবসানে বিদেশী-বিধর্মী-বিভাষী-তুর্কীশাসনে স্ব স্ব ধর্মীয় মত-পথ নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে প্রচারের ও আচার-আচরণের স্বাধীনতা পেয়ে চিরলালিত লৌকিক দেবতা-উপদেবতার মাহাত্ম্য, উচ্চারণে, পূজা প্রচলনে এবং পার্বণিক অনুষ্ঠানে উৎসাহী হয়ে ওঠে তেরো শতক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই। প্রথমে অলিখিত ধামালীরূপে তেরো চৌদ্দ শতকে কথকতায় এবং পরে লিখিত পাঁচালী মাধ্যমে পনেরো-আঠারো শতক অবধি দেশের সর্বত্র লৌকিক দেবতা-অপদেবতার প্রভাব ও প্রসার ঘটে লোকসমাজে। এঁরা পশ্চিম বঙ্গে নানা উপনামের চণ্ডী, শূন্য, ধর্মঠাকুর, বাসুলী, যক্ষ, ষষ্ঠী, শীতলা, ওলা, ক্ষেত্রপাল, যক্ষ এবং পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে পদ্মা বা মনসা এবং শিব-কালী-দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী, বসুমতী জগদ্ধাত্রী রূপে সর্বত্র পূজিত হতে থাকেন, এঁদের মধ্যে চণ্ডী, শিব-কালী-মনসা-ধর্মঠাকুর-ষষ্ঠী-শীতলার মাহাত্ম্যকথা পূর্ণাঙ্গ পাঁচালীরূপে রচিত হয়েছে বিভিন্ন শতকে। চৈতন্য চরিতকার বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে এ সময়কার মানুষের ধর্মজীবনের চিত্র বিধৃত রয়েছে। ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে/মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে/দম্ভকরি বিষহরী পূজে কোনজন/পুত্তলি করও কেহ দিয়া বহুধন/বাসুলী পূজ এ কেহ নানা উপচারে/মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।

এমনি করে যখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের দেব-দ্বিজ-বেদ মাহাত্ম্য অবহেলিত এবং শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা-পুরাণ গণজীবনলগ্নতা হারাচ্ছিল, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা স্বধর্মের আচারিক বিলুপ্তি এবং স্ব স্ব শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার ও অবস্থানের তথা সমাজসর্দারের ও নিয়ন্ত্রকের মর্যাদার বিপর্যয় আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে তাদেরই উচ্চারিত পাঁতি

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা বৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

—উপেক্ষা করে কিন্তু সামাজিক নিন্দা লাঞ্ছনা এড়ানো লক্ষ্যে বিধর্মী রাজশক্তির অনুমতির, নির্দেশের ও আগ্রহের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ্য রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবত বাঙলায় পাঁচালী আকারে প্রচার করতে থাকেন। ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস, কবিচন্দ্র মিশ্র ও কায়স্থ মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রমুখ পনেরো শতকের কবিগণ এবং এ সময়েই ধর্মান্তরে হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধ কল্পে, শাস্ত্রে ও সমাজে আনুগত্য দৃঢ় রাখার জন্যে স্মার্ত ও নৈয়ায়িকরা স্মৃতি-ন্যায়ের নতুন টীকা-ভাষ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রয়োজন মতো শাস্ত্রের, আচারের ও সমাজের নীতি-নিয়মের গ্রন্থি কোথাও শিথিল কোথাও দৃঢ় করে ইসলামের অভিঘাত ঠেকানোর মতো যুগোপযোগী করার চেষ্টা হল, এ সব করেও হয়তো ইসলামের প্রসার রোধ করা যেত না। চৈতন্যদেব উত্তর ভারতের সন্ত মতের আদলে বাঙলায় সূফীমত প্রভাবিত প্রেমবাদ প্রচার করতে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র পরিহার করলেন বটে (হেন মহাঠাকুরাণী ভাব যার মনে উপজয়/বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।) কিন্তু পরিণামে ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু সমাজ অটুট রইল। যেমনটি উনিশ শতকে রামমোহনের ব্রাহ্মমত খ্রীস্টান ধর্মের প্রসার রোধ করেছিল, রামকৃষ্ণের নিবর্ণ সেবাধর্ম ব্রাহ্মমতের প্রসার ঠেকিয়েছিল। ষোল শতকে চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য দ্বৈতা দ্বৈতবাদও তেমনি বাঙলায় ইসলামের বিস্তার চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

১০

চর্যাপদের ভাষা বাঙলা নয়—অর্বাচীন শৌরসেনী অবহট্ঠ।[৪৫] লিখিত বাঙলা রচনার শুরু তুর্কী আমলে—নতুন যুগে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজত্বের অবসানে। অবশ্য ছড়া-গান-গল্প-গাথার আকারে বাঙলায় অলিখিত রচনার উদ্ভব যে বাঙলা বুলির স্বরূপে স্বাতন্ত্র্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাপ্তির মুহূর্ত থেকেই, তার জন্যে সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না— কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের আর নিরক্ষর জনগণের বিশ্বাস-সংস্কারজাত লৌকিক ভূত-প্রেত-দেবতা-দানবের ইতিবৃত্তান্ত ও শক্তি-মাহাত্ম্যকথা বা স্তুতি-নিন্দা বিষয়ক রচনা দিয়েই সাহিত্যের শুরু, চণ্ডী, শিব, মনসা, রাধাকৃষ্ণ, ধর্মঠাকুর প্রভৃতির বৃত্তান্ত দিয়েই রচিত হয় পাঁচালী, তারপর ব্রাহ্মণ্য অবতার কাহিনী রাম ও কৃষ্ণ কথা–রামায়ণ ও মহাভারত–ভাগবত যুক্ত হয়। লক্ষণীয় যে হিন্দু রচিত এ সাহিত্যের ভাবে ও ভাষায় ইসলামের প্রভাব প্রকট।

যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় রয়েছে কয়েকটি আরবী ফারসী শব্দ এবং লীলা বা রস বিন্যাসে রয়েছে সূফী সাধনতন্ত্রের প্রভাব।[৪৬] চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর ও পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগর নারীদেবতা বিদ্বেষী ও একক (অদ্বৈত) পুরুষ দেবতা পূজক। বিপন্ন দুর্বলচিত্ত ধনপতি চণ্ডীপূজায় সহজেই রাজি হয়েছে বটে, কিন্তু চাঁদ নতি স্বীকার করছে এক অনন্য অসামান্য বালিকার কৃচ্ছ্র সাধনার ও সিদ্ধির কাছে, মনসার কাছে নয়। এ একান্তই ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।[৪৭] আর হরগৌরী, রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে বা পদে তো সূফীদের গজল-দিওয়ানের ও ভণিতার প্রভাবও অস্বীকার করা যাবে না।[৪৮]

১৫৭৫ সনের যুদ্ধে বাঙলা নামত মুঘল অধিকারে গেল বটে, কিন্তু দ্রোহী সামন্ত ভূঁইয়ারা ১৬১৭ সন অবধি গোটা বাঙলায় সর্বব্যাপী মুঘল শাসন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, ফলে অশাসনে দুঃশাসনে, দ্রোহে ও নৈরাজ্যে দেশের মানুষ জানে-মালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপর্যস্ত হয় আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। আর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত ঋদ্ধ বন্দর অঞ্চল বাঙলার অর্থ চলে যায় দিল্লীতে এবং এ সময় থেকে, বাঙলার বাণিজ্যে শুরু হয় য়ুরোপীয় বেণেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। অনক্ষর, অর্থে-সম্পদে নিঃস্ব বিপন্ন গণমানব মসজিদে-মন্দিরে আস্থা হারিয়ে বাঁচার গরজে নতুন এক দেবতার শরণ নেয়। জীবন-জীবিকার অভয়-আশ্রয় রূপে পীর-নারায়ণ সত্যের ও তাঁর অনুগত দেব-দেবীর আশ্রিত হল বিপন্ন হিন্দু-মুসলিম! 'হিন্দুর দেবতা হল মুসলমানের পীর/দুই কুলে সেবা লয় হইয়া জাহির।'

পীরনারায়ণ সত্যের চেলাদেবতা হচ্ছেন : ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়/বড় খাঁ গাজী, কুমীরদেবতা কালুরায়/কালুগাজী, বর্ণ দেবী বনবিবি/ওলাদেবী/ওলাবিবি প্রভৃতি অনেক। এ পীর-নারায়ণ 'সত্য'-আশ্রয়ী হিন্দু-মুসলিমের মানসিক, আচারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মিলন হয়েছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে। আর নামে হিন্দু বা মুসলিম হলেও অভিন্ন ছিল আধ্যাত্মিকভাবে ও জীবনযাত্রার বিভিন্ন গুরুবাদী বাউলরাও।[৪৯]

১১

লিখিত সাহিত্য তো শিক্ষিত লোকের সৃষ্ট ও পাঠ্য। সে যুগে শিক্ষা মানেই ছিল সংস্কৃত শিক্ষা। স্থানীয় ভাষা ছিল জমি পরিমাপের, টাকা-কড়ি হিসাবের প্রয়োজনীয় ভাষা মাত্র। হিন্দুদের সাহিত্য সৃষ্টি ও পাঠ ছিল সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ। তুর্কী শাসকরা প্রথমে দরবারী ফরমান অনুবাদসহ আরবীতে এবং পরে ফারসীতে প্রচার করতেন। কাজেই হিন্দুরাও ফারসী শিখছিল ব্রিটিশ আমলের ইংরেজীর মতোই। শিক্ষিত দেশী ও বিদেশী প্রশাসক মুসলিমরা সাহিত্যচর্চা করত ফারসীতে। বাঙলায় হিন্দুরা লিখত, পড়ত ও শুনত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবপাঁচালী, গাইত অবশ্য বাঙলাগীত। কেউ কেউ দরবারী প্রভাবে ফারসী ও (উর্দু-হিন্দি) হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও। কিন্তু তুর্কী-মুঘল শাসিত দেশজ মুসলিমরা ছিল শিক্ষার ঐতিহ্য ও আগ্রহহীন অজ্ঞ-অনক্ষর তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র পেশাজীবী প্রায়-অসচ্ছল মানুষ। এদের থেকে যারা সে-কালে পাঠশালায় বাঙলা মাধ্যমে ভাষা ও গণিত শিখেছে বৈষয়িক জীবনে অতি প্রয়োজনীয় বোধে, আর যারা মক্তবে দরাসে আরবী হরফে কোরআন পাঠ ও রোজা নামাজ প্রভৃতির আবশ্যিক নিয়ম-রীতি পদ্ধতি শিখেছে, তাদের কেউ কেউ মাদ্রাসায় শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কালে দরবারী ভাষা ফারসীও শিখত। বস্তুত মাদ্রাসায় কোরআন হাদিস পড়ানো হত কেতাবের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পার্শ্বোক্ত ফারসী টীকা ভাষ্যের সাহায্যে, অনেক পরে উনিশ শতক থেকে কেতাবের পাঠের পার্শ্বোক্ত টীকা-ভাষ্য-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উর্দুভাষাতেও চলত। কিন্তু ১৯২৫/৩০ সন অবধি ওই সব মাদ্রাসায় বাঙলা হরফেরও প্রবেশাধিকার ছিল না। সে জন্যে মাদ্রাসায় শিক্ষিত বাঙালী আলিম-মৌলবীদের বাঙলা বর্ণপরিচয়ও থাকত না বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি। এঁদের মাতৃভাষা তথা মুখের ভাষা প্রজন্মক্রমে অবশ্যই ছিল স্থানীয় বুলি। এঁদের কেউ কেউ (যেমন মৌলানা আকরম খান প্রমুখ) বাঙলায় স্বশিক্ষিত হতেন ব্যক্তিগত আগ্রহে ও চেষ্টায়, কেউ কেউ বাঙলায় সই করতেও শিখতেন।

এমনি অবস্থায় তুর্কী-মুঘল শাসিত আঠারো শতক-পূর্ব বাঙলায় বাঙলা ভাষায় মুসলিম রচিত সাহিত্য ছিল বিরলতায় দুর্লক্ষ্য ও দুর্লভ।

AMARBOI.COM

প্রায় নয়শ' বছর ধরে বিভাষী মঙ্গোল গোত্রীয় আরাকানরাজ শাসন করেছেন বাঙলার প্রান্তিক অঞ্চল চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরারাজ শাসন করেছেন কুমিল্লা-নোয়াখালী। এসব অঞ্চল ক্বচিৎ কখনো স্বল্পকালের জন্যে ক্ষণ-বিজয়ী গৌড়-সুলতানের অধীনে থাকত মধ্যযুগে। ১৬৬৬ সনেই কেবল শঙখ বা সঙ্খনদ অবধি উত্তর চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ সনে দক্ষিণ চট্টগ্রাম মুঘল শাসনে আসে। যুগীদিয়ারাজ ও ত্রিপুরারাজ, যথাক্রমে নোয়াখালী-কুমিল্লা তুর্কী-মুঘলের করদ রাজা হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেছেন। বাঙলার এ প্রত্যন্ত ভাগ বা ব্রিটিশ আমলের চট্টগ্রাম বিভাগও ছিল দেশজ মুসলিম অধ্যুষিত বটে, তবে বৃহৎবঙ্গ ও ভারতবিচ্ছিন্ন এ সব রাষ্ট্রের অধিবাসীরা মঙ্গোলগোত্রীয় বৌদ্ধ রাজার ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত বলে এবং সুপ্রাচীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (চট্টগ্রাম) বন্দর প্রভাবিত বলে স্থায়ীভাবে বর্ণে ও বর্গে বিন্যস্ত ভারতীয় সমাজের মতো অমানবিক আধিগ্রস্ত ছিল না, তারা মানুষের মহিমা ও মর্যাদা স্বীকার করত ঃ নর সে পরমদেব মন্ত্র তন্ত্র জ্ঞান /নর সে পরমদেব নর সে ঈশ্বর (কাজী দৌলত, সতীময়না-লোর-চন্দ্রাণী কাব্য)। বাঙলার তথা ভারতের সমাজ সংস্কৃতি শাসন বহির্ভূত ও বিচ্ছিন্ন হিন্দু-মুসলিমরা তাই এ অঞ্চলে স্ব স্ব ভাষা-শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও পরম্পরা সংরক্ষণের জন্যেই বিভাষী বৌদ্ধ মঙ্গোল রাজত্বে নিজেরাই শাস্ত্র ও সমাজ রক্ষণে নীতিশাস্ত্রে ঐতিহ্য রক্ষার এবং সাহিত্য সৃষ্টির, পুষ্টির ও নিত্য অনুশীলনের উদ্যোগ আয়োজন করেছে।[৫০]

১২

মুসলিম-রচিত সাহিত্যও মুখ্যত অনুবাদ। যথার্থ সাহিত্য শিল্পরস পরিবেশনই ছিল এঁদের প্রণয়োপাখ্যান অনুবাদের একমাত্র প্রেরণা। এঁরা প্রথমে উত্তর ভারতে প্রচল জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেম প্রতীক উপাখ্যান এবং পরে ফারসী প্রভাব প্রবল হলে ফারসী সূফীতত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীক প্রণয়োপাখ্যান নিছক ইহজাগতিক শারীর প্রেমকাহিনী হিসেবে পরিবেশন করেছেন। বাঙালী কবিদের অনুবাদ বলতে কোথাও কায়িক [লিটারেল] কোথাও ছায়িক [স্বাধীন অনুস্মৃতি] ও কোথাও ভাবিক [কেবল ভাবালম্বন] বুঝতে হবে। কাজেই বাঙলা ভাষায় বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চার প্রবর্তক হচ্ছে দেশী মুসলিমরা। পনেরো শতকের দেশজ মুসলিম বংশধর শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ইউসুফ জোলেখা [গিয়াসুদ্দীন আজম শাহর রাজত্বকালে ১৩৮৯-১৪১০ সনের মধ্যে রচিত রাজ-প্রশস্তি অনুসারে] প্রথম উপাখ্যান। ষোল শতকে রচিত হয় মুহম্মদ কবিরের মধুমালতি [১৫৫০ সনের মধ্যে রচিত, দ্বিজশ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর [১৫৩২-৩৩ সনে রচিত]। দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত লায়লী মজনু [১৫৩৫-৫৩ সনে রচিত]। সতেরো শতকে আরকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গ শহরে রচিত হয় কাজী দৌলতের সতী ময়না-লোর-চন্দ্রানী উপাখ্যান [১৬৩৮ সনে অসমাপ্ত রেখে কবির মৃত্যু], মাগন ঠাকুর রচিত উপাখ্যান চন্দ্রবতী [১৬৫৮ সনের পূর্বে রচিত] এবং আলাউল রচিত পদ্মাবতী, সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল, আনন্দ বর্মা-রতন কলিকা [কাজী দৌলত রচিত লোর-চন্দ্রানীর পরিসমাপ্তি অংশ], সপ্তপয়কর, সিকান্দররামা প্রভৃতি ১৬৫১ থেকে ১৬৭৩ সনের মধ্যে রচিত। রোসাঙ্গে রচিত আর এক কাব্যের নাম 'রেজওয়ান শাহ'। রচয়িতা শমসের আলি, সতেরো কিংবা উনিশ শতকের।

সতেরো শতকে সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, লালমোতি-সয়ফুল মুলুক প্রভৃতি অনুবাদ-অনুসৃতিমূলক উপাখ্যান রচয়িতা হচ্ছেন দোনাগাজী, আবদুল হাকিম, শরীফ শাহ, গেয়াস খান, মুহম্মদ আকবর, মঙ্গল চাঁদ প্রভৃতি।

আঠারো শতকের রোম্যান্স রচক হচ্ছে মুহম্মদ আলী রজা, পরাগল, মুহম্মদ আলী প্রভৃতি এবং আঠারো শতকে সুশীল মিশ্র, দ্বিজ পশুপতি, গোপীনাথ দাস, বাণীরাম দাস প্রভৃতি মুসলিম প্রভাবে রূপকথাভিত্তিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন।

প্রণয়োপাখ্যান রচকদের মধ্যে দৌলত উজির বাহরাম খান, কাজী দৌলত, আলাউল, দোনাগাজী এবং আবদুল হাকিম মধ্যযুগের প্রথম শ্রেণীর হিন্দু কবিদের তুল্য। আর আঠারো শতকের শেষার্ধে পলাশী-উত্তরকালে ১৭৬০ সনের পরে হাওড়া-হুগলী-কোলকাতা বন্দর এলাকার অধিবাসী বাঙলা-হিন্দুস্তানী মিশ্র বুলিভাষী ফকির গরীবুল্লাহ ইউসুফজোলেখা, সোনাভান, হোসেন মঙ্গল [জঙ্গনামা] মদনকামদেব কিস্‌সা [সত্যপীর মাহাত্ম্যকথা] আর আমীর হামজার দিগ্বিজয় কাহিনীর অংশবিশেষ রচনা করেন। আর সৈয়দ হামজা [জ. ১৭৩৩-মৃ. ১৮০৪ সনের পরে] রচনা করেন, মধুমালতী [১৭৮৮ সনে], আমীর হামজা [১৭৯৪ সনে], জৈগুন বিবির কেচ্ছা। [১৭৯৭ সনে]। বাংলা ও হিন্দুস্তানী [উর্দু-হিন্দি] মিশ্র ভাষায় ও শৈলীতে রচিত বলে এগুলোকে 'দোভাষী সাহিত্য' বলা হয়।

মুসলিমরা বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জঙ্গনামা নামে বিভিন্ন যুদ্ধ কাব্য রচনা করেন ষোল থেকে আঠারো শতক অবধি সৈয়দ সুলতান, জায়েন উদ্দীন, আবদুন নবী, গেয়াস খান, শেখ ফয়জুল্লাহ, নসরুল্লাহ খোন্দকার, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াত মাহমুদ, হামিদ প্রভৃতি। এসব যুদ্ধ কাব্যের মধ্যে মুহম্মদ খানের কারবালা বিষয়ক 'মকতুল হোসেন' [১৬৪৬ সনে রচিত] কাব্য কবিত্বে ও কারুণ্যে প্রথম শ্রেণীর রচনা। কলেবরে বিরাট হচ্ছে আবদুল নবী [১৬৮৫ সনে] রচিত 'আমীর হামজা' কাব্য। উক্ত কবি মুহম্মদ খান রচিত একমাত্র রূপক কাব্য 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ বা যুগ সম্বাদ' [১৬৩৫ সনে রচিত] নামের সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব বিষয়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থটি কবিত্বে, তত্ত্বে, তথ্যে এবং কাহিনীগত সৌন্দর্যে সত্যই উঁচুমানের, মাপের ও মাত্রার অনন্য কাব্য।

ষোল শতক থেকেই ধর্মসাহিত্য রচিত হচ্ছিল জনগণকে বাংলা ভাষায় ধর্মকথা জানানোর লক্ষ্যে। ষোল শতকের শেখ পরাণ, নেয়াজ, সতেরো শতকের মুত্তালিব, আশরাফ, আলাউল, মুজাম্মিল, আবদুল হাকিম, আঠারো শতকের সৈয়দ নুরুদ্দীন, নসরুল্লাহ খোন্দকার, আবদুল করিম খোন্দকার প্রভৃতি উল্লেখ্য। মুত্তালিবের কিফায়তুল মুসল্লিন, আলাউলের তোহফা এবং নসরুল্লাহর শরীয়তনামা তথ্যে তত্ত্বে ও বিন্যাসগুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্নোত্তরে জগৎ, জীবন, শাস্ত্র, নীতি, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকশিক্ষা দান লক্ষ্যে এক ধরনের গ্রন্থ রচিত হয়েছে সতেরো শতক থেকেই। রচকদের মধ্যে সতেরো শতকের আকিল, আঠারো শতকের শেখ সাদী, আলিরজা, এতিম আলম, সৈয়দ নুরুদ্দীন, সেবরাজ চৌধুরী প্রমুখ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। এর নাম রেখেছি 'সাওয়াল সাহিত্য'।

মুসলিমরা চৈতন্যচরিতের আদলে চরিত বা জীবনী সাহিত্যও রচনা করেছিলেন। ষোল শতকে সৈয়দ সুলতান আদমসৃষ্টি থেকে হজরত মুহম্মদ অবধি বিপুলকায় নবীবংশ [১৫৮৪-৮৬] এবং সতেরো শতকে শেখ চাঁদ প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরের 'রসুল চরিত' রচনা করেছিলেন। শেখ মনোহর নামের এক কবি আঠারো শতকের ফেনী অঞ্চলের বিদ্রোহী শাসক শমশের গাজীর কৃতি-কীর্তির ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন আঠারো শতকের প্রান্ত পর্বে।

সত্যপীর পাঁচালী রচনা করেছিলেন হুগলীর ফকির গরীবুল্লাহ এবং রংপুরের তাহির মাহমুদ আঠারো শতকে। উল্লেখ্য যে সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্যকথা রচনা করেছিলেন শতাধিক কবি দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হচ্ছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিমরা সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চা করতেন। বাঙলা ভাষায় 'রাগ-তালনামা' নামের সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করে তাঁরা তাঁদের সেক্যুলার জীবনদৃষ্টির ও সংস্কৃতিমানতার সাক্ষর রেখে গেছেন চিরকালের ইতিহাসে। অনেক রচয়িতার মধ্যে ফাজিল নাসির মুহম্মদের রাগমালা [১৭২৭ সনে রচিত] এবং আলিরজার [১৭৫৯–১৮৩৭] ধ্যানমালা শ্রেষ্ঠ। এসব সঙ্গীত গ্রন্থে উদ্ধৃত গান বা রাধা-কৃষ্ণ পদগুলোই মুসলিম কবির পদসাহিত্য ও চট্টগ্রামে হিন্দু কবি রচিত পদাবলী নামে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য এসব হিন্দু কবি রচিত রাধা-কৃষ্ণ পদগুলোও বৈষ্ণবতত্ত্বগর্ভ পদ নয়।

সর্বশেষে বাঙলা ভাষায় রচিত বাঙালী সূফীপন্থীদের রচিত সূফীতত্ত্ব গ্রন্থের উল্লেখ করছি। সূফীতত্ত্বের অবলম্বন হয়েছে বৌদ্ধ ও হিন্দু যোগ এবং আংশিকভাবে তন্ত্র। এগুলো একাধারে সূফী চর্যা, সাধন-পদ্ধতি, তত্ত্ব ও দার্শনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। সূফীমতও গুরুবাদী বা পীরনির্ভর সিদ্ধিপন্থা। ষোল শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষ বিজয়, সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান প্রদীপ', অজ্ঞাত কবির রচিত 'যোগকলন্দর', সতেরো শতকের শেখ চাঁদ রচিত 'হরগৌরী সম্বাদ' ও 'তালিব নামা', হাজী মুহম্মদের 'সুরতনামা', মীর মুহম্মদ সূফির 'নুরনামা', কাজী শেখ মুনসুর রচিত 'সির্নামা বা শ্রী, আলী রজা রচিত 'আগম ও জ্ঞান সাগর', শেখ জাহিদ রচিত 'আদ্য পরিচয়' প্রভৃতি। এদের মধ্যে তথ্যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বে উঁচু মানের দার্শনিকতায় গোরক্ষবিজয়, জ্ঞানপ্রদীপ, সুরতনামা, হরগৌরী সম্বাদ, জ্ঞানসাগর ও যোগকলন্দর শ্রেষ্ঠ।

শেখ ফয়জুল্লাহ 'গাজী বিজয়' নামে সেনানী–দরবেশ ইসমাইল গাজীর বৃত্তান্ত রচনা করে বাংলায় পীর পাঁচালী রচনার রেওয়াজ চালু করেন, পরে সত্যপীরাদি অনেক কাল্পনিক ও বাস্তবপীর চরিত গ্রন্থ বাংলায় রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মধ্যে আবদুল হাকিম ও শেখ মনোহর এবং হয়তো সৈয়দ নুরুদ্দীনও নোয়াখালী জিলার, শেখচাঁদ, মুহম্মদ আকবর, শেখ সাদী ও সেরবাজ চৌধুরী কুমিল্লা জিলার এবং হামিদ সম্ভবত সিলেটের আর তাহির মাহমুদ ও হায়াত মাহমুদ রংপুরের, অন্য সবাই চট্টগ্রামের।

যুগান্তর সম্ভব হয় চেতনার উন্মেষে। নতুন চেতনার উন্মেষ বিপরীত কিংবা উন্নতমানের চেতনার অভিঘাতেই সম্ভব। আমাদের দেশে সাড়ে সাতশোর্ধ্ব বছর আগে তা সম্ভব হয় তুর্কীবিজয়ের দরুন। শাসক-শাসিতের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী উপজাত হচ্ছে পরস্পরের ধর্ম, মনন ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে-পরিচয় সম্ভব হয়েছে পরস্পরের ভাষা জানাজানির ফলে। নইলে শুধু চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাতে কেউ কারো প্রভাবে পড়ে না। তার প্রমাণ তিনশ বছর ধরে য়ুরোপীয় বেনেরা ভারতে যাতায়াত করছিল কিন্তু তবু প্রতীচী আমাদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ভাষার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপ তার মন-মননের ঐশ্বর্যের দ্বার অবারিত করল আমাদের কাছে। আমাদের জীবনেও সে অমারজনীতে সূর্যোদয় ঘটল। আমাদের জীবনে ও মননে আকস্মিকভাবে ঘটল কালান্তর। তুর্কীর ধর্মের মননের ও সংস্কৃতির প্রভাবে যে নতুন চিন্তা চেতনার লাবণ্য এদেশে দেখা গেল, তাও ইংরেজ প্রভাবের মতোই ছিল ব্যাপক ও গভীর। ভক্তিবাদ-সন্তধর্ম-প্রেমবাদ তারই প্রসূন। তাতে বিজ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না বটে, কিন্তু উচ্চমার্গের তাত্ত্বিক চেতনা ছিল। তাতেও ছিল নতুন জ্ঞানের আলো– তার অবশ্য ঔজ্জ্বল্য ছিল না তেমন, তবে মানবতার ও সংবেদনশীলতার স্নিগ্ধতা ছিল। সেদিনও নির্জিত-নিপীড়িত-নির্বিত্ত নিম্নবর্ণের মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও দ্রোহের সাহস জেগেছিল, সেদিনও শঙ্করীয়-রামমোহনী কায়দায় ধর্মতত্ত্বে নতুন ব্যাখ্যা মিলেছিল— সমাজতত্ত্বে ফঁকির ফাঁক ধরা পড়েছিল। জন্মসূত্রে নয়, সামর্থ্য ও আত্মপ্রত্যয় সূত্রেই যে জীবন নিয়ন্ত্রিত, —সম্ভব হয়েছিল সে উপলব্ধিও। ফলে মানুষের জীবনে জীবিকায় উন্মুক্ত হল সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত। শাস্ত্রের জন্যে যে জীবন নয়-জীবনের জন্যেই শাস্ত্র তাও বোধগত হয়েছিল। আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের সাফল্য–সম্ভাবনার দিগন্ত যে অশেষ, তা দেব-দ্বিজ-বেদ জুজুর মিথ্যা ভয়-মুক্ত মানুষের কাছে আর অজানা রইল না। তুর্কী প্রভাবে দেশী মানুষের চিন্তা-চেতনায় যে বিপ্লব এল, তারই প্রসূন সন্তধর্ম, ভক্তধর্ম ও প্রেমধর্ম সেদিন ভারতে জীবন-জিজ্ঞাসায় ও জগৎ-ভাবনায় যুগান্তর ঘটিয়েছিল। ধর্মান্তরে, কর্মান্তরে, চিন্তাচেতনার রূপান্তরে সাহিত্যে-শিল্পে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে-সঙ্গীতে-শাস্ত্রে-পোশাকে-প্রশাসনে সর্বাত্মক পরিবর্তন এসেছিল, যেমনটি ঘটেছিল পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে। এ মানসমুক্তি স্বাতন্ত্র্যগর্বী অভিজাত উচ্চবিত্তের মধ্যে যত না ঘটেছিল, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি এসেছিল নিম্নবর্ণের ও বিত্তের লোকের মধ্যে। এই গণমানবই এ সময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে উন্মুখ ও উদ্যোগী হয়। তাই আমাদের সাহিত্যে-ভাস্কর্যে-সঙ্গীতে গেঁয়ো গণমানবের প্রভাবই দেখতে পাই। এ সাহিত্যে দৃষ্টি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি নতুন হওয়া সত্ত্বেও ভাব-ভাষা-বিষয়-রূপ-রস-নীতি-আদর্শ সবটাই স্থূল, অপরিস্রুত, আবর্তিত ও নিম্নমানের হওয়ার মূলে রয়েছে স্বল্পশিক্ষিত ও স্বল্পবিত্ত গেঁয়ো মানুষের পরিচর্যা।

আঠারো শতক অবধি বাঙলা সাহিত্যে এই চিন্তা-চেতনার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষণীয়। বিষয়গত আবর্তন-অনুবর্তন সত্ত্বেও মন-মানসের প্রসার ঐ সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য ছিল না। ফারসী ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। এমনি করেই ঘটে প্রাচীন যুগের মধ্যযুগে উত্তরণ-প্রাচীনতার সময়োপযোগী কালিক রূপান্তর। যদিও এ সাহিত্যে পরিস্রুত দরবারী জৌলুস ছিল দুর্লভ।

ইংরেজ প্রভাবে পরিবর্তন এসেছিল কেবল শহুরে মানুষের মনে ও আচরণে। কিন্তু তুর্কী-মুঘল প্রভাবে গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে সর্বত্র সমভাবেই গড়ে উঠেছিল শাস্ত্র আর সমাজের ভিত। এবং পরিণামে শাস্ত্র আর সমাজও ফাটলে-ভাঙনে হীনবল ও হৃতগৌরব হয়েছিল। তখনো অবশ্য বসনে-ভূষণে, আচার-আচরণে বাহ্য প্রভাবটা ব্রিটিশ আমলের মতোই গাঁয়ের চেয়ে শহর বন্দরে শিক্ষিত সমাজেই ছিল প্রকট।

তথ্য নির্দেশ

১. ক. Influence of Islam on India Culture, Dr. Tarachand, pp 111-20.
খ. বাঙলার নবজাগৃতি, ১ম সং, পৃ ১২১ – ২৪।
২. বাঙলার সূফী সাহিত্য, ১ম সং, আহমদ শরীফ।
৩. Tagore without Illusions, Hirendra Mitra, p-5.
৪. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য [শেখ শুভোদয়া], ১ম সং, আহমদ শরীফ, পৃ ১০৩ – ১৩।
৫. ক. History of Sufiism in Bengal, Muhammad Enamul Haq, Asiatic Socity Bangladesh, First Edition 1975.
খ. বঙ্গে সূফি প্রভাব, ১ম সং, ১৯৩৫ সন, মুহম্মদ এনামুল হক।
গ. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ১ম সং, ১৯৪৯ সন, মুহম্মদ এনামুল হক।
৬. Bengal : Past & Present, Vol. LXVII, SL. No. 130, 1948, pp 35 - 36.
৭. JASB, 1889, Vol. LVII, p.12 ff.
৮. JASB, 1896, (N. N. Basu). pp 36 - 37.
৯. Social History of the Muslims in Bengal down to 1538 A.D. Dr. A. Karim, p 87.
১০. JASB, 1896, pp 36 - 37
১১. ক. বঙ্গে সূফিপ্রভাব : পৃ ১৩২–৩৩।
খ. Distrct Gazetteers-Chittagong, 1908, p 56, Dinajpur, 1912, p 20.
গ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃ ২৩।
ঘ. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম।
ঙ. মকবুল হোসেন, লায়লী মজনু।
চ. Buddur Mokam, (M. S. Khan), JASP, 1962.
ছ. Social History of the Muslims in Bengal Down to 1538 A. D., Dr. A. Karim, pp 91-96.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. Mirat-Al-Asrar, D. U. Ms. No 16/AR/143/folio 19.
১৩. Akhbar-al-Akhyar, pp 44-45.
১৪ ক. Khurshidi-Jahan-Numa-llahi Buksh, JASB 1895.
খ. Sufiism and its Saints etc., J. A. Sobhan, p 331.
গ. Ta'dhkirat-l-Auliya-i-Hind, Mirza Muhammad Akhtar Dehlabi, p 56
ঘ. বঙ্গে সূফি প্রভাব, p 69.
ঙ. Afdalul Fawa'd-Amir Khasru, p47.
চ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮), সুখময় মুখোপাধ্যায়।
১৫. বঙ্গে সূফী প্রভাব, (১৯৩৫), পৃ ১৩৮।
১৬. District Gazetteer, Mymensingh : 1917, p 152.
১৭. History of Assam 1926, E. Gait, p 46 ff.
১৮. District Gazetteer, pabna : 1923, pp 121-26.
১৯. Sufiism and its Saints etc., J. A. Sobhan, p 236.
২০. ক. District Gazetteer, Bogra: 1910, pp 154-5
খ. JASB 1878, PP 92-23.

২১. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ ১৪০-১৪১।
২২. Ibn Battuta: Gibb.
২৩. ক. Hadith literature in India, Dr. M. Ishaque, pp 53-54.
খ. Islamic Culture, Vol. XXVII, No. I, Jan, 1953, p 10 Note 9.
গ. Social History of the Muslims in Bengal, Dr. A. Karim, pp 67-72.
২৪. Mirat-i-Madari, Abdur Rahaman Chisti A. H., 1064, MS. D. u. No. 217, [ডক্টর করিমের Social History -(৩) উদ্ধৃত, পৃ ১১৩]
২৫. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ ১১২-১৩।
২৬. ক. Memoirs of Gaud and Pandua, p 92.
খ. Sufism and its Saints etc., A. Sobhan (1938), pp 236-37.
২৭. Bengal past & present, Prof. S. Hasan Askari, 1948, p 36, note 13.
২৮. Social History of Bengal, Dr. A Rahim, p 72.
২৯. District Gazetteer, Hoogly, p 297 ff. pp 302-3.
৩০. Riyad-as-Salatin, Abdus Salam, pp 115-16.
৩১. ক. JASB, 1874, p 215 ff.
খ. Risalat-al-Shuhda.
গ. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, ১৩৬৭ সন।
৩২. JASB, 1872, pp 106-07, 1873, p 290.
৩৩. ক. Akhbar-al-Akhyar, p 173.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. Kazinat-al-Asfiya, Vol. I. p 399.

৩৪. JASB, 1904, No. 2, p 108 ff.

৩৫. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ ১৪৩–১৪৪।

৩৬. ক. Riyad-as-Salatin, Abdus Salam, pp 115-50.
খ. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ ৯৩-১১৯।

৩৭. Indian Muslims and Public Service 1871-1915, Zafrul Islam & Raymond L Jensen, JASP, Vol IX, No. I, June 1964, p 89.

৩৮. Origin of the Mussalmans of Bengal, 1895, Khandakar Fazle Rabbi.

৩৯. Nawab Bahadur Abdul Latif, Ed. by Dr. Enamul Haq, 1968, Dhaka. his writings & related documents.

৪০. The Indian Mussalmans-Are they bound in conscience to rebel against the Queen? 1871.

৪১. Historical Fragments of the Mughal Empire, Ed. by J. P. Guha, Delhi 1978, p 271.

৪২. ক. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, মুহম্মদ এনামুল হক, ১ম সং, ঢাকা ১৯৪৯ সন।
খ. আঠারো শতকের চট্টগ্রামে মুসলিমদের দেশজ আচার সংস্কার, আহমদ শরীফ, মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ, পৃ ২০–৩৪। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৫ সন।
গ. চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, আব্দুল হক চৌধুরী, বাঙলা একাডেমী ১৯৮৮ সন।

৪৩. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, আহমদ শরীফ, ১ম সং, ১৯৮৩ পৃ ১-১৩৯।

৪৪. তদেব।

৪৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৮৭ সন বাংলা সাহিত্যের সূচনাঃ চর্যাগীতি, পৃ ৪০২-৪৯।

৪৬. ক. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাবঃ মনীষা মঞ্জুষা, মুহম্মদ এনামুল হক, ১ম সং, পৃ ৪৮-৫৪।
খ. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১ম সং, ১৯৫৫ সন, পৃ ৫০-৫১।

৪৭. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্যঃ ১ম খণ্ড, আহমদ শরীফ।

৪৮. ক. বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম ও ২য় খণ্ড [প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ], ঢাকা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

৪৯. বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, আপোষমুখী সাহিত্যঃ পীরপাঁচালী ও সহজিয়া বাউলমত ও সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

৫০. ক. তদেব।
খ. সৈয়দ সুলতান, তাঁর যুগ ও গ্রন্থাবলী, পৃ ৩৮৪-৪৯৬, আহমদ শরীফ দ্রষ্টব্য এবং ১২ তম পর্বের জন্যে বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকৃত ইতিহাস পাঠ প্রসূত জাতিদ্বেষণার পরিণাম

ব্যক্তিগত জীবনে নানা দায়-দায়িত্বের চাপে, লাভ-লোভের বশে ভালমন্দ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, নীতি-নিয়ম জেনেও মানুষ অন্যায় আচরণ ও অপকর্ম করে। কাম-প্রেম-স্বার্থ বশে এবং জীবিকা ক্ষেত্রে সিদ্ধি-সাফল্য লক্ষ্যে মানুষ সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে দেশ-ভাষা-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-গোষ্ঠী নির্বিশেষে যে-কোন লোকের সঙ্গে জুটে যেতে মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করে না। আর অবসরে অন্যাসক্ত মনে মানুষ স্বদেশী, স্বগোত্রী, স্বভাষী, স্বধর্মী ও স্বশ্রেণীকে আপনভাবে এবং সব ভিন্ন দেশী-ভাষী-গোত্রী-গোষ্ঠী ও ধর্মী লোককে সে ঈর্ষা হিংসা ঘৃণা ও অবিশ্বাস করে– সম্ভাব্য শত্রু বলেও ভাবে। তাই তারা প্রতিবেশী হলেও পর, প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী। বিজাতি বিভাষী বিধর্মী বিশ্রেণী বিদেশীর প্রতি আশৈশব অপ্রেমের উৎপত্তি ঘটে এভাবেই।

বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত রক্ত-মাংসের মানুষ মানসিক প্রয়োজনবোধে কাউকে আঘাত দেয় কিংবা বৈষয়িক স্বার্থে কারো ক্ষতি করে। যে আঘাত দেয় অথবা ক্ষতি করে সে সিদ্ধি-সাফল্যের আনন্দে ও সুখে তৃপ্ত বলে তার কর্ম-আচরণ অন্য হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না সে কিংবা ভুলে যায়। কিন্তু যে আঘাত পায়, যার ক্ষতি হয়, সে তার ক্ষোভ-রোষ-বেদনা মনের গভীরে নিষ্ক্রিয়ভাবে হলেও পুষে রাখে, এমন কি প্রজন্মক্রমে শ্রুতিস্মৃতি মাধ্যমে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে। এবং জাগতিক নিয়মে চলমান জীবনে প্রতিপক্ষ থেকে সবল-দুর্বল সব মানুষই কোন না কোন ক্ষেত্রে আঘাত পায়ই– ক্ষতির কারণও হয় প্রতিপক্ষ। তাই অতীতে কিংবা বর্তমানে ক্ষতির কারণ না হলেও সম্ভাব্য শত্রুতার, প্রতিযোগিতার, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা ভিন্ন গোষ্ঠীর, গোত্রের, ধর্মের, বর্ণের, ভাষার ও ভিন্ন দেশের লোকের প্রতি মানুষ সন্দেহ ও অবিশ্বাস সচেতনভাবে পুষে রাখে।

সমস্বার্থে অপরের প্রতি বৈষয়িক জীবনে— এমন কি কামে-প্রেমেও আপাত আস্থা রাখলেও প্রত্যেক ঈহাসম্পন্ন জিগীষু প্রতিষ্ঠাকামী মানুষই প্রতি দ্বিতীয়ব্যক্তিকে শত্রু, প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে, অন্তত পরিচিত প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষায় হিংসায় ঘৃণায় ভোগে। জীবনযাত্রার চলমানতার উৎস ও ভিত্তি এমনি আধিগ্রস্ত বিকৃত মানসিকতা বলেই মানবসমাজ চিরদ্বন্দ্বমুখর, বিঘ্নসংকুল, বিশৃঙ্খল ও দ্রোহবহুল। নীতিশাস্ত্রিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যা-ই থাক, বাস্তবে শাসক-শাসিত চিরকালই দুটো আলাদা জাত বা শ্রেণী। সম্পর্কটা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে শোষক-শোষিতের, পীড়ক-পীড়িতের, শাসক-শাসিতের, দাতা-গ্রহীতার, পূজ্য-পূজারীর, পালক-পালিতের, পোষাক-পোষিতের, সেবিত-সেবকের, প্রভু-ভৃত্যের ও মান্য-অনুগতের। এমন কি চীনে-রাশিয়ায়ও সম্পর্কটা সাধারণের অনুভবে শাসক-শাসিতের, পীড়ক-পীড়িতের। তাই শাসকের কর্ম-আচরণ ও বিধিনিষেধ অনেক ক্ষেত্রেই শাসিতের ক্ষোভের, ক্রোধের ও বেদনার যৌক্তিক কিংবা আবেগনজাত কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শাসক-শাসিতের সম্পর্কটা কখনো শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালোবাসার হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এযুগের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দলগত দ্বন্দ্ব স্মর্তব্য। বিরোধী দল সরকারের কেবল অপকর্মই দেখে, তেমনি বিধর্মীর ও বিদেশীর শাসন সম্বন্ধে থাকত প্রজার সর্বপ্রকার অসন্তোষ ও ক্ষোভ।

শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ও পরিচিতি যখন হয় বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী বিশ্রেণী চেতনা-ভিত্তিক, তখন শাসিতের মনে প্রজন্মক্রমে অতীত বঞ্চনা-দুঃশাসন বর্তমানেও অবিমোচ্য হয়ে দগদগে ক্ষতের মতো বিরাজ করে। আর স্বদেশী স্বজাতি-স্বধর্মী স্বভাষীর হলে তা নিষ্প্রাণ নিষ্ক্রিয় স্মৃতিমাত্র হয়ে পড়ে থাকে, ক্ষোভ-ক্রোধ-যন্ত্রণা থাকে না সে-স্মৃতিতে।

বিভিন্ন গোষ্ঠী-গোত্র-জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষার লোক অধ্যুষিত দেশে ও রাজ্যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্বগোষ্ঠী স্বগোত্রী স্বধর্মী শাসকের জ্ঞাতিত্বগর্বীরা দুই দুর্জন দুঃশাসকের অতীত শোষণ-পীড়নকে ক্ষমার চোখে দেখে। ভাবে, কিছু অসংযত অবিবেচক মানুষ নির্মম দানব স্বভাবের হয়ই। সে দুঃশাসক ব্যক্তিমানুষের জন্যে নিন্দা ঘৃণা মনের কোণে সঞ্চিত রেখেই গোত্রীয় বা জাতীয় চেতনার উৎস ও আকর হিসেবে জাতীয় ইতিহাসকে অবলম্বন করে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত থাকতে চায় এক একটি গোষ্ঠীর, গোত্রের, ভাষার, ধর্মের ও দেশের মানুষ। যেমন তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ আমলপূর্ব ভারত ইতিহাস হিন্দুর এবং তুর্কী-মুঘল আমল মুসলিমের গৌরব-গর্বের অবলম্বন। যেসব দেশে প্রায় সব অধিবাসীই একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেছে, যেমন মিশরে ইরাকে ইরানে আরবে মধ্য এশিয়ায় য়ুরোপে তারা অভিন্ন ঐতিহ্যে বা পরম্পরায় আশৈশব মানস-লালন পেয়ে দেশের ও পূর্বপুরুষের ইতিহাসকে ধর্ম ও আচার ভেদ সত্ত্বেও, নিজেদের বলে মনে মননে বরণ করে তাকে নিজেদের পরিচিতির অভিন্ন গৌরব-লজ্জার অবলম্বন রূপে স্বীকার করে নিয়েছে। সেখানে ইতিহাস সমকালের জাতিক বা সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ হয়ে থাকেনি।

খ্রীস্টপূর্বকালে বহু শতাব্দী ধরে পাঞ্জাব অবধি ভারত শাসন করেছে পার্সীরা বা ইরানীরা এবং পরে গ্রীকরা। প্রায় গোটা উত্তর ভারতে হামলা-হুকুম চালিয়েছে কালক্রমে শক-হুন-পার্থিয়ানরা। ইতিহাসরিক্ত কালের ভারতে তাদের সু-কু কোন কৃতি-কীর্তিই আমাদের অধিগত নয়। তাই তারাও স্বাতন্ত্র্যে অনুপস্থিত বলে তারা আমাদের দ্বেষ-ঘৃণায় ক্ষোভ-রোষের কারণ হয়ে থাকেনি। আস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গল কিরাতের দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্তও হাতে নেই বলে এবং বৌদ্ধবিলুপ্তির ও জৈনদের সংখ্যাল্পতার দরুন জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বহুশতক ব্যাপী দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষেও আমরা গুরুত্ব দিই না। কেননা শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-সংস্কৃতির ভিন্নতা এবং গৌত্রিক, ভাষিক ও অবস্থানগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে সতেরো শতক থেকেই 'হিন্দু' অভিধায় সব অখ্রিষ্টান অমুসলিমই চিহ্নিত ও পরিচিত হয়ে আসছে, ব্রিটিশ আমলে এটিই জাতিচেতনার ও জাতীয়তার ভিত্তি হয়ে যায়। অধিজনের মান্য বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তাদের শাস্ত্র-সংস্কৃতির উৎস বলে জানে ও মানে প্রায় সবাই।

পার্সীরা প্রান্তিক অবস্থানে সংখ্যাল্প হওয়ায়, দেশজ খ্রীস্টানরা সংখ্যায় কম হওয়ায় বিশাল ভারতে বিত্ত-বেসাতের ও রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দুর পক্ষে তারা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের ভারতের নগণ্যসংখ্যক মুসলিম আরব-ইরানী-তুর্কী-মুঘল রক্তজ বটে, কিন্তু আর সব মুসলিমই দেশজ তথা ভারতের জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দুর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বংশধর। তারা পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ভুলে এবং সংস্কৃতি পরিহার করে আরব-ইরানমুখী হয় স্বমতে নিষ্ঠ থাকার লক্ষ্যে এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজে। কিন্তু অর্থে বিত্তে বেসাতে ও জনসংখ্যায় উপেক্ষণীয় না হওয়ায়, দেশের সর্বত্র মুসলিমরা আর্থিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী হওয়ায় ব্রিটিশ শাসনে হিন্দু-মুসলিম দ্বেষ-দ্বন্দ্ব মুখ্য সমস্যা হয়ে ওঠে। ভারতে মুসলিমদের উপস্থিতি ইতিহাসগত হওয়ায় তাদের সুনির্দিষ্ট শাস্ত্র ও বিশিষ্ট সংস্কৃতি থাকায়, তাদের স্বাতন্ত্র্য রইল অবিলুপ্ত, তাদের কর্ম-আচরণ রইল লিখিতভাবে ও শ্রুতিস্মৃতিতে প্রচল। তার সঙ্গে রইল অনেক বানানো রটানো শ্রুতিকটু জালাধরা কিসসাও।

ফলে ভারতে তুর্কী-মুঘল শাসন তার ভালো মন্দ নিয়েই হল ভারতের মুসলিমদের গৌরব-গর্বের উৎস আর বিধর্মী প্রজার চোখে হল শোষণের, পীড়নের এবং বর্বরতার ও দুঃশাসনের দৃষ্টান্ত।

যে কোন দেশের, জাতির বা বংশের রাজাদের কেউ কেউ প্রবৃত্তিতাড়িত দুষ্ট দুর্জন দুঃশাসক থাকেই। ব্যক্তি হিসেবেই মানুষের নিন্দা ঘৃণা তার প্রাপ্য অবশ্যই। কিন্তু দুষ্ট দুর্জন দুঃশাসক কোন রাজার বা প্রশাসকের দুষ্কৃতি-দুঃশাসনের জন্যে জাত তুলে নিন্দা করা মূঢ় অবিবেচকের কাজ। যে-মনস্তাত্ত্বিক কারণে মায়ের মারের চেয়ে সৎমায়ের মৃদু তিরস্কারও মর্মভেদী, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও স্বজাতি-বিজাতি চেতনা তেমনি দৃষ্টিভেদ ঘটায়।

AMARBOI.COM

ভারতের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ইতিবৃত্তের নামে এ বীজ ছড়িয়েছেন সামাজিক স্বার্থে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা আর বিধর্মী বিভাষী বিদেশী শাসনে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হিন্দু ইতিহাসকাররা সযত্ন অনুশীলনে তা অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফলবন্ত করেছেন। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের দুইরূপ ঃ মধ্যযুগে ও একালে মুসলিম লিখিত এবং ব্রিটিশ ও হিন্দু লিখিত।

মধ্যযুগের ইতিহাসকারেরা ব্যক্তি শাসকের নীতি-নিয়মে, কর্মে-আচরণে ও চরিত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন, এঁদের রচিত ইতিহাসে পৌত্তলিক প্রজা হিন্দুর প্রতি অবজ্ঞা বেশি, বিদ্বেষ কম। এ কালের মুসলিম লেখকরাও তা কম বেশি অনুসরণ করেছেন। ব্রিটিশ ও হিন্দু লেখকরা জাতিগত চরিত্রে গুরুত্ব দিয়ে ছিদ্রান্বেষণে ছিলেন যত্নবান। কাজেই এঁদের রচিত ইতিহাস পাঠান্তে তুর্কী-মুঘল শাসন বিধর্মী পাঠকমনে সামগ্রিকভাবে এবং সাধারণভাবে ক্ষোভ ক্রোধ ও ঘৃণা, এমন কি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগায়। এঁদের লিখিত ইতিহাসে শাসক মুসলিমদের কুৎসা বেশি বর্ণিত। তাদের প্রতি অভিযোগও অনেক, ক্ষোভ বিদ্বেষও তীব্র। যদিও অমাবস্যার শ্রাবণ আকাশে ক্ষণপ্রভার মতো দু'একজন সুশাসকের সাক্ষাৎও মেলে। অথচ এর ফলে দেশে গত দুশো বছরে অনেক অপূরণীয় ক্ষয় ক্ষতি ও অনর্থপাত ঘটেছে। জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষায় গুরুত্ব না দিয়ে ভালো-মন্দ-মাঝারি রূপে চিহ্নিত করে স্বৈর-শাসনের সে যুগের শাসক-প্রশাসকদের সু-কু কৃতি-কীর্তি-আচরণের মূল্যায়নমুখী হলে ইতিহাস লেখকগণ ভিন্ন দৃষ্টি ও ভিন্ন সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা পেতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষণ-পীড়ন-দলন-দমনের কথাই যদি বলি, কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ গোত্রে কোন্ মানুষে তা ছিল না? ক্ষমতা ও জুলুম হচ্ছে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের। তাই প্রবল মাত্রেই কম-বেশি দুর্জন। প্রয়োজনের ও প্রবৃত্তির মাত্রানুসারে সে দুর্বলের উপর হুকুম হুমকি হামলা চালায়। সুযোগ সুবিধে মতো প্রবল দুর্বলের জান-মাল-গর্দান নেয়। জাত-ধর্মের মিল বা ভেদ মানে না। কেড়ে মেরে হেনে খাওয়ার ও পাওয়ার লোভ মানুষের প্রাণীসুলভ স্বভাব। দাস-ভৃত্য-স্ত্রীর উপর কম-বেশি অত্যাচার কবে কোন্ দেশে কোন্ সমাজে হয়নি? আজো কি হয় না? দেশ-কাল শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি প্রভাবিত জীবনদৃষ্টি, ন্যায়বুদ্ধি, শ্রেয়োবোধ দেশ-কাল-শাস্ত্রভেদে মাপে মানে মাত্রায় ভিন্ন হয়ই। এমন কি আপন-পর ভেদে বিচার-বিবেচনার প্রয়োগেও পার্থক্য ঘটে, ঘটত। কেবল কি রাজাই অত্যাচার করত, পরিবারপ্রধান, গোত্রপ্রাধান, সমাজসর্দার, শাস্ত্রপতি, জমিদার-মহাজন শাসন পালন-পোষণের নামে শোষণ-পীড়ন-দলন-দমন কি করেনি? সে-যুগের নীতি ছিল জোর যার মুলুক তার। নীলকরেরা জোর জুলুম গুম খুন শোষণ পীড়ন যা কিছুর জন্যে আমাদের ঘৃণার পাত্র, তা আমাদের দেশী জমিদারের অনুকরণেই করেছে, একটুও বেশি করেনি, অথচ বিদেশী বলেই ওদের নিন্দায় আমরা আজো মুখর আর জমিদারের নিন্দায় অনীহ। দেশের ও গোত্রের ভুল ও অপব্যাখ্যাত বিকৃত ইতিহাস পড়ে আমরা কেন আমাদের বর্তমান জীবনপ্রতিবেশকে বিষাক্ত-বিনষ্ট করব! জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষার প্রভেদ তুচ্ছ জেনে ও মেনে সমকালে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় স্বদেশে সহাবস্থানের অঙ্গীকারে রাজি থাকাই হিতবুদ্ধির পরিচায়ক।

স্বাধীনতা-উত্তর সেক্যুলার ভারতরাষ্ট্রে এবং অন্যত্রও ইতিহাসকাররা অনেক বেশি সত্যসন্ধ, অনুপুঙ্খ তথ্যনিষ্ঠ আর দেশ-কাল-শাস্ত্র-সমাজ সচেতন এবং মানুষের কর্মাচরণের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য ও প্রাতিবেশিক প্রয়োজন প্রভৃতিরও চারিত্র নিরূপণে বিবেচনা আবশ্যিক বলে জানেন ও মানেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ইতিহাসপাঠের প্রভাব উপমহাদেশে গোষ্ঠী-গোত্র-সম্প্রদায়গত দ্বেষণার ও দাঙ্গার অবসান ঘটাবে এবং কালিক প্রয়োজনে শোষক-শোষিতের বঞ্চক-বঞ্চিতের শ্রেণীগত দ্বেষণা ও লড়াই-ই কেবল বৃদ্ধি করবে গণমুক্তি লক্ষ্যে।

AMARBOI.COM

মহামানব নয়-ভালো মানুষ চাই

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীরা স্ব স্ব জীবনের ও খাদ্যের অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশে বাস করে। ওরা সহজাত প্রবৃত্তি চালিত এবং প্রকৃতি লালিত। সব প্রজাতির প্রাণীর জীবনেই হয়তো আকস্মিক উপদ্রব নেমে আসে কখনো, জীবন হয় সময়ে সময়ে বিপন্ন। প্রাণহানিও ঘটে। এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির অরিও। তবু গা-পা বাঁচিয়ে সতর্কভাবে বেঁচে থাকা জলে-স্থলে-আকাশে সম্ভব।

কিন্তু মানুষ যে কেবল নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাড়াকাড়ি মারামারি করেই বাঁচতে অভ্যস্ত তা-ই নয়, লোকালয়ে মশা-মাছি পোকা-মাকড়-কীট-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতঙ্গ থেকে বড় ছোট-মাঝারি কোন প্রাণীরই জীবন মানুষের হাতে-কাছে-পাশে নিরাপদ নয়। আবয়বিক কারণে মানুষ হাতিয়ার প্রয়োগে ভাঙতে, গড়তে ও সঞ্চয় করতে পারে। খাদ্যের জন্যে সার্বক্ষণিক প্রয়াসের ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না তার। যদিও জীবন-জীবিকা দলগত ও সমবেত শ্রম, বুদ্ধি ও প্রয়াস এবং আবিষ্কার উদ্ভাবন নির্ভর, তবু সুযোগসুবিধে মতো লোভী ও লুব্ধ প্রবল মানুষ স্বজনকে ও দুর্বলকে বঞ্চিত করে সর্বপ্রকার সম্পদ আত্মসাৎ করতে প্রায় আবাল্য অভ্যস্ত হয়। দেহে ক্ষীণ, বুদ্ধিতে হীন মাত্রই প্রবল বুদ্ধিমানের জুলুমের শিকার। জনে-জনে, পরিবারে-পরিবারে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, গোত্রে গোত্রে, দেশে দেশে, জাতিতে-জাতিতে, বর্ণে-বর্ণে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অবিরাম অনবরত চলছে এ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, কাড়াকাড়ি, মারামারি। সবাই জিগীষু, সবাই প্রাপ্তিকামী ও প্রভুত্ব-লিপ্সু। যে দেহে ক্ষীণ আর বুদ্ধিতে হীন সে সবারই অবজ্ঞেয় ও পরিহাসপাত্র। তার উপর অকারণেও হুকুম-হুমকি-হামলা চালানো, তাকে প্রতারণায় বঞ্চিত করা, তার উপর জুলুম করে আনন্দ পাওয়া ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে উত্তমের আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেন প্রবল বুদ্ধিমান সাহসী মানুষের স্বভাবই।

এভাবে কিছু মানুষকে ছলে বলে অর্থে বিত্তে হাতে রেখে এক একজন সাহসী বুদ্ধিমান লোক লক্ষ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা, মন-বুদ্ধি, শ্রম-সাহস নিয়ন্ত্রণ করত। কোটি কোটি অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন শ্রমজীবী নিয়তিবাদী মানুষ গৃহপালিত পশুর মতো, পোষমানা পালে চরা গরু ভেড়ার মতো অনুগত থাকত। তবু তারা শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা মুক্ত ছিল না।

কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। তাই ওই নিঃস্ব নিপীড়িত অজ্ঞ অনক্ষর ধনে-মনে কাঙাল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা-অসূয়া দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত ছিল বেশি। ওই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যতো প্রভুমানা অনুগত মানুষ মেলে, স্বজন-স্বগোত্রপ্রাণ ততো মেলে না আজো। দারিদ্র্য মানুষের সর্বপ্রকার মানবিক গুণ বিকৃত ও বিনষ্ট করে।

দ্বন্দ্বদুষ্ট, অশান্তিক্লিষ্ট দলে বা সমাজে তাই সহাবস্থানের অবশ্যমান্য শর্তগুলো পরিবারে গোষ্ঠীতে গোত্রে ও দেশে দেশে কালে কালে প্রচার করতে থাকেন মানবহিতৈষী শান্তিকামী শ্রদ্ধাস্পদ মহাপুরুষ নামের যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনানিষ্ঠ গুণী-জ্ঞানীরা। তাঁদের স্বস্থানের ও স্বকালের মুগ্ধ অনুরাগী-অনুগতরা হয়তো নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর উচ্চারিত ও নির্দেশিত নীতি-নিয়ম মেনে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে আগ্রহী হয়। কিন্তু কালপ্রবাহে তাঁদের সে আগ্রহের ও আবেগের তীব্রতা কমে যায় এবং কালান্তরে ও প্রজন্মক্রমে তা শ্রুতিস্মৃতিগত তাৎপর্যহীন, আচার-আচরণহৃত নিষ্ক্রিয় বিশ্বাসে ও সুপ্ত সংস্কারে অবসিত হয়। সমাজে শান্তিতে সহাবস্থানের পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে উচ্চারিত মহাপুরুষ-মনীষী নেতা-নায়কদের বাণী, মহৎকথা, তত্ত্বকথা, নীতিকথা, কর্ম-আচরণ সম্পৃক্ত 'দেশনা' কেতাবভুক্ত থাকলেও, মোল্লা-পুরোত-রাব্বী-ভিক্ষু-পাদরীর পার্বণিক উচ্চারণে শ্রোত্ররসায়ন হলেও তা কখনো সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্মে আচরণে বাস্তব রূপ পায়নি, পাবে না। শাস্ত্র তাই কালান্তরে, স্থানান্তরে প্রজন্মক্রমে কখনো কারো কোন উপকারে আসেনি। দ্বন্দ্বসংঘাতই ঘটিয়েছে বেশি-সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় নির্বিশেষ মানুষের সহাবস্থান সম্ভব করেনি।

মানতেই হবে নবী-অবতার-সাধু-সন্ত-দরবেশ-জ্ঞানী-গুণী-সমাজনায়কদের উচ্চারিত বাণীর, কর্মের, আচরণের ও নির্দেশিত নীতি-নিয়মের প্রভাবে, আনুগত্যে ও অনুসৃতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালীন সমাজ-উদ্ভূত স্থানীয় মানবসমস্যার সমাধান সাময়িকভাবে অবশ্যই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মহামানবেরা চিরস্মরণীয় থাকার আকাঙ্ক্ষাবশে তাঁদের উচ্চারিত বাণীর অমোঘ সত্যতার, নির্দেশিত নীতি-নিয়মের সর্বকালীনতার ও সর্বস্থানিকতার আর মানবিক জীবনযাত্রার চাহিদা পূর্তির অপরিবর্তনীয় চিরন্তনতার ও যাথার্থ্যের দাবিদার হয়ে এবং অনুরক্তদের মনেও শ্রুতি-স্মৃতি মাধ্যমে যে বিশ্বাস-সংস্কার প্রজন্মক্রমে সঞ্চারিত করে গোত্রে গোত্রে, শাস্ত্রে-শাস্ত্রে, জাতিতে-জাতিতে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব হানাহানি জাগিয়ে রেখেছেন। গড্ডলস্বভাবদুষ্ট এ মানুষও প্রাকৃতিকভাবেই গতি-তাড়িত হয়েও, অবচেতনভাবে পরিবর্তনপ্রবাহে ভাসমান থেকেও চিরস্থিরত্বে ও চির-অক্ষয়তায় আস্থাবান। এরা সনাতনী।

এদের শাস্ত্রে নিবদ্ধ মহৎ বাণীগুলো বাস্তবে ধরা বোঝার বাইরে হাওয়া হয়ে ভাসে। শাস্ত্র হচ্ছে কার্যত বিধি-নিষেধের সমষ্টি ও আকর। ওই আচরণ বিধি নিষেধ মানা-না-মানার উপর নির্ভর করে স্বর্গবাস ও সর্বনাশ। তাই শাস্ত্রমানা মানুষ উদারতার অনুশীলনও করতে পারে না। তার মূল কারণ, যাঁরা তাঁদের জীবনদর্শন, জীবন ও জগৎ চেতনা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-সত্য লাভ করেছেন অরণ্য-পর্বতের নির্জনতায়, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে এক অদৃশ্য অলৌকিক স্বয়ম্ভূশক্তি পরমের কৃপায়। কাজেই তাঁদের জীবনদর্শনটি মূলে অপার্থিব উৎসসম্ভূত তথা বিশ্বাসসঞ্জাত, যুক্তি-বুদ্ধি প্রসূত নয়। তাই স্থান-কালের প্রয়োজনে এঁরা মত-পথ পরিবর্তনের কথা ভাবাই সর্বনাশক পাপ বলে জানে ও মানে।

তাই আজকের যুক্তিবুদ্ধিবাদী বিবেকবান মানুষ মহাপুরুষ ও মহাবাণী বিমুখ, শাস্ত্রভীরু। তাই আজ "মহামানববাদে" আস্থা ক্ষীণ। মহাপুরুষের শাস্ত্র বিভিন্ন মতের মানুষে-মানুষে বিচ্ছেদের, ব্যবধানের, দ্বেষের ও দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে রয়েছে। মহাপুরুষ নির্দেশিত নীতি-নিয়মও কালিক ও স্থানিক সামঞ্জস্যরিক্ত ও সঙ্গতিহৃত। ফলে তা তাৎপর্যহীন আচার-সংস্কার মাত্র। তাই মহাপুরুষ-উচ্চারিত সত্য ও ন্যায় আপেক্ষিক চেতনাজাত। মানবপ্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, অহিংসা, করুণা, মৈত্রী, দান-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতির উপযোগও শর্তসাপেক্ষ মাত্র, তথা স্থানিক-কালিক-ব্যক্তিক ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রয়োজন-নিরপেক্ষ নয়। তাই শাস্ত্র, আপ্তবাক্য, সুভাষণ, প্রবাদ, প্রবচন, বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণ, নীতি-নিয়ম, সত্যচেতনা ও ন্যায়বোধ মানববুদ্ধির বিকাশের এবং উৎপাদনব্যবস্থার ও হাতিয়ারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সামর্থ্যের ও সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কাজেই পুরোনো কিছুই নতুন দিনের নতুন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা মেটাতে পারেনি, পারে না এবং পারবে না। বিশেষত মহৎকথা, সূক্ষ্ম-দার্শনিকতত্ত্ব, প্রীতি-ক্ষমার আদর্শ আটপৌরে জীবনে চিরকালই ছিল অকেজো ও উপেক্ষিত। আধ্যাত্মিকতা মাত্রেরই উদ্ভব, স্থিতি ও প্রসার কল্পনায়, বিশ্বাসে, ভয়ে ও ভাবনায়। ওটা ম্যাজিক (Magic) আর ঐতিহ্যিক জীবনাচারের নিয়ামক হচ্ছে লজিক, ম্যাজিকের কাল অপগত। লজিকের দিন সমাগত। তাই বিশ্বাস নয়, যুক্তিই হবে বাঞ্ছিত জীবনাচারের দিশারী ও নিয়ামক।

তা ছাড়া আমাদের জানা ও মানা উচিত যে কোন মহৎ অলৌকিক পূত পবিত্র আসমানী তথ্য, তত্ত্ব, বাণী কিংবা 'দেশনা' আজকের মানুষকে তুষ্ট, তৃপ্ত কিংবা অনুগত পোষমানা প্রাণী করে রাখতে পারবে না। কেননা এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে সংহত ও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুদ্রীভূত পৃথিবীতে সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে মানুষ হচ্ছে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিচারশীল যুক্তিবাদী। তাই ভূতে-ভগবানে, নিয়মে-নিয়তিতে, নীতি-রীতিতে, পাপ-পুণ্যে, দয়া-দাক্ষিণ্যে মানুষের আস্থা কার্যত বিলীয়মান। মানুষ আস্তিক বটে, তবে বেদে-বাইবেলে কোরআনে-পুরাণে তাদের ভয়-ভক্তি পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয়। বাস্তবে শক্তি-সাহস ও আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের ধর্মবুদ্ধি জীবনে আকাঙ্ক্ষা-পূর্তি, ক্ষতি ঠেকানো ও রোগ-মৃত্যু এড়ানো লক্ষ্যে নিয়োজিত। অন্যকথায় মানুষের ধর্মাচরণ ক্ষয়-ক্ষতি ভীরুতা জড়িত এবং কাঙ্ক্ষাপূর্তি বা প্রাপ্তিলোভ প্রসূত ভয়-ভরসা সম্পৃক্ত হয়েই অভিব্যক্তি পায়। তাই মোক্ষ, নির্বাণ বা স্বর্গ নয় তাদের লক্ষ্য। কাজেই মানতে-পূজায়-সিরনিতে, সন্ত-দরবেশের আশীর্বাদে, সাধু-সন্ন্যাসী যোগী-ভিক্ষু-শ্রমণ-শ্রাবকের মন্ত্রে-মাদুলীতে-তাবিজে-কবচে, তুকে-তাকে, ঝাড়ে-ফুঁকে, বাণে–উচ্চাটনে, তীর্থে-দরগায় ওই যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞান প্রজ্ঞাহীন ভীরু-ভিখারী মানুষের ভরসা। তাদের ধর্মভাবের ও ধর্মাচারের অবলম্বন ও অভিব্যক্তি এতেই সীমিত। এ ধরনের মানুষ ধার্মিক নয়, ধর্মভীরু। এরা সমাজের সম্পদ নয়-দায়। এরা সৎও নয়, শঠ-স্বার্থপর, আত্মরতিই এদের জীবনে পুঁজি-পাথেয়-প্রেরণা। আর আপাত নিরীহ হলেও সমাজের বোঝা। অনুন্নত সমাজে এদের সংখ্যাই বেশি। তাই ব্যবহারিক ও মানসিক সর্বপ্রকার বিকাশ ও উন্নয়ন মুখ্যত এদের জন্যেই হয় মন্থর। কেননা ক্ষীণজীবনদৃষ্টির এ মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ও কিছুকে দেখে না, তাই পরার্থে এরা কিছু ভাবতেই পারে না। এরা প্রাণী মাত্র।

এদের কেউ কেউ ক্ষুধায় ও বিক্রমে বাঘ, পরসম্পদ কাড়তে, ভিন্ন গোত্রের ঘাড় ভাঙতে, পররাজ্য গ্রাস করতে এ মানুষ সদা উন্মুখ। আর অন্যরা লোভে হায়েনা, সেবায়-সান্নিধ্যে প্রভুর সারমেয়, স্তাবকতায় ফেরু, চিন্তা চেতনায় গড্ডল, অনুকরণে পবননন্দন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জগতের কবি-দার্শনিক-মনীষীরা সাধারণভাবে (ব্যতিক্রম ক্বচিৎ কেউ) আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিরদাঁড়া সোজা রেখে তরু হতে চাননি, শাহ-সামন্ত-সর্দার-সরকার প্রভৃতি প্রতাপ-প্রভাবশালীকে অবলম্বন করে স্তাবক বা উপদেষ্টারূপে লতার মতো বেড়ে উঠতে চেয়েছেন। প্লেটো-অ্যারিস্টটল থেকে একালের বুদ্ধিজীবীরাই তার সাক্ষ্য। মানুষের বিচিত্র স্বভাব ও এসব নানা কর্ম- আচরণ মানুষের সম্মুখগতি ও মানসিক প্রগতি বিঘ্নিত ও মন্থর করেছে।

আজ যা প্রয়োজন ও জরুরী, তা শাস্ত্রনিষ্ঠা নয়, মহাপুরুষের আনুগত্য-অনুসৃতিও নয়, তা যুক্তিনিষ্ঠা। সমাজে এখন শাস্ত্র ও মহাপুরুষ নয়— প্রয়োজন নীতি-নিয়মমানা যুক্তিনিষ্ঠ ভালোমানুষ। নীতি-নিয়ম অবশ্যই জীবন-জীবিকার চাহিদানুগ ও বাঞ্ছিত স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক হওয়া আবশ্যিক। যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-রুচি ব্যক্তিবিশেষের মানস-বিকাশের মাপ-মান-মাত্রা অনুসারে ভিন্নতা পায় বটে, তবে এক্ষেত্রেও বিবেক-বিবেচনাই সিদ্ধান্তের ও কর্ম-আচরণের ভিত্তি বলে ভুল-ভ্রান্তিতেও প্রবোধ মেলে এবং ঔচিত্যবোধজাত বলে তা মানুষকে অন্তত নীতিভ্রংশ কিংবা চরিত্রভ্রষ্ট করে না।

আত্মপ্রত্যয় আত্মসম্মান সম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষই কেবল স্বাধিকারসচেতন ও সহিষ্ণু থেকে সমাজে সহযোগিতায় সহাবস্থানে আগ্রহ ও নিষ্ঠ থাকতে পারে। তেমন মানুষই কেবল অনধিকারচর্চা থেকে বিরত থাকতে চায়। জুলুম পেতে যেমন চায় না, তেমনি জুলুম করতেও চায় না- অন্তত দ্বিধা করে। সততা কিংবা নীতিনিষ্ঠা বলতে যা বোঝায়, তা এমনি আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদা সচেতন মানুষেই কেবল লভ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এও সত্য যে মানুষও মূলে বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত প্রাণীমাত্র। বাঞ্ছিত সমাজসদস্য হবার জন্যে আবশ্যিক প্রবৃত্তি-সংযমন লক্ষ্যে, সমাজ-স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত-নিয়মিত করার, ও শক্তি-মন-রুচি আয়ত্ত করার জন্যে জরুরী অনুশীলন সবাই করে না, করবে না কখনো। তাই শাস্ত্র পারেনি তাদের সংযত রাখতে, সরকার পারেনি শায়েস্তা করতে, সমাজের নীতি-নিয়ম-নিন্দাও পারেনি তাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে, পরলোকে প্রসৃত শাস্তিও করে না তাদের পাপভীরু।

প্রলোভন প্রবল হলেই তারা সর্বপ্রকার অন্যায় কাজ করে। জুলুম করে দুর্বলের প্রতি, কাড়ে পরের সম্পদ নিন্দা-শাস্তি-পাপ ভয় উপেক্ষা করেই। তাই দুনিয়ায় কোথাও কোন শ্রেণীর বা অবস্থানের প্রবৃত্তি-চালিত মানুষের কেউ কাউকে সুখ-স্বস্তি-শান্তি দেয়ওনি, যথার্থ অর্থে পায়ওনি, মন-মরুর মরীচিকাতাড়িত হয়েছে মাত্র।

হাজার হাজার বছর ধরে শাস্ত্রে-সমাজে-সরকারে নানা ভাবে মানুষের, মানুষ্যত্বের মানবিক গুণের, মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্বের ও কর্তব্যের, ন্যায়-সত্যের, দান-দাক্ষিণ্যের, কৃপা-করুণার, ক্ষমার ও প্রীতির কথা উচ্চারিত হলেও, বাস্তবায়নের চেষ্টা হলেও সামাজিক আবেগরহিত চিত্তে তা টেকসই হয়নি কখনো কোথাও। বরং বারে বারে উচ্চারিত হয়ে তা আবেদন হারিয়েছে, হারিয়েছে তাৎপর্য। সর্বপ্রকার জোর-জুলুম-কাড়া-মারা-হানা কখনো কমেনি কোথাও, প্রবল-প্রলুব্ধ মানুষের যথাপ্রয়োজনে ঘটেছে যথাসময়ে। বুদ্ধ-যিশু থেকে একালের কোন সাধু-সন্ত নেতা-নায়ক-মনীষীই অহিংসার, মানবতার, সদাচারের, মানবপ্রীতির, সহাবস্থানের দোহাই কেড়েও ব্যক্তির বা দলীয় মানুষের ও রাষ্ট্রের জোর-জুলুম, হত্যা, দাঙ্গা, শোষণ, প্রতারণা প্রভৃতি কমাতেও পারেননি। যদি কোথাও কমেও থাকে, তা অন্যান্য বাস্তব কারণে,—মহৎচেতনার কিংবা বুলির অথবা মহৎ চরিত্রের প্রভাবে নয়। তাই শাস্ত্রিক, দার্শনিক ও নৈতিক বুলি প্রাণীপ্রজাতি মানুষের প্রাবৃত্তিক আধি ঘুচাতে পারবে না। নানা স্বার্থবশে বিভিন্ন অজুহাতে জাত-বর্ণ-ধর্ম-দল শ্রেণী স্ব স্ব স্বার্থে আপন-পর নির্বিশেষে জোর-জুলুম-দাঙ্গা-হত্যা-যুদ্ধ-কাড়া-মারায় উৎসাহী হয়।

এর জন্যে চাই অধিক সংখ্যক অহং-সচেতন গর্বিত আত্মপ্রত্যয়ী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যুক্তি-রুচি-বিবেক চালিত মানুষ, যাদের কাছে জ্ঞানের চাইতে মান বড়, যারা কর্মে আচরণে নিন্দা-ঘৃণা-অপমান ভীরু। আর্থ-সামাজিক শৈক্ষিক নৈতিক-শাস্ত্রিক অবস্থানগত কারণে বৈষম্যদুষ্ট সমাজে এমন মানুষ এতো বিরল যে প্রায় করগণ্য। তবু শরম-সংকোচ বশে কিংবা নিন্দা-শাস্তি-পাপ ভয়ে অথবা সুযোগ-সুবিধে-প্রয়োজনের অনুপস্থিতির ফলে শতকরা দশ/বিশজন সৎ ও নিরীহ-নিষ্ক্রিয় মানুষ সর্বত্র মেলে, —এদের ক্ষতি করার শক্তি যেমন নেই, তেমনি নেই সমাজের কল্যাণ করার যোগ্যতা। আবার সময়ে অসময়ে প্রবলের জোর-জুলুমের শিকারও হয় এরাই। কাজেই এমনি ভীরু-সৎ-নিরুদ্যম-নির্লোভ মানুষ কার্যত দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কর্মার লিপ্সা বাড়ায়— এদের দুর্বলতা ওদেরকে দুষ্কর্মে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করে। একের মনের ও অপরের শক্তির, একের আগ্রাসনের ও অপরের প্রতিরোধের ভারসাম্য স্থিতাবস্থার অনুকূল।

মন্দের ভালো হিসেবে দেখা যায় সামন্ত-বুর্জোয়া সমাজে যারা অর্থে বিত্তে অতি প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুণ্য লোভে বা ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে ও ক্ষমতার দাপটে স্বদেশের স্বকালের স্বস্থানের মানুষের মনে ভয়-বিস্ময়-চমক জাগানো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগানোর জন্যে কিংবা মান-যশ-শ্রদ্ধা-ভক্তি-খ্যাতি লোভে দানে-দাক্ষিণ্যে, কৃপায়-করুণায়, জনহিতকর কাজে ও প্রতিষ্ঠানে দীনজনের সেবায় মুক্ত হস্তে ব্যয় করেন। একে একালে আমরা উদার বুর্জোয়া মানবতা বলে থাকি। এ হচ্ছে পচনশীল বিষাক্ত ক্ষতের উপর দুর্গন্ধ নিবারক প্রলেপ-পট্টিমাত্র। তাছাড়া শোষক অসংখ্য হলেও দান করার মতো ধনী কয়জনই বা থাকে একটি এলাকায়। কাজেই এতে গণমানবের পীড়ন শোষণের স্থায়ী উপদ্রব থেকে কখনো কোথাও উপশম পায়নি। তা ছাড়া দানে-দাক্ষিণ্যে কৃপায়-করুণায় মানুষের উপকার করা স্বাধিকারচ্যুত মানুষকে অপমান করারই নামান্তর। এছাড়াও হাজার হাজার বছর ধরে মহৎ ও মানবপ্রেমী ভাবক-চিন্তকরা নানাভাবে লোকচিত্তে মানবিকতার ও মানবতার বিকাশ-বিস্তারের কথা বললেও আসলে আজ অবধি মানুষের মানসে-সমাজে-সরকারে কর্মে-আচরণে মানবতার প্রসার বলতে গেলে নিতান্ত সংকীর্ণ সড়কে সামান্যই ঘটেছে। আজ ভাত-কাপড়-শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে দুনিয়ার শতে আশি ভাগ মানুষ বঞ্চিত। বঞ্চিত মৌল মানবিক অধিকার থেকে। জননী-জায়া-কন্যা রূপে আদরের হয়েও নারী ঘরে ঘরে আজো ন্যায্য কদর পায়নি। আজো ধন-মান-শিক্ষারিক্ত মানুষ অবজ্ঞেয়, আজো শ্রমজীবী মানুষ প্রাপ্য মানবিক মর্যাদা পায় না। বসার তো নয়ই— কাছে দাঁড়ানোর, কথা বলার অধিকারও নেই দুনিয়ার অনেক অনেক শ্রেণীর মানুষের। ঘরে ঘরে যেখানে আদুরে কুকুর বেড়াল কোল পায়, সেখানে আজো মানুষ অস্পৃশ্য-ঘৃণ্য। আজো মানুষ মানুষের কাজে গৃহে পোষা পশুর আদরও পায় না। আজো নরহত্যায় মানুষ উৎসুক, আজো হত্যাব্রতী, বৃত্তিজীবী সৈনিক এবং পীড়নপটু পুলিশ মেলে। আজো মানুষ ধন-মান প্রেম-প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে ঈর্ষা-অসূয়া দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ-সংঘাত-হননপ্রবণ, আজো জিগীষা আর জিঘাংসা পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি চলে, আজো স্বার্থ বিষয়ে মানুষে ও অন্য প্রাণীতে আচরণগত পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। আজো সন্তান স্নেহ ও রিরংসায় মানুষ অন্য শ্রেণির মতোই প্রাকৃতিক। আজো পরকে-ভাইপো-ভাগ্নেকে অপত্যসম লালন-পালনের লোক সমাজে সুদুর্লভ।

প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নিয়ম প্রাণীর প্রাবৃত্তিক নীতির প্রসূন। এ একপেশে অন্যায্য নীতি নিয়ম। গায়ের জোরই ও নীতির ভিত্তি। মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হচ্ছে 'দুর্বলেরে রক্ষা করা আর দুর্জনেরে হানা'। কিন্তু ওই প্রাণীসুলভ বুনো নীতিই মানুষের অবলম্বন এ মুহূর্তেও। এখানে মানবিক গুণের বা মানবতার ছিটেফোঁটাও নেই।

সত্য বটে কোন মানুষের ব্যক্তিক মনীষালব্ধ মানবিক অনুভব-উপলব্ধি সূক্ষ্মতায় তীক্ষ্ণতায় মাপে মানে মাত্রায় মাহাত্ম্যে প্রায় আকাশচুম্বী। শাস্ত্রে, দর্শনে, সাহিত্যে মানুষের সুবিকশিত মানবতার দৃষ্টান্ত মেলে। মানবতার সে সুউচ্চ মিনারে উত্তরণ ঘটেছে যার, তিনি 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এ আস্থাবান। তিনি এক ও অভিন্ন বিশ্বেশ্বরে, মানবসাম্যে ও মানবসংহতিতে আস্থাবান। সবাই তখন আত্মীর অংশ আত্ময়। তাঁর কাছে তখন মশা-মাছি তেলাপোকা ছারপোকার আর মানুষের প্রাণের মূল্য সমান। তিনি তখন সর্বব্যাপী প্রীতির আনন্দে ধন্য ও তৃপ্ত। এমন কি সন্ত দরবেশ সন্ন্যাসীর মধ্যেও জাত-বর্ণ-ধর্ম পাপী পুণ্যবান ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষকে সাদরে গ্রহণ করতে দেখা যায়, অন্তত তাঁরা ঘৃণা করেন না কাউকে। কিন্তু মনীষীর মহাপুরুষের সত্যের গুরুত্ব কিংবা উপযোগ অনুশীলনরিক্ত সাধারণ মানুষের মনে-মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়নি কিংবা টেকেনি। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোষ্ঠীগতভাবে পরিবারে সমাজে সরকারে সামষ্টিক, সামগ্রিক ও সামূহিক জীবনাচারে তা কখনোও কোথাও প্রতিফলিত হয়নি আজ অবধি। বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত মানুষ প্রায় প্রাণীর প্রজাতিস্তরেই রয়ে গেছে। এতো সুযোগ-সুবিধে সত্ত্বেও কয়েক হাজার বছরেও মানুষ মানবিক গুণের ও মানবতার প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত হয়নি। এমনি সদ্বুদ্ধি-সদিচ্ছার স্বল্পতার দরুনই, মানবতাজাত মানবপ্রীতির শূন্যতা হেতুই মার্কসের মৃত্যুর একশ বছর পরেও, সব জেনে বুঝেও বিদ্বান বুদ্ধিমান বুর্জোয়ারা মার্কসবাদ অঙ্গীকারে রাজি নয় আজো গণমানবের ভাত কাপড়ের নিশ্চিত ব্যবস্থার লক্ষ্যে। শুধু তা নয়, জন্মসূত্রে আস্তিক এ মানুষেরা জাত-বর্ণ-ধর্ম দ্বেষণায় দাঙ্গায় হত্যায় যুদ্ধে চোরা-চালানে, ভেজালে-প্রতারণায়, বাণিজ্যের নামে লুটে, কূটনীতির নামে ভেতরে-বাইরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাধিয়ে বিশ্ব মানুষের সুখ-সম্পদ শান্তি-স্বস্তি নষ্ট করে। বোঝা যাচ্ছে যুক্তি বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা দিয়ে নয়, অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষও মুখ্যত প্রবৃত্তিচালিত। তাই অধিকাংশ মানুষের জীবন আত্মরতির ঘানিবদ্ধ। তাই এরা যুক্তি বা ন্যায় মানবে না কখনো। জোর খাটাতে হবে। এ জন্যে এ যুগে আর মহাপুরুষ ও মহাবাণী নয়, মহৎ দেশনাও নয়, এ যুগে চাই ঐহিক জীবনবাদী গণমানবদরদী কিছু ভালো মানুষ, যারা স্বস্বার্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ মেনে দুনিয়ার শোষিত-পীড়িত-দলিত বঞ্চিত মানুষকে অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে-শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে মৌল মানবাধিকার দেয়ার জন্যে শোষক-বঞ্চক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিরামহীন আপোসহীন সংগ্রাম করবে, লড়াই করবে জয় লক্ষ্যে। দুনিয়ার অধিজন মজলুম চাষী মজদুরের বাঁচার ন্যায্য অধিকার দানের জন্যে নিতান্ত উনজন জালিম বঞ্চক শোষক শাহ-সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়াকে জোর-জবরদস্তি প্রয়োগে উচ্ছেদ-উৎখাত করতেই হবে মানবতার খাতিরেই। যে কোন বিবেকবান ব্যক্তিই মানবতার কাছে এ বিষয়ে দায়বদ্ধ।

ধন বৈষম্য দূর করে প্রথমে ইকুয়ালিটির প্রতিষ্ঠা, পরে ওই মানবসাম্য সবার ধাতস্থ হলে, সমাজতন্ত্রে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেলে সব রাষ্ট্রে, তখন সমস্বার্থে স্বাধিকারে সংযত ও সহিষ্ণু থাকার অঙ্গীকারে বিশ্বের মানুষ সহজেই ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে লিবার্টি ভোগ করতে পারবে। মধ্যবর্তীকালে একটু কড়াকড়ি গণহিতার্থেই প্রয়োজন হয়, হবে। কিন্তু পুঁজিবাদীদের প্রচারিত ব্যক্তির ও সমাজের মন-বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণের 'অপবাদে' কোন সত্য নেই। কেননা দুনিয়ার কোন শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার কখনো কোন নতুন ভাব-চিন্তা, মত-পথ বা তত্ত্ব-তথ্য সহ্য করে না, করেনি, করবে না। নতুন তত্ত্বের প্রচারক সনাতন মতে-পথে স্বস্থ শাস্ত্রিকের, সমাজপতির কিংবা সরকারের অভিপ্রায়ক্রমে প্রায়ই মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে। কিন্তু উচ্চারিত মত-পথ-তত্ত্ব-তথ্য-ভাব-চিন্তা তবু লোপ পায়নি।

ভালো হও, ভালোবাস এবং ভালো কর

যৌথ জীবনে সহাবস্থানের প্রয়োজনে, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে জান-মালের নিরাপত্তার লক্ষ্যে পারস্পরিক স্বার্থে মানুষ তাদের অস্তিত্বের আদিকাল থেকেই অবচেতনভাবেই আপোসে বাস করতে চেয়েছে। সহযোগিতায় ও সহিষ্ণুতায় যে উন্নতি ও শান্তি নিহিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাও উপলব্ধি করেছে, কিন্তু প্রবৃত্তি পরবশ অসংযত অবিবেচক মানুষ জেনে-বুঝেও কর্মে আচরণে তা রূপায়িত করতে পারেনি। তাই ব্যক্তিক ও গোত্রিক জীবনে সুখস্বস্তি শান্তি স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে ঘন ঘন। তবু মানতেই হবে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত সঙ্কুলতার চেয়ে পারস্পরিক স্বার্থে মানুষের সহযোগিতায় সহাবস্থানের আগ্রহ, পরিবেশ ও সময়পরিসর নিশ্চয়ই বেশি ছিল, নইলে হাজার হাজার বছর ধরে দ্বন্দ্বে-মিলনে একত্রে বাস সম্ভব হত না, হত না তাদের সংস্কৃতি-সভ্যতার, তাদের মন রুচি-বুদ্ধি-মননের বিকাশ। জান-মাল-প্রিয়-পরিজন নিয়ে নিরাপদে নিজে বাঁচতে এবং অপরকে বাঁচতে দিতে চেয়েছে বলেই মানুষ বাঁচা-বাঁচানোর জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুগত থাকতে চেয়েছিল একটি নীতির, তা হল 'ভালো হও, ভালোবাস এবং ভালো কর।'—এর আবশ্যিকতা ও গুরুত্ব প্রবৃত্তিচালিত অসংযত অবিবেকী মানুষকে বোঝানোর জন্যেই জগতের বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকবান মানুষ দেশে দেশে কালে কালে নতুন নতুন শাস্ত্র তৈরি করেছে, সমাজে নব নব নীতি-নিয়ম চালু করেছে, সরকারে নানা বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করছে। এ একই লক্ষ্যে পুরোনো শাস্ত্র বর্জন করে নতুন শাস্ত্র বানিয়েছে। সমাজের চালু নীতিনিয়মরীতি পালটে নতুন নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছে, বদলেছে প্রশাসনের নীতি-নিয়ম। বুনো বর্বর ভব্য মানুষের কালপ্রবাহে এ অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস তাদের বিকাশের আজকের স্তরে নিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের আজো 'ভালো হও, ভালোবাস এবং ভালো কর' তত্ত্ব প্রবৃত্তিগত হয়নি বলেই আজো অধিকাংশ মানুষ দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কর্মা। তাদের বোঝাতে হবে ভালো হওয়াতেই সর্বজনীন কল্যাণ। ভালো হও, মানে—জান-মাল-প্রিয়-পরিজন নিয়ে নিরাপদ জীবনযাত্রার জন্যেই সংযম-সহিষ্ণুতার অনুশীলন করতে হবে, স্ব স্ব স্বার্থেই সহযোগিতায় সহাবস্থানে আগ্রহী থাকতে হবে, ভালোবাসতে হবে মানুষকে, কল্যাণকে, ন্যায়কে, যুক্তিকে আর নীতি-নিয়মকে, করতে হবে যুক্তিসিদ্ধ জন ও আত্মকল্যাণকর কাজ। স্বার্থে ও পরার্থে অর্থাৎ কর্মে আচরণে যেন কোথাও কখনো কারো উপর জ্ঞাতসারে জুলুম না হয় অর্থাৎ অনধিকার চর্চা না হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যতদিন এ 'ভালো হও, ভালোবাস এবং ভালো কর' নীতির আনুগত্য কবুল না করবে, ততদিন ঘরোয়া জীবনযাত্রায়, রাষ্ট্রে, সমাজে নির্বিঘ্নে জীবনোপভোগ ও বাঞ্ছিত সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম খুব কম লোকের জীবনে-পরিবারেই সীমিত থাকবে।

মনের ও চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বজনীন আগ্রহের ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে না হলেও বহুজনহিত ও বহুজনসুখকামী মানুষের চেষ্টায় 'ভালো হও, ভালোবাস এবং ভালো কর' নীতিভিত্তিক কিছু সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এ নীতি-আদর্শেরই প্রমূর্ত রূপ।

এ 'ভালো হও, ভালোবাস এবং ভালো কর' নীতি অঙ্গীকার করেই কেবল দ্রোহী-সংগ্রামী উদ্যমশীল উদ্যোগী মানুষেরা মৌল মানবাধিকারের স্বীকৃতিতে ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কারমুক্তি ও গ্রহণশীলতা, আর্থিক জীবনে প্রাপ্য সুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্বচেতনা ও অধিকারবোধ প্রভৃতি নাগরিকে বাঞ্ছিত জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণ ও বস্তু অর্জন করা সম্ভব করে তুলতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিগীষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা

জীবৎ কালকে যদি শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে ভাগ করে দেখি, তাহলে মানতেই হবে যে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বই জীবনের পাকা ও পরিপূর্ণ কাল। এর আগে থাকে কচি-কাঁচা-অপূর্ণ মন-বুদ্ধি-স্বপ্নের কাল, পরে বুদ্ধি পায় জড়তা, ধীশক্তি হয় হৃত, দেহ পেতে থাকে জীর্ণতা, চিন্তার ও কর্মের এ অপকর্ষ কালে মানুষকে প্রায় জীবন্মৃত বা অকেজো জেনেই ব্রাহ্মণ্যবাদে এদেরকে মৃত্যুর অপেক্ষায় বনে বাসের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বার্ধক্যমাত্রই দেহ-মন-মননের অক্ষমতা, জীর্ণতা বা জড়তা নয়। ব্যতিক্রমও অনেক। দেশ-কাল-প্রতিবেশ ভেদে এবং আর্থিক আচারিক ও শৈক্ষিক-নৈতিক অবস্থান ভেদে প্রৌঢ়ত্বের পরিসর জীবনে দীর্ঘতর হয়। এ ক্ষেত্রে ইদানীংকার বিশেষ সাক্ষী চীন।

দেহের সীমায় নিবদ্ধ প্রাণ ও প্রাণনা বিপুল বিচিত্র বিশ্বের কতটুকুই বা ধারণ করতে পারে! জানা বোঝার মহাসমুদ্রে এক একটি মানুষ নাপিতের বাটি মাত্র। কাজেই অজ্ঞতার অজানা বিশ্বজগতের অকূল অতল সাগরে আমরা আসলে জ্ঞানের ভেলারই গর্ব করি। এমন কথাও বলা চলে, গোটা দুনিয়ার মানুষের সামগ্রিক সামষ্টিক ও সামূহিক প্রয়াসে আজ অবধি হয়তো পৃথিবীতে বা ব্রহ্মাণ্ডরূপ গ্রহজগতে জ্ঞানের বিপুলকায় জাহাজও ভাসানো সম্ভব হয়নি। আমরা কি জানিনে-তার হদিস মেলেনি, কি জানি— তারই মাত্র একটি ভুল ত্রুটিপূর্ণ তালিকা পেশ করতে পারি। অতএব যা জানি তার চেয়ে যা জানিনে তা লক্ষ গুণে বেশি। তবু মন-বুদ্ধি-রুচি-গরজ যোগে অর্জিত ও উপলব্ধ জ্ঞান-প্রজ্ঞাই— এমনকি তা প্রাতিভাসিক হলেও মানুষের পুঁজি পাথেয়-বল ভরসার আকর।

মানুষ স্ব স্ব পরিবেষ্টনীর মধ্যে থেকে আশৈশব দেখে আর শুনে নানা বিষয়ে সংস্কারের জালে মন-বুদ্ধি-আত্মা অজ্ঞাতেই বরং অবচেতনভাবেই আবদ্ধ রাখে। তার জানা বোঝার আগ্রহ থাকে সামান্যই কিন্তু যৌথ জীবনে কান দুটো খোলা থাকে বলেই অনেক কিছু শোনে এবং যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে অনীহ উদাসীন বলেই অনেক কিছুই রুচি-বুদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে মানে। জিজ্ঞাসু অধ্যবসায়ী জ্ঞানপিপাসু মানুষ জগতে জনসংখ্যার তুলনায় সুদুর্লভ। তারাও আশৈশব পারিবারিক সামাজিক প্রাতিবেশিক অবস্থানের দাস ও বশ বলে সর্বপ্রকারে আশৈশব লালিত ও অর্জিত বিশ্বাস-সংস্কার মুক্ত হতে পারে না। তাছাড়া চিন্তা-চেতনার, মন-বুদ্ধির, রুচি-সংস্কৃতির সীমিত পরিসরে বিচরণ করতে হয় বলে তাদেরও অনুভব-উপলব্ধি যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা আর জ্ঞান-প্রজ্ঞা পরিমিতি মানে। তাই অনন্য অসামান্য ধীশক্তিধর মানুষও সর্বজনগ্রাহ্য সর্বকালস্থায়ী সর্বপ্রতিবেশ-পরিবেশ উপযোগী কোন সত্য তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে পারে না। এজন্যেই জনান্তরে কালান্তরে স্থানান্তরে মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞাজাত, অনুভব-উপলব্ধি-প্রয়োজন প্রসূত, প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতালব্ধ কোন তত্ত্ব তথ্য সত্যই টেকে না, হৃত উপযোগ হয়ে বর্জিত হয়। তাই চিরন্তন চিরকলীন চিরসত্য হয়ে কোন শাস্ত্র, বিশ্বাস, সংস্কার, সমাজ, নীতি-নিয়ম নৈতিক রীতি-রেওয়াজ, আচারিক প্রথা-পদ্ধতি উৎপাদক যন্ত্র-কৌশল, প্রাশাসনিক নীতি-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্ধতি কোথাও অপরিবর্তিত থাকেনি। জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজনানুসারে বারবার বিবর্তিত বা পালটে গেছে। মন্থর গতিতে হলেও এ সব বিবর্তন বা রূপান্তর সাধারণ ভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনার, জ্ঞান-প্রজ্ঞার, মন-বুদ্ধি-রুচির উৎকর্ষজ্ঞাপক।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে, আবিষ্কারে উদ্ভাবনে অনুভবে উপলব্ধিতে চিন্তায় চেতনায় সাহিত্যে দর্শনে আজকের প্রাগ্রসর মানুষ-সমাজ-দেশও গুটিকয় আবিষ্কারক উদ্ভাবক উদ্যোগী জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-দার্শনিক-সাহিত্যিক-নীতিশাস্ত্রকারের দানে গড়া। এক মানুষের সৃষ্টি অন্যসব মানুষের সম্পদ।

কিন্তু কেউ কোন সর্বজনীন সর্বসম্মত তত্ত্বে তথ্যে পৌঁছতে পারেননি। কেননা মানুষের দেহ-মনের, জ্ঞান-বুদ্ধির, যুক্তি-প্রজ্ঞার, অনুভব-উপলব্ধির শক্তি সীমিত এবং নানা পারিবেশিক ও অবস্থানগত কারণে স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশ-বিস্তার-উৎকর্ষ বিঘ্নিত হয় বলেই। ফলে বিদ্বান বুদ্ধিমানরা জ্ঞান-প্রজ্ঞার, চিন্তা-চেতনার, যুক্তি-বুদ্ধির যথাসাধ্য সমাবেশ ঘটাতে পারেন বটে, কিন্তু সমন্বয় সাধন করতে পারেন না। তাই তত্ত্বে তথ্যে সিদ্ধান্তে ফাঁক-ফুকুর, ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। মানুষের সমাবেশ শক্তি আছে, সমন্বয় শক্তি হয়তো নেই। এক দার্শনিক অনেক জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি যোগে যে তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেন, তা অন্য দার্শনিক অযৌক্তিক ও ভুল বলে প্রচার করেন। এক বিজ্ঞানী যে সত্য জানেন, অন্য বিজ্ঞানী তাতে ত্রুটি প্রত্যক্ষ করেন। এক সাহিত্যিক তাঁর মন-প্রাণ, ভাব-ভাবনা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, অনুভব-উপলব্ধি, মনন-মনীষা প্রয়োগে যে জীবনতত্ত্ব ও জগৎভাবনা চিত্রিত করেন, পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টিতে তা সাধারণ ও অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়, কালান্তরে মূল্য মর্যাদাও হারায়। এমন কি মানবমনীষার ও মানবচরিত্রের বিস্ময়কর অনন্য বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে, যে-শেকসপীয়ারের রচনায়, তাও ত্রুটির নিন্দামুক্ত নয়। আর শাস্ত্রের ও সমাজের নীতি নিয়ম আদর্শের জন্ম-মৃত্যু, উদ্ভব-বিনাশ তো দেশে দেশে কালে কালে গোত্রে গোত্রে ইতিহাস অনেক দেখেছে, দেখছে ও দেখতে থাকবে। এভাবেই মানবসভ্যতা এগিয়ে গেছে, এগুচ্ছে ও এগুতে থাকবে। কিন্তু শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের জন্যে মানুষ বাঁধা পড়ে অচলায়তনে। সে-দুর্গের দেয়ালে ফুটো-ফাটা হতে থাকে বটে, তবে দেয়াল কেজোভাবে ভাঙতে সময় লাগে। কেননা অন্যের কাছে ভুলত্রুটিপূর্ণ তুচ্ছ ও পরিহাসজনক হলেও মোহগ্রস্ত মানুষের কাছে স্ব স্ব শাস্ত্র চিরন্তন সত্যের, ন্যায়ের কথার আকর এবং জগতের একমাত্র ঐশবাণীর সংহিতা, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কালের মাপে প্রয়োজনের তোড়ে কিছুই টেকে না জেনেও কিছু মানুষ যা জানে, যা বোঝে, যা অনুভব-উপলব্ধি করে, যা আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে তা মুখে বা লিখে অন্যদের জানিয়ে দেবার প্রণোদনাও প্রয়োজন অনুভব করে অন্তরে। এ হচ্ছে অহং এর প্রতিষ্ঠাপ্রবৃত্তির প্রসূন— সেই ভেনি ভিডি ভিসির মাত্রা ভেদমাত্র। তাই আমরা জ্ঞান-প্রজ্ঞার, মন-বুদ্ধির, চিন্তা-চেতনার, অনুভব-উপলব্ধির অপূর্ণতা জেনে বুঝেও লিখিয়ে বকিয়ে হই। আত্মরতিই সম্ভবত অযৌক্তিক আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও জিগীষা যোগায়। আমরা লিখি, আমরা বলি, আমরা আত্মপ্রচার করি আত্মপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে।

শেষ নেই জেনেও শেষ কথা, শেষ তত্ত্ব, শেষ তথ্য, চরম ও পরম সত্য উচ্চারণে আমরা উন্মুখ। শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তা সংঘর্ষের, বিচ্ছেদের ব্যবধানের স্থায়ী কারণ হয়ে রয়েছে আজো। প্রণোদনা যোগায় লোকবন্দ্য হয়ে অনন্য অসামান্য রূপে চিরস্মরণ্যে ও চিরবরেণ্য থাকার বাসনা। অতএব জিগীষাই জীবনপ্রেরণা, জয়েই দেশ কিংবা মন জয়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের সার্থকতা। এজিত বস্তুই নামান্তরে যশ-মান-খ্যাতি-ক্ষমতা। আকাঙ্ক্ষা পূর্তির প্রয়াস-প্রবাহই চলমান জীবন। মূলে সেই 'আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি আজীবন থাকব' veni vice-vice- র অনুরূপ স্বপ্নই যোগায় উদ্যম। এ জিগীষা কেউ পূরণ করে খেলায়, কেউ বা সুযোগ হারায় হেলায়।

গণমুক্তির পথ ও পদ্ধতি

আজকাল যে কোন উন্নয়নশীল দেশে সমাজবাদী লোকের সংখ্যা কম নয়। যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে সহজেই স্বীকার করা ও করানো সম্ভব যে দরিদ্র দেশে নিঃস্ব মানুষকে বাঁচার অধিকার দানের জন্যেই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে দেহে-মনে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে ও ধনে-জনে অসমমাত্রায় মানুষকে অর্থ-সম্পদ অর্জনে অবাধ অসম প্রতিযোগিতায় ছেড়ে দেয়া অমানবিক ও সমাজস্বাস্থ্যের পরিপন্থী।

এ-ও সত্য যে দুনিয়ার শতকরা নিরেনব্বইজন মানুষই স্ব স্ব রাষ্ট্রসীমার মধ্যে অর্থ-বিত্ত-খ্যাতি-ক্ষমতার বৈষম্যজাত মানসিক দৈহিক যন্ত্রণায় বেদনায় ও মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যে ভোগে। কাজেই বঞ্চনা-বঞ্চিত সমস্যা সর্বব্যাপী। ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের উৎস সমভাবে বাস্তবিক ও মানসিক।

কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শাস্ত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কারে আজন্ম লালিত বলে বিশুদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে অন্যায়ের ও অযৌক্তিক বৈষম্যের উৎস নিরূপণে ও প্রতিকার প্রকাশে উদ্যোগী হয় না ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনে আস্থাবান আত্মাবাদী মানুষ। অজ্ঞাত ভয়তাড়িত ভরসাকামী নিয়তিবাদী মানুষের কাছে যাদুই সত্য এবং যুক্তি মিথ্যা। তাই নিঃস্ব নিরন্ন মানুষও সমাজবাদে আস্থা রাখে না। ফলে চোখে আঙুল দিয়ে আর্থ-সামাজিক শোষণ-পীড়ন-দমন-দলনের উৎস ও কারণ দেখিয়ে দিলেও তাদের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম জাগানো সম্ভব হচ্ছে না শ্রেণীসংগ্রামী সমাজবাদীদের পক্ষে। আর্থ-সামাজিক শোষক-পীড়ক প্রত্যক্ষ বলেই, সমাজবাদীরা কেবল শ্রমিক-কৃষককে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রবর্তনা-প্ররোচনা দিতে প্রয়াসী হলেও ওদের থেকে প্রত্যাশিত সাড়া মেলে না। ভূত রয়েছে সর্ষে বীজে। এ ভূত আশৈববলালিত শাস্ত্রিক সংস্কার প্রসূত। শাস্ত্রিক বিশ্বাসে-সংস্কারেই তাদের জীবনদর্শনের ও প্রাত্যহিক জীবনাচারের স্থিতি। এ এক দুর্লঙ্ঘ্য ও দুর্ভেদ্য দুর্গ। ব্যক্তিজীবনে প্রলোভন প্রবল হলেই কেবল এ দুর্গের ছিদ্রপথে গোপনে বিচরণ সম্ভব হয়, তবে দুর্গের প্রয়োজনীয়তা ও পবিত্রতা কখনো অস্বীকৃত হয় না। তাই কম্যুনিস্টদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এ আধির চিকিৎসা করা। এর চিকিৎসার প্রাথমিক ব্যবস্থা হবে মানুষকে স্বাক্ষর ও শিক্ষিত করা, দ্বিতীয় স্তরের চিকিৎসা হবে যুক্তি-প্রমাণ যোগে জীবনে ঐহিকতার বাস্তবতা প্রমাণের প্রয়াসে। মনে রাখতে হবে ব্যক্তির জীবনে আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও নৈতিক চেতনার ও নীতিনিষ্ঠার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অপরিমেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এ নীতি-চেতনার উৎস ধর্মশাস্ত্র নয়, যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা এবং অহংচেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধই মানুষকে নীতিনিষ্ঠ রাখে। আজকাল সাহসের অভাবই সততা এবং বুদ্ধিশূন্যতাই সরলতা বলে ব্যাখ্যা-বিদ্রূপ করা হলেও এর মধ্যে পূর্ণ সত্য নিহিত নেই। মানুষের নৈতিক শক্তি যে অদম্য-অপরাজেয়, তা বিভিন্ন ব্যক্তিজীবনে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। মহৎ জীবনের ইতিহাসে রয়েছে তার সাক্ষ্য। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও স্থিতি পরিচিত জনের আস্থা অর্জনে, আর ব্যক্তিত্বের ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিই হল ন্যায়-সত্যনিষ্ঠা।

গোড়ায় এ উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রিক বিশ্বাসের অসারতার কথা উচ্চারিত হত। ধর্মবিশ্বাসকে আফিমের নেশার মতো ক্ষতিকর ও অবাস্তব বলে বোঝানোর চেষ্টা হত। পরে আস্তিকদের অসহিষ্ণু দেখে কম্যুনিস্টরা শাস্ত্রবুদ্ধির অপকারিতার কথা উচ্চারণে বিরত থাকে। এখন চীনে-রাশিয়ায় কেবল যে মঠ-মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-সিনাগোগের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তা নয়, ধর্ম সম্মেলনেরও ব্যবস্থা হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে। অথচ কে না জানে ও বোঝে যে সমাজবাদের বা সাম্যবাদের মূলকথাই হল ধন-সম্পদের অযৌক্তিক ও অসম অর্জন ও ভোগদখল নিয়ন্ত্রণ। সব ধর্মশাস্ত্রেই দান-দক্ষিণা-কৃপা-করুণার মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতা স্বীকৃত হলেও স্বোপার্জিত ও পিতৃধনে ব্যক্তির অবাধ ভোগাধিকার অস্বীকৃত নয়। সুতরাং কার্ল মার্কসের উৎপাদন-বণ্টন-উদ্বৃত্ত তত্ত্ব মাত্রই শাস্ত্র বিরোধী। কাজেই আপোস লক্ষ্যে কম্যুনিস্টরা যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস অঙ্গীকার করে তাহলে সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদ আর প্রচার করা চলে না, বিপরীত দুই মেরুর তত্ত্ব বলেই। তাছাড়া শাস্ত্রগুলো হচ্ছে অজটিল গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনসম্পৃক্ত সরল যাযাবর পশুপালক কিংবা কৃষিজীবী সমাজের পণ্য বিনিময় নির্ভর Pastoral Economy যুগের। সুদূর অতীতের সেই সরল গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক নীতি-নিয়মই বিধৃত হয়েছে শাস্ত্রে। দ্বিপত্র অঙ্কুর যেমন পুরোনো পাতা ঝরিয়ে নতুন পাতা গজিয়ে গজিয়ে বহুবিস্তৃত মহীরুহ হয়ে ওঠে, তেমনি সভ্যতার ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক ও সামাজিক জীবন সূক্ষ্ম তন্তুজটে জটিল হয়ে উঠেছে— আমাদের পুরোনো সবকিছু পরিহার করে করে নতুনের ঠাঁই করে দিতে হবে। বরণের জন্যেই বর্জন আবশ্যিক। আজকের সংহত পৃথিবীতে যন্ত্র-নির্ভর যুগে ও যন্ত্রপ্রভাবিত সভ্যসমাজে যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিজীবনে জট-জটিল প্রাত্যহিক সমস্যাজড়িত কর্মে-আচরণে আগের কালের সর্বপ্রকার নীতি-নিয়ম যে অকেজো বলেই অচল এবং আমরা অবচেতনভাবেই এ বিবর্তন স্রোতে যে ভাসমান, তা সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে গণমানবকে জানিয়ে বুঝিয়ে দেয়া মুখ্যত সমাজবাদীদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পুরোনো শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের যাদুমুক্ত করা সম্ভব হলেই কেবল বাস্তব ও রূঢ় যুক্তি-প্রমাণ যোগে তাদের মধ্যে স্ব স্ব স্বার্থে সহিষ্ণুতার, সহাবস্থানের ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে বাঁচার আগ্রহ জাগানো সম্ভব ও সহজ হবে। বলতে হবে এককালের শাস্ত্র অন্যকালে মিথ্যা কিংবা অকেজো বলেই বর্জিত হয়েছে। এভাবে কালে কালে দেশে দেশে মানুষ পুরোনো শাস্ত্র পরিহার করে দেশকালোপযোগী করে নতুন সংজ্ঞায়, রূপে ও গুণে মণ্ডিত করে নতুন উপাস্য সৃষ্টি করেছে, করেছে নতুন নীতি-নিয়ম, বেঁধেছে আচারিক বিধিনিষেধের জালে।

কাজেই সহজ ও সাদা কথায় শাস্ত্রও বিবর্তনশীল জনসমাজের কালিক স্থানিক প্রয়োজনে উদ্ভাবিত ও পরিবর্তিত পরিবেশে বর্জিত হয়েছে--এ যুক্তি ও তথ্য যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনসমাজে স্বীকৃত হয়, তাহলে আজকের দিনে সমাজবাদ অধিজনের স্বার্থে সমর্থনে ও সংগ্রামে বাস্তবায়ন সম্ভব ও সহজ। মনে রাখতে হবে মুসলিম মাত্রেরই হাড়ে-রক্তে রয়েছে কাফের ও কম্যুনিস্ট ভীতি ও দ্বেষণা। এ আধিতত্ত্ব মানে না বলেই আমাদের কম্যুনিস্টরা শাস্ত্রমানা শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মানে ও জানে। তাই তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে উৎসাহী, তারা কেবল সামন্ত-বুর্জোয়া ও উপনিবেশ-প্রবণ সাম্রাজ্যবাদীদেরই শত্রু বলে জানেন, আর আমলা মুৎসুদ্দি জোতদার খতমে উৎসুক।

শ্রমের মজুরী বৃদ্ধিতে কিংবা বর্গা খাজনার হ্রাসে শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুরের মুক্তি নিহিত হয়, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব হলেই কেবল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গণমুক্তি সম্ভব এবং যে এটিই একমাত্র পন্থা, তা উপলব্ধিগত হলেই কেবল কৃষক-কলশ্রমিক ও ক্ষেতমজুরকে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করার লক্ষ্যে রাজনীতিক চেতনাদান ও রাজনীতিক কর্মী ও নেতা বানানো সম্ভব হবে। নইলে উৎখাতের জন্যে ক্ষমতার উৎস ও আধার সন্ধানে কখনো সামন্ত জোতদার, কখনো সেনাবাহিনী, কখনো বুর্জোয়া সদাগর-কারখানাদার কখনো আমলা-মুৎসুদ্দি-টাউট, কখনো বা সাম্রাজ্যবাদী শত্রু খুঁজে বেড়ালে ব্যর্থতার বিড়ম্বনা এড়ানো যাবে না। এখন বিবেচ্য রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে কারা? রাজতন্ত্রের আমলে থাকে স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী, ধনে সংখ্যায় বৃদ্ধিতে ও সাহসে বুর্জোয়াসমাজ প্রবল হওয়ার ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা আসে তাদের আয়ত্তে। অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে আনার ও রাখার জন্যে চাই ধন-জন ও সাহস—এ তিন বল বা শক্তি যার আয়ত্তে, তেমন কাঙ্ক্ষী মানুষই হত ও থাকত রাজা। উক্ত তিন শক্তির সঙ্গে অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও বুদ্ধি ব্যক্তিগত গুণ হিসেবে থাকা আবশ্যিক।

আগে শাহ-সামন্ত আমলে শোষণের মাত্রা নিষ্ঠুর লুণ্ঠনের পর্যায়ে থাকলেও প্রত্যক্ষ শোষকের সংখ্যা ছিল কম। বুর্জোয়া যুগে শোষণের রূপ বিচিত্র ও বহুমুখী এবং কিছুটা পরোক্ষ হওয়ায় শোষণের মান-মাপ ও মাত্রা এক নজরে দেখা সহজ নয়। ফলে অর্থে, বিত্তে, খ্যাতি-ক্ষমতায় বা প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যারা অগ্রণী, তারাই গণতন্ত্র নামের ফাঁদ বসিয়ে অজ্ঞমানুষকে যান্ত্রিক ভোটাধিকর দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ভাগ করে ভোগ করে। আগের এক আকবর বাদশাহর ক্ষমতা এখন সংসদ সদস্যরূপী কয়েকশ ব্যক্তি, আমলা ও সেনানী এবং তাদের চেলা-মুৎসুদ্দিরা বিভিন্ন মাপে, মানে ও মাত্রায় ভাগ করে ভোগ করে। তাই দুস্থ দুর্বলরা আজো মত-পথ-পদ্ধতি নির্বিশেষে পৃথিবীর সর্বত্রই লঘু-গুরু ভাবে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে শক্তি-সাহস-জ্ঞান-বুদ্ধি-কৌশল-উদ্যম ও ধূর্ততা সম্পন্ন মানুষের শোষণ-পীড়ন-দলন-দমন-বঞ্চনার পাত্র। প্রবলের এমনি কর্ম-আচরণ 'যোগ্যতমের উধ্বর্তন' তত্ত্ব নামে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মরীতি বলে প্রশংসিত।

মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে তাদের উপর পীড়ন প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদের অধিকার দাবি করে দুনিয়ার সবদেশেই বিভিন্নকালে বহু বহু মানুষ এককভাবে কিংবা সমবেতভাবে বুকের রক্ত দিয়েছে, হয়েছে শহীদ। আজো প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কোন না কোন ব্যক্তি বা জনতা প্রাণ দিচ্ছে। কিন্তু সাফল্য আশানুরূপ হচ্ছে ক্বচিৎ। তার কারণ কেবল সাহস ভরে মারতে-মরতে রাজি থাকলেই হয় না, আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির থাকলেও সাফল্য আসে না। সাফল্যের জন্যে কেবল শক্তি, সাহস, উদ্যম ও হাতিয়ারই যথেষ্ট নয়। আদর্শে-উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে ত্রুটি থাকলে রণনীতিতে ও রণকৌশলে খুঁত থাকলে কিংবা আসল বা মূল শত্রু বা শ্রেণী চিহ্নিত করতে অসমর্থ হলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে বড় কথা, লক্ষ্য তথা চাওয়া-পাওয়ার পরিণতি ও পরিণাম সম্বন্ধে যথাসম্ভব ও যথা প্রয়োজন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে আপাত কর্তব্য নির্ধারণে বিভ্রান্তি ঘটে। যেমন শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কিংবা কৃষকের ঋণ-কর মওকুবের অথবা ক্ষেতমজুরের দৈনিক মজুরীর হার বৃদ্ধির আন্দোলন কখনো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সার্থক বিপ্লবের-সংগ্রামের অংশ হতে পারে না, গণচেতনার ও গণশক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে মাত্র। এককথায় সংগ্রামের পরিবেশ তৈরী হয় মাত্র। কিন্তু সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিলেই সংগ্রামের শক্তি-সামর্থ্য আয়ত্তে আসে না। কাজেই কম্যুনিস্টদের প্রধান বা মূল লক্ষ্য হওয়া চাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। সেজন্যে প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরে আপোসহীন বিরামহীন সংগ্রাম চালানোর শক্তি বৃদ্ধির প্রাত্যহিক চেষ্টা ও তরুণদের দীক্ষাদানের অক্লান্ত প্রয়াস চালানো। এ-ও সত্য যে মানুষ কখনো কোন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক কিংবা বৈশ্বিক আদর্শ ব্যবস্থাতেই রোবট হয়ে থাকবে না। চলমান জীবনে তার সদা বিকাশমান চেতনার, মননের, রুচির ও বুদ্ধির বিকাশ-বৈচিত্র্য অনুসারে তার মানসিক ও ব্যবহারিক চাহিদা ঈর্ষা-অসূয়া-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়ে রাখবেই। কাজেই সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন সংগ্রামসঙ্কুল থাকবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

AMARBOI.COM

রাজনীতির খেলা

মানুষও সাধারণভাবে গড্ডল স্বভাবের–রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ করে এরা নেতৃ চালিত ও তাড়িত। বিনা প্রশ্নে এরা নেতার কথায় হুজুগে মাতে। নেতার বুকে, মুখে, মনে, মতলবে কোন অসঙ্গতি কিংবা অযৌক্তিকতা আছে কি না, তা সাধারণে বিচার-বিবেচনা করে না। সমকালীন দলীয় পত্রিকাগুলোও দল ভাঙার ভয়ে সত্য কথা চেপে যায়। এ জন্যেই বোধ হয় রাজনীতির, ফলে রাজনীতিকের কোন নির্দিষ্ট চরিত্র নেই, নেই কোন সত্য-মিথ্যার, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যচেতনা। রাজনীতি ও রাজনীতিক তাই বহুরূপী, তার রূপ ও স্বরূপ কখনো অভিন্ন নয়। তার উদ্দেশ্য লক্ষ্যে পৌছা, সিদ্ধি লাভ, সাফল্য অর্জন। তার নীতি হচ্ছে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। তাই যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন সে। সেবায় ও হত্যায় সে সমভাবে আগ্রহী। দুটোর লক্ষ্য কল্যাণ— আত্ম কিংবা পর কল্যাণ—তা পরে বিচার্য। তাই সাধারণ মানুষ রাজনীতির বা রাজনীতিকের কর্ম-আচরণের কূল-কিনারা পায় না, বোঝে না তার তাৎপর্য। রাজনীতি ও রাজনীতিক অভিসন্ধিচালিত বলেই তার উচ্চারিত কথায়, আপাত আচরণে ও মতলবে মিল থাকে না। নামে রাজনীতি ও রাজনীতিক হলেও এদের সুনির্দিষ্ট অনুসৃত কোন নীতি থাকে না। থাকে 'চাল'–তাই রাজনীতি হচ্ছে দাবাখেলা, ঘুঁটির 'পুঁজি' ও চাল নৈপুণ্যই এর পাথেয়। দাবায় ছক আছে, দাবারুর সততা আছে। কিছু ঘুঁটিরও আছে পরিচয়, কিন্তু রাজনীতির ও রাজনীতিকের এসব কিছুই নেই। আর এদের এ খেলার বা চালের পরিণামে বহুকালের জন্যে এমনকি কয়েক শতকব্যাপী-গোষ্ঠীর, গোত্রের, জাতির, রাষ্ট্রের, বিশ্বের মানুষদের কারো পৌষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস, কারো বা সর্বনাশ চলতে থাকতে পারে। এ রাজনীতি ও রাজনীতিকরাই দেশ-রাজ্য-রাষ্ট্র বেচে কেনে দেশের রাষ্ট্রের মানুষের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান কাল থেকে দৃষ্টান্ত দেব না, কারণ তাতে কেউ তুষ্ট হলেও রুষ্ট হবে অনেকেই। সাময়িকতার ঘোর রয়েছে বলে যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে আমার কথা যাচাই করার প্রবৃত্তিও হবে না কারো। তাই অতীতের দু'একটা কথা এখানে স্মরণ করছি।

একশ বছর পরে ইংরেজের কাছে কোলকাতার বিদ্যাবান ও বিত্তবান হিন্দুর যখন চাওয়ার আর কিছু থাকল না, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েও শিক্ষিতরা সরকারী কৃপাবঞ্চিত হয়ে বেকার হচ্ছিল বা স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে স্বল্প বেতনে কাজ করছিল, তখনই অপ্রাপ্তির ও বঞ্চনার ক্ষোভ নিয়ে মনে-মননে ও কর্মে-আচরণে ব্রিটিশবিরোধী হয়ে উঠছিল তারা উনিশ শতকের শেষ পাদে। সুচতুর ব্রিটিশ সরকার ভাবী দ্রোহের আশঙ্কায় বাঙালী বাবুদের জাতিচেতনা, সংঘশক্তি ও সংহতি বিনষ্টি লক্ষ্যে বঙ্গ বিখণ্ডিত করে বিচ্ছিন্নতার দেয়াল তোলে ১৯০৫ সনে। বাঙালী হিন্দুরা এ ষড়যন্ত্র টের পেয়ে মরিয়া হয়ে আন্দোলন করে। তখন তাদের জিগির ছিল মাতৃস্বরূপা মাতৃভূমিকে বিখণ্ডিত করা চলবে না। জান কবুল, বঙ্গমাতাকে অখণ্ড অবয়বে রাখবই– এ ছিল সেদিনকার শপথ। আবার ছত্রিশ বছর পরে (১৯০৫ সনের আন্দোলনের শরিক কয়েক লক্ষ হিন্দু ১৯৪৭ সনে বেঁচে বর্তে ছিলেন) সে-হিন্দুরাই আবার বঙ্গমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্যে সোল্লাস দাবি জানায়, অখণ্ডিত রাখার প্রস্তাব সক্রোধ প্রত্যাখ্যান করে। গান্ধী যিনি অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা তিনিও পাঞ্জাব ও বাঙলা খণ্ডিত করার দাবিদার হলেন কারণ অখণ্ড পাঞ্জাবে বাঙলায় হিন্দুরা হবে উনজন। এদিকে দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভাবক ও প্রবক্তা জিন্নাহ অখণ্ড বাঙলার ও পাঞ্জাবের সমর্থক হয়ে গেলেন হিন্দু-মুসলিম বাঙালীর ও শিখ-হিন্দু-মুসলিম পাঞ্জাবীর অভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা বা জাতিচেতনা স্বীকার করেই। কারণ বাঙলায় ও পাঞ্জাবে মুসলমানরা অধিজন। আবার অখণ্ড বাঙলা ও অখণ্ড পাঞ্জাবপ্রেমীও হলেন পাকিস্তানকামী মুসলিম লীগার শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ফিরোজ খান নুন। আসামের গোপীনাথ বড়দলুই আসামের স্বাতন্ত্র্যকামী হলেন গান্ধীর পরামর্শেই। জিন্নাহ মাউন্টব্যাটেনের চাপের চোটে দ্বিজাতিতত্ত্ব পরিহার করলেন শেষ মুহূর্তে–রাজি হলেন গণভোটে। আবার মুসলিমদের স্বাধীন স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবিদার এই জিন্নাহই গভর্নর জেনারেল হিসেবে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন নতুন তত্ত্ব : পাকিস্তানে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই রাষ্ট্রের সমমর্যাদার ও সমঅধিকারের নাগরিক। কংগ্রেসও তো সেক্যুলার ভারত রাষ্ট্রকামী ছিল, তা হলে আর পাকিস্তান কেন! যে-যুক্তিতে গান্ধী অখণ্ড বঙ্গ ও অখণ্ড পাঞ্জাব পছন্দ করেননি, তিনি কাশ্মীর কিংবা উত্তর-পূর্বপ্রান্তের (NEFA) এলাকা সম্বন্ধে সে-যুক্তি কখনো উচ্চরণ করেননি। নেহেরু কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের অঙ্গীকার করেও পালন করেননি। নেপালী রক্তের নেতা দর্জির আহ্বানে লেপচা-ভুটিয়ার সিকিম গ্রাস করে ভারত সরকার। বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী মোঙ্গল গোত্রীয় লোকের এলাকা উত্তর-পূর্ব প্রান্ত ওদের দাবি সত্ত্বেও ভারত ছাড়ে না কেন! ওই অঞ্চল কখনো জম্বুদ্বীপের কিংবা ভারতবর্ষের অংশ ছিল না। এ ছিল বুনো কিরাত মোঙ্গলের নিবাস। কেবল হিটলার-মুসোলিনী বিনাশ লক্ষ্যে দুই আদর্শিক মেরুর রুশ-মার্কিন ঐক্য ও জোটবদ্ধ হল, সাফল্যের মুহূর্ত থেকেই তাই দু'শক্তির মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে শুরু হল দ্বন্দ্ব। কেবল এরশাদ বিতাড়ন লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়া ও বামপন্থী পাঁচদলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রতিক জোটও আন্দোলনের সফলতার বা ব্যর্থতার মুহূর্তেই ভাঙবে, এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুভাবাপন্ন দলগুলো লিপ্ত হবে দ্বন্দ্বে ও সংঘর্ষে।

বলেছি রাজনীতি ও রাজনীতিক কখনো যুক্তি মানে না কেবল শক্তি মানে। এ ক্ষেত্রে শাশ্বত নীতি একটাই 'জোর যার মুলুক তার'। আর হুজুগে তাড়িত ও নেতাচালিত জনগণ যে গড্ডল স্বভাবেরই হয়– তা গোড়াতেই কবুল করেছি। দুনিয়ার সব দেশের সব রাজনীতি ও রাজনীতিক চারিত্রে ও লক্ষ্যে অভিন্ন।

ভাস্কর মূর্তি ও বিকৃতচেতনা

আদি মানুষেরা প্রতিকৃতি প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করেই নাকি তাদের আকাঙ্ক্ষা-অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করত। যাদুবিশ্বাসী মানুষকে বাঞ্ছাসিদ্ধির আকৃতি নাকি এ অঙ্কনে প্রবর্তনা দিত। উপকরণ আয়ত্তে ছিল না, মাটির ও পাথরের বুকই ছিল অবলম্বন। অঙ্কন ছিল শ্রম, ধৈর্য ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। আর সেদিনও অঙ্কনে প্রয়োজন হত তীক্ষ্ণ ও গভীর বীক্ষণ শক্তি, যন্ত্র-নিয়ন্ত্রণের অনুশীলনজাত নৈপুণ্য এবং সৃষ্টির জন্যে বাস্তবঘেঁষা শিল্পচেতনা।

তারপরে মানুষের বুদ্ধির, প্রয়োজন চেতনার, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্রম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পোড়ামাটি, পাথর, ধাতবপাত, চামড়া, বল্কল, কাঠ প্রভৃতিকে ব্যবহার করেছেন অঙ্কন-চিত্রণের জন্যে।

একসময়ে অঙ্কন-চিত্রণের আদি প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের অন্তরস্থ গভীরতম চিন্তার, চেতনার, অনুভূতির, আকাঙ্ক্ষার ও সৌন্দর্যবুদ্ধির অভিব্যক্তির বাহন হিসেবে এ আদি ও আদিম উপায় ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, প্রতিকৃতিতে ও মূর্তিশিল্পে, রঙ-তুলিজ চিত্রণে গভীর ও ব্যাপক তত্ত্বে ও তথ্যে, রূপে ও রসে, ভাবে ও ভাবনায় শাস্ত্রের, সাহিত্যের, দর্শনের, ইতিহাসের, আদর্শের, প্রেরণার প্রতীক ও প্রতিভূ হয়ে ওঠে। ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য খণ্ডচিত্র ও ম্যুরাল আজ রৈখিক শিল্প। এভাবে আদি সমাজে অরি-মিত্র আসমানী শক্তিও সমূর্ত ও প্রমূর্ত হয়ে ওঠে ক্ষতিভীরু প্রাপ্তিলোভী মানুষের ভয়-ভক্তি ভরসার মানস-আশ্রয়রূপে।

বহু শতাব্দী ধরেই অপৌত্তলিক মানুষের কাছে প্রতিকৃতি, মূর্তি কিংবা চিত্র পূজ্য কিছু নয়। কিন্তু চিন্তার, চেতনার, অনুভূতির, উপলব্ধির, কল্পনার ও আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তির রূপ-রসময় আলেখ্য ও বাহনরূপেই তা মানবসমাজে অনুশীলিত ও চর্চিত হয়ে সংস্কৃতি-সভ্যতার পরিব্যক্ত প্রতীক হয়ে ক্রমে বহুমুখী উৎকর্ষ লাভ করছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষ নিরবয়ব হাওয়াই কিছু ধারণাগত করতে পারে না বলেই সে মনে মনে তথা কল্পনায় অন্তত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা প্রয়োগে মানসিকভাবে যে-কোন গুণকে ও শক্তিকে, যে-কোন অদৃশ্য কর্মে ও আচরণে অবয়ব দিয়ে [ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী তার প্রমাণ] কল্প-মূর্তি তৈরী করে, পষ্ট ধারণার অনুগত করে স্বস্তি-সুখ পায়। তাই পিতার ছবিতেও পিতার মর্যাদা ও মমতা স্বতো আরোপিত হয় বলেই ছবিকে দলিত করা সম্ভব হয় না। নিরাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহরও তাই আর্শ-কোর্স-হাত-পা-দরবার মানুষ ভাষায় মূর্ত করে আবেদন নিবেদন করে, অভিব্যক্তি দেয় বক্তব্যের। এ তাৎপর্যে সব মানুষই বিচিত্রভাবে পুতুলপ্রিয়, পটুয়া, পৌত্তলিক। বহুকাল ধরেই বিশ্বের শাস্ত্রমানা মুসলিম সমাজেও চিত্রী ও চিত্র নিন্দিত নয়। কোরআন-হাদিসমানা শিয়ারা শাস্ত্র সম্পৃক্ত জিন ও মানুষের চিত্র (ইরানে নবীর ছবিও) বহু শতাব্দী ধরে অঙ্কিত করে আসছে। খলিফা আবদুল মালিকের আমলের মুদ্রায় গ্রীক-রোমান আদলে মূর্তি উৎকীর্ণ থাকত। কাজেই সব সম্প্রদায়ের মুসলিমের মূর্তি সম্বন্ধে মন-মত অভিন্ন নয়। ফটো চলচ্চিত্রও চালু রয়েছে।

তাছাড়া, আজ আমরা মানুষের তৈরী স্মারক বেদী-সৌধে পবিত্রতা আরোপ করি, ফুল দিই, সেল্যুট ভেজি, জীবন্ত মানুষ জ্ঞানে সম্মান-শ্রদ্ধা জানাই, স্মারক অনুষ্ঠানে ছবির ফ্রেমেও মালা পরাই, এমন কি কেউ কেউ মোমবাতি-আগরবাতিও জ্বালে। জন্মোৎসবে হৃত বয়সপ্রতীক মোমবাতি জ্বালে আর নেভায়। কেউ কেউ প্রতিকৃতি আঁকায়, কেউ ফটো বৃহদায়তন করে, কেউ কেউ বড় ছোট মাঝারি ভাস্কর মূর্তি গড়ায়। কৃতি কীর্তিমান মানুষের ভাস্কর মূর্তি সড়কে, পার্কে, ভবনে, যাদুঘরে শোভা পায়।

আবার নিষ্ঠ শাস্ত্রমানা মানুষও পশু-পাখি-মানুষের চিত্র বা মূর্তিযুক্ত টাকা বুকের পকেটে রেখেই নামাজ পড়ে, কখনো পাপচেতনা জাগেনি, জাগে না তার। পাসপোর্টও পকেটে রেখেই বুকে ঝুলিয়েই মানুষ নামাজ পড়ে, হজ্জকৃত্যও করে। ছবি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ জেনে-বুঝেও মুসলিমরা, মুসলিম-রাষ্ট্রের সরকারেরা আপত্তি করে না, যেমন মক্কার সরকারও পাসপোর্টে ছবি রাখার শর্ত প্রত্যাহার করে না।

ভাস্কর-উৎকীর্ণ মূর্তিতে, স্থপতি নির্মিত মূর্তিতে ও চিত্রী অঙ্কিত ছবিতে কিংবা ফটোতে, চলচ্চিত্রে পার্থক্য কি এবং কোথায়? পার্থক্য উপকরণের ও পদ্ধতির। অপৌত্তলিকরা যেহেতু কোনটাই পূজার জন্যে বানায় না, সেহেতু কোনটাই আপত্তিকর থাকেনি— আপত্তির কারণ নেই বলেই। কাজেই ভাস্করমূর্তির আলাদা অপরাধ কি?

মানুষ, হায়রে মানুষ, শহুরে শিক্ষিত মানুষও কি আজো ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি-বিবেক-বিবেচনায় আনুগত্য স্বীকারে নারাজ থাকবে।

ভাস্কর মূর্তির নির্মাণ ও উদ্যানে সড়কে প্রতিষ্ঠা যে দেশাচার ও সরকারী নীতিবিরুদ্ধ নয় এবং ভাঙা যে দণ্ডনীয় অপরাধ, তা কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিমূর্তি ভাঙার সাম্প্রতিক ঘটনার সূত্রে সরকারের স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা উচিত।

পঞ্চ প্রসঙ্গ ঃ

শেখা-জানা-বোঝার রয়েছে নানা উপায়— দেখে, শুনে ও পড়েই সাধারণত মানুষ জ্ঞান লাভ করে, আর ঠেকে ও ঠকে যে অভিজ্ঞতা, তা-ই হয়তো শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-প্রজ্ঞা। এমনি জানা-বোঝাই সবচেয়ে কেজো সম্পদ, জীবনে চলার পথের পুঁজি-পাটা-পাথেয়। আমরা সচেতন প্রয়াসে শিখি কম, আকস্মিকভাবেই দেখে শুনে পড়ে এবং ঠেকে-ঠকে শিখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি। ফলে অভিজ্ঞতার বাইরে লব্ধজ্ঞান, প্রাপ্ত শিক্ষা, জানা বিষয়, বোঝা তত্ত্ব সাধারণভাবে প্রায়ই থাকে অপূর্ণ ও অস্পষ্ট। নিখাদ, নিখুঁত, সুস্পষ্ট, সুসম্পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যিক যে-কোন জীবন উদ্ভিদ বস্তু বিষয় তত্ত্ব বা তথ্য সম্বন্ধে লিখিয়ে বলিয়ে লোকদের তথ্য শিক্ষক, বক্তা, লেখক, বিদ্বান, মনীষী, বুদ্ধিজীবী বা মস্তিষ্কজীবীদের। নইলে লেজ আছে শুনেই ছুঁচো থেকে হাতী অবধি সবাইকে এক প্রজাতিভুক্ত ভাবার প্রবণতা যায় না।

১ বুদ্ধিজীবী

ইংরেজীতে Intelligentsia N Intellectual বলে দুটো শব্দ আছে। কিন্তু আমরা বুদ্ধিজীবী, মগজজীবী বা মস্তিষ্কাজীব [মস্তিষ্ক+আজীব] অভিধায় উক্ত দুই শ্রেণীর লোককেই সাধারণভাবে নির্দেশ করি। অথচ ইংরেজিতে যাদের White collar বা সাফকাপুড়ে বলা হয়, তারা সবাই অর্থাৎ আমাদের শিক্ষিত মানুষমাত্রই সে-অর্থে ভদ্রলোক এবং অফিসের প্রতিষ্ঠানের সংস্থার অফিসার, উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-সাংবাদিক প্রভৃতি সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী মগজজীবী বা মস্তিষ্কাজীব বা Intelligentsia. মৌলিক ভাব-চিন্তার অনুশীলক তথা মননশীল ব্যক্তিই দার্শনিক, বিজ্ঞানীই কেবল Intellectual বা মনীষী নামে অভিহিত হবেন। যেমন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবশ্যই ছোট বড় মাঝারি বিদ্বান বলে আখ্যাত হবার অধিকার রয়েছে। এঁরা সাধারণভাবে Learned বা বিদ্বান এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্ব স্ব বিষয়ে লিখিয়ে [লিখতে হলেই পড়তে হয়] বা পড়ুয়া হিসেবে পণ্ডিত বা Scholar রূপে সমাজে সম্মানিত ও স্বীকৃত হন।

www.amarboi.com

অতএব White collar, learned, Scholar, Intelligentsia, Intellectual দের আমরা বাঙলায় সাফকাপুড়ে, বিদ্বান, পণ্ডিত, মগজজীবী বা মস্তিষ্কাজীব [বুদ্ধিজীবী— সুষ্ঠু পরিভাষা নয়, কেননা বুদ্ধি প্রাণী মাত্রেরই চলমান জীবনে ও জীবনাচারে আবশ্যিক পাথেয় এ পুঁজি।] এবং মনীষী পরিভাষা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। এগুলোই হবে যথাশব্দ। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে সব শিক্ষকই সাধারণ অভিধায় বিদ্বান [learned] কেউ কেউ জ্ঞানী পণ্ডিত [Scholar] এবং হাজার শিক্ষকের মধ্যে দু'-একজন মনীষী, যিনি লোকগ্রাহ্য নতুন চিন্তা-চেতনা-মন-মত-পথ সৃষ্টি ও প্রচার করেন। প্রসঙ্গত চিন্তাবিদ [যিনি চিন্তা জানেন] নয়, যথাশব্দ হবে চিন্তাশীল [যিনি চিন্তা করেন] অথবা চিন্তক।

২ সংস্কৃতি

শুনতে পাই সংস্কৃতির শতোর্ধ্ব সংজ্ঞা চালু রয়েছে গোটা দুনিয়ায়। তবু এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পায়নি কেউ। অনেকেই নাচে গানে বাজনায় অভিনয়েই সংস্কৃতির প্রকাশ বলে জানে ও মানে, এগুলোকেই তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে। কিন্তু সিনেমাকে, মিলাদকে, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করে না। আবার শাস্ত্রিক সামাজিক আচার-আচরণকে, নির্মাণ-উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরুচি নৈপুণ্য সৌন্দর্যবুদ্ধি, সজ্জা, শৃঙ্খলাপ্রীতি প্রভৃতিকেও কেউ সংস্কৃতির বাহ্য ও বাস্তব প্রকাশ বলে স্বীকার করে না। এমনকি মানুষের সততা, সৌজন্য, কৃপা-করুণা, দান-দক্ষিণা, সাহায্য, সহযোগিতা, বিবেক-বুদ্ধি— এক কথায় মানুষের অভিব্যক্ত প্রাতিক্ষণিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণকেও কেউ সংস্কৃতি সম্পৃক্ত বলে সহজে সোজাসুজি মেনে নেয় না। মানুষের অর্জিত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণই যে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় অর্থেই সংস্কৃতি, তা আমাদের মনেও কখনো জাগে না। এ জন্যেই আমরা প্রাকৃত জনের, নিরক্ষরের, নিঃস্বের, ভিখিরীর, মজুরের সংস্কৃতি স্বীকার করিনে, লোকজীবনকে, লোকসাহিত্যকে, লোকাচার-আচারণকে আমরা এককথায়, 'ফোকলোর' বলে আখ্যাত করে নিজেদের তথ্য বিদ্যা-বিত্তের লোকদের মানুষ ও ভদ্রলোক নামে অভিহিত করি। 'লোক' আর গান্ধী প্রদত্ত 'হরিজন' নাম তাৎপর্যে অভিন্ন।

দৈহিক কারণেই অন্য প্রাণীর আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের সহজাত বুদ্ধি, আগ্রহ, উদ্যম-উদ্যোগ রয়েছে। মানুষের কাছে প্রশিক্ষণ না পেলে ওরা সারাজীবন একই নিয়মে জীবন যাপন করে। মানুষ তার কায়িক তথা 'হাত' রূপ প্রত্যঙ্গের প্রয়োগে স্বরচিত ও স্বায়ত্ত কৃত্রিম জীবন প্রতিবেশে বাস করে। তার অনুভবের ও উপভোগচেতনার ক্রমবিকাশে ও বিস্তারে তার বিচিত্র চাহিদা তাকে আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে করেছে অনুপ্রাণিত ও প্রয়াসী। এর ফলেই সাধ্যানুসারে মানুষমাত্রই জীবনাচারের ক্ষেত্রে অগ্রসরমান। বিকাশের তারতম্য ঘটেছে মানসিক শক্তির মাত্রাভেদে, প্রাতিবেশিক (প্রাকৃতিক) কারণে উৎকর্ষের অভাবে। তাই আদি আরণ্য ও সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তির উৎকর্ষধন্য মানুষ আজো সমকালীন। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্বজনীন ও চিরকালীন হলেও মানুষের অসম বিকাশের দরুনই সংস্কৃতির কোন সর্বজনীন রূপ নেই কোথাও।

আদি মানবের-জীবিকার ঋদ্ধির ও নিরাপত্তার ভয়-ভরসাজাত অরিমিত্র শক্তির কাল্পনিক অস্তিত্বের ধারণাই করেছে মানুষকে বিশ্বাস-সংস্কারের অনুগত। ভয়-ভরসাজাত সংস্কারই মননগ্রাহ্য বিশ্বাসের স্তরে উন্নীত হয়ে অলিখিত ও লিখিত শাস্ত্ররূপে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা দলের, স্থানের বা কালের মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেছে। শাস্ত্রোক্ত নিয়মনীতি ও রীতিপদ্ধতিই শাস্ত্রমানা মানুষের মানসসংস্কৃতির ও আচার-আচরণের নিয়ামক।

আমরা জানি, আবিষ্কার-উদ্ভাবন মাত্রই ব্যক্তিক, যৌথ বা সামাজিক নয়। একের সৃষ্টি অন্য সবার অনুকৃত বা অনুসৃত আচারমাত্রা। একের আবিষ্কার অন্য সবারই অনুকৃত বা ব্যবহৃত সম্পদ ও সম্পত্তি মাত্র। অতএব, সংস্কৃতির স্রষ্টা ব্যক্তি বিশেষ, আর আচাররূপে ধারক হচ্ছে দেশ-কাল-সমাজ-শাস্ত্র প্রভৃতি।

কাজেই যা কিছু দেখতে শুনতে বলতে করতে কুৎসিত, তা পরিহার করা এবং যেসব ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণ মানুষের যৌথ তথা সমাজিক জীবনে শ্রেয় বা হিতকর, সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের অনুকূল, তা-ই বাঞ্ছিত সংস্কৃতি। অতএব, যৌথ বা সামাজিক জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক, সুরুচি-সৌজন্য, সহানুভূতি, আত্মমর্যাদা, দায়িত্ববুদ্ধি, কর্তব্যচেতনা প্রভৃতির সমন্বিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। এক কথায় শ্রেয়োবুদ্ধি ও সৌজন্যই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানসসৃষ্ট ও মানসসম্পদ, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে অভিব্যক্ত সৌজন্যই সংস্কৃতিমানতা। সংস্কৃতিমান মানুষের নৈতিকচেতনা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সর্বক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ ও তীব্র। কেননা সংস্কৃতিমান ব্যক্তি ন্যায়বুদ্ধিচালিত জেনে-শুনে-বুঝে সে কোন অপকর্ম আত্মমর্যাদা বা বিবেকহানির ভয়ে করে না। তাই সে তার বিশ্বাস ও যুক্তিবুদ্ধি অনুসারে শাস্ত্রের, সমাজের, রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেনে চলে। যখন অমান্য করে তখনো যুক্তিবুদ্ধি-বিবেকের সমর্থন পেয়েই করে। এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে বিদ্যা, বিত্ত ও প্রযুক্তি সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটায়।

সংস্কৃতি বহতা নদীর মতো সৃজ্যমান, গতিশীল ও উৎকর্ষপ্রবণ। বন্ধ্যাসংস্কৃতি পরিহার্য সংস্কার ও আচার মাত্র, যা মানসিক সৃষ্টিশীলতা ও আচারিক বিবর্তনশীলতা রুদ্ধ করে, শীতকালীন ক্ষুদ্র জলাশয়ের বদ্ধজলের মতো মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সংস্কৃতি তাই দেশী-বিদেশী হয় না, আংশিকভাবে শাস্ত্রিক ও নৈতিক চেতনানুগ হয়, এবং সংস্কৃতি বদ্ধ ও মুক্ত নামেও অভিহিত হতে পারে রক্ষণশীলতার ও গ্রহণমুখিতার মাপে। তবে উঁচুমানের, মাপের ও মাত্রার প্রবহমান নিত্য সৃজনশীল ও বিকাশমান সংস্কৃতি তা-ই, যা দেশ কাল জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে নতুনকে ও উৎকৃষ্টকে, যে-কোন মানুষের সৃষ্টিকে মানুষেরই মানবিক উত্তরাধিকার রূপে নিঃসংকোচে গ্রহণ বরণ করে (যন্ত্র বস্তু প্রযুক্তিকে যেমন গ্রহণ ও ব্যবহার করে) ঋদ্ধ হয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাই অপসংস্কৃতি বলে কিছু নেই। স্থানকালীনধীন সমাজের উপলব্ধির ও উপযোগবুদ্ধির স্তর ও মাত্রানুসারে এক দেশের বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি অপর দেশের বা গোষ্ঠীর কাছে অনভিপ্রেত অপসংস্কৃতি বলে মনে হয় মাত্র। দৃষ্টির ও বিচারের এ পার্থক্য পরিবারে পরিবারেও রয়েছে।

সন্ধিৎসু বঙ্কিমচন্দ্র 'কালচার'-এর অনুরূপ অভিধায় 'অনুশীলন' শব্দটির ব্যবহার চালু করেছিলেন, তার আগে 'কালচার'-এর কোন প্রতিশব্দ ছিল না। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'কালচার' এর মৌল অর্থসাদৃশ্যে কৃষ্টি শব্দটি প্রয়োগ করতেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টিতে তুষ্ট থাকেননি। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'আত্মসংস্কৃতি' কথাটি আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি আত্মার সংস্কার জ্ঞাপক 'সংস্কৃতি' শব্দটি সানন্দে কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন ১৯২৩ সন থেকে। তারপর বহুমনের মন্থনে ও বহুজনের প্রয়োগে সংস্কৃতি এখন ব্যক্তির ও জাতির মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় শোভন এ সৃষ্টিশীল ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিক রূপই নির্দেশ করে। যেহেতু চিৎপ্রকর্ষই গতিশীল বিবর্তমান উৎকর্ষমুখী-সংস্কৃতির উৎস, যেহেতু প্রেয় নয়, শ্রেয়োবোধে সংঘর্ষ-সংঘাত এড়িয়ে সমাজে সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের যোগ্যতাই হচ্ছে সংস্কৃতিমানতা, সেহেতু এবং কাজেই সৌজন্যই হচ্ছে সংস্কৃতি।

AMARBOI.COM

৩ মুসলিমদের উনিশ শতকী শিক্ষাতত্ত্বঃ

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতক অবধি একটি ভুল ধারণা বাঙলাদেশের মানুষের সংখ্যাগুরু অংশের শৈক্ষিক, সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থিক জীবনের ইতিবৃত্ত বিকৃত করে চলেছে। সেটা হচ্ছে স্বধর্মীর শাসনের অবসানে স্বাধীনতাভিমানী হৃতরাজ্য ও হৃতসম্পদ দেশজ মুসলিমরাও পরাজয়ের ক্ষোভ ও গ্লানিবশে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষাগ্রহণে বিমুখ ছিল। এ ধারণার অনুকূলে ইংরেজ ও হিন্দু-মুসলিম বিদ্বানেরা তথ্য প্রমাণও উপস্থিত করেন। কিন্তু ওই তথ্য প্রমাণের মূলেই যে ভুল ও বিভ্রান্তি রয়ে গেছে, তা আজ অবধি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, করে না, তা হচ্ছে ওদের আরবী-ফারসী শিক্ষাও ছিল না কখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম ভুল ঃ বাঙলা-বিহার-উড়িশা নিয়েই ছিল আঠারো শতক থেকে ১৯০৫ অবধি সুবেহ বাঙ্গালা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। ইংরেজ আমলের বাঙলাভাষী অঞ্চলের কোন বিষয় আলোচনা কালে বিহার-উড়িশার পরিপ্রেক্ষিত বা পটভূমিকা বিবেচনায় আনা হয় না। অথচ ইংরেজের সব আইনই সুবাহর সর্বাঞ্চলের জন্যে রচিত ও প্রযোজ্য ছিল।

দ্বিতীয় ভুল ঃ দেশজ তথা নিম্নবর্গের বৌদ্ধ-হিন্দুজ নিঃস্ব নিরক্ষর শোষিত অবজ্ঞেয় মুসলিম সমাজের ও তুর্কী-মুঘল শাসক গোষ্ঠীর মুসলিমদের লেন-দেন সম্পর্ক ছিল সর্বক্ষেত্রেই রাজা-প্রাজার, শাসক-শাসিতের-স্বধর্মীর নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নয়। তার প্রমাণ মালদহ, রাজমহল, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের দেশজ মুসলিমদের নাম, নিরক্ষরতা, আচার-আচারণ, বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির আজ অবধি চালু রূপ।—এ তথ্যে অমনোযোগ–অবহেলা।

তৃতীয় ভুল ঃ নিম্নবর্গের দেশজ মুসলিমদেরও সাধারণভাবে তাদের জ্ঞাতি নিম্নবর্গের ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতোই শিক্ষার বা সাক্ষরতার ঐতিহ্য যে ছিল না, তা কখনো মুসলিমদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়নি, হয় না।

চতুর্থ ভুলঃ যখন ওহাবী প্ররোচনায় এবং পরাধীনতার ক্ষোভ ও গ্লানিজাত ব্রিটিশ বিদ্বেষবশে যে ইংরেজী শিক্ষা মুসলিমরা গ্রহণ করেনি— এ সিদ্ধান্তে পৌছার আগে (১) গাঁয়ে-গঞ্জে মুসলিমরা বাঞ্ছিত হারে বাঙলায় ও ফারসীতে সাক্ষর শিক্ষিত ছিল কি-না (২) ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র পাটনায় তথা বিহারে ধনী মানী শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ ও ইংরেজি বিরাগ ছিল কি-না (৩) প্রতীচ্যদেশজ আধুনিক জাতীয়তাবোধ ও মাটিভিত্তিক স্বদেশচেতনা অননুভূত থাকা সত্ত্বেও নিতান্ত স্বধর্মীপ্রীতি ব্রিটিশবিদ্বেষ [ওহাবীরাও গোড়ায় ব্রিটিশ মিত্র ছিল, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর জীবিত কালে, তীতুমীরের লড়াই কালেই ১৮৩২ থেকে ব্রিটিশ ওহাবীশত্রু হয়ে ওঠে] জাগিয়েছিল কি-না। (৪) বহিরাগত মুঘল শাসকগোষ্ঠীর কেউ যে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে বিমুখ ছিল না [কেননা গোড়া থেকেই ধনী মানী সাক্ষর শিক্ষিত মুসলিমরা সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়েছিল, ফলে ১৮৬২ সন থেকেই প্রবেশিকা নয় স্নাতক মুসলিমও পাওয়া যাচ্ছিল] এসব তথ্য, তত্ত্ব এ সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করেননি কেউ।

আগ্রহ থাকলেও গাঁয়ে বিদ্যালয়ের অভাবে ইংরেজী পড়ানো সম্ভব যে ছিল না, তার প্রমাণ উনিশ শতকের শেষ পাদে শিক্ষিত ও ধনী হিন্দুর উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে মুসলিমরা সন্তান ভর্তি করাতে থাকে। ফলে সংখ্যাগুরু বর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলিমরাই গোড়ার দিকে শিক্ষার সুযোগ পেতে থাকে। তা ছাড়া দারিদ্র্যও শিক্ষার প্রয়োজনচেতনার অভাব তো চিরনিঃস্ব ও অবজ্ঞেয় সমাজে ছিলই। বিশ শতকের আগে নিম্নবর্গের ও বর্ণের হিন্দুসমাজেও শিক্ষিত ছিল দুর্লভ।

পঞ্চম ও গুরুতর ভুল করেছেন শিক্ষা কমিশনের ব্রিটিশ ও উর্দুভাষী মুসলিম সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে দেশজ মুসলিমদের ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতিগত কোন সম্পর্ক বা পরিচয় ছিলই না। তাই দেশজ বাঙালী মুসলিম সমাজ এবং তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী থেকে পাওয়া আয়মা-মদদেমাস-ওয়াকফ সম্পত্তি ভোগী আভিজাত্যভিমানী স্বল্পসংখ্যক মুসলিম পরিবারগুলো যে দুটো পৃথক নিঃসম্পর্ক শ্রেণী এবং দুটো শ্রেণীর জীবন-জীবিকা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনাদর্শ ও জীবনাচার যে একেবারেই আলাদা, তা তাঁর কখনো বিবেচনার বিষয় করেননি। মুর্শিদাবাদের ও কোলকাতার স্বঘোষিত, স্বয়ংসিদ্ধ ও ব্রিটিশনিয়োজিত বিদেশাগতের বংশজ উর্দুভাষী ফারসীশিক্ষিত শহুরে অভিজাতরাই [দেশজ শিক্ষিত বাঙালী মুসলিমের অভাবে] বাঙালি মুসলিমদের অভিভাবকরূপে কোম্পানী ও ভিক্টোরিয়া সরকারে পরামর্শদাতা ছিলেন। এসব মুসলিমদের দাবিতেই কোলকাতায় মাদ্রাসা (১৭৮০) এবং মুর্শিদাবাদে [১৮২৪ সনে] ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। দুটোতেই শিক্ষক-ছাত্র ছিলেন সাধারণভাবে অবাঙালী। আরবী-ফারসী-বাঙলা শিক্ষিত দেশজ বাঙালী ছিল সেই অনক্ষরতার অন্ধকার যুগে যথার্থই 'হাজারে না মিলে এক'। কেন মেলে না, সরকারের বৃত্তিঘোষিত প্রচার-প্রণোদনা সত্ত্বেও কেন স্কুলে ছাত্র মেলে না তার কারণ সন্ধান ও অনুমান করেছেন উর্দুভাষী নেতারা এবং ইংরেজ সরকার ও শিক্ষাবিদরা বিভিন্নরূপে। সেগুলো এই : হৃতরাজ্য, হৃতসম্পদ বিক্ষুব্ধ মুসলিমরা পরাজয়ের গ্লানিজাত ব্রিটিশ বিদ্বেষ বশে ইংরেজের চাকরী ও ইংরেজী ভাষা দুটোকেই ক্ষোভে ঘৃণায় পরিহার করেছিল, ওহাবী প্ররোচনায় ইংরেজ ও ইংরেজী দ্বেষী হয়ে উঠেছিল, স্বধর্মে আস্থা ও স্বসংস্কৃতি হারানোর আশঙ্কায় বাঙলা বা ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণে বিমুখ ছিল। [এ জন্যে উর্দু-ফারসী মাধ্যমে মুসলিমদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবও সরকার বিবেচনা করছিল। অথচ গাঁয়ে-গঞ্জে দেশজ মুসলিমদের মধ্যে উর্দুভাষী ও ফারসীজানা পরিবার একটিও ছিল কি-না, সে-খোঁজ কেউ নেননি।] অথচ শিক্ষার ঐতিহ্য থাকলে মাদ্রাসায় কেন হাজারে বা শতে শতে দেশজ মুসলিম সন্তান ভর্তি হয় না— সে প্রশ্ন তাদের মনে জাগেনি কখনো। কাজেই বাঙালী মুসলিমদের শিক্ষাগ্রহণে অনীহার অনুমিত কারণগুলো ভ্রান্ত চিন্তার ও তথ্যতত্ত্বেরই ফল।

AMARBOI.COM

দেশজ বাঙালীর পরম্পরাগত জীবন-জীবিকা, জীবনাচার ও জীবনভাবনা এবং তাদের আর্থিক-সাংস্কৃতিক, মানসিক-আত্মিক অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকলে তাঁরা সহজেই (যা Adam বা মল্লিক লক্ষ করেননি) বুঝতে পারতেন যে শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না বলে তারা সরকারী উপদেশে-উৎসাহে উদ্যোগে এবং সমাজহিতৈষীদের পরামর্শে, আবেদনে, আহ্বানে সাড়া দেয়নি। কোলকাতা প্রভাবিত হিন্দুদের চাকুরে-ব্যবসায়ীরূপে সহজে ধনী হতে দেখল যখন, তখন মুসলিমরাও বিদ্যায় ও বিত্তে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখল এবং সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহ বোধ করল। ততদিনে ১৮৮০ সন এসে গেছে এবং হিন্দুরা অনতিক্রমনীয় দূরত্বে এগিয়ে গেছে। বর্ণ হিন্দুদের এ সমস্যা ছিল না। কেননা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের একটা অংশে আদিকাল থেকেই লেখাপড়ার ও রাজ্যসরকারে চাকরীর ঐতিহ্য বা পরম্পরা ছিল। ফলে কেবল ব্রিটিশ আমলে নয়, তুর্কী-মুঘল শাসনেও গাঁ-গঞ্জে নিম্নবর্গের ক্ষুদ্র পেশাজীবী মুসলিমরা ছিল বিদ্যায়-বিত্তে ধনী মানী ক্ষমতাবান বর্ণ হিন্দু-শাসিত ও শোষিত। অতএব বাঙালী মুসলিমের দর্প-দাপটের তেমন কোন অতীত ছিল না। তার উঁচু মাপের, মানের ও মাত্রার ভবিষ্যৎ রয়েছে অবশ্যই। কেননা বসুন্ধরা চিরকালই বীরভোগ্যা, মনন-মনীষার প্রভাবে ও প্রয়োগে জয় ও উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪ বাঙালী - বাঙলাদেশী ঃ

আজকের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের আটানব্বই ভাগই বাঙালী। অর্থাৎ বহু শতাব্দীর রক্তসঙ্কর মানুষ ভৌগোলিক, আবস্থানিক, আবাসিক, ভাষিক ও জীবিকাগত সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠতায় অভিন্ন পরিচয়ে শাস্ত্রগত বিশ্বাসের ভিন্নতা, অবজ্ঞা, অসূয়া থাকা সত্ত্বেও বাঙালী পরিচয়ে স্বস্থ, সুস্থ ও আত্মীয়তাবোধে আত্মস্থ। তবে প্রগতিশীলেরা শুধু বাঙালী হলেও অন্যরা হয়তো আগে মুসলিম হিন্দু, খ্রীস্টান বা বৌদ্ধ এবং পরে বাঙালী আর কেউ কেউ আগে বাঙালী পরে হিন্দু, মুসলিম ইত্যাদি। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তির ও মন-মননের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে শেষোক্ত দু'টো শ্রেণী গড়ে উঠেছে। অতএব মাপে মানে মাত্রায় বাঙালীত্বে পার্থক্য রয়েইছে। তাই স্বদেশ স্বজাতিবোধেও রয়েছে মাপ মান মাত্রার পার্থক্য। রাজনীতিক মত-পথ-মন্তব্যেও ব্যক্তির বা দলের কর্মে আচরণে তা কখনো প্রকট হয়েও ওঠে। তবে নিজেদের বাঙালী সত্তা সম্বন্ধে আজকাল আর কেউ সন্দেহ বা আপত্তি পোষণ করে না। আগে করত, যেমন মুসলিমরা আরবী ইরানী ইরাকী সমরখন্দী বোখারী মক্কী মদনী সৈয়দ হাসেমী কোরাইশী বলে গর্ব করত। আর বর্ণহিন্দুরাও নিজেদের উত্তর ভারতীয় আর্যবংশজ বলে কুলপঞ্জী তৈরী করাত।

বাঙলাভাষী সঙ্কর বাঙালীর অর্ধাংশমাত্র বাস করে বাঙলাদেশ নামের রাষ্ট্রে। ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী সজ্ঞানে যুক্তিগ্রাহ্য করে কৃত্রিম পরিচয়ে অভিহিত হতে চায়, বলে 'আমি ভারতীয়।' অর্থাৎ রাষ্ট্রিক পরিচয়ে আমি ভারতীয় এবং ভাষিক জাতিসত্তায় বাঙালী। অতএব, ভাষিক-ভৌগোলিক অভিন্নতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রিক ভিন্নতা দুই বাঙলার বাঙালীকে অভিন্ন জাতি রাখেনি, জাতিসত্তার অভিন্নতাও ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যহেতু অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত নয়। আর ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরম্পরা বা ঐতিহ্য তো গ্রহণে বর্জনে বদলায়। হিন্দু ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আরব ইরান ঐতিহ্যের ধারক হয়, খ্রীস্টান হওয়ার মুহূর্তেই হয় খ্রিষ্টীয় পরম্পরার বাহক। দেশান্তরে স্থায়ীবাসী হয়েছে যারা তারাও হয় ছিন্নমূল। কাজেই চিরকালীন তথা প্রাজন্মিক পরিচয়ের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি বা অবলম্বন বলতে গেলে নেই-ই।

ঢাকা শহরের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি সচেতন ভদ্রলোকেরা যখন লেখায় কথায় ভাষণে রাষ্ট্রিক পরিচয়ে নিজেদের বাঙালী বলে দাবি করে, তখন বাঙলাদেশী বলে নিজেদের অভিহিত করে না। তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই ভিন্ন ভাষার, রক্তের ও সংস্কৃতির গারো, খাসিয়া, মুরঙ, চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতির স্বতন্ত্রসত্তা অস্বীকার করে বা তাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব অনুভব করে না তথা তাদের মৌল মানবিক বা রাষ্ট্রে নাগরিক মাত্রেরই সমাধিকার অঙ্গীকার করে না। সরকারের বা জনগণের মনে নাগরিক হিসেবে ঠাঁই নেই দেখে ওরা হতাশ হয়, অপমানিত বোধ করে, জিম্মির বিড়ম্বনা ভোগের আশঙ্কা করে। রাষ্ট্রকে আপন মনে করতে দ্বিধা করে তারা, তাই রাষ্ট্রিক জাতীয়তা প্রাণে-মনে-মননে দৃঢ়মূল হয়ে আবেগ-অনুভবের নিত্যসঙ্গী হয় না তাদের। রাষ্ট্রে সমতা, একতা ও একাত্মতা বোধের অভাবে তারা স্বঘরে স্বদেশে অপরিচিতির, অনাত্মীয়তার প্রতিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। এসব কারণেই উনিশ শতকে য়ুরোপে এবং এ শতকে বিশ্বে অভিন্ন ভাষিক বা একক গোত্রীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, উঠছে। বিভিন্ন জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারকামী দুর্বল ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলো দ্রোহী হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছে স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃত লক্ষ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্যে। অতএব, আমরা শতে আটানব্বই জন সত্তায় বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রিক অখণ্ডতার ও একাত্মতার জন্যেই সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বাঙালী এবং রাষ্ট্রিক পরিচয়ে বাঙলাদেশী হতে হবে আমাদের। সত্য ও শ্রেয় আমাদের এ অঙ্গীকারেই নিহিত।

৫ প্রাচীন ভারত ও হিন্দুত্বঃ

ভারতেও মনে হয় এ পুরোনো আধিটা সম্প্রতি প্রবলতর হয়ে উঠছে। যা কিছু প্রাচীন ভারতের সবটাই যেন হিন্দুর, এমনি একটা দাবি কথায় কথায় অনেকের মুখে লেখায় ও ভাষণে প্রকাশ পাচ্ছে। হিন্দু কারা? এ পরিচয় কত কালের? বিভিন্ন দেবতার পূজক মাত্রই, বিভিন্ন দর্শনের প্রবক্তামাত্রই যে একই গোষ্ঠীর, একই রক্তের বা একই সমাজের, তা প্রমাণ করা যাবে কি? জৈন-বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্য মতের শাখা-প্রশাখা কি? অবিকৃত জৈনমতের লোক সংখ্যায় বেশি থাকলে কিংবা অবিলুপ্ত বৌদ্ধমতবাদীরা কি নিজেদের হিন্দু নামে পরিচয় দিত? শিখেরা এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনজ তথা দেশজ খ্রীস্টান ও মুসলিমরা হিন্দু নামে আত্মপরিচয় দিতে রাজি কি? তা হলে মহেনজেরো-হরপ্পা-লোথাল সভ্যতার ধারকদের বংশধরেরাই বা বেদ-গীতা-অবতারবাদী হিন্দুর জাতি হয় কি করে, সে-সভ্যতাই তাদের ঐতিহ্য হয় কিভাবে? বৌদ্ধ রাজারাও কি হিন্দুর-ঐতিহ্যিক পরম্পরার স্রষ্টা! বিদ্বানদের সাম্প্রতিক মতে খ্রীস্টপূর্ব বারো/এগারো/দশ/নয় শতকের দিকেই ঋগ্বেদ রচিত ও সংকলিত, আর চতুর্থ সহস্রাব্দে ভারতে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার উদ্ভব এবং খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োবিংশ শতকে সিন্ধুসভ্যতার প্রসার, আর চৌদ্দ-তেরো খ্রিষ্টপূর্ব শতকে ভারতে আর্যভাষী উপজাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। আপ্তবাক্য হিসেবে উপনিষদ রচিত ও সংকলিত হতে থাকে সপ্তম থেকে চতুর্থ খ্রীস্টপূর্ব শতকে। এরই মধ্যে জৈন-বৌদ্ধদ্রোহী মতের উদ্ভব।

৩২৭-২৫ খ্রীস্টপূর্ব অব্দে গ্রীক বিজয় ঘটে পাঞ্জাব অবধি অঞ্চলে। তার আগে এ অঞ্চল ছিল পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকে ঘটে শক অনুপ্রবেশ। প্রথম-তৃতীয় শতক অবধি চলে কুশান শাসন, খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতক অবধি চালু থাকে গ্রীক ক্ষত্রপ শাসন। ভারতে ও পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে দর্শনে-রাজনীতিতে-সাহিত্যে-বিশ্বাসে-সংস্কারে-জীবনাচারে-প্রশাসনপদ্ধতিতে, ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে, কৃষি-শিল্পে, হাতিয়ার ও দ্রব্য সামগ্রী নির্মাণে কি গ্রীক, শক, হুন, কুশান, ইরানী, তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ কারো কোন অবদান নেই, তারা সবাই হিন্দুর জ্ঞাতি? অবতারবাদতো নবীবাদ প্রভাবিত। আজকের প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রে বৈদিক আচার-আচরণের 'অগ্নি' ছাড়া আর কি আছে? আর্যত্ব কোথায়? বরং গীতা যেমন অবতারবাদের সাক্ষ্য, তেমনি মন্দিরে প্রমূর্ত দেব-দেবীর উপাসনা, দেবকল্প পশু-পাখি-বৃক্ষ, পূজা-ধ্যান, জন্মান্তরবাদ, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, দর্শন, তন্ত্র-যোগ চর্যা প্রভৃতি কিরাত-নিষাদ-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক-ভেড্ডিডের প্রভাবজ। আর্যত্ব বা বৈদিক শাস্ত্র ও আচার কার্যত দুর্লক্ষ্য। অতএব, কথায় কথায় গৌরব, গর্ব ও দম্ভ প্রকাশ করার পূর্বে প্রাচীন ভারতে কি কারণে হিন্দুর একক অধিকার তা যুক্তি-তথ্য-প্রমাণযোগে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং হিন্দুর ও হিন্দুত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংজ্ঞাও নির্ধারণ করতে হবে। প্রাচীন ভারত জৈনের, বৌদ্ধের, পার্শীর, দেশজ খ্রীস্টানের ও দেশজ মুসলিমের নয় কেন— তাও যুক্তিযোগে জানাতে হবে। সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ক আনুপূর্বিক অনুপুঙ্খ আলোচনায় 'ভারতীয়' বলতে পাকিস্তান ও বাঙলাদেশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি? আসামসংলগ্ন অঞ্চলের মোঙ্গল গোত্রীয় নাগা, মিজো, চাকমা-খাসিয়া, অহোম, মণিপুরী, ত্রিপুরা প্রভৃতি কি ব্রিটিশ পূর্বভারতের অধিবাসী ছিল? প্রচলিত সংজ্ঞায় ওরা কি ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতিভুক্ত— না শাসিত প্রজা?

কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী ও আরণ্যকরাও কি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে হিন্দু। অতএব ভারত আর হিন্দু একার্থক নয়, 'ভারত হিন্দুর চেয়ে বড়ো, হিন্দুর চেয়ে পুরাতন, আর্যের চেয়েও প্রাচীন, বেদের চেয়েও আগেকার'।[১]

আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়, চীন-শক-হুন-পাঠান-মুঘল 'একদেহেলীন' হয়ে কি কেবল হিন্দু হল-আর্য হল! আর্য কারা এবং কতজন, তাদের দান কি এবং কতটুকু!

অধিজনের হিন্দুত্বগর্ব ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ও ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের মন ভাঙে এবং তাদের পর করে দেয় মাত্র।

* [অন্নদাশঙ্কর রায়, ভূমিকা, পৃঃ ১৩/ শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত জিন্না / পাকিস্তান/ নতুন ভাবনা, ১৯৮৮]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহোদরা প্রতিম ফরিদা প্রধান
পুত্র যাহেদ করিম
পুত্রবধূ নাসিমা যাহেদ
এ তিন প্রিয়নাম এ গ্রন্থবুকে অঙ্কিত থাকে।

আর
বন্ধুবর মামুনুর রশীদ, সজ্জনবর শাহজাহান চৌধুরী, সুভাষ ভট্টাচার্য, গৌতম লস্কর, এস. এম. ইউনুস, মুস্তফা মজিদ, আলতাফ হোসেন, সহিদুল ইসলাম
প্রমুখের প্রীতিও স্মরেণ্য করে রাখলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্বিষ্ট সম্প্রদায়চেতনার গোড়ার কথা

জ্ঞানী-গুণীদের ধারণা ভারত-উপমহাদেশে বিজাতি-দ্বেষণার এবং সাম্প্রদায়িকতার উৎস হচ্ছে মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘল শাসনে হিন্দুপীড়ন, ব্রিটিশ শাসনে সুপ্রযুক্ত ভেদনীতি, আর ইংরেজি শিক্ষায় সাধারণভাবে হিন্দু প্রাগ্রসরতা, অর্থসম্পদে একক ঋদ্ধি এবং তাদের সংখ্যাগুরুতা বা অধিজনতা। ওই ধারণা আজ অবধি গোটা উপমহাদেশে জনজীবনে মানসিক–মনস্তাত্ত্বিক আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অপরিমেয় ক্ষতি করেছে।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছে ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই। এর আগে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বা শাসক-শাসিতের মানস-দ্বন্দ্ব এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পীড়ন-বঞ্চনা সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটাতে পারেনি। কেননা, শহরে শাসনকেন্দ্রে শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি-সাহস ছিল না হিন্দুর। আর গাঁয়ে-গাঁয়ে দেশজ মুসলিমরা ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর, নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবর্গের ক্ষুদ্রবৃত্তিজীবী, আর নিতান্তই উনজন। এরা ছিল অর্থ-সম্পদ-শিক্ষার অধিকারী বর্ণহিন্দুর প্রশাসনে। বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে তুর্কী-মুঘল আমলের প্রাশাসনিক পদবী আজো চালু রয়েছে। তা ছাড়া, দেশজ দরিদ্র নিরক্ষর মুসলিমদের প্রতি এখনকার বর্ণহিন্দুর মনস্তাত্ত্বিক অবজ্ঞাও তার সাক্ষ্য। উল্লেখ্য যে, পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে বর্ণহিন্দুরা কোথাও অন্য কোনো কারণে বিপন্ন না হলে ইসলাম বরণ করেনি। কারণ তারা ছিল শূদ্রসেব্য। মানবসাম্যের ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের আচণ্ডালে কোল দিতে হত, খেতে হত এক পাতে, বসতে হত গা ঘেঁষে—এ ছিল পুঁজিপতি মিল-মালিকের ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হওয়ার মতো অসম্ভব ঘটনা আর অবাস্তব চেতনা। তাই দক্ষিণ-পূর্ব আর উত্তর ভারতে ইসলাম বর্ণহিন্দুর পক্ষে আকর্ষণীয় হয়নি। আর জোর করে তরবারির সাহায্যে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করলে গোটা য়ুরোপের খ্রীস্টানের মতোই সর্বত্র মুসলিমই থাকত। তুর্কী-মুঘলের রাজধানী এবং প্রশাসনকেন্দ্রেও কোথাও মুসলিম-অধিজন ছিল না। বেসামরিক প্রশাসনে তো বটেই, এমনকি সৈন্যবাহিনীতেও হিন্দু সিপাহির আর সেনানীর সংখ্যা কম ছিল না। হিন্দুবিদ্বেষী বলে কুখ্যাত আওরঙ্গজেবের সময়ে বরং হিন্দু পদস্থ চাকুরের সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা তেত্রিশ জন। এত হিন্দু আকবরের সময়েও সরকারি চাকুরিতে ছিল না।

শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিহিন্দুর হত্যা বা লাঞ্ছনা, এবং যুদ্ধকালে বা অন্য সময়ে মন্দিরে আশ্রিত শত্রুর কিংবা অপরাধীর সন্ধানে মন্দির-মূর্তি ভাঙাকে ব্রিটিশ শাসক-ঐতিহাসিকরা ফলাও করে ত্রাসকর হিন্দুপীড়নরূপে চিত্রিত করেছেন। ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ-অবমানিত হিন্দু পাঠকও যুক্তিবুদ্ধিপ্রয়োগে তা সম্ভব কি অসম্ভব, বাস্তব কি বানানো–তা বিচার না করেই করেছে বিশ্বাস। নব-আবিষ্কৃত তথ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে—ব্যক্তিগত দ্রোহে-অপরাধে দোষী ধনী-মানী-সামন্ত-প্রশাসক হিন্দুর প্রাণদণ্ড হয়েছে, অর্থসম্পদ হয়েছে বাজেয়াপ্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর, তুর্কী-মুঘল অনেক শাহ-সামন্ত-শাসক-প্রশাসক মন্দিরে অর্থ আর ভূমি দান করেছেন। ব্রিটিশ আমলে প্রযুক্ত ভেদনীতির কুয়াশাচ্ছন্ন, অস্বচ্ছ আর অসুস্থ পরিবেশে কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগেরও গরজ বোধ করেনি ব্রিটিশ-রচিত ইতিহাসের পাঠক, এবং সাম্রাজ্যবাদী এলিয়ট-ডাওসনের দুষ্টবুদ্ধি এবং অভিসন্ধি প্রসূত খণ্ডিত আর বিকৃত অনুবাদে পরিবেশিত তথ্য হিন্দু পাঠকমনে জাগিয়েছিল তুর্কী-মুঘলের এবং সাধারণভাবে মুসলিমের প্রতি ক্ষোভ-ক্রোধ-বিদ্বেষ-ঘৃণা আর মুসলিমদের রেখেছিল লজ্জিত। কাণ্ডজ্ঞান তথা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই বোঝা যেত যে,

১. গোটা ভারতবর্ষ কখনো একই সময়ে তুর্কী-মুঘল শাসনে ছিল না–বিজয়নগর প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল, স্বশাসিত রাজস্থানের রাজ্যগুলোও ছিল। বলতে গেলে, সে যুগের নিয়মে প্রায় গোটা ভারতবর্ষই ছিল সামন্তশাসিত। এবং না বললেও চলে যে, শতকরা পঁচানব্বই জন সামন্তই ছিলেন হিন্দু। কেননা উত্তর-পশ্চিমের একটা অঞ্চল ব্যতীত দেশটা ছিল হিন্দুঅধ্যুষিত। কাজেই, তুর্কী-মুঘল শক্তি সার্বভৌম ছিল বটে, কিন্তু তাদের প্রত্যক্ষশাসন ছিল না বলে তারা অত্যাচার করার সুযোগটাই পায়নি। আর, প্রাশাসনিক কাজে যে হিন্দুই থাকত, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে হিন্দুর দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, শিকদার, মহলানবিশ, সেহলানবিশ, মজুমদার, খাস্তগীর, দস্তগীর, দস্তিদার, সাধু খাঁ, সরকার প্রভৃতি পদবী।

আবার গাঁয়ের দেশজ মুসলিমরা যেমন বর্ণহিন্দুর তাঁবে ছিল, তেমনি অন্ত্যজ হিন্দু নাপিত-ধোপা-কামার-কুমার-চামার-চাঁড়াল-তাঁতি-হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর প্রভৃতিও ছিল দেশজ মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে সেবক ও যোগানদার। অতএব, গ্রামীণ সামাজিক-বৈষয়িক জীবনে সর্বশ্রেণীর হিন্দু-মুসলিমই ছিল পরস্পর নির্ভরশীল। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর আবশ্যিক চাহিদার যোগানদার।

২. রাজার লক্ষ্য সম্মান আর সম্পদ। রাজা রাজস্ব পেলেই, আর আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেই, অত্যাচার-পীড়ন করার কারণ থাকে না। কাজেই বিধর্মী রাজার প্রজার ধর্মবিশ্বাসের বা শাস্ত্রাচারের প্রতি অবজ্ঞা থাকে বটে, যে-কোনো আস্তিকের পরধর্মে অবজ্ঞা থাকেই, কিন্তু প্রজার ধর্ম কাড়ার দুর্মতি কৃচিৎ কোনো স্থূলবুদ্ধি রাজার ঘটতে পারে—সবার কখনোই নয়। ভারতবর্ষে সর্বত্র মুসলিম যেহেতু উনজন, সেহেতু তুর্কী-মুঘল যে স্বধর্মপ্রচারে আগ্রহী ছিল না, তা স্বতঃপ্রমাণিত।

৩. বাঙলাদেশে নওয়াব মুর্শিদকুলি খান যে ইজারাদারি ব্যবস্থা চালু করলেন, তাতে মুসলিম ইজারাদার ছিল নগণ্য। কারণ, নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবর্গের আর নিম্নবৃত্তির হিন্দু-বৌদ্ধজ মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষিত ধনীলোক ছিল না। বিদেশাগত উর্দুভাষী মুসলিমই হয়েছিল ইজারাদার। এমনি অবস্থা ছিল ভারতবর্ষের সর্বত্র। তাই মুঘলশাসনের অবসানকালে যে ছোটো-বড়ো প্রায় সাড়ে আটশ সামন্ত-জমিদার-তালুকদার-জায়গীরদার রইলেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় করগণ্য কয়জনই ছিলেন মাত্র মুসলমান।

৪. ভারতবর্ষের সর্বত্র দেশজ মুসলিম মাত্রই সাধারণভাবে নিরক্ষর এবং দরিদ্র পেশাজীবী ও প্রান্তিক চাষী। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, তবে তা মুসলিম সমাজের আর্থিক-শৈক্ষিক-সাংস্কৃতিক জীবন প্রভাবিত করতে পারেনি। শাস্ত্রিক-সামাজিক জীবনেই ছিল তাঁদের প্রভাব সীমিত। অতএব, তুর্কী-মুঘল আমলে নানা কারণে ধনী-মানী সামন্তশ্রেণীর ব্যক্তিহিন্দু শাস্তি বা নির্যাতন পেয়েছে, প্রজা হিসেবে জাতিহিন্দু নির্যাতিত হয়নি; রাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক মুখ্যত রাজস্ব দেয়া-নেয়ার, এবং অনুগত থাকা না-থাকার। এতে বিপর্যয়-ব্যতিক্রম-ব্যত্যয় না ঘটলে, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের, প্রজাপীড়নের কারণ ঘটে না। উল্লেখ্য যে দরবারী ইতিহাসোক্ত হিন্দু মাত্রই ছিলেন রাজা-সামন্ত শাসক প্রশাসক—সাধারণ হিন্দুপ্রজা নয়। এ 'হিন্দু' দেশীয় বা হিন্দুস্তানী অর্থেই প্রযুক্ত, ধর্মমতবাদী নির্দেশক নয়।

৫. ব্রিটিশ আমলে হিন্দুর অর্থ-সম্পদ-শিক্ষা-দর্প-দাপট দেখে মুসলিমদের চোখ টাটাল। তা তাদের অজ্ঞতারই ফল। কেননা, তুর্কী-মুঘল আমলেও সাধারণভাবে অর্থ-বিত্ত-বেসাত ছিল বর্ণহিন্দুর কবলেই। তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বড়ো প্রশাসনকেন্দ্রগুলোতে ইরাকি-ইরানি মধ্যএশীয় চাকুরে আর ব্যবসায়ীরা। ওরা কিন্তু সংখ্যায়ও বেশি ছিল না। সবাই এদেশের স্থায়ী বাসিন্দাও ছিল না। মুঘল রাজত্বের অবসানে দেখা গেল—ধনী-মানী-সামন্ত-জমিদার মুসলমানমাত্রই উর্দুভাষী তথা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বংশজ। খাঁটি দেশজ মুসলিম বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। ব্রিটিশ আমলে ইতিহাসে অজ্ঞ মুসলিমরা, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিমরা মনে করল—বুঝি ইংরেজ প্রতিপোষণেই বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে-দফতরে হিন্দুরা প্রতিষ্ঠা পেয়ে প্রবল হল, আর বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত ও দফতর-চ্যুত হল মুসলিমরা। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র তথ্য নেই, নেই সত্যের সমর্থন। ইংরেজ আমলে নতুন ভূমিব্যবস্থায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপ্রভাবে পণ্যবিনিময়ভিত্তিক গ্রামীণ বৃত্তিজীবীদের আর্থ-বাণিজ্যনীতির বিনাশে, প্রাশাসনিক বিবর্তনে এবং শিক্ষার ঐতিহ্যহীন শিক্ষাবিমুখ দেশজ মুসলিম সমাজে ওকালতি-ডাক্তারি-চাকুরির ও নতুন নিয়মের বেনে-ফড়ে-দালাল-দেওয়ানের অভাবে, এবং প্রজন্মক্রমে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সম্পত্তির বিভাজনে দারিদ্র্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর বর্ণহিন্দু সমাজে অর্থসম্পদ এবং শিক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছিল প্রায় বিনা প্রতিযোগিতায় আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। হিন্দুরা মুসলিমের সম্পদ কাড়েনি, ওরা সম্পদ তেমন হারায়ওনি, ওদের অর্জন ছিল না, ছিল ক্ষয়ই কেবল। চাকরি আর সম্পদ, দর্প আর দাপট, ক্ষমতা আর প্রভাব, মান আর মর্যাদা হারিয়েছিল শাসক-প্রশাসকগোষ্ঠীর ও শ্রেণীর বিদেশাগত তুর্কী-মুঘল বংশধরেরা। সেনাবিভাগে তাদের চাকরি গেল, প্রাশাসনিক ও বিচার বিভাগেও তারা কাজী-আমিন-ফৌজদার পদ হারাল। ইংরেজি চালু হওয়ায় ১৮৬০ সনের দিকে ওকালতি পেশাও তাদের হারাতে হল। তারা অবশ্য পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই দেশত্যাগ করে উত্তর-ভারতে এবং ভারতের বাইরে চলে গেছে। কেবল শাসনকেন্দ্রে শহর অঞ্চলে উর্দুভাষী দরিদ্র পেশাজীবীরা থেকে গেছে, যাদের অবজ্ঞায় খোট্টা বা কুট্টি বলা হয়।

অতএব তুর্কী-মুঘলের হিন্দুপীড়ন, হিন্দুহত্যা, ভয় ও বল প্রয়োগে ধর্মান্তর—ব্রিটিশ আমলে অভিসন্ধিবশে বানানো অযৌক্তিক-অবাস্তব "মিথ" মাত্র। তেমনি, ব্রিটিশ সহযোগিতায় দেশজ মুসলিমদের অর্থসম্পদ হিন্দুকবলিত হওয়ার কিসসা আর ক্ষোভও অকারণ। তা ছাড়া, জাত হিসেবে মানুষ ভালোমন্দ হয় না, হয় ব্যক্তি হিসেবে। একালে হিন্দু-মুসলিমের নিজেদের স্বার্থেই সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায়, নিরাপদ-স্বস্তিতে সহাবস্থানের জন্যে তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনায় ও পাঠে আগ্রহী হওয়া আবশ্যিক। বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদন আজো সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন বাঙালিদের—'আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙলার বাঙালির ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক। ক্ষুদ্রকীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।' (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড) শ্রুতি-স্মৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভরতা নয়, হিন্দুকে প্রমাণ করতে হবে যে ভারতের কোথায় কবে কে বা কারা মৃত্যুভয় দেখিয়ে পাড়াকে পাড়ার, অঞ্চলকে অঞ্চলের হিন্দুর ধর্ম কেড়েছে, হিন্দু পাড়ায় বা জনপদে গণহত্যা ঘটিয়েছে। মধ্যযুগের কোন লেখায় এ খবর মেলে না। আর হিন্দুদের মানতে হবে যে রাজারাই তাঁদের প্রয়োজনে নরহত্যা করে মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-মঠ-বিহার ভাঙেন, ভাঙান। রাজার জাত-ধর্ম তার জন্যে দায়ী নয়। এ সূত্রে কাশ্মীররাজ হর্ষ ও তাঁর কর্মচারী দেবোৎপাটননায়ক স্মরণীয়, যাঁরা মন্দির-মূর্তি ধ্বংস করে সম্পদ লুটতেন। তুর্কী-মুঘল আর এখনকার মুসলমান একগোষ্ঠীর একশ্রেণীর নয়, তা ছাড়া ব্রিটিশ আমলের নওয়াব-সামন্ত-জমিদাররা মুসলিম বলেই তাঁদের শোষণ-পীড়নের মাত্রা হিন্দু রাজা-সমন্ত-জমিদারের চেয়ে বেশি ছিল কি? হিন্দুপীড়ন যদি করেও থাকে তুর্কী-মুঘলশাসকরা, তার জন্যে ভারতীয় মুসলিমদের দায়ী করা চলে না। একালে অতীতের ইতিহাসগত ঘটনার বা আচরণের ন্যায়-অন্যায় দৈশিক, কালিক, শাস্ত্রিক নীতি-নিয়মের মানে-মাপে-মাত্রায় বিচার্য।

এ সূত্রে আরো একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন—তা হচ্ছে : ব্যক্তিক বা পরিবারিক জীবনে মানসিক বা শৈক্ষিক, আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় থাকলেও সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক বিচারে এবং হিসেবে চিরকালই মানুষের দেহে-প্রাণে-মনে-মননে উৎকর্ষ ঘটছে। ব্যক্তিগত জীবনে উঠতি-পড়তি-ঘাটতি যেমন আছে, তেমনি দেশগত এবং কালগত মানুষের জীবনেও একপ্রকারের বন্ধ্যাত্ব, স্থবিরত্ব আর আচারসর্বস্বতা আঞ্চলিকভাবে কিছু-কালের জন্যে প্রকট হয়ে ওঠে। একেই বলে অবক্ষয়। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সৃষ্টিশীলতা চালু থাকে, সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ-বিকাশ-প্রসার হতে থাকে। এ হিসেবে, মননে-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে সংস্কৃতি-সভ্যতা ক্রমোন্নত হচ্ছে। কাজেই, আমরা যত অতীতে যাব, মানুষের মানসিক-ব্যবহারিক-আচারিক অপূর্ণতা ততই দৃষ্টিগোচর হবে। প্রতি মুহূর্তে মানুষের অজ্ঞতা কমছে, জ্ঞান বাড়ছে, বুদ্ধি সূক্ষ্ম হচ্ছে, অনুভূতি তীক্ষ্ণ হচ্ছে, উপলব্ধি স্পষ্ট, ব্যাপক আর গভীর হচ্ছে। কাজেই, অতীতমাত্রই বর্তমান কালের তুলনায় অধিক অজ্ঞতার, বিশ্বাসের সংস্কারের, অলৌকিকতার, অলীকতার, বিস্ময়ের, কল্পনার, ভয়ের, ভক্তির, নিয়তি-নির্ভরতার, সংকীর্ণ চিন্তার, অসহিষ্ণুতার আত্মপ্রত্যয়হীনতার কাল। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিচালিত, সদিচ্ছা-সংযত মানুষ সেকালে একালের চেয়ে দুর্লভ ছিল। তাই দেখা গেছে—ইহুদি-খ্রীস্টান-কাফের মুসলিমকে, এবং মুসলিমরা ইহুদি-খ্রীস্টান-কাফেরকে সহজভাবে গ্রহণ করছে না। একটা বৈর-অবজ্ঞার ভাব মনের গভীরে পোষণ করছে। সে কারণে, জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যে-শাক্তে-বৈষ্ণবে-শৈবে রেষারেষি হানাহানি ছিলই। মধ্যযুগে মুসলিমরা গির্জা-সিনাগোগ-মঠ-মন্দিরের প্রসার পছন্দ করেনি। অজুহাত পেলেই ভেঙেছে। তেমনি, খ্রীস্টানেরা ভেঙেছে মসজিদ। ইহুদিরা আর হিন্দুরা সে-সুযোগ পায়নি। কিন্তু হিন্দু রাজা-জমিদার মসজিদ তৈরির, আজান উচ্চারণের এবং গরু কোরবানীর অনুমতি যে দেননি, তেমন নজিরও কম নয়। এ মুহূর্তে সেক্যুলার ভারত সরকারও "গরু জবেহ" নিয়ন্ত্রিত-নিষিদ্ধ করেছেন হিন্দুর আবদারে বা দাবিতে। এ যুগে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-শিক্ষার এবং আন্তর্জাতিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান-অভিজ্ঞতার প্রসারে মানুষ অনেক সহিষ্ণু-সংযত উদার এবং তুচ্ছ বিষয়ে উদাসীন হয়েছে। এ যুগে মনের গভীরে স্বধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আস্থা রেখেও এবং পরধর্মে অবজ্ঞা পুষেও, মানুষ নিরাপদ স্বস্তিতে সহাবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদের লিপ্সা-প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমন তীব্র এবং অসহ্য হলে প্রবল পক্ষ ধর্মমতের, নিবাসের কিংবা ভাষা-বর্ণ-শ্রেণীগত পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে বাধায় দাঙ্গা, প্রবৃত্ত হয় বিধর্মী-বিভাষী-বিজাতি হননে-বিতাড়নে। তাই, আজো নিশ্চিন্ত নিরাপদে স্বস্তিতে বিধর্মীর বিভাষীর বিজাতির বিদেশীর সহাবস্থান স্বাভাবিক এবং সম্ভব হচ্ছে না।

এ সমস্যার সমাধান করতে হলে সচেতনভাবে শিক্ষিত মানুষকে যুক্তিপ্রবণ এবং যুক্তি-আশ্রয়ী হতে হবে। যুক্তিবাদের প্রসারেই কেবল আস্তিক মানুষ এ মানসিক আধি আর সামাজিক ব্যাধি এবং রাষ্ট্রিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। অথবা সমাজে নাস্তিকের সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি পেলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে-রাষ্ট্রে দৃঢ়, ব্যাপক এবং গভীর হলে সমাজ আর রাষ্ট্র এ রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মনে হয় চিরকালই কল্পনা-বিস্ময়-ভয়-ভক্তি-ভরসায় চালিত হয়, কাজেই নাস্তিকের সংখ্যা বাড়বে না। অতএব বাকি থাকল জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা এবং শ্রেয়োচেতনা। এগুলোর সচেতন সযত্ন অনুশীলন আবশ্যিক এবং জরুরী।

সাম্প্রদায়িকতা : বীজ-অঙ্কুর ও ফল

AMARBOI.COM

১. শাস্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতা

অসহায় মানুষ নিজেদের গরজেই আবিষ্কার করেছে স্রষ্টা তথা জীবননিয়ামক প্রভু তার অজ্ঞ-অসমর্থ-অসহায় জীবনে বিশ্বাসের ও ভরসার, ভয়মুক্তির ও নিরাপত্তার অবলম্বন হিসেবেই। আদি মানবের অজ্ঞতার-অসহায়তার সে-স্তর ভব্য-সভ্য মানুষ আগেই অতিক্রম করলেও ব্যক্তি মানুষের আজো ভয়তাড়ক ও ভরসাদাতা এক অদৃশ্য শক্তির সহায়তা প্রয়োজন হয় আশৈশবলব্ধ ও নিষ্ঠ লালনে পুষ্ট বিশ্বাস-সংস্কারপূর্ণ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধিশূন্য মানসিক জীবনে। তার চাওয়ার ও পাওয়ার মধ্যখানের বিঘ্নজাত না পাওয়ার, আকাঙ্ক্ষার অপূর্তির অনুভূতি থেকেই তার ভয়-ভরসার অরি-মিত্র অদৃশ্য নিয়তি শক্তির উদ্ভব। মূলত সব কার্যের অদৃশ্য-অজানা কারণকেই তারা স্রষ্টা বলে জেনেছে। আমরা জানি, কারণবিহীন করণ বা কার্য নেই। সে-কারণ অবশ্য অনেকতায় বহু। অতএব স্রষ্টা ও শাস্ত্র মানুষের মানসিক, বৈষয়িক ও সামাজিক প্রয়োজনেই স্থানিক ও কালিকভাবে তৈরি করেছে মানুষই। জ্ঞানের প্রসারে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে, যুক্তির প্রয়োগে এ স্রষ্টার ও শাস্ত্রের স্থানিক ও কালিক পরিবর্তন ঘটেছে, তত্ত্বের জটিলতা, ভয়-ভরসা ভিত্তিক স্রষ্টায় ও শাস্ত্রতত্ত্বে মিশেছে নানা কল্পনা ও বিশ্বাস প্রতীক উপশক্তি তুক-তাক, মন্ত্র-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ-মাদুলী প্রভৃতি প্রায়োগিক যাদু এবং বিভিন্ন টোটেম-ট্যাবু। অতএব মাৎস্যন্যায় বিলোপলক্ষ্যে প্রজারা মিলে গোপালকে যেমন রাজা বানাল, আদিকালের মানুষও তেমনি নিজেদের প্রয়োজনে স্রষ্টা ও শাস্ত্র বানিয়ে নিজেরাই তাদের অনুগত হল। যেমন আমরা শহীদ মিনার তৈরি করে প্রমূর্ত ও পবিত্র জাতীয় ঐতিহ্য-প্রতীক পীঠস্থান করে তুলেছি। ইতোমধ্যে মানুষ জগতের ও জীবনের অনেক রহস্য আবিষ্কার করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক অনেক বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, মন্ত্র-মাদুলী দেবতা-মানব, ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী অহেতুক অপ্রয়োজনীয় নিষ্ফল ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু দুর্বলচিত্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি বিবেকে ভরসা পায় না। তারা স্রষ্টা ও শাস্ত্র মানে, আচারে-আচরণে স্রষ্টার ও শাস্ত্রের আনুগত্যের রূপায়ণকেই তারা চর্যারূপে জানে ও মানে।

সব ধর্মের উদ্ভবই স্থানিক ও কালিক। এ স্থানিক ও কালিক মানুষের সীমিত মানসিক শক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বিবেক-অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন প্রসূত ঈশ্বরে আনুগত্য সর্বজনীন করার আগ্রহই তাদেরকে প্রচার-প্রবণ করেছে। স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-সংস্কারের উদ্ভবও শৈশবে উন্মেষিত এবং লালিত আবেগে অনুরাগেই। অবশেষে আচারে-আচরণে পালা-পার্বণে প্রায়োগিক শাস্ত্রই মানুষের ঈশ্বরানুগত্য রূপে ব্যক্তিক ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। এতে কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি উপলব্ধি থাকে না। প্রাজন্মক্রমিক তাৎপর্যরিক্ত আচার-আচরণ থাকে মাত্র। এ তখন একটা বিশ্বাস-সংস্কার বা আশৈশব লালিত অভ্যাস মাত্র। ঈশ্বরতত্ত্ব হচ্ছে ইহ-পরজীবন নিয়ন্ত্রী এক পরম শক্তি। এ কৌম-গোত্র-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়-স্বধর্মীর জাতি চেতনার বন্ধনসূত্র। কাজেই ব্যক্তি মানুষের আরো হাজারো বিশ্বাস-সংস্কারের মতোই ভিত্তিহীন হলেও এর গুরুত্ব ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে অসামান্য ও অবিমোচ্য। তাই স্বধর্মেই তথা শাস্ত্রেই তাদের সত্তার ও সম্বিতের স্থিতি-ঐহিক ও পারত্রিক উভয়ত। এ কারণেই ধর্মের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতায় সশ্রদ্ধ সহাবস্থান দুর্লভ। ইতিহাসের সাক্ষ্যেই জানি ধর্মমতের পার্থক্যজাত হানাহানি অন্য রকম দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে সংখ্যায় ও মাত্রায় ছাড়িয়ে গেছে।

দুনিয়ায় দুর্বলচিত্ত বিশ্বাস-সংস্কার চালিত ভয়বিতাড়িত ও ভরসাশ্রিত মানুষের সংখ্যা লক্ষে নিরানব্বই হাজার নয়শ নিরানব্বই জন। জ্ঞান-যুক্তি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আরো বিকাশে-প্রসারে এ সংখ্যা অনেক হ্রাস পাবে বটে, তবু আপাত উদাসীনরা শঙ্কা-সঙ্কট মুহূর্তে ঈশ্বরাশ্রিত ও মন্ত্র-মাদুলীরূপ যাদুনির্ভর হবে। কাজেই মানুষ সামাজিক ভাবে কখনো নাস্তিক হলেও জীবনে সবাই নাস্তিক হবে বলে মনে হয় না।

আপাতত দেখা যাচ্ছে কম্যুনিস্ট শাসনে দীর্ঘকাল থেকেও বিশ্বাসে ও অঙ্গীকারে যারা অকম্যুনিস্ট তারা ব্যক্তিজীবনে সত্তার ও সম্বিতের গভীরে ভূতে-ভগবানে বিশ্বাস, নিয়তিতে আস্থা, স্বপ্নাদি অলৌকিক জাদু ঘটনার সত্যতায় নির্ভরতা রাখে। কিন্তু কেবল ভূতে-ভগবানে, তুকে-তাকে, বানে-উচ্চাটনে, মন্ত্রে-মাদুলিতে বিশ্বাস ব্যক্তিক বা সামাজিক জীবনে দ্বেষ-দ্বন্দ্বের কারণ হয় না। ঈশ্বর সম্পৃক্ত আচার-আচরণের পালা-পার্বণের সামাজিক লালন ও রূপায়ণই ঘটায় ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কিংবা জাতিগত লড়াই। কাজেই আস্তিক্যটা বজায় রেখে অর্থাৎ স্রষ্টায় বা ঈশ্বরে আস্থা রেখে শাস্ত্রিক আচার-আচরণ-পালা-পার্বণকে ব্যক্তিক বলে মেনে সামাজিকভাবে বর্জন করলেই কেবল বিধর্মী-বিদ্বেষের বিলুপ্তি সম্ভব হবে। তখনই কেবল বিভিন্ন ঈশ্বরবাদীর সহিষ্ণুতায় সশ্রদ্ধ সহাবস্থান নির্বিঘ্ন হবে।

কিন্তু মানুষ নিজেদের গরজেই ভয়-ভরসা ও ন্যায় প্রতীক সর্বজনীন ও সার্বভৌম ঈশ্বর উদ্ভাবন করেছে জীবনে অভাবের ও আকাঙ্ক্ষার নির্বিঘ্ন পূর্তি লক্ষ্যে। এ জন্যেই স্বকল্পিত ঈশ্বরের স্তুতি-প্রশস্তি, তোয়াজ-তোষামোদ উপাসনা-প্রার্থনা পদ্ধতিও তৈরি করেছে, অর্থাৎ কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্য-প্রীতি-প্রসাদ পাবার জন্যে অপর মানুষের মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে পদ্ধতিতে গলিয়ে বশ করা হয়, তেমন পদ্ধতি প্রয়োগে স্বসৃষ্ট ঈশ্বরকেও তুষ্ট করা যায়, এ বিশ্বাসে স্তুতি-প্রশস্তি-চাটুকারিতায় কাঙ্ক্ষাপূর্তি ঘটে। মানুষের শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ পালা-পার্বণ হয়েছে কাঙ্ক্ষাপূর্তির প্রায়োগিক দিক। তাই তারা শঙ্কা-সঙ্কট উত্তরণ এবং কাঙ্ক্ষ্যবস্তু প্রাপ্তি লক্ষ্যে আচারসর্বস্ব। আর ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক লড়াই বাধে ওই আচারে-অনুষ্ঠানে বাধাদানের আর প্রতিষ্ঠান ভাঙার ফলে। সব মানুষ বিজ্ঞানে-দর্শনে সাহিত্যে-সমাজতন্ত্রে বাঞ্ছিত মানের বিদ্যা অর্জন করলে এবং বিশ্বাসে আস্তিক হয়েও জ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠ হলে তবে মনে হয় সমাজস্বাস্থ্যের জন্যে সম্প্রদায়গত জীবন নিরুপদ্রব রাখার লক্ষ্যে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থান করার অঙ্গীকার সহজেই করতে পারে। মাপে-মানে-মাত্রায় বিশেষ বিদ্বান ও সংস্কৃতিমান মানুষের সহিষ্ণুতা, উদারতা ও সৌজন্য এ প্রত্যাশা জাগায়।

অথবা দেশ-কাল-গোত্রগত ঈশ্বর চেতনাকে জিইয়ে রেখেও অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্বে আস্থা রেখেও বিভিন্ন দেশে-কালে গোত্র ও ব্যক্তি উদ্ভাবিত শাস্ত্রের সত্যে, আচারে ও বিশ্বাসে বহুবহু ক্ষেত্রে মেরুর ব্যবধান ও বৈপরীত্য এবং কারণ-ক্রিয়া নিরূপণে অযৌক্তিক বৈচিত্র্য ও ব্যর্থতা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি যোগে অনুভব ও উপলব্ধি করে শাস্ত্র পরিহার করার চেতনাও আস্তিক মানুষ নির্বিশেষকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বস্থ ও সুস্থ রাখতে পারে। স্রষ্টা তো কেবল মানুষই সৃষ্টি করেননি, বিশ্বে জীব-উদ্ভিদ-জল-বায়ু-অগ্নি-মাটিও সৃষ্টি করেছেন। অন্যদের যদি আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব, প্রয়োজন ও শাস্ত্র না থাকে, তবে অন্যতম সৃষ্ট এবং প্রাণিজগতের একটি প্রজাতি মানুষেরই বাপূজন-ভজন থাকবে কেন? আমাদের বিশ্বাসে-সংস্কারে আরো নানা শক্তির লীলা ও ক্রিয়া রয়েছে। সেগুলোও আমাদের ব্যক্তি-জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, ভূত-প্রেত-জীন-পরী-তুক-তাক, গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি প্রভাবিত দিন-ক্ষণ-তিথির শুভাশুভ, তাবিজ-কবচ, ঝাড়ফুঁক, ধাতু-পাথর প্রভৃতি। এগুলো নিয়ে সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক কিংবা দৈশিক গৌত্রিক কোন দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, সংঘাত-সংঘর্ষের কারণ ঘটে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসটা এবং তাঁর সাধন ভজন পূজন আরাধন উপাসনও তেমনি একান্ত ব্যক্তিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মেনে নিলেও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ঘুচবে। এ বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তিপুষ্ট ও জ্ঞানঋদ্ধ যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জগতে যন্ত্রের প্রসাদপুষ্ট যুগে ও জীবনে মধ্যযুগ অবধি স্থানিক ও কালিক মানুষের ব্যক্তিক সামাজিক জীবনজীবিকার প্রয়োজনে উদ্ভূত নীতি-নিয়ম, আদর্শ-উদ্দেশ্য, রীতি-পদ্ধতি সম্বলিত শাস্ত্র উপযোগরিক্ত অনাবশ্যিক ও পরিহার্য বলেও বিবেচিত হচ্ছে জ্ঞানবান যুক্তিবাদী সংস্কৃতিমান মানুষের পক্ষে। বস্তুত অপেক্ষাকৃত অজ্ঞতার যুগে অসম্পূর্ণ জগৎ-চিন্তার ও জীবন-ভাবনার প্রসূন পুরোনো শাস্ত্র মানা সম্ভব হয়নি বলে যুগে যুগে দেশে দেশে গোত্রে গোত্রে পুরোনো ধর্ম-শাস্ত্র বর্জিত হয়েছে, তৈরি হয়েছে স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী নতুন নতুন শাস্ত্র। তাই ঈশ্বরতত্ত্ব ও শাস্ত্র কখনো চিরন্তন ধারণায় স্থিত ছিল না। নতুন জ্ঞান, সম্বিত ও প্রয়োজন তৈরি করেছে নতুন ঈশ্বরতত্ত্ব ও আচারিক শাস্ত্র। ঈশ্বরতত্ত্বের ও শাস্ত্রের বিবর্তনধারাও স্থানে-কালে বিভিন্ন এবং সত্যের ও তত্ত্বের, আচার ও আচরণ বিধি-নিষেধের বৈপরীত্যেও বিচিত্র। ঈশ্বর যদি অস্তিত্বে চিরন্তনও হন, শাস্ত্র কদাচ নয়—তা দেশে-কালে-মানুষের প্রয়োজনে উদ্ভূত এবং কালান্তরে বিলুপ্ত, স্থানান্তরে প্রায় অগ্রাহ্য। তাই শাস্ত্র কখনো ঈশ্বর-এর মতো স্বতোসিদ্ধ নয়, নয় সর্বজনগ্রাহ্য। অতএব আজকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ আস্তিক হলেও বহুজনহিত ও বহুজনসুখ বিরোধী বলেই শাস্ত্রিক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আজকের বাঞ্ছিত জিগির বা শ্লোগান হবে 'স্রষ্টার অনুগত হোন, শাস্ত্রের নয়।'

২. গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম ও ধর্মধ্বজা

গণতন্ত্রের ধারণায় পূর্বে যেসব সীমাবদ্ধতা ছিল, সাম্প্রতিক চেতনায় তা লোপ পেয়েছে। এখনকার একজন মানববাদী গণতন্ত্রে রাষ্ট্রবাসী মানুষমাত্রেরই সমান মর্যাদা। আঁধা-কানা-খোঁড়া, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, কালো-ধলো, লম্বা-বেঁটে, নারী-পুরুষ সব মানুষই আইনের চোখে সমান। সবাই মৌল মানবিক অধিকারে স্থিত বলে স্বীকৃত। কাজেই একালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম এবং অবস্থা ও অবস্থান ভেদে নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বে প্রভেদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

বিশেষ করে ইদানীং সমাজের, রাষ্ট্রের ও সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে ধারণা পালটে গেছে। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশের অধিকার আজকাল অনেকটা প্রসারিত, ব্যক্তির উপর শাস্ত্রের শাসন ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আজকাল সভ্যতার ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের অনুপাতে সংকুচিত হয়ে এসেছে। স্বীকার করতেই হবে যে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-শিক্ষা-বিবেক-বিবেচনার শক্তির প্রসারে এখনকার ব্যক্তি ও সমাজ শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার এবং পুরোনো অজ্ঞ সমাজের নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি আক্ষরিক ও নিষ্ঠভাবে মেনে চলছে না। এবং মেনে না চলার ফল ক্ষতিকর হয়নি, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি নির্ভর মানুষে বরং মনুষ্যে বাঞ্ছিত গুণের দ্রুত ও অবাধ বিকাশ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে, অন্তত মানুষের মনের দুর্গের দেয়ালে ফাটল ধরেছে, দুর্গের দ্বার খুলেছে, মানবতা ও মানবিকতা শুধু ব্যক্তি মনে নয়, সামাজিক চেতনায়ও স্ফূর্তি লাভ করছে।

এর সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক প্রভাবে এবং ফলেই সভ্যজগতে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এখন একান্তভাবেই ঐহিক, ইহজাতিক এবং জীবিত মানুষ তথা অধিবাসী বা নাগরিক সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রের বা সরকারের সবরকমের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও ইহজাগতিক। মৃতজনের প্রতি রাষ্ট্রের কোনই দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই। বলেছি, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-বিত্ত অবিশেষে যে কোন ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমান ও অভিন্ন। কাজেই নাগরিকের পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব কোন রাষ্ট্রেরই হতে পারে না। তাছাড়া একটি আধুনিক রাষ্ট্র একক ধর্মমতের লোক অধ্যুষিত হতেই পারে না। শহর-বন্দর মাত্রই বিচিত্র দেশের, ভাষার, ধর্মের মতের ও মতলবের মানুষ অধ্যুষিত, আর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাড়া একই ধর্মের লোকের মধ্যেও থাকে বিপরীত মতবাদী সম্প্রদায়। কাজেই ধর্ম সেকারণেও সরকারের সেবার ও সমর্থনের বিষয় হতে পারে না। পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্র আধুনিক য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে বিদ্যা-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনা, প্রযুক্তি রূপ প্রাণরস বা সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করে বটে, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাস-সংস্কার ও বর্বর আচার-আচরণ ছাড়ে না। তখন তারা শাস্ত্রমানা প্রাণীমাত্র হয়ে যায়—জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাশক্তি প্রয়োগ করে না। এমনি বিশ্বাসী ইহুদী সাড়ে তিন হাজার বছরে, হিন্দু তিন হাজার বছরে, বৌদ্ধ-জৈন আড়াই হাজার বছরে, খ্রীস্টান দুই হাজার বছরে এবং মুসলমান চৌদ্দশ' বছরে পিছিয়ে থাকে। মনে-মননে-মতে-পথে কিছুতেই স্বকালবাসী হয় না। কিম্ আশ্চর্য অতঃপরম্। আরো আশ্চর্য, তারা কেউ একে অপরের শাস্ত্রের সত্যতায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌক্তিকতায় আস্থা রাখে না। পরের ধর্মমাত্রই তাদের কাছে ভুল, অসার শিক্ষার সমষ্টি এবং উপহাস্য ও অবজ্ঞেয়। কেবল স্বশাস্ত্রই সত্যের ও সারকথার আকর। তাই এখানে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ব্যর্থ ও অপ্রযোজ্য। আমরা সবাই জানি এবং কখনো কখনো মানিও, জগতের মানুষের অর্ধেক দুঃখ যন্ত্রণা-পীড়ন-বঞ্চনার কারণ হচ্ছে ওই ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মদ্বেষণা। সন্দেহ-অবিশ্বাস-অপ্রীতি-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব প্রভৃতির উৎস ওই বিধর্মী-বিদ্বেষ। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের উৎস এ-ই। আমরা জানি, কৌম-গোষ্ঠী-গোত্রবদ্ধ বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান মানুষকে একদিন ঐশশক্তির অভিন্নতার চেতনা দান করেই মানবিক ঐক্যের ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সহাবস্থানকামী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন স্বকালের মানবহিতকামী জ্ঞান-মনীষী মনস্বী চিন্তানায়করা—যাঁরা আজো মুনি-ঋষি-নবী অবতাররূপে স্মরণীয়, শরণীয় ও সম্মানীয়। বুনো-বর্বর মানুষ সেকালে এঁদের নেতৃত্বেই ভব্য-সভ্য আবিষ্কারক, উদ্ভাবক ও নব নব চিন্তাচেতনাশীল মনুষ্যসমাজে উন্নীত হতে থাকে। মন-মননের ও দেশকালের পরিবেষ্টনীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশকালোপযোগী করবার জন্য বারবার শাস্ত্রের হয়েছে সংস্কার। বদল হয়েছে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মমত। একালে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির বিকাশে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে বিস্ময়ের, কল্পনার, ভয়ের, ভক্তির ও ভরসার, এক কথায়, অজ্ঞতার ও দৈব-নির্ভরতার সেদিন এ যন্ত্রযুগে একেবারে অপগত। এখন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেকই কর্ম-আচরণের নিয়ন্তা। এখন মানব সংহতির, মানবানুগত্যের জন্যে কোন আসমানী ভয়-ভক্তি-ভরসার প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রের কার্যকারিতারও অবশিষ্ট মাত্র নেই। তাই পৃথিবীর শহুরে শিক্ষিত সমাজে শাস্ত্রাচার অবহেলিত হচ্ছিল। নাগরিকেরা হচ্ছিল উদার ও সহিষ্ণু। এমন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনের কূটচালে ও আর্থিক মদদে বিশ্বব্যাপী আকস্মিকভাবে মৌলবাদী দলের ও সম্প্রদায়ের প্রচার-প্রচারণারূপ উপদ্রব-উপসর্গ শুরু হয়ে গেছে। তার প্রভাব হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে মারাত্মক। আবার তারা কূর্মস্বভাব বরণ করে প্রাগ্রসর পৃথিবীর চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিমুখ হয়ে উঠেছে। বলছে, শাস্ত্র অনুসরণেই সর্বপ্রকার ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণ ও সমস্যা-সঙ্কটমুক্তি সম্ভব।

৩. পরিণাম

বিধর্মী-বিজাতি-বিগোত্র-বিভাষী-বিদেশী মাত্রই মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবেষ্টনীগত কারণে দ্বেষণার ও অবজ্ঞার পাত্র হলেও দাঙ্গা বাধাবার মতো তথা হত্যা করবার মতো শত্রু হয় না। উনজন বা অধিজন তখনই ঈর্ষার, অসূয়ার, দাঙ্গার ও হত্যার পাত্র হয়ে ওঠে, যখন তারা বিদ্যায়-বিত্তে, অর্থে-সম্পদে প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দেয়। তখন দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত রাজনীতিক নেতার, মতলববাজ বেনের এবং সম্পদলিপ্সু সর্দারের উস্কানীতে বা প্ররোচনায় যারা প্রত্যক্ষভাবে স্বধর্মীর, স্বজাতির, স্বগোত্রের আপাতদরদী হয়ে তাদের পক্ষে বিধর্মী বিজাতি বিভাষী হনন অভিযানে উৎসাহী হয়, তারা সাধারণভাবে শিক্ষিতও নয়, ধার্মিকও নয়, নয় স্বধর্মী ও স্বজাতিপ্রেমীও। তারা প্রাত্যহিক জীবনে গুণ্ডা-মস্তান। তাদের চেলারা দরিদ্র, তারা শ্রমে নয়, ছল-চাতুরী-প্রতারণায় বাঁচে। তাই তারা স্বসমাজেও নীতিমান-হৃদয়বান নয়। কাজেই বিজাতি-বিধর্মী-বিদ্বেষের এবং দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষ-সংঘাতের গোড়ায় থাকে আর্থিক কারণ—যে অর্থ সব মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। দাঙ্গাবাজ হত্যাকারীরা নিষ্ঠুর অন্ধশক্তি মাত্র। কেউ লেলালে শিকারী কুকুরের মতো রক্তলোলুপ ও সম্পদলিপ্সু হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা-বিবেক এবং দর্শন-বিজ্ঞান সাহিত্য-ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান আজকের দিনে এত উৎকর্ষ লাভ করা সত্ত্বেও, জীবন ও জীবিকা বিজ্ঞানজাত যন্ত্র ও প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মনোভূম এখনো প্রায়ই অকর্ষিত অনাবাদী রয়ে গেছে। জ্ঞান-যুক্তি-অভিজ্ঞতা তাদের কোন রকমেই প্রভাবিত করে না, কেবল ক্রোধ-ক্ষোভ-উত্তেজনাই তাদেরকে সময় বিশেষে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করে। নইলে তারা একালে যখন কোন শহরে বন্দরেই অভিন্ন শাস্ত্রের, মতের, ভাষার ও দেশের মানুষের স্বাতন্ত্র্যে বাস সম্ভব যে নয়, তা জেনে বুঝে মেনে ভিন্ন শাস্ত্রের, মতের, গোত্রের, ভাষার বা দেশের মানুষের সঙ্গে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায়, সহাবস্থানের কল্যাণকর নীতি মানার মানস অঙ্গীকারে আবদ্ধ হত। ভিন্ন শাস্ত্রের মতের, গোত্রের, ভাষার ও দেশের মানুষের প্রতি বিদ্বিষ্ট হত না জন্মসূত্রেই। বিধর্মী-বিভাষী-বিজাতি-বিদেশী বিগোত্রীর মানুষমাত্রকেই পর এবং ভাবীশত্রু, প্রতিযোগী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবত না। আর এমন হিতাহিত বিবেচনাশূন্যও হত না। তারা ভাবে না যে, তারা যখন তাদের প্রতিবেশী বিধর্মী হত্যা করে, তাদের মন্দির, মসজিদ, মঠ, গীর্জা, সিনাগোগ ভাঙে, তার প্রতিক্রিয়ায় নিহত বিধর্মীর সুদূরস্থ বা বিদেশস্থ স্বধর্মীর সন্তানদের নিরপরাধ জাতিদের একইভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়, চরিতার্থ করে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। অতএব যে স্বশাস্ত্র-স্বধর্মী-স্বজাতি-স্বগোত্র-স্বভাষীর প্রতি মমতাবশে বিধর্মী বিজাতি বিগোত্র-বিভাষী হত্যায় এমন আগ্রহ ও উৎসাহ, অন্যত্র এ হত্যার শোধ নেয় শত্রুর স্বদলের ও স্বমতের লোকেরা দ্বিগুণ প্রতিহিংসায়। যেমন এ সেদিন ভারতে সংঘটিত বাবরি মসজিদ রামজন্মভূমি সম্পৃক্ত মুসলিম হত্যার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল বাঙলাদেশীর ও নগণ্য সংখ্যায় অসহায় পাকিস্তানী হিন্দুর সম্পদে ও মন্দিরে হামলার আকারে। প্রাণহানি যে ঘটেনি, তা সৌজন্য-সুবিবেচনার ফলে নয়, দরিদ্রের কেবল সম্পদলিপ্সার আধিক্যের কারণে। তাছাড়া আক্রান্তরা ঘর ছেড়ে, পাড়া ছেড়ে আগেই পালিয়েছিল। ভিন্ন ধর্মী ও সংখ্যাগুরুর রাষ্ট্রে বিপন্ন স্বধর্মীকে যখন রক্ষা করা সম্ভব নয়, তখন স্বরাষ্ট্রে ভিন্নধর্মী উনজনকে হত্যা করে বিদেশের স্বধর্মীকে বিপন্ন করা কেন? এ কোন্ ধরনের স্বধর্মী-স্বজাতিপ্রীতি?

বিস্ময়ের বিষয় এই যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-বুদ্ধিতে, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে আমাদের বিদ্বান উদ্যোগী মানুষেরা যখন বিশ্ববিজয়ী, তখনো আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত-শহুরে মানুষ কেবল হিন্দু, কেবল মুসলিম, কেবল খ্রীস্টান, ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ থাকতে চাই। কখনো নিবর্ণ মানুষ নামে পরিচিত হতে কিংবা নির্ভেজাল মনুষ্যত্ব বা মানবতাসম্পন্ন হবার বাসনা পোষণ করি না মনের গহনে। তাই ভব্য-সভ্য সমাজে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে এখনো মানুষের আদি ও আদিম বুনো-বর্বর রূপ প্রকট। আমেরিকায় বর্ণ-চেতনা, য়ুরোপে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা, আফ্রিকায় গোত্রদ্বেষণা, ভারতে গোত্র-বর্ণ-ধর্মবিদ্বেষ, এশিয়ার অন্যত্র গোত্র ও ধর্মচেতনা এবং পৃথিবীর সর্বত্র লঘু গুরু জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-মতবাদ বিদ্বেষ প্রসূত যে রক্তক্ষরা প্রাণহরা দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ জিইয়ে রেখেছে মানুষ বিশ শতকের এ অবসান কালেও তার সাধারণ নাম 'সাম্প্রদায়িকতা'ই। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ঋদ্ধ ভব্যসভ্য জীবন-জগৎসচেতন মানুষের মনুষ্যত্বের এ এক গাঢ় লজ্জার ও গভীর ক্ষোভের কারণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ববর্ণের, স্বগোত্রের, স্বমতের, স্বভাষার, স্বদেশের নয় বলে মানুষের হাতে মানুষের ধন-প্রাণ আজো বিপন্ন। এর চেয়ে মানবতা বিরোধী আচরণ আর কি হতে পারে। হায়, এমন অমিত মনের জমি রইল পতিত। কর্ষণ করলে ফলত সোনা! মানবতার বিকাশ হলে জীবনসম্পদ সুখের না হোক, স্বস্তির ও শান্তির হত, হত মনুষ্য নামের যোগ্য।

উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে জাতিদ্বেষণা

আমাদের দেশ ছিল রাজার রাজ্য। অধিবাসীরাও নানা ভয়ে-ভরসায় ভাগ্যান্বেষণে কাছাকাছি অঞ্চলে নিবাস পরিবর্তন করত। এজন্যে তাদের কোন স্থায়ী পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি ছিল না। নিজেদের মধ্যে তারা চলত গোত্রীয় পরিচয়ে। আর চিহ্নিত হত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব, লিঙ্গায়েত, রামনামী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, রামানন্দ, রামদাস-দাদু-চৈতন্যপন্থীরূপে। পরিচয়ের আরো কয়েকটি ভিত্তি বা মাপকাঠি ছিল। যেমন—শূদ্র, সৎশূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য অন্ত্যজ এবং জলচলশূদ্র, আর উচ্চবর্গের হিন্দু বা বর্ণহিন্দু। এগুলোকে এখন (কালো-ধলোর পার্থক্য নয় বলে) ভারতে বর্ণভেদ বা বর্ণবিদ্বেষ বলা হয় না, তারা এখন একে 'জাতপাতের' সামাজিক ও সামান্য লঘু শ্রেণীবিভাগ বলে আসল তত্ত্ব ও তথ্য ঢাকা দেয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনে দক্ষিণ আফ্রিকা-আমেরিকার মতো বর্ণ (কালো-ধলো) বিদ্বেষের অপরাধ ও নিন্দা এড়ানোর কৌশলরূপে।

অতএব, আমাদের দেশে ধর্মমতবাদী গোষ্ঠী বা শিষ্যসমষ্টি ছিল। এ গোষ্ঠী বা মতবাদীগুচ্ছকে বলা হত 'সম্প্রদায়'। এর ইংরেজী পরিভাষা বা প্রতিশব্দ হচ্ছে সেক্ট। আর ইংরেজী community শব্দ চালু হয়েছে শ্রেণীগত বা বর্ণগত এমনকি বিশেষ পেশাজীবী নির্দেশক হিসেবে[১] বিভাষার এ শব্দের প্রয়োগ তথা অভিধা সুনির্দিষ্ট নয়। প্রাচীন ভারতেও ধর্ম ও শাস্ত্র বিবর্তিত হয়েছে। দেব-দ্বিজ-বেদদ্বেষী আজীবিক ও জৈন-বৌদ্ধ দ্রোহ এবং কালান্তরে ব্রাহ্মণ্যসমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তি, মধ্যযুগে আবার দেব-দ্বিজ-দ্রোহী অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে সন্তধর্মের প্রসার প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত ও বিবর্তিত করেছে বটে, কিন্তু একটি অভিন্ন জাতিসত্তা দান করেনি মধ্যযুগে।

সতেরো শতকের শেষ পাদে শিবাজী যখন প্রতাপে প্রবল মুঘলের সাম্রাজ্যের একাংশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন সম্ভবত বিদেশাগত রাজবংশের থেকে পার্থক্য জ্ঞাপক দেশজ তথা হিন্দুস্তানী রাজা [হিন্দ>হিন্দু] অর্থে মারাঠা রাজ্যকে হিন্দুরাজ্য নির্দেশ করা হয়। কেননা, ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ও ইতিহাস লেখা শুরু করার

---

১ বেদেজাত, জেলেজাত–এ বৃত্তিজীবী শ্রেণীবাচক জাত হচ্ছে Community-র প্রতিশব্দ। আবার মত সম্প্রদায় 'অর্থেও বৈষ্ণব, শিয়া, সম্প্রদায়' হচ্ছে Community, আবার সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ীও কম্যুনিটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কখনো 'হিন্দু'—এ সাধারণ নামে চিহ্নিত হত না, বরং সিন্ধুর বা সিন্দু উপত্যকা রূপে গোটা উত্তর ভারতই [এখনো 'হিন্দুস্তান' রূপে সিন্দ্ > হিন্দ্ = অধিবাসী হিন্দু] নামে আরব-ইরাক-ইরান-তুরস্ক এবং মধ্যএশিয়ার সবলোকের কাছেই পরিচিত ছিল ইংরেজ আমলেও।

ইংরেজরাই ভেদনীতির প্রয়োগ সাফল্য লক্ষ্যে দেশজ এবং তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীকে 'মুসলমান' নামে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাধারণভাবে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করে তুর্কী-মুঘল মুসলিম শাসনে হিন্দুকে পীড়নের-বঞ্চনার টুকরো খবর সযত্নে সংগ্রহ করে বিকৃতভাবে পরিবেশন করতে থাকে এবং হিন্দুযুগ বা শাসনকাল বলেও একটা সোনালী প্রাচীনকাল কল্পনায় নির্মাণ করে। হিন্দুযুগ হল, মুসলিম যুগ হল, কিন্তু খ্রীস্টান যুগ হল না, হল ব্রিটিশ আমল এবং ভগবানের মতো নিরপেক্ষ থেকে তারা হিন্দু-মুসলিমের প্রতি সমদৃষ্টির ও সমব্যবহারের গৌরব দাবি ও অর্জন করল। অথচ আমরা জানি, ভারতীয় জনগণকে বিভিন্ন গোত্রীয় নামে চিহ্নিত করলেও বিদেশীকে মধ্যযুগে আখ্যাত করা হত তাদের দৈশিক নামে—পার্শী, সমরখন্দী বদখসানী, খোরাসানী, বোখারী, তুরুক, আফগানী, কাবুলী এবং পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি, ইংরেজ, দিন্েমার প্রভৃতি। ধর্মবিশ্বাস অনুসারে কাউকে অভিহিত করা হত না। আরো আগেও আমরা গোত্রীয় নামে শক, হূন, কুষান, চোল, চালুক্য পল্লব, মৌর্য, গুপ্ত, পাল বংশ নামকে এবং পরেও ঘোরী, খলজী, তুঘলক, লোদী, আইবক প্রভৃতি গোত্রীয় নামকেই প্রাধান্য দিয়েছি, ধর্মবিশ্বাসকে বা জন্মভূমিকে নয়।

AMARBOI.COM

২.

য়ুরোপে ষোল শতকের আগেই গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার সঙ্গে দৈশিক বা আঞ্চলিক এবং ভাষিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। সবাই খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী বলে ধার্মিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা তথা সেক্টেরিয়ানিজম রাজনীতিক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্টদের ছাড়া অন্যদের মধ্যে সম্ভবত সংখ্যাল্পতার জন্যে প্রবল হতে পারেনি। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতীচ্য তথা ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে যখন স্বদেশ ও স্বজাতি চেতনা এল, তখন প্রথমেই শিক্ষিতরা হলেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার। কেননা, ওখানে তখন দৈশিক-ভাষিক-গৌত্রিক চেতনা অভিন্নমূল রশুনের মতো সংহত হয়ে গেছে অভিন্ন ও অবিভাজ্য সত্তায়। তখনো গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজের হাতে আসেনি, ভারত আগেও কখনো ছিল না একচ্ছত্র শাসনে, ধর্মও বিভিন্ন, ভাষাও অসংখ্য। স্বদেশের সীমা কোথায়? য়ুরোপে সবাই ছিল যিশুপন্থী। এখানে কোথাও শুধু হিন্দু, শুধু মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলও মেলে না। ধর্মমতে ঐক্য না থাকলে এক জাতি হয় কি করে? কাজেই য়ুরোপীয় স্বদেশ-স্বজাতির আদল মিলল না এদেশে।

স্বদেশ-স্বজাতি চিহ্নিত কবার প্রথম চেতনা জাগে বঙ্কিমচন্দ্রে। গোটা ভারত তখনো ইংরেজ অধিকারে আসেনি বলে তাঁর স্বদেশ ইংরেজ অবিকৃত 'সুবা-ই-বাঙলা'য় রইল নিবদ্ধ—অর্থাৎ বাঙলা বিহার উড়িষ্যা হল গোড়ার দিকে তাঁর স্বদেশ এবং এ সুবার নির্বিশেষ অধিবাসীই হল তাঁর স্বজাতি। প্রমাণ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে সাত কোটি মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্বদেশকে 'মাতৃভূমি' এবং স্বভাষাকে 'মাতৃভাষা' রূপে আখ্যাত করেন। এর আগে বাঙালীরাই বাঙলাকে বলত ভাষা, লোকভাষা, লৌকিক ভাষা, দেশী ভাষা, বঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা, গৌড়িয়া ভাষা। অতএব 'মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা' চেতনার ও অভিধার জন্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮–৯৪) কাছেই ঋণী।

তবু ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ইতিহাস রচয়িতা জেমস্ মিলই যখন হিন্দুযুগ, মুসলিম যুগ এবং ব্রিটিশ যুগ তত্ত্ব ইতিহাসে সন্নিবেশিত করে তিন ভাগে বিন্যস্ত করে হিন্দু মনে মুসলিম বিদ্বেষবিষ ছড়ালেন, তখন থেকেই অসহিষ্ণু গোঁড়াবর্বর মুসলিম অত্যাচারে ছয়শ' বছর ধরে নিপীড়িত হিন্দু প্রজন্মক্রমে আজো ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ এবং প্রতিহিংসাপ্রবণ। মোটামুটিভাবে ১৯৬০ সন অবধি ব্রিটিশের কৃপা-করুণা প্রাপ্ত বাঙালী হিন্দুরা ইংরেজ শাসনকে মনে করেছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং ইংরেজকে বরণ করেছে ত্রাতারূপে আর ইংরেজ লিখিত ইতিহাস পড়ে সত্যমিথ্যা বাস্তব-অবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভব বিচার-বিবেচনা না করেই, হিন্দুলিখিত পরবর্তী কালের ইতিহাসের সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য করে হত্যার ভয় দেখিয়ে হিন্দুকে মুসলিম করা, হিন্দুর জান-মাল-গর্দানের উপর শাসকগোষ্ঠীর নিত্য হামলা প্রভৃতি আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও বিদ্বিষ্ট হয়েছে অন্ত্যজশ্রেণীর দেশজ দরিদ্র ও ক্ষুদ্রপেশাজীবী নিরক্ষর নিরন্ন মুসলিমদের উপর। তারা বুঝতে চাইল না যে তরবারী দেখিয়ে মুসলিম করলে মুলতানের এদিকে গোটা উত্তর-দক্ষিণ ভারতে মুসলিম সংখ্যা নগণ্য কেন? রাজধানীগুলোতে মুসলিমরা উনজন কেন? গাঁয়ে গাঁয়েও ধন-মান-সম্পদশালী হিন্দু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ক্ষত্রিয়ই কেবল মেলে কেন? মুসলিমরা দরিদ্র নিরক্ষর শ্রমজীবী উনজন কেন? মুঘল আমলে বিচার ও সৈন্যবিভাগ ছাড়া বেসামরিক প্রশাসন হিন্দুর হাতে ছিল কেন? জমিদার-সামন্তমাত্রই [প্রায় সাড়ে আটশ'] কেন তুর্কী-মুঘল শাসনে হিন্দু ছিল যারা ব্রিটিশ আমলেও সম্পদ-সম্মান-প্রভাব প্রতাপ বজায় রেখে স্বাধীন ভারতে সম্মান-সম্পদ হারিয়েছে? গোটা ভারতেই বাদশাহর জাত দেশজ মুসলিমরা সম্পদে সম্মানে শিক্ষায় হীন কেন? মুঘল-প্রশাসকের সবপদবী আজো হিন্দুরাই করে ধারণ, তারাই ছিল প্রশাসক, তারা নিপীড়িত হত কিভাবে? যুদ্ধে বা রাজনীতিক কারণে হিন্দু সামন্ত পীড়ন, হত্যা বা হিন্দু মন্দির ভাঙা কি বিধর্মীর ও বিধর্মের উপর হামলা? এসব সহজ কথা, যুক্তির কথা বিচার-বিবেচনা করার মতো বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগে এখনো হিন্দুরা অনীহ। তাই ইংরেজের উপ্ত-অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কুসুমিত এবং ফলিত বিষবৃক্ষ আজো বিষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেশে হত্যাকাণ্ড ঘটায় ঘনঘন।

৩.

আবার আগের কথায় ফিরে যাই। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে হিন্দু ও মুসলিম সমভাবে স্বধর্মীর জাতীয়তা বোধে সুস্থির হল। ভারতের বাইরে হিন্দু নেই। কাজেই ভারতীয় হিন্দুত্ব হিন্দু মননে-চিন্তনে মারাঠার-রাজপুতের ও প্রাচীন ভারতের গৌরব-গর্বচেতনায় হচ্ছিল স্বস্থ ও আবর্তিত। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দও রয়েছেন। আর মুসলিমরা দেশ-কাল তথা স্বদেশ-স্বকাল চেতনা বিরহী হয়ে বিশ্বমুসলিম চেতনায় হচ্ছিল স্বাপ্নিক, নিষ্ক্রিয় আবেগ ও মোহ সম্বল করে তারা এক অবাস্তব, অসম্ভব সৌভ্রাত্রের জগতে মানস বিহারেই থাকে আজো আশ্বস্ত। বাস্তবজীবনের দুর্যোগ-দুর্ভাগ্য-দুঃখ-বেদনা ঘুচানোতে তাই তাদের মন নেই। দেশ-কাল মানে না বলে তারা তাদের বাস্তব ভৌগোলিক অবস্থানকেও তুচ্ছ জানে। স্বাতন্ত্র্যে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধর্মীদের সঙ্গে সহাবস্থান যে বাস্তব জীবনে আবশ্যিক ও জরুরী তা আজো যেন তাদের মনে ঠাঁই পায় না। এমন হাওয়াই 'উম্মাহ' চিন্তা এ যুগে আর কোন ধর্মবাদীর মধ্যে নেই।

অতএব, কম্যুনিস্টরাই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ স্বদেশচেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানব চেতনা অঙ্গীকার করে কেবলই মানববাদী হয়ে ওঠে। তার আগে হিন্দু শিক্ষিত হয়ে স্বধর্মীর জাতীয়তায় আস্থা রেখে কেবল হিন্দু হয়েছে এবং মুসলিম হয়েছে দেশকালহীন শুধু মুসলিম। এর পরিণাম ভারত-ইতিহাসে সর্বক্ষেত্রে হয়েছে এবং হচ্ছে ট্র্যাজিক। এ আধি এখনো প্রবল।

ছয়-সাতশ' বছর ধরে প্রজন্মক্রমে এদেশে জন্ম-মৃত্যু বরণ করেও তুর্কী-মুঘলেরা ব্রিটিশ প্রভাবে হিন্দুর চিন্তায় চেতনায় বিদেশীই রয়ে গেল।

এমনকি অন্তরে সে-চেতনা প্রবল ছিল বলেই কংগ্রেস সদস্যরাও হিন্দুমনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগানো লক্ষ্যে, তাদের সংগ্রামী প্রেরণা-প্রবর্তনা, উত্তেজনা-উদ্দীপনা দানের জন্যে মুসলিম তথা বিধর্মী-বিজাতি-বিদেশী তুর্কী-মুঘল বিদ্বেষ ছড়ানোকেই উত্তমপন্থা বিবেচনা করেছে। ফলে রানা প্রতাপ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজী, রাজসিংহ হয়েছেন বিজাতি বিতাড়ক হিন্দুবীর। এর ফলে আহত মুসলিমরা হল বিরূপ। একারণেই কংগ্রেস একচ্ছত্র বিদেশী শাসক ব্রিটিশ বিতাড়ন লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ দৈশিক তথা সর্বভারতীয় জাতীয়তা প্রচারে নিষ্ঠ থাকলেও ফুটো পাত্রে পানি তোলার মতো মুসলিমের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। অথচ ব্রিটিশভয়ে স্বদেশ প্রেমিকরা যা করেনি, তা করলে অর্থাৎ বাহাদুর শাহ, টিপু সুলতান, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানী, তুঁতিয়া টোপী, আহমদুল্লাহ, ঝিন্দনের রানী, দেওয়ান মুলরাজ কিংবা বাসুদেব, ফাড়কে, চাপেকার প্রভৃতি নিয়ে কবিতা-নাটক ইতিহাস রচনা করলে, স্বাধীনতাসংগ্রাম লক্ষ্যে দৈশিক জাতীয়তা অবশ্যই গড়ে উঠত।

AMARBOI.COM

অতএব উনিশ শতকে দুটো ধার্মিক জাতি ছিল—হিন্দুজাতি ও মুসলিম জাতি। কংগ্রেসই দৈশিক জাতি চেতনা জাগানো ও প্রচার উদ্দেশ্যে হিন্দুকে ও মুসলিমকে সম্প্রদায় আখ্যা দান করে। কাজেই হিন্দু, মুসলিম, শিখ নির্দেশক community অভিধা বিশ শতকের কংগ্রেসের দেয়া। হিন্দু মহাসভা কিংবা মুসলিম লীগ তা কখনো স্বীকার করেনি। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি ও উদ্ভব স্মর্তব্য।

আস্তিক মানুষ ঘরোয়া পরিবেশে প্রাপ্ত আশৈশব লালিত শাস্ত্রিক বিশ্বাসে দৃঢ় থাকে এবং সাধারণত যুক্তি-বুদ্ধি যেহেতু ইহ-পরলোকে প্রসৃত বিশ্বাসের দুর্গ ভাঙার কাজে বিশ্বাসীর ব্যক্তিক জীবনে কখনো প্রযুক্ত হয় না, সেহেতু প্রত্যেক মানুষই স্বধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও সত্য বলে জানে ও মানে। অন্য ধর্মশাস্ত্রকে সে যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে বলে মুহূর্তেই তার অনেক অযৌক্তিকতা, অবাস্তবতা, অসম্ভাব্যতা সে অনুভব-উপলব্ধি করতে পারে এবং এভাবে সে পরধর্ম মাত্রকেই ত্রুটিবহুল, ভুল ও মিথ্যা বলে অবজ্ঞা করে। ফলে স্ব স্ব মতের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব বা সত্যতা প্রমাণ কালে বিভিন্ন মতাবলম্বীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দুনিয়ার সর্বত্র হয়েছে এবং এখনো অশিক্ষাকীর্ণ অনুন্নত দেশগুলোতে ঘটে। সেকালে এর সঙ্গে ক্বচিৎ আর্থ-রাজনীতিক কারণও যুক্ত হত। একালের অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়া থেকেই আমাদের হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ মাত্রই হচ্ছে আর্থ-রাজনীতিক স্বার্থসম্পৃক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের বাঙলায় হিন্দু-মুসলিমের মধ্যেকার ধর্মবিষয়ে পরম্পরাগত পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ-দ্বন্দ্বের এবং ঠাট্টা-অবজ্ঞার উদ্ধৃতিবহুল বর্ণনা রয়েছে আমাদের 'বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে জাতিবৈর নামের পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় খণ্ডেও নানা প্রসঙ্গে। কিন্তু সেযুগে বাস্তব সংঘর্ষ-সংঘাতের খবর মেলে না, মনসামঙ্গলেও কাল্পনিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ঘটানো হয়েছে মনসার মহিমা প্রমাণের ও প্রচারের জন্যে। তবু সতেরো-আঠারো শতকের পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে নির্জিত হিন্দু-মুসলিমের আর্থিক-শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক মিলন হয়েছিল খেয়ে-পরে বাঁচবার তাগিদেই—পূজ্য পীর-নারায়ণ ও তাঁর চেলা দেবতাদের আশ্রিত হয়ে। ব্রিটিশ আমলে দাঙ্গা বাধতে থাকে শহরে-বন্দরে রাজনীতিকদের প্ররোচনায় প্রয়োজনে। নিরপেক্ষতাদুষ্ট ও অজ্ঞ নিঃস্ব লোকের গাঁয়ে গাঁয়ে ইদানীং পূর্বকালে দাঙ্গা বাধানো যায়নি। এখন গাঁয়েও শিক্ষার বিস্তার হয়েছে, স্বল্পশিক্ষিত বেকার ও গৃহস্থ এখন গাঁয়েও অনেক। রেডিও-টিভি এবং সংবাদপত্র মাধ্যমে এখন তারাও ঘরে বসে বিশ্বদ্রষ্টা ও প্রায় সবজান্তা স্বশিক্ষিত চালাক-চতুর লাভ-ক্ষতি সচেতন মানুষ। তাই লাভ-লোকসানের তাড়নায় তারাও দাঙ্গা, হত্যা ও সম্পদ লুট প্রবণ।

৪.

উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে বিজাতিবিদ্বেষ ছিল, হিন্দু-মুসলিম মিলে এক জাতি ছিল না বলে সাম্প্রদায়িকতা নামে একে অভিহিত করা যাবে না। বাঙলার প্রথম মনীষী-মনস্বী রামমোহনকে দিয়ে শুরু করি। ব্রিটিশ কৃপাজীবী রামমোহনও জানতেন যে মুঘলরা-আলিবর্দী-মিরজাফরেরা অত্যাচারী ছিলেন, এবং তুর্কী-মুঘল আমলে হিন্দুরা পরাধীন ছিল, তাই ব্রিটিশশাসিত বাঙলায় তাঁর মধ্যে পরাধীনতার ক্ষোভ ও গ্লানি ছিল না। "Divine Providence at last in its abundant Mercy stired up the English nations to break the yoke of those tyrants, and to receive the oppressed native of Bengal under its Protection... Subjects have not viewed English as a body of Conquerors, but rather as deliverers and look up to your Majesty not only as Rulers but also as a father and Protector". দেখা যাচ্ছে মুঘল শাসনকে রামমোহন দেশী লোকের বা স্বজাতির শাসন মনে করেননি। ইংরেজ শাসনে তাই পরাধীনতার গ্লানিবোধ করেননি। হয়েছিলেন আনন্দিত। রামমোহনের, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বিদ্যাসাগরের রচনায় তথা চিন্তা-চেতনায় মুসলিম অনুপস্থিত। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' উপাখ্যানে তো শত্রু দিল্লীর খিলজীরাই। হিন্দুর কথা লিখতে গিয়ে প্রতারক প্রবঞ্চক টাউট ঠকচাচা-বাহাউল্লাকে কেন আনলেন প্যারীচাঁদ মিত্র বোঝা যায় না। সেকি কেবল পরিহাস রসিকতার জন্যে? ভূদেব মুখোপাধ্যায়-ই বা শিবাজী-রৌসনারার 'অঙ্গুরী বিনিময়' কিসসা ফাঁদতে গেলেন কেন? দীনবন্ধু মিত্র সাহসী অনুগত লেঠেল পান মুসলিম তোরাপের মধ্যে, যেমন পান মধুসূদনও হানিফের মধ্যে বা পরে শরৎচন্দ্রও পান আকবরের মধ্যে। এগুলো কি মুসলিমপ্রীতির বা বিজাতির প্রতি অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধার অভিব্যক্তি? আবার কৃষ্ণকুমারী নাটকে গোলাপ ফুল দেখে দুষ্ট যবনের সোনার ভারতে প্রবেশের দুর্দিন-দুর্ভাগ্য স্মরণ করেন ভীমসিংহ। ইনি মধুসূদন নন তো! স্বয়ং বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রের ভর্তি নিষিদ্ধ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্রই বাস্তবকে বরণ করেছিলেন মনেপ্রাণে, তিনি মৃণালিনী থেকে সব উপন্যাসই ইতিহাসের ছায়া ও তত্ত্ব অবলম্বনে রচনা করেছিলেন। এবং মুসলমানকে বাদ দিয়ে যে দেশের ও সমাজের কথা ও চিত্র পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না – এ বাস্তব বুদ্ধি তাঁর দুর্গেশনন্দিনী রচনার কাল থেকেই সক্রিয় ছিল। তিনি মানুষকে হিন্দু-মুসলিম পাপী-নিষ্পাপ হিসেবে দেখেননি। তাই সমাজনিন্দিত যৌনাচারী শশিশেখর বা অভিরাম স্বামী, লম্পট-উদ্ধত ও পিতৃদ্রোহী বীরেন্দ্র সিংহ, মুঘলের পদলেহী মানসিংহপুত্র জগৎসিংহ এবং তিলোত্তমা-বিমলা তাঁর প্রথম সার্থক রচনার পাত্র-পাত্রী-নায়ক হয়েছিল। অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে বলে এখানে শুধু আমার ধারণার কথাই বলি, —বঙ্কিমের হাতে আয়েশা, উসমান, মুহম্মদ আলি, দলনী, মুবারক, জেবুন্নিসা, চাঁদশাহ ফকির, নির্মলকুমারী সম্পর্কে আওরঙ্গজেবও উজ্জ্বল চরিত্র। রমেশচন্দ্র দত্তও একাধারে দীর্ঘশ্বাস ও গর্ভ নিয়ে অঙ্কিত করেছেন হিন্দু গৌরবগাথা। তিনি সুরুচি ও সংযম রক্ষা করেছেন বলে তাঁর বিজাতি বিদ্বেষ উগ্রতা লাভ করেনি।

দ্বিধাগ্রস্ত নবীন চন্দ্র সেন বহিরাগত কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা মুসলিমদের 'উপবৃক্ষ' রূপে গ্রহণে রাজি থাকলেও, রঙ্গমতীর হিন্দুকবি নবীন চন্দ্র সেন ত্রয়ী কাব্যে কামনা করেছেন এক ধর্মরাষ্ট্র এবং তা হিন্দুরাষ্ট্র। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাল্পনিক কাব্য 'বীরবাহু'তেও শত্রু বানিয়েছেন যবন মুসলিমদেরই, যে-মুসলিম তাঁর প্রতিবেশী। হিন্দু দর্শন-মননগর্বী বিবেকানন্দ সদর্পেই মৌলবাদী হলেও বরং দেশকালের বাস্তব চাহিদানুগ ভাবনা-চিন্তা করেছেন, তিনি কালধর্মে শূদ্ররাজত্ব যেমন ভেবেছেন, তেমনি মুসলিমের আনুকূল্যও আবশ্যিক ভেবেছেন।

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা আমাদের বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করে। তিনি যে কেবল তাঁর সৃষ্টিশীল আবেগে-অনুভবে-মননে মুসলিমদের বহিরাগত উপদ্রব বলেই ঠাঁই দেননি তা নয়, ইতিহাস চেতনায়ও তাদের অস্তিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করেছেন। বাপে-বেটায়, ভাইয়ে-ভাইয়ে কেবল হানাহানি প্রবণ তুর্কী-মুঘলের উপস্থিতি তাঁর কাছে ভারতের দুর্যোগের নিশীথরাতের দুঃস্বপ্ন মাত্র।

বলা চলে ইসলামের ও মুসলমানের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীরে এক প্রকার বিরূপতা ছিল। তিনি যখন বাস্তবে আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনে অনুপেক্ষণীয় মুসলিম শক্তির সঙ্গে হিন্দুর নিজেদের স্বার্থেই মুসলিমদের দাবি ও ক্ষোভ মিটিয়ে আপোষে সহযোগিতায় সহাবস্থানের পরামর্শ দিয়েছেন কোন কোন প্রবন্ধে। তাঁর ডালিয়া, দুরাশা বা সমস্যাপূরণ পড়েও মুসলমান পাঠক আনন্দ পায় না। ভারতে সাতশ' বছরের মুসলিম উপস্থিতি তাঁর মনোলোকে অস্বীকৃত।

পাওয়া ও রাখা অসম্ভব জেনে রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনো ভারতের স্বাধীনতা চাননি, তেমনি তিনি কেবল হিন্দু-চেতনায় ছিলেন অভিভূত, কখনো হিন্দু-মুসলিমের সমঝোতার প্রয়োজন বোধ করলেও দৈশিক জাতীয়তায় আস্থা রাখেননি। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী অভিধায় দেশজ মুসলিমও হিন্দু এবং ধর্মে মুসলমান—এমন তাত্ত্বিক কথা বলার সময়ে তিনি হিন্দুরা যে শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা-পুরাণপন্থী বাচক হিন্দু এবং শব্দটি যে যোগারূঢ়, হিন্দু উপত্যকাবাসী বলে হিন্দু নয়, তাও স্মরণে রাখেননি। তাছাড়া, একজন কবি স্বদেশের পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত থেকে জাতীয়তাবাদ বিরোধী হয়ে আন্তর্জাতিকতার এবং বিশ্বমানব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বিশ্বেশ্বর চেতনার মহিমা যখন প্রচার করেন, তখনো পরাধীনতায় ক্ষুব্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে এ মতের সমর্থন পাইনি। রবীন্দ্রনাথেরই যদি এ মনোভাব, তবে অন্য হিন্দুমাত্রই যদি মুসলিম-দ্বেষণা দুষ্ট হয়, তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। কার্যত অকম্যুনিস্ট হিন্দুর মধ্যে আজো নির্বিশেষ 'মানুষ-চেতনা' কৃচিৎ মেলে। নির্বিশেষ মানুষকে কেবল মানুষ রূপে গ্রহণ করা দেশ-কালগত আস্তিক মানুষের প্রায় সাধ্যাতীত। তাদের কৃপা-করুণা উদারতা আর সৌজন্যও তাই একটা নীতি নিয়মের সীমা মেনে চলে। তবু লাভে, লোভে, কামে, প্রেমে, চোরা চালানে-পাচারে ব্যক্তিক-মিলন, বন্ধুত্ব, দাম্পত্য চিরকাল ঘটে, ঘটবে দুই বিধর্মী-বিজাতির মধ্যে। তাই উনিশ শতকের সব হিন্দু গদ্য-পদ্য লেখকই বিষয়ানুসারে বা প্রসঙ্গক্রমে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ-ক্ষোভ-ক্রোধের ও প্রতিহিংসার অভিব্যক্তি দিয়েছেন লঘু-গুরুভাবে। এ-ও উল্লেখ্য যে লেখকের কেউ কেউ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিকামীও ছিলেন। যেমন যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭–১৯২৭) পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী কাব্যে সচেতন ভাবেই বলেছেন 'যাহাতে হিন্দু-মুসলমান বা বৌদ্ধ কোনও শ্রেণীর পাঠক ব্যথিত হইতে পারেন, মনঃ কল্পিত এরূপ কোন কথা বলি নাই।' আগেই বলেছি উনিশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান দুটো পৃথক জাতি। কাজেই এ হচ্ছে সংস্কৃতি ও সুরুচি সম্পন্ন বিবেকবান উদার সুজনের উক্তি। আজো ঘরোয়া জীবনে হিন্দুরা 'বাঙালী' বলতে কেবল হিন্দুকেই নির্দেশ করে। আর বাঙলাভাষী দেশজ মুসলমানরাও 'মুসলমান'–বাঙালী নয় কখনো তাদের কাছে। প্রখ্যাত নীরদ চৌধুরীর বাঙালীও কেবল হিন্দুই।

উনিশ শতকে অন্ত্যজ শ্রেণীর মতোই দেশজ মুসলিম সমাজে কোন প্রকারের শিক্ষারই সাধারণ ঐতিহ্য ছিল না। হাজারে কেউ সামান্য লেখাপড়া করত বাঙলা-আরবী-ফারসীতে, লক্ষে কেউ হতেন আরবী-বাঙলা-ফারসীতে বিদ্বান বা পণ্ডিত, কাজী, উকিল, সদর আমিন প্রভৃতি। এ কারণে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম উনিশ শতকে ছিল নগণ্য সংখ্যক। তা ছাড়া যাঁরা বাঙলা সংবাদ-সাময়িক পত্র চালাতেন কিংবা বাঙলায় গদ্যে-পদ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করতেন, তাঁদের শিক্ষা ছিল স্কুলের সীমায় নিবদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া সেকালের আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিকভাবে মুসলিমদের তথা তুর্কী-মুঘলদের প্রতি ঘৃণা-অবজ্ঞা নিন্দা-কটূক্তি থাকতই। এতে বিরক্ত দেশী মুসলিমরাও বাঙলাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত বা দ্বিধান্বিত ছিল প্রায় ১৯৩০ সন অবধি, একই কারণে উত্তর ভারতের হিন্দুরাও উর্দু ও ফারসী হরফ বর্জন করল উর্দু লেখায় নিজেদের গৌরব-গর্বের কিছু না পেয়ে এবং তাদের নিন্দা দেখে। উল্লেখ্য যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মধ্যযুগের মুসলিম কবি ও কাব্য আবিষ্কার এবং নজরুল ইসলামের চমকপ্রদ গান ও কবিতাই বাঙালী মুসলিমদের বাঙলাকেই নির্দ্বিধায় মাতৃভাষা রূপে বরণে প্রেরণা-প্রবর্তনা দিয়েছে। তাঁরা হিন্দুর অনুকরণে ও অনুসরণেই স্বল্প বিদ্যা নিয়েই সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চায় ও লেখায় এগিয়ে আসেন স্বজাতিপ্রীতি বশেই। হিন্দুরা যেমন কেবল হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্র ও ঐতিহ্য এবং হিন্দুর সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে লিখেছেন, উপকরণ-উপাদান সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ এবং রাজপুত-মারাঠা ইতিবৃত্ত থেকে, মুসলমানরাও তেমনি আরব-মিশর-স্পেন-ইরাক-ইরান-মধ্যএশিয়ায় মানস পর্যটন করেছেন গৌরব-গর্বের বৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্যে। আগেই বলেছি, ইংরেজী শিখে হিন্দু কেবল হিন্দু হয়েছিল, মুসলিম হয়েছিল শুধু বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সচেতন মুসলিম। কেউ বাঙালী থাকেনি। ফলে ভাষিক-দৈশিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালী চেতনা জাগেনি আজো। ধর্মমতে স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বই ব্যবধানের প্রাচীর সুউচ্চ এবং অটল রেখেছে।

গোড়ার দিকে হীনম্মন্যতাবশে হিন্দুর মনরক্ষার জন্যে গো-বধ বন্ধ করার লক্ষ্যে, হিন্দু-মুসলিম মিলনকারী মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) লিখেছিলেন 'গো-জীবন।' তিনি মুসলিম সমাজে নিন্দিতও হয়েছিলেন। পরে ১৮৯৭ সন থেকে তিনি হিন্দুকে মুসলিম শোষক-পীড়ক ও প্রতারক বলেই জেনেছেন। 'বর্তমান মুসলমান সমাজের একখানি কবিতা', 'মদিনা গৌরবকাব্য' এবং 'গাজী মিঞার বস্তানী' স্মর্তব্য।

ব্রিটিশ প্রজা কায়কোবাদ (১৮৫৯–১৯৫৩) মুঘল-মারাঠার পতনে সমভাবে ব্যথিত হয়েছেন তাঁর মহাশ্মশান কাব্যে। হিন্দু মুসলমান উভয়কেই বীররূপে চিত্রিত করেছেন তিনি। কিন্তু দীর্ঘজীবী এ কবিও বিশ শতকের কয়েকটি খণ্ড কবিতায় হিন্দুর নিন্দায় মুখর হয়েছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতিবাদে যুদ্ধংদেহি ক্রোধ নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন বিশ শতকের গোড়ার দিকে মোজাম্মেল হক (১৮৬০–১৯৩৩), ডাক্তার [হোমিও] সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২–১৯৩০), মতিয়ুর রহমান খান (১৮৭২–১৯৩৭) এবং সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০–১৯৩২)।

মুসলিম নায়কের ও হিন্দু নায়িকার প্রেমকথা মূলক রচনায় হিন্দুকে হীনভাবে চিত্রিত করে এঁরা মনের খেদ, ক্ষোভ ও জ্বালা মিটিয়েছেন। উল্লেখ্য যে এঁরা অকারণে নিজেদের বাদশাহ্‌র-জাত বলে মনে করতেন বলে মধ্যযুগের হিন্দুদের প্রতি তাঁদের কোন ক্ষোভ ছিল না, যদিও সেকালে বর্ণহিন্দুরা জমিদার-মহাজন-প্রশাসক রূপে তাঁদের একালের মতোই শাসন-শোষণ করত।

AMARBOI.COM

এঁদের রচনা গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় সাধারণভাবে হিন্দু লেখকদের লেখার চেয়ে হীন ছিল। তাই মুসলিম সমাজেও তেমন জনপ্রিয় বা বহুল পঠিত হয়নি। তবে লক্ষণীয় যে উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিককার অনেক মুসলিম লেখক হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিকামী ছিলেন। এর একটি কারণ হয়তো অশিক্ষিত সমাজের এ লেখকরা কৃতি প্রকাশের ও খ্যাতিলাভের জন্যে প্রতিবেশী শিক্ষিত হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক বলে মনে করেছিলেন।

আস্তিক মানুষের এমনি ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। এ সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানব স্বভাব। কাজেই আস্তিক সমাজে বিজাতি, বিভাষী, বিধর্মী, বিদেশী বিদ্বেষ লঘু-গুরু এবং সুপ্ত-গুপ্তভাবে থাকবেই।

৫.

এর প্রতিকার রয়েছে নাস্তিকতায়, কম্যুনিজমে ও নির্ভেজাল সেক্যুলারিজমে। ভারত সরকারের সেক্যুলারিজম কৃত্রিম, গোঁজামিল মাত্র, তাই সেখানে দাঙ্গা অব্যাহত। 'সেক্যুলারিজম' স্বরূপে শাস্ত্রের ও শাস্ত্রীয় আচারের রাষ্ট্রিক অস্বীকৃতি ও সরকারী ঔদাসীন্য। ভারত সরকার সর্ব ধর্মের ও শাস্ত্রের, আচারের ও সংস্কারের রক্ষক ও পোষক। তাই সেখানে সেক্যুলারিজম বৃথা ও ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষতিভীরু বল-ভরসাকামী দুর্বল মানুষ কখনো নাস্তিক হবে না, হবে না নানা কারণে কম্যুনিস্টও, তবে সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদর্থেই সেক্যুলারিজমকে নীতি ও নিয়ম, আইন ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে প্রয়োগসাফল্য কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারত উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর যথাসম্ভব নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি সমেত, তাদের ভৌগোলিক অবস্থান তজ্জাত জীবিকাগত সাচ্ছল্য-সঙ্কট, রাজ্যগুলোর শাসক গোষ্ঠীর পরম্পরা ও গৌত্রিক পরিচিতি আর অসংখ্যক গৌত্রিক ভাষিক ও রাজ্যিক তথা স্বাধীন-পরাধীন মানুষের ভাষার ও অবস্থানের আঞ্চলিক ব্যবধান জাত আর্থিক শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের যথাসম্ভব তথ্যভিত্তিক ইতিবৃত্তান্ত রচনা করা এবং করানো মাটি ও মানুষপ্রেমী ব্যক্তির, জনকল্যাণকামী সমাজের এবং দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের তথা সরকারের পক্ষে আবশ্যিক ও জরুরী বলে মনে করি।

তা হলে হিন্দু-মুসলমান-জৈন-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানের এবং বিবিধ ও বিচিত্র গোত্র গোষ্ঠীর ও ভাষার মানুষের সাঙ্কর ও আঞ্চল অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে তারা হবে সচেতন, অনেক বিষয়েই তাদের অজ্ঞতাজাত অন্ধবিশ্বাস ও মিথ্যা গর্ব হবে লুপ্ত আর তারা হবে মোহমুক্ত স্বকালের ও স্বদেশের সজ্ঞান নাগরিক। তখন তারা জানবে ও বুঝবে ভারতবর্ষ বলে কোথাও, কখনো কোন অখণ্ড দেশ বা রাজ্য ছিল না, ভারতবর্ষে কোথাও, কখনো এক গোত্রের, এক গোষ্ঠীর, এক ভাষার, এক ধর্মমতের বা একক শাস্ত্রানুগত একক আচারের কোন জনসমাজ বা জনগোষ্ঠী ছিল না। এখানে সেখানে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই বারে বারে দলে দলে কৌমে কৌমে গোত্রে গোত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ লোক এসেছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে। উত্তর আফ্রিকা, আরব, ইরাক-ইরান-মধ্যএশিয়া-উরাল পর্বত, দানিয়ুব নদী ও মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের লোকও এসেছে। এক কথায় সাহারা থেকে গোবী, দানিয়ুব থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি সব অঞ্চল থেকেই এসেছে। ইতিহাসধৃত কালেই আমরা ইরানী, গ্রীক, শক, হুন, কুষাণ, আইবক, বরবক, আজারী, আরমানী, তুর্কী, মুঘলদের পাচ্ছি। ভারতে কোন্ গোত্রের কোন্ রক্তের লোক নেই?

আর্য কারা, হিন্দু কারা, প্রাচীন ভারতের সবকিছু কেন কেবলই হিন্দুর ঐতিহ্য ও গৌরব-গর্বের অবলম্বন এবং অবদান? মধ্যযুগের শাসক তুর্কী-মুঘল এখনকার ভারতে কারা? তাদের সংখ্যা কত? তাদের এখনকার স্বাতন্ত্র্য কি? দেশজ শাসিত মুসলিমদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি? দেশজ শাসিত মুসলিমরা তাদের জ্ঞাতি ভেবে মধ্যযুগীয় তুর্কী-মুঘল-রাজত্বের গৌরব-গর্ব করে কেন? এর ভিত্তি কি? একালের হিন্দুদের সগর্বে উচ্চারিত ও প্রচারিত 'বহুত্বে ও বৈচিত্র্যে ভারত-সংস্কৃতির ও সমাজের, ঐতিহ্যের মননের ঐক্য' তত্ত্বের স্বরূপ কি, তাৎপর্যই বা কি? এটা গৌরব-গর্বের কথাই বা কি? বাস্তবে এর অস্তিত্ব কি ও কোথায়? মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘলের প্রত্যক্ষ বা খাস শাসনের নানা সময়ে পরিসর ছিল কতটুকু? প্রশাসকরা তো ছিল স্থানীয় হিন্দু। প্রত্যক্ষ অত্যাচার-শোষণের উপায় বা পদ্ধতি ছিল কি কি? সবচেয়ে বড় কথা, দেশজ মুসলিমরা ছিল ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী নিরক্ষর দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ, তারা স্বধর্মী তুর্কী-মুঘল শাসক সরকার থেকে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে কি কি আর্থিক-সামাজিক শৈক্ষিক-সাংস্কৃতিক সাহায্য-সহায়তা পেয়েছে? এক কথায় প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষের জনজীবন-জীবিকার, জনসমাজ-সংস্কৃতির, জনগণের নৈতিক শৈক্ষিক-আর্থিক অবস্থার ও অবস্থানের যথাসম্ভব পষ্ট চিত্র আঁকতে হবে একালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইতিহাস' নামের লেখায়। নইলে বিজাতি বিভাষী-বিধর্মী-বিদেশী দ্বেষণামুক্তি ঘটবে না জনমানসের, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আবশ্যিক। আমরা জানি, বিশ্বাসপ্রবণ আস্তিক মানুষের অতীতাশ্রয়ী মানসিকতা সর্বপ্রকার যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকসম্মত উদারতার ও প্রগতিশীল মননের প্রতিকূল।

* বঙ্কিমবীক্ষা প্রবন্ধ—প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নামের প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তমদ্দুন-সংস্কৃতি-কালচার

সরকারের মন্ত্রীরাই সময়ে অসময়ে জেনে না-জেনে বুঝে না-বুঝে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে 'হিং টিং ছট'-এর মতো জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার ও অনুশীলনের এবং বিদেশীর-বিজাতির সংস্কৃতি বর্জনের আবেদন জানান তাঁদের ভাষণে।

সংস্কৃতি কোনো উৎপাদিত শস্য বা নির্মিত সামগ্রী নয়। সংস্কৃতি ব্যক্তির ও সমাজের প্রতি মুহূর্তের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্ত মানসিক চেতনা এবং জীবনাচারে প্রকটিত এবং নির্মিত সর্ব প্রকার ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ও ভোগ্য-উপভোগ্য বস্তু। তাই সংস্কৃতি মাত্রই প্রবহমান ও বিকাশমান। স্থিররূপে আবর্তিত সংস্কৃতি আচার মাত্র। শুনেছি, য়ুরোপে বিভিন্ন কালের ও দেশের মনীষীর দেয়া সংস্কৃতির একশ' ষাটটিরও বেশি সংজ্ঞা প্রচলিত রয়েছে। কাজেই স্বল্প বিদ্যা নিয়ে কোনো সংজ্ঞাই বেছে নেয়ার ও দেয়ার দায়িত্ব নেব না। তবে বাজার চালু কিছু ভুল ধারণার অপনোদনে ব্যক্তির মানসিক বিভ্রান্তি দূর করার এবং সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে জরুরী মনে করছি। সংস্কৃতি কারো মৌরসী সম্পদ নয়, সংস্কৃতি হচ্ছে মানব-উত্তরাধিকার। সংস্কৃতিমাত্রই মিশ্র ও প্রবহমান, দেশের কালে প্রজন্মে নব নব রূপে বিকাশমান।

১. সমাজে কিছু লোক দেখা যায়, যারা বাঙলা শব্দের পরিবর্তে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করে সুখ পায়, তারা মনে করে বিভাষীর ওই শব্দ উচ্চারণ মাত্রই বিনা শ্রমে কিছু সওয়াব হাসিল হল। তারা মনে করে আরবী ভাষা হচ্ছে কোরআন-হাদিসের ভাষা, কাজেই ওই ভাষা প্রয়োগে কিছু অতিরিক্ত সওয়াব মেলে, রক্ষা পায় তমদ্দুনও। তাদের জানা উচিত আরবী ভাষা একটা অঞ্চলের ভাষা। প্যাগান-কাফের-ইহুদী-খ্রীস্টান-মুসলিম ও নাস্তিক সবারই মাতৃভাষা আরবী। মুসলিমরা আরবী ভাষার সর্বকনিষ্ঠভাষী। মুমীনেরা শাস্ত্রিক নিষেধের দরুন বহু বহু শতক ধরে সাহিত্য রচনা করেনি বলে এক অর্থে আরবী ভাষা বিকাশে তাদের দান কমই। তাছাড়া যেসব আরবী নাম এখনো আমরা রাখি, সেগুলো যেমন মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ, আবদুল মোত্তালেব, আবু তালেব, আবু বকর, উমর, আলী, আবদুল মন্নাফ প্রভৃতি সব নাম কাফের, ইহুদী ও খ্রীস্টান সমাজে প্রচলিত ছিল, এসব নামে আজো আরবীভাষী মাত্রেরই অধিকার রয়েছে সমভাবে। তেমনি আরবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার অভিধানে সংকলিত সব শব্দেও রয়েছে আরবী ভাষী মাত্রেরই উত্তরাধিকার। কাজেই আরবী আজো কেবল মুমীনের ভাষা নয়।

২. আরবী পোশাকও মুসলিম উদ্ভাবিত নয়। এ পোশাক ফেরাউন আমল থেকেই রয়েছে চালু; কেবল রঙে-রূপে-আকারে-প্রকারে কালিক পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। আর সালওয়ার-কামিজ-আসকান-শেরোয়ানী-চৌকা-চাপকান-পাগড়ীও মূলে ছিল কুষাণদেরই পোশাক। এগুলোও কালিক ও স্থানিক বিবর্তন পেয়েছে মাত্র।

৩. বিভিন্ন দেশের ও কালের এমনকি অঞ্চলেরও মুসলিম জীবনাচারে অনুসৃত প্রকটিত মুসলিম সংস্কৃতি সমূহ রয়েছে বটে। কিন্তু ঢালাওভাবে সব মুসলিমে প্রযোজ্য কোন একক মুসলিম সংস্কৃতি নেই। অবশ্য রোজা-নামাজ-হজ্জ্ব প্রভৃতি শাস্ত্রিক আচার-আচরণ সম্পৃক্ত কিছু ইসলামি সংস্কৃতি বা চিরস্থির ইসলামি চর্যা বা পালা-পার্বণ রয়েছে বটে। এসবের অনেক কিছু আবার সুন্নতে ইব্রাহিম তথা রিকথ হিসেবে পাওয়া অর্থাৎ ইহুদী শাস্ত্র থেকে নেওয়া।

অতএব, শাস্ত্রিক আচার-আচরণ ও চর্যা ব্যতীত মুসলিমের মানসিক ও বৈষয়িক এবং প্রাত্যহিক জীবনে প্রায়োগিক ও প্রায়োজনিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ মাত্রই 'ইসলামিক' নামে আখ্যাত হতেই পারে না। আবদুর রহমান চুখতাইর আঁকা চিত্র কিংবা বুলবুল চৌধুরী পরিকল্পিত নাচ মুসলমানের বলেই ইসলামি হবে না। য়ুরোপে শেখা চিকিৎসা পদ্ধতি এবং য়ুরোপে আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগে মুসলিম ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করলেই তা ইসলামি চিকিৎসা, আরোগ্য বা রোগমুক্তি হয় না। কাজেই ইসলামিয়া আরোগ্য সদন, ইসলামিয়া হোটেল, ইসলামিয়া সেলুন প্রভৃতি নাম হাস্যকর অজ্ঞতাজাত অপপ্রয়োগ ও অসুস্থ মনের অভিব্যক্তি মাত্র—এতে ইসলামের মূল্য মর্যাদা বা গুরুত্ব-মহিমা-বাড়ে না। মুসলিমদের মানস-দাবি অনুসারে প্রতীচ্যবাসীরাও এখন 'মেহোমেডান' 'মুসলিম' প্রভৃতির পরিবর্তে 'ইসলামিক' পরিভাষাই ব্যবহার করে সর্বত্র। কিছুকাল আগে ঢাকার 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাঙলাদেশ'-এ নাকি এক খ্রীস্টান বিদ্বান 'ইসলামিক ট্রেড' বিষয়েও প্রবন্ধ পড়ে গেছেন। যা কিছু মুসলিম করবে তা-ই কি ইসলামিক হবে? ব্যবসা-বাণিজ্য-হাসি-কাঁশি-জাল-জুয়া-জোচ্চুরিও? স্থাপত্য-ভাস্কর্যও? নাচ-গান চিত্রও?

৪. প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ বিভিন্ন ও বিচিত্র বর্ণের, বর্গের, গোত্রের, রক্তের, ভাষার, মন-মতের মানুষের বাসভূমি। ইতিহাসের ছায়া-কায়া ও কঙ্কাল অবলম্বনে ও অনুমানে-প্রমাণে বলা চলে মহেনজোদারো-হরপ্পা গোষ্ঠী নয় শুধু, অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য-শক-হুন-কুষাণ-ইরানী-গ্রীক প্রভৃতি এসেছে—রাজত্ব করেছে, স্থায়িবাসিন্দা হয়েছে। ভারতবর্ষ কখনো একক শাসনে এক রাজ্য ছিল না। ছিল না বহুকাল দক্ষিণাপথের সঙ্গে উত্তরাপথের সংযোগ-সম্পর্ক। এখানে নিঃসম্পর্কের গোত্রগুলো এবং ভাষাসমূহ অনেকতায় বহু এবং বিচিত্র। কাজেই ভারতবর্ষ একদেশ, একরাজ্য এবং এখানে এক শাস্ত্রিক জাতিও ছিল না কখনো। তাই এটি সর্বার্থেই উপমহাদেশ।

মধ্যযুগে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার লোকেরা সিন্ধু উপত্যকার অঞ্চলকে (সিন্ধ-হিন্দ) বলত হিন্দ, তার অধিবাসীদের বলত (হিন্দুই > হিন্দরী) হিন্দু, তার ভাষাকে নির্দেশ করত হিন্দি বলে। এ সূত্রেই গোটা ভারতবর্ষ ওদের কাছে হল হিন্দ্ তথা হিন্দু অধ্যুষিত হিন্দুস্তান। এভাবে আঠারো শতক অবধি পশ্চিম-মধ্য ও উত্তর এশিয়ার লোকের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোটা ভারতবর্ষই ছিল হিন্দুস্তান এবং জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে অধিবাসী মাত্রই আখ্যাত ছিল হিন্দু বা হিন্দুয়ী [হিন্দুরী] নামে। য়ুরোপেও তাই এটি ইন্ডি/ইন্ডিজ/ইন্ডিয়া।

এখনো উত্তর ভারত বাঙলায় উড়িষ্যায় দাক্ষিণাত্যে জনগণের মধ্যে 'হিন্দুস্তান' নামেই হয় নির্দেশিত। মারাঠারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে তথা সতেরো শতকের শেষ পাদের আগে হিন্দু নামে আলাদা কোনো ভারতীয় সম্প্রদায় চিহ্নিত হত না। ওরা দেশজ শাসক বলেই (অর্থাৎ বিদেশাগত তুর্কী-মুঘল নয় বলে) তাদের হিন্দু নামে সম্ভবত অভিহিত করা হয়–এ নাম তখনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাসী নির্দেশক ছিল না। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনায় আমরা 'হিন্দু তুরুক' দেশী-বিদেশী অর্থেই ব্যবহৃত দেখি। এবং এর পরম্পরাও পাই আমরা আঠারো শতক অবধি, পার্সী-গ্রীক, শক-হুন-কুষাণ-পাঠান-আফগান-তুর্কী, আইবক-খলজী, তুঘলক-লোদী, মুঘল এবং পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফিরিঙ্গি-ইংরেজ-সমরখন্দী-বুখারী-খোরাসানী-বদখসানী প্রভৃতি গৌত্রিক-স্থানিক নামে অভিহিত—এর মধ্যে ধর্মবিশ্বাস অনুগ কোনো পরিচিতি নেই। বিভেদ-নীতির ধারক ইংরেজই প্রথম ধর্মবিশ্বাসানুগ 'হিন্দু' এবং 'মুসলিম' অভিধায় ভারতবাসীকে চিহ্নিত করে বিভেদের-বিদ্বেষের বীজ-বৃক্ষ-ফলকে সার্থকভাবে কাজে লাগায়। এর আগে আঠারো শতকের অন্তত প্রথমপাদ অবধি শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-সৌর-লিঙ্গায়েত-রামনামী আর বিভিন্ন সন্ত সম্প্রদায় ছিল উচ্চ বর্ণের ও স্পৃশ্য অস্পৃশ্য এখনকার হিন্দু অভিধায় আখ্যাত জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সবাই রশুনের মতো ধর্মমতে অভিন্নমূল হিন্দু ছিল না। ধর্মসম্প্রদায় বা ধর্মীয় জাতি হিসেবে 'হিন্দু' নাম ও ধারণা চালু করে ইংরেজ। এভাবেই বিষবৃক্ষের উদ্ভব। এর ফল বিধর্মী-দ্বেষণা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত। কিন্তু ধার্মিক পরিচয়ে হিন্দু ও মুসলিম হল, ইংরেজ কিন্তু খ্রীস্টান হল না কখনো ভারতবর্ষে, দৈশিক পরিচয়েই 'ইংরেজ' রইল। এভাবে ইংরেজ হিন্দু মনে প্রাক্তন শাসক গোষ্ঠীর প্রতি যে ক্ষোভের-ক্রোধের-ঘৃণার ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিল, তা তুর্কী-মুঘলের স্বধর্মী সমকালীন মুসলিমদের প্রতিই হল প্রযোজ্য ও প্রযুক্ত।

ভারতের এখনকার হিন্দুরা অজ্ঞতাবশে মনে করে ও দাবি করে যে, যা-কিছু প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় মানস ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য, তার সবটাই হিন্দুর। তারা মহেনজোদারো হরপ্পার-দ্রাবিড়ের-অস্ট্রিক ভেড্ডিডের, পার্সীর-গ্রীকের, শকের, হুনের কুষাণের প্রভাব বা দান বলে কিছুই আলাদাভাবে পরখ বা স্বীকার করতে চায় না এবং উত্তর ভারতের বর্ণ হিন্দুমাত্রই মনে করে তারা আর্য এবং বৈদিক উত্তরাধিকার একান্তভাবে তাদেরই। যদিও বৈদিক শাস্ত্রাচার তাদের মধ্যে সামান্যই টিকে রয়েছে, এমনকি উপনিষদও নাকি অনার্যদের চিন্তা-চেতনার মন-মননের প্রসূন। আর মূর্তিপূজা, নারী-পশু-পাখি-বৃক্ষপূজ্য, মন্দির উপাসনা-ধ্যান, অবতারবাদ-জন্মান্তরবাদ এবং সাংখ্য যোগ বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি নাকি অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোলের দান—এ সবই তো এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুর শাস্ত্রিকতত্ত্ব, আচার ও চর্যা। অতএব হিন্দুদের এ দাবির ও গৌরব-গর্বের মূলে সত্য ও তথ্য নেই। এ জন্যেই মনীষী লেখক অন্নদা শঙ্কর রায় বলেন, "ভারত আর হিন্দু একার্থক নয়, ভারত হিন্দুর চেয়ে বড়ো, হিন্দুর চেয়ে পুরাতন, আর্যের চেয়েও প্রাচীন, বেদের চেয়েও আগেকার। অগ্রাধিকারের দাবি যদি কারো থাকে তবে তা আদিবাসীদের। তারাই এদেশের রেড ইন্ডিয়ান। তারাই আদি ভারতীয়।" [পৃ-১৩ জিন্না/পাকিস্তান নতুন ভাবনা—শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সূত্রে ভুল ধারণায় বিভ্রান্ত হিন্দুদের এ তথ্যও জানা দরকার যে (ক) শূদ্রসেব্য ও শূদ্রবন্দ্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ইসলামভীতি ছিল একালের বুর্জোয়া-পুঁজিপতিদের কম্যুনিজমত্রাসের মতোই, কেননা ইসলাম বরণ করলে তাদের এই দাস-বশ-ঘৃণ্য-অস্পৃশ্য শূদ্রদের সঙ্গে সামাজিকভাবে একাকার হয়ে যেতে হত। কাজেই দায়ে না ঠেকলে কোনো বর্ণহিন্দু পূর্ব পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি ইসলাম বরণ করেনি। (পারসী ও গ্রীক-হুন-শক-কুষাণ শাসিত পাঞ্জাব অবধি অঞ্চলে ছিল ভিন্ন পরিবেশ) তাই হিন্দু-বৌদ্ধজ তথা দেশজ মুসলিমরা ছিল অন্ত্যজ ও জলচল শূদ্রজ। এজন্যেই এরা গোটা ভারতেই ছিল ক্ষুদ্র পেশাজীবী দরিদ্র গ্রামবাসী এবং বর্ণহিন্দুর আর্থিক, সামাজিক এবং প্রাশাসনিক নিয়ন্ত্রণে। এদের লেখাপড়ারও ঐতিহ্য ছিল না। কাজেই এরা হিন্দুর উপর জোর-জুলুম চালাতে পারেনি। হিন্দুই ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায় তাদের প্রভু। এখনো গ্রামীণ মুসলিমদের প্রতি শূদ্রজ বলেই হিন্দুর প্রাজন্মক্রমিক অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য হিন্দু মন থেকে মুছে যায়নি।

(খ) গাঁয়ে দেশজ মুসলিমরা সংখ্যালঘু ও হিন্দুর তাঁবে ছিল বলেই জোর করে হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করার কাহিনী বানানো মিথমাত্র। আর তুর্কী-মুঘল শাসক-প্রশাসকরা যদি জোর-জবরদস্তীতে হিন্দুদের মুসলিম বানাত, তা হলে গোটা ভারতের সব প্রশাসন কেন্দ্রে ও রাজধানীতে অধিজন থাকত মুসলমানরাই। কিন্তু উক্ত সব শাসন-প্রশাসন কেন্দ্রে তুর্কী-মুঘল প্রাশাসনিক পদবীগুলো আজো হিন্দুরাই বহন করে। আজো হিন্দুরাই অধিজন। বর্ণহিন্দু থেকে দীক্ষিত মুসলিম যেহেতু দুর্লক্ষ্য, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি সর্বত্র যেহেতু হিন্দুই বিপুল সংখ্যায় অধিজন, ইতিহাসে যেহেতু ইসলামে গণ-দীক্ষার বিভীষিকামূলক কোন ঘটনার উল্লেখমাত্র নেই, বিত্ত-বেসাত ও দেওয়ানী প্রশাসন যেহেতু ছিল সর্বত্র হিন্দুর হাতেই (ইংরেজ আমলে যেমন একজন মাত্র কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে সব প্রশাসকাদি কর্মচারী ছিল দেশী লোক), সেহেতু নগণ্য সংখ্যক বেসামরিক তুর্কী মুঘল-প্রশাসকের পক্ষে অকারণে নিতান্ত বর্বর খেয়াল-খুশিমতো ঢালাওভাবে হিন্দুকে পীড়ন-নির্যাতন করা বাস্তবে স্বাভাবিক ও সম্ভব ছিলই না। জোরে দীক্ষিত করলে এত হিন্দু থাকে কি করে, কি করে থাকে তার ধর্মাচার ও কি করে টেকে মূর্তি-মন্দির এবং শাস্ত্র-সংস্কৃতি, মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য, চৈতন্য চরিতগুলো ও বাঙলা পাঁচালী পড়ে কি মনে হয়– হিন্দুরা ভয়ে আতঙ্কে জীবন কাটাত, অর্থে-বিত্তে পীড়িত হত?

(গ) হিন্দু-লিখিত ইতিহাসেই রক্ত-পিপাসু তেমন নিষ্ঠুর ও বিধর্মীদ্বেষী তুর্কী-মুঘল সুলতান-বাদশাহ করগণ্যও নয়, বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। উল্লেখ্য যে ইংরেজ-লিখিত ইতিহাস পড়ে হিন্দু মাত্রেরই ধারণা হয়েছে যে, তুর্কী-মুঘল শাসকরা ছিল বিধর্মীদ্বেষী বুনো বর্বর নিষ্ঠুর শাসক। কিন্তু ভুললে চলবে না যে ওরা ছিল পার্সী-শক-হুন-কুষাণদেরই দেশী ও জ্ঞাতি এবং কালের মাপে সভ্যতর ও উচ্চতর মানের সংস্কৃতি স্রষ্টা, উঁচুতর মানের, মাপের ও মাত্রার প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক।

ইংরেজ লিখিত ও প্রচারিত এবং ব্রিটিশ আমলে হিন্দু বিদ্বান সমর্থিত মিথ্যা ইতিবৃত্ত এখন সত্যসন্ধ, জিজ্ঞাসু, বিদ্বান ঐতিহাসিকরাই নব আবিষ্কৃত তথ্য-প্রমাণ যোগে খণ্ডন করছেন, আশা করা যায়, অচিরেই মিথ্যার কুয়াশা কেটে যাবে, সত্য ভাস্বর হয়ে উঠবে। ভুল ধারণা জাত ক্ষোভ-ক্রোধ-বিদ্বেষবিষও হবে অপসৃত।

৫. গত কয়েক শতক ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে চিন্তাচেতনার আবিষ্কার-উদ্ভাবনের উন্মেষ-বিকাশ কেন্দ্র হচ্ছে প্রতীচী। সবকিছুই ওদের মন-মনন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনীষার প্রসূন। আর সারা দুনিয়ার বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য মানুষের জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক নিয়ন্ত্রিত মানসিক জীবনমাত্রই এবং নিত্যকার প্রাত্যহিক জীবনাচারে ব্যবহৃত যন্ত্র-প্রযুক্তি মাত্রই ওদের দান।

আমাদের ঘরে-সংসারে ব্যবহৃত তৈজস ও আসবাবপত্র, আমাদের দালান-কোঠার স্থাপত্য, আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও সেগুলোর রূপ, রঙ, মাথার চুল থেকে পায়ের জুতা, স্যান্ডেল অবধি সবটাই য়ুরোপীয় আদলে পরিকল্পিত ও নির্মিত। আমাদের আইন-কানুন, আমাদের প্রাশাসনিক ব্যবস্থা, আমাদের সেনাবাহিনীর অঙ্গ ও অস্ত্র, নাম ও শিক্ষা-শৃঙ্খলা, আমাদের রাষ্ট্রিক বা সরকারী নীতি-নিয়ম, আমাদের দোকান-বাজার, শহুরে শিক্ষিত লোকের আহার্য ও তার গ্রহণ পদ্ধতি প্রভৃতি জীবনাচারের সর্বক্ষেত্র লঘু-গুরুভাবে য়ুরোপ প্রভাবিত। প্রতীচীবাসী হতে পারলে এবং সন্তানদের সে-দেশে অভিবাসিত করাতে পারলে আমরা ধন্য হই, আমাদের জীবন চেতনায় তুষ্টির ও তৃপ্তির কারণই হচ্ছে সর্ব ব্যাপারে প্রতীচ্যায়ন। প্রতীচ্য সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রভাব ও অনুপ্রবেশ ঠেকানো যাচ্ছে না। বন্ধ্যা উপমহাদেশ প্রতীচীর মোকাবেলায় অসমর্থ, তাই ঋণের ও বশ্যতার সে লজ্জা-গ্লানি ঢাকবার জন্যে আধিগ্রস্ত হয়ে বিকৃতভাবে স্বাতন্ত্র্যগৌরব অনুভব করবার ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখার অপপ্রয়াসে আমরা শিক্ষিতরা-মন্ত্রীরা বুদ্ধিজীবীরা দৈশিক-জাতিক সংস্কৃতি খুঁজে বেড়াই পার্বণিকভাবে, পাজামা-পাঞ্জাবী-চাদরে, পয়লা বৈশাখে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, চকবাজারী খোর্মা-খেজুরে। আর খুঁজি জলে-পানিতে, ভাইয়ে-দাদায়, নানায়-দাদায়, আপায়-দিদিতে, সালামে-নমস্কারে, ধুতিতে-লুঙ্গিতে, ধূপে-লোবানে, প্রয়াতে-ইন্তেকালে। য়ুরোপীয় সব ভালো, কারণ তারা প্রতিবেশী নয়, হিন্দুর চোখে মুসলমানের, মুসলিমের কাছে হিন্দুর সব মন্দ ও ঘৃণ্য কারণ তারা প্রতিবেশী। এ ব্যাধির ঔষধ কি!

সংস্কৃতি-সভ্যতার বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি ঘটে সৃষ্টিশীলতায় আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, চিন্তা-চেতনা-মননের প্রসারে এবং ভিন্ন গোত্রের, গোষ্ঠীর, জাতির ও দেশের মধ্যে ভাবের-চিন্তার-হাতিয়ারের, ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর বিনিময়ে আর অনুকরণে-অনুসরণে। যারা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় এবং বিচ্ছিন্নতায় আরণ্য বা বুনো জীবনে তুষ্ট ও তৃপ্ত, গ্রহণবিমুখ, শ্রেয়ো-চেতনারিক্ত তারা আজো আদিম অবস্থায় ও মানসিক অবস্থানে রয়ে গেছে। আমরাও আবিষ্কার উদ্ভাবন করতে পারিনি বটে, কিন্তু গ্রহণে-বরণে, অনুকরণে-অনুসরণে সভ্য সমাজভুক্ত হয়েছি ও রয়েছি। আমাদের বুনো জ্ঞাতিরা (সাঁওতাল-মুণ্ডা প্রভৃতি) আজো রয়েছে সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে। আমরা বিদেশের-বিজাতির বিভাষীর জ্ঞান-বুদ্ধি-বিজ্ঞান-দর্শন-শাস্ত্র-পোশাক-ভাষা-প্রাশাসনিক ব্যবস্থা প্রভৃতি সবকিছু ধার করে অনুকরণে-অনুসরণে গ্রহণ করেই হয়েছি সভ্য, হচ্ছি উন্নত ও অগ্রসর। অতএব বিদেশী-বিজাতির সংস্কৃতি বর্জন করতে চাইলে হবে 'লোম বাছতে কম্বল উজাড়।' পারবে কি মুসলিমরা নাচ-গান-অভিনয়-চিত্রকলা ভাস্কর্য-নাটক-সিনেমা বর্জন করতে?

মানব-উত্তরাধিকারে অর্থাৎ যে-কোন মানুষের সৃষ্টিতে রয়েছে প্রজাতি হিসেবে সর্বকালের সব মানুষের অধিকার—এ তত্ত্বে যারা আস্থা রাখে, তারা যা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর তা-ই নির্বিচারে নির্দ্বিধায় গ্রহণবরণ করে কেবল ঋদ্ধই হয়, হয় উপকৃত, থাকে গতিশীল। এর নামই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রতি মুহূর্তেই বৃক্ষপত্রের মতো উন্মেষ-বিকাশশীল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামেও দেখি কাম হয়

গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মকে বৌদ্ধেরা বলে 'সদ্ধর্ম' অন্যেরা চিহ্নিত করে বৌদ্ধধর্ম বলে, তেমনি যিশু প্রবর্তিত ধর্মকে খ্রীস্টানরা বলে ক্যাথলিক মত। অন্যেরা আখ্যাত করে যিশুখ্রীস্টের নামে খ্রীস্টধর্ম বলে, তেমনি ইসলামকেও য়ুরোপীয়রা অভিহিত করত 'মেহোমেডানিজম' নামে, ওদের প্রভাবেই সম্ভবত মুসলিম সমাজেও ক্বচিৎ কখনো কেউ কেউ তাৎপর্য না বুঝেই মুহম্মদীয় ধর্ম বা শাস্ত্র নামে উচ্চারণ করতে দেখা যায়।

মুসলমানরা য়ুরোপীয় বা খ্রীস্টান প্রদত্ত 'মেহোমেডানিজম' পছন্দ করেনি, করে না। তারা বলে তাদের কোরআন আল্লাহ্-প্রোক্ত। এটি আল্লাহ্‌রই অভিপ্রেত ও নির্দেশিত শেষ শাস্ত্র বা ধর্মমত। আল্লাহ্-উচ্চারিত বাণীই কোরআন। আনুষঙ্গিক, রসুল মুহম্মদ উচ্চারিত নীতি-নিয়ম-নির্দেশও আল্লাহ্-অনুমোদিত। কাজেই একে মেহোমেডানিজম এবং এ শাস্ত্রমানা মানুষকে মেহোমেডান নামে অভিহিত করলে এ মতবাদের ঐশতা-অপার্থিবতা অস্বীকার করা হয়, একে পৌরুষেয় ও পার্থিব বলে নির্দেশ করে এর গুণ-মান-মাহাত্ম্য খর্ব বা নষ্ট করা হয়। তাই মুসলমানেরা তাদের ধর্মমতের বা শাস্ত্রের নাম রেখেছে 'ইসলাম।' তারা তাই 'মুসলিম।' এ 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' নামেই যথাক্রমে ধর্মের পরিচয় দিতে ও তারা অভিহিত হতে চায়। মেহোমেডানিজম ও 'মেহোমেডান' অভিধায় তাদের ঘোর আপত্তি ছিল এ কারণেই।

আগে মুসলিমদের এ আপত্তিতে কোন গুরুত্ব দেয়নি প্রতীচ্য জগৎ, সম্ভবত তখনো অর্ধয়ুরোপ জুড়ে তুর্কী সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলেই। ১৯১৮ সনের পর য়ুরোপীয়রা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে অথবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন সার্বভৌম হওয়ার ফলে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তারাই মেহোমেডানিজম ও মেহোমেডান অভিধা ও নাম বর্জন করে মুসলিমদের এতকাল উপেক্ষিত আপত্তির গুরুত্ব দিয়ে 'ইসলাম ও ইসলামিক' শব্দ দুটো এমন উৎসাহের সঙ্গে যত্রতত্র প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিকভাবে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রয়োগ-অপ্রয়োগ করতে থাকে যে এখন আত্মসম্মানের খাতিরেই প্রতিবাদ করার এবং এর অপব্যবহার ও প্রয়োগ প্রতিরোধ করার সময় এসেছে।

বিশ্বের নির্বোধ মুসলিমরাও সর্বত্র বুঝে না-বুঝে, জেনে না-জেনে, ইসলাম, ইসলামিক ও ইসলামিয়া শব্দের অপপ্রয়োগ করছে হাস্যকরভাবে, নির্লজ্জভাবে, বিরক্তিকরভাবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের উৎসাহ, আগ্রহ, আনন্দ ও তুষ্টি ও তৃপ্তি দেখে প্রতীচীর লোকেরা মুসলিম সম্বন্ধীয় যা কিছু তার সঙ্গে 'ইসলামিক' বিশেষণ যুক্ত করে দেয়। আশ্চর্য যে এ ভুল লজ্জাকর অযৌক্তিক অপপ্রয়োগে যে-সব মুসলিম আগ্রহী তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত এমনকি বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা ঋদ্ধ। তারাই মুসলিমদের রাজ্য-রাজত্বের ইতিহাসের নাম দেয় ইসলামিক ইতিহাস, প্রকৌশল-প্রযুক্তি কলেজের নাম দেয় ইসলামিক প্রকৌশল-প্রযুক্তি ইনস্টিট্যুট, য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখা-শেখানোর বিদ্যালয়ের নাম রাখে ইসলামিয়া কলেজ।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুরোপীয় আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির নাম দেয় ইসলামিয়া চক্ষুচিকিৎসালয়, বা ইসলামিয়া আরোগ্যসদন, মাদ্রাসায় ফাজেল-কামেল পড়ার পরে ইসলাম সম্বন্ধে আর কিছুই জানার-পড়ার-পড়াবার থাকে না জেনেও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এমনকি নজরুল একাডেমী ও নজরুল গবেষণা ইনস্টিট্যুট থাকা সত্ত্বেও চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি নজরুল অধ্যাপক পদ ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যও হচ্ছে মূলত ইসলামি কবি বানিয়ে ভোট যোগাড়ের অপপ্রয়াস মাত্র। পরিণামে বাঁশের, কাঠের, ভাতের দোকান থেকে হেন কোন দোকান নেই যা ইসলামিয়া নয়, অবশ্য কোন মদের বা চোরাচালানের মতো ব্যবসা এ নামে চলে কিনা জানিনে। ইসলামকে বেচে খাওয়ার বাঙলাদেশী শেষ প্রয়াস হচ্ছে 'আল্লাহু আকবর' নামে দশ টাকার নোট মুদ্রণ। দেশের মুসলিমদের সংক্রামক এ আধির খবর প্রতীচ্য বিদ্বানেরাও রাখে। তাই গত বছর আরব-পারস্যের সঙ্গে এ দেশের মধ্যযুগীয় বাণিজ্য বিষয়ক এক গবেষণা পত্র 'ইসলামিক ট্রেড এ্যান্ড কমার্স' নামে পড়ে গেলেন এক বিদ্বান আমাদের ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাঙলাদেশ-এ। নাম মোহের এ জাতীয় আধি কি আমাদের মান বাড়ায়, না লজ্জা বাড়ায়?

এ বিষয়টি জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক দিয়ে জানবার বুঝবার বিবেচনা করবার মতো লোক কি বিশ্ব মুসলিম সমাজে আজো মিলবে না? মুসলিম ও ইসলাম কি অভিন্নার্থক? যা কিছু মুসলিম করে—ডাকাতি-চুরি-জাল-জুয়া-জোচ্চুরি সবটাই কি ইসলামি? নাচ-গান-চিত্রও? স্থাপত্য-ভাস্কর্যও?

কেউ যদি বলে নামে কি আসে যায়, তাকে বলি, তা-ই যদি হবে অর্থাৎ নাম যদি তুচ্ছ গুরুত্বহীনই হয় তা হলে ইসলামি, ইসলামিক ও ইসলামিয়া নামে এত অনুরাগ কেন সরকারের ও জনসাধারণের-ব্যবসায়ীর-প্রতারকের? তা ছাড়া নাম মাত্রই পরিণামে আকৃতি-প্রকৃতি ও আচার-স্বভাব নির্দেশক। যেমন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, য়ুরোপীয়, তিব্বতী, নিগ্রো, কুকুর গরু আম লাউ ইত্যাদি। তুচ্ছ দৃষ্টান্তও দেয়া যায়, কাবিনে ফুলজানের বদলে সকিনার নাম লিখলে কিংবা কসিরউদ্দীনের স্থানে বসিরউদ্দীনের নাম বসালে মামলাটি জটিল ও অসমাধ্য হয়ে ওঠে না কি? আরো আছে, শিয়ার 'আলি' শিখের 'গুরু' মুসলিমের 'তকবীর' হিন্দুর 'হর-কালী' শ্লোগান প্রলয়ঙ্কর। এগুলো প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা-উত্তেজনা-প্ররোচনা-উদ্দীপনা যোগায়। গালাগালিও ইংরেজীতে যাকে বলে 'টু কল বাই ন্যামস' খুনাখুনি ঘটায়। 'ইসলাম' বাটিকাও তেমনি মুসলিমদের মুহূর্তেই অভিভূত ও বশীভূত করে। কাজেই নামেই কাম হয়। এতে কর্মজীবনের, ইহজাগতিক চেতনার মূল্য-মর্যাদা অনুভব-উপলব্ধি বিমিশ্র ও বিকৃত হয়, স্বচ্ছ থাকে না, জনচিত্ত হয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার। জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা ঋদ্ধ মুক্তিবুদ্ধির বিকাশ-প্রকাশ হয় রুদ্ধ।

আমাদের বিশ্বাসের ডিগদড়ি নিতান্ত হ্রস্ব, আমরা জ্ঞানশূন্য, যুক্তিহীন, আমাদের বুদ্ধি অননুশীলিত। তাই খেজুর গাছ, উট, দুম্বা আমাদের প্রিয়, আরবী শব্দ মাত্রই আমাদের কাছে পবিত্র। এজন্যেই আমাদের রাজনীতিক দলেও প্রতিনিধি, সদস্য, পরিষদ থাকে না, থাকে মজলিশ, শোওরা, রোকন প্রভৃতি। আরবী ভাষা—যা একাধারে ও যুগপৎ আজো ইহুদীর আর খ্রীস্টানেরও, আমাদের এখনো জাদুমন্ত্র। এর এক একটি শব্দ আমাদের দিল করে রওশন, মন করে পবিত্র, পাপ করে হালকা। এখন আমাদের বিভ্রান্ত মন-বুদ্ধি-মনন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি আত্মা বা সত্তাও কুয়াশাচ্ছন্ন। আমাদের কাছে উচ্চ-তুচ্ছ, জ্ঞান-বিশ্বাস, অনুভব-উপলব্ধি, ভয়-ভক্তি-ভরসা একাকার। আমরা কেবল শুনে-শুনে, মেনে-মেনে জানি, জানা-বোঝা-ভাবা যেন আমাদের কাজ-কর্তব্য-দায়দায়িত্ব নয়। তাই আমরা পীরী-মুরিদী ও মিলাদ যে কোরআন-হাদিস-বহির্ভূত বেদাত আচার, তা জানিই না। আমাদের দেহ আছে, প্রাণ আছে, তাই আমরা জীবিত, আমরা তাই নড়ি, তাই ঘুরি, আমরা চলি কিন্তু তা যেন সর্বপ্রকারে লাটিমের মতো, যন্ত্রের মতো, এর সম্মুখগতি নেই। তাই আমরা চিন্তায়-চেতনায় আদর্শে-আকাঙ্ক্ষায়-অতীতাশ্রয়ী। আমাদের আবর্তিত গতি, আবর্তিত চিন্তা, আবর্তিত জীবন। আমরা অন্ধ ও দিশেহারা। এতেই যেন আমরা স্থিতির সুখ, গতির আরাম যুগপৎ ও একাধারে ভোগ-উপভোগ করে তুষ্ট ও তৃপ্ত। আমরা যে দেহে প্রাণে মনে-মননে মুক্ত নই, তাও আমরা অনুভব-উপলব্ধি করিনে। তাই সেই প্রাবচনিক আপ্তবাক্য আমাদের আজো নিত্য আওড়ানো কেজো বলেই আবশ্যিক, উপাদেয় বলেই জরুরী—'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' যুক্তি-আশ্রয়ী না হলে আমাদের মুক্তি নেই। কিন্তু মৌলবাদীদের উপদ্রবে এবং মতলববাজ সরকারের প্রচারণায় যুক্তিবাদের প্রভাব যেন দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে।

শিক্ষিত শহুরে মানুষও যুক্তি-বুদ্ধি চালিত নয় বলেই কথায় কথায় ইসলামের দোহাই দিয়ে বাঙলাদেশ সরকার আমাদের প্রতিদিনই প্রতারিত করছে। ইসলামে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও এবাদত ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। ব্যক্তির উপাসনার ও সৎকর্মের সওয়াব সমাজে বা কওমে বর্তায় না। কাজেই সরকারী খরচে রাষ্ট্রপ্রধান ও কর্মচারী হজ্ব-ওমরাহ করলে কিংবা হেলিকপ্টারে আটরশি গিয়ে ষাট হাজার সরকারী টাকা ব্যয় করলেও সে সওয়াব জাতি পায় না।

রাষ্ট্রের তথা সরকারের ও রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে জনগণের ইহজাগতিক চাহিদা মেটানো, তাদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দান, তাদের অশন-বসন-নিবাস-নিদান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা রাখা। সরকার এ দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে, অসামর্থ্য ও অক্ষমতা ঢাকার জন্যে—তাও নাগরিক মাত্রেরই নয়–কেবল মুসলমানদের বেহেস্তে পাঠানোর চিন্তায়-চেতনায় উৎকণ্ঠায়-উদ্যোগে সদা ব্যস্ত থাকে আমাদের অজ্ঞতার, সারল্যের ও বিশ্বাসের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। দুনিয়ার সর্বত্র মুসলিম রাষ্ট্রমাত্রই সেনানী নায়ক শাসিত কিংবা স্বৈরশাসক নিয়ন্ত্রিত (কেবল মালয়েশিয়া সামান্য ব্যতিক্রম) এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই নিজেদের মধ্যে রেষারেষিতে ও যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে। তবু তারাই আবার বেআক্কেল-বেহায়ার মতো বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য আর উম্মাহর কথা সর্বক্ষণ উচ্চারণ করে– ঘন ঘন সম্মেলনও করে। এক অমুসলিম একবার জিজ্ঞাসা করেছিল–মুসলিম রাষ্ট্রমাত্রই ঘরে বাইরে লড়াই প্রবণ কেন? মুসলিমটি লজ্জিত হয়েছিল, জবাব দিতে পারেনি।

অতএব, সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে–পুঁজি করে, কথায় কথায় ইসলামের ও পারত্রিক কল্যাণের দোহাই দিয়ে আমাদের উপর দৌরাত্ম্য করছে বলেই আমাদের প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে এগিয়ে আসা উচিত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দল হিসেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের অনির্দেশ্য বেতাল বেঢক হালচাল

কারণ ছাড়া কার্য নেই। একক কারণেও কিছু ঘটে না। তাই কারণেরও কারণ থাকে, ইমারতের যেমন থাকে অদৃশ্য ভিত। যে ইমারত যত উঁচু ও পোক্ত, তার ভিত তত গভীর ও চওড়া। তেমনি যত ছোট আর দরিদ্র হোক একটা জাতির বা রাষ্ট্রের ইতিবৃত্ত–তার জন্মের, জীবনের ও বৃদ্ধির, তার উৎকর্ষের ও অবক্ষয়ের কারণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে হলেও আনুপূর্বিক জানা না থাকলে তার চলমান হালচাল দেখেই তার গতিপ্রকৃতি বা পরিণাম অনুমান করা সম্ভব হয় না, সহজ হয় না। তার উঠতি-পড়তি নিরূপণ করা যায় না বলে তার মূল্যায়ন ও তার চারিত্রিক লক্ষণ জানা সম্ভব হয় না।

কাজেই আমাদেরও গোড়ার কথা অন্তত সূত্রাকারে জানাবোঝা দরকার–আমাদের অতীত ও বর্তমান ধারাবাহিকতা বীজ-বৃক্ষ রূপে দেখার এবং ভবিষ্যৎ ফল অনুমান করার জন্যে।

১৯০৫ সন থেকে বিশেষ করে ১৯১৫ সন থেকে গান্ধী-নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নানা দাবি আদায়ের সংগ্রাম আপোসহীন বিরামহীনভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল। ওয়াহাবী (১৮২২–৫৭) ও ফরায়েজী (১৮৩০–৬০) আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশ মুসলিমরা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭–৯৮) নেতৃত্বে ১৮৬০ সন থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক ও ব্রিটিশ কৃপা-করুণা প্রত্যাশী হয়েই থাকে। তারা ১৯৪৭ সন অবধি এ নীতি অনুসরণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়ী হয়েও আর্থিক-নৈতিকভাবে পর্যুদস্ত ব্রিটিশ কংগ্রেস-আন্দোলনে বিচলিত হয়ে ভারত ছাড়তে হল সম্মত।

মুসলমানরা যদিও ওয়াহাবী-ফরায়েজী ব্যর্থতার পরে কখনো স্বাধীনতা-সংগ্রামে নামেনি, অধিজন হিন্দুর ভাবী প্রতিহিংসা-পীড়ন আশঙ্কায় ভীত মুসলমানরা তাদের জান-মাল এবং ন্যায্য অধিকার নিরাপদ ও নিরুপদ্রব রাখার ব্যবস্থা করার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করে, দাবিও জানায়। অধিজন হিন্দুভীতিবশে উনজন মুসলমানেরা কখনো দৈশিক জাতীয়তা স্বীকার করেনি। ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব ও স্বতন্ত্র আবাসিক রাষ্ট্রের দাবিও উচ্চারিত হয় এভাবে। লর্ড মিন্টোর পরামর্শে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকায় ১৯০৬ সনে। শেষাবধি এ মুসলিম লীগকেই ভেদনীতির নিপুণ প্রবর্তক ও প্রয়োগকর্তা ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র রাজনীতিক দল হিসেবে স্বীকার করে নেয়। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়েই হল স্বাধীন।

স্বাধীনতার সংগ্রাম করছিল কংগ্রেস, তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই যেসব শৈক্ষিক সামাজিক, প্রাশাসনিক, আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজনে জরুরী মনে করেছিল, সেগুলোর জন্যে সুষ্ঠু ভাবনা-চিন্তা করে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ফলে ব্রিটিশ সরকারের দুষ্ট বুদ্ধিজনিত প্রদেশ ভেঙে ওরা ১৯২৮ সনের কংগ্রেসী প্রস্তাব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাষিক ও গৌত্রিক প্রদেশ বা রাজ্য বিন্যাস করে। দৈশিক জাতীয়তা ভিত্তিক সেক্যুলার সংবিধান তৈরীও করল অল্পকালের মধ্যেই ওই বহু ধর্মের ও ভাষার বিশাল রাষ্ট্রের জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানরা স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা কিছুই ভাবেনি, কেবল হিন্দুভীতিবশে পাকিস্তান চাই-চাই করছিল। ফলে স্বাধীনতার দশ বছরের মধ্যেও তার সংবিধান তৈরি ও প্রয়োগ করতে পারল না। তাদের পরিকল্পিত কোন আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ছিল না, তাই মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সনের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ববাঙলায় অস্তিত্ব হারাল। মন-মত-মতলব অভিন্ন না করেই কেবল নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট করেছিল বলে জেতার পরে পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপতায় ও ষড়যন্ত্রে ভেঙে গেল যুক্তফ্রন্টের সংহতি। ফজলুল হকের ও সোহরাওয়ার্দীর দল আলাদা হল না কেবল, হয়ে গেল প্রায় দুশমন। ১৯৪৭ সন অবধি গোটা ব্রিটিশ আমলেই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের দেশজ বাঙালী মুসলিমরা ছিল বিদেশাগত উর্দুভাষী রইস মুসলিম নেতা-পরিচালিত। তাদের মধ্যে সচ্ছল-শিক্ষিত চাকুরে-উকিল-ডাক্তার-শিক্ষকরূপে নিরক্ষর নির্বিত্ত বা স্বল্পবিত্ত চাষী মজুরের তুলনায় নগণ্য সংখ্যক শিক্ষিত লোক অবশ্যই ছিল। (কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারই তার সাক্ষ্য) কিছু দেশজ জোতদার তালুকদার-তরফদার-হাওলাদার সওদাগরও ছিল বটে, তবে বড়-ছোট জমিদারমাত্রই ছিল উর্দুভাষী বা তাদের বংশজ।

এ অনক্ষর ও নিঃস্ব মানুষ আকীর্ণ বাঙালী মুসলিমরা পাকিস্তানী আজাদী পেয়েই ছাগলের স্তন্যবঞ্চিত নির্বোধ তৃতীয় বাচ্চার মতো আনন্দেই ছিল প্রায় দশ বছর। শিশু রাষ্ট্রের দোহাই শুনে শুনে এ সময়ে তারা দেশত্যাগী হিন্দুর সম্পদ স্বল্প মূল্যে বা বিনা ব্যয়ে পেয়েই নিজেদের আজাদী ধন্য মনে করেছে।

১৯৪৭ সনের পর থেকেই গৃহস্থরা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছিল লেখাপড়া শিখে চাকরী করে আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান উন্নত করার লক্ষ্যে। ফলে দশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও উঠতির আকাঙ্ক্ষাপুষ্ট একটা প্রসারমান ও বর্ধিষ্ণু শ্রেণী গড়ে উঠছিল। তাদের মধ্যেই কারো কারো চোখে ধরা পড়ল যে বাঙালীরা কোথাও তাদের ন্যায্য অংশ পাচ্ছে না, না চাকরীতে, না বাণিজ্যে, না সৈন্যবিভাগে। এর আগে পাকিস্তানী জোশে হুঁশহারা হলেও একটা স্বার্থবুদ্ধি জেগেছিল ছাত্রদের মধ্যে। পাকিস্তানে ও মুসলিম জাতীয়তায় আস্থাবশে ভারতের ভাষা উর্দুকে সবাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করেছিল সানন্দে নয় কেবল, সোল্লাসে। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে ছাত্রদেরই কেবল, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে বাঙালীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উর্দুতে ব্যুৎপত্তির অভাবে হেরে যাবে, ইংরেজী জ্ঞানের অভাবে ব্রিটিশ আমলে বাঙালী মুসলমানরা যেমন বঞ্চিত হয়েছিল চাকরী থেকে তথা অর্থ-বিত্ত থেকে। কাজেই একমাত্র নয়, কেবল অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাঙলার স্বীকৃতি দাবি করল ছাত্ররা তথা বাঙালীরা।

১৯৫৭ সন থেকে বামপন্থী ও বামঘেঁষা আওয়ামী সদস্যরা স্বায়ত্ত বা স্বশাসন দাবি করার কথা ভাবতে থাকেন। ১৯৫৭ সনে মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আয়োজিত কাগমারী সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক সম্মেলনে ভারতীয় বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তথাকথিত পাকিস্তানী ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি বিরাগ এবং বাঙালীর সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এবং বাস্তবে অনুশীলনের এবং রূপায়ণের অঙ্গীকার করা হয়। ফলে সরকার হল শঙ্কিত আর সরকারী ইঙ্গিতে ও আর্থিক মদদে পাকিস্তানপ্রিয় ইসলামপন্থীরা তামদ্দুনিক সাহিত্য সম্মেলন করলেন চট্টগ্রামে। কিন্তু তার কোন প্রভাব পড়েনি তখনকার পাকিস্তানী শাসকদের প্রতি বিরূপ শিক্ষিত শহুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতিপন্থী কিশোর-তরুণের ও প্রবীণদের উপর। জাগ্রত জনতা কাগমারী সম্মেলনের প্রভাবে দ্বিধাহীন হল ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সচেতন।

১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে সেনানী আইয়ুব খান জঙ্গীশাসন প্রবর্তন করেন সাদা ক্যু করে। সেনানী নায়ক আইয়ুব শরিফ শিক্ষা কমিশনের শিক্ষার্থীস্বার্থ বিরোধী সুপারিশ কার্যকর করেন। অবশেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-নেতার আপোসহীন অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের কাছে হার মানল সরকার। ১৯৬৫ সনে জনপ্রিয় হয়ে দীর্ঘকাল ক্ষমতা হাতে রাখার অভিসন্ধি বা উপায় হিসেবে আইয়ুব কাশ্মীর দখলের জন্যে যুদ্ধ শুরু করে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করতে বাধ্য হন কাশ্মীরিদের সমর্থনের অভাবে। তখন থেকেই তাঁর প্রভাব কমতে থাকে, তিনি অসুস্থও হন, অবশেষে গোটা পাকিস্তানে দেখা দেয় তাঁর বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ। সেনাপতি এয়াহিয়া খান কেড়ে নিলেন ক্ষমতা। তারপর নির্বাচন এবং ক্ষমতালিপ্সু জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্রীড়নক এয়াহিয়ার নির্বুদ্ধিতার ও গোঁয়ার্তুমির ফলে এবং ভুট্টোর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আবদার ছিল কার্যত পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করারই দাবি, এ কারণেও বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ বাঙালী প্রাণপণ সংগ্রামে নামল ১৯৭১ সনে, মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বাধীন করল বাঙলাদেশ। আগেই বলেছি, ঋজুভাবে কিছুই ঘটে না। এ সময় পরিসরে লঘু-গুরু অনেক আন্দোলন, বহু মিছিল, কিছু রক্তঝরা দ্রোহ, প্রাণহরা সংঘর্ষ-সংঘাত, কাগুজে বিবৃতি, মেঠো বক্তৃতা হয়ে গেছে সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, রাজনীতিক নানা প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে। কৃষক-শ্রমিকও প্রতিকার চেয়ে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, প্রতিরোধে এবং দাবি আদায় লক্ষ্যে রুখে দাঁড়িয়ে জয়ীও হয়েছে কখনো কখনো।

ইতোমধ্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসারে শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা গেছে বেড়ে। তারা পরিবেষ্টনীগত কারণেই হয়েছে উঠতি বুর্জোয়া। তারা তখন একাধারে ও যুগপৎ দেশের সম্পদ ও সমস্যা। সম্পদ এ জন্যে যে তারা চক্ষুষ্মান হয়েছে, হয়েছে কর্মকুশল। সমস্যা এ জন্যে যে তাদের অধিকারচেতনা, স্বার্থচিন্তা, বঞ্চনার জ্বালা, না পাওয়ার ক্ষোভ তাদেরকে অধৈর্য লিপ্সু ও অসংযত করে তুলছিল। দু-হাজার বছরের দরিদ্র সন্তান বলে তাদের অর্থ-সম্পদের তথা বিত্ত-বেসাতের দ্রুত মালিক হওয়ার লোভও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারাই অধৈর্য হয়ে পাকিস্তান সরকারের কাছে ন্যায্য অংশ ও অধিকার দাবি করছিল–দাবিও পেশ করছিল তীক্ষ্ণ তীব্র ও উচ্চ কণ্ঠে—ক্রমশ হয়ে উঠছিল অদম্য। ছাত্রদের এগারো দফা, যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা, আওয়ামী লীগের ছয় দফা স্মর্তব্য।

ইতোমধ্যে ১৯৬৫ সনে অরক্ষিত বাঙলার জনগণ জানল ও বুঝল বাস্তবে পূর্ব বাঙলা হচ্ছে পাকিস্তানের শাসনের, শোষণের, বাণিজ্যের উপনিবেশ মাত্র, অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্রের অংশ নয়। ওরা কাশ্মীর প্রাপ্তির জন্যে বাঙলাদেশ হারাতে বা ছাড়তেই যেন রাজি। ফলে গোড়ায় জনসমর্থন বঞ্চিত আওয়ামী লীগের ছয় দফা কাশ্মীর যুদ্ধোত্তরকালে গণসমর্থন পেতে থাকে। এ সময়েই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বিক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ বাঙালী মাত্রই ছয় দফার সমর্থক হয়ে ওঠে। আসামী মুজিবুর রহমান হলেন জাতীয় নেতা, যদিও এ সময়ে কেবল আমিনা বেগমই ছিলেন আওয়ামী লীগের শিবরাত্রির শলতে। আগরতলা মামলার পরিণামভীত সদস্যরা তখন পাল থেকে পলাতক। কাজেই ১৯৪৮ সন থেকেই পূর্ব বাঙলার জাগ্রত ছাত্র-জনতা নানা লঘু-গুরু আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী ঔদাসীন্যের অভিযোগে, কলকারখানাদারদের জুলুমের প্রতিবাদে, কৃষক ও বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেশাজীবীর প্রতি অবিচারের ও করবৃদ্ধির প্রতিকার চেয়ে সভা-সম্মেলন-মিছিল-ধর্মঘট-হরতাল করে তাদের ক্ষোভ-ক্রোধ-যন্ত্রণার, পীড়ন-শোষণ-ক্লেশের অভিব্যক্তি দান করে। এও উল্লেখ্য যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ববাঙলায় প্রথম ধর্মঘট করে পুলিশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাই। আর অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলার দাবি পেশ করেই ছাত্ররা সরকারবিরোধী গণআন্দোলন শুরু করে। আর ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলন করে (১৯৪৮) চট্টগ্রামে (১৯৫১) ও কুমিল্লায় (১৯৫২) সংস্কৃতি সম্মেলন করে এবং ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলন (১৯৫৪) করে প্রগতিশীল বাঙালীরা সেদিন কেবল ইসলামী জোশের ক্ষতিকর পরিণাম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আত্মভোলা উঠতি বাঙালীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এভাবে শৈক্ষিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এবং শ্রমিক-কর্মচারীর জীবিকাক্ষেত্রে লঘু-গুরু প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধমূলক আবেদন-অভিযোগজাত আন্দোলন-সংগ্রাম বিচ্ছিন্নভাবে ও ক্ষুদ্রাকারে চলছিলই। তবে সব আন্দোলনই লাটিমের মতোই আবর্তিত হয়েছে, জাতীয় জীবনে সম্মুখগতি পেয়েছে কৃচিৎ কোনটা, ফলপ্রসূও হয়েছে কোন-কোনটা।

কিন্তু তিনটে কারণে এগুলো কখনো সুনির্দিষ্ট আদর্শে ও লক্ষ্যে, নীতিতে ও নিয়মে, অঙ্গীকারে ও উদ্যোগে আধুনিক রাষ্ট্রে প্রত্যাশিত শৃঙ্খলায় চলেনি কখনো। সে তিনটে কারণ এই ঃ প্রথম কারণ সব রাষ্ট্রেই প্রয়োজনীয় সংখ্যায় একদল অভিজ্ঞ এলিট থাকে। কিন্তু নিরক্ষর এবং ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী ও চাষী-মজুর আকীর্ণ দরিদ্র মুসলিম সমাজে ওই পরিশীলিত ও বিশ্বসচেতন রাজনীতিজ্ঞ ও শিল্প-বাণিজ্য-বাজার অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল না প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সাংসদ ও সরকার পরিচালকদের মধ্যে। নতুন করে শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান দানের লোকও ছিল না কেউ। কেজো, প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান কর্ণধারদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল আনাড়ি। কাজেই তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই কেবল ছিলেন সহকারী, সহযোগী, দফতরপ্রাণ ছিলেন কৃচিৎ কেউ। ফলে স্বাধীনভাবে জানার বোঝার করার দায়িত্ব বা অধিকার ছিল না বলে, তাঁরা ছিলেন হুকুমনামা ও ফরমায়েসখাটা চাকুরে। এ সুযোগেই উত্তর ভারত থেকে আসা সচিব ও জেলাশাসকরা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থেই করতেন নীতি-নিয়ম নির্ধারণ আর চালাতেন প্রশাসন। এ আনাড়িত্ব ছিল না ভারতের কংগ্রেস শাসক, প্রশাসক ও নীতি নির্ধারকদের। ফলে একই সময়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও শাসনে-প্রশাসনে উন্নতি-উৎকর্ষ ছিল গুণে মানে মাপে মাত্রায় পৃথক।

দ্বিতীয় কারণটি সবচেয়ে গুরুতর। বলেছি দীক্ষিত দেশজ মুসলিমরা নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নির্বিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধজ। প্রজন্মক্রমে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী বলে তাদের অর্থে-বিত্তে-শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে সচ্ছল-স্বচ্ছন্দ হওয়ার অধিকার ছিল না কখনো; ছিল না মনে-মানে আত্মচেতনার সুযোগ, ছিল না সমাজে আচারে আত্মনিয়ন্ত্রণের ও আত্মপ্রসারের অধিকার। দরবেশ নামে পরিচিত প্রচারকদের হাতে দীক্ষিত হয়েও পেশাভিত্তিক বর্ণাশ্রিত সমাজপ্রতিবেশে তাদেরও পেশা বদল করে অর্থ-সম্পদে আত্মোন্নয়নের সুযোগ বা উপায় ছিল অনিশ্চয়তার ঝুঁকিপূর্ণ। তাই উনিশ শতক অবধি এরা ছিল সাধারণভাবে নিরক্ষর দরিদ্র চাষী, মজুর কৈবর্ত, নিকেরি, জুলাহ, কাহার, মুলুঙ্গি, কুমার, ভিক্ষাজীবী বাউল-ফকির-ভিখারী, মাঝি-মাল্লা, দরজি, রাজ-ছুতার প্রভৃতি। আরবী-ফারসী শিক্ষিত ছিল কয়েক হাজারে এক আর উনিশ শতকে ইংরেজী জানা মুসলিম ছিল কয়েক লাখে এক। বাঙলাজানা তথা স্বাক্ষর লোকও ছিল না হয়তো শতে একাধিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহাসিকভাবে বাঙালী-সভ্যতার দু'হাজার বছরের মধ্যে নিম্নবর্ণের ও বর্গের এ শ্রেণীর মানুষগুলোর অনেকেই যখন ১৯৪৭ সনের পর থেকে কয়েক বছর ধরে শহরে হিন্দু-পরিত্যক্ত দালান-কোঠাগুলোর দামে ও বিনাদামে অধিকার পেল, গাঁয়েও বাড়ি-ভিটে ও জমির মালিক হল, তখন তাদের এবং কিছু না-পাওয়া অন্যদের লোভ-লিপ্সা ও আকাঙ্ক্ষা হল অপ্রতিরোধ্য। তারা বাঘের ক্ষুধা, হায়েনার লোভ, নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নগরে-বন্দরে, গাঁয়ে-গঞ্জে। দিশেহারার মতো ছুটোছুটি, ঠেলাঠেলি লেগে গেল শহরে-বন্দরে এসব অর্থ-সম্পদ লিপ্সু মানুষের। দলে দলে শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত আর চালাক চতুর অশিক্ষিত লোকেরা শহরে বন্দরে ভীড় জমায় আর্থিক ভাগ্য ফেরানোর লক্ষ্যে। এরা দু'পুরুষ ধরে এখনো পাই পাই খাই খাই করে। এরা চাকুরে হয়ে ঘুষখোর হয়, ব্যবসায়ী হয়ে মৌজুতদার ও চোরাকারবারী হয়, কারখানাদার হয়ে ঔষধে পর্যন্ত ভেজাল মেশায়, ঠিকেদার হয়ে কেবলই ঠকায়। নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ যাদের দায়িত্ব তারা দেয়া-নেয়ার আপোস করে। সর্বত্র চলছে গোপন চুক্তির ও আপোসের নীতি-নিয়ম, লেন-দেন চলে নির্বিঘ্নে। জনজীবনের কালোবাজারে কোন বাচালতা নেই, নেই হৈ চৈ, মারামারি, কাড়াকাড়ি, সব চলে ইঙ্গিতে, এমনকি বলা চলে অব্যক্ত ধ্বনির ভাষায়। এখানে ঘুষ দিয়ে তৃপ্ত, আর পেয়ে তুষ্ট মানুষ। যা ঘটে যেন সবই প্রেমসে পেয়ারসে ঘটে। গাঁ-গঞ্জের বা নগর-বন্দরের নিরীহ-সৎমানুষ যারা এ চুক্তিতে নেই, তারা এখন জোর-জুলুমের শিকার। কাজেই গাঁ-গঞ্জ-শহর-বন্দর এখন দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীর খপ্পরে, গোটা দেশ দুর্নীতিবাজ ও মস্তান কবলিত। ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকবান সজ্জন এখন প্রভাবহীন ও দুর্লভ। তা ছাড়া এখন জনসংখ্যার, শিক্ষিত বেকারের বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক অসঙ্গতি প্রভৃতি অধিকাংশ মানুষকে বাঁচার তাগিদে বানিয়েছে দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী-বঞ্চক-প্রতারক-পরস্বাপহারক, আর একদল হতাশ কিশোর-তরুণকে করেছে মাদকাসক্ত।

AMARBOI.COM

তৃতীয় কারণ—এমনি আকস্মিকভাবে বিনা প্রয়াসে বিনা প্রতিযোগিতায় বিদ্যায় ও বিত্তে গড়ে ওঠা ভুঁইফোড় সমাজে মানস ও ব্যবহারিক সংস্কৃতির ছিল নিতান্ত অভাব। আত্মসম্মান বোধ এবং অহমিকাই মানুষকে সৎ ও বিবেকবান করে। জ্ঞান-প্রজ্ঞাই মানুষকে যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক আশ্রিত হতে প্রেরণা-প্রবর্তনা দেয়, এ ভুঁইফোড়দের কাছে আত্মমর্যাদার গুরুত্বচেতনা দুর্লভ, তারা স্থূল খ্যাতি-ক্ষমতা-মান-যশকামী। তাই মন্ত্রীদের মধ্যেও অভিযুক্ত কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত দুষ্ট-দুর্জন সুলভ। মানুষের অন্তরের অনাস্থা-অশ্রদ্ধা-নিন্দা-ঘৃণার কোন গুরুত্ব নেই এদের কাছে। এরা উপস্থিত মৌন মানুষের সালাম ও আপাত আনুগত্য প্রত্যাশী মাত্র। এ মানুষে এ সমাজে কোন রাজনীতিক সংস্কৃতি যে সকল অননুশীলিত, তা নয়, অজ্ঞাতও। তাই এখানে মৌল মানবিক অধিকার এবং বিচারবিভাগের অনপেক্ষতা ও স্বাধীনতা আজো স্বীকৃত। রাজনীতিও যে এক প্রকার উঁচু মনের মানের, মাপের ও মাত্রার সংস্কৃতি, এর সঙ্গে যে মাটি-মানুষপ্রীতি, বহুজনহিত ও বহুজনসুখচেতনা, আদর্শ ও নীতিনিষ্ঠা অপরিহার্যভাবে জড়িত, রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের কেবল জৈবিক-ব্যবহারিক অশন-বসন-নিবাস-নিদান-স্বাস্থ্য-শিক্ষার সুব্যবস্থায় যে রাজনীতিকদের দায়িত্ব শেষ হয় না; শিল্পের সাহিত্যের ইতিহাসের, দর্শনের, বিজ্ঞানের, সমাজতন্ত্রের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ও মনোবিজ্ঞানের চর্চা এবং এসব কিছুর অবলম্বনে সামষ্টিক, সামগ্রিক ও সামূহিকভাবে সংস্কৃতিচর্চা যে রাজনীতিকেরও আবশ্যিক দায়িত্ব, তা সংস্কৃতিবোধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাবে এখনো অনুপলব্ধ, সংস্কৃতি-সভ্যতা-মননের মানবিক বিকাশই যে রাষ্ট্রের ও রাজনীতিকের লক্ষ্য, তা এদের জানাই নেই। সামাজিক মানুষের মহত্ত্ব সাধনার ও অর্জনের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে দেয়াই রাষ্ট্রের চরম ও পরম লক্ষ্য। মানুষকে সভ্য-ভব্য-সুরুচিমান সংস্কৃতিমান সজ্জন-সুজন করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

কংগ্রেস করত উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি স্বাধীন পেশার শিক্ষিত লোকেরা, মুসলিম লীগে নেতৃত্ব দিত নওয়াবজাদা, পরীজাদা, সাহেবজাদা, মালিকজাদা, চৌধুরীজাদা, স্যার-খানবাহাদুর-খানসাহেবেরা, এরা ছিল সব চাটুকারের দল। কাজেই গণদরদী গণসংযুক্ত রাজনীতিক ছিল না এরা।

তা ছাড়া, ব্রিটিশ আমলে এরা রাজনীতিক কাজে তথা সেবামূলক কাজে যুক্তও ছিল না। এরা কেবল সাংসদ ও মন্ত্রী হত। আর ব্রিটিশ ইঙ্গিতে মুসলমানদের জন্যে হিন্দুদের থেকে চাকরী প্রভৃতির ব্রিটিশ সরকারের মধ্যস্থতায় ন্যায্যভাগ দাবি করত সভা-সম্মেলন ও বিবৃতি মাধ্যমে। তাদের রাজনীতির রূপ ও সীমা ছিল এই পর্যন্তই। এমনি অজ্ঞতা-অসংস্কৃতি ও অপরিশীলিত রাজনীতিক প্রতিবেশেই গান বাঁধিয়ে এক কবির গানের দুটো কলি সারা দেশে খুব জনপ্রিয়: 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরি আছে সারা মন/শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া যে নাহি কিছু প্রয়োজন।' অর্থাৎ ঘোড়ার মতো তৃণাচ্ছন্ন মাটিতে গড়াগড়ি দিলেই যেন সব পাওয়া হয়ে যায়, মিটে যায় সব দায়িত্ব কর্তব্য। আমাদের বাঙলাদেশী মানুষের মন-মত-মননের মতোই, এমনকি তাদের চাওয়া-পাওয়ার অভিব্যক্তি স্বরূপ যেন এ গান। এ গান পাকিস্তান যুগের, সম্ভবত ১৯৬৫ সনের যুদ্ধকালের। তখন গোড়ার দিকে মনোভাব ছিল পাকিস্তান পেয়েছি, আর কিছু চাওয়ার নেই। দ্বিতীয় কলি যদি হত 'এরি সেবা-সম্মান লাগি আমাদের দেহ-মন-প্রাণের সব আয়োজন' তাহলে আমাদের মাটি-মানুষ প্রেম পেত অভিব্যক্তি।

এখন স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ নামের রাষ্ট্র পেয়েছি। এখন দেশে ক্ষমতা দখলের তথা মন্ত্রী হয়ে মজা লুটা, খ্যাতি ক্ষমতা বিত্ত বেসাত পাওয়া ছাড়া রাজনীতির ও রাজনীতিকদের অন্য কোন লক্ষ্য নেই। তাই আমাদের বুর্জোয়া রাজনীতিকদের চেতনায় ও হিসেবে দেশ, জাতি ও মানুষ নেই, আছে কেবল ভোটযোগাড়ের ও ক্ষমতাদখলের উৎকণ্ঠা ও প্রয়াস। এ ক্ষেত্রে কম্যুনিস্টরা অবশ্য ব্যতিক্রম। কারণ তাদের লক্ষ্য গণমানবকে সর্বপ্রকারে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্ত করে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তারা জানে শাসক-প্রশাসক স্বদেশী-স্বধর্মী-স্বজাতি-স্বভাষী হলেই গণমানব শোষণ-পীড়ন মুক্ত ও স্বাধীন হয় না। তাই তারা সামন্ত-বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী ও সংগ্রামী। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে তাদের আপোসহীন-বিরামহীন প্রাণপণ লড়াই কখনো রক্তঝরা ও প্রাণহরা, কখনো নিবর্তন ও প্রতিরোধমূলক। যুদ্ধ চলতে থাকবে লক্ষ্যে উত্তরণ না ঘটা অবধি। পূর্ব য়ুরোপের প্রতিবিপ্লবী ঘটনা-বিদ্রোহ দেখে এদের হতাশ হলে চলবে না, এদের জানতে বুঝতে হবে যে এ মার্কসবাদের ব্যর্থতা নয়— অদক্ষ মার্কসবাদীর ব্যর্থতা।

অতএব আমাদের দেশের রাজনীতি হচ্ছে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অদক্ষ, অদীক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, অপরিশীলিত অনুশীলনবিমুখ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী, দোকানদার, ঠিকেদার, কারখানাদার, আড়তদার প্রভৃতির সরকারী ক্ষমতা-দখলের রাজনীতি, ধন-মান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতালোভী ধনী-মানীরা হন রাজনীতিক। আমাদের দেশে এ মুহূর্তে নামদার নেতাদের অধিকাংশই দৃশ্য ও অদৃশ্য ব্যবসাজীবী এবং ধনী।

কৃষকপ্রজা দল, মুসলিম লীগ প্রভৃতি যখন নিষ্প্রভ ও জনসমর্থনচ্যুত, তখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হল পঞ্চাশের গোড়ার দিকেই, সেটা আওয়ামী লীগ হল, তার থেকে ভাসানী ন্যাপ হল, ফাঁকে ফাঁকে ভোট-মৌসুমী রাজনীতিকদের ভোট পার্বণে তৈরী PDP NDF COP প্রভৃতিও আর্তব দল গড়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগ থেকেই জাসদের উদ্ভব। সেটি তখন বিভিন্নভাবে নানা উপমতের উপশাখা তৈরী করেছে। ১৯৬৬ সনে যখন বিশ্বের কম্যুনিস্টদের মতে-পথে অনৈক্য দেখা দিল, তখন আমাদের দেশেও কম্যুনিস্টরা নানা দলে বিভক্ত হতে লাগল। তবে সি-পি-বি রইল অনড়। এসব দলের কোনটা রক্তাক্ত বিপ্লবে, কোনটা জনগণতন্ত্রে, কোনটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে, কোনটা শৈক্ষিক-সাংস্কৃতিক আর্থিক প্রতিবেশের বিবর্তনে বা অবক্ষয়ে গণমুক্তিকামী বা প্রত্যাশী।

দেশের চাষী-মজুর-জেলে-জোলা-কামার-কুমার প্রভৃতি পেশাজীবীরা দিন দিন দরিদ্র হচ্ছে। সচ্ছল চাষী জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র হচ্ছে, জমি হারাচ্ছে, জেলে-জোলা-নিকেরি-কামার-কুমাররাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়ে জীবন-মরণ সমস্যায় পড়েছে। তবু গণমুক্তি সংগ্রামী কম্যুনিস্টদের তাঁরা তাদের হিতকামী আপনজন বলে গ্রহণ করে না, কম্যুনিস্টরা জনপ্রিয় হয় না, তাদের দলও ভারী হয় না সদস্যসংখ্যায়। এ এক বিড়ম্বনা!

পাকিস্তান গড়ে পাকিস্তান ভেঙে দরিদ্র শ্রেণীর জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসেনি, বরং দারিদ্র্য-দুঃখ ও অভাব-যন্ত্রণা বাড়ছে। গোড়া থেকেই স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশে গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে মস্তানদের জোরজুলুম-বঞ্চনা, প্রতারণা, হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলা বেড়েছে, বাড়ছে, বেড়েছে জাল-ভেজাল-জুয়া-জোচ্চুরি। সর্বত্র অন্যায়ভাবে 'ফেল কড়ি মাখ তেল' নীতিতে ঘুষ-কমিশন পাওনা-বকশিস্-টিপস্-উপহার-নজর-উপঢৌকন-দস্তুরী যোগে কার্যসিদ্ধি হয়।

মূলে এক নীতিরই বিশ্লিষ্ট রূপ চার নীতির সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক জাতীয়তার ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংবিধান চালু করেও গণমানবকে স্বস্তি-সুখও দিতে পারেননি শেখ মুজিব, দুর্ভিক্ষ হল তাঁর চোখের সম্মুখে। খাদ্যাভাবে লক্ষ লোক গেল মারা। এ সময়ে রক্ষীবাহিনী ও আওয়ামী গুণ্ডারা নরহত্যা প্রবণ হয়ে ওঠে। (আহমদ মুসার 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ' দ্রষ্টব্য) মুজিব হত্যায়ও এল না গণমানবের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, আসেনি কোন পরিবর্তন, জিয়াউর রহমান হত্যায়ও সুখ এল না। অর্থলিপ্সুর দেশে জিয়ার অর্থলিপ্সা ছিল না। স্বপ্রয়োজনে সর্বপ্রকার নীতি-নিয়ম বর্জন-গ্রহণ করেও, নির্বিচারে কয়েক হাজার গুপ্ত হত্যা করিয়েও, এ সুবিধেবাদী সেনানী শাসক অন্যদের দুর্নীতিকে স্বেচ্ছায় প্রশ্রয় দিয়েও এক শ্রেণীর বিচারবুদ্ধিহীন লোকের কাছে আজো প্রিয়। সুখ এল না বর্তমান মিথ্যাচারী-চালবাজ ধর্মধ্বজী ইসলামসেবী সরকারের আমলেও। আমাদের ধারণা এদেশী দরিদ্র ভুঁইফোড় সংস্কৃতিহীন অনভিজ্ঞ অদীক্ষিত রাজনীতিকের, ব্যবসায়ীর ও চাকুরের বিদ্যায়-বিত্তে ঋদ্ধ, দেহে-মনে-মননে স্বস্থ ও সুস্থ তৃতীয় প্রজন্মের বংশধরদের মধ্যেই আমরা জ্ঞান-বুদ্ধি, যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন সংস্কৃতিমান রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, মাটি-মানুষ প্রেমী কর্মী পাব, য়ুরোপে যেমন পাওয়া গেছে, ওরা হবে মানবিকতা, মানবতা ও মানবতাবাদী নেতা ও কর্মী। দেশ, জাতি ও মানুষ হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা জনগণের মানসোৎকর্ষ ও ভোগ-উপভোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে করবে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ। এত আত্মপর স্বার্থবাজ অমানুষকে হুকুমে-হুমকিতে, পিটিয়ে-পাটিয়ে বাঞ্ছিত নাগরিক বা সমাজসদস্য করে গড়ে তোলা যাবে না। অতএব আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে আরো অন্তত পনেরো বিশ বছর। অবশ্য আকস্মিক কোন কারণে যদি বিপ্লব ঘটে যায়, তাহলে দুর্দশা ঘুচবে।

কাজেই আওয়ামী লীগ, বাকশাল, বি.এন.পি. অতীতাশ্রয়ী মৌলবাদী জামায়েত ইসলামী, জাসদ, বাসদ, ন্যাপ, এন.এ.পি. প্রভৃতি ও নিম-বামদল, সব বুর্জোয়া দল ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে বটে, তাদের দিয়ে কোন লোকোপকারের আশা-আশ্বাস নেই। জনগণের প্রতি তাদের কোন দরদের সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই তাদের কথায় ও আচরণে। তারা গা-পা বাঁচিয়ে আস্ফালন করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধ কিংবা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

কাজেই আমাদের আরো অনেককাল শহুরে লুটেরা বুর্জোয়ার শাসনে থাকতেই হবে। তবে নির্বাচনে লোকশিক্ষা ও গণচেতনা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সজ্জনের ভোট প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বাড়ে। কিন্তু এখনকার দিনে টাকার খেলা সে-সম্ভাবনাও লোপ করছে।

অবশ্য ক্ষমতা দখল লক্ষ্যে ভোটের রাজনীতি করে বলেই এরা দেশের মানুষপ্রেমী ও মানুষসেবী আদর্শনিষ্ঠ কোন ছাত্রদল তৈরি করতে পারে না। এরা ছাত্রদল ও যুবদল নামে লেঠেল-গুণ্ডা-মস্তান পোষে। ওরা নগদ অর্থে, ভাবী চাকরী ও বেসাত লোভেই করে রক্তঝরা প্রাণহরা এ কাজ। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে-হস্টেলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটেছে এবং নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠেছে এসব তথাকথিত রাজনীতি সচেতন ছাত্র দিয়েই।

AMARBOI.COM

এ মুহূর্তে আমাদের অবক্ষয়মুখী রাজনীতি, রাষ্ট্রিক শিথিল ও বিকৃত শাসন-প্রশাসন, আইনের শাসনে অনাস্থা ও অমান্যতা, জনগণের দুর্গত আর্থিক জীবন, সমাজে নৈতিক চেতনার অবলুপ্তি, সর্বস্তরের মানুষের চারিত্রিক অপকর্ম, সাংস্কৃতিক জীবনে রুচির দৈন্য ও বিকৃতি, জ্ঞান-যুক্তির অনুশীলনে অনাগ্রহ, ব্যক্তির উগ্র আত্মরতিজাত অর্থসম্পদ লিপ্সা, মনন জীবনের বন্ধ্যাত্ব, মানবিক ও সামাজিক মহৎ-বৃহৎ আদর্শ ও নীতি চেতনার অনুন্মেষ প্রভৃতির কারণ দুটো। এক, আমাদের দু'দুটো স্বাধীনতাপ্রাপ্তি অনপেক্ষভাবে স্ববলে অর্জিত হয়নি, আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-মনন স্বাধীনতা সংগ্রামীর যোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করিনি কখনো—অনুশীলন করিনি প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস-অঙ্গীকার-উদ্যম-উদ্যোগের।

অর্থাৎ স্ব-আকাঙ্ক্ষাবশে স্ববলে স্বযোগ্যতায় স্বাধীনতা অর্জনের, রক্ষণের, রাষ্ট্রের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের, ভাতে কাপড়ে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে অর্থে সম্পদে প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে শাসনে-প্রশাসনে কলে-কারখানায় উৎপাদনে নির্মাণে রাষ্ট্রকে দৃঢ় ভিত্তিক, সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে যে সততা-সংযম-ত্যাগ-নিষ্ঠা-পরার্থপরতা-আদর্শ ও নীতিচেতনা এবং আবিষ্কার-উদ্ভাবন প্রবণতা ছোট-বড়-মাঝারি অধিকাংশ চালক-পরিচালকে বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত ছিল, তা কখনো আমাদের মধ্যে গোড়া থেকেই দেখা যায়নি। পূর্বোক্ত কারণে যে-লুট দিয়ে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীন জনজীবনের শুরু, তা আজো অবাধে নির্বিঘ্নে চলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই, এখানে গোড়া থেকেই চলছে বিদেশী শক্তির ইঙ্গিতে মদদে আর্থিক ঋণে-দানে কৃপায়-করুণায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত মুৎসুদ্দী রাজনীতিক দলের নেতৃত্বে রাজনীতি এবং মুৎসুদ্দী সেনানী নায়কের ও সরকারের গণমানবের সেবা ও স্বার্থবিরোধী দৌরাত্ম্য। নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হলেও এ মুহূর্তেও আমাদের রাষ্ট্রের স্টিয়ারিং হুইল রয়েছে নিউইয়র্কে-ওয়াশিংটনে। আর ভেতরে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট এন.জি.ও. নামের দেশী-বিদেশী হাজার দেড়েক সেবা-সাহায্য-ত্রাণ প্রতিষ্ঠান। এরা বন্ধুবেশী শত্রু। কেননা এরা আমাদের কল্যাণ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে, স্বনির্ভর হয়ে দেশ গড়তে, নিজেদের বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান যোগ করে, সাহসের সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি করে, অঙ্গীকারের সঙ্গে প্রয়োজন-চেতনা যোগে অজ্ঞ, অক্ষম, অসমর্থ, পরনির্ভর রাখছে বলে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বাবলম্বী কর্মী, সেবী ও পরিচালক রূপে দেশকে ঋদ্ধ করবার শক্তি অর্জনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান। এদের সেবা-সাহায্য-ত্রাণ আপাত মধুর হলেও পরিণামে বিষবৎ ক্ষতির কারণ হবে।

মাটি-মানুষের স্বার্থে
একটি সেক্যুলার দল আবশ্যিক ও জরুরী

AMARBOI.COM

প্রাণীমাত্রেরই লক্ষ্য আত্মরক্ষণ ও আত্মপ্রসার। আত্মরক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেই আত্মবিকাশে-বিস্তারে প্রাণী হয় নিরত। এ স্বভাব মানুষেরও। অন্য প্রাণীদের মতোই মানুষেরও আবশ্যিক তিন চাহিদা—আহার, নিদ্রা ও মৈথুন। এগুলো যুগপৎ শারীরিক ও মানসিক। সব প্রাণীই মোটামুটি তাদের জাগ্রত জীবন কাটায় মুখ্যত খাদ্যান্বেষণে। মানুষও তা-ই করত, এখনো করে, তবে তা' ভিন্ন কারণে অনন্য।

মানুষের দৈহিক গঠনের বিশিষ্টতার ফলে মানুষ ঋজু হয়ে দাঁড়াতে পারে, দুটো হাত হাঁটার জন্যে দেহ ধারণের জন্যে প্রয়োগ করতে হয় না, এ দিয়ে সে খাদ্য সহজেই সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে পারে। আগে পচন রোধ করা যেত না বলে এবং মৌজুত রাখার বুদ্ধিজাত ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে মৌজুত বা সঞ্চিত খাদ্যবস্তুতে নির্ভর করা যেত না। ক্রমে মানুষ দলবদ্ধ বা যুথগত জীবনে সম ও সহস্বার্থে কিংবা প্রবলের স্বার্থে দুর্বলকে হুকুম-হুমকি-হামলায় ভীত রেখে, তাদের সহায়তায়-সহযোগিতায় আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে প্রকৃতিকে দাস ও বশ করে স্বনির্মিত প্রতিবেশে স্বরচিত কৃত্রিম জীবন যাপন করতে থাকে। যৌথ বা দলবদ্ধ জীবনে সমঝোতার ভিত্তিতে ও অঙ্গীকারে সহাবস্থান করতে গেলে সর্বজনীন স্বার্থে ও সম্মতিতে কিছু নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ মানতেই হয়। এগুলোই কালিক পরিণামে আচার-সংস্কার ও প্রথা-পদ্ধতি রূপে স্থিতি পায় ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে।

এভাবে মানুষের বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য-জীবনে স্থানিকভাবে অসম ক্রমোন্নয়নে-উৎকর্ষে সভ্যতা-সংস্কৃতির আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্রমবিকাশ-বিস্তার ঘটে ঘটে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের এ অবস্থায় ও অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। এর সবটা কোন গোত্রের বা একক অঞ্চলের দান নয়। অনুকরণে-অনুসরণে, দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে আমরা মানবকৃতি ও মানব মনন মানবিক উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ-বরণ করেই সংস্কৃতি সভ্যতা ক্ষেত্রে এগিয়েছি। উল্লেখ্য যে একের আবিষ্কার-উদ্ভাবন মননই অন্যদের ঐতিহ্য আচার, বিশ্বাস-সংস্কার সভ্যতা-সংস্কৃতি রূপে পরিচিত।

যে কোন অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারের, জন্মমৃত্যুর, মন-মননের, জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা শক্তির ক্রমবিকাশের বা ক্রমবিবর্তনের ধারা উপলাহত মন্থর, বক্র ও জটিল। নিজের জীবিকাসম্পৃক্ত না হলে মানুষ সাধারণভাবে দেশ-জাত-ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোন ভাব-চিন্তা মনে-মগজে পোষে না। তাই ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে যা কিছু বস্তু বা যন্ত্রগত প্রয়োজন মেটায়, তা সোৎসাহে-সাগ্রহে গ্রহণ-বরণ করে মানুষ। কিন্তু বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতিমানা মানুষ নতুন ভাব-চিন্তা-নীতি-নিয়ম-পদ্ধতি জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-শ্রেয়োবোধ যোগে জানতে-বুঝতে চায় না বলে কখনো কোন চিন্তা-যুক্তি গ্রাহ্য বিষয়ে পরিচ্ছন্ন মত-পথ বোধগত করতে পারে না।

তারা একালের যন্ত্র নিয়েছে, বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্য জানছে, আধুনিক অর্থপ্রতীক পুঁজি, বাণিজ্য ও পণ্য উৎপাদন নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি গ্রহণ করছে, য়ুরোপীয় আদলে প্রাত্যহিক জীবন রচনায় ও যাপনে আগ্রহী হয়েছে, জীবনে ঐহিকতার ও ইহজাগতিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা স্বীকার করেছে, তবু স্বশিক্ষার ও জ্ঞানের স্বল্পতায়, বিশ্বাস-সংস্কার বশ্যতায়, যুক্তি-বুদ্ধির অননুশীলনে মননের বন্ধ্যাত্বে প্রাগ্রসর য়ুরোপের কল্যাণকর ভাব-চিন্তা-চেতনা, নীতি-নিয়ম, রীতি-পদ্ধতি অবিকৃত ও পূর্ণভাবে গ্রহণ-বরণ ও প্রয়োগ করতে পারে না। যা কিছু নেয়, খণ্ডভাবে নেয়, সম্পূর্ণ অবয়বে ও তাৎপর্যে নেয় না বলে বিকৃতভাবে তা ক্ষতিকর হয়ে প্রকটিত হয়। তাৎপর্য সচেতন হয়ে অঙ্গে ও অন্তরে, বাস্তবে ও মননে, নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণ-অনুসরণ করতে না জানলে বা না পারলে অনুকরণ-অনুসরণ মাত্রই বাঞ্ছিত ফলদানে ব্যর্থ তো হয়ই, শ্রম, সময় ও লক্ষ্যভ্রষ্টতার দরুন নৈতিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রিকভাবে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হতে হয়। আজকের এ মুহূর্তের আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর হালচাল এরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বাঙলাদেশে স্বল্পসংখ্যক লোক সমাজবাদী বা কম্যুনিস্ট বটে, কিন্তু অন্য শিক্ষিত শহুরে লোকেরা য়ুরোপীয় আদলের 'গণতন্ত্র' কামনা করে। অশিক্ষিত কোটি কোটি নারী-পুরুষের এ য়ুরোপীয় তত্ত্বে-দর্শনে কোন জ্ঞানও নেই, কোন দাবিও নেই। এরা গড্ডলিকা-স্বভাবে চলে ভাঁওতাবাজ রাজনীতিকদের তাড়নায় ও চালনায়। অতএব, আমাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা লেখাপড়া জানা সচ্ছল মানুষেই নিবদ্ধ।

সাম্প্রতিক ধারণায় গণতন্ত্র হচ্ছে জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-আর্থিক-শৈক্ষিক অবস্থা-অবস্থান নির্বিশেষে আঁধা-কানা-খোড়া ধরা না-পড়া চোর-ডাকাত-প্রতারক-নরহন্তা অবিশেষে রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা মাত্রেরই মৌলমানবিক অধিকার-সাম্যের অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন। আমাদের বাঙলাদেশী গণতন্ত্রীদের চেতনায় এখনো এ বোধের উন্মেষ ঘটেনি, তাই তাঁদের গণতন্ত্রে ধর্মের ঠাঁই, অঞ্চলের গুরুত্ব, গোত্রের স্বাতন্ত্র্য, নারী-পুরুষে ভেদ, স্বধর্মী-বিধর্মী চেতনা রয়েছে। একালে যে গণতন্ত্র অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে সেক্যুলারিজম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর সমার্থক ও নামান্তর হতেই হবে তা আজো তাঁদের বোধগত নয়। তাই আমাদের সব বুর্জোয়া দলই ধর্মধ্বজী, ন্যাপ-সিপিবিও ধর্ম মানছে, অন্য কম্যুনিস্টরাও মুসলিমভীরু।

সেক্যুলারিজমে ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ হচ্ছে ব্যক্তির ঝাড়ে-ফুঁকে-মন্ত্রে-মাদুলীতে আস্থার ও ভরসার মতো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। রাষ্ট্রাদর্শে ও রাষ্ট্রিক বিধিব্যবস্থায় তা থাকবে অস্বীকৃত, সরকার থাকবে তার প্রতি উদাসীন। সরকারী কাজে-কর্মে শাসনে-প্রশাসনে ধর্মের ও ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকবে অস্বীকৃত। কেবল অর্থ-সম্পদের উত্তরাধিকারে শাস্ত্রীয় নীতি-নিয়ম বিধি-নিষেধ থাকবে অবশ্যই মান্য।

আমরা সবাই মৌখিকভাবে কিংবা আদর্শিকভাবে মানি যে স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস দমনের ও উৎপাটনের গণতন্ত্রই একমাত্র উপায়। আমরা জানি ও মানি যে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে যা কিছু বিবেচিত তার প্রত্যেকটির জন্যে রয়েছে মন্ত্রণালয়। রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য এভাবে রয়েছে স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত এবং হচ্ছেও পালিত। মানতেই হবে এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য আসমানি নয়, ঐহিক, ইহজাগতিক, মাটিলগ্ন জীবিত মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, স্বাস্থ্যিক, প্রাশাসনিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পৃক্ত।

রাষ্ট্রান্তর্গত মর্ত্যের জীবিত মানুষের জীবনযাত্রার জীবিকাগত, স্বাস্থ্যগত, নিবাসগত, শিক্ষাগত চাহিদা মেটানো, জীবন-জীবিকায়, অন্নে-আনন্দে অঙ্গে-অন্তরে সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য-আরামের উন্নয়ন-উৎকর্ষ-বিকাশ-বিস্তার ঘটানোর, এক কথায় তাদের আত্মরক্ষণের, আত্মবিকাশের, আত্মবিস্তারের ও ভোগ-উপভোগের সুযোগ-সুবিধে করে দেয়া, বজায় রাখা, এবং ক্রমোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করাই হচ্ছে রাষ্ট্রের তথা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সরকার এ যুগে একটা সমবায় সমিতির কার্যনির্বাহ পর্ষদের মতোই। বেশিও নয় কমও নয়, সরকার হচ্ছে of the people, by the people and for the people. কিন্তু নাস্তিক, কম্যুনিস্ট কিংবা সেক্যুলার আদর্শে গঠিত না হলে সরকার হবে অধিজন হিন্দুর, মুসলিমের, বৌদ্ধের কিংবা খ্রীস্টানের, কেবল অবিশেষিত মানুষের হবে না। মুসলিমভীরু বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দল সত্য উচ্চারণে সাহসী নয়, ন্যাপ ও সিপিবি মুসলিমতোষণ নীতি গ্রহণ করে বলেছে : ধর্মভাবে ও সমাজতন্ত্রে বিরোধ নেই, আমরাও ধর্ম মানি। আওয়ামী লীগের সেক্যুলারিজমে রয়েছে গোঁজামিল—সমাজতন্ত্রে দলীয় গণতন্ত্র, রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, ধর্মনিরপেক্ষতা থাকেই—একে চারনীতি বানিয়ে লোককে বিভ্রান্ত করা হয়েছে মাত্র। এবং এ 'সেক্যুলারিজম' ভারতের মতোই গোঁজামিলজাত। তাই এতে কাজ এখানেও হয়নি, ভারতে তো হয়ইনি। আওয়ামী লীগ এখন বাঙালী জাতীয়তার কথাই বলে। সমাজতন্ত্র বা সেক্যুলারিজমের কথা বলেই না।

আমাদের দেশে স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস-দুঃশাসন নিরোধের জন্যে এবং জাত-ধর্ম-বর্ণ-নিরপেক্ষ দৈশিক জাতীয়তাবোধ জাগানো ও অকৃত্রিম আস্থায় ও নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করে স্থায়ী ও স্বীকৃতি দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতি ও জাতীয়তাবোধ গড়ার লক্ষ্যে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক ও জরুরী। কেননা ধর্মে বা গোত্রে উনজনেরা তাদের প্রতি অধিজনের তাচ্ছিল্য-অবজ্ঞা-ঔদাসীন্যজাত যে মানসিক পীড়ন, অবমাননা অহরহ পায়, তা থেকে তাদের মুক্ত রাখার উপায় হচ্ছে তিনটে: নাস্তিক্যের, কম্যুনিজমের এবং নিদেনপক্ষে সেক্যুলারিজমের প্রতিষ্ঠা। অধিকাংশ মানুষ কখনো নাস্তিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে না, কম্যুনিজমও বিপ্লবসাপেক্ষে যা অদূর ভবিষ্যতে ঘটছে না, বাকি রইল মন্দের ভালো সরকারের সেক্যুলার শাসন-প্রশাসন নীতি বা রাষ্ট্রাদর্শ। নাস্তিক্যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হত, কম্যুনিজমে আর্থ-সামাজিক-সাম্প্রদায়িক সমস্যা ঘুচত, সেক্যুলারিজমে সুবিচার ভিত্তিক দৈশিক জাতীয়তা পাকাপোক্ত হবে।

তাই আমি প্রস্তাব করছি যে, মাটি ও মানুষপ্রেমী এবং দেশের কল্যাণকামী রাজনীতিক ও রাজনীতিসচেতন তরুণ-প্রবীণ নারী-পুরুষ মিলে সেক্যুলার দল নামে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি দল গঠন করুন। সাম্প্রদায়িক দলগুলোর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে আস্থা হারিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে উনজনেরা 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এখন সেক্যুলারপন্থী মুসলিমরা ওঁদের অভয় দিয়ে সেক্যুলার দলে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানাতে পারেন। এভাবেই ধর্মধ্বজী আকীর্ণ রাজনীতিক দলগুলোকে মানুষের কল্যাণে রাজনীতিকভাবে উৎখাত করা সম্ভব।

এ সেক্যুলার দল ব্যক্তির, পরিবারের ও বৃহত্তর অর্থে প্রতি নাগরিকের ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে এবং জীবিকার ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে বর্ণ-ধর্ম-ভাষা এবং আর্থিক-শৈক্ষিক শ্রেণী নিরপেক্ষ আর সর্বপ্রকার অবস্থা ও অবস্থান নিরপেক্ষ কেবল ব্যক্তিমানুষ হিসেবে দেখার মতো মন, রুচি ও যুক্তি-বুদ্ধি অর্জন করবে। ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা অনুভব-উপলব্ধি করবে। আর ব্যক্তি মানুষ যে ভালোও নয়, মন্দও নয়, কেবল কারো জন্যে ভালো, কারো জন্যে মন্দ, কারো প্রতি ভালো, কারো প্রতি মন্দ, কখনো ভালো আর কখনো মন্দ মাত্র। এ জন্যেই এ মানুষ কষিত কাঞ্চন। এমনি জানাবোঝার ফলেই সম ও সহস্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতার অঙ্গীকারে সমাজে ও রাষ্ট্রে নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে সহাবস্থান সহজতর হবে, এখন যা শাস্ত্রের, নৈতিকতার ও সরকারী শাস্তি-নিন্দা-পাপের ভয় দেখিয়েও সম্ভব হচ্ছে না। স্বসত্তার মর্যাদা ও স্বাধিকার সচেতন মানুষ জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা যোগে বাঁচবার ও চলবার চেষ্টা করে। ব্যক্তি মানুষকে মর্যাদাসচেতন ও যুক্তিবাদী হবার জন্যে প্রেরণা-প্রবর্তনা দিতেই হবে।

তাই ভোট পাওয়ার জন্যে মানুষকে জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-ভাষার মাপে নয়, কেবল 'মানুষ' হিসেবে মূল্য দেয়ার, তার ন্যায্য দাবি পূরণের ও অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করতে হবে।

বিরোধী দল হিসেবে সেক্যুলারিজমের মহিমা-মাহাত্ম্য এবং বাস্তবে কল্যাণ ও সুফল জানাতে, বোঝাতে ও দেখাতে হবে। উনজনদের ও মাটিলগ্ন ও স্বদেশপ্রেমী করার এ-ই পন্থা।

আর রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতায় গেলে সেক্যুলারিজম আক্ষরিকভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের অকৃত্রিম অঙ্গীকার করতে হবে। এ জন্যে কারো নাস্তিক হওয়ার প্রয়োজন নেই, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনানিষ্ঠ রুচি বা সৌজন্য সম্পন্ন উদার মানুষই দরকার।

এভাবে গড়ে উঠবে অকৃত্রিম দৈশিক জাতিচেতনা ও জাতীয়তাবোধ, এবং নির্বিশেষ মানবকল্যাণ নিহিত রয়েছে এখানেই। নাস্তিক্যের কেজোপ্রসার অসম্ভব, কম্যুনিজম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবসাপেক্ষ। তাই আপাতত নাস্তিক, কম্যুনিস্ট, শাস্ত্রে উদাসীন উদার আস্তিক, বুর্জোয়া-বিদ্বান ও রাজনীতিক নিয়ে গড়ে উঠুক একটা প্রতিবাদী প্রতিরোধমুখী যুক্তিবাদী এবং কেজো কর্মসূচী সম্বল একটি জনসংগঠন।

অতএব রাষ্ট্রের স্বার্থেই সাম্প্রদায়িক ও কেবল ক্ষমতা দখলের রাজনীতির উচ্ছেদ সাধনে মাটি-মানুষ প্রেমীরা সেক্যুলার তত্ত্বাবলম্বনে এগিয়ে আসুন।

কম্যুনিস্ট বিশ্বের হুজুগে দ্রোহ, বিপর্যয় ও মার্কসবাদ

কোন বিষয়ের বা ঘটনার অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে কোন পষ্ট ধারণা, দৃঢ়মত, মন্তব্য প্রকাশ করতে হলে, কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে বিষয়ের ক্রমানুসরণ, ঘটনার ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরী। কিন্তু আমরা তেমন কোন তথ্যসূত্র রাশিয়ার বা ওয়ার্সচুক্তিভুক্ত পূর্বয়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করতে পারিনি। কাজেই আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথ্যের অসম্পূর্ণতাজাত তত্ত্বের ও অনুমানের ভেজালে ত্রুটিমুক্ত না হওয়ারই কথা। সবকথা জানা-বোঝা না থাকলেও নিজের ও সমাজের প্রয়োজনে একটা মত গড়ে তুলতে ও পোষণ করতে হয় এবং কখনো গরজে পড়ে মন্তব্য পরিব্যক্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

কম্যুনিস্ট জগতের ব্যক্তির ও সমাজের প্রকৃত মন-মনন এবং জীবনযাত্রার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা দুঃসাধ্য ছিল বাইরের লোকের পক্ষে। য়ুরোপ-আমেরিকা হয়ে যেসব খবর আসত, তাতে কতটুকু তথ্য আর কতটুকুই বা চমক, তা নিরূপণ করা ছিল সাধারণের সাধ্যাতীত। যাঁরা বামপন্থী তাঁরা ওই সব খবরে কান দিতেন না, যাঁরা পুঁজিবাদী-মৌলবাদী তাঁরা সানন্দে উপভোগ করতেন সে-সব সংবাদ। এ করেই দিন, মাস, বছর কাটছিল বিগত সত্তর বছর ধরে। আকস্মিকভাবে কালান্তক খবর পাওয়া গেল ১৯৮৮ সনে, যখন ওয়ার্সচুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবক তথা পালক ও পোষক রাশিয়া ন্যাটোজোটের পালক-পোষক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্বার্থে দুই শিবিরের রাষ্ট্রগুলোর স্থিতি-স্বস্তি-প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বিবেচনা না করেই অস্ত্রহ্রাসের ও বর্জনের নীতির অঙ্গীকারে চুক্তিবদ্ধ হল। এর পরিণাম পরে আলোচিত হবে।

তার আগের কথাগুলো আগে বলি। আমরা জানি ১৯১৭ সনে পরাজিত পর্যুদস্ত রাশিয়ায় সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতিষ্ঠা নির্বিবাদ ও নির্বিঘ্ন ছিল না। নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে, শোনা যায়, অন্তত দু'লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। এর মধ্যে জার সাম্রাজ্যভুক্ত পুরোনো তুর্কী-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গোত্রীয় দেশগুলো রাখার প্রয়াসে প্রায় ১৯২৮ সন অবধি মধ্য এশিয়ায় সন্ধি-বিগ্রহ চলতে থাকে। ১৯২৪ সনে নায়ক লেনিনের মৃত্যুতে কঠিন ও দৃঢ়চিত্তের, ধীরবুদ্ধির ও স্থির সঙ্কল্পের স্ট্যালিন পেলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকার। তাঁকে সর্বসম্পদ পণ করে সর্বপ্রকার ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে খাদ্যসঙ্কট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবলিত হয়েও এক রক্তক্ষরা-প্রাণহরা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল উপায়ন্তর ছিল না বলেই। যুদ্ধান্তে ভাগ-বাঁটোয়ারায় পেয়ে গেলেন বা বখরা হিসেবে নিয়ে নিলেন কয়েকটি দেশ এবং দেশের খণ্ডাংশ। দুনিয়াজুড়ে গড়ে উঠল এক কম্যুনিস্ট-সাম্রাজ্য, যার দায়িত্বে ও অভিভাবকত্বে রইল রাশিয়া। এদের অর্থে-সম্পদে পালনের ও রক্ষার জন্যে অস্ত্রসজ্জিত সেনা পোষণ, বাণিজ্য-বাজারের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি নানা দায়িত্ব-কর্তব্যও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়েছে রাশিয়াকে এবং নৈতিক প্রেরণায় বা বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যিক স্বার্থে পৃথিবীর নানা আঞ্চলিক যুদ্ধেও যোগাতে হয়েছে অর্থ, অস্ত্র, শক্তি ও সাহস। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পরেই শুরু হল বিত্তবান জিগীষু যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয়ের অভিযান। অর্থে-সম্পদে দীন হয়েও রাশিয়া দাঁড়াল আকাশজয়ে গ্রহবিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগী হয়ে। এসব আপাতদৃষ্টিতে গরীবের ঘোড়া রোগ বলে প্রতীয়মান হলেও বিরূপ পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায়, নির্বান্ধব রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্যে আবশ্যিক ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নানা ক্ষয়-ক্ষতির, সর্বস্ব হারানোর ঝুঁকি নিয়েও দ্বন্দ্বে-সংঘাতে-মামলায় জড়িয়ে পড়তেই হয় আত্মমর্যাদা বা সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনে, রাশিয়ার অবস্থাটাও ছিল তেমনি। একে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' বলে নিন্দা করার আগে তার অবস্থা ও অবস্থানটাও বিবেচনা করা আবশ্যিক।

WWW.AMARBOI.COM

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে যেমন আমরা ঘরের কথা বাইরে বলি না, বাইরের লোকের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করি, পরিবারের সম্মান রাখার ও নিন্দা এড়ানোর জন্যে, তেমনি রাশিয়াও তার ঘরের কথা কাউকে জানতে দেয়নি। কিন্তু আমরাতো দেখছি, বিগত সত্তর বছরের মধ্যে সামান্য সামান্য খণ্ড সময় পরিসরের শান্তি-স্বস্তি ব্যতীত প্রায় সব সময়েই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে অর্থ-সম্পদ-জনশক্তি ব্যয়ে যুদ্ধ করতে, অস্ত্র যোগাতে, খাদ্যের চাহিদা মেটাতে, মঙ্গোলিয়া-কিউবা থেকে পূর্ব য়ুরোপীয় দেশগুলোকে সর্বপ্রকারে পালন-পোষণ করতে নিরুপায় মস্কো সরকারকে স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর থাকতেই হয়েছে। এভাবে গত সত্তর বছর ধরে বঞ্চিত রাখতে ও থাকতে হয়েছে রাশিয়ার অধিবাসীদের। এ সত্তর বছর ধরে কৃচ্ছ্রতা তাদের বুকে-ঘাড়ে-মাথায় জগদ্দলের মতো চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোন দেশেই সাধারণ মানুষের চেতনায় রাষ্ট্রের স্বার্থের গুরুত্ব ঠাঁই পায় না। সরকার দায়ে পড়েই যে জনগণকে তাদের প্রাপ্য নিম্নতম সুখ-স্বস্তি-আরাম-আনন্দ থেকে আর্থিক ও মানসিকভাবে বঞ্চিত রেখেছে, তা তারা অনুভব-উপলব্ধি করেনি। তারা তাদের ভয়-ত্রাসের, হুকুম-হুমকির, কারাবদ্ধ বিড়ম্বিত জীবনের বোবাকান্নায় প্রজন্মক্রমে গুমরে মরেছে। মানুষ যন্ত্র নয়, একঘেয়ে জীবনে সে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট হয়ে, ধৈর্য হারায়। সে মাঝে মধ্যে অবসর চায়, চায় আর্থিক সঙ্গতি এবং মানসিক ছুটির বা মুক্তির আনন্দ। তার এই material and mental relaxation-এর আবশ্যিকতা ক্রুশ্চেভ বুঝেছিলেন। তিনি কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির ও দূরদৃষ্টির অভাবে অন্যরা তা অনুধাবন করতে পারেনি। তাই ভেতরে তা' অনুসৃত হয়নি। আর বাইরের কম্যুনিস্ট সমাজে তা 'সংশোধনবাদ' বলে নিন্দিত হয়েছে।

কয়েক বছর আগেই (১৯৮৬-৮৭) যান্ত্রিক জীবনে Relaxation-Relief-এর আর্থিক মানসিক ব্যবস্থা করেছিলেন চীনের নায়ক ডেঙ-শিয়াও-পিঙ। তিনি মহৎ উদ্দেশ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করলেও প্রয়োগে করেছিলেন মারাত্মক ভুল। তিনি মিত্রের ছদ্মবেশী চিরশত্রু যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি, প্রযুক্তি, প্রকৌশলী ও পরামর্শ নির্ভর হলেন, ওরা ঘরে প্রবেশ করেই ইঁদুরের মতো ঘরের বেড়া কাটা নয়—খুঁটি ভাঙা শুরু করে দিল। এখানে তা প্রাসঙ্গিক নয় বলে আলোচ্যও নয়। তবে ছাত্রদ্রোহ মার্কিন-ষড়যন্ত্রের ও প্ররোচনারই যে ফল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই আমাদের। গর্বাচেভ আদল পেয়েছিলেন চীন থেকেই।

নায়কতন্ত্রে ক্ষমতায় স্থিত থাকার এবং প্রশাসনে সাফল্যের ভিত্তিই হচ্ছে বিশ্বস্ত ও অনুগত জন খুঁজে বের করার ও দলভুক্ত করার যোগ্যতা। সেজন্যে নায়করা এবং 'ক্যু' করে ক্ষমতায় আসা সেনানী শাসকরা অনুরাগী-অনুগত আস্থাভাজনদের দোষত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখেন এবং তাদের সভয় প্রশ্রয়-আশ্রয় দিয়ে হাতে রাখেন আর নিশ্চিন্তে রাজত্ব করেন। এ অবস্থায় শাসন-প্রশাসনের স্তম্ভরূপ আমলারা দুর্নীতিদুষ্ট হয়। রাশিয়ায় এবং অন্যত্র তা-ই হয়েছিল পালন-পোষণ-শাসনের কর্তা ব্যক্তিরা।

পরিণাম দেখে মনে হচ্ছে, গর্বাচেভের উচিত ছিল ধীরে সন্তর্পণে বন্দিত্বের বাঁধন খোলা, —বাঁধন শিথিল করে করেই মুক্তির আশ্বাস দেয়া। যেমন, ঘোষণা করতে পারতেন, এখন থেকে ব্যক্তির দুঃখ-বেদনা-অভাব-নির্যাতনের কথা লেখা বা চিঠির আকারে পত্রিকার মাধ্যমে বা অফিসে নিবেদন করা যাবে। এখন থেকে পারিশ্রমিক বাড়ানোর চেষ্টা করবে সরকার বিভিন্ন উপায়ে। এসব না করে একটা আকস্মিক বিস্ময় ও উল্লাস জাগানো লক্ষ্যে উচ্চ কণ্ঠে অকস্মাৎ ঘোষণা করলেন 'গ্লাসনস্ত' ও পেরেস্ত্রৈকা। আশা করেছিলেন, অকারণে হঠাৎ কারামুক্ত কয়েদীদের মতো আনন্দে-উল্লাসে অভিভূত কৃতজ্ঞ দেশবাসীর সরকারের প্রতি আনুগত্য ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যাশিত ফল মিলল না রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডেও, সেখানেও একনায়কত্বের অবসানের, গণতন্ত্রের এবং জীবনে আশু সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবি উঠল, পেরেস্ত্রৈকার আশু ফল পাওয়ার জন্যে জনগণ অস্থির-অধৈর্য হয়ে উঠল। কৃতজ্ঞতা বোঝা গেল না, কিন্তু ঔদ্ধত্য বাড়ল।

অন্যসব রিপাবলিকে কথা বলার অধিকার পেয়েই ফেরুপালের মতোই চিৎকার করে একটি দাবিই উচ্চারণ করল, তা হল 'স্বাধীনতা চাই।' বোঝা গেল এদের কম্যুনিজমে তথা সমাজবাদে কখনো দীক্ষা দেয়া হয়নি, উপনিবেশ-শাসকদের মতোই কেবল অস্ত্রবলে ভয়-ত্রাসের শাসন চালিয়েছে। সমাজবাদের সাম্যতত্ত্বের প্রভাবে-প্রচারে দেশ-জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-গোত্র চেতনা বিলোপ করে নির্বিশেষে মানুষ ও মনুষ্যসমাজ বোধ—নিদেনপক্ষে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধও জাগানো যায়নি যুক্তরাষ্ট্রের মতো। জানা গেল, দীক্ষা দেয়া-নেয়া হয়নি। ১৯৮৮ সনের পরে এ ফাঁকির ফাঁক প্রকট হল, বাস্তব কারণ হয়ে তা এক রাষ্ট্রিক-মানবিক ট্র্যাজেডী ঘটাচ্ছে। আর ভাগে-বিজয়ে পাওয়া ও হুকুম-হুমকি যোগে সমাজতন্ত্র চালু করা রাষ্ট্রগুলোর হাঙ্গেরীতে ১৯৫৬ সনে, চেকোস্লোভাকিয়ায় ১৯৬৮ সনে দ্রোহ দেখা দিয়েছিল—যা অস্ত্রবলে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। পোলান্ডে যুক্তরাষ্ট্র প্রয়াস চালাচ্ছিল অর্থসাহায্যের নামে বহু বছর ধরে। সে-ভাঙার প্রয়াস সফল হল পোলান্ডেই। তারই প্রভাবে ভাঙার ও দ্রোহের প্ররোচনা পেল পূর্ব জার্মানী থেকে পূর্বয়ুরোপের সব রাষ্ট্রগুলো। সে-হুজুগেরই তরঙ্গাভিঘাত লেগেছে মঙ্গোলিয়ায়, আলবানিয়ায়, কিউবায় এবং অন্য সর্বত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে হুজুগ বলছি এ জন্যে যে এরা কেবল পরিবর্তন চেয়েছে—চাইছে অস্থির-অধৈর্য হয়ে। সে-পরিবর্তন কিন্তু কেমন, তার লক্ষ্য ও পরিণতি কি, তা কোন্ কল্যাণ বয়ে আনবে সে-জিজ্ঞাসা এ মুহূর্তে তাদের মনে নেই, তারা এখন কেবল দ্রোহে, ভাঙার গানে, ভাঙতে পারাতেই তুষ্ট এবং তৃপ্ত। এখন দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ যান্ত্রিক আবর্তনে ছেদ সৃষ্টির সাফল্যে আনন্দিত ও গর্বিত এবং নির্লক্ষ্য। দূর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার চেলা ন্যাটোজোট বলছে—ভাঙ-ভাঙ, কোন ভয় নেই, অর্থ-সম্পদ যা-ই লাগে আমরা দেব। আমরা তো রয়েছি মানব মুক্তির দিশারী ও সহায় হয়েই। আমরা চিরকাল মুমূর্ষুর পক্ষেই থাকি। পুঁজিবাদী দেশগুলো কম্যুনিজম, কম্যুনিস্ট ও সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলোকে জেনেছে 'জানি-দুশমন' রূপে। এরাই রাশিয়াকে বলেছে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম।' মুখ্য আপত্তি কি? সেখানে মানুষের বাক্ স্বাধীনতা নেই, অধিকার নেই স্বাধীন চিন্তার ও নতুন চিন্তা প্রকাশের। যেন দুনিয়ার অন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এসব মানুষের অবাধ অধিকারভুক্ত। শাস্ত্রের, সমাজের, রাষ্ট্রের, প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কারের, আচার-আচরণের বিরুদ্ধে কেউ কোন যুক্তিসঙ্গত কথা উচ্চারণ করলে দুনিয়ার সর্বত্র অতীতে ও বর্তমানে প্রতিবাদে প্রতিরোধে শাস্ত্রী-সমাজসর্দার-সরকার এবং জনগণ এগিয়ে আসেই। ওই নতুন চিন্তা-চেতনা-সত্য বা তথ্য প্রকাশককে লাঞ্ছনায়, দৈহিক নির্যাতনে, নির্বাসনে কিংবা হত্যায় চরম শাস্তি দেয়াও হয়েছে, হয় এবং ভবিষ্যতেও বহু বহু কাল দেয়া হবে। কাজেই কম্যুনিস্ট দেশের অপবাদ দেয়া স্থূলবুদ্ধিলোকের জন্যে মতলববাজদের অপপ্রচার মাত্র।

গোটা পৃথিবীর সাক্ষর-নিরক্ষর, বিদ্বান-মূর্খ নারী-পুরুষের যা জানা-বোঝা ও মানা বাঞ্ছিত ছিল, উচিত ছিল তা' তারা সব সময়ে এড়িয়ে যায়—না জানার, না বোঝার ভান করে। মার্কসবাদই দুনিয়াতে এই প্রথম মানব-মহিমা বুঝে মানবমুক্তির পথ জানিয়েছে। বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে বলবান কিছু মানুষ বাহুবলে ক্ষীণ এবং বুদ্ধিতে হীন মানুষকে দাস, ভূমিদাসরূপে সর্ব অর্থেই গৃহ-পোষ্য প্রাণী করে রেখেছিল হাজার হাজার বছর ধরে। কত নবী-অবতার-সন্ত-শ্রমণ কত কত মহৎ বাণী শুনিয়েছেন যুগে যুগে দেশে দেশে। কিন্তু নরাকৃতির এ দীন-দুর্বল প্রাণীগুলো কখনো মনুষ্য মর্যাদায় মালিক-প্রভু সমাজে ঠাঁই পায়নি। মার্কসবাদীরাই প্রথম মানবিক চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে মানুষ নির্বিশেষের সত্তার সাম্য, মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করে। এবং দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা এবং আঁধা-কানা-খোঁড়া-বোবা আর নারী-পুরুষ অবিশেষে মানুষ মাত্রেরই স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করেই, কারো কৃপা-করুণায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে নয়, জন্মগত দাবিতেই মানুষ হিসেবে মৌল মানবিক অধিকারের স্বীকৃতিতে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার অঙ্গীকার ও আশ্বাস পেল মার্কসবাদে। নীতি-নিয়ম কিছু কড়া হলেও এই প্রথম দেহে-মনে দাসত্বমুক্ত কিন্তু সমস্বার্থেই যৌথজীবনে সামাজিক-প্রাশাসনিক তথা রাষ্ট্রিক নিয়মানুগত্যে বাধ্য বা নিষ্ঠ নাগরিক পেলাম ও দেখলাম আমরা কম্যুনিস্ট শাসিত রাষ্ট্রে।

এমন জন্মমুহূর্ত থেকে প্রতিটি মানুষের স্বাধিকারের স্বীকৃতিরূপে তার সারা জীবনের অশন-বসন-নিবাস-নিদান ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের নিশ্চিত ব্যবস্থা আর কবে কারা কোথায় রেখেছিল—বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য সমাজে? এ পরম ও চরম মানব-স্বীকৃতি কার্ল মার্কসের পূর্বে এমন বাস্তব ও প্রায়োগিকভাবে কে কবে কোথায় ভেবেছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অঞ্চলে কথায় বলে 'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়'। কম্যুনিস্ট বিশ্বের হুজুগে জনগণেরও হয়েছে সে-খেয়াল, সে-অবস্থা। না হলে সেসব রাষ্ট্রের শিক্ষিত-সচেতন বিদ্বান-বুদ্ধিমান-মননশীল যুক্তিপ্রবণ লোকেরা কি দেখে না, জানে না, বোঝে না যে অতীতের কথা বাদ দিলেও আজো তৃতীয় বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে ভোগে, আজো দুই-তৃতীয়াংশ লোক নিম্নতম মানবিক স্তরে বা মানবেতর অমানবিক জীবন যাপন করে? তারা কি জানে না, শিশু থেকে প্রৌঢ় অবধি দরিদ্র মানুষেরা পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে এবং অনাহারে ও অর্ধাহারে, চিকিৎসার অভাবে অকালে অসময়ে অপমৃত্যুর শিকার হয়? আজো দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার তথা তৃতীয় বিশ্বের অন্তত তেয়াত্তর খানা রাষ্ট্রের সাংবাৎসরিক সমস্যা? আজো ঝড়-খরা-বন্যায় মানুষ কীট-পতঙ্গের মতো, হাঁস-মুরগী-গরু-ভেড়া-ছাগলের মতো অসহায়ভাবে করুণ অপমৃত্যু কবলিত হয়?

কোন্ বুদ্ধিতে, কোন্ যুক্তিতে, কোন্ শ্রেয়োবোধে, কোন্ সর্বনাশ ঠেকানোর-এড়ানোর জন্যে তারা আজ 'কম্যুনিজম' নামটা পর্যন্ত শুনতে নারাজ? পুঁজিবাদী সচ্ছল ও কৃষি-শিল্প-সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলোতো ওয়েলফেয়ার বা কল্যাণ রাষ্ট্র হল কম্যুনিজম ঠেকানোর জন্যেই। কিন্তু বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে ঋণ-দান-ত্রাণসামগ্রী দিয়েও কি কাজের বিনিময়ে খাদ্য বা খাদ্যের বিনিময়ে কাজ দেবার এবং বেকার সমস্যা ঠেকানো সম্ভব হবে কখনো? দরিদ্র দেশে গণতন্ত্র কি মানুষের অন্ন-বস্ত্র-নিবাস ও শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে কিংবা পারবে 'যোগ্যতমের উর্ধ্বতন' নীতি স্বীকার করে? এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী সমাজে অসম্ভব-অসাধ্য জেনে-মেনেই তো সমাজবাদ-সাম্যবাদ কাম্য হয়েছিল। রক্তঝরা-প্রাণহরা সংগ্রামে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চীনে-রাশিয়ায়।

AMARBOI.COM

পূর্বয়ুরোপের ও রাশিয়ার রিপাবলিক দেশগুলোর লোকেরা হুজুগতাড়িত দ্রোহে মাতাল হলেও ইতোমধ্যেই তাদের কর্তা-ব্যক্তিদের টনক নড়েছে, নড়ছে। পোলান্ড যুক্তরাষ্ট্রে অর্থসাহায্যের জন্যে মিনতি জানিয়ে এসেছে, পূর্বজার্মানী ষাট লক্ষ বেকারের ভয়ে শঙ্কিত চিন্তিত। পূর্ব য়ুরোপের সব দেশই এখন মার্কিন অর্থসাহায্যের আশ্বাসে প্রতীক্ষারত। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আইএমএফ প্রভৃতি কোন অর্থ প্রতিষ্ঠানই ওদের প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থ কখনো যোগাতে পারবে না, ন্যাটোজোটেরও তেমন অর্থসম্পদ নেই, তারাও বাঁচার তাগিদেই পুঁজি-পণ্য-বাজার-বাণিজ্য সাম্য প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে সমবায়ী হচ্ছে। এমনকি একক মুদ্রায় নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রস্তাবও উঠেছে।

রুমানিয়ায় নগ্ন ন্যাটো-মার্কিন ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার এবং গুণ্ডা-মুৎসুদ্দী নিয়োগে বিচারের নামে চচেস্কু-দম্পতি হত্যাও আমরা দেখলাম। আসলে স্বয়ং গর্বাচেভই মার্কিন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। মার্কিন-পাতা ফাঁদে নির্বোধের মতো জড়িয়ে পড়েছিলেন। ধূর্ত র‍্যগানের মতলব না বুঝে সরল মনে তিনি ওয়ার্সচুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবকত্ব তাদের না জানিয়েই ছাড়লেন। তাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্বও ত্যাগ করলেন, অস্ত্র বর্জনের ও সীমিতকরণের চুক্তিবদ্ধ হয়ে। সবকিছু তিনি করলেন ব্যয় হ্রাস করে স্বদেশের ক্রুদ্ধ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুব্ধ অস্থির অসহিষ্ণু জনগণকে আর্থিক সাচ্ছল্য দিয়ে তুষ্ট ও তৃপ্ত করার লক্ষ্যে। গর্বাচেভের এ আকস্মিক নীতি বদলের ফলে রাশিয়ার প্রতি ওয়ার্সভুক্ত পূর্ব য়ূরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর আস্থা ও ভরসা উবে গেল, জাগল তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ। ন্যাটোজোট-যুক্তরাষ্ট্র তাদের এ ক্রোধ-ক্ষোভ-ঘৃণা উসকিয়ে দিল বল-ভরসা-শক্তি-সাহস যুগিয়ে। দেখা গেল পঁয়তাল্লিশ বছরের অনভ্যস্ত জনগণ দ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে রাস্তায় নামল অকুতোভয়ে। তাদের সম্মুখে কিন্তু কোন নতুন ব্যবস্থার স্বপ্ন বা নকশা ছিল না। কেবল এ ব্যবস্থা চাইনে, এ ব্যবস্থা মানব না—এই ছিল শ্লোগান—'গণতন্ত্র' মানে তাদের কাছে শাসন শৈথিল্য ও ভয়মুক্তি। মুক্তি অনুভব-উপলব্ধি সাপেক্ষ, মুক্তি মুদ্রা বা অন্ন যোগায় না। তাঁরা কি পুরোনো নীতি নিয়মে, ধনতন্ত্রী হবে, না নতুনতর কোন নীতি-নিয়ম-পদ্ধতি চালু করবে! তা এখনো তাদের চিন্তা-চেতনার বিষয় নয়। এ মুহূর্তে তারা নির্লক্ষ্য। আমাদের ধারণায় মার্কসবাদের চেয়ে নতুনতর, উৎকৃষ্টতর, উন্নতর কোন তথ্য, তত্ত্ব, বিষয় ও পন্থা আজো আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হয়নি। যেদিন হবে, সেদিন মার্কসবাদ 'গুরুত্ব হারাবে', বাজার হারায় যেমন পুরোনো যন্ত্র উন্নত যন্ত্রের কাছে।

তাই আমাদের মনে হয় এ উত্তেজনা প্রশমনে ধীরবুদ্ধি ও স্থিরবিশ্বাসবশে কম্যুনিস্ট জগৎ আবার মত ও মন্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে দ্বিদলীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা সাপেক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুং বাদ কিংবা ঈষৎ পরিবর্তিত বিধি ব্যবস্থা অঙ্গীকার করে সমাজবাদ কায়েম করবে রাষ্ট্রে। ইতোমধ্যে ভাঙা-গড়ার, অনুধাবনে-অনুশোচনায় লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিচার-বিবেচনায় চার/পাঁচ/ছয় বছর লাগবে। এ অনুমান মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কা কম। কেননা মার্কসীয় পদ্ধতি এখনো উৎকর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ-ও উল্লেখ্য ও স্মরেণ্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বখরা হিসেবে পাওয়া রাষ্ট্রে কম্যুনিজমে দীক্ষা দান যেমন গুরুত্ব পায়নি, তেমনি নীতি-নিয়ম পদ্ধতির প্রয়োগও সর্বত্র সুষ্ঠু, সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি, বিরোধ, বৈপরীত্য, বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা থেকেই গেছিল, ১৯৫৩ থেকে পূর্বয়ুরোপীয় অনেক রাষ্ট্রেই কম্যুনিস্ট পদ্ধতির গোঁজামিলই ছিল বেশি। এসব ত্রুটিবিচ্যুতিই ঘটায় গণদ্রোহ।

নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় নির্বান্ধব রাশিয়া টিকে থাকার দায়েই মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী হয়েছিল। ক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি-ক্ষমতা-মর্যাদা পেয়ে বিশ্বনেতৃত্বে আসন সুদৃঢ় রাখার লোভে বা গরজে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্বপণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী হয়েই থাকতে হল। ফলে পুরো সত্তর বছর ধরে দেশের জনগণকে সর্বপ্রকারে অর্থ-সম্পদে ও সাধ-আহ্লাদে বঞ্চিত রাখতে হয়েছে। এ পরাশক্তি হওয়ার খেসারত অবশেষে দিতেই হল। রাশিয়া কিছুকালের মধ্যে কেবল মূল ভূখণ্ডে সীমিত থাকবে। গর্বাচেভের পুরো পাঁচ বছর টিকে থাকার সম্ভাবনা শতে চল্লিশের বেশি নয়। রাশিয়া ভাঙল। খুশি হল, জিতে গেল, নিশ্চিন্ত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভাঙার চালটা চেলেছিলেন র‍্যগান। এ মুহূর্তে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের লোকেরাও বেপরওয়া হুজুগে দ্রোহী হয়ে উঠেছে, ইউক্রেনও স্বাধীন হতে চায়। এখন গর্বাচেভের অবস্থা ও অবস্থান জাহাজে দ্রোহী কবলিত কলাম্বাসের মতোই। কাণ্ডারী ও দিশারী কলাম্বাসই ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি-লক্ষ্য-কৌশলের আধার ও নায়ক। মাঝপথে তাঁকে ছাড়া-মারা ছিল দ্রোহীদের পক্ষে আত্মহননের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামান্তর। তাই ক্ষোভ-ক্রোধ-নিন্দা-তিরস্কার পরিব্যক্ত করেও তাঁকেই রাখতে হয়েছিল নেতৃত্বে। অথবা আনাড়ি অপটু মোটর চালককে যেমন শঙ্কিত আরোহী দুর্ঘটনার শঙ্কা-সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মাঝপথে তাড়িয়ে দিতে পারে না, গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত বকাবকি করেও নিরুপায় হয়ে গাড়ী চালাতে দিতে হয়, এখন যেন গর্বাচেভের অবস্থা ও অবস্থান ওই কলাম্বাসের বা শোফারের মতোই। তাঁর প্রতি কারো আস্থা আছে বলে মনে হয় না, যে-কোন মুহূর্তে তাঁর কর্তৃত্বের অবসান ঘটতে পারে।

আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ কম্যুনিস্ট তত্ত্বে ও তথ্যে আগ্রহী নন। তাঁরা মার্কসবাদ কিংবা লেনিনবাদ কিংবা মাও-সে-তুঙ পরিব্যক্ত তত্ত্ব ও তথ্য উপলব্ধির চেষ্টা করেননি, যদিও এঁদের বাণী মোল্লা-পুরোতের মতোই সর্বক্ষণ উদ্ধৃত করেন কথায় ও লেখায়। মার্কসীয় তত্ত্বের এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্যের নির্যাস হল, রাষ্ট্রান্তর্গত জীবিত মানুষ মাত্রেরই পালন-পোষণের অবিকল্প দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের বা সরকারের। এ দায়িত্ব আক্ষরিকভাবে পালনের ব্যবস্থাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সরকারের মুখ্য, অপরিহার্য ও আবশ্যিক লক্ষ্য বা আদর্শ। এ চেতনা মনের মধ্যে থাকলে কেউ গুরুবাদী হয় না। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে দেখলাম ১৯৮৮ সনে গর্বাচেভের ভাব-চিন্তা-কর্ম দেখে কেউ হচ্ছিলেন স্টালিনপন্থী—তাঁর তসবির নিয়ে সভা-সেমিনার-মিছিলের আয়োজন করছিলেন, আর একদল গর্বাচেভের তারিফে হচ্ছিলেন মুখর। কিন্তু এঁরাই আবার গর্বাচেভের মত-পথ-তাল-বাহানার দিশা না পেয়ে হতাশায় বোবা হয়ে রইলেন। পূর্বয়ুরোপের হাল দেখে এখন সবাই আপাত বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত। এর মধ্যেই মার্কসবাদে প্রত্যয়ী কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে বলছেন, 'মার্কসবাদে ভুল নেই'। গণমুক্তির একমাত্র পথ মার্কসবাদের অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন। মার্কসবাদ ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে অযোগ্য ও অদক্ষ দায়িত্বে ও কর্তব্যে উদাসীন মার্কসবাদী কর্মকর্তারা, দুর্নীতিবাজ দুষ্ট-দুর্জন শাসক-প্রশাসকরা। এ ধারণা আমাদেরও। তবে মার্কস-উদ্দিষ্ট মূলতত্ত্ব গোড়া থেকেই অপব্যাখ্যাত, অপপ্রযুক্ত হয়ে অনেকখানি বিকৃত হয়েছিল। এর মানবিক-আনুভূতিক দিক হয়েছিল প্রায় অস্বীকৃত। আমরা জানি এবং মানি যে মানুষের মনন-চিন্তন মানুষের দেহের সম্মুখগতির মতোই এগিয়ে চলে নতুন নতুন অনুভব-উপলব্ধির এবং আবিষ্কারের উদ্ভাবনের দিকে। সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশ পেয়েছে এভাবেই। কোথাও কোথাও স্থানিক ও সাময়িকভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা-মন-মনন বন্ধ্যা থাকে, অবক্ষয়গ্রস্তও হয়, কিন্তু সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিকভাবে মানুষের প্রগতিশীলতা-অগ্রগামিতা কখনো থেমে থাকে না। তখন বন্ধ্যারাও, অবক্ষয়গ্রস্তরাও, অতীতাশ্রয়ী প্রতিক্রিয়াশীলেরাও অবশেষে মানব-অবদান গ্রহণে ঋদ্ধ হয়ে এগিয়ে যায়, অতীত ছেড়ে ভবিষ্যতে ভরসা রাখে, বরণ করে দেশ-কালের প্রয়োজনে বর্তমানের শ্রেয়সকে। তাই আমাদের দৃঢ় ধারণা—মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রসূন প্রতিটি মানুষকে ভাতে কাপড়ে বাঁচিয়ে রেখে জীবনকে নিজের মতো করে ভোগ-উপভোগের অধিকার দেয়ার যে দায়িত্ব মানববাদী মানুষ একবার অঙ্গীকার ও বাস্তবায়িত করেছে, তার থেকে মানুষ আর পিছু হটতে পারবে না। কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ, কোন না কোন রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী সমাজ বজায় রাখবে। আরো অনেক দরিদ্র-অনুন্নত দেশে সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, গড়ে উঠবে মানবাধিকার ও মানবমর্যাদার স্বীকৃতিধন্য বহু বহু রাষ্ট্র ভবিষ্যতে। কেননা মানবিক সমস্যার সমাধানের এ মুহূর্ত অবধি এ-ই একমাত্র উপায়। বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে গুণে, মানে, মাপে, মাত্রায় মানুষের অভাবিত-অসামান্য অধিকার বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে যে-সব সঙ্কট দেখা দেবে বলে কম্যুনিস্ট চিন্তক-মনীষীরা প্রায় নিঃসন্দেহে অনুমান করেছিলেন, সে-সব ঘটেনি বটে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যন্ত্রের ও প্রযুক্তির ক্রমোৎকর্ষ তা ঘটাবেই। সে আলামত যে দুর্লক্ষ্য, তাও নয়, ন্যাটোজোটে তার উন্মেষ আভাসিত হয়েছে। অতএব সমাজবাদ-সাম্যবাদ জিন্দাবাদ।

জীবন কি এবং কেন?

জীবন প্রভাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, 'এ জীবন লইয়া কি করি?' তিনি সারাজীবন এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। অর্থাৎ কি করে, কিভাবে জীবন যাপন করলে সুন্দর, সফল ও সার্থক হয়, তা-ই ভেবেছেন সারাটা জীবন। জগতের কোটি কোটি মানুষ জীবনের মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা অন্য প্রজাতির প্রাণীর মতোই নির্লক্ষ্য নিরুদ্দেশ জীবন যাপন করে। মানবদেহের ও মানব মনের-মননের শক্তি ও সম্ভাবনা যে অসামান্য ও অশেষ, তা তারা সারা জীবনে কখনো অনুভব-উপলব্ধি করে না। অন্য প্রাণীর মতোই সাধারণ মানুষও 'আহারে-নিদ্রায় ও মৈথুনে' জীবন কাটায়। (উল্লেখ্য যে বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার আগে পুরুষের অপত্যস্নেহ ছিল না) এমন কি পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনেও সব মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন নয়। নিষ্ঠ নয় কোন লক্ষ্যে উত্তরণে। সাধারণ মানুষ কেবল ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, কাম-ক্রোধই অনুভব করে—এবং এসব রিপু-তাড়িতই থাকে। সাধারণ মানুষ আশৈশব শোনাকথায় বিশ্বাস রাখে, আশৈশব দেখা আচার-আচরণ অনুকরণ করে। এ-ই তার জীবনের পুঁজি। কাজেই ভূতে-ভগবানে, প্রেতে-পিশাচে, জীনে-পরীতে, ঝাড়ে-ফুঁকে, তুকে-তাকে, বাণে-উচ্চাটনে, মন্ত্রে-মাদুলীতে, তাবিজে-কবচে, দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্রে এবং আসমান-জমিনে প্রসৃত দৃশ্য-অদৃশ্য অলীক-অলৌকিক সব কিছুতে তার আস্থা-ভয়-ভক্তি-ভরসা অবিচল। এ প্রতিবেশে এসব চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস-আস্থা তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। সে স্বনির্ভর নয় কোন অবস্থায় ও অবস্থানেই, সে অদৃশ্য শক্তির কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যের কিংবা রোষ-পীড়নের পাত্র। না বললেই চলে যে এমনি জীবনে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি অপ্রযোজ্য, অকেজো ও অপ্রয়োজনীয়। ফলে মানুষের ভাবে-চিন্তায়, কর্মে-আচরণে, বিশ্বাসে-সংস্কারে অসঙ্গতি সব সময়েই ঘটে। আর সে কখনো নিরপেক্ষ চেতনায় ও ন্যায়বোধে স্বস্থ ও সুস্থ থাকে না। সারা জীবনটাই তার অসঙ্গতির ও অসামঞ্জস্যের সমষ্টিমাত্র হয়ে যায়।

হিন্দুরা বলে, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে ঈশ্বরের হাতে, কিংবা জীবন-মৃত্যু-আহার্য-সম্পদ ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত, তা হলে স্বেচ্ছায় আত্মহনন কি সম্ভব? ঈশ্বরের অনিচ্ছায় অনভিপ্রায়ে কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি ঘটতে পারে? তা হলে সৎ-বদ, সু-কু'কর্মে-পাপ-পুণ্য কেন? হিন্দু-বৌদ্ধরা বলে, সৎ-বদ কর্মের ফলেই জন্মান্তরে মানুষ বারবার সুখ-দুঃখরূপ শাস্তি ও শান্তি ভোগ করে। কিন্তু ইহুদী-খ্রীস্টান প্রভৃতি জন্মান্তর মানে না, তা হলে অন্ধ-খঞ্জ-বোবা-বধির জন্মসূত্রে যন্ত্রণায় ভোগে কেন? অনেকেই জানে, নিয়তি বা অদৃষ্ট বা কর্মফল অমোঘ, তবু তদবীরে তকদীর বদলাতে চায় কেন? যদি রাখে ঈশ্বর মারে কে? তা হলে রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন কি? আরোগ্য বা মৃত্যুতো ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটবেই। যার যা কপালে আছে, তা বাস্তব হয়ে উঠবেই যদি, তা হলে মানুষের কর্মপ্রয়াসের প্রয়োজন কি? শুয়ে বসে থাকলেও তো তা ঘটার কথা। মানুষের ব্যক্তি জীবনে প্রাপ্য-অপ্রাপ্য, সুখ-দুঃখ, খ্যতি-ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠা যদি পূর্বনির্ধারিতই হয়, তা হলে ওই অমোঘ নিয়তি তো বিনা-প্রয়াসেই ফলবার কথা। আদিতে কিছুই ছিল না, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মও ছিলেন একা, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ হবার জন্যে কার সৃষ্ট সময় বা কাল ও স্থান পেলেন? ওই দুটো তার সৃষ্ট হলে তিনি স্থিতি পেলেন কোথায়? অনস্তিত্ব থেকে তাঁর প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় অস্তিত্ব দিয়ে কর্মফলের ভয়-ভরসায় সদা উদ্বিগ্ন রেখে এবং অভাবের, রোগের, না পাওয়ার, বিপদের-যন্ত্রণার মধ্যে আমাদের সদা ব্যস্ত ও অসুস্থ রাখার উদ্দেশ্য কি?

এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর মেলে না বলে, মানুষ বিশ্বাসপ্রবণ হয়েই, প্রশ্ন না করেই আনুগত্য অঙ্গীকার করেই ঈশ্বরকে খেয়ালী লীলাময় আখ্যাত করে আত্মপ্রবোধ ও স্বস্তি পায়। মানুষ তাদের বিশ্বাসের ও মুখে উচ্চারিত কথার এবং বুকের কামনা-বাসনার সার্বক্ষণিক এমনি অসঙ্গতি কখনো অনুভব-উপলব্ধি করেই না। তাই যখন যেমন তখন তেমনি বিশ্বাস, কর্ম ও আচরণ করে থাকে। কথায়-কাজে, বিশ্বাসে-প্রয়াসে, নীতিতে-নিয়মে তাই কোথাও তাদের কোন স্থির তাত্ত্বিক বা দার্শনিক প্রত্যয় নেই।

সে বিশ্বাস করে ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু তার সন্তানের মৃত্যু তার মঙ্গলের জন্যেই হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করতে বা মানতে পারে না। সে করুণাময় ঈশ্বর-সৃষ্ট কুৎসিত নারীর নিন্দা করে। পরের ঠোঁট কাটা মেয়ে বউ করে ঘরে তুলতে চায় না, কিন্তু নিজের কানা মেয়েকেও পাত্রস্থ করতে চায়। সে বলে, গাড়ী চাপা পড়ার থেকে ঈশ্বর তার সন্তানকে বাঁচিয়েছে। গাড়ী চাপা দিচ্ছিল ঈশ্বরের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি, সে-কথা সে উচ্চারণ করে না। গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে কেউ বেঁচে যায়, কেউ সত্যই চাপা পড়ে মরে। ঈশ্বর কাউকে বাঁচায়, কিন্তু কেউ তো মরে, তাকে মারে কে? তা হলে কল্যাণকর শক্তি এবং মন্দ শক্তি দুটোই সমান, কখনো মন্দ শক্তি, কখনো বা সৎ শক্তি জয়ী হয়। এ কেবল দুটো শক্তির হার-জিতের খেলা। গণক-নজুম-জ্যোতিষী বলে, গ্রহ-নক্ষত্র দিন-ক্ষণ-মানুষের জীবনের কর্ম-আচরণের শুভাশুভ নিয়ন্ত্রণ করে। তা হলে মানুষের জীবন-জীবিকার নিয়ন্তা কে? ঈশ্বর না রাশিচক্র? এ প্রশ্ন আস্তিক মানুষের মনে জাগে না। জ্যোতিষী-গণকেরা ঝড়-খরা-বন্যা-দুর্ভিক্ষের এবং রাষ্ট্রনায়কদের মৃত্যু বা পতন সংবাদও আগাম দিতে পারে। তা হলে তারা গোয়েন্দা বিভাগের মতো ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও কর্মসূচিও জেনে নিতে জানে। ঈশ্বরও তা হলে স্ব-অভিপ্রায়ের ও কর্মের গোপনীয়তা রক্ষায় অক্ষম। ঈশ্বরকে ন্যায়বান জেনেও খুনী স্তুতি-তোয়াজে ঈশ্বরকে বশ করে শাস্তি এড়ানোর প্রয়াসী। বাস্তব জীবনে ঈশ্বর অকারণে কিছু ঘটান না দেখে-বুঝেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলৌকিকতায়, মন্ত্রমাদুলীতে, ঝাড়ফুঁকে আস্থা রাখে। একজন নিরক্ষর বা একটি স্কুলছাত্র মন্ত্রমাদুলীর, ঝাড়ফুঁকের, দেবতার ও দরবেশের শক্তিবলে ডাক্তারী পরীক্ষায় বসলে পাশ করবে? তা হলে মেডিক্যালের ছাত্রই বা না পড়ে, কম পড়ে ঈশ্বরের কৃপায় পাশ করবে কি করে না-পড়া না-জানা প্রশ্নের উত্তর লিখে?

মানুষ যেখানে কার্যের, করণের, ঘটনায়, পরিণামের কারণ খুঁজে পায় না, সেখানেই অলীক-অলৌকিকের কৃপায়-কৃতিতে আস্থা রাখে। পৌষ মাসে বৃষ্টি হলেও বন্যা হবে না কখনো। কাজেই মসুমে সাময়িক খরা দেখা দিলে ঈশ্বরের কাছে বিশেষ প্রার্থনায় বৃষ্টি নামানো কোন আসমানী কৃপার দান বলে মানা যাবে না। কারণ অকালে কিছু ঘটে না, প্রত্যাশিত রোদ-বৃষ্টিতে আকস্মিক অবাঞ্ছিত সাময়িক বিপর্যয়কে ঈশ্বরের রোষ ভাবার মূলে কোন সত্য বা তথ্য নেই। প্রত্যেক কিছুর মূলে থাকে স্থানের ও কালের নিয়ম। প্রকৃতিও নয়, আসমানী শক্তিও নয়, বরং মানুষই তার বিজ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় নানা প্রাকৃত উপাদান-উপকরণের মিশ্রণে-সংযোজনে অকালে-অস্থানে নানা রসের ও আকারের ফল-মূল তৈরী করতে পারে এবং করে।

শিক্ষিত শহুরে মানুষের মধ্যে যারা প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কেবল প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে পরীক্ষাপাশ লক্ষ্যে গ্রহণ করে, পাঠ্যবিষয়গুলো তারা বিচ্ছিন্নভাবে কেবল খণ্ড খণ্ড রূপে শেখে ও জানে, বিষয়ের সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক ধারণা যেমন তারা পায় না, তেমনি বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবার বোঝার আগ্রহও তাদের মধ্যে জাগে না। অর্থাৎ এভাবে পাঠ্য বিষয়টি কখনো শিক্ষার্থীর আত্মস্থ হয় না—প্রশ্নোত্তর রূপে খণ্ডাংশ কণ্ঠস্থ হয় মাত্র। যেমন গণিতভীরু শিক্ষার্থীর জীবনে জ্যামিতি-বীজগণিত শেখা-জানা হলেও অবোধ্য ও অপ্রযোজ্য থেকে যায়। এ বিদ্যা থাকা না থাকা সমান। এ শ্রেণীর লেখাপড়া জানা তথা উচ্চশিক্ষিত বলে পরিচিত ব্যক্তিও আসলে অজ্ঞই থেকে যায়। নিরক্ষর আর এমনি শিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণই তার প্রমাণ। উভয় শ্রেণীর লোকই আসমানী ভয়-ভরসা নির্ভর, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগবিমুখ। এ কারণেই সভ্যতা-সংস্কৃতির ও মানসোৎকর্ষের ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক জীবনে সামষ্টিক, সামগ্রিক ও সামূহিক বিকাশ ও অগ্রগতি এত মন্থর ও ক্ষীণ যে তা অনুপুঙ্খ বিচার ব্যতীত অনুভূত ও দৃশ্যমান হয় না। জীবনে সচেতন অনুভূতি ও উপলব্ধি ছাড়া মনোজগতের বিকাশ-বিস্তার ঘটে না। ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ বা সংযমও তাই সম্ভব হয় না। মানবিক গুণের অনুশীলনও হয় না সম্ভব। জীবনে আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করার আর মানার প্রয়োজন বুদ্ধিও জাগে না সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাই ব্যক্তিমনে সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধও জাগে না সহজে। সমাজে মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ তাই দুর্লভ। শিক্ষিত মানুষ যতদিন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি যোগে জীবনকে ও জগৎকে জানবার-বুঝবার চেষ্টা না করবে, অধীত অধিগত বিদ্যা অনুভব-উপলব্ধি যোগে সতাৎপর্য আত্মস্থ হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ মননের বিকাশ না ঘটাবে—যুক্তিবাদী করবে, দেহ-প্রাণ-মন-মনন যে অসামান্য অশেষ পুঁজি, এ মানব জমিন আবাদে যে সোনার ফসল ফলে, অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি না করবে, ততদিন মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি-সুরুচি-সৌজন্য বাঞ্ছিত রূপ লাভ করবে না। প্রবল মানুষের হাতে সামাজিক মানুষের পীড়ন-লাঞ্ছনা-বঞ্চনাও ঘুচবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের অনুশীলনে অশেষ সুপ্তশক্তির বিকাশ-প্রকাশ ঘটে, তা অলিম্পিক খেলায় দেখা যায়, প্রাণ-মন-মননের অনুশীলনে যে মানুষ বিজ্ঞানে, প্রযুক্তি-প্রকৌশলে আকাশের সীমা অতিক্রম করছে, জলে-স্থলে-আকাশে নানাভাবে আধিপত্য করছে, শিল্পে-সাহিত্যে দর্শনে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-যন্ত্রে, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে প্রযুক্তি-প্রকৌশলে যে অসামান্য কৃতির আশ্চর্য স্বাক্ষর রয়েছে, তা দেখেই কি মনে হয় না এ জীবন একটা অসামান্য পুঁজি ও পাথেয়, এ দেহ-প্রাণ-মন-মনন অশেষ ঐশ্বর্য? এ শক্তি-সম্পদের অপ্রয়োগ জীবনের অপচয় ও ব্যর্থতা মাত্র। জীবনকে সুব্যবহৃত সুন্দর, সফল ও সার্থক করতে হলে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা নিয়ে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি আশ্রিত হয়ে জীবনকে আদর্শ ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হবে। তা হলেই গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় কমবেশি মানবিক গুণ বা মনুষ্যত্বসম্পন্ন সমাজসদস্যের সংখ্যা বাঞ্ছিত সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। সেরূপ অবস্থায় সমাজে বিভিন্ন অবস্থানের মানুষ সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় স্বস্তিতে সহাবস্থান করতে পারবে। জীবনকে বৃক্ষরূপে জানলে এতে ঋদ্ধির পাতা বাড়ানো, সুন্দরের ফুল ফোটানো, ও সার্থকতার ফল ধরানো ব্যক্তি মাত্রেরই আবশ্যিক দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্য। উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-উপভোগ-বিলাসও জীবনকে অপচিত ও অনস্তিত্বে ব্যর্থ করে। জীবনও একপ্রকার সগর্ব-সতুষ্ট-সতৃপ্ত ভেনি-ভিডি-ভিসি।

জীবন কি এবং কেন? –এ প্রশ্নের উঁচুমার্গের সূক্ষ্ম সুচিন্তিত তাত্ত্বিক উত্তর দিয়েছেন দার্শনিকরা। আমাদের স্থূলচেতনায় জীবন একটা বৃক্ষ। শিল্পীর চেতনা ও রুচি নিয়ে এ জীবনবৃক্ষে সযত্ন পরিচর্যায় পাতা বাড়াতে, ফুল ফোটাতে ও ফল ধরাতে হয়। এর জন্যে প্রয়োজন সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে সুপ্ত, সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রেখে বা ক্ষীণ দুর্বল করে, হৃদয়বৃত্তির ও মননবৃত্তির অনুশীলনে অনুভব-উপলব্ধির শক্তির এবং চিন্তাচেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটিয়ে, হাতিয়ারের আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৌকর্যে উৎকর্ষে, ভোগ্যসামগ্রীর উৎপাদনে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নির্মাণে প্রকৃতিকে দাস ও বশ করা, স্বাধীনভাবে স্বসৃষ্ট স্বায়ত্ত প্রতিবেশে দলবদ্ধ জীবনে-জীবিকায় শ্রেয়োলক্ষ্যে সহযোগিতায় সহাবস্থানের জন্যে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যচেতনা নিয়ে প্রীতির, সৌজন্যের, সুরুচির, সৌন্দর্যের অনুশীলন করা, ঐহিক জীবনকে জীবনশিল্পীর চেতনা নিয়ে বিচিত্রভাবে রচনা করাই জীবনচর্যা এবং এর সম্পদ ও মাধুর্য ভোগ-উপভোগ করার জন্যেই মনুষ্যজীবন। অনুভূতির, উপলব্ধির ও উপভোগের সূক্ষ্মতায়, লাবণ্যে ও প্রসারে অশেষ সম্ভাবনার পথে এগিয়ে চলা, বিকাশমান বিচিত্র বৈশ্বিক জীবনানুভব করাই হচ্ছে মানুষের সচেতন অবচেতন লক্ষ্য। কিন্তু এ চেতনা সাধারণ মানুষে জাগে না, জাগে না জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট কোন স্বপ্ন বা সাধ। সুখের অন্বেষায় দিশেহারা হয়ে নিরুদ্দেশ ছুটোছুটিতেই যাদের উৎকণ্ঠ, উদ্বিগ্ন, লিপ্স জীবন কাটে। তাদের জীবন মায়া-মরীচিকার বিড়ম্বনায় আকীর্ণ। যাদের আমরা মহৎ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, অসামান্য মনীষী, সার্থক রাষ্ট্রনায়ক, মনুষ্যকল্যাণ যন্ত্র ও ঔষধ আবিষ্কারক এবং চিরায়ত শাস্ত্র সমাজস্রষ্টা বলে জানি ও মানি, তাঁদেরও জীবন-চেতনার সবটা নির্ভুল নয়। নিখুঁত চেতনা নিখাদ জীবন চালনা হয়তো মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। তবু স্বপ্ন, সাধ ও লক্ষ্য নিখুঁত, নিখাদ ও সুউচ্চ রাখা ও থাকা প্রণোদনার জন্যেই আবশ্যিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামের শিক্ষা ও কামের শিক্ষা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার তিনটে স্তর। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা। যা শেখা বা শেখানো হয় তা-ই শিক্ষা, যা জানা হয় তা-ই জ্ঞান বা বিদ্যা এবং জ্ঞান বা বিদ্যা উপলব্ধ হলে অর্থাৎ তার জীবন ও সমাজ সম্পৃক্ত উপযোগ-চেতনা বা তাৎপর্য বোধগত হলেই কেবল জ্ঞান উন্নীত হয় প্রজ্ঞায়—তখনই কেবল অর্জিত জ্ঞান বা বিদ্যা হয় কেজো বা জীবনে-সমাজে প্রয়োগসম্ভব। শিক্ষা-জ্ঞান-বিদ্যা-প্রজ্ঞা সার্থক ও সুপ্রযুক্ত হয় যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাগ্রাহ্য হলেই।

বলতে গেলে শিশু জন্ম মুহূর্ত থেকেই দেখা-শুনে শিখতে থাকে। সে-শেখায় থাকে মুখ্যত নির্বিচার অনুকরণ ও অনুসরণ। আমরা জানি, অভিজ্ঞতাই হচ্ছে কোন বিষয়ে খাঁটি পূর্ণ বা 'প্রায়-পূর্ণ' জ্ঞান। গাঁয়ের মাঠে-ঘাটে-হাটে নিবদ্ধ জীবনে অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে না। তাই একের অভিজ্ঞতা আলাপের, কথক-শ্রোতার কিংবা শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমে অনন্যের 'জ্ঞান'রূপ পাথেয় হয়ে ওঠে। লেখার বুদ্ধি জাগার ও ধ্বনিপ্রতীক হরফ বা বাক্য কিংবা ভাবপ্রতীক চিত্রলিপি উদ্ভাবনের আগে লোকহিতবাদী সমাজহিতকামী লোকশিক্ষকরা মুখে মুখে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় বিষয়েই বাস্তব এবং অলীক, অলৌকিক ও কাল্পনিক জ্ঞান বিলাতেন। বহু বহু কাল সে-শিক্ষা বা জ্ঞানও থাকত গোত্রীয় সমাজে এবং ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমিত। তার পর একসময়ে লিপিবদ্ধ জ্ঞান বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। বাহক হচ্ছে পর্যটক আর পররাজ্যগ্রাহী শাসকগোষ্ঠী। আর একাল তো অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ যুগ তো রহস্যভেদী, গোপনীয়তা বিনাশী সদা-জিজ্ঞাসু ও সন্ধিৎসু।

তবু আজ অবধি পৃথিবীর শিক্ষিত-শহুরে মানুষেও যুক্তি-বুদ্ধি ঋদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি ক্বচিৎ মেলে। তাই শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী-ডাক্তার-উকিলের মধ্যেও যৌক্তিক-বৌদ্ধিক মুক্ত চিন্তা-চেতনার লোক দুর্লভ। সবাই আশৈশব লালিত বিশ্বাসের-সংস্কারের দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গে আবদ্ধ। আশ্চর্য, এ খবর তারা নিজেরাই জানে না যে তারা বিশ্বাস-সংস্কারের ডিগদড়ি বাঁধা। তাই পেশার ক্ষেত্রে তাদের পরিপক্বতা এলেও, সমাজে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হলেও জীবনে তাদের মুক্ত চিন্তা-চেতনার স্বাদ মেলে না। এমনকি এর অভাব তারা অনুভবও করে না। তাই মনুষ্য চিন্তা-চেতনার বিকাশ নিতান্ত মন্থর– এত মন্থর যে তার ক্রমোৎকর্ষ বা গতি অনুভব করা যায় না। ব্যক্তিক বিচলন থাকলেও সনাতন স্থবির সমাজ যেন পোষমানা সঙ্ঘবদ্ধ-দলানুগত মেষপাল।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রাথমিক স্তরে কেবল না জেনে না বুঝে শেখাই হয়। যেমন 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল' মুখস্থ হয়ে গেল। সামান্য স্মৃতিশক্তি থাকলে এবং মনোযোগ দিলেই শেখা যায়। মাধ্যমিক স্তরে জানাই জরুরী, বোঝার প্রয়োজন নেই। যেমন 'বরিশালে ধান ও পাট জন্মে'–এটি হল জ্ঞান। এর আর্থিক ও ব্যবহারগত প্রয়োজন-চেতনা প্রত্যাশিত নয় এ স্তরে। উচ্চশিক্ষায় ধান ও পাটের গুরুত্ব-চেতনাই অর্থাৎ ধান ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাটের উপযোগ চেতনা তথা জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে এর আবশ্যিকতা উপলব্ধিই এ শিক্ষার লক্ষ্য, কাজেই এটা বোঝার-উপলব্ধির তাৎপর্য চেতনার স্তর।

আমাদের সাক্ষর-নিরক্ষর অভিভাবকরা শিক্ষাসচেতন হলেও জ্ঞানসচেতন নয় বলে আমরা শেখা-জানাকেই চরম ও পরম লক্ষ্য বলে মানি। এ জন্যে আমরা মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির অনুশীলন জাত-সংযম, নিয়ন্ত্রণ ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা কেবল আর্থোপার্জনে-নৈপুণ্যে বা যোগ্যতাকেই সুশিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা বলে জানি। তাই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানবিদ হলেই আমার সন্তান যোগ্য হয়েছে বলে তুষ্ট ও তৃপ্ত হই। মানবিক গুণের অনুশীলনে 'মনুষ্যত্ব' অর্জিত হল কি-না, প্রত্যাশিত মানবিক গুণে সমাজের বাঞ্ছিত সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল কি-না, তা আমরা কখনো ভাবি না। অঙ্গে ও নৈপুণ্যে যোগ্য হতে এ যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জানা আবশ্যিক ও জরুরী অবশ্যই। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের চর্চা বা অনুশীলনই যে কেবল অন্তরে মানবিক অনুভূতির ও চিন্তা-চেতনার বিকাশের ও উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক তা' উপলব্ধি না করলে সমাজে ইহজাগতিক ও বৈষয়িক স্বার্থপরতা-সংকীর্ণতা বাড়বে, মানুষের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি হ্রাস পাবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে নিঃসঙ্গতা ও সমাজ বিরহিতা বৃদ্ধি পাবে। কেননা এসব শাখার বিদ্যা মানুষের অনুভবশক্তির প্রসার ঘটায় এবং উপলব্ধির জগৎ প্রসৃত করে। যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-আনুভূতিক চেতনার বিস্তারে ও উৎকর্ষেই মানবিক গুণের মান-মাপ-মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা এমন ত্রুটিবহুল যে আমাদের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ শিক্ষা আর পরীক্ষাও শেখা-শেখানোর বড়জোর জানা-জানানোর স্তরে নিবদ্ধ থাকে। কোন কোন মেধাবী জিজ্ঞাসু কৌতূহলী শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত অন্বেষায়-সন্ধিৎসায়ই কেবল বিদ্যাকে-জ্ঞানকে বোঝার-অনুভবের-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করে। তাই জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির অনুগত চিন্তা-চেতনা-মন-মননশীল মানুষ সমাজে এত দুর্লভ। দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের কথা বোঝা সহজ হবে। আমরা অনেকেই বাল্যকালে জ্যামিতি ও বীজগণিত পড়েছি, কষেছি এবং শিখেছি, কিন্তু জানিনি ও বুঝিনি। তাই জ্যামিতি ও বীজগণিত জীবনের কোন প্রয়োজনেই প্রয়োগ করতে পারিনি। যেমন পাটীগণিতের সবটারই উপযোগ ও প্রয়োগ ছিল জীবনে। কাজেই আমার মতো স্থূল ও স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে জ্যামিতি ও বীজগণিত শেখা নিরর্থক হয়েছে, -হয়েছে শ্রমের ও সময়ের অপচয়, অজ্ঞতা ঘোচেনি, জ্ঞান শক্তি হয়ে ওঠেনি। তেমনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে পাঠ দান-গ্রহণ পদ্ধতি প্রায়ই একই রকম রয়েছে। পরীক্ষা পাশ লক্ষ্যে কেবল বেছে বেছে প্রশ্নোত্তর রূপে শেখা-জানা এবং মুখস্থ করা এমনকি নকলও করা যেখানে শিক্ষার সর্বজনীন লক্ষ্য, সেখানে কোন বিষয়ের তাৎপর্য বোঝার আগ্রহ শিক্ষার্থীর মনে জাগেই না। এমন শিক্ষার্থীও দেখেছি, যে কোনদিন বইও আগাগোড়া কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা নিয়ে পড়েনি। মূল বই পড়ে ক্বচিৎ কেউ, প্রায় সবাই পড়ে সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্নোত্তর, শর্টকাট। সব শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় পরিমাণের বা মানের-মাপের-মাত্রার বিদ্যার অধিকারী নন, তাঁরাও বোঝেন না বলেই কেবল উক্তি বা উদ্ধৃতিবহুল নোট দেন।

তাতে বিদ্যা দান-গ্রহণের মান-মাত্রা কমে, একেবারে প্রশ্নোত্তর স্তরে নেমে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু তথাকথিত কোর্সপদ্ধতি শেখা-জানা-বোঝার এবং শেখানো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানানো-বোঝানোর দায়িত্ব একেবারেই সীমিত ও স্বল্পকালীন করে দিয়েছে। কেননা কোন বইয়ের বা বিষয়ের উপর একবার পরীক্ষা হয়ে গেলে, তার কোন কিছুই মনে রাখার দায়িত্ব বা প্রয়োজন থাকে না শিক্ষার্থীর। এ যেন স্কুল ছাত্রের পাঠ্যবইয়ের অর্ধেক ষান্মাষিক পরীক্ষার পরে এবং শেষার্ধ বার্ষিক পরীক্ষার পরে অকেজো-অপাঠ্য হয়ে যাওয়ার মতোই।

বিষয়ের পূর্ণজ্ঞান শিক্ষকের অধিগত না হলে অর্থাৎ শিক্ষক যদি বিষয়টি সতাৎপর্য বোধগত বা উপলব্ধি না করতে পারেন, তাঁরও বিদ্যা-জ্ঞান শেখার ও জানার স্তরেই থেকে যায়, তাই তিনি শিক্ষার্থীদের মনে কৌতূহল-জিজ্ঞাসা-সন্ধিৎসা জাগিয়ে তাদের মনে পূর্ণজ্ঞান পিপাসা কিংবা বৌদ্ধিক-আনুভূতিক-যৌক্তিক উপলব্ধির আগ্রহ জাগাতেই পারেন না। লিখতে হলে জানতে হয়, জানাবার জন্যে পড়তেই হয়। যে-সব শিক্ষক লেখেন তাঁদের মেধা-মনন যে-স্তরেরই হোক, তাঁদের পড়তে-জানতে হয়, তাঁরা বিদ্বান হন। যে-সব শিক্ষক লেখেন না, তাঁরা সাধারণভাবে পড়েন না (ব্যতিক্রম বিবেচ্য নয়), তাঁরা কেবল নোট তৈরী করেন, এবং তা দেখেই পড়ান এবং কেউ কেউ শিক্ষার্থীদের সে-নোটই দেন—এবং ছাত্রপ্রিয় হন। বিদ্যা বা জ্ঞান হচ্ছে বহতা নদীর মতো। চিন্তা-চেতনা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-মননজাত নব নব জ্ঞান-উপলব্ধিতে, তথ্য-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সম্পর্ক-সংবাদ বিরহী শিক্ষক কখনো প্রত্যাশিত মানের ও মাপের হতে পারেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে শিক্ষকতা হচ্ছে সৃষ্টিশীলতার নামান্তর। জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়-অনুভবে-উপলব্ধিতে-অনুশীলনে-মননে তাঁর চিন্তা-চেতনা প্রসৃত হবে, নতুন তাৎপর্যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পরিবেশিত বা বিতরিত জ্ঞান ঘটাবে মানসোৎকর্ষ, দেবে নতুন জীবনদৃষ্টি ও জাগাবে নতুন জগৎভাবনা। শিক্ষকের চিন্তা-চেতনার মৌলিকতা ও সৃষ্টিশীলতাই শিক্ষার্থীতে সঞ্চারিত হয়, গ্রন্থোক্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নয়। অবশ্য প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুল-শিক্ষকের এ সৃষ্টিশীলতা জরুরী নয়। কেননা শেখানো-জানানোর এ দুটো স্তরে বোঝা-বোঝানো তেমন সহজ নয়, এখানে পাঠ্য বিষয় ও বিদ্যা বছর বছর আবর্তিত হতে থাকে মাত্র। মন-মানসের 'মানব জমিন' এভাবেই থাকে অকর্ষিত, যা 'আবাদ করলে ফলত সোনা।'

এবার অন্য এক কথা বলি। যেখানে আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কারের স্থিতি, সেখানে বুদ্ধি নিষ্ক্রিয়, জ্ঞানের প্রবেশ রুদ্ধ, যুক্তি অনুপস্থিত আর মনন অননুশীলিত। বিশ্বাস-সংস্কারের দৃঢ়-দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গের দেয়ালে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রতিহত হয়ে অকেজো ও নিষ্ফল হয়ে পড়ে। আমাদের প্রচলিত উচ্চ শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীর জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বোধির উন্মেষ-বিকাশ ঘটায় না। ফলে তারা লেখাপড়া জানা তথা শিক্ষিত ব্যক্তি হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিনিষ্ঠ বিবেকবান বিবেচকবান মানুষ হয় না। বিশ্বাস-সংস্কারের ও জীবনাচারের ক্ষেত্রে নিরক্ষর মানুষের চেয়ে এদের শ্রেষ্ঠত্ব বা পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না, ভূতে-ভগবানে এদের ভয়-ভক্তি-ভরসা আদিম পর্যায়ের। এদের জীবনে বল-ভরসার অবলম্বন হচ্ছে ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক, বাণ-উচ্চাটন-তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী। এ তথাকথিত সাফকাপুড়ে শিক্ষিতরাই হয় স্বার্থপর, অনুদার, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতী। উদারতার, সহিষ্ণুতার, সংযমের, জ্ঞানের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তির শ্রেয়োচেতনার, বিধর্মী-বিভাষী-বিজাতি-বিদেশীর সঙ্গে সহযোগিতায় সহাবস্থানের দীক্ষা এরা ছাত্রজীবনে পায় না, নিজেরা অনুশীলনে আগ্রহী বা প্রয়াসী হয়ে স্বশিক্ষিতও হয় না। যদিও সুশিক্ষার অন্য নাম স্বশিক্ষা। কাজেই সুশিক্ষিত জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি নিষ্ঠ মানুষের সংখ্যা বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় মাপে বৃদ্ধি না পেলে আমাদের কোন সমস্যারই সমাধান সহজে মিলবে না।

প্রগতির একটি তাত্ত্বিক সংজ্ঞা

মানুষ জন্ম মুহূর্ত থেকেই তার পারিবারিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক দৈশিক আচারিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-সংস্কার, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ স্বীকার করে নিয়ে তার অনুগত হয়ে জীবন শুরু ও শেষ করে। সাধারণভাবে সব মানুষই শাস্ত্রানুগত, আচারনিষ্ঠ, বিশ্বাস-সংস্কারচালিত বলেই তাদের চিন্তা-চেতনার অনুভব-উপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না তাদের কর্ম-আচরণে। মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ পুরোনো বিশ্বাসে-সংস্কারে শাস্ত্রিক আচারে, সামাজিক নীতি-নিয়মে দৈশিক রীতি-রেওয়াজে অসঙ্গতি, অপ্রয়োজনীয়তা, অযৌক্তিকতা, অবাস্তবতা অপকারিতা দেখে তা ব্যক্তিগতভাবে পরিহার করে এবং শ্রেয়োবাদী হিসেবে শক্তি-সামর্থ্য-সাহস থাকলে উচ্চকণ্ঠে তা পরিহারের জন্যে অন্যদের সযুক্তি আহ্বান জানায়, তাদেরই আমরা বলি সংস্কারক কিংবা শাস্ত্র-সমাজদ্রোহী চিন্তানায়ক, নবচেতনার বা জীবন দর্শনের প্রবর্তক, যুগস্রষ্টা মনীষী-মনস্বী।

যে হাতিয়ারের অভাব কিংবা পুরোনো হাতিয়ারের ত্রুটি অনুভব-উপলব্ধি করে সেই ত্রুটিমুক্ত উপযোগ ঋদ্ধ নতুন হাতিয়ার আবিষ্কারে উদ্ভাবনে হয় উদ্যোগী। যে পুরোনো শাস্ত্রিক নীতি-নিয়মে কালিক ও স্থানিক অসঙ্গতি-অনুপযোগ অনুভব করে, সেই স্বকালের স্বসমাজের ও স্বদেশের মানুষের চাহিদানুগ নতুন শাস্ত্র প্রচার-প্রবর্তন করে, কিংবা স্থান-কালের উপযোগী করে সংস্কার করে। এভাবেই পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের সংস্কারের, বিশ্বাসের জীবনাচারের তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির, জীবিকাপদ্ধতির, ব্যবহারিক হাতিয়ার প্রভৃতি দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিবর্তন হয়েছে, চিন্তা-চেতনার, বোধ-বুদ্ধির উৎকর্ষে, বিস্তারে, সূক্ষ্মতায় ও শক্তি-সামর্থ্যে হয়েছে অসামান্য অশেষ।

মানুষের এ অগ্রগতি ব্যক্তি মনে জাগায় অভাববোধ, প্রচলিত বিশ্বাসে-সংস্কারে অনাস্থা, চালু-নীতি-নিয়মের উপযোগে সন্দেহ, প্রচলিত সর্বজনগ্রাহ্য সত্যে সন্দেহ, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা এবং যাচাই করার আগ্রহ প্রভৃতিই সম্ভব করেছে। কাজেই মানুষের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ধর্মমতের ও শাস্ত্রের বিবর্তনের, নৈতিক-সামাজিক আর্থিক এবং জীবিকা পদ্ধতির বিবর্তনের, উৎকর্ষের ও প্রসারের মূলে রয়েছে কোন না কোন ব্যক্তি মনের বিরক্তি, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল এবং আবিষ্কারে উদ্ভাবনে আগ্রহ আর শ্রেয়োচেতনা।

অতএব, চিন্তায় চেতনায় ব্যবহারিক জীবনে হাতিয়ারে-পোশাকে-তৈজসে-আসবাবে নতুন মাত্রই হচ্ছে দ্রোহের ও প্রগতির দান। দ্রোহেরই অপর নাম প্রগতি, পুরোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্জনের এবং নতুন মত-পথ-পদ্ধতি-নীতি-নিয়ম গ্রহণের নামই প্রগতি। বৃক্ষ যেমন পুরোনো বর্জন করে নতুনকে সৃষ্টি ও বরণ করে এগিয়ে যায়। প্রগতি মানে তাই সম্মুখগতি-অগ্রগতি। যেহেতু নতুন চিন্তা-চেতনা জ্ঞান-বুদ্ধি-কৌশল, সন্দেহ-অবিশ্বাস-কৌতূহল-জিজ্ঞাসা-যুক্তি এবং পুরোনোতে অশ্রদ্ধা অনাস্থা ও বিরক্তি-বিরাগই নতুন সৃষ্টির জনক, সেহেতু কোন বিশেষ দেশ-কাল ও সমাজগত জীবনে নতুন কখনো মানুষের জীবনের ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হতেই পারে না, এ যাবৎ পৃথিবীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ যা কিছু চিন্তায়-চেতনায় মনে-মননে আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে নতুন এনেছে, তা অকল্যাণকর হয়নি, কেবল অতীতাশ্রয়ী, পিছিয়ে পড়া মন-মননের, রুচি-বুদ্ধির এবং বন্ধ্যা মনের ও চালু আচার-আচরণনিষ্ঠ মানুষই অগ্রসর ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা-যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি-সংস্কৃতির মানুষ-উচ্চারিত মত-পথ-পদ্ধতি সহ্য করতে চায় না। ওরা বদ্ধমনের মানুষ বলে তাদের থাকে পুরোনোপ্রীতি এবং নতুনভীতি। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনে নতুন দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহারে তাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। যেমন সাধারণ মানুষ য়ুরোপীয় আস্তিক্য-নাস্তিক্য দর্শন, মনন-তত্ত্ব-তথ্য বরণ করে না, করতে চায় না বটে, তবে য়ুরোপীয় বিদ্যুৎ-ফোন-ফ্যান-ফ্রিজ-রেডিও-টিভি, প্রেস-কম্প্যুটার চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্ঞানের বিজ্ঞানের সব কিছুই গ্রহণ ও অনুকরণ করছে। অথচ মনের দিক দিয়ে শাস্ত্রমানা এসব মানুষ কয়েক হাজার বছর আগেকার ভূত-ভগবানের জগতে বাস করে অলীকে ও অলৌকিকে অবোধের মতো আস্থা রাখে।

কাজেই দ্রোহী মাত্রই নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের স্রষ্টা, ধারক, বাহক ও প্রচারক। নতুন মাত্রই অঙ্গে ও অন্তরে প্রগতির প্রসূন। এমনকি অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমাও স্বরূপে ও পরোক্ষে মানবকল্যাণের কারণ হয়েছে, বিশ্বমানবের যুদ্ধভীতি ও যুদ্ধবাজের প্রতি ঘৃণা ওই বৈনাশিক মারণাস্ত্রেরই দান। অতএব চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস-সংস্কারের ক্ষেত্রে পুরোনো বর্জনে, নতুন নির্মাণে ও বরণে আগ্রহমাত্রই প্রগতিশীল। এমন মানুষ দেশে দেশে কালে কালে কিছু থাকেই। এরাই সংস্কৃতি-সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, এরাই পিতৃধর্ম, পিতৃসমাজ ও পিতৃপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কার-নীতি-নিয়ম-রীতি-রেওয়াজ দ্রোহী।

আমাদের আধুনিক যুগে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমই ছিলেন প্রতীচীর প্রভাবে প্রগতিশীল। আমাদের কালে চল্লিশোত্তর দশকে প্রগতিশীল সাহিত্যিক ছিলেন কম্যুনিস্ট লেখকরা, কাব্যে যেমন সুভাষ-সুকান্ত-বিষ্ণুদে প্রমুখ, তেমনি নাটকে বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ। আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল নবান্ন, দুঃখীর ইমান, ছেঁড়া তার প্রভৃতি নাটক।

অতএব প্রগতি সাহিত্য বাঙলাদেশেরও সাহিত্যে কম্যুনিস্টদেরই সৃষ্টি। যেহেতু কম্যুনিস্টরা, মুখ্যত গুরুবাদী ও তত্ত্বনিষ্ঠ, সেহেতু তাদের রচনায় একঘেয়ে আবর্তন আছে। বিবর্তন দুর্লক্ষ্য, নতুন ব্যাখ্যায়, মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায়, শৈল্পিক উৎকর্ষে, পরিপ্রেক্ষিতের বৈচিত্র্যে তা বহু ও বিবিধ হয়ে ওঠে না। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যে মানবপ্রকৃতি সম্পৃক্ত হয়ে তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে না, যেন বক্তব্য ও বক্তৃতা প্রধানই থেকে যায়। মানবিক অনুভবের ও উপলব্ধির সম্পদে তাৎপর্যঋদ্ধ, মননপুষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনার উৎকর্ষে চিরায়ত হয়ে ওঠে না। কম্যুনিস্ট রচিত সাহিত্যে উৎকর্ষ তাই দুর্লভ। জনপ্রিয়তাও প্রত্যাশিত মাত্রার নয়।

এর এই বৈচিত্র্যহীনতা, উৎকর্ষরিক্ততা, আবর্তনশীলতা, বক্তব্যের ঋজুতা ও অভিন্নতা এ সাহিত্যকে সাধারণ পাঠকের কাছে অনাকর্ষণীয় করে রেখেছে, একে অবক্ষয় বলুন, ব্যর্থতা বলুন কিংবা অসার্থকতা বলুন—মূল কথা হল এ সাহিত্য জনগণের গণমানবের উপর প্রত্যাশিত বা বাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বর্তমানেও প্রগতিশীলদের সাহিত্য চর্চা চলছে, চলবে চিরকাল। কেননা, সর্ব সংস্কারমুক্ত ও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি চালিত নাস্তিক রচিত সাহিত্য অবশ্যই হয় এবং হবে মুক্ত চিন্তার, চেতনার, মননের, অনুভবের ও উপলব্ধির প্রসূন ও ফসল। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদের রচনায়ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা থাকার কথা। প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ে এ পুরোনো পৃথিবী নতুন হয়ে দেখা দেয়, নতুন দিনে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ, নতুন সঙ্কট, নতুন সমস্যা উদ্ভূত হয়। স্থান-কালজাত চাহিদা-প্রয়োজন ও সঙ্কট-সমস্যাঅনুগ চিন্তাচেতনা সচেতন মনীষী-মনস্বীকে স্বকালের, স্বদেশের স্বজাতির চাহিদা পূরণে, সঙ্কটমোচনে, এর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী করে। এঁদের ভাব চিন্তা-কর্ম-আচরণ এবং উচ্চারিত মত-মন্তব্য অবশ্যই হয় প্রগতিপন্থা নির্দেশক। যারা গণমুক্তিকামী ও সমাজ-বিবর্তনকামী তাদের রচিত সাহিত্যকে প্রগতি সাহিত্য বলে মানতেই হবে, অবশ্য লেখকের সাধ্যানুসারে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় লঘু-গুরু ভেদ থাকবেই। আমাদের বাঙলাদেশে নকশা জাতীয় গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে গণমুক্তি লক্ষ্যে গণজীবনচিত্র রূপায়িত হচ্ছে, কারো কারো রচনায় শিল্প-সৌন্দর্য, বক্তব্যের ঋজু চমক, যুক্তির তীক্ষ্ণতা, কাহিনীর বাস্তবতা স্পষ্ট। বিশ্বাস-সংস্কারের বন্ধনমুক্ত জ্ঞান-যুক্তি-বিবেকবান মানুষের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা তাঁদের রচিত সাহিত্যে শিল্পে-চিত্রে, ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে, ইতিহাসে ও দর্শনে প্রতিফলিত হয়ই, হবেই।

AMARBOI.COM

একুশে ফেব্রুয়ারী : একটি চেতনা

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের উচ্চারিত অনুচ্চারিত তথা ব্যক্ত-অব্যক্ত বাহন হচ্ছে ভাষা,—মাতৃভাষা। এ তাৎপর্যে ভাষা হচ্ছে মানুষের জাগ্রত জীবনে সব রকমের অনুভবের ও সর্ব প্রকার উপলব্ধির বাহন ও উৎস। এ অর্থে ভাষাই জীবন। কিংবা জীবনেরই অন্য নাম ভাষা।

একটা গোত্রের বা জাতির চিন্তা-চেতনার গুণ-মান-মাপ-মাত্রার পরিমাপ-পরিমাণ পাওয়া যায় তার ভাষার শব্দ-সম্পদের আকৃতি-প্রকৃতি, সংখ্যা ও ব্যঞ্জনাবৈচিত্র্যের রূপ থেকে। পৃথিবীর মননশীল সভ্য জাতির ভাষার শব্দসম্পদ বিপুল। সেসব ভাষার অভিধা ও ব্যঞ্জনা স্থূল প্রতিশব্দে সীমিত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-কোন তাত্ত্বিক-দার্শনিক চিন্তা-চেতনা প্রকাশের জন্যে প্রয়োজন মতো যথাশব্দ গঠন করা কঠিন হয় না, তেমনি দুঃসাধ্য হয় না নতুন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং উদ্ভাবিত নতুন যন্ত্রের নামকরণের জন্যে শব্দ তৈরী করা। আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা এক কালের আঞ্চলিক মানুষের মুখের বুলি থেকেই লিখিত রূপ পেয়েছে বলে এবং এ ভাষা পূর্বে কখনো বিদ্বান-পণ্ডিতের সাগ্রহ সাহিত্য-শাস্ত্র-দর্শন চর্চার কিংবা রাজার প্রাশাসনিক ভাষার মর্যাদা পায়নি বলে তেমন বিকাশ পায়নি। সভ্য জগতের অনেক ভাষার তুলনায় আমাদের বাঙলা ভাষা আজো শব্দসম্পদে দীন। গাণিতিক-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-প্রাকৌশলিক-প্রাযুক্তিক সর্বপ্রকার চিন্তা-ভাবনার প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি দান আজো বাঙলা ভাষায় বাঞ্ছিত মানে-মাপে-মাত্রায় সম্ভব হয় না। তাই আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকারে আমাদের আত্মোন্নয়নের অবলম্বন করতে হলে, সর্বপ্রকার বিষয়ে শিক্ষার বাহন করতে হলে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে হলে সাহিত্যে-শিল্পে-আইনে-গণিতে-চিকিৎসাশাস্ত্রে, শারীরবিদ্যায়, জীববিজ্ঞানে, রসায়নে, পদার্থে-দর্শনে-সমাজবিজ্ঞানে, গ্রহ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে হয় মৌলিক চিন্তা-চেতনা-গবেষণা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন মাধ্যমে, অথবা অনুবাদ মাধ্যমে বাঙলা ভাষাকে সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের যোগ্য করে তুলতে হবে। তা হলেই কেবল আমরা ভাষার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর ও স্বাধীন হতে পারব।

মনে রাখতে হবে, ব্যক্তির জীবনে যেমন বাক্‌পটুতা, বাগ্মিতা, বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশসামর্থ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখায় মনোভাবের অভিব্যক্তি দানের ক্ষমতা ব্যক্তিকে সমাজে-রাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে সু ও সুপ্রতিষ্ঠ করে, অর্থ-বিত্ত-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা দান করে, তেমনি জাতীয় জীবনেও ভাষা এক মহাসম্পদ—অফুরন্ত ঐশ্বর্য, গৌরব-গর্বের অবলম্বন। প্রজন্মক্রমে অর্জিত ও ভাষায় সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বুদ্ধি, সাহস-শক্তি, অনুভূত তত্ত্ব, উপলব্ধ তথ্য, চিন্তা-চেতনা, যুক্তি-বিবেচনা আমাদের করছে প্রাজ্ঞ, দিচ্ছে নতুন চিন্তা-চেতনায় প্রবর্তনা। বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির যোগে আমাদের মনে ডানা মেলবে নতুন আকাঙ্ক্ষা, আমাদের চোখে ধরা দেবে জীবনযাত্রার নতুন দিশা, জাগবে জীবনে নতুন স্বপ্ন, সে-স্বপ্ন দেবে নতুন উদ্যম, উদ্যোগী হব আত্মোন্নয়নে, আত্মোৎকর্ষে ও আত্মপ্রসারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

পৌরুষহীন উদ্যমহীন অযোগ্যকে গৌরবময় ঐতিহ্য রোমন্থনে কেবল আস্ফালন করে অযোগ্যতার গ্লানি ঢাকতে অনুপ্রাণিত করে। আর উদ্যমশীল আত্মবিস্তারকামী মানুষকে ঐতিহ্য স্বদেশের স্বকালের স্বজাতির ও স্বরাষ্ট্রের সমস্যা-সঙ্কট সমাধানে অনুপ্রাণিত করে।

২১শে ফেব্রুয়ারিও আমাদের গৌরব-গর্বের ঐতিহ্য। একে জাগ্রত ও উদ্যমশীল-উন্নয়নকামী জাতি হিসেবে স্মরণ করতে হলে আমাদেরও স্বকালের স্বদেশের স্বসমাজের ও স্বরাষ্ট্রের মানুষের জোর-জুলুমের, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিচল থাকতে হবে। এভাবেই হবে ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণ সার্থক। নইলে এ হয়ে পড়বে আর এক মোহররম পার্বণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লড়াকু চাষী মজুর পেশাজীবী এক হও

মানুষের সমাজ হাজার হাজার বছরের পুরোনো। অন্য প্রাণীদের মধ্যে যেমন আমরা প্রায়ই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক দেখি, যেমন সাপে বেঙ খায়, বাঘে-সিংহে অন্য প্রাণী ধরে খায়, বড় মাছ যেমন ছোট মাছ ধরে খায়, তেমনি চিরকাল মানুষই মানুষের শত্রু। মানুষ মানুষের রক্ত-মাংস খায় না বটে, তবে অন্যভাবে মানুষকে ধনসম্পত্তি কেড়ে, টাকা পয়সা থেকে বঞ্চিত করে ভাতে-কাপড়ে মারে। দেহের ঘামঝরা শ্রম দিয়ে মানুষ যা রোজগার করে অন্য ধনী-মানী মানুষ জোরজুলুম করে তা কেড়ে নেয়, লুট করে নেয় নানাভাবে।

আগের কালেও যে মানুষ দেহে দুর্বল, বুদ্ধিতে হীন, যার ধনবল, জনবল, বাহুবল নেই, তাকে গায়ের জোরে, বুদ্ধির প্যাঁচে, জনবল ও ধনবল প্রয়োগে 'দাস' করে রাখত বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও ধনবান ব্যক্তিরা। সে সময় দুনিয়ার অর্ধেকের বেশি মানুষই থাকত ধনীদের গোলাম-বান্দা-দাস হয়ে।

এখন দাস প্রথা নেই বটে, কিন্তু যারা জোতদার, আড়তদার, সওদাগর, কারখানাদার, ঠিকাদার আর সরকারী বড় বড় চাকুরে ও মন্ত্রীরা-মেম্বরেরা ছলে-বলে-কৌশলে আজো চাষী-মজুরদের, ছোট ছোট পেশাজীবীদের নানাভাবে অর্থে-বিত্তে শোষণ করছে জোঁকের মতো, কখনো কখনো আড়ালে অলক্ষ্যে থেকে মারছে জানে-মালে বিচিত্র পথে। নজরে-ঘুষে-কমিশনে-পাওনে-উপহারে-বখশিসে-দালালিতে সরকারী-বেসরকারী চাকুরে, মেম্বর-মাতবর প্রভৃতিকে খুশি না করে গরীব উমি মানুষ কোন কাজেই কামিয়াব হয় না।

আজো সমাজে আছে মাত্র দুই কিসিমের লোক: শোষক ভদ্রলোকেরা আর শোষিত গরীব-চাষী-মজুর-কুলি-কামার-জেলে-জোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র পেশাজীবী দরিদ্ররা, যারা প্রায় দিনে এনে দিনে খায়, একদিন কাজ না পেলে বউ-বাচ্চা নিয়ে উপোস করে, বেশি দিন রোগে ভুগলে ভিখিরী হয়, নয়তো অনাহারে অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে অকালে অনাহারে মরে। অথচ আদি ও আদিম কাল থেকেই দুনিয়ার শ্রমজাত সব কাজই করেছে, করছে ও করবে ওরাই, আর ভোগ-উপভোগ করবে ভদ্রলোকেরা। এ অন্যায় রুখতে হবে।

চাষীরা কৃচিৎ সচ্ছল থাকে, ছেলেপুলে বেড়ে গেলে চাষের জমি ভাগ হয়ে যায়। কোন কোন ছেলে মজুর হয়ে যায়। কেউ কেউ শহরে কারখানার শ্রমিক হয়, রিকসাচালক হয়, কুলি হয়, বোঝা বয়, মাল টানে, ভিক্ষা করে। থাকে রাস্তার ধারে বস্তির ঝুপড়িতে। অবশেষে বউ-বাচ্চাদের অকালে এতিম-অনাথ-ভিখিরী বানিয়ে অল্প বয়সে মারা যায়। কাজেই জমিদারের আমলে যেমন, জমিদারী উঠে যাওয়ার পরেও তেমনি ভদ্রলোক শোষকদের শোষণে-বঞ্চনায়-প্রতারণায় শতকরা পঁচানব্বই জন উমি চাষী-মজুর হতভাগ্যরা আদি কালের কেনা গোলামদের মতোই দুঃখ-যন্ত্রণার জীবন যাপন করে। ভাতে-কাপড়ে এরা আজো নিশ্চিত নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে পারে না।

AMARBOI.COM

দেশ বলতে জাত বলতে, মানুষ বলতে শিক্ষিত শহুরে এবং গাঁ-গঞ্জের মেম্বর-টাউট-টন্নি-মাতবর, অর্থ বিত্ত ওয়ালা সাফকাপুড়ে ভদ্রলোকেরা নিজেদের বোঝে। অন্যরা যেন মানুষ নয়, অন্যরা যেন তাদের ভোগ-উপভোগের দ্রব্য-সামগ্রীর, তাদের ভাত-কাপড়ের যোগানদার, তাদের ভোগ-বিলাসের সবকিছুর মজুর, চাকর ও নির্মাতা। দুনিয়ার উমি চাষী-মজুর-পেশাজীবীদের দুনিয়ায় জন্মই যেন তাদের হুকুম-হুমকি-হামলা চালাবার জন্যে, তাদের ফরমায়েস খাটবার জন্যে। বাড়ি-গাড়ি-ক্ষমতা-খ্যাতি-মান-সম্মান-সুখ-বিলাস প্রভৃতি সব কিছুই ওই বড়লোকদের জন্যেই।

চাষী-মজুর কি চিরকাল শোষিত হবে? চিরকাল কি বিনা প্রতিবাদে শোষিত-দলিত-ঘৃণিত-বঞ্চিত-প্রতারিত থাকবে? নগর-বন্দরের, গাঁয়ের-গঞ্জের সাফকাপুড়ে ধনী-মানী-সরকারী-বেসরকারী শিক্ষিত মানুষেরা চিরকালই কি গরীবের উপর অন্যায়ভাবে হুকুম-হুমকি-হামলা চালিয়ে যাবে? চিরকালই কি ভোটের অধিকার দিয়ে খুশি রেখে তাদের ভোটের সময়ে তোয়াজ করে বোকা বানিয়ে মজা লুটবে? এবার সময় এসেছে, জুলুমকে ও জালিমকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সময়মতো প্রয়োজনমতো যে মরতে জানে, দুনিয়াতে জান-মাল নিয়ে বাঁচবার এবং বউ-বাচ্চাকে বাঁচাবার অধিকার তারই। কাজেই এবার চাষী-মজুরদের লড়াকু হতে হবে। তাদের একে অপরকে এখন সচেতন লড়িয়ে করে তোলার সময় এসেছে। ডাক দিতে হবে এ বলে—

তোর হাঁড়ির ভাতে দিনেরাতে দস্যু দেয় হাত
তোর রক্ত শুষে হল বণিক, হল ধনীর জাত।

[ওঠ রে চাষী—নজরুল ইসলাম]

এদের আর সহ্য করা চলবে না, ক্ষমা করে প্রশ্রয় দেয়া উচিত হবে না।

ধূলিকণা মাখা মানুষের শিশু
দলে আজ করিছে ভীড়
আপনপ্রাপ্য অধিকার চায়
তার লাগি দেবে লাল রুধির।

দাবি আদায়ের, আন্দোলনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে :
দেশের চাষী-মজুর-পেশাজীবী এক হও।

জয় হোক চাষী-মজুর-পেশাজীবী বঞ্চিতদের।

নারী নির্যাতন : এর শেকড়ের সন্ধানে

আজকাল শহুরে শিক্ষিত লোকেরা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও প্রচারণায় উচ্চকণ্ঠ। যাঁর যেমন যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-রুচি-ন্যায়বোধ, তিনি তেমন সব করুণ ও জোরালো কথায় বাকজাল বিস্তার করেন। কিন্তু এ নির্যাতনের গোড়ায় যে শাস্ত্রিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক নীতি-নিয়মের ও রীতি-রেওয়াজের সমর্থন রয়েছে, এতে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষের শাস্ত্রিক ও নৈতিক জন্মগত ও প্রাজন্মক্রমিক অধিকার রয়েছে, তা তাঁরা বিবেচনা করেন না।

চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে প্রথমে রোগের লক্ষণ নিরূপণ করতে হয়, পরে তার কারণ নির্ণয় করতে হয় এবং পরে তার প্রতিকারের বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হয়। নারী নির্যাতনের কারণগুলো আগে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে নিরূপণ করতে হবে, তারপরে প্রতিকার পন্থা আবিষ্কার তেমন কঠিন নাও হতে পারে। কিন্তু উপায় সর্বদা-সর্বত্র প্রয়োগসাধ্য করার জন্যে আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক অবস্থা ও অবস্থান বাঞ্ছিত মানে, মাপে ও মাত্রায় উন্নীত ও বিকশিত করতে হবে।

১. বিয়ে প্রথা চালু করতে হয়েছে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি নিবারণের জন্যেই, এ আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ আদিকাল থেকেই প্রাণী হিসেবে পুরুষের 'জরু'-র প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ নরের নারীসম্ভোগ লিপ্সা যেমন বিশেষ বয়সে সার্বক্ষণিক, গোড়ার দিককার অবিকশিত চেতনার নারীর মধ্যে তা উন্মেষিত হয়নি হয়তো, —কারণ প্রাণিজগতে প্রায়ই নারীর কামবাঞ্ছা কেবল সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্যেই অপ্রতিরোধ্যভাবে জাগে—তার তীব্রতা তাকে যেন যন্ত্রণাগ্রস্ত করে তোলে, রতিসম্ভোগেই তার এ যন্ত্রণা মুহূর্তে ঘোচে—সে হয় যথাসময়ে সন্তানবতী। মনুষ্যপ্রজাতি সম্ভবত ক্রমাগত মানসোৎকর্ষের ফলে নারীর মধ্যেও কামবাঞ্ছা কৃত্রিম উপায়ে জাগিয়ে রতি-রমণ আনন্দ উপভোগ করে। দৈহিক অবয়বে প্রবল এবং মানসিকভাবে সদা-প্রস্তুত নরজাতীয় প্রাণীরই ভূমিকা রতি-রমন ক্ষেত্রে সক্রিয়, নারীজাতীয় প্রাণী বাহ্যত নিষ্ক্রিয়, এর থেকেই প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা হয়েছিল যে পুরুষই সম্ভোক্তা এবং নারী সম্ভোগ্য মাত্র। এ ধারণা এ যুগেও প্রবল।

২. যখন আদিতে নারী ছিল যে-কোন পুরুষের ভোগ্য, তখন সন্তান লালনের দায়িত্ব ছিল কেবল মায়েরই। এবং সন্তান চিহ্নিত হত মায়ের নামেই। এ মাতৃকেন্দ্রিক যৌথজীবনেও যখন দ্রৌপদী-বিয়ে চালু হল, অর্থাৎ এক নারীকে হিমালয় উপত্যকার কিন্নরদের মতো সব ভাইয়ের স্ত্রী করে উপভোগ প্রথা চালু হল, তখন সে-নারী হল মক্ষিরানীর মতো। এ যৌথসম্পদ নারী ও সন্তানগুলো কারো একা ছিল না বলে, তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ছিল না বলেও ওই নারী ছিল স্বাধীন। আবার সব বোনের এক স্বামী-প্রথাও ছিল চালু। ভুটান রাজার ক্ষেত্রে এখনো তা চালু রয়েছে। উনিশ শতক অবধি হিন্দুদের মধ্যে এমনি ব্যবস্থা কৃচিৎ প্রচলন ছিল।

৩. আরো পরে যখন কাড়াকাড়ি ও হানাহানি মুক্ত নিরুপদ্রব সমাজ কাম্য হল, তখন বিয়ে প্রথা চালু হল পুরুষের স্বার্থে নিরুপদ্রব-নির্দ্বন্দ্ব সম্ভোগ লক্ষ্যে। তখন এক পুরুষ বাহুবল ও খাদ্য সংগ্রহশক্তি অনুসারে বহুপত্নীক হতে থাকল। তখন নারী হল পুরুষের সম্ভোগ পাত্রী। তার স্বাধীন সত্তা হল অস্বীকৃত। এখন থেকে নারীর দেহের অধিকারী এবং তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অভিভাবক, নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক হল পুরুষ। নারীর ভোগ্যপণ্যসত্তার ও বাঁদীসত্তার শুরু এভাবেই।

৪. পুরুষের চিত্তবিনোদন ও রতি-রমণ পাত্রী হওয়াই যখন নারীর একমাত্র সামাজিক উপযোগ বলে বিবেচিত হল, তখনই সভ্য সমাজে দুনিয়ার সুন্দরীতম নারীর সন্ধান এবং তাকে বাহুবলে ছিনিয়ে আনাই হল বীরত্ব, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব, পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বড়ো কৃতি ও কীর্তি বলে হল বিবেচিত। এ কারণেই নারী হল বীরভোগ্যা। এবং বুদ্ধির সঙ্গে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, সংকল্পের সঙ্গে উদ্যোগের সমন্বয়ে জনবল-ধনবলকে পুঁজি ও পাথেয় করে রাজপুত্তুর পাড়ি দিত অজ্ঞাত-অকূল সমুদ্রে। সব আদি রূপকথার ও মহাকাব্যের বিষয় এ-ই। সভ্যতার বিকাশের ধারায় প্রথমে এ 'জরু' নিয়েই শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, জঙ্গ-যুদ্ধ-লড়াই। তারপর যাযাবর জীবনের অবসানে 'জমি' নিয়ে এবং পরে সম্পদ প্রতীক 'জর' নিয়ে নারী-ভূমি-স্বর্ণ নিয়ে চলতে থাকে চিরন্তন লড়াই। এখন যা মুদ্রা-প্রতীক সম্পদে স্থিতি পেয়েছে-ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সম্পদের 'চেক' হাতে থাকলেই নিশ্চিত ভোগ-উপভোগের জীবন। আগে কেবল জরু ও জমি ছিল বীরভোগ্য। কেননা তা মনোবল, বাহুবল, জনবল ও ধনবল প্রয়োগে কাড়তে, অর্জন বা অধিকার করতে হত। এখন ছল-চাতুরী-প্রতারণা প্রয়োগেই সম্পদ অর্জন বা সংগ্রহ-সঞ্চয় করতে হয়। তাই একালে অর্থ-সম্পদই হচ্ছে বীরত্বের ও বড়ত্বের পরিমাপক।

৫. নারীকে যখন মূল্যবান ভোগ্যবস্তুর মতো করে ভাবল মানুষ, তখন থেকেই তার মনে রিরংসাপ্রসূত ঈর্ষা-অসূয়া-অসহিষ্ণুতা জন্ম নিল। এ ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি অন্যের লোলুপদৃষ্টি, ভোগেচ্ছা, মানস-দুর্বলতা সে সহ্য করতে অপারগ হল, তখন থেকেই নারী হল সযত্ন সতর্ক প্রহরার পাত্রী, গৃহকোণ হল তার নির্বিঘ্ন আশ্রয়, নারী পর্দা ও সতীত্ব এভাবেই পেল গুরুত্ব। নারীর 'সতীত্বে'-র গুরুত্ব পুরুষের রিরংসাজাত অসূয়ায় ও অসহিষ্ণুতায়। ভীতা নারীর মধ্যে প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাসে-ভয়ে এ সতীত্ববোধ তার দেহের রক্ত-মাংসের মতোই অবিচ্ছেদ্য সংস্কারে পরিণতি পেয়েছে। আজো পুরুষ-স্পৃষ্টা বলেই বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজে ঘৃণ্য। এবং এক সময় বিধবাকে একক ব্যক্তিভোগ্য বলেই পুড়িয়ে মারা হত।

৬. শৈশবে-বাল্যে বিবাহের উদ্ভব এই 'সতী' রাখার গরজেই। আট-নয়-বারো বছরে নারীর বিবাহ দিতেই হত। নইলে সমাজে নিন্দিত ও পতিত এবং অভিভাবকের নরকে স্থিতির আশঙ্কা থাকত।

৭. এ শৈশব-বাল্য বিবাহ থেকেই শ্বশুর-শাশুড়ীর ও স্বামী-ভাসুরের অভিভাবকত্বের, কর্তৃত্বের তথা শাসনের-নিয়ন্ত্রণের-হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর, পিটানোর, বেঁধে রাখার, অনাহারে রাখার অধিকার প্রয়োজনীয় বা জরুরী হয়েছিল। এভাবেই স্বামী হল নারীর মর্ত্যজীবনের ঈশ্বর, ভগবান, মালিক, পূজ্য, তার পায়ের তলায় তার স্থান তথা স্বামীর কাছে আত্মা ও আত্মসমর্পণ করেই, সত্তার স্বাতন্ত্র্য বর্জন করেই, দেহ-মন-চেতনা স্বামীর অনুগত করেই নারীজীবন সার্থক ও ধন্য করতে হয়। দুনিয়ার সব ভাষাতেই স্বামীবাচক শব্দগুলো প্রভুত্বজ্ঞাপক। পত্নীমাত্রই সেবিকা। এ জন্যে দুনিয়ার সব ধর্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে নারীর স্থান পুরুষের নিচে। নারীর অভিভাবকত্ব পুরুষের তথা পিতার, স্বামীর ও সন্তানের অধিকারে। নারী হচ্ছে পিতা-স্বামী ও সন্তান পাল্য ও পোষ্য অবলা-অকেজো প্রাণী, যদিও উৎপাদন-নির্মাণনির্ভর সমাজে নারী গোড়া থেকেই শ্রম দিচ্ছে,—ব্যতিক্রম কেবল শাহ-সামন্ত-সদাগর-শাসকঘরেই লভ্য।

৮. এ শাস্ত্রিক ব্যবস্থা নারীকে আজো হীনম্মন্যতায় ভোগাচ্ছে। মুসলিম ঘরের চাকুরে নারী আজো 'কাবিন' নিয়ে সম্ভোগ্য প্রাণী হিসেবে বিক্রীত হতে আগ্রহী। আজো স্বামীর 'পদবী' স্বনামে যোগ করে ইন্দিরা-ম্যারগ্যারেট ধন্যা। আত্মসত্তায় ও স্বাতন্ত্র্যে স্থিত থাকা নয়, আত্মসমর্পণেই-সেবিকাভাবেই তার সুখ। এ আধি থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে সচেতন প্রয়াসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. মনস্তাত্ত্বিকভাবে এ মুহূর্তেও নারী কিছুতেই নিজেকে স্বাধীন সত্তায় পুরুষের [দৈহিক শক্তি ব্যতীত] সর্বপ্রকারে সমকক্ষ বা সমান বলে ভাবতেই পারে না। যদিও সভায় উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করে। পুরুষও উত্তমন্যতায় ভোগে। আজ অবধি সমাজের ও সমাজ-মানসের রূপ এমনিই।

১০. আদিতে যখন লেখা-পড়ার কোন আর্থিক মূল্য ছিল না, তখন সেই নিরক্ষর সমাজে কন্যাপণই ছিল। এখনো অনেক দেশে বহু দামে কনে কেনা হয়। বড় ঘরে মানী পরিবারে বিয়ে করাতে হলে চিরকালই টাকা দরকার হত। বামুনের মেয়েকে তো দিয়েথুয়ে সম্প্রদান করাই ছিল আবহমান কালের প্রথা। এ-ও উল্লেখ্য যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই কোন কোন অঞ্চলে—সম্ভবত আবহাওয়ার দরুন বা অন্য কোন জৈব কারণে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম থাকত বা থাকে, সেখানে নারীর বাজারদর বেশি। কোথাও কোথাও নারী বেশি, পুরুষ ছিল কম, সেখানে আবার পুরুষের বহুবিবাহ ছিল সহজ এবং সামাজিকভাবে জরুরী। এভাবেই এক নারী বহু স্বামী, এবং এক স্বামী বহুপত্নী প্রথা চালু হয়েছিল। এ ছিল অনেকটা চাহিদা-সরবরাহের আনুপাতিক হার নির্ভর।

১১. একালের যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত জগতে আদিম কৃষি ও বাণিজ্য নির্ভরতার বিবিধ ও বিচিত্র বিকাশের ফলে মানুষের ধন-মান-পদ-পদবী-খ্যাতি-ক্ষমতা বহু ও বিচিত্রভাবে সামাজিক মানুষের মান-মর্যাদা-অর্থ-বিত্ত অর্জনের পথ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কারণে ভালো ও বড় চাকুরে, বৃহৎ শিল্পের মালিক বা প্রকৌশলী-বিদ্বান-চিকিৎসক, ক্ষমতাবান ও উচ্চপদস্থ আমলা-উকিল-সাংসদ প্রভৃতির সঙ্গে কুটুম্বিতা তথা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী হয়েছে মানুষ। তারাই বর বা জামাই কেনে বহু অর্থ-সম্পদ দিয়ে। প্রলুব্ধ বর ও তার অভিভাবক দর কষাকষি করে, চড়া পণ হাঁকে—সম্বন্ধলিপ্সু কনেপক্ষ 'যৌতুক' নামে উঁচু দরে দাম দিয়ে 'জামাই' ধরে।

১২. শিক্ষিত শহুরে সমাজে দরিদ্র এবং মনের দিক দিয়েও কাঙাল পুরুষেরা যৌতুক নিয়ে সচ্ছল হতে চায়। দরিদ্র ঘরের মাঝারি ও রূপহীনা কন্যারা যৌতুক যোগাড় করতে পারে না বলে অনূঢ়া থাকে—এখন প্রায় তা রীতি-রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

১৩. কিন্তু গাঁয়ের অনক্ষর চাষী-মজুর-গৃহস্থ ঘরে ও অন্ত্যজ সমাজে আজো কন্যা অনূঢ়া রাখা চলে না, নিন্দিত-পতিত ও শাস্ত্রিকভাবে মহাপাপী হতে হয়। আজো অন্তর্জলি মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিন্দা-পাপ মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই নিঃস্ব-দরিদ্র অভিভাবক সাধ্যাতীত অর্থের যৌতুক দেয়ার অঙ্গীকার করে কন্যার 'অনূঢ়া' নাম ঘুচিয়ে নিন্দা ও পাপমুক্ত হয়। পরে যৌতুক যোগাড় করতে পারে না বলে শ্বশুরবাড়িতে কন্যা নির্যাতিত ও নিহত হয়। বধূর অক্ষম মা-বাপের অঙ্গীকার ভাঙার, কথার খেলাপের দায়ে প্রাণ হারায় তরুণী বধূ। এসব বধূ শিক্ষিতা হলে তথা রোজগারে সমর্থ হলে, সামাজিকভাবে বাইরে কাজ করার অধিকার পেলে, শিক্ষিতা মহিলাদের মতোই অনূঢ়া থাকার সামাজিক অধিকার পেত এবং চাকুরে হিসেবে টাকার গাছরূপে শ্বশুরঘরে নিরুপদ্রব জীবন যাপন সম্ভব হত। কাজেই গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে নারীমাত্রই রোজগেরে হলে যৌতুক দেয়া-নেয়া বন্ধ করা বা হওয়া যেমন সহজ হবে, তেমনি নিপীড়ন-নির্যাতনেরও কোন আর্থিক কারণ থাকবে না। অবশ্য দাম্পত্যে মানসিক অসুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অস্বস্তির অন্য কারণ কারো কারো জীবনে থাকবে। এবং এ যুগে তালাক মাধ্যমে সে-সব দুঃখমুক্তির উপায়ও রয়েছে।

১৪. আগে হাটে-বাজারে বেশ্যালয় ছিল, তখন পাড়ায় গৃহস্থের মেয়েরা থাকত হামলামুক্ত। ধর্ষণ ছিল না বললেই চলে। সমাজটা হচ্ছে মধ্যযুগীয় মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার জড়িত ও নিয়ন্ত্রিত আবর্তিত সমাজ। এখানে অত্যুৎসাহে বেশ্যালয় বন্ধ করে দিলে গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝিরাই যে হবে আক্রান্ত—তা বোঝার জন্যে কোন বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তবু সরকার জনপ্রিয় হওয়ার জন্যে সারাদেশে ধর্ষণ ছড়িয়ে দিয়েছে। এ হচ্ছে সেই 'মদন ভস্মেরই' বৃত্তান্ত। অপ্রতিরোধ্য প্রাণী প্রবৃত্তির ধারণা নিয়ে বলা যায়, 'ধর্ষণ' বন্ধ করা সমাজ পরিবর্তন না করলে সম্ভব হবে না। যৌনজীবন সম্বন্ধে আমাদের দেশ-কাল-প্রয়োজন অনুগ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। তা হলেই সমাজস্বাস্থ্য বাঞ্ছিত মানে উন্নীত হবে।

১৫. নারী-নির্যাতনের ও মানসিকভাবে নারী-নিপীড়নের মূলে রয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকে পুরুষ-প্রধান সমাজের নানা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ এবং দেশ-কালগত নানা বিশ্বাস-সংস্কার, এর মধ্যে সম্ভোগ্য সম্ভোক্তা সম্পর্কটাই মুখ্য। নইলে নারীকে ও পুরুষকে কি দুই ভিন্ন জাতের বা সম্প্রদায়ের প্রাণী বলে কি ভাবা সম্ভব। স্বামীসম্ভোগ্য বলেই উচ্ছিষ্ট-অকেজো নারীকে হিন্দু সমাজে পুড়িয়ে মারা হত। আজো পুরুষ স্পৃষ্টা বলেই বিধবা বিবাহ ঘৃণ্য।

১৬. ক. ঘরে-সংসারে মা হচ্ছে জননী—সন্তানের নিশ্চিন্ত অভয় আশ্রয়। সন্তান পামর বা নররূপীপশু না হলে কি সে মাকে নির্যাতিত করতে বা হতে দিতে পারে? মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়েইতো আত্মীয় পরিজন পরিবার।

খ. স্ত্রী হচ্ছে যৌন সম্পর্কের প্রিয়া, পরম আকর্ষণের ও আদরের সঙ্গিনী। অমানুষ না হলে তার মন-ভাঙা কোন বিবেচক স্বামীর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে অনুরাগ অবসিত হলে তাকে এ কালে ত্যাগ করাই মনুষ্যোচিত কর্ম—পীড়ন নয়। বস্তুত মায়ের পরেই স্ত্রীই হচ্ছে পুরুষের মর্ত্যজীবনে অভয়শরণ। এ স্ত্রী সন্তানের জননী, বংশরক্ষার উৎস।

গ. আর কন্যা হচ্ছে ঘরে পিতার স্নেহস্নাত সন্তান। ভাই-বেনোর সম্পর্কও শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে স্বার্থবুদ্ধি-শূন্য নিছক গভীর মমতার।

অতএব, জননী-জায়া-জাতারূপে মা-স্ত্রী-কন্যারূপে কোন পুরুষের কি পর হতে পারে। হতে পারে কি নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার! কাজেই নারীমুক্তি শহুরে সমিতি-করা মহিলাদের বক্তৃতানির্ভর নয়। এর জন্যে দেশের নারী-পুরুষের হাজার হাজার বছর ধরে লালিত শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাবৃত্তিক ধারণা বর্জন করতে হবে। নারী-পুরুষ যে সমান তার যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য অঙ্গীকার করে সহমর্মিতায় সহাবস্থানে সম্মত থাকতে হবে।

যদি দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-বংশ-ভাষা-সংস্কৃতি-যোগ্যতা, আর্থিক-শৈক্ষিক-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান নির্বিশেষে কেবল ছেলেমেয়েদের প্রেম-পছন্দের মিলন বা পরিণয় প্রথা এ দেশেও চালু হয়, তাহলেও নারীর অনেক সমস্যার সমাধান মিলবে। সেক্ষেত্রেও অবশ্য মনোমালিন্যে দাম্পত্য টুটবে—ঘর ভাঙবে। তখন প্রতীচ্য দেশের মতোই দাম্পত্য হবে ঠুনকো, ভঙ্গুর—স্বল্পকাল স্থায়ী। তবে সমাধিকারের ভিত্তিতে সমকক্ষতায়, সহযোগিতায় ও সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে ঘর বাঁধলে তাকে একটা ইহজাগতিক ব্যক্তিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক চুক্তি হিসেবে গ্রহণ বরণ করলে তা হৃদয়গত ট্রাজেডীর ও পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ নাও হতে পারে। পেশা বদলের মতোই দাম্পত্য বদলও স্বাভাবিক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের রূপ পাবে। যেভাবেই হোক, সর্বপ্রকারে শাস্ত্রিক সামাজিক নৈতিক সংস্কারের বন্ধনমুক্তিই নারীকে দাম্পত্যে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দেবে সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। আর্থিক স্বনির্ভরতাই নারীকে নিপীড়নমুক্ত করবে। নারীমুক্তির লক্ষ্যে আপাতত নারীর শিক্ষার ও অর্থকর পেশার ব্যবস্থা করা জরুরী।

রমজান : সমাজ ও সরকার

দিনে পাঁচবারে সতেরো রাকাত নামাজ মুসলিম মাত্রেরই জন্যে ফরজ। বালক-বালিকা থেকে সজ্ঞান মুমূর্ষু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অবধি সবার জন্যেই দৈহিকভাবে অসমর্থ হলেও মনে মনে ধ্যানে নামাজ আদায় করা আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কাজেই পাক-নাপাক কোন অবস্থাতেই নামাজ তরক করা তথা বাদ দেয়া চলে না। ক্বাজা নামাজও আদায় করতে হয়। তা সত্ত্বেও আস্তিক তথা মুমীন বয়োধর্মের প্রাবল্যবশে প্রৌঢ়কাল অবধি সাধারণভাবে নামাজাদি প্রাত্যহিক ধর্মাচারে থাকে উদাসীন। বেনামাজীরা দিনে সতেরোটা ফরজ পালন করে না। আর রমজানের রোজা হচ্ছে দিনে এক ফরজ মাত্র এবং মোট উনত্রিশ বা ত্রিশ ফরজ মাত্র। শাস্ত্রানুসারেই, রোজা মুসলিম মাত্রেরই পক্ষে আবশ্যিক নয়।

শিশু, দুর্বল বালক-বালিকা, রুগ্ণ নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ভ্রাম্যমাণ নারী-পুরুষ, ঋতুবতী-গর্ভবতী নারী প্রভৃতি অনেকেই কাফ্ফারা দিয়ে—অর্থ দান করে রোজা রাখার দায় এড়াতে পারে। তাছাড়া যে নিয়মিত নামাজ পড়ে না, তার রোজা রাখাটা প্রায় অযৌক্তিক-অসঙ্গত উপোস থাকার মতোই। অথচ অনেকেই ঘরোয়া ও সামাজিক পরিবেশের চাপে পড়ে নামাজ না পড়েও রোজা রাখে। মনে আল্লাহর ভয় না থাকলে লোক-নিন্দার ভয়ে রোজা রাখা বা রোজা রাখার ভান করা চরিত্রহীনের কাপট্যমাত্র। আবার যে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ববোধে রোজা রাখে না, রাস্তার দোকান বন্ধ রেখে তাকে রোজা রাখতে বাধ্য করা যাবে না, এ বৃথা প্রয়াস। এ ছাড়াও আমাদের গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে সর্বত্র ঘরে ঘরে শিশুর জন্যে, রোগীর জন্যে, অসমর্থ বুড়োবুড়ির জন্যে এবং রোজা না-রাখা সদস্যদের জন্যে সকালে-দুপুরে খাবার তৈরি করতেই হয়, ব্যতিক্রম এখানে বিবেচ্য নয়।

রাষ্ট্র মাত্রই দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রানুসারী কিংবা নাস্তিক অধ্যুষিত। আজকাল রাষ্ট্রমাত্রই কম-বেশি মৌলমানবাধিকার স্বীকার করে, স্বীকার করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং অন্যের ক্ষতি হয় না তেমন ব্যক্তিগত আচারে-আচরণে ব্যক্তির স্বাধিকার। তাই যদি হয়, তাহলে রমজান মাসে অমুসলমানদের দোকানে-রেস্তোরাঁয়-হোটেলে প্রকাশ্যে খাওয়ার অধিকার দিতেই হয়। পাঁচতারা হোটেলে সে-ব্যবস্থা থাকেও। আমরা জানি, ক. ভিখারীরা সারাদিনই রাস্তায় কাটায়, খ. অমুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকুরে-মজুর-শ্রমিকেরাও সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কর্মস্থলে থাকে, গ. অফিসে-দফতরে-কারখানায়-পোশাকফেক্টরীতে আজকাল অসংখ্য নারী কাজ করে, বিশেষ বয়সের কোন নারীই সব রোজা রাখতে পারেই না, ঘ. আর শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং সব শ্রেণীর ও ধর্মমতের রুগ্ন নারী-পুরুষকেও প্রয়োজনে সময়ে অসময়ে রাস্তায় বের হতে হয়। সম্ভবত রোজা না-রাখা মানুষের সংখ্যাই বেশি। কাজেই রমজান মাসেও রাস্তায় রাস্তায় খাবার দোকান, চায়ের ও পানীয়ের দোকান খোলা রাখতে হয়। এটি ব্যক্তির গণতান্ত্রিক কিংবা মানবিক অধিকারের অন্তর্গত।

বিশ শতকের এ শেষ দশকে শিক্ষিত-শহুরে সমাজে ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর, ব্যক্তিক আচার-আচরণের উপর, ব্যক্তিক রুচি-বুদ্ধির উপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক কিংবা সরকারী-রাষ্ট্রিক জোর-জুলুম-জবরদস্তি চালানো কি মধ্যযুগীয় স্থূলতার পরিচায়ক নয়? একজন ধনী-মানী-সচ্ছল-শিক্ষিত কর্মনিপুণ, বাকপটু এবং হিতবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যদি আল্লাহ্‌র প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকে, তাঁর আনুগত্যে ঔদাসীন্য দেখায়, তাহলে আল্লাহ্‌-ই তার বিচার করবেন। আল্লাহ্‌র হয়ে তাকে তার স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কি অন্যলোকের রয়েছে? অন্যলোক অবশ্য তার হিতকামী হয়ে তাকে সুবুদ্ধি-সুপরামর্শ দিতেই পারেন। কিন্তু সে সব লোক জেনে-বুঝেও আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশে নিজ দায়িত্বে উদাসীন, তার উপর হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর অধিকার কি এ কালের কোন শিক্ষিত লোকের বা সরকারের আছে?

আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে বুঝতে হবে যে-ব্যক্তি তার শাস্ত্রাচারে উদাসীন, সে কেবল নিজেরই ক্ষতি করে। যে নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, সে কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই দায়ী। যে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ খুন-জখম-জেনা-চুরি-ডাকাতি-জুয়া-জোচ্চুরি-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করে, সে কেবল নিজেরই ক্ষতি করে না, সমাজের এবং রাষ্ট্রেরও ক্ষতি করে। সে-জন্যে উক্ত সব অপরাধ (ক্রাইম), সামাজিক অপকর্ম [ভাইস] এবং পাপ [সিন]-এর জন্যে মর্ত্যে সামাজিক-রাষ্ট্রিক শাস্তিও তার প্রাপ্য।

রোজা না রাখা কিংবা নামাজ না পড়া রাষ্ট্রিক তো নয়ই, সামাজিক অপরাধও নয়। কাজেই সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় তার ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিকার হরণ অমানবিক, অগণতান্ত্রিক, অসাংস্কৃতিক অপকর্ম। এখানে বিশ্রুত একটি বৃত্তান্ত স্মরণ করছি বিবেকের তাড়নায়।

একবার হযরত ঈসার কাছে জেনার অভিযোগে এক নারীকে হাজির করে গ্রামবাসীরা। জিজ্ঞাসিত হয়ে যিশু বলেন—এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু তাকে দণ্ড দানের অধিকার কেবল সে-পুরুষেরই, যার মনে কখনো পরনারীর রূপ-যৌবন বিচলন ঘটায়নি। তেমন লোক সেখানে কেউ ছিল না। ফলে দণ্ড দেয়াও হল না। রোজার ক্ষেত্রে আমরাও কি নিজেদের কথা ভাবতে পারি না।

মুসলমানেরা বলে ও বিশ্বাস করে যে, ধর্মে বা ধর্মবিশ্বাসে জবরদস্তি নেই। মুসলমানেরা ধর্মের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানেও আস্থা রাখে। বলে, তোমার ধর্ম তোমার জন্যে, আর আমার ধর্ম আমার জন্যে। তারা বলে 'লাকুম দিনুকুম অলেয়াদীন।' মুসলমানেরা জানে ও মানে যে প্রত্যেক মানুষ তার দোষ-ত্রুটি-পাপের জন্যে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ও পুণ্য কর্মের জন্যে হাসরে আল্লাহ্‌র হুকুমে তিরস্কৃত ও পুরস্কৃত হবে, দোজখ ও বেহেস্ত-জাহান্নাম ও জান্নাত তৈরী হয়েছে এ জন্যেই। এসব জেনে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝেও অসহিষ্ণু কিছু মুসলমান বিচারের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে, পাপী-অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব বরণ করে সানন্দেই। এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি। এ কাজ আধুনিক ন্যায়-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-সভ্যতা-সংস্কৃতি-সুরুচি-সৌজন্যবিরোধী, কেননা, সংযম-সহিষ্ণুতা-সুরুচি-সৌজন্যই হচ্ছে সংস্কৃতিমানতার মাপকাঠি বা পরিমাপক লক্ষণ বা অভিব্যক্তি।

অবশ্য সমাজ-সদস্য হিসেবে সৎপরামর্শ বা দেশনা দানের নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার থাকে সুনাগরিকের। কিন্তু তা কোন অবস্থাতেই হুকুম-হুমকি-হামলার পর্যায়ে নামতে পারে না, পারে না জোর-জুলুম-জবরদস্তির রূপ নিতে।

আল্লাহ বলেছেন, তোমরা রোজা রাখবে আত্মসংযম শেখার জন্যেই অর্থাৎ সংযমে অভ্যস্ত হবার জন্যে। রোজা-নামাজে যে উদাসীন, তাকে হেদায়েত করতে পারি, কিন্তু জুলুম করতে পারি না। অতএব, ধর্মত, ন্যায়ত আর একালের যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-সমাজ-সংস্কৃতি এবং গণতান্ত্রিক মানবতান্ত্রিক নীতি-আদর্শ মানা কোন শিক্ষিত শহুরে সমাজ এবং সরকার হোটেল-রেস্তোরা বন্ধ রাখার জন্য জোর প্রয়োগ করতে পারে না, পারে না দাবি বা আবেদন জানাতে। এ জন্যেই আমরা সমাজের ও সরকারের কাছে আদেশ-নির্দেশের জুলুম প্রয়োগে বিরত থাকার জন্যে জনগণের হয়ে সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

এ সূত্রে আরো একটা কথা বলি। এ বছরের হজের দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। অর্থে-বিত্তে সচ্ছল ও শারীরিক স্বাস্থ্যে সমর্থ নারী-পুরুষের হজ করাও আল্লাহ্-নির্দেশিত কর্ম ও আচরণ। পূর্বের ইসলামি সরকার আর এখনকার রাষ্ট্রিক ইসলামের সংরক্ষক সরকারও ধনীদের ও কোরানিক অধিকার খেয়াল-খুশিমতো নিয়ন্ত্রণ করে। এ বছর মাত্র দশ হাজার বাঙালী হজ করার অনুমতি পাবে আমাদের দশ কোটি মুসলিমদের মধ্যে। খোদার উপর এ খোদকারীর কারণ হচ্ছে দেশ দরিদ্র, যদিও হজের অর্থব্যয়ে সমর্থ ব্যক্তি কয়েক লক্ষ। আর সরকার একেবারেই দরিদ্র—অত টাকা বিদেশে ব্যয়ের মতো বিনিময়-মুদ্রা তার নেই। কাজেই মানুষের শাস্ত্র নির্দেশিত এবং মৌল মানবিক অধিকারভুক্ত ধর্মকর্মের উপর এ সরকারী নিয়ন্ত্রণ। আশ্চর্য, সম্ভবত দেশের বাস্তব দারিদ্র্য অনুভব করেই জনসাধারণও এ অধিকার হরণ আপোসে মেনে নিয়েছে। এমনি প্রয়োজনে সরকার চারটি বিয়ে করার কোরানিক অধিকারও ঘরোয়া অশান্তির অজুহাতে হরণ বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে শাস্ত্রবিরোধী আইন করেছে। তেমনি কোরানোক্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করে আইয়ুব আমলে পিতার জীবিতকালে মৃতপুত্রের সন্তানদের পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করা হয়েছে। রিজিকের মালিক রাজ্জাক জেনেও সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণে যত্নবান। কাজেই প্রয়োজনে সরকার শাস্ত্রও সংশোধন বা লঙ্ঘন করে জনস্বার্থের খাতিরে।

আমরাও তাই জনস্বার্থে এবং পশুসম্পদ রক্ষণের ও বৃদ্ধির প্রয়োজনে হজ-সম্পৃক্ত কোরবানী নামের ওয়াজেব পালন সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব পেশ করছি সমাজের ও সরকারের বিবেচনার জন্যে।

নামাজে আগ্রহ নেই, অথচ রোজায় উৎসাহ যেমন সাধারণ মানুষের বেশি, তেমনি অর্থ যোগাড় হলেই নামাজ-রোজায় উদাসীন সব মানুষই কোরবানী দিতে অত্যুৎসাহী হয়। যদিও কোরবানী দেয়ার দায়িত্ব নেই বিত্তহীন বেকার নারীর, বৃদ্ধের, শিশুর ও মৃত ব্যক্তির এবং কোন দরিদ্রেরই। কোরবানী ফরজ নয়—ওয়াজেব মাত্র। কোরবানী করা না-করা সম্বন্ধে নানা দেশের বিভিন্ন শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে মতগত পার্থক্যও বিদ্যমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই দেশের পশুসম্পদের শূন্যতা বা স্বল্পতা বিবেচনা করে আমরা দেশবাসীকে নিতান্ত লোক-দেখানো ধনগর্ব কিংবা মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের গৌরব জাহিরের জন্যে পরিবারের সব জীবিত ও মৃত সদস্যদের নামে গরু-ছাগল হত্যা না করে কেবল গৃহপতির নামে বা রোজগেরে সদস্যদের নামে কোরবানী দেয়ার এবং প্রতিবেশীসহ পুরো সাতজনের সাতভাগ না হলে গরু-কোরবানী থেকে বিরত থাকার জন্যে এবং এ নীতিনিয়ম আইনসিদ্ধ করার জন্যে সরকারের কাছেও আমরা জনস্বার্থে সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি। এতে কম সংখ্যক পশু নিহত হবে— দেশের পশুসম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বৃদ্ধি পাবে দুধের পরিমাণও, বৃদ্ধি পাবে হাল. বলদের সংখ্যা। মাটি-মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধে বিবেকচালিত হয়েই আমরা এ আবেদন জানাচ্ছি।

ছদ্মাবরণের বিড়ম্বনা

পরিমিত ধ্বনির পৌনঃপুনিকতার নামই সাহিত্যে ছন্দ। এ ছন্দ থেকেই ছাঁদ। এ ছাঁদ রয়েছে সর্বত্র। ব্যক্তির অঙ্গে অবয়বে যেমন, তার হাঁটার, চলার, হাতনাড়ার, হাসার ধরনে, কথাবলার ভঙ্গিতে, ঠোঁট বাঁকানোর কিংবা চাহনির ধরনের মধ্যে থাকে ওই ছাঁদ। এমনকি শোয়া-বসার মধ্যেও থাকে প্রতিটি ব্যক্তির বিশিষ্ট ছাঁদ। এ ছাঁদ সুষম হলেই তার মধ্যে ফোটে শ্রী, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও বিশ্লেষণে প্রতিটি মানুষই অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সবক্ষেত্রেই আলাদা, প্রতিটি মানুষই স্থূল-সূক্ষ্মভাবে পৃথক সত্তার। তাই কোন দুজনের হাত-পা-আঙুলের ছাপে মিল নেই। বুড়ো আঙুলের টিপসইয়ের তাই এত গুরুত্ব —ওটি দিয়ে পুরো মানুষটাকে শনাক্ত করা যায়।

এ আঙ্গিক এবং এর প্রায়োগিক ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্য তথা পার্থক্য যেমন দৃশ্যমান, এভাবেই যেমন আমরা আমাদের পরিচিত জনকে দেখেই দূর থেকে চিহ্নিত করতে পারি, তেমনি তার গলা খাঁখারি কিংবা হাসি-কাশি-থুতুর-ধ্বনি শুনে, এমনকি তার পদধ্বনি কিংবা দরজায় তার হাতের টোকা শুনে বা টোকার আওয়াজেও তাকে শনাক্ত করতে পারি। তবু মানুষ নির্বোধের মতো ছদ্মবেশে-ছদ্মআচরণে স্ব-স্ব রূপ ও মতলব ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে, যাতে লোকে তাকে সর্বপ্রকারে ভালো-বিশ্বস্ত ও প্রত্যাশিত গুণান্বিত বলে মানে। এ ফাঁকি যে অচল, তা অন্যের ক্ষেত্রে দেখে বুঝেও নিজেই হয় পর—প্রতারণাচ্ছলে, আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার। অতি চালাক-চতুরদের এ বিড়ম্বনা বোধ জাগলে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক সচেতন হলে সমাজ-স্বাস্থ্য উন্নত হবে অবশ্যই। মূলে বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত প্রাণী প্রজাতি মানুষও আত্মনিয়ন্ত্রণে, আত্মশোধনে, আত্মানুশীলনে জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস, সংকল্প-উদ্যম যোগে মন-মনন-মানসিকতা কিভাবে কতখানি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তা তার ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে প্রতিনিয়ত প্রকটিত হয়। পরিব্যক্ত হয় তার কথায়-কাজে, অভিব্যক্তি পায় অপরের প্রতি তার আগ্রহে কিংবা ঔদাসীন্যে। বিভিন্ন ভোগ্য-উপভোগ্যে তার আকর্ষণে কিংবা বিকর্ষণে, স্বার্থপরতায় কিংবা পরার্থপরতায়। সবটা মিলে তার জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার মাপে-মানে-মাত্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে ওজন করেই আমরা সচেতন-অবচেতনভাবে তার ভালো-মন্দ-মাঝারিত্ব সম্বন্ধে স্ব স্ব ধারণা গড়ে তুলি। এমনি মূল্যায়নে সূক্ষ্ম সুবিচার যে হয়, তা নয়, তবে মারাত্মক অবিচার বোধ হয় কখনো হয় না। অবশ্য ভালো-মন্দ সবক্ষেত্রেই প্রতারক প্রত্যয় থাকেই, এবং তা ব্যতিক্রম মাত্র।

রূপকথায়, কিস্‌সা-কাহিনীতে, প্রবাদে-কিংবদন্তীতে, মহাকাব্যাদি সাহিত্যে রাজদরবারের বৃত্তান্তে আর ইতিহাসে তো শত শত সাক্ষ্য-প্রমাণ-স্বীকৃতি রয়েইছে, তা ছাড়া স্বকালে-স্বদেশে এবং বিদেশেও দেখছি জ্ঞানী-গুণী মনীষী-মনস্বী-কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক ঐতিহাসিক কিংবা বিজ্ঞানীরা কেবল শাহ-সামন্তাশ্রিত নন, স্বকালের স্বদেশের স্বসমাজের ধনী মানী খ্যাতি ক্ষমতার-দর্প দাপটের মানুষের ও সরকারের স্তাবক ও অনুগত হয়ে কৃতার্থ হন। ব্যতিক্রম ক্বচিৎ কখনো উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় ধ্রুব হয়ে আমাদের প্রবোধ দিয়ে আশ্বস্ত রাখে মাত্র। এদের কি কেবল অনন্য-অসামান্য মস্তিষ্ক থাকে, মেরুদণ্ড থাকে না? লতা যেমন তরুলগ্ন হয় বেড়ে ওঠার প্রয়োজনে, এদেরও কি আবশ্যিক হয় কোন-না-কোন ধনী-মানীর আর্থিক আশ্রয় এবং স্বীকৃতির প্রশ্রয়? এ কেবল আংশিক সত্য। ধনে কাঙালিদের হয়তো এ আশ্রয় প্রশ্রয় প্রয়োজন, কিন্তু মনে-কাঙাল প্রতিষ্ঠাকামীদের সংখ্যাই যেন বেশি। ভীরু প্লেটো অমিত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও লাঞ্ছনার ও প্রাণ হারানোর ভয়ে নামলেন না রাজনীতির মাঠে, অন্যদের বুদ্ধি-পরামর্শ-প্ররোচনা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দিয়েই হয়তো চরিতার্থ করলেন তাঁর রাজনীতিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি। ওই বিস্ময়কর জ্ঞান-মনীষা রূপায়িত-বাস্তবায়িত হল না নিজের কৃতি-কীর্তি রূপে। প্রায় সবজান্তা অভিমানী অ্যারিস্টটল ছোকরা আলেকজান্ডারের বুদ্ধি-পরামর্শদাতা রূপেই কৃতার্থ হলেন, আকাঙ্ক্ষা জাগল না তাঁর সেনাপতিদের মতো রাজা হবার। অসামান্য জ্ঞান-মনীষা নিয়ে কৌটিল্যও রইলেন স্বপদে আসীন। রাজা বানিয়েছেন তিনি, রাজা হননি, সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ম্যাকিয়াভেলি—জটিল-কুটিল সূক্ষ্ম দুষ্টবুদ্ধির আকর, কূটনীতি-রাজনীতি-শাসন-প্রশাসনের বিশারদ, ভেদ-বিবাদের নারদ এ মানুষটি নিজে কিছু হতে চাননি, কেবল রাজাদের যুগিয়েছেন বুদ্ধি, দিয়েছেন প্ররোচনা-উত্তেজনা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা। তিনি রাজা বানিয়েছেন, রাজ্য বাঁচিয়েছেন, কিন্তু রাজা হতে চাননি।

পূর্বকালের লিখিয়েরা কবি-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বিজ্ঞানী-ভৌগোলিক নির্বিশেষে সব লিখিয়েরাই তাঁদের গ্রন্থের গোড়ার দিককার কয়েক পৃষ্ঠা তো অন্নদাতার স্তুতি-প্রশস্তিতে, তোয়াজ-তোষামোদ-চাটু বাক্যে পূর্ণ করতেনই, এমন কি পাতায় পাতায় আনুগত্য প্রকাশে থাকতেন আগ্রহী। ভণিতাগুলোও এ সূত্রে স্মর্তব্য। স্বসত্তা বিলোপে এমন আত্মসমর্পণ লিখিয়েদের মধ্যেই কেবল দেখা যায়। অবশ্য 'নুন খাই যার গুণ গাই তার' নীতি সততার, আনুগত্যের, কর্তব্যপরায়ণতার, গুণগ্রাহিতার, কৃতজ্ঞতার ও প্রভুনিষ্ঠার বাঞ্ছিত প্রমাণ বটে, তবে আত্মবিলোপী-অহংবিনাশী এ কৃতজ্ঞতা কেবল শ্বন-স্বভাবের পরিচায়ক বলেই মনুষ্য সমাজে ঘৃণ্য। সোলেমানী–অঙ্গুরীর মতো এমন মানুষ যখন যার, তখন তারই সেবক থাকে। আমীর খসরু–আলাউল প্রমুখ লিখিয়েদের মধ্যে আশ্রয়দাতা প্রভুস্তুতি সেভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ফৈজী-ফজলও ছিলেন অন্নদাতা প্রভু আকবরের তেমনি অনুগত স্তাবক। এমনকি উনিশ শতকের মহত্তম মনীষী-গ্যয়টেও হলেন তাঁর দেশের স্বাধীনতা-হর্তা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অনুগত অনুচর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালে কালে গণনায়করা কিন্তু প্রাণপণ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই স্ব স্ব আদর্শে, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে ও কর্তব্যে ছিলেন স্থির অটল অভীক। ইব্রাহিম বিতাড়িত হয়েছেন, মুসা সাময়িকভাবে পালিয়েছেন, যিশু প্রাণ দিয়েছেন, তবু ব্রতভ্রষ্ট হননি। এঁদের সংকল্প ছিল 'উদ্দেশ্যের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' এঁরা মহামানব নামে স্বীকৃত, কাজেই এঁদের বাদ দিয়েই ঐশ অভিজ্ঞানরিক্ত মর্ত্যমানবের দৃষ্টান্তই আমাদের আদর্শ। রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয় নায়কদেরও তাই বাদ দিচ্ছি। তবু আদর্শ নিষ্ঠ-উন্নতশির জেদী-দ্রোহী ও নিতান্ত দুর্লভ ছিলেন না, এখনো বিরল নন। সক্রেটিস প্রাণ দিয়েছেন, মান দেননি, আপোস করেননি। ইমাম আবু হানিফা রাজানুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, উপেক্ষা করেছিলেন খলিফার হুকুম, আবু রায়হান আলবিরুনী রাজদ্রোহের জন্যে হয়েছিলেন সুদূর সিন্ধে নির্বাসিত। রুশো-মনটেস্কু-ভলতেয়ার ভয় করেননি রাজরোষের। এমনি মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালেই ছিল, রয়েছে, থাকবে। নইলে সমাজতো এগুতো না-ই, টিকতও না। কিন্তু এঁরা কখনো নেতৃত্বে আসেন না। লিখিয়ে ও নেতা ক্বচিৎ কোথাও অভিন্ন হলে, তিনি স্বরূপে লেখক-নেতা নন, নেতা-লেখক মাত্র। আমাদের মনে হয়, অমিতজ্ঞান-মনীষার লোক জননেতা হলে, সরকার-প্রধান হলে রাষ্ট্র এবং সামগ্রিকভাবে প্রশাসন, গণরুচি, সামাজিক নীতি-নিয়ম, সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নত হবে। জ্ঞান-মনীষা-মনস্বিতা কি বল-বীর্যে লভ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা বিনষ্ট করে?

আগে কবি-শিল্পীদের ভাত-কাপড় যোগাতেন শাহ-সামন্তরা, তাই তাঁরা ছিলেন ওঁদের স্তাবক। একালে তাঁদের পালক-পোষক জনগণ—তাই তাঁরা আঁকেন-লেখেন জনগণের কথা প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে। রাজতন্ত্র না থাকলেও তাঁরা সরকারকেই ভাবেন রাজা। এ কারণেই যখন যিনি শাসক-প্রশাসক এক শ্রেণীর আঁকিয়ে লিখিয়ে বকিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে-বানিয়ে লাভে-লোভে তাঁদেরই হন স্তাবক।

ফলে আমরা বিদ্বান-বুদ্ধিমান মস্তিষ্কজীবদের মধ্যে, সৃষ্টিশীল কবি-সাহিত্যিক-চিত্রী-ভাস্কর-শিল্পীদের মধ্যে এবং মননশীল তাত্ত্বিক-দার্শনিকদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক দেখতে পাই— সরকার ঘেঁষা, সরকারভীরু ও সরকারশত্রু।

বলাবাহুল্য সরকার ঘেঁষারা হন শ্বন-স্বভাবের, তেমনি সরকারভীরুরা হন ফেরুস্বভাবের আর সরকারশত্রুরা থাকেন দ্রোহী, জেদী, অভীক, অনড়। এঁরা কেবল যে দেশের, রাষ্ট্রের বা জনগণের ভরসা তা নয়, মানুষেরও প্রত্যাশা প্রতীক ও প্রতিভূ। সরকার ঘেঁষারা হলেন কোকিল— সরকারেরও সুদিনের সুহৃদ। সরকারভীরুরা হচ্ছেন কূর্ম, গা পা বাঁচিয়ে লাভে লোভে আত্মপ্রকাশ করেন, নইলে থাকেন দৃষ্টির আড়ালে— পথের বাইরে। আর সরকারশত্রুরা যেন কিছুটা লড়িয়ে ষাঁড়-মোষ-মোরগের মতো। সমাজে-সরকারে উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলে এঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন সর্বপ্রকার ক্ষয়-ক্ষতির ভয় উপেক্ষা করেই। সরকার ঘেঁষারা চারুবাক্যের চাটুকার, এঁরা আচরণে শ্বন, স্বভাবে কোকিল, সরকারভীরুরা আপাত নিরীহ, প্রকৃতিতে কূর্ম, লাভে-লোভে হুজুগে ফেরু, এঁরা দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়, পরিবারের ছাড়া সম্পদ নন কারুর। কেননা দেশের রাষ্ট্রের মানুষের বিপদে আপদে এ স্বার্থবাজদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা মেলে না।

এখন গোড়ার কথায় ফিরে যাই। কর্ম-আচরণ নয় কেবল, কেউ মন-মতলবও লুকাতে পারে না। কিছুই ঢাকা যায় না, লুকোনো চলে না, তবু প্রত্যেকেই মনে করে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে যা, তা কেউ এখনো টের পায়নি। তাই সরকারসেবী চাটুকারও মনে করে তার স্বরূপ এখনো কারুর কাছে প্রকট হয়নি— সমাজে বেশ সম্মানে সুপ্রতিষ্ঠ রয়েছে। তার চাটুকারিতা পদলেহিতা কেউ টের পায়নি, কেবল সে যা করে, তা তার স্বাধীন মত, নির্ভেজাল মত-পথ বলেই জানে অন্যলোকে। বাজারে তার আদর-কদর আছে। সরকারভীরুরাও মনে করে সমাজে তাদের একটা সুনাম-সম্মান আছে। তাদের গা-পা বাঁচানো সুবিধেবাদী চরিত্র কারো চোখে পড়ে না। কোন কোন সরকারশত্রুও মনে করে এখনো সে-সরকারকে পুরো চটায়নি, তার শত্রুতার গুরুত্ব উদাসীন সরকার এখনো বোঝেনি, কাজেই সেও তাই নিজেকে তেমন বিপন্ন মনে করেন না। আত্মগোপনের, স্বমন-মত-ভূমিকা গোপনের এ চেষ্টা সত্ত্বেও মনকে চোখ ঠাওরালেও, উটপাখির মতো চোখ বুজে থাকলেও, সবাই সমাজে স্বরূপে প্রকট। 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে'! সমাজে শহরে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সবাই সবাইকে জানে, ঘা দেয়ার, দু'কথা শুনিয়ে দেয়ার, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার লোক নেই, এ যা।

সুখের অন্তরায়

AMARBOI.COM

১.

সুখ কি এবং কেমন—তা অস্পষ্টভাবে অনুভব এবং সচেতনভাবে উপলব্ধি সম্ভব হলেও এর সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব কিংবা সহজ নয়। সুখ অবশ্যই ব্যক্তিক অনুভব-উপলব্ধির গম্য ও যোগ্য চেতনা। এর এক শব্দে কোন সংজ্ঞা দেয়া অসম্ভব। তাই ঋণাত্মক গুণের অনস্তিত্ব বা অনুপস্থিতিই সুখ বলে মানতে ও জানতে হয়। 'খ' যদি হয় 'স্থ', অবস্থা, অবস্থান হয় মানসিকভাবে, তাহলে নিরুপদ্রব, নিঃশঙ্ক নিশ্চিন্ত, অবিপন্ন, অবিপর্যস্ত, অনিরাশ, অভাবমুক্ত, আশ্বস্ত ও আনন্দিত মানসিক অবস্থা, অবস্থান বা স্থিতি। সুখ তাহলে শব্দান্তরে স্বস্থতা বা স্বাস্থ্য, সুস্থিতি, সুঅবস্থা বা অবস্থান। অতএব, দুঃখ এভাবেই মানসিক দুস্থতা বা অস্বস্থতা কিংবা অসুস্থতা দুঃস্থিতি দুরবস্থা বা দুরবস্থান। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এর সঙ্গে শারীরিক, আর্থিক, নৈতিক, ইন্দ্রিয়জ চাহিদার পূর্তি-অপূর্তি, পারিবারিক-সামাজিক শাস্ত্রিক-রাষ্ট্রিক অধিকার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি; আর কাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বাধা-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা প্রভৃতি সবকিছু সম্পৃক্ত।

২.

পারিবারিক সুখ আদর-কদর-প্রীতি-সদিচ্ছা-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সম্পৃক্ত আর্থিক সাচ্ছল্য ভিত্তিক। তেমনি সামাজিক সুখের স্থিতি হচ্ছে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে। আর রাষ্ট্রিক সুখের প্রকটিত রূপ হচ্ছে আইনের প্রয়োগে রক্ষিত শৃঙ্খলা-শান্তি, জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তা, নিরুপদ্রব আর্থিক-নৈতিক-সামাজিক-প্রাশাসনিক ন্যায়নির্ভরতা। এক কথায় জীবন-জীবিকার ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের ও নাগরিকের সর্বপ্রকার জোর-জুলুমমুক্ত মানসিক ও শারীরিক স্থিতির, অবস্থার ও অবস্থানের নাম সুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩.

ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনে মানুষ চিরকাল এ সুখ সন্ধানী, সব বাঞ্ছিত সুখ সব সময়ে মেলে না বলেই মানুষ নিয়ম-নীতির, রীতি-রেওয়াজের এবং প্রথা-পদ্ধতির স্থায়িত্ব ও অনুবর্তনকেই নিরুপদ্রব সুখ-শান্তি-শৃঙ্খলার দৃঢ় ভিত্তি বলেই জেনেছে এবং মেনেছে। 'শাস্ত্র' নামের সংবিধানের উদ্ভব ঘটেছে এভাবেই এবং এ লক্ষ্যেই শাস্ত্রনিষ্ঠা হয়েছে আবশ্যিক। সময়-শাসিত জীবন যদিও পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিবর্জন দাবি করে, তবু মানুষ এক এক নিশ্চয়তা থেকে অন্য অজ্ঞাত অনিশ্চয়তায় পা বাড়াতে সাধারণভাবে ভয় পায়। কৃচিৎ কেউ কোথাও সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে পুরোনো বর্জনে, নতুন ভাব-চিন্তা-নিয়ম-নীতি-প্রথা-পদ্ধতি প্রবর্তনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসে, তার প্রভাবেই কিছু লোক তার সঙ্গে জুটেও যায়। ফলে সমাজে স্থিতিশীল ও গতিশীল, রক্ষণবাদী ও প্রগতিবাদী, সনাতনী ও নয়াবাদী, প্রাক্তনী ও অদ্যতনী এ দুটো মনের ও মতের, পথের ও পদ্ধতির মানুষের দ্বান্দ্বিক অবস্থিতি থাকে যে-কোন সময়ে ও যে-কোন স্থানে এবং যে-কোন সমাজে।

মন-মননের ও মত-পথের এ বৈপরীত্যের ও দ্বান্দ্বিক অবস্থানের ফলে মানুষ কখনো কোথাও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত এড়াতে পারেনি। রক্তক্ষয় হয়েছে অনিবার্য। শাস্ত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে লোকে মিথ্যে স্তোক বাক্য বা আপ্তবাক্য উচ্চারণ করে, বলে সব শাস্ত্রই ওই স্রষ্টার, পরমের, পরমাত্মার সন্ধানী, আনুগত্যকামী ও উপাসনা প্রবণ। আসলে কি তাই? এক্ তাৎপর্যে বৌদ্ধ-জৈন-সাংখ্য-বৈশেষিক দর্শনে স্রষ্টা দুর্লভ। অন্যান্য শাস্ত্রেও স্রষ্টা রূপে-গুণে-লিঙ্গে বিপরীত ও বিচিত্র। এ হচ্ছে অন্ধ-হস্তী ন্যায়ের জগৎ, কিংবা একেবারেই হাওয়াই-শূন্যতার জগৎ। যদি সাদৃশ্য থাকেই, যদি কোন তথ্য বা তত্ত্ব থাকেই স্রষ্টা-শাস্ত্র দর্শনে, তা হল ক্ষতিভীত ও প্রাপ্তিলোভী মানুষের ভয়-ভক্তি-ভরসা। এ সাধারণ ও স্বাভাবিক ভয়-ভক্তি-ভরসা জাত হচ্ছে অরি-মিত্র শক্তি ও স্রষ্টা-শাস্ত্র। অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিতে আস্থাবান জ্ঞান-যুক্তি-বিরহী মানুষ মাত্রই তাই রক্ষণশীল শাস্ত্রানুগত, পুরাতনে প্রীত নতুনে ভীত। নানাভাবে তারই রূপ দেখি আজকের শিক্ষিত-শহুরে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে।

৪.

আমাদের শাস্ত্রে-সমাজে-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা আজো এ দ্বন্দ্বেরও শিকার। তবু ক্ষুদ্র হলেও এ রক্ষণশীলদের মধ্যে একজন এবং তার জ্ঞান-যুক্তি-ব্যক্তিত্বের প্রভাবে একদল প্রগতিবাদী তথা সময়ের চাহিদা অনুগত শ্রেয়োবাদী হয়ে নতুনকে, কল্যাণকে বরণ করে, বর্জন করে পুরোনো মত-পথ। একদিন কেরলায় শঙ্করাচার্য বিদ্যায়-বিত্তে-বুদ্ধিতে, অস্ত্রে-শস্ত্রে, কৌশলে-সাহসে-শক্তিতে উন্নত আরবদের দেখে মনে করলেন বুঝি একেশ্বরবাদী বলেই এরা এমন উন্নত, তিনিও তাই স্বধর্মীদের উন্নত করার জন্যে ছাড়লেন দেব-দ্বিজ-পূজা, ছাড়লেন মূর্তি-মন্দির, হলেন অদ্বৈতবাদী। তাঁর অনুসরণে দক্ষিণ ভারতে বিমূর্ত অদ্বৈতবাদ চালু করলেন ভাস্কর রামানুজ নিম্বার্ক প্রমুখ। উত্তরভারতেও ইসলাম-মুসলিম প্রভাবে আবির্ভূত হলেন দেব-দ্বিজ-দেবদ্বেষী নানক-কবীর-দাদু-রামানন্দ-বল্লভ-চৈতন্য প্রমুখ সন্তরা। আবার ইংরেজ ও ইংরেজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার মুহূর্তে রামমোহনও দেব-দ্বিজ ও মূর্তি বিরোধী হয়ে খ্রীস্টানের আদলে হলেন একক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্মবাদী। কিন্তু রক্ষণশীল সনাতনীর সংখ্যা কোন মতেই কমানো গেল না। অন্যদিকে ইসলামের ভারতে অনুপ্রবেশ মুহূর্ত থেকেই গীতা-স্মৃতি-পুরাণের বাঁধন শক্ত করতে চেয়েছে সনাতনী রক্ষণশীল শাস্ত্রপন্থীরা। তেমনি ইংরেজ অনুপ্রবেশের মুখেও মুসলিমরা তাদের শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা লক্ষ্যে চাইল মদ্রাসাশিক্ষা, হিন্দুরাও চাইল শাস্ত্রশিক্ষা। ফলে শাসকরাই প্রতিষ্ঠিত করল টোল-মদ্রাসা। মুসলিমরা ওয়াহাবী-ফরায়েজী হলে হিন্দুরাও ক্রমে হল আর্যসমাজী শুদ্ধিবাদী। এদিকে সংখ্যালঘু প্রগতিবাদী হিন্দুরা বসাল হিন্দু কলেজ [১৮১৭] দেখাদেখি প্রগতিবাদী মুসলিমরাও সরকারী অর্থে বানাল মুর্শিদাবাদে ইংরেজী স্কুল [১৮২৪]। বাঙলায় প্রগতিকামী প্রাগ্রসর চিন্তাচেতনার আধার ছিলেন রামমোহন রায় [১৭৭৪-১৮৩৩]। মুসলিম সমাজে নেতৃত্ব দিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ [১৮১৭-১৮৯৮]। তারপর একদল নতুন চিন্তা প্রচার করে তো, অন্য দল সনাতন মত-পথ আরো উৎসাহে আঁকড়ে ধরে। এরা সংস্কারক হয় তো, ওরা আরো ঘটা করে পালা-পার্বণ আচারনিষ্ঠ হয়। এরা কম্যুনিস্ট হয়তো, ওরা আরো দ্বিগুণ আগ্রহে পুঁজিবাদী হয়। এরা উদার মানবিকতা বা মানবতাবাদী হলে, ওরা হয় নিষ্ঠুর নিষ্ঠ মৌলবাদী। এরা সেক্যুলার হলে, ওরা হয় বেশি করে ধর্মধ্বজী। এরা মানব উত্তরাধিকার অঙ্গীকার করে বৈশ্বিক হলে ওরা স্বাতন্ত্র্যকামী স্বধর্মী ও স্বদেশী আচার-সংস্কৃতিপ্রবণ হয়।

আজ এমুহূর্তেও যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেও মানুষ মানসিক জীবনে রক্ষণশীল। বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির প্রসাদ সর্বক্ষণ পেয়েও নিয়েও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিমুখ। মার্কসীয় সমাধান পন্থার বিকল্প নেই জেনেও আর্থিক-সামাজিক জীবনে তা গ্রহণ বিমুখ। জ্ঞান ও যুক্তি মানুষকে বিড়ম্বিত করে না বুঝেও, তা পরিহার প্রবণ। আজো তাই জীবন, সমাজ এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও শাস্ত্রানুগত্য ও শাস্ত্রনিষ্ঠা অধিকাংশ লোকে প্রবল। তাই আজো শিবসেনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক, হিন্দু মহাসভা, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামায়াতী ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ আর খ্রীস্টান দল সর্বত্র সুলভ। এর কারণ এই, অলৌকিক আসমানে ও লৌকিক জমিনে প্রসৃত মানুষের জীবনে বাস্তবে প্রত্যক্ষ লাভে-লোভে মানুষ পাপও করে, শ্রেয়সকে, প্রয়োজনকেও নির্বিচারে বরণ করে। কিন্তু মনোভূমে সংস্কারবদ্ধ ক্ষতিভীরু-প্রাপ্তিলোভী মানুষ নিয়তিবাদী, আসমানী কৃপা-করুণা প্রত্যাশী যেমন, তেমনি আসমানী ক্রোধ-রোষ ভীরু। তাই শোনা কথায় তাদের আস্থা ও ভরসা, জানা কথায় জানে বলেই যেন প্রত্যয়হীন। ফলে মন্ত্র-মাদুলী, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচে তার নিত্য নির্ভরতা। জ্ঞান ও যুক্তি যেন মানবার মতো, নির্ভর করবার মতো যথেষ্ট সম্বল নয়। আসমানী শক্তি হচ্ছে ম্যাজিক, জ্ঞান ও যুক্তি হচ্ছে লজিক। ম্যাজিকের শক্তি অলৌকিক ও অশেষ, লজিক নিতান্ত বাস্তব বলেই তার শক্তি সীমিত, বোধ্য। মানুষের অভয় শরণ হচ্ছে ওই আসমানী আস্থার। জ্ঞান-যুক্তির শক্তি-সাহসের, সংকল্প-বাস্তবায়নের মানুষ কম। তাই শাস্ত্রানুগত, সংস্কারনিষ্ঠ বিশ্বাসাশ্রয়ী মানুষের আধিক্যে আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আত্মপ্রত্যয়ী, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে জ্ঞান-যুক্তির, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রতি অনুরাগ ও আস্থা দুর্লক্ষ্য। আর এ-ই রয়েছে আমাদের সর্বপ্রকার বন্ধনের ও বঞ্চনার মূলে। আমাদের জীবন ও চারিত্র হচ্ছে সর্বপ্রকারে অসঙ্গত-অসামঞ্জস্য। বলা চলে সুবিধেবাদীর ও সুযোগসন্ধানীর অসঙ্গতির, অসামঞ্জস্যের, বিভিন্নতার আর বৈচিত্র্যের সমষ্টির নামই সমাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.
সুখ আমরা চাই বটে, কিন্তু পথ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মতবিরোধের ফলে সুখ রাষ্ট্রিক জীবনেও অপ্রাপ্য, সামাজিক জীবনে অপ্রাপ্ত, ব্যক্তিক জীবনে অলব্ধ, পারিবারিক জীবনেও মরীচিকা। তাই সময়ের ও সমাজের চাহিদা মেটাতে আমরা অসমর্থ। অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান ও যুক্তি আশ্রয়ী না হলে 'সুখ' আসে না, আসবে না।

আবেগের আধিক্যে

অন্তরে আবেগতরঙ্গ না উঠলে একটা জরুরী চিঠিও লেখা হয় না—অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা, নিরুদ্যমতা, ঈহাশূন্যতা, জেগে থেকেও সুস্থ মানুষের শুইয়ে থাকা প্রভৃতি সবটাই হচ্ছে আবেগ-শূন্যতার লক্ষণ। লঘু-গুরু যে-কোন আবেগ মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের আপাত ও ঋজু উৎস। আবেগ ব্যতীত কেউ কোন উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করতে পারে না। এ আবেগের অভাবেই মানুষ সবকিছুতে গড়িমসি করে, কিছুতেই কোন কাজ শুরু করতে পারে না, করছি–করব, যাচ্ছি–যাব, ধরছি–ধরব করে, করে ঘণ্টা-দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর গড়িয়ে যায়। কিছুতেই দায়িত্ব, কর্তব্য, অঙ্গীকার পালন হয়ে উঠে না—সততা আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও, এ আবেগ না জাগলে ভিখিরীকে পয়সা দেয়া হয় না, স্বহস্তে চা তৈরী করেও খাওয়া হয় না। সব কাজই আবেগতাড়িত। এ আবেগের অন্য নাম চটজলদি সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় কর্মে মৌহূর্তিক উদ্যোগ, এর আরো একটি নাম উদ্যম, কর্মপ্রেরণা, বা আচরণ-প্রণোদনাও এর অন্যতম অভিধা হতে পারে। এ আবেগতাড়িত বা এ উদ্যমচালিত কর্ম ও আচরণ নিষ্ফল, ব্যর্থ বা অশুভঙ্কর হলে তাকে বলে অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা কিংবা হুজুগে নির্বুদ্ধিতা। বাস্তবে বিচার-বিবেচনা করে কিছু করা মানুষের পক্ষে তেমন স্বাভাবিক নয়, যদিও তা সময় সাপেক্ষে সম্ভব। কিন্তু মন স্থির করার জন্যে, সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে সময় কি সবসময়ে, সবক্ষেত্রে মেলে? তা ছাড়া আমাদের সব সিদ্ধান্তে, উদ্যোগে, আয়োজনে মনের যুক্তিহীন প্রবণতা আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের প্রভাবিত করে। সে-প্রভাবে যে আমরা অনুভবে টের পাইনে, তাও নয়। কাজেই আমরা যদি বলি গুরুতর সিদ্ধান্ত স্থির বিশ্বাসে ও ধীর বুদ্ধি যোগে গ্রহণ করা উচিত, তাতেই ক্ষতির ও ব্যর্থতার আশঙ্কা থাকে কম, তবু তার সঙ্গেও আমাদের ইন্দ্রিয়জ রিপু নামের আবেগগুলোর কোন একটার অন্তত স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রভাব থাকেই। তারই উপজাত সৌজন্য, সৌন্দর্যবুদ্ধি, সৃষ্টিপ্রবণতা, সংবেদনশীলতা, অভিভূতি, বিস্ময় প্রভৃতি আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ বিচিত্রভাবে অভিব্যক্তি পায়। আবেগবশে তথা অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির তথা ইন্দ্রিয়জ রিপুবশে কোন ন্যায়বিরুদ্ধ, সমাজনিন্দিত, আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ কেউ করার পর পরই হয় অনুতপ্ত। আবার দেশ-কাল-পরিবার-সমাজ প্রতিবেশ যদি হয় নীতি শিথিল বা ভ্রষ্ট, অপরাধবহুল, সুরুচি-সংস্কৃতি রিক্ত, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিচার-বিবেচনাবিরল, আত্মমর্যাদা-চেতনাহীন, ঘৃণা-লজ্জা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়শূন্য এবং সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকবহুল, তাহলে সামাজিক নীতি-নিয়ম-রীতি-পদ্ধতিমানা লোক থাকে নিতান্ত প্রভাব প্রতাপহীন অনুজন। তখন চলে আরণ্যজীবন খাদ্য-খাদক পীড়ক-পীড়িত, শোষক-শোষিত, ত্রাস-ত্রস্ত আকীর্ণ হয় গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বন্দর।

আজকের এ মুহূর্তের বাঙলাদেশের বা ঢাকার ঘটনার দৃষ্টান্তেই আমাদের উক্তির সমর্থন মিলবে। গাঁয়ের কিশোরীর রূপে মুগ্ধ অপ্রতিরোধ্য কামাবেগতাড়িত তরুণ হঠাৎ তাকে বাগে পেয়ে ধর্ষণ করার মুহূর্ত পরেই অবসন্ন দেহে-মনে নিজের নিরাপত্তার জন্যেই অনন্যোপায় হয়ে হত্যা করে কিশোরীকে, যার রূপ তাকে রাখত উদ্বেলিত, করেছিল বেপরোয়া। গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরের পাড়ায়-মহল্লায় মস্তান নামের শিক্ষিত-অশিক্ষিত গুণ্ডা রয়েছে দেশব্যাপী। এরা কাড়ে-মারে-হানে, কারণে-অকারণে হুকুম-হুমকি-হামলা চালায়। এরা ভয় দেখায়, হুঙ্কার ছাড়ে, ছুরি চালায়, গুলি ছোঁড়ে। দেশ রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদের কবলেই। তারা শাসন করে না বটে, কিন্তু শাসায়, সরকারী শাসনে নয়, দেশ চলে শাসানোতে। শাসনের চেয়ে শাসানোর অনুগত তাই সারাদেশের গণমানব। কাড়া-মারা-খুন-জখম-লুটের ঘটনার কোথাও কোন সাক্ষী মেলে না। লোক মাত্রই ত্রস্ত। তাই গাঁয়ে নেই গণ-শ্রদ্ধেয় মাতব্বর, মহল্লায় নেই সর্দার, কোথাও নেই সালিশের সর্দার, পঞ্চায়েত। এ কারণেই থানাও নেয় না সহজেই এজাহার। নিলেও থাকে নিষ্ক্রিয়। কারণ রাজনৈতিক দলের, সরকারের, ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য ও চেয়ারম্যান পোষ্য ও আশ্রিত, এমনকি নানা অপকর্মে নিযুক্ত চেলা হচ্ছে এসব প্রতাপে প্রবল, অকুতোভয় খুনী-লুটেরা। কাজেই এরা জানে এদের অপরাধের বিচার নেই। তাই প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়জ রিপু চরিতার্থ করতে এদের এত উৎসাহ সংযত থাকার মতো ঘৃণা-লজ্জা-নিন্দা-শাস্তির কোন ভয় নেই বলেই। যে-কালে যে-দেশে আইনের শাসন প্রবল থাকে, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ মানা ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের সংখ্যাধিক্য থাকে কিংবা যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা ঋদ্ধ আত্মসত্তার মর্যাদাসচেতন স্বশিক্ষিত মানুষের বহুলতা থাকে, তখন মানুষ প্রবৃত্তি পরবশ হতে সাহস বা শক্তি পায় না, তখন প্রবৃত্তি সংযত রাখে, আত্মসংযমের মানসানুশীলন করে। শাস্ত্রী-সমাজপতি-প্রশাসকরা সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং নীতি-নিয়ম বাস্তবে রূপায়ণ-তৎপর থাকলেই কেবল অধিকাংশ মানুষ শাস্ত্র-সমাজ-সরকার মানে। প্রলুব্ধ মানুষ যে-কোন অপকর্ম করতে থাকে সদা-উদ্যত, কেবল সামাজিক নিন্দা ও সরকারী শাস্তি ভয়েই হয় সংযত, থাকে বিরত। অভাব-অশাসন দুষ্ট বিকৃত বিশৃঙ্খল এবং নিন্দা-শাস্তির বা লজ্জা-ভয় বিবর্জিত রাষ্ট্রে পরিবেশ অনুকূল বলেই, প্রলোভন প্রবল হলেই যে কেউ নির্দ্বিধায় যে-কোন অপরাধ করে বসে। দারিদ্র্য, অব্যবস্থা, অন্যায়-অবিচারে-দুঃশাসনে অশাসন প্রভৃতি দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীর সংখ্যা বাড়ায় ঘরে-সংসারে-সমাজে-রাষ্ট্রে প্রায় মশা-মাছি-রোগজীবাণুর মতোই। তখন সৎ শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্যে কাল হয় বৈরী, সমাজ হয় পচনদুষ্ট, মানুষ হয় সর্বপ্রকারের ও সর্বক্ষেত্রে নীতি-নিয়ম-রীতি-রেওয়াজভ্রষ্ট, রাষ্ট্র পড়ে দুষ্ট-দুঃশাসকের কবলে। জোর-জুলুম-ছড়ায় সর্বত্র, তখন জোর যার মুলুক তার। তখন যারা দেশের অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে সেই দোকানদার, আড়তদার, কারখানাদার, সওদাগর, ঠিকেদার, চালানদার সবাই হয়ে ওঠে ভেজালদার, ঠক-ঠকবাজ। তখন দেশ চলে আইনে নয়, অধ্যাদেশে, তখন ভেটে, ঘুষে, উপঢৌকনে, উপহারে, কমিশনে, বখশিসে, পাওনে, নজরে, দস্তুরীতে এবং উপকার বা সৌজন্য বিনিময়েই হয় সর্বপ্রকার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ বা 'মকসেদ' হাসিল। এর মধ্যেও রয়েছে বিড়ম্বনা, কেননা কর্তৃপক্ষ স্থানে-কালে একক নয়, বহু ও বিবিধ। যেমন ভারতীয় চাহিদা আছে জেনেও সরকার ভারতের সঙ্গে শাড়ি আমদানী চুক্তি করবেই না। সীমান্তে লেন-দেনের মাধ্যমে দেশে আসে ভারতীয় শাড়ি, স্তূপাকার হয় আড়তে, গুদামে ও দোকানে, বিপণনও চলে প্রকাশ্যে। তবু কয়েক মাস অন্তর হয় সেনাদল নয়তো পুলিশ দল এসে ছিনিয়ে নেয় শাড়ির থান বা বান্ডেল। ওই শাড়ি আবার কোথায় নষ্ট করা হয়, বা কোথায় বিক্রয় করা হয়, বেচে কারা, ক্রেতা কারা, বিক্রয়লব্ধ অর্থ কারা কোথায় জমা দেয়—এসব খবর কেউ জানতেও চায় না, জানানোও হয় না। নষ্ট যদি নাই করবে, দেশী লোকের কাছে বেচবেই যদি, তা হলে দোকানদারদের থেকে কাড়া কেন? নাকি ভারতে ফেরত দিয়ে অন্য পণ্য আনা হয়—এ সংবাদ জানার উপায় নেই এবং দেশের জনগণের চাহিদানুগ পণ্য আমদানী করাই তো সরকারের দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্য। জনগণের তাহলে নিষ্পাপ চাহিদা [নেশাসক্তি নয় যেহেতু] ভারতীয় শাড়ি আমদানীর অনুমতি নেই কেন? এর নামই দুর্নীতি-দুঃশাসন। কামের, লোভের, লাভের, আবেগের কথা বললাম।

এবার ক্রোধাবেগের কথা বলি, গঞ্জের-নগরের-বন্দরের ওই পাওয়ার এলিট এবং তরুণ মস্তানেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে, কোন কারণে ক্ষুব্ধ হলে কিংবা ক্রুদ্ধ হলে ধৈর্য ধরে আইন-আদালতের আশ্রয় নেয় না, যে বা যারা এ ক্ষতি-ক্ষোভ-ক্রোধের নিমিত্ত, তাদের হনন করে বা করিয়েই নিশ্চিন্ত-নিরাপদ হয়। কারণ শাসক প্রশাসকরা তাদের পক্ষে আর্থিক বা রাজনীতিক কারণে ও প্রয়োজনে। সরকার প্রধানেরা যদি আইন উপেক্ষা করার পথ ও প্রশ্রয় নেয়াই নীতি-আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন, তা হলে অন্যদেরও নিজেরা নিঃশঙ্ক নিরাপদ থাকার গরজেই আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতেই হয়। পাপী পাপী টানে—'পাপের দুয়ারে পাপ সহায়' মাগে।

এখন অন্য এক আবেগের কথা বলি। কৈশোরে ও উদ্ভিন্ন যৌবনে প্রাণের উচ্ছলতার জন্যে যে-কোন কর্মে আদর্শে জ্ঞান-বুদ্ধির অপরিপক্বতাজাত এক প্রকারের হুজুগে আকর্ষণ বোধ করে। এ অনুন্নত দেশে তা হচ্ছে রাজনীতি। বিশেষ করে নিরক্ষরতাদুষ্ট দেশে ছাত্ররা ছাড়া প্রতীচ্য দেশাগত দেশ-জাতি-মাটি-মানুষ প্রভৃতির প্রতি অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য চেতনা প্রসূত গণ-রাজনীতিতে কর্মী হওয়ার যোগ্যতা নিরক্ষররা রাখে না। শিক্ষিত বেকার বা পেশাজীবীরাও আজো তেমন রাজনীতিকে ব্যক্তিজীবন সম্পৃক্ত বলে জানে না, বোঝে না, তাই সাধারণভাবে এড়িয়ে চলে, এবং মূর্খতাবশে সগর্বে সানন্দে বলে 'আমি রাজনীতি করি না।' যেন করাটা, সচেতন ও জিজ্ঞাসু থাকাটা নষ্টামি মাত্র, নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক দায়িত্ব নয়। তাই তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র রাজনীতিক আন্দোলনে, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, ন্যায্য দাবি আদায়ে লড়াইয়ে ছাত্রদের যোগ দিতেই হয়। এ বিষয়ে অতীতের রাজনীতিক সাফল্যে ছাত্রদের অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে, উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণে সগর্বে স্বীকার করা হয়। ছাত্রদের সমকালীন আন্দোলনই কেবল সরকার ও সরকারপোষ্য চাটুকাররা সহ্য করতে চায় না উপদ্রব বলে। তাদের কথায় ছাত্ররাজনীতি হচ্ছে চরিত্রহীনতা, কেবল লেখাপড়া করাই তাদের কর্তব্য। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।' সে-সরকারও কিন্তু ছাত্র-যুব নামের লড়াকু যোগাড় করে অর্থ-বিত্ত-বেসাত দিয়ে ছাত্র-যুবদল পোষে। এ কালে যেমন বড়-ছোট সব রাজনীতিক দলই লড়াকু মস্তান হাতে রাখে অর্থ দিয়ে ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে বা ভাবী লাভের লোভ দেখিয়ে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমলে ছাত্র রাজনীতি বেচা-কেনা ছিল না, তখন বিদেশী ও বিভাষী শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ও শোষণ মুক্তির একটা প্রেরণা, উত্তেজনায় ছাত্ররা রাজনীতিক আদর্শে উদ্দীপিত থাকত। এখন চলছে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। তাই দলগুলোর অনুগত ছাত্ররা সাধারণত দলের পক্ষে লড়াকু হিসেবেই কাজ করে। উঠতি বুর্জোয়ার তথাকথিত গণতন্ত্রে কোন দলেরই নীতি-আদর্শগত কোন পার্থক্য নেই। এ জন্যে এখনকার বুর্জোয়া দলের ছাত্রদলগুলো পরস্পর মারামারি হানাহানিতে নিরত থাকে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মাঠে-ময়দানে-সভায়-মিছিলে। শিবিরতো কার্যত খুনী দলই।

আমাদের উক্ত মন্তব্যের প্রমাণ, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি বামপন্থী ছাত্রদলগুলো কেবল সমাজ-পরিবর্তন লক্ষ্যে কাজ করে বলে ওরা এসব কাড়া-মারা-হানাতে যোগ দেয় না। অতএব পূর্বে রাজনীতি-সচেতন সাধারণভাবে ছাত্রমাত্রই ছিল আদর্শ চালিত। এখন হয়েছে মতলব তাড়িত হুজুগে। ব্যতিক্রম অবশ্য তখনো ছিল, এখনো রয়েছে।

অবশেষে আর এক প্রকারের আবেগের কথা বলি, যার উৎস সৌজন্য ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি। না, শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিষয়ক সৃষ্টির, রসের, রুচির আবেগ নয়। নিতান্ত সুরুচির, সংস্কৃতির ও সৌজন্যের আবেগের কথাই বলব, যা ভাষাকে করছে বিকৃত, শব্দের অভিধাকে করছে বিভ্রান্তিকর, শৈলীকে করছে অপপ্রয়োগে আকীর্ণ।

স্বস্থ মানে নিজের মধ্যে নিরাপদে 'স্থিত' থাকা, এর থেকে বিশেষ্য পদ স্বস্থের ভাব, অবস্থা 'স্বাস্থ্য'। তাই 'সু বা কু' হওয়ার কথা নয়, স্বাস্থ্য হয় আছে, নয়তো নেই, আধিব্যাধি আক্রান্ত। তাই 'সুস্বাস্থ্য' হয় না। তেমনি হয় না স্ব স্বার্থ [স্ব+অর্থ], তেমনি হয় না সুস্বাগত [সু+ আগত] তেমনি হবে না 'সুপ্রিয়'। কেননা কুপ্রিয় হতেই পারে না, কিন্তু গন্ধ, রুচি, ভাষা যেহেতু বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত দু-ই হতে পারে, সে জন্যে 'সুগন্ধ' সুরুচি, সুভাষ, এরূপ সুনাম, সুজন, সুসময়, সুদিন অবশ্যই শুদ্ধ প্রয়োগ। কিন্তু সাদৃশ্য-বাতিকবশে সৌজন্যের মাত্রা বৃদ্ধি সৌন্দর্যের অবয়বে লাবণ্য ও 'শ্রী' সংযোগ ভাষাকে বিকৃত করার নামান্তর মাত্র। আর অন্য অনেক সার্বক্ষণিক প্রায়োগিক ভুলের মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি জাত্ 'অর্থনৈতিক' শব্দের অপপ্রয়োগ। ব্যক্তির, পরিবারের ও রাষ্ট্রের কেবল আর্থিক' অবস্থাই থাকে, অর্থনৈতিক নয়, রাষ্ট্রেরই কেবল অর্থনৈতিক অবস্থান, ব্যবস্থা, ভুল প্রভৃতি থাকে।

বাঙলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের দান

শৈল, সমতল, সরিৎ আর সমুদ্র নিয়ে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি চট্টলা। দিকে দিকে সবুজের সমারোহ, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা রজতময়ী স্রোতস্বিনী, উপরে নীল আকাশ, তিন পাশে লীলাচঞ্চল নীল সমুদ্র। উপরে নিচে নীলের লীলা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ শৈল-সাগর পরিবেষ্টিত চট্টলার শোভা-সৌন্দর্যের মনোহর বর্ণনা দিয়েছিলেন তাঁর এক কবিতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রামবাসীর সাহিত্যচর্চার পরিচিতি দানের আগে চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনীতিক-প্রাশাসনিক অবস্থার সামান্য উল্লেখ প্রয়োজন। ভৌগোলিক অবস্থানে চট্টগ্রাম হচ্ছে ভারতের ও বাঙলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত অঞ্চল। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সামুদ্রিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর। মোটামুটিভাবে নয় শতক থেকে এ অঞ্চল বিভাষী বৌদ্ধ মোঙ্গল শাসিত আরাকানরাজ্যভুক্ত ছিল। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কখনো স্বল্পকালের জন্যে ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত থাকে কিংবা গৌড় সুলতানের অধিকারে আসে। স্বভাষী ও স্বধর্মী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলেই হয়তো চট্টগ্রামবাসী হিন্দু-মুসলমানদের বিভাষী-বিধর্মী আরাকানী শাসনে নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও বিকাশ লক্ষ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে চট্টগ্রামের দেশজ মুসলিমরা নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করেছেন, বাঙলায় শাস্ত্র কথা লিখেছেন, যা মধ্যযুগের বাঙলার অন্যত্র দুর্লক্ষ্য। চট্টগ্রামের মুসলিমপ্রভাবে ত্রিপুরা-নোয়াখালীতেও পরে সতেরো শতক থেকে মুসলিম সাজে বাঙলায় অনুবাদমূলক সাহিত্য ও শাস্ত্র রচনা শুরু হয়। বাঙলার অন্যত্র যখন হিন্দুরা কেবল লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য ও পৌরাণিক শাস্ত্রকথা জনগণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে বাঙলায় পাঁচালী আকারের রচনায় তাঁদের প্রয়াস সীমিত রেখেছেন তখন চট্টগ্রামের হিন্দুরাই রূপকথা ভিত্তিক বিশুদ্ধ সাহিত্য বা রোম্যান্স রচনায় অগ্রণী হন।

সে যুগে মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ ছিল না। তাই রাষ্ট্র ছিল না, ছিল জমিদারের জমিদারীর মতোই রাজার রাজ্য। তাই রাজ্য হাতবদলে প্রত্যক্ষভাবে জানে-মালে পীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হলে কেউ বিচলিত হত না। তাই চট্টগ্রাম নিয়ে আরাকান-ত্রিপুরা-গৌড়রাজের মধ্যেকার কাড়াকাড়ি হানাহানি কিংবা পরবর্তী কালে সংঘটিত মগ-মুঘল-পর্তুগীজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চট্টগ্রামবাসীর নৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক-শাস্ত্রিক জীবনে তেমন কোন বিপর্যয় ঘটাতে বা চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে কোন তরঙ্গ তুলতে পারেনি—অন্তত তার কোন দাগ দৃশ্য নয়। যদিও আলাউলের আত্মকথায়, 'নসরমালুম' নামের গীতিকায় পর্তুগীজদের দস্যুবৃত্তির, দ্বিজ ভবানীদাসের 'লক্ষণদিগ্বিজয়ে' জয়ছন্দ রাজার বা শাহবারিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দরে' আরাকান-ত্রিপুরার দ্বন্দ্বের কথা মেলে। আর কবি মুহম্মদ খান রচিত 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদে' ও 'মক্তুল হোসেন' নামের কারবালা কাব্যে চট্টগ্রামের আরাকান রাজনিযুক্ত কয়জন মুসলিম প্রশাসকের নামে মেলে। তা ছাড়া কোন কোন কাব্যে সমকালীন শাসক বা রাজপ্রশস্তিও রয়েছে—এ ছাড়া রাজনীতিক-প্রাশাসনিক কোন সংবাদ মেলে না সাহিত্যে।

তাই যন্ত্রবিরল সেকালের মন্থরগতি নিস্তরঙ্গ আর্থিক-সামাজিক-সংস্কৃতিক-গ্রামীণ জীবনে রাজশক্তির প্রতিকূলতা বা আনুকূল্য হিন্দু বা বৌদ্ধ-মুসলিম জীবনে বিশেষ কোন বিপর্যয় বা পরিবর্তন ঘটিয়েছিল বলে মনে হয় না। সে-যুগে সমাজ মুখ্যত শাস্ত্রশাসিত এবং মন-মননও শাস্ত্রিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ছিল বলে রচনার বিষয়ও ছিল স্ব স্ব শাস্ত্রানুগত। হিন্দুর রচিত সাহিত্যও শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে পৃথক ছিল, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত ছিল অবশ্য সবারই সাধারণ ঐতিহ্য ও সম্পদ। আর লৌকিক দেব পাঁচালীতেও আগ্রহ ছিল নির্বিশেষ হিন্দুর।

মুসলিমরা হিন্দি-ফারসি-রূপকথার-প্রণয়কাহিনীর অনুবাদে অনুসরণে যেমন বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি ইসলামের উন্মেষ যুগের নানা যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জঙ্গনামা, নবী ও রসুল চরিত এবং শাস্ত্রকথা রচনা করেছেন। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবেই আমাদের দেশে শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাব নিরপেক্ষ সেক্যুলার ভাব-চিন্তার তথা বিশুদ্ধ মানবিক অনুভব-উপলব্ধি প্রসূত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানজ সাহিত্য গদ্যে-পদ্যে রচিত হতে থাকে। মধ্যযুগে অবশ্য প্রণয়োপাখ্যান ও গীতিকাগুলোই ছিল ব্যতিক্রম।

ভাষিক ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণে বিদ্বানেরা এখন স্বীকার করছেন যে শাহ মুহম্মদ সগীর গৌড় সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহর [১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.] আমলে জগদ্বিখ্যাত প্রণয়োপাখ্যান ইউসুফ-জোলেখা রচনা করে বাঙলার ও বাঙলা ভাষার আদি কবির সম্মানের দাবিদার। কেননা বিদ্বানেরা এখন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মৌলতত্ত্বে ও লীলা বিন্যাসে উক্ত ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের প্রভাব ও প্রতীকিরূপ আবিষ্কার করেছেন।[১] সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর [১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.] আমলে তাঁর অধিকৃত চট্টগ্রামের সেনানীশাসক পরাগল খানের অধীনে হোসেন শাহ নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারী হুগলীস্থ বালাণ্ডার ধনাঢ্য অধিবাসী কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস কর্মস্থল পরাগলপুরে বসেই [১৫১২-১৫১৯ খ্রি.] পরাগল খানের অভিপ্রায়ক্রমে অনুবাদ করেছিলেন 'মহাভারত।' এটিই বাঙলায় রচিত আদি বা প্রথম মহাভারত। এ জন্যেই এ গ্রন্থ কেবল সর্ববঙ্গীয় সমাদর নয়, আসামেও বিপুলভাবে আদর-কদর পেয়েছিল, ফলে তা আসামী ভাষায় বিকৃতি পেয়ে এখন আসামের ভাষা-সাহিত্যের ও গৌরব-গর্বের অবলম্বন হয়েছে। আর নুসরত শাহর [১৫১৯-৩২] আমলেই পরাগল-পুত্র ছুটি খানের ওর্ফে নসবত খানের আগ্রহে কেবল অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। কাজেই রৌরব নরক ভীতি উপেক্ষা করে মহাভারত অনুবাদের সাহস হয়েছিল চট্টগ্রামস্থ হিন্দুরই। এখানে উল্লেখ্য যে চট্টগ্রামে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গজ কবি দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য ষোল শতকে সারদামঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল রচনা করেছিলেন চট্টগ্রামে বসেই।

গোটা বাংলাদেশে চট্টগ্রামের হিন্দুরাই শাস্ত্রতত্ত্ব নিরপেক্ষ প্রথম রূপকথা ভিত্তিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা শুরু করেন আঠারো শতক থেকে। শীত-বসন্তের উপাখ্যান লেখেন বাঁশখালীর সাধনপুর নিবাসী বাণীরাম ধর, রূপবতী-রূপবান প্রণয়কাব্য রচনা করেন সুশীল মিশ্র। শশিচন্দ্রের উপাখ্যান রচনা করেন রামজয় বা রামজীবনদাস, হিন্দি গাথার অনুসরণে গোপীনাথ দাস লেখেন মনোহর মধুমালতী উপাখ্যান। পটিয়ার মনসাগ্রামের জমিদার আশরাফ আলী চৌধুরীর আগ্রহে 'সয়ফুল মুলুক জরুখভান' কাব্য রচনা করেন উক্ত গ্রামবাসী উনিশ শতকের কবি মহেশ চন্দ্র দাস।

চট্টগ্রামের হিন্দুরাও রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। সে-যুগে হয়তো স্থানিক দূরত্বের দরুনই চট্টগ্রামের সব হিন্দু পদকারের পদ অঙ্গে ও অন্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রভাবিত নয়। উল্লেখ্য যে একালের বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের বাইরে সেকালের বৈষ্ণব পদকার ক্বচিৎ মেলে। চট্টগ্রামের হিন্দুদের কেউ কেউ চট্টগ্রামের মুসলিমদের মতো রাগতাল বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন। পদকারদের মধ্যে দুজন মহিলাও রয়েছেন, একজন শ্রীবরের ঝি [কন্যা], অপরজন কবি হীরামণি।

আর পুরুষদের মধ্যে নাম পাচ্ছি : দ্বিজ রঘুনাথ, গোবিন্দ বল্লভ, শ্যামদাস, জয়রাম দাস, নট ঘনশ্যাম, শিবরাম দাস, দ্বিজ জানকীনাথ, দ্বিজ কুমুদ, কানুদাস, দ্বিজ পার্বতী, দীন [দ্বিজ?], ভবানন্দ, উদয়াদিত্য, প্রতাপাদিত্য, নন্দলাল রায়, [পাগল] শঙ্কর, শিবচরণ দাস, কৃষ্ণদেব দাস, মর্কট বল্লভ, দ্বিজ মাধব, মোহন দাস, হীরামণি, শ্রীবরের ঝি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিজরাম, গোপাল, নটহি দাস, রাধাবল্লভ, হরি দাস, বংশী বদন, দীনবন্ধু, নট ভূঁইয়া মিত্র, চাঁদ, রায়, নবচন্দ্র দাস, বসুদের, নিত্যানন্দ ও দ্বিজ গদাধর। আর 'সারদামঙ্গলে'র কবি মুক্তারাম সেনের দুটো, দ্বিজরাম গোপালের একটি এবং মাধবানন্দের একটি শাক্তপদও পাওয়া যায়।

বাঙলায় সঙ্গীত শাস্ত্র গ্রন্থ, রাগতালমালা রচনা করেছিলেন অন্তত পাঁচজন কবি, তাঁদের নাম : দ্বিজরাম তনু, দ্বিজ ভবানন্দ তনু, দ্বিজ রঘুনাম, দ্বিজ রামগোপাল ও দ্বিজ পঞ্চানন।

সতেরো শতকের কবি সুচিক্রদণ্ডীবাসী দ্বিজরতিদের রচনা করেন 'মৃগলুব্ধ' নামে পৌরাণিক শিব মাহাত্ম্য কথা এবং লক্ষণ দিগ্বিজয় বা রাজ্যাভিষেক লেখেন দ্বিজ ভবানী নাথ। আঠারো শতকের অন্যান্য কবি হচ্ছেন সারদামঙ্গল প্রণেতা আনোয়ারাবাসী কবি মুক্তারাম সেন, তাঁর ভাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মাহাত্ম্য রচক ব্রজলাল সেন, কালিকা মঙ্গল রচয়িতা নিধিরাম আচার্য ও গোবিন্দ দাস, মনসার ভাসান প্রণেতা রামজীবন বিদ্যাভূষণ, মৃগলুব্ধ সম্বাদ রচক রামরাজা, গোকুলমঙ্গল লেখক ভক্তরামদাস, পীর-নারায়ণ সত্যের পাঁচালী প্রণেতা সুচিয়া গ্রামবাসী ফকির চাঁদ। অন্যান্য কবিগণ হচ্ছেন নিমাই সন্ন্যাস প্রণেতা শঙ্কর ভট্ট ও সদানন্দ ভট্ট, আনোয়ারার নবগ্রামবাসী বলরামদেব, সুচক্রদণ্ডীগায়ের মহিলা তারিণীদেবী [সুবচনীব্রত লেখিকা], ষড়াননব্রত লেখক আনোয়ারাবাসী ভৈরব চন্দ্র আইচ, সুচক্রদণ্ডীবাসী কবিরাজ ও পরে জমিদার ষষ্ঠী চরণ মজুমদার প্রমুখ।

বাঙলা সাহিত্য চর্চায় আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামী মুসলমানই ছিলেন পথিকৃৎ এবং প্রণয়োপাখ্যান অনুবাদে বা রোমান্স রচনায়ও চট্টগ্রামী মুসলমানই ছিলেন অগ্রণী। এক কথায় ভিন্ন জাতির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আরাকান রাজ্যের ও রাজধানী রোসাঙ্গে প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীরা নিজেদের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি এবং ভাষা-সাহিত্য রক্ষায় ও চর্চায় এবং এগুলোর বিকাশ সাধনে তৎপর হয়েছিলেন বৃহৎ বঙ্গ থেকে প্রাশাসনিক-শাস্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাজাত উনজনের মানসিক অসহায়তার দরুন।

পনেরো শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত [আনু. ১৩৮৯–১৪০৯] ইউসুফ জুলেখা, দৌলত উজির বাহরাম খান প্রণীত লায়লী মজনু [আনু. ১৫৪৩–৫৩ সন] রোসাঙ্গ প্রবাসী কবি কাজী দৌলত রচিত [আনু. ১৬৩২–৩৮] সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী, কবি আলাউল [আনু. ১৬৫০–৭৩ সন] রচিত পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, সিকান্দরনামা, সপ্তপয়কর প্রভৃতি কেবল শ্রেষ্ঠ প্রণয় কাব্যই নয়, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের মধ্যেও প্রথম সারির রচনা। অন্যদের মধ্যে ষোল শতকে মধুমালতী রচক মুহম্মদ কবির, বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা দ্বিজ শ্রীধর ও শাহবারিদ খান, সতেরো শতকে রোমান্স প্রণেতা কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, শরীফ শাহ্, গেয়াস খান, আঠারো শতকে পরাগল, বাণীরাম ধর, সুশীল মিশ্র প্রমুখ কবিদের পাচ্ছি।

চট্টগ্রামের মুসলিমরা আরো এক ক্ষেত্রে পথিকৃৎ এবং গোটা ভারতে অনন্য। এঁরা ভারতীয় যোগ-তন্ত্র ও বেদান্ত প্রভাবিত এক স্থানীয় সুফীতত্ত্বের ও সাধনপদ্ধতির উদ্ভাবক। বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিমের অধ্যাত্মচেতনার এক সমন্বিতরূপ এতে পাওয়া যায়। এ শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার মিলন এসব রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়।[২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান রচিত জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞান-চৌতিশা, হাজী মুহম্মদের নুর জামাল, সতেরো শতকের কবি মীর মুহম্মদ সফীর নুরনামা, আঠারো-উনিশ শতকের কবি আলিরজার [১৭৫৯–১৮৩৭], আগম-জ্ঞানসাগর, বালক ফকিরের জ্ঞান চৌতিশা, নেয়াজের যোগকনন্দর, শেখ মনসুরের সির্নামা মোহসিন আলির মোকামমঞ্জিল কথা প্রভৃতি চট্টগ্রামী কবি রচিত যোগ-তন্ত্র-উপনিষদ প্রভাবিত সুফীতত্ত্ব-দর্শন।

বলেছি বাঙলার অন্যত্র দুর্লভ হলেও চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিমরা বৈষ্ণব না হয়েও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকশ পদ বা গান রচনা করেছিলেন, এমনকি 'রাগতালনামা' নামের সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থও রচনার গৌরব তাঁদেরই। রাগতাল গ্রন্থের মুসলিম রচয়িতারা হচ্ছেন আলাউল, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, কাজী দানিশ, আলিরজা, তাহির মাহমুদ, চম্পাগাজী, বখশ আলি প্রমুখ অনেকেই। এঁরা সঙ্গীত শিক্ষকও ছিলেন। মুসলিম পদকারদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে সৈয়দ সুলতান, আলাউল, আফজল, আলিরজা, চম্পাগাজী, ফাজিল নাসির মুহম্মদ ও মনোহর।

চট্টগ্রামের মুসলিম কবিরা জঙ্গনামা নামে ইসলামের উন্মেষ কালের নানা যুদ্ধ বিষয়ে যুদ্ধকাব্যও রচনা করেছিলেন, জায়েন উদ্দীনের এবং সৈয়দ সুলতানের জয়কুমরাজার যুদ্ধ, আলাউল রচিত সিকান্দরনামা, আবদুল নবী রচিত রসুল-পিতৃব্য হামজার দিগ্বিজয় নামে বিপুল কলেবর কাব্য, শাহবারিদ খান রচিত 'হানিফার দিগ্বিজয়' আর দৌলত উজির বাহরাম খান, গিয়াস খান, মুহম্মদ খান, নসরুল্লাহ খোন্দকার রচনা করেছিলেন কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে নানা নামের কাব্য। এগুলোর মধ্যে মুহম্মদ খান [১৬৪৬ সনে] রচিত মক্তুল হোসেন-ই শ্রেষ্ঠ। এ কাব্য কারুণ্যের নির্ঝর।

'মুহম্মদ খান কহে শুনিতে মরম দহে
পাষাণ হইয়া যায় জল।'

উনিশ শতকে মধ্যযুগীয় ধারায় 'ভ্রাতৃ বিলাপ' কাব্য বা শোকগাথা রচনা করেছিলেন মহিলা কবি রহিমুননিসা। আর 'সত্যকলিবিবাদ সম্বাদ' নামে নৈতিক আদর্শিক পাপ-পুণ্য বিষয়ক রূপক কাব্য [১৬৩৫ সনে] রচনা করেছিলেন মক্তুল হোসেন কাব্য প্রণেতা মুহম্মদ খান। এ ধরনের রচনা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য। 'নবীবংশ' নামে আদম থেকে নবী মুহম্মদ অবধি প্রধান নবীদের বিশালকায় চরিত গ্রন্থ রচনা [১৫৮২-৮৪ সনে] করেন প্রভাবশালী কবি-পণ্ডিত পীর মীর সৈয়দ সুলতান। মুসলিম শাস্ত্র বিষয়ে ষোল শতক থেকে নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। রচকদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন শেখ পরাণ, নেয়াজ, পরাণপুত্র মুত্তালিব, আশরাফ, আলাউল, মুজাম্মিল ও নসরুল্লাহ খোন্দকার। নিরক্ষতার সে-যুগে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রিক নৈতিক সামাজিক আচার-আচরণ বিষয়ক নানা সাধারণ জ্ঞান-দানের জন্যে ডাক ও খনার বচনের মতো এক প্রকার লোকশিক্ষা গ্রন্থও লিখিত হত গণমানুষের হিতার্থে। এগুলো প্রশ্ন-উত্তরে রচিত। এগুলোর নাম দিয়েছি 'সাওয়াল সাহিত্য।'

'সাওয়াল সাহিত্য' যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন কবি আকিল, এতিম আলম, আলিরজা, নসরুল্লাহ খোন্দকার ও আবদুল করিম খোন্দকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগেও বাঙলা সাহিত্যের আসরে চট্টগ্রামের দান কম নয়। এ যুগেও চট্টগ্রামবাসী কয়েক ব্যাপারে পথিকৃৎ বলে গৌরব করতে পারে। গত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নবীন চন্দ্র সেন [১৮৪৭-১৯০৯] চট্টলভূমি ধন্য করে গেছেন। মহতের ও বৃহতের প্রতি এঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, তাই তিনি মহৎ চরিত্রপূজাই কাব্যসাধনার অবলম্বন করেছিলেন।

ধলঘাট গ্রামবাসী কবিভাস্কর শশাঙ্ক মোহন সেন [১৮৭১-১৯১৮] বাঙলা ভাষায় পাশ্চাত্য ধারায় সমালোচনা-সাহিত্যের প্রবর্তক। তাঁর বাণী মন্দির, বঙ্গবাণী ও মধুসূদন বাঙলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক। মূলত ও প্রধানত তাঁর সন্ধান, সংগ্রহ ও গবেষণার ফলেই জানা গেছে যে দেশজ মুসলমানরা পনেরো শতক থেকেই হিন্দুদের মতোই বাঙলায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন। সাহিত্যবিশারদের পুঁথি আবিষ্কারের ফলেই এবং নজরুল ইসলামের কবিতায় মুগ্ধ হয়েই বাঙালী মুসলিমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার করে বাঙলাকেই মাতৃভাষা রূপে বরণ করে।

রাজদূত শরচ্চন্দ্র দাস [১৮৪৯ - ১৯১৭] ভারত বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন, তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর নবীন চন্দ্র দাস [১৮৫৩-১৯১৪] 'রঘু বংশ' অনুবাদ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পটিয়ার জঙ্গলখাইন-নিবাসী উকিল-কবি বিপিনবিহারী নন্দী [১৮৭০-১৯৩৭] 'রাজস্থান', 'চন্দ্রধর' প্রভৃতি অনেকগুলো মহাকাব্য বা কাহিনীকাব্য রচনা করে গেছেন। মীরেরসরাইবাসী সুরেশ চন্দ্র নন্দীও প্রত্যপ, পানিপথ ও পল্লীগীতি নামের তিনখানা মহাকাব্য রচনা করেছেন। আবুল মা আলী হামিদ আলী 'কাসেম বধ' 'সোরাব-রুস্তম' প্রভৃতি কাব্যে যে শক্তির পরিচয় রেখে গেছেন তা সম্যক আলোচিত হলে শক্তিমান মহাকাব্য রচয়িতারূপে তিনি স্বীকৃতি পাবেন। সুকবি জীবেন্দ্র কুমার দত্তের [১৮৮৩-১৯২৯] নাম আজো আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

চট্টলগৌরব শাহ বদিউল আলম এবং স্বনামধন্য মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, [১৮৭৫-১৯৫০] মুসলিম ঐতিহ্য সম্বন্ধে বইপত্র লিখে গেছেন। জ্যোতি সম্পাদক কালী শঙ্কর চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, প্রাবন্ধিক নলিনী কান্ত সেন [১৮৭৮-১৯২১], পটিয়ার জমিদার ষষ্ঠীবর মজুমদার, তাঁর ভ্রাতা 'কল্পনা-প্রসূন' রচয়িতা পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, 'ওমর ফারুক' রচয়িতা সাপ্তাহিক মোহম্মদী সম্পাদক নজির আহমদ চৌধুরী, টেরিয়াইলের মোহাম্মদ সফী চৌধুরী, কাট্টালীর মৌলবী তমিজউদ্দীন, চকরিয়ার আবদুল রশিদ সিদ্দিকী প্রমুখ ব্যক্তিগণও বাঙলা ভাষায় কিছু কিছু রচনা রেখে গেছেন। ফরোখ আহমদ নেজামপুরী, ফকির আহমদ, অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র সিংহ, হরি কৃপা চৌধুরী, কামাল উদ্দীন খান প্রভৃতি এক সময় সাহিত্য চর্চা করতেন। অনন্ত কুমার বড়ুয়া, জ্যোতিষ চন্দ্র কর, অম্বিকা দাস, হীরেন চৌধুরী, গোলাম ছোবহান প্রমুখের নামও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। আশুতোষ চৌধুরীর সংগৃহীত এবং রচিত গাথা এবং গীতিকাগুলো লোক-সাহিত্য শাখার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। তাঁর পুত্র সুচরিত চৌধুরী [জ. ১৯৩০] এখনকার একজন প্রখ্যাত গল্পকার। প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ [১৯২২–৭১] চট্টল গৌরব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল আলম, মাহবুব-উল-আলম, দিদারুল আলম, ওহিদুল আলম—এ চার ভাইয়ের নাম আপনাদের সবারই জানা আছে। তাঁদের চাচাতো ভাই কবি-নাট্যকার আবদুল মোনেম এবং আবদুস সালামও ছিলেন সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে মাহবুব-উল-আলম আধুনিক বাঙলা কথা-সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক। তাঁর 'মোমেনের জবানবন্দী' একটি অনবদ্য রচনা। আবুল ফজলের [১৯০৩–৮৩] নাম কে না জানে! তিনিও ছিলেন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম কথাশিল্পী এবং মননশীল প্রগতিবাদী প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী। 'বাঙলার পতন' নাটক রচয়িতা মুজাফফর আহমদ কৃতী নাট্যকার। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণামূলক অবদানের জন্যে পণ্ডিত সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' মুসলিম বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর জ্ঞান-মনীষার পরিচায়ক। আর প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর [১৯১৯-৫৪] 'প্রাচী' প্রভৃতি উপন্যাসে শক্তির স্বাক্ষর আছে। অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন [জ ১৯১৫] কম্যুনিস্ট কর্মী ও ধার, ঘুষ প্রভৃতি ১৫/১৬ খানা রাজনৈতিক রম্য রচনাগ্রন্থ লিখে জনপ্রিয় ও খ্যাতকীর্তি হয়েছেন। গণচেতনার কবি গীতিকার, কবিয়াল রমেশ শীলের [১৮৭৭-১৯৬৭] নাম বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।

আর যাঁরা আমাদের গৌরব গর্বের অবলম্বন হতে পারতেন, তাঁরা হয় ১৯৪৭ সনের পরে পশ্চিমবঙ্গে রয়ে গেছেন, নয়তো চলে গেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এখনকার প্রখ্যাত-খ্যাত-স্বল্পখ্যাত চট্টল সন্তানদের নাম এখানে অবিন্যস্তভাবে উল্লেখ করছি। জিজ্ঞাসু পাঠক-গবেষক সন্ধিৎসু চট্টল প্রেমী এতে কুঞ্চী পাবেন। ইতিহাসকার সতীশ চন্দ্র ঘোষ [১৮৮১-১৯২৯], গোমদণ্ডী বাসীকবি অম্বিকা চৌধুরী [জ. ১৮৯৯], মহামুনিবাসী কবি অমিতাভ বড়ুয়া [জ. ১৯২৬], লেখক-সাংবাদিক-কম্যুনিস্ট বিনোদ দাশগুপ্ত [জ. ১৯৩০], কবি-নাট্যকার অশোক বড়ুয়া [১৯২১-৭০], কবিতা-গল্প-উপন্যাস লেখক আহমদ ছফা [জ. ১৯৪৩], কবি মাহবুব আলম চৌধুরী, কবি ঔপন্যাসিক আইউব খান [জ. ১৯১৯], ফজল-পত্নী উমরাতুল ফজল প্রবন্ধকার রশীদ আল ফারুকী ওর্ফে খায়রুল বশর [১৯৪০-৮৮], গিরীশ বড়ুয়া বিদ্যাবিনোদ [জ. ১৮৯১], কবিয়াল চরিতকার নূরুল ইসলাম চৌধুরী [মৃ. ১৯৮৪], গল্পকার জহুরুল হক চৌধুরী, গল্প-নাটক লেখক জ্যোতির্ময় চৌধুরী [জ. ১৮৯৯] উর্দু গল্প-উপন্যাসের অনুবাদক জাফর আলম [জ. ১৯৪১], কবি ত্রিদিব দস্তিদার [জ. ১৯৫২], বিজ্ঞান বিষয়ে লেখক তপন চক্রবর্তী [জ. ১৯৪২], নিকুঞ্জ বিহারী চৌধুরী [জ. ১৯০৭], প্রখ্যাত কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা [জ. ১৯৪৯], ডক্টর মুহম্মদ ইব্রাহিম, কবি তুষার দাস [জ. ১৯৬২], প্রবন্ধকার নূরুল ইসলাম, কবি গল্পকার বিমলেন্দু বড়ুয়া [জ. ১৯৩৩], ঔপন্যাসিক বিপ্রদাস বড়ুয়া [জ. ১৯৪২], প্রাবন্ধিক মনোরঞ্জন দাশ [জ. ১৯৪২], প্রাবন্ধিক ভাষাবিজ্ঞানী মনসুর মুসা [জ. ১৯৪৪], ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া [জ ১৯৩৮], গল্পকার শহীদ সাবের [১৯৭১ সনে নিহত], কবি প্রাবন্ধিক লোকমান খান শেরওয়ানী [মৃ. ১৯৬৯], প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুল করিম, আরো যাঁদের নাম উল্লেখ্য তাঁরা হলেন আহমদ কবির, ডক্টর রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া [১৯৩০-৯০], সুজন বড়ুয়া, শিশির দত্ত, আবুল মোমেন, শামসুল আলম, আবুল মনসুর। আর যাঁর নাম বিশেষ করে আলাদাভাবে উল্লেখ্য তিনি হলেন চট্টগ্রামের সমাজ-সংস্কৃতি-লোকগাথা প্রভৃতির উপকরণ সংগ্রাহক, গবেষক ও গ্রন্থকার আবদুল হক চৌধুরী। [জ. ১৯২৩]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁদের নাম আমার অজ্ঞতার বা স্মৃতিশক্তির স্বল্পতার দরুন উল্লেখ করা গেল না, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : মনীষা মঞ্জুষা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮-৫৪।
২. ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস : রাজনীতি, সমাজ ও শ্রীচৈতন্য : শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ১৩৯৩ সন, পৃঃ ২৮৯-৯০।

শিখার প্রাণপুরুষ প্রগতিবাদী আবুল হোসেন
[১৮৯৬–১৯৩৮]

'শিখা' আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন আবুল হোসেন। তিনি সংস্কারক ছিলেন না, ছিলেন দ্রোহী। মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এ তাঁর পাশে এসে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মুখ্যত মুমীন এবং সমাজে পদস্থ ব্যক্তি। সাহসের কমতি এবং চেতনার সীমা থাকলেও তাঁদেরও ছিল মনীষা ও মনস্বিতা। তাঁদেরকে ও তাঁদের পরামর্শ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না বলেই আবুল হোসেন তাঁর নাস্তিক্যে ও দ্রোহে ছিলেন নিম্নকণ্ঠ, মুসলিম সমাজে তাঁর চিন্তা-চেতনা তাঁর উচ্চারিত তত্ত্ব ও তথ্য গ্রাহ্য করার জন্যেও ছিল এর প্রয়োজন। আবুল হোসেনের মননে-চিন্তনে মৌলিকত্ব থাকলেও তাঁর বাকভঙ্গি চমৎকৃত করবার মতো শিল্পসুন্দর ছিল না, তাঁর গল্প-নাটক প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্যমূলক রচনা হওয়ায় সেগুলো নকশার স্তর অতিক্রম করে শিল্পিত সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে কাজী আবদুল ওদুদের ভূতে-ভগবানে বিশ্বাস দৃঢ় থাকা সত্ত্বেও রামমোহনী-বঙ্কিমী যুক্তি প্রয়োগে কোরআন-হাদিসে মুসলিমদের আনুগত্য কুআচার ও লোকাচার মুক্ত করে বরং দৃঢ় করতেই চেয়েছিলেন। কাজী আবুল ওদুদ ছিলেন যথার্থ অর্থে সংস্কারক—নির্মাতা নন, মেরামতেই ছিল তাঁর আস্থা। তাঁর চিন্তা-চেতনা একটা সুনির্দিষ্ট স্ববাঞ্ছিত পরিসরে হয়েছে আবর্তিত। মহৎ ব্যক্তিত্ব পূজায় ছিলেন তিনি নিষ্ঠ। হযরত মুহম্মদ-রামমোহন-গ্যয়টে-রবীন্দ্রনাথ এবং অংশত জামাল উদ্দীন আফগানী ও সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর আদর্শ মানুষ ও বীরপুরুষ। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁর কোন সংশয় বা জিজ্ঞাসা ছিল না। তিনি ছিলেন নিরেট আস্তিক। এ মানুষ দিগন্তবিস্তারী মানস পরিভ্রমণে—সপ্রশ্ন জীবন ও জগৎ পরিক্রমার সাহস কিংবা আগ্রহ রাখে না। তাই তিনি বিশ্বাসের লাগাম, স্বসমাজের বন্ধন আর আদর্শে আকর্ষণ স্বীকার করেই মানুষকে শ্রদ্ধা, স্বসমাজকে উন্নত এবং স্বদেশকে সহিষ্ণুতায়-সহাবস্থানের যোগ্য করতে চেয়েছিলেন ভাবে-চিন্তায় কর্মে-আচরণে। সূচিত যথাশব্দ প্রয়োগে সংযত-সুন্দর বাক্যে উদ্দিষ্ট বক্তব্যের অভিব্যক্তি দানে তাঁর ছিল বিশেষ নৈপুণ্য। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন যথার্থই বাক্-শিল্পী। এ জন্যেই চিন্তা-চেতনার পরিসর নাতিবিস্তৃত ও অনুচ্চ হওয়া সত্ত্বেও শিখাগোষ্ঠীর প্রধানরূপে প্রতিভাত হলেন তিনিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের আর একজন ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। এদের সংস্পর্শে এসে প্রদীপ্ত যৌবনে তিনি বিশ্বাস-সংস্কারের বন্ধনমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সত্তার গভীরে জীবনের ও জগতের স্বরূপ অনুভব ও প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সে-সময়কার কয়েকটা রচনায় বিদ্যা-বুদ্ধি, মুক্তচিন্তা ও গভীর চেতনাজাত কিন্তু আশৈশবের সংস্কার নিরপেক্ষ কিছু উপলব্ধির স্বাক্ষর রয়েছে। পরবর্তী জীবেনে তিনি অন্তত প্রকাশের ওই সাহস আর দেখাননি, হয়তো মন-মতের দিক দিয়ে তিনিও শাস্ত্রমানা বিশ্বাসপুষ্ট মুসলিমই হয়ে গিয়েছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেনের ভাষা ও ভঙ্গি ছিল সুষম সুন্দর। কাজেই কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেই স্বসমাজে তিনি প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের কিংবা লেখকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর একজন মুক্তবুদ্ধি লেখক এঁদের শিখাগোষ্ঠীর না হয়েও এঁদেরই সমকালে কিছু দার্শনিক তত্ত্ব 'মানুষের ধর্ম' নামে নির্ভীক চিত্তে ললিত মধুর ভাষায় ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি মুহম্মদ বরকতউল্লাহ। এ যে উদ্ধত যৌবনেরই বেপরোয়া প্রকাশ মাত্র ছিল, তাঁর প্রত্যয়সিদ্ধ ছিল না, তাঁর পরিণত বয়সের নবী ইসলাম ও মুসলিম সম্বন্ধীয় বইপত্রই তার সাক্ষ্য।

আনোয়ারুল কাদির, আবদুল কাদির, আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ কেউই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রতীক শিখার শরীর কিংবা আত্মিক অস্তিত্ব জিইয়ে বা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। তাঁদের মন-মত পরিবর্তিত হয়েছিল, পরিহার করেছিলেন তাঁরা শিখাকেন্দ্রী চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-আচরণ। তাঁদের পরবর্তী জীবনের কৃতি, জীবনাচার ও আচরণই তার প্রমাণ। আকস্মিক মৃত্যুর শিকার না হলে তাঁর শিখা সম্পৃক্ত সঙ্গীদের মতো তিনিও বয়োধর্মে মত-পথ বদলাতেন কি-না আমরা জানিনে, তবে শিখা-গোষ্ঠীর মধ্যে কেবল তাঁরই ছিল দেশ-কাল-ধর্ম ও সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এবং সমাধানের প্রায় বাস্তব ও প্রকৃষ্ট কালোপযোগী উপায়-চেতনাও যে তাঁর ছিল, তা তাঁর রচনা পড়েই বোঝা যায়। দেশ-কাল-শাস্ত্র-সমাজ ও স্বসমাজের মানুষের বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত-শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্ণচেতনা নিয়ে এবং সর্বপ্রকার পূর্বলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার পরিহার করে স্বসমাজকে অশিক্ষার, দারিদ্র্যের, শোষণের, পীড়নের, লাঞ্ছনার ও কুপ্রথার কবলমুক্ত করার প্রবল ও ঐকান্তিক আগ্রহই ছিল তাঁর আন্দোলনের মূল প্রেরণা। শিক্ষার আলোবঞ্চিত কুসংস্কারপ্রবণ অজ্ঞতাদুষ্ট সম্পদরিক্ত সেদিনকার মুসলিম সমাজে হিতবুদ্ধি মানুষের বিরলতার দরুন তাঁর আহ্বান, তাঁর উচ্চারিত কল্যাণকর বাণী, তাঁর নির্দেশিত সর্বপ্রকার জুলুমমুক্তির পন্থা ক্বচিৎ গ্রাহ্য হয়েছে। আর আজ কালান্তরে তাঁর পরিবর্তিত ও অগ্রসর স্বসমাজে এসব বাণীর কার্যকরতা নেই বটে, কিন্তু এমন একজন দুর্লভ চরিত্রের ও মনীষার মনস্বী মানুষ রচনাবলী থাকা সত্ত্বেও যে স্বসমাজে বিস্মৃত-প্রায়, তার কারণ বোধ হয় তাঁর বাণী বাক্‌বিন্যাসে সুখপাঠ্য বা প্রত্যাশিতভাবে শিল্পসুন্দর নয় বলেই।

এঁদের সবাই মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিত্ব বলে প্রশংসিত বটে, কিন্তু এঁরা কেউ সমকালীন প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা গ্রহণে-বরণে সমর্থ ছিলেন না। এঁরা বহুজনহিত-বহুজন সুখবাদী বটে, কিন্তু সমকালে যেপথে মানুষের শোষণ-পীড়ন মুক্তি ঘটেছে, জীবনে জীবিকায় অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে, সেই সমাজবাদ বা সাম্যবাদ সমর্থন করতে পারেননি, এঁদের চিন্তাচেতনায় ছিল সংকীর্ণতা ও বদ্ধতা। তাঁরাতো সাধারণ ব্যক্তিত্ব, মানবদরদী বিশ্ববিখ্যাত মনীষীরা ও সমাজবাদীরা সাম্যবাদভীরু ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিও টলস্টয়, বার্ট্রান্ড রাসেল, বার্নার্ড শ, গোড়ার দিকে রোমা রঁলা, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল—এঁরা সবাই বিপ্লবভীরু ও সমাজতন্ত্রবিরোধী ছিলেন।

আবুল হোসেন ছিলেন দেশের মাটির ও মানুষের হিতকামী বিবেকবান পুরুষ। তাই তাঁর স্বল্পকালীন জীবন নিবেদিত ছিল স্বদেশের, স্বসমাজের ও স্বজাতির কল্যাণচিন্তায় ও হিতসাধনে। দেশ মানুষ, ধর্ম, ন্যায় ও কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-চেতনায় কিছু অনন্যতা ছিল।

ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে নবী-অবতার বা কৌম-প্রধান আরোপিত দেশ-কালোচিত কিছু নিষেধের সমষ্টি মাত্র। এ নিষেধসমষ্টি এক বিশেষ দেশ, কাল ও জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সৃষ্ট। তাই কালান্তরে, দেশান্তরে ও জনান্তরে তার প্রয়োজন ফুরায়। এবং তখন প্রবর্তকের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধার প্রভাবে ও সংস্কারবশে নিষ্প্রয়োজনে তাৎপর্যবিরহী নিরুদ্দিষ্ট আচারিক ও আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র মেনে চলে মানুষ। ফলে মোহগ্রস্ত বন্ধ্যামনের মানুষ স্বকালের, স্বদেশের, স্বসমাজের বাস্তব, জড়তার ও জীর্ণতার শিকার হয়। তখন ওই আচারিক শাস্ত্রও মেনে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে ধার্মিকের যান্ত্রিক জীবনেও দেখা দেয় অবচেতন বিদ্রোহ জীবন-জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনে। এর ফলে শাস্ত্রবিরোধী আচার-আচরণে আসক্ত হয় আনন্দ-ও বৈচিত্র্য সন্ধানী ভোগ-উপভোগ লিপ্সু মানুষ। লেখক তাই বলেন—'ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মানবজীবনকে তার সমস্ত শক্তির উৎকর্ষ দ্বারা সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন করে তোলা। এ জীবনকে তুচ্ছ করে কোন ধর্মসাধনাই সার্থক হতে পারে না। যে ধর্ম মনুষ্যের এই বিপুল জীবনের সম্পদ ও শ্রীকে বিকশিত করতে সাহায্য করে না, সে ধর্ম মিথ্যা এবং তার পূজা মানুষকে অধঃপতনের চরমে নিয়ে যায়।' (আদর্শের নিগ্রহ, পৃঃ ৭০) বলাবাহুল্য আবুল হোসেনের ধর্মে বিশ্বাস সন্দেহাতীত ছিল না। তিনি আস্তিকদের ভয়েই ধর্মে আস্থা প্রকাশ করেছেন।

AMARBOI.COM

এ জন্যেই অতীতের প্রতি মোহবশে, সংস্কারের প্রভাবে শাস্ত্রের তথা নবী-অবতারের আদেশ বা উপদেশ-নিষ্ঠাকে তিনি জীবনবিরোধী আত্মবিনাশী বিশ্বাস ও আচার বলে অভিহিত করেছেন। তাই লেখক বলেছেন, 'অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামও কতকগুলি আদেশ ও নিষেধের সমষ্টি মাত্র। ... ইসলাম মানুষের জন্য, মানুষ ইসলামের জন্য নয়।... কালের পরিবর্তনে অবস্থার বিপর্যয়ে ধর্মশাস্ত্রের কথা মানুষ পুরোপরি পালন করতে পারে না।' এবং যেহেতু 'সংসারের উন্নতির জন্যই মূলতঃ ধর্মবিধানের সৃষ্টি' সেহেতু 'ধর্মগুরুর আদেশের নিগ্রহ হতে মুক্তি না পেলে মুসলমান তো মানুষ হবেই না, বরং ইসলামও কেবল dead letter হয়েই থাকবে।' কারণ দেশ-কালের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যে-ধর্মবিধিসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল, তা কখনো সনাতন হতে পারে না। তিনি এ-ও জানেন 'ভয়, দুর্বলতা ও অজ্ঞতা, এই তিনটি মনোভাব এই ধর্ম বিশ্বাসের জননী।' তাই 'যে জাতি যত আদিম প্রকৃতিবিশিষ্ট সে তত (ধর্ম) অনুষ্ঠান প্রিয়।' 'মানুষের প্রকৃতি জিনিসটি ধর্মগুরুর-বুদ্ধি-অনুভূতি প্রসূত হুকুমের চেয়ে অনেক বেশি সত্য' বলেই মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে পুরোনো শাস্ত্র-দ্রোহী হয়ে সমকালের স্বদেশের স্বকালের স্বসমাজের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে চাহিদা মিটিয়ে সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে প্রবহমানতা বজায় রেখে মানব প্রগতিকে টিকিয়ে রেখেছে। 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধে আবুল হোসেন এ আদেশের নিগ্রহমুক্ত মানুষের জন্যে—বিশেষ করে স্বদেশী মুসলিমের জন্যে পীর-কবর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরগাহ প্রভৃতি নিষ্ফল পৌত্তলিকতা বর্জিত সমাজ মুসলিমদের জন্যে তিনি কামনা করেছেন–, 'স্থিরবুদ্ধি, বিশাল চিত্ত, সংস্কারমুক্ত, বিপুল স্নেহ এবং অন্যের অধিকার দানে মুক্ত হস্ত' ব্যক্তিত্ব। এমনি গুণেই 'আবার মুসলমান জয়যুক্ত হবে—এবার তরবারি দ্বারা নয়—শ্রদ্ধা দ্বারা; জুলুম দ্বারা নয়, প্রীতি দ্বারা; শারীরিক বল দ্বারা নয়, চিত্তের আনন্দ ও মনের বল দ্বারা। (নিষেধের নিগ্রহ, পৃঃ ৩৮)

'অতীতের মোহ' প্রবন্ধে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মপ্রসারের প্রবৃত্তির প্রাবল্য স্বীকার করে আবুল হোসেন বলেন, 'এ আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহই মানুষকে করেছে সৃষ্টিশীল। এ সৃষ্টিশীলতাই মানুষের ইতিহাস, এর থেকেই সভ্যতার সৃষ্টি ও বিকাশ। সৃষ্টিশীলতার মূলে রয়েছে মানুষের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা; আবার এ ইতিহাস বা ইতিহ'ই তার মধ্যে জাগিয়েছে ঐতিহ্যপ্রীতি।' পূর্বপুরুষের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অতীত কৃতির গৌরব-গর্ব উত্তরপুরুষদের করে পিতৃধনে ধনী পুত্রদের মতো নিরাকাঙ্ক্ষ্য ও নিষ্ক্রিয়। এ অতীতমোহ তাদেরকে স্বকালের স্বদেশের স্বজনের ও স্বজীবনের বাস্তব প্রয়োজন সম্বন্ধে করে উদাসীন ও অজ্ঞ। ফলে ব্যক্তিক, সামাজিক, আর্থিক নৈতিক জীবনে নেমে আসে অবক্ষয়।

এ অতীতপ্রীতি ভারতবর্ষে তথা লেখকের সমকালীন বাঙলায়ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু-মুসলিমের এ অতীত ঐতিহ্যমুখিতাই ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের উৎস। হিন্দু মাত্রেই হিন্দু ঐতিহ্যের ধারক-বাহক রূপে স্বতন্ত্র সত্তা, স্বার্থ ও ঐতিহ্য সচেতন, তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিমরাও তেমনি আরব-ইরান ও মধ্য এশিয়ামুখী। দুই পক্ষই স্বদেশের স্বকালের মানুষেব বাস্তব সমস্যা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন। ফলে ব্রিটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সমস্যা গভীর, ব্যাপক ও অসমাধ্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত হিন্দু কেবল 'হিন্দু' হবার সাধনা করছে, মুসলিমও তেমনি আগে মুসলিম পরে ভারতীয় হবার আস্ফালনে মেতেছে। ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘু বলে এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা গৌণ, সংখ্যায় বেশি ও শক্তিতে প্রবল হিন্দুরই উচিত ভারতীয় হবার ও সবাইকে ভারতীয় করার দায়িত্ব নেয়া। এ জন্যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের গর্ব এবং স্বতন্ত্র সত্তা, স্বার্থ ও সংস্কৃতি চেতনা বর্জন করে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে দৈশিক জীবনের, জীবিকার ও রাজনীতির, সংস্কৃতির ও অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার, সহাবস্থানের ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে যৌথ-প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন লেখক। আবুল হোসেনের মতে অতীতমোহ পরিহার, বর্তমানের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিদান এবং ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নই য়ুরোপকে উন্নত ও প্রাগ্রসর করেছে। ভারতবাসীর তথা বাঙালীরও উন্নতির পথ ও পাথেয় এ-ই।

আবুল হোসেন 'তরুণের সাধনা' প্রবন্ধে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ও শিক্ষার আদর্শগত ত্রুটির বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এখনকার দিনে চাকরীর যোগ্য করার ও হওয়ার লক্ষ্যেই শিক্ষা দান ও গ্রহণ করার নীতি চালু হয়েছে। এ কারণেই লেখকের ভাষায় 'আধুনিক বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। বিশেষত অনগ্রসর মুসলিম ঘরের সন্তানেরা ছোটখাটো চাকরী পাবার আশায় শিক্ষা গ্রহণ করে, বাস্তবে বেকার থেকে 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এখন (লেখকের সমকালে) অনেকেই সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহ বোধ করে না।' তাঁর মতে 'যে-শিক্ষা হৃদয় প্রশস্ত করে না, বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না, চিত্তকে মার্জিত করে না, – সংস্কার হতে মুক্তি দেয় না, সে-শিক্ষা জাতির প্রাণ বিনাশ করে।' [শিক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা] লেখকের মতে 'শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে— মানুষকে এই সুন্দর ভুবনে কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যপুষ্ট জীবন যাপনে শক্তিমান ও নানা দৃষ্টিক্ষম করে তোলা।' –মানুষের জীবনে চাই সুরুচি, সৌন্দর্য, সম্পদ, প্রেম, শক্তি ও স্রষ্টাকে উপলব্ধি করবার প্রকৃষ্ট জ্ঞান।

যে শিক্ষা মানুষকে এ সমস্ত দিতে পারছে না, সে শিক্ষা নিরর্থক '... মানুষ মাত্রকেই শিক্ষালাভ করতে হবে ... এমন শিক্ষা যাতে করে সে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষম হতে পারে।' এ সূত্রে তিনি আদর্শ শিক্ষকের চরিত্রে কি কি গুণ থাকে, স্বদেশী আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রত্যেক ছাত্রকে জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিতে পরিপুষ্ট করে তোলা দরকার।' এবং স্মরণ করেছেন রাজা রামমোহন রায়কেও, যিনি দেশবাসীকে বলেছিলেন 'ব্রিটিশের আমলে তোমরা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনকে আয়ত্ত কর... অতীতের শাস্ত্র-কঙ্কালের পূজা ছেড়ে দাও।' আবুল হোসেন তাঁর সমকালীন শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটে অভিশাপের কথা বলেছেন : ১. বাইরের উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়ায় তরুণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ও মানসিক চাঞ্চল্য। ২. অতীতের অন্ধমোহ; আজকাল কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয়েই তাদের অতীতের ইতিহাসের পানে তাকিয়ে বর্তমানের অক্ষমতা ও দৈন্যের দারুণ লজ্জাকে ঢেকে রাখছে। ৩. আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কার-ধারণা ও তজ্জাত আমাদের ধাত। হিন্দু মুসলমানের ধারণা ও সংস্কার পৃথক। লেখকের মতে হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টান প্রভৃতি জাতির সমন্বয় সাধন করতে হবে, সবাইকে "আজ ভুলে যেতে হবে দুটি কথা 'হিন্দু ও মুসলমান।' আমাদের শক্তি অর্জনে মন দিতে হবে। সে শক্তি লাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞান। শক্তি না হলে কোন মুক্তিই সম্ভবপর হয় না, কাজেরও হয় না।"

আবুল হোসেনের এ আদর্শ শিক্ষা স্বপ্ন, মনন-প্রসূন নয়, মধুর কল্পনাজাত, সুন্দর জীবনাকাঙ্ক্ষার আবেগ-উদ্বেলিত।

আবুল হোসেন চিন্তা-চেতনায় ছিলেন মানববাদী, তাই তিনি অসাম্প্রদায়িক, উদার, শ্রেয়োবাদী ও হিতবাদী এবং দৈশিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম মিলন-কামী ও গণহিতে মিলিত প্রয়াসকামী। নিরঙ্কুশ প্রীতিই এ বন্ধনসূত্র ও মিলনসেতু।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যুগ ও জীবন
[১৮৮৫-১৯৬৯]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। সে-সময়টা সাধারণভাবে বাঙালী মুসলিম জীবনে আঁধার যুগ। অজ্ঞতার, দীনতার ও হতাশার এ যুগ ও যুগপ্রভাব বুঝতে হলে আমাদের একটু অতীতে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে।

তুর্কীদের বাঙলাবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর নিরাকার একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য, যোগ্যতানুসারে কর্মনির্বাচনের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি জন্মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত, ঐহিক জীবনে বিদ্যা-বিত্ত ও মানবিক মান-মর্যাদাবঞ্চিত নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষের মধ্যে বঞ্চনার যে-ক্ষোভ জাগায় এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থা আত্মপ্রত্যয়ীর জীবনে আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যে-সম্ভাব্য পথের দিশা দেয় এবং নতুন প্রত্যাশা জাগায়, তা-ই তাদের ইসলাম বরণে করে উদ্বুদ্ধ। তবু সেকালে গাঁয়ে-গঞ্জে দীক্ষিত মুসলিমের স্বপ্রতিষ্ঠ সমাজ গড়ে ওঠার মতো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে মোটামুটি তেরো-চৌদ্দ ও পনেরো শতকের প্রথমার্ধ লেগে যায়। ইসলামে তারা দীক্ষিত হয় বটে, তাদের সন্তানও মুসলিম নামে পরিচিত হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রটি তেরো নদীর ওপারের হওয়ায়, ভাষাটাও অজ্ঞাত থাকায় এবং বিশেষ শাস্ত্রীর কাছে নয়—দরবেশের হাতে দীক্ষিত হওয়ায়, শরীয়তে বাঞ্ছিত জ্ঞান ষোল শতকের শেষার্ধের পূর্বে অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাঙলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাস এ সাক্ষ্যই বহন করে। উল্লেখ্য যে শূদ্রসেব্য বর্ণহিন্দুরা ইসলাম বরণ করলে আচণ্ডালে কোল দিতে হবে বলে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৈষয়িক শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হারাতে হবে বলে স্বার্থবশেই স্বধর্মে সুস্থির ছিল। তাঁদের ইসলাম ভীতি অনেকটা একালের পুঁজিবাদীদের কম্যুনিজম ভীতির মতোই ছিল।

শিল্প বিপ্লবের মতো কিছু ঘটেনি বলে কিংবা হাতিয়ারের উৎকর্ষ ও পরিবর্তন হয়নি বলে ধর্মান্তরের ফলে তাদের বৃত্তি-বেসাতগত জীবনেও আসেনি কোন পরিবর্তন। কাজেই দীক্ষিত জনেরা কেবল ঘৃণ্য অচ্ছুত হবার অপমান থেকেই মুক্তি পেয়ে স্বস্তি-সুখ লাভ করেছিল। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে মুসলিম হয়েছিল বলে তাদের লেখাপড়ার কোন ঐতিহ্য ছিল না, আর পেশান্তর ঘটেনি বলে আর্থিক জীবনেও কোন সচ্ছলতা আসেনি, ফলে তাদের মানসিক-সাংস্কৃতিক জীবনও রইল পুরোনো দেশজ আচারে-সংস্কারে নিবদ্ধ। তবু কেউ কেউ সন্তানকে ষোল শতক থেকে বাঙলা-আরবী ফারসী শেখাতে থাকে। তাদের সন্তান মুনশী-মোল্লা-মুয়াজ্জিন-মৌলবী-উকিল-কাজী-আমিন এমনকি ফৌজদারও হয়েছিল বটে, তবে সে যুগে একালের মতো শিক্ষিত লোকের চাকরির ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল না বলে আর্থিক প্রেরণাহীন নির্লক্ষ্য শিক্ষা দানে ও গ্রহণে আগ্রহ ছিল না মানুষের। সে-যুগ ছিল ব্রাহ্মণাদি বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও শিক্ষাবিরলতার কাল। সেকালের নিম্নমানের স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজে মুদ্রার প্রয়োজন ও প্রচলন ছিল কম। ধান-চাল, তেল-নুন, মাছ-তরকারি, হাঁড়ি-বাসন আর গৃহনির্মাণ সামগ্রী মিলত এবং ঘরে তৈরি সুতায় কাপড় বুনানো চলত শ্রম ও পণ্যবিনিময় মাধ্যমে। গাঁয়ের মানুষের ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনের চাওয়া-পাওয়া এখানেই শেষ। তাদের ঐহিক জীবন ছিল এতেই সীমিত।

তুর্কী-মুঘল আমলে প্রশাসনকেন্দ্রে ও থানায় থাকত প্রশাসক সেনা-সেনানী। আর বিচার বিভাগে থাকত মুসলিম কাজী। তারাও থাকত ইকতায় কসবায় থানায়। রাজস্ব আদায়ের দেওয়ানি ব্যবস্থা, ভূমি প্রশাসন, পঞ্চায়েত প্রভৃতি ছিল গ্রামে গ্রামে সংখ্যাগুরু ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের হাতে। কাজেই গ্রামীণ মুসলিমরা ছিল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ হিন্দুর হুকুম-হুমকি-দলন-দমনের পাত্র। আগেই বলেছি গাঁয়ের মুসলিমরা ছিল সাধারণভাবে অজ্ঞ-অনক্ষর-দরিদ্র শ্রমজীবী ও সামান্য আয়ের বৃত্তিজীবী মানুষ—জুলহা, নিকেরী, মুলুঙ্গী, কৈবর্ত, কামার, কুমার, চাষী-মজুর আতরাফ বা আজরাফ। কাজেই জমিদার-মহাজন সদাগর-চাকুরে-চিকিৎসক প্রভৃতি সবাই ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ। অতএব তুর্কী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুঘল আমলেও গাঁয়ে গাঁয়ে ধন-মান, বিদ্যা-বুদ্ধি, বৃত্তি-বেসাত, শাসনক্ষমতা তথা প্রতাপ-প্রভাব ছিল হিন্দুদেরই। স্বজাতি বলে তুর্কী-মুঘলগোষ্ঠীর কৃপা-করুণা তারা পায়নি। ব্রিটিশ আমলের দেশজ গ্রামীণ খ্রীস্টানদের মতোই ছিল দেশজ গ্রামীণ মুসলিমদের অবস্থা ও অবস্থান। চণ্ডীমঙ্গলে ও মনসামঙ্গলে এর আভাস মেলে।

ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই ইরানীর, মুঘলের ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য গোত্রের লোকের সেনাবাহিনীর এবং প্রশাসন ও বিচার বিভাগের চাকরি গেল। এক কথায় শাসকগোষ্ঠী জীবিকাচ্যুত হল। অনেকে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল, যারা রইল তারা কোলকাতায়-মুর্শিদাবাদে ইংরেজ সহযোগী-সহকারী রূপেই থাকল। গাঁ-গঞ্জের মুসলিমদের সঙ্গে কোলকাতা-মুর্শিদাবাদের উর্দুভাষী লোকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। অথচ ধনী-মানী ও শিক্ষিত বলে এ উর্দুভাষী বাঙালীরাই বাঙালী মুসলিমদের অজ্ঞাতে তাদের হয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে ইংরেজের প্রশাসনে পরামর্শদাতা হিসেবে।

প্রথমত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজার তথা সাধারণ মানুষের জান-মাল-গর্দানের মালিক হয়ে বসল জমিদার। চাষী ও অন্যান্য গ্রাম্য বৃত্তিজীবীরা পরিণত হল প্রায় ভূমিদাসে। তারপর গ্রামীণ মানুষের স্বনির্ভর জীবনে বৃত্তি-বেসাতের ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে শুরু হল উপদ্রব ও উপপ্লব। একচেটে বহির্বাণিজ্যলোভী বেনে ইংরেজ কোম্পানী এদেশের লবণ, সুতা, কাপড় ও রেশম ব্যবসায় একচেটে করে নিল। ফলে বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত সমাজে নিম্নমানের বৃত্তিজীবীদের দেখা দিল জীবিকাসঙ্কট। গোটা দেশে রফতানি কমল, আমদানি বাড়ল, বৃদ্ধি পেল নিঃস্ব নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের সংখ্যা। বাড়ল ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মহামারী কবলিত মানুষের মৃত্যুহার।

এ অবস্থা যখন চরমে, তখন ওয়াহাবীদের এবং কিছু পরে ফরায়েজীদের আহ্বানে মুসলিমরা ইসলামের নামে ব্রিটিশ বিতাড়ন যুদ্ধে নামল মধ্যযুগীয় বিদ্যা-বুদ্ধি ও মত-পথ সম্বল করে। এবং উত্তেজিত নিরুপায় অজ্ঞ অনক্ষর গ্রামীণ মানুষ বাঁচার তাগিদেই শেষ চেষ্টা হিসেবে জান-মাল কবুল করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জমিদার-মহাজন শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আর্থিক সাচ্ছল্যের প্রত্যাশায়।

ওয়াহাবী-ফরায়েজী ও সিপাহী আন্দোলনের অসাফল্যে অবসান ঘটে ১৮৬০ সনের দিকেই, যদিও নানাভাবে এর জের চলেছিল ১৮৭১ সন অবধি। মুসলিমরা যখন তিন তিনটে দ্রোহের ও প্রয়াসের ব্যর্থতায় অবসন্ন, তখন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান, জামাল উদ্দীন আফগানী প্রভৃতির প্রেরণায় ও প্রচারণায় এবং ইংরেজ সরকারের উৎসাহে বাঙালী মুসলিমরা ইংরেজ ও ইংরেজী প্রীতির আর হিন্দুভীতির অনুশীলন করতে থাকে। আগেই অবাঙালীদের বংশধরেরা কোলকাতায় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে। এমনকি ১৮৬১ সন থেকে মুসলিম সন্তানেরা বি. এ., বি. এল ও এম. এ. পাস করতে থাকে দু'চার জন করে।

এবার সৈয়দ আহমদ খান, আবদুল লতিফ, আমীর হোসেন, সৈয়দ আমীর আলি প্রমুখ উর্দুভাষীর প্রেরণায় এবং কোলকাতার মুসলিম-প্রকাশিত সাময়িক পত্রের প্রচারণায় সচ্ছল গৃহস্থরা-যাদের পরিবারে বিশেষ করে বাঙলা-আরবী-ফারসী শিক্ষার সামান্য ঐতিহ্য ছিল তারা-সন্তানকে ইংরেজী শিক্ষা দানে আগ্রহী হল। কিন্তু হিন্দু-বিরল এলাকায় স্কুলের অভাবে শিক্ষার প্রতিবেশে ও পরিবেশের অনুপস্থিতির দরুন যত শিক্ষার্থী স্কুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল, তাদের মধ্যে কৃচিৎ কেউ উচ্চশিক্ষা পেল, অর্থাৎ প্রবেশিকা বা উচ্চতর পরীক্ষায় কম শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হল। তাই বিশ শতকের গোড়ার দিকেও এক একজন মুসলিম যুবকের উচ্চ শিক্ষা ও চাকরি প্রাপ্তিতে মুসলিম সমাজ আশ্বস্ত ও গরিমা বোধ করত।

আমরা জানি, প্রশাসনের বাহন করার কল্পনাও যখন সরকারের মনে জাগেনি, তখন থেকেই কোলকাতার ও তার চারপাশের দূর বিস্তৃত অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা সন্তানদের ইংরেজী শেখাতে থাকে। ফলে ওইসব অঞ্চলেই শিক্ষিতের, চাকুরের ও ধনীর সংখ্যা অভাবিতভাবে দ্রুত বেড়ে যায়। বাঙলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে শিক্ষার প্রসার হতে সময় লেগেছে, এ ক্ষেত্রে বিক্রমপুরই কেবল ব্যতিক্রম।

এভাবে ইংরেজী অশিক্ষিত নির্জিত বাঙালীর মধ্যে জমিদাররূপে আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে, উনিশ শতকের গোড়া থেকে বেনে-ফড়ে-দালাল-দেওয়ান-গোমস্তা হিসেবে, চতুর্থ দশক থেকে ডেপুটি-মুনসেফ-দারোগারূপে এবং ষষ্ঠ দশক থেকে ইংরেজী জানা উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-ঠিকাদার-দোকানদার-কেরানি-বেয়ারারূপে কোম্পানি-সরকারের ও কোম্পানি-কর্মচারীর লুটের অবশিষ্ট দেশের অভ্যন্তরস্থ যা কিছু অর্থ-সম্পদ থাকল, তা গেল বর্ণহিন্দুদের ভাগে। আর ইংরেজী শিক্ষার অভাবে উনিশ শতক, বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষার্ধ হচ্ছে বিদ্যায় ও বিত্তে রিক্ত মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের, দুর্ভোগের ও দুর্দশার যুগ।

তখন মুসলমানমাত্রই চোখ মেলে বাড়ির আঙিনায়-গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে সর্বত্রই দেখল—জমিদার হিন্দু, মহাজন হিন্দু, সদাগর হিন্দু, শিক্ষক হিন্দু, চিকিৎসক হিন্দু, উকিল-মোক্তার হিন্দু, অফিসে চাকুরেও হিন্দু আর কুলি-মজুর-ভিখিরী ছাড়া রাস্তা ঘাটে কোথাও সচ্ছল শিক্ষিত মুসলিম খুঁজে পাওয়া যায় না সহজে। কাজেই তারা ভাবল, তাদের দুরবস্থার জন্যে, নিঃস্বতার জন্যে দায়ী বর্ণহিন্দুরাই। ফলে তাদের বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ মনে জাগল হিন্দুবিদ্বেষ। ইংরেজরাও তাল দিল, উত্তেজনা জাগাল— অনুগত রাখার সহজ উপায় হিসেবে, যেমনটি গোড়ার দিকে তুর্কী-মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা জাগিয়ে অনুগত ও কৃপাধন্য করেছিল হিন্দুদের।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোবঞ্চিত সে-যুগের মানুষেরা বাস করত বিশ্বাস-সংস্কারের জগতে। তারা ছিল নিয়তিবাদী, ঐশীশক্তির কৃপা-করুণা, দয়া-দাক্ষিণ্যকামী, পুরুষকারে আস্থা ছিল না তাদের, তাই আস্থা ছিল না যোগ্যতায় বা সামর্থ্যেও। জীবনে শাস্ত্রের তথা শরীয়তী ইসলামের রূপায়ণই পতন ঠেকানোর, ঐহিক দুর্ভাগ্য রোধের ও উন্নতির উপায় বলে জানল ও মানল তারা। ফলে বৌদ্ধ-হিন্দু ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া আচার-সংস্কার পরিহারে, জীবনাচারে শরীয়তী ইসলামের রূপায়ণে, মুসলিম-সত্তার স্বাতন্ত্র্য-চেতনার উজ্জীবনে এবং জীবিকাক্ষেত্রে বৃত্তি-বেসাতে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুবিদ্বেষেই আত্মোন্নয়ন সম্ভব বলে মনে হয়েছে তাদের। এভাবে গত দু'শ বছর ধরে বাঙালী মুসলিমদের বাঙালীত্ব ঘুচিয়ে দেশকালহীন কেবল আদর্শিক ও বৈশ্বিক মুসলিমত্ব অর্জনের প্রেরণা-প্রবর্তনা দিয়ে এসেছে ওয়াহাবী-ফরায়েজী আলেমরা ও ইংরেজী শিক্ষিত নেতারা। এমনকি ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের প্রভাবে উনিশ শতকের শেষ পাদে জনাব আলি, মালে মুহম্মদ, আবদুল আজিজ, সমির উদ্দীন প্রমুখ শায়েরও দোভাষী পুঁথির মাধ্যমে এসব তত্ত্ব প্রচার করেছেন সারাদেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.

বাঙালী মুসলিমদের মন-মত যখন উক্ত সব চেতনা চালিত, তখন ১৮৮৫ সনে শহীদুল্লাহর জন্ম। মুসলিমদের আচারে সংস্কারে এ বাঙালীত্ব ঘুচিয়ে স্বতন্ত্র সত্তা সচেতন শরীয়তপন্থী আদর্শ মুসলিম বানানোর কালে বিদেশাগত পীর গোরাচাঁদের বংশধর ও গ্রামের পীরের দরগাহর খাদেম বংশজ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণকালেই স্বজীবনে ইসলামের আক্ষরিক রূপায়ণে ছিলেন নিষ্ঠ। তাই আরবী-ফারসী-উর্দু শিখেছেন ও কেতাব পড়েছেন সাগ্রহে, ইসলামকে জানবার-বোঝবার জন্যেই।

হিন্দুরা যেমন ইংরেজী শিখে জাতীয়-চেতনায় কেবল হিন্দু হল, হৃতস্বার্থ মুসলিমরাও কেবল মুসলিম থাকতে চাইল, আর সব চেতনা হল অপ্রধান। হিন্দুরা যেমন উর্দু ভাষায় মুসলিম-কথার আধিক্য দেখে উর্দু ভাষা ও হরফ বর্জন করল, মুসলিমরাও বাঙলায় হিন্দুর কথা ও হিন্দুর রচনা দেখে বাঙলাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণে দ্বিধা করল। হিন্দুরা যেমন হিন্দুর ইতিবৃত্ত নিয়ে লিখল, মুসলিমরাও তেমনি উনিশ শতকে আরব-ইরান-ইরাক-স্পেন ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম কাহিনীকেই তাদের রচনার বিষয় করল। বস্তুত এ সময়ে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিবেশী হলেও দুটো পৃথক মানসজগতে বাস করত।

শহীদুল্লাহর জন্ম সনেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। তাঁর কৈশোর কালেই মুসলিমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে পৃথক-প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন দাবি করছিল, আর তাঁর নব যৌবনেই ১৯০৬ সনে মুসলিমদের স্বতন্ত্র-সত্তার, পৃথক জাতীয়তার ও ভিন্ন স্বার্থের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম লীগ। অতএব মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দেহ-মনের গঠন ও বিকাশ কালে মুসলিমরা ছিল দেশকালহীন কেবল মুসলিম, বড় জোর মুসলিম বাঙালী, —বাঙালী মুসলিম নয়। স্বয়ং শহীদুল্লাহও ছিলেন সারাজীবন সবকিছুর আগে ও উপরে শাস্ত্রানুগত মুসলিম। তাই জীবনে তিনি ওয়াজ করেছেন, পীরালি করেছেন, কোরআন অনুবাদ করেছেন, হাদিস সংকলন করেছেন, আর লিখেছেন ইসলামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গ। অনুবাদও করেছেন আরবী-ফারসী-উর্দু সাহিত্য, ইংরেজী-ফরাসী নয়। শাস্ত্রের অনুসরণে ইসলামের নিষ্ঠ অনুধ্যানেই কেটেছে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সারাটা জীবন।

ইংরেজী শিক্ষিতরা চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষবশে মুসলিম লীগ সমর্থক। কিন্তু মৌলবীরা অনেকেই ছিলেন স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসপন্থী। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রকাশ্যে কোন দলেরই সমর্থক ছিলেন না। তবে পাকিস্তান প্রাপ্তিতে খুশি হয়েছিলেন।

আবাল্য তিনি স্বশাস্ত্রনিষ্ঠ সৎ সংযমী পুরুষ ছিলেন। সততা ও আদর্শ নিয়ন্ত্রিত মানুষ সাধারণত সরল বুদ্ধির ও বৈষয়িক জীবনে ন্যায়নিষ্ঠ হয় আর বিশ্বাস-সংস্কারের ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে হয় নিয়ম-নীতির ও রীতি-পদ্ধতির অনুসারী। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবনে এসব চারিত্র্যলক্ষণ আমৃত্যু অবিরল ছিল। সারাজীবন বিশ্বাসের যুগে ও বিশ্বাসের জগতে তিনি বাস করেছেন, জ্ঞানী ও বহুদর্শী হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তির যুগ ও যুক্তির জগৎ সতর্কভাবে পরিহার করে চলেছিলেন। এ জন্যেই সেকালের লেখক-সংঘ-আয়োজিত তাঁর সংবর্ধনা সভায় পরম পরিতৃপ্ত চিত্তে তিনি তাঁর প্রতি ভাষণের শুরুতেই উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে আল্লাহ আমাকে মুসলমান করে সৃষ্টি করেছেন।'

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদুল্লাহর ছিল মেধা, ছিল অশেষ জীবনতৃষ্ণা। তৃষ্ণা তাঁকে বিদ্যার বিভিন্ন দিকে প্রলুব্ধ করেছিল, ফলে বাস্তব প্রয়োজনের পাঠ্যবইয়ে জাগিয়েছিল ঔদাসীন্য। এ কারণেই স্কুলে-কলেজে তিনি শিক্ষার্থী হিসেবে কৃতী ছিলেন না। তবু অর্জিত জ্ঞান পরিণামে তাঁকে ধনে-মানে-যশে অধিকার দিয়েছিল। স্বশাস্ত্রনিষ্ঠা আর শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁকে জনগণের প্রিয় করেছিল। বিদ্বান হিসেবে বিদ্বৎ-সমাজে শহীদুল্লাহর যত কদর, তার চেয়ে সহস্রগুণে বেশি আদর ও খ্যাতি ছিল তাঁর গাঁ-গঞ্জের, শহর-বন্দরের সাক্ষর-নিরক্ষর মুসলিম জনসমাজে। তাঁর বিদ্যা ও বাঙলা ভাষা-সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান-গবেষণা যাদের নাগালের বাইরে অর্থাৎ তাঁর বিদ্যার পরিধি ও জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে কিছু মাত্র ধারণা ছিল না বা নেই যাদের, তাদের কাছেই তিনি ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক, বহুভাষাবিদ ও প্রাচ্যের জ্ঞানতাপস এক মহাপুরুষ। ভক্তের ও নিন্দুকের মুখে কিংবা লেখায় ব্যক্তির চরিত্রচিত্র নিরাপদ নয়—অতিরেকদুষ্ট। আসলে একজন যথার্থ পণ্ডিত সমাজে যতদূর প্রতিষ্ঠা পান, যতটুকু সম্মানের দাবিদার হন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর চেয়ে অনেক বেশি মান-মর্যাদা ও আদর-কদর লাভ করেছেন। এর কারণ রয়েছে।

এ শতকের ত্রিশোত্তর কালে অর্থ-সম্পদ বঞ্চিত শিক্ষিত মুসলিমরা আর্থরাজনীতিক স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের জিগির তোলে। ফলে সবক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলিমের অবস্থানও দ্বান্দ্বিক ও সংঘাত-সঙ্কুল হয়ে ওঠে। তখন বৈষয়িক, নৈতিক ও যৌক্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে অর্থে-বিত্তে-শিক্ষায়-সম্মানে-সংখ্যায় লঘু মুসলিমরা তাদের সত্তার স্বাতন্ত্র্যের, ঐতিহ্যের পার্থক্যের, জীবন-চেতনার ভিন্নমুখিতার প্রমাণ ও গৌরব-গর্বের অবলম্বন স্বরূপ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে হিরো বা নায়ক সন্ধানী হয়ে ওঠে। এভাবেই হিন্দুর গান্ধী, মুসলিমের জিন্নাহ, হিন্দুর মহাত্মা, মুসলিমের কায়েদে আজম, হিন্দুর রবীন্দ্রনাথ, মুসলিমের ইকবাল/নজরুল, হিন্দুর গান্ধী টুপী, মুসলিমের জিন্নাহ টুপী, হিন্দুর অবনঠাকুর, মুসলিমের চুঘতাই আবেদীন, হিন্দুর সত্যেন বোস, মুসলিমের কুদরৎ-ই-খোদা, হিন্দুর বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিমের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দুর বিশ্বভারতী, মুসলিমের জামিয়া মিল্লিয়া, হিন্দুর বোস-মুখার্জি, মুসলিমের ফজলুল হক-নাজিম উদ্দীন, হিন্দুর সুনীতি চাটুজ্যে, মুসলিমের শহীদুল্লাহ—এমনি ধরনের তুলনায় ও গুণী-মানী আবিষ্কারের নেশার ঘোরে মধুসূদনের পাশে কায়কোবাদ, বঙ্কিমের পাশে মীর মশাররফ হোসেন, হেমচন্দ্রের পাশে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বিদ্যাসাগরের পাশে মহসিন প্রভৃতির গুণ-মান-মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হল ত্রিশোত্তর ব্রিটিশ আমলের, পাকিস্তান যুগের এবং একালের বাঙলাদেশে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামে উপর্যুক্ত কালিক মানস-পরিমণ্ডলের প্রভাবে হল-কলেজ-চেয়ার-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদুনাথ সরকার কিংবা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার অথবা সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতির কলকাতায় এমনি সম্মানপ্রাপ্তি কল্পনাতীত। কিন্তু জ্ঞান-অভিজ্ঞতার অসঙ্গতি ব্যক্তিমনে সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি, ব্যক্তি মানুষ ও জাতি তথ্যের ও সত্যের অভাবে বঞ্চিত হয়, বঞ্চিত হয় প্রত্যাশিত সত্য দৃষ্টি লাভে। এতে জাতির মানস অগ্রগতি হয় ব্যাহত। ইতিহাসের সত্য ও শিক্ষা থাকে অজ্ঞাত। বছর কয় আগে ফজলুল হক সম্বন্ধে লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে তথ্য প্রকাশ করে দুই অধ্যাপক মতলববাজদের রোষে বিপন্নবোধ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণগ্রাহিতা জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষের লক্ষণ, কিন্তু না-জেনে না-বুঝে গুণগ্রাহিতা মিথ্যাচার ও আত্মপ্রতারণা মাত্র,—জাতীয় চরিত্রকে তা উন্নত করে না।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত। বাঙলা ভাষাতত্ত্বে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশান্তরে ও দূরবিস্তৃত, বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে পণ্ডিত হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-প্রবর্তিত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম (১৯১২ সনে) পাশ-করা ছাত্র। এ বিদ্যার প্রথম ও প্রধান শর্তই হচ্ছে জ্ঞাতি-ভাষাগুলোর শব্দ-তাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণিক কাঠামো সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন। এ জন্যে শহীদুল্লাহকেও জানতে হয়েছে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অবহট্‌ঠ, বাঙলা, উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দি, নেওয়ারী, অহমিয়া এবং প্রাচীন ইন্দো-ইরানী ও ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণ আবশ্যিকভাবেই। অন্য প্রয়োজনে এবং তুলনার জন্যেও তাঁকে জানতে হয়েছে ইংরেজী, আরবী, ফারসী, মুন্ডা, তিব্বতী ভাষা। আর্যভাষার আলোচকদের এসব জানতে হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও জানতেন।

বাঙলা ভাষাতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান যে অসামান্য গভীর ও ব্যাপক ছিল তা তাঁর বিভিন্ন লেখা দেখেই বোঝা যায়, যদিও তিনি বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যাশিত ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা গ্রন্থ লিখে যাননি। ইসলাম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য আল্লামা। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসসম্পৃক্ত অনেক জটিল জিজ্ঞাসারও জবাব মিলেছে তাঁর গবেষণায় ও বিশ্লেষণে।

শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি সম্বন্ধেও ছিল তাঁর বিশিষ্ট মত। মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি-প্রীতির কথা তাঁর মুখে উচ্চারিত হত ঘন ঘন। বিশ শতকের প্রথম তিন দশক ধরে বাঙলা মুসলমানের মাতৃভাষা কি-না, সে-বিষয়ে যখন বিতর্ক চলছিল, তখন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, বাঙলা কেবল মাতৃভাষা নয়, বাঙালী মুসলমানের জাতীয় ভাষাও (১৩২৫ আশ্বিন, 'আল-ইসলাম')। আর বাঙলা ভাষার অবস্থান ও মর্যাদা যখন পাকিস্তানবাদী ও পাকিস্তানীদের হাতে বিপন্ন তখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন। ডক্টর জিয়াউদ্দীনের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ... ইহা কেবল বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি বিরোধী নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে' (১২ শ্রাবণ ১৩৫৪, 'জিয়াউদ্দীনের প্রতিবাদ—পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সমস্যা')। তিনি সেদিনকার হুজুগতাড়িত পাকিস্তানী বাঙালীর মুখের উপর এ কথাও নির্ভীক ও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমাদের মুখ্য পরিচয়—আমরা বাঙালী।

১৩৫৬ সনে (১৯৪৯) সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির ভাষণে উচ্চারণ করেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।"

১৯৫১ সনে অনুষ্ঠিত কুমিল্লায় শিক্ষক সম্মেলনে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, "শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ছাড়া নতুন কোন ভাষা চাপিয়ে দিলে আমাদের তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রয়োজন হলে বিদ্রোহ করতে হবে। কারণ এ চেষ্টা হবে পূর্ব বাংলার গণহত্যার সামিল।"

আর একটি বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছিল চির উৎকণ্ঠা। তিনি শিক্ষার দ্রুত ও সুষ্ঠু বিস্তার কামনা করতেন। তাঁর ভাষায়, "আমি মনে করি দেশের সর্বপ্রথম কাজ মূর্খতারূপ মহাশত্রুর সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করা।" (অভিভাষণ)। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার, গণশিক্ষার বা সাক্ষরতার ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা তিনি সারাজীবন ধরে বলে গেছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ আকৈশোর একনিষ্ঠ অনন্যচিত্ত মুমীন ছিলেন। এমন মানুষ সাধারণত অসহিষ্ণু ও বিধর্মী-বিদ্বেষী হয়। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন সুরুচিবান পরিশীলিত সংস্কৃতির মানুষ। স্বধর্মে সুস্থির থেকেও পর ধর্ম ও পর মত সইবার ও সহাবস্থানের সুবিবেচনা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা ছিল অশেষ এবং জ্ঞানের ও ভাষা-সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর মন, সাড়াও দিয়েছেন তিনি সাধ্যমতো। তাই তাঁর মধ্যে একক বিষয়ে একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক সাধনা দুর্লক্ষ্য। বৈচিত্র্যে বিচরণেই ছিল তাঁর আনন্দ, একলগ্নতায় তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তাই তাঁকে কোরআনের তর্জমায়, হাদিস সংগ্রহে, কিংবা কসিদাতুলবুর্দা, উমর খৈয়ামের রুবাই, হাফিজের দিওয়ান, ইকবালের শেকওয়া অথবা বিদ্যাপতির পদ অনুবাদে যেমন আগ্রহী দেখি, তেমনি তাঁর উৎসাহ দেখি ইসলাম সম্বন্ধে লেখায়, রেডিয়ো-কথিকা রচনায় ও ওয়াজে 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে তা গ্রথিতও হয়েছে। প্রথম জীবনে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির ও পত্রিকার (১৩২৫) সহ যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বয়ং 'আঙুর' (১৯১০) নামে ছোটদের জন্য এবং 'বঙ্গভূমি' (১৩৪৪) ও 'পীস' (Peace), শেষে 'তকবীর' (১৯৪৬–৪৭) নামে বড়োদের জন্যে পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক ছিলেন। গল্প লিখেছেন, লিখেছেন কবিতাও, সাহিত্যালোচনাও করেছেন, রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক 'রাজা'র তাঁর অনুমিত ও ব্যাখ্যাত রূপকার্থ প্রশংসিতও হয়েছিল। তবে তাঁর অনূদিত সাহিত্যের শৈল্পিক মান উঁচু ছিল না, তেমনি বাঞ্ছিত মানের ছিল না তাঁর গ্র গুলোও, আর কবিতা তো অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। অতএব, তাঁর কৃতিত্বের ক্ষেত্র হচ্ছে ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস।

তাঁর অনন্য কৃতির ও অসামান্য কীর্তির সাক্ষ্য হচ্ছে তাঁর আবিষ্কৃত ভাষার ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কোন একক বিষয়ে অখণ্ড মনোযোগে প্রয়োজনীয় সর্বাঙ্গীন কিংবা পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় তাঁর আগ্রহের সাক্ষ্য বিরল। তিনি সাধারণত অন্যের রচনায় তথ্য ও তত্ত্বগত ভ্রান্তি সংশোধনেই এবং খণ্ড খণ্ড তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কারেই নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্ষেপে পালন করতেন। গবেষণা ক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলতে গেলে ছিলেন একজন শিকড়-সন্ধানী তথা অদৃশ্য তথ্যমূল উদঘাটনে উৎসাহী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ নিরূপণে, চর্যার বিশুদ্ধ পাঠ নির্মাণে, কোন শব্দের উৎপত্তি-বুৎপত্তি নির্ণয়ে, বাঙলা ভাষার উপর মুণ্ড-প্রভাব আবিষ্কারের কিংবা বড়ু চণ্ডীদাসের, কৃত্তিবাসের কাল নির্ধারণে, উমর খৈয়াম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণে, কিংবা কৃষ্ণতত্ত্ব ভাগবত গীতার পাঠান্তর আলোচনায়, ভরত-কন্ব-বিশ্বামিত্র তত্ত্ব সন্ধানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৈহয়গোত্রের পরিচয় দানে অথবা লোকসাহিত্য তত্ত্ব আলোচনায় তাঁর আগ্রহ খণ্ড খণ্ড তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কারে ছিল নিবদ্ধ। অথচ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাঙলা ভাষার উদ্ভব-বিকাশ-বিবর্তন ধারা সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক বিপুলকায় গ্রন্থ রচনার অতুল্য যোগ্যতা (সুনীতিকুমারকে স্মরণ রেখেও বলা যায়) কেবল তাঁরই ছিল। তিনি তা সুদীর্ঘ জীবনে করেননি। শিক্ষক হিসেবে কেবল ছাত্রপাঠ্য সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তই রেখে গেলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৪৪ সনের জুন মাসে রীডার হিসেবে অবসর গ্রহণ করে বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। আবার ১৯৪৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেশত্যাগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয় সঙ্কট-তারণের জন্যে। এ সময় তিনি প্রফেসর ও ডীন হবার সুযোগ পান। ১৯৫৫ সনে তিনি নতুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও বাঙলা বিভাগে অধ্যক্ষ হন, তার পরে উর্দু উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি নিয়ে করাচি চলে যান। সেখান থেকে ফিরে বাঙলা একাডেমির চাকরি নিয়ে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সংকলনের ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এক অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হন। তার পর আমৃত্যু দু'তিন বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর এমেরিটাস পদে ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন। লাহোরের লিংগুইস্টিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট অব পাকিস্তান 'শহীদুল্লাহ প্রেজেন্টেশন ভল্যুম' প্রকাশ করে এবং ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফেলিসিটেশন' গ্রন্থ বের করে তাঁকে সম্মানিত ও সংবর্ধিত করেছিল।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দীনকে ও দুনিয়াকে সমগুরুত্বে বরণ করেছিলেন, বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না তিনি। সাত পুত্র ও দুই কন্যার পিতা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পদশালী ছিলেন।

ব্যক্তি হিসেবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন নিরহঙ্কার প্রিয়ভাষী সজ্জন সুজন। লোক ব্যবহারে ছিলেন মাটির মানুষ। নানাজনের অপকর্মের ও বিরুদ্ধাচরণের ক্ষোভ থাকলেও যেহেতু গিবত বা নিন্দা মুমীনের পক্ষে হারাম, সেজন্যে তাঁর মুখে পরনিন্দা-কুৎসা শোনা যায়নি। সাক্ষাৎকামী নির্বিশেষ মানুষের জন্যে ছিল তাঁর দুয়ার খোলা। গাঁ-গঞ্জের শহর-বন্দরের সাক্ষর-নিরক্ষর, সব পেশার পরিচিত লোক মাত্রই তাঁকে করত শ্রদ্ধা ও সমীহ।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙলা ভাষায় মুণ্ডাপ্রভাব চিহ্নিত করার, গৌড়ী প্রাকৃত আবিষ্কারের ও বাঙলা ব্যাকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্যে, আর চর্যাপদের পাঠশুদ্ধি ও চর্যাকারের সময় নিরূপণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও বড়ু চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য ও কাল নিরূপণ প্রভৃতি গবেষণাকর্মের জন্যে বহু কাল অবশ্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আর নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁর নাম যুক্ত হয়েছে বলে প্রাত্যহিক উচ্চারণে তাঁর নাম থাকবে অবিস্মৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তমনের ঔচিত্যবাদী আবুল ফজল
[১৯০৩ – ৮৩]

১৯৭৪ সনে অন্য অনেকের সঙ্গে আবুল ফজলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে 'ডি-লিট' উপাধি দানে সম্মানিত করার সময়ে তাঁকে 'বাঙলার বিবেক'–এ গুণনামে অভিহিত করা হয়। ষাটের দশক থেকে সত্যই তিনি জাতির বিবেকের ভূমিকাই পালন করে আসছিলেন। জনগণের ও জাতির স্বার্থবিরোধী যে-কোন সামাজিক, প্রাশাসনিক ও রাষ্ট্রিক অন্যায়-অপকর্ম-অবস্থা-ঔদাসীন্যের প্রতিকার চেয়ে বিবৃতিদানে কিংবা উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদে এগিয়ে আসার স্বল্প কয়েকজন লোকের মধ্যে চিন্তাশীল সাহিত্যিক হিসেবে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। এ ভূমিকা পালনে তাঁকে সুযোগ দিয়েছিল ও উৎসাহ যুগিয়েছিল মুখ্যত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ইউনিয়ন! শিক্ষিত-সাহসী-বেকারবিরল সেকালে অবসরপ্রাপ্ত প্রগতিশীল ও নির্ভীক স্পষ্টভাষী আবুল ফজলকে সম্বল, সভাপতি ও বক্তা করে সেমিনারে, মেঠো বক্তৃতায় এবং কাগজে বিবৃতি মাধ্যমে ষাটের দশকের ঢাকায় তথা পূর্ববাঙলায় প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের একটা সাহসী মানস পরিবেশ গড়ে তুলেছিল ছাত্ররা। আবুল ফজল জানতেন :

১. "মানুষের জীবনে সভ্যতা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে, সাহিত্যেরও একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে। যে-ভূমিকা আমি কখনো বিস্মৃত হইনি। তাই দেশের মানুষ আর সমাজের বিচিত্র সমস্যা বারবার আমার লেখায় ছায়াপাত করেছে।" [১৯৭৪ সনের সমাবর্তন সভায় ডি-লিট প্রাপ্তি উপলক্ষে ভাষণ]

২. "কথা আমি অনেক বলেছি, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেক বিষয়ে অনেক কথা আমাকে বলতে হয়েছে, অনেক সময় বাধ্য হয়েছি বলতে। আমি চাই না, তবু আমাকে দিয়ে আজো কথা বলায়—দেশ বলায়, সমাজ বলায়, ছাত্রেরা বলায়। নিজের মনের তাগাদায়ও কম কথা বলি না।" [নিবেদন : 'সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র' গ্রন্থ]

'সাফ কাপড়েদের [White Collar] তথা শিক্ষিত শহুরে তরুণদের এমনি সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক-সাহিত্যিক আবেগতাড়িত আন্দোলনের ছাত্রবৃত নেতৃরূপে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয় গভীর ও ব্যাপক। এ সময়ে দেশ-মানুষ-সমাজ বিষয়ক সমস্যা-সঙ্কট সম্বন্ধে তাঁর মত-মন্তব্য ও বক্তৃতা-বিবৃতি প্রগতিশীল তরুণদের প্রভাবিত করত বলে তাদের চোখে তিনি ছিলেন সীমিত অর্থে 'চিন্তানায়ক।'

ফলে ব্রিটিশ আমলে ভার্নাক্যুলার শিক্ষক হিসেবে যিনি সরকারী স্কুলে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে চাকরী জীবনে বাঙলায় এম-এ পাশ করে (১৯৪০) সরকারী কৃষ্ণনগর কলেজে [১৯৪১ সনে] যিনি প্রভাষক হন, এবং ১৯৫৯ সনের জানুয়ারীতে চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপক রূপে যাঁর চাকুরে জীবনের অবসান ঘটে, প্রগতিশীল লোকপ্রিয় মনস্বী মনীষী হিসেবে নন্দিত সেই আবুল ফজলকে স্বাধীন বাংলাদেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদ দিয়ে মুজিব সরকার তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানে ভূষিত করেন। এবং তাঁর জনপ্রিয়তা—তাঁর প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা কাজে লাগিয়ে জনগ্রাহ্য হবার মতলবে সেনানী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়ক জিয়াউর রহমান তাঁকে উপদেষ্টা বা মন্ত্রী করায়; তাঁর পূর্বের ভূমিকার গৌরব ক্ষুণ্ন এবং চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি কিঞ্চিৎ ম্লান হয়।

আবুল ফজল সমকালীন নতুন ও প্রবল চিন্তা-চেতনা সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে' জড়িত থাকা থেকে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন কিংবা ছাত্র ইউনিয়নে ভাষণ দান, বা বিভিন্ন সরকারের পুরস্কার গ্রহণ অথবা জিয়া সরকারের উপদেষ্টা হওয়া প্রভৃতি স্মরণে রেখে আবুল ফজলের সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ঔচিত্যবাদী বলে অভিহিত করা চলে।

আবুল ফজল গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখেছেন। কিন্তু চিন্তা-চেতনায় সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মনীষী হিসেবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি ইতিহাসগত হয়ে রইল। অতএব ষাটের দশকের শুরু থেকে মন্ত্রী হওয়ার মুহূর্ত অবধি আবুল ফজল ছিলেন পূর্ববাঙলার-বাঙলাদেশের লোক-নন্দিত একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

এ শতকের উষাকালেই আবুল ফজলের (১৯০১/০৩-৮৩) জন্ম[১]। এবং এ শতকের গোড়ার দিকটা মুসলিম সমাজে আধুনিকতার তথা প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাব সংক্রমিত হওয়ারও উষাকাল। মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজী-গণিত-ইতিহাসও পাঠ্য করে তাকে হাই মাদ্রাসায় ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নয়ন ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে রক্ষণশীল মুসলিমদের আধুনিকতার প্রতীক। আবুল ফজল ছিলেন এ মিশ্র শিক্ষার ও সংস্কৃতির প্রসূন ও মিশ্র বিদ্যার প্রতিম। তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে এর প্রভাব ও পরিব্যক্তি শেষাবধি লঘু-গুরুভাবে ছিলই।

আবুল ফজল যখন ১৯২৫ সনে সেকালের শিক্ষার মুক্তাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এলেন, তখন কবি আবদুল কাদিরের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে সান্নিধ্য পেলেন তখনকার সংস্কারমুক্ত উদারপ্রাণ স্বসমাজ হিতৈষী আধুনিক জীবন ও জগৎসচেতন শিক্ষকদের। এঁরা হলেন [সৈয়দ] আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন এবং স্কুল পরিদর্শক কাজী আনোয়ারুল কাদির।

আবুল হোসেন ছিলেন যথার্থ মুক্তবুদ্ধির ও স্বাধীন চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি মুসলিম তরুণদের মনে আধুনিক চিন্তা-চেতনা বপনের জন্যে 'আল মামুন ক্লাব' (১৯২৭ সনে) প্রতিষ্ঠিত করেন—বুদ্ধির ও জ্ঞানের অনুশীলনই ছিল এ ক্লাবের লক্ষ্য। কাজেই অনুমান করি, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' মূলে তাঁরই মানস-সন্তান। কেননা এরও লক্ষ্য ছিল বুদ্ধির ও জ্ঞানের বিকাশ-বিস্তার। সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' শীর্ষে মোটা হরফে লেখা থাকত—'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' কিন্তু এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে প্রবল ছিলেন লিখিয়ে বলিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ। তাই প্রাধান্য পেলেন তিনিই। বলা বাহুল্য এঁরা ছিলেন মুখ্যত মুসলমান। ইসলাম ও মুসলমানকে ভালোবাসেন বলেই ধনে-মনে, বিদ্যায়-বিত্তে, বুদ্ধিতে-বেসাতে পিছিয়ে পড়া স্বধর্মীকে রামমোহনী কায়দায় চিন্তা-চেতনা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী করে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। মুসলিম সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠার ও মুখপত্র 'শিখা' প্রকাশের উদ্দেশ্যই ছিল তাঁদের লেখার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে তাঁদের 'মত-পথ'

১. আবুল ফজল একবার তাঁর আসল জন্ম সন ১৯০১ বলেই আমাকে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধে শিক্ষিত মুসলিমদের অবহিত করানো এবং এভাবে প্রভাবিত করা। তাঁদের অবলম্বন ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি। তাঁদের উদ্দেশ্য ও যুক্তি বুঝবার মতো লোক ছিল না তখন নিরক্ষর আকীর্ণ মুসলিম সমাজে। তাই কোলকাতার আকরম খানেরা হয়েছিলেন প্রতিবাদী। আবার চারের দশকে যখন বুঝবার মতো শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, ততদিনে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ও মোহামেডান স্পোর্টিং-এর কৃতিত্বে মুসলিমরা ভিন্নতর চেতনায় ও লক্ষ্যে প্রবুদ্ধ। কাজেই তখন শিখাগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা-মত-পথ উপযোগ হারিয়েছে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের তথা শিখাগোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা এবং তাদের মনে আধুনিক চেতনার বীজ বপন করা জ্ঞানের প্রসার ও যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ মাধ্যমে। কাজেই তাঁরা ছিলেন সর্বার্থেই সংস্কারক। আবুল ফজল জীবনে কখনো এ প্রভাববলয় অতিক্রম করতে পারেননি। তিনি ছিলেন অকল্যাণবিরোধী উদার সংস্কারক—ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে। তাই তাঁর সাহিত্যে অনুবৃত্তি আছে, নতুন কথা নেই, উচ্চারণেও নেই নতুন মত-পথের আভাস, আছে মাটি-মানুষ ও রাষ্ট্রিক-স্বার্থবিরোধী ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণের উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি নাস্তিক ছিলেন না, ছিলেন উদাসীন আস্তিক। সমাজস্বাস্থ্য রক্ষায় শাস্ত্রের গুরুত্বও স্বীকার করতেন তিনি। শিক্ষা কমিশনের কাছে (১৯৭৩–৭৪ সনে) তাই তিনি ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যিক বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। আর কম্যুনিজম যে তিনি কখনো পছন্দ করেননি, তাও তিনি লিখিতভাবে পরিব্যক্ত করেছেন, "কমিউনিজম ব্যক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। সমষ্টির জন্য ব্যক্তিকে অকাতরে বলি দেয়। আমি যে জীবনদর্শনে বিশ্বাসী তার সঙ্গে এইসব খাপ খায় না। ... কমিউনিজম একটি খণ্ড ব্যাপার, মানুষের জীবনের শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানই এর উদ্দেশ্য।" আবার তিনি এ-ও জানেন ও মানেন যে "ইসলামের সঙ্গে কম্যুনিজমের কোন তুলনাই সঙ্গত নয়। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন—তার সীমান্ত ইহকাল-পরকাল ব্যাপী বিস্তৃত।" ফলে আবুল ফজলের চিন্তাভাবনা তাঁর সমকালীন স্বদেশ-স্বধর্মী-স্বজাতি ও স্বসমাজ-স্বরাষ্ট্র নিয়েই আবর্তিত এবং তাঁর চিন্তা-চেতনাও মাঝারি ও সাধারণ, কৃচিৎ চমকপ্রদ কিংবা দ্রোহমূলক। তবে সাময়িক কোন সমস্যা-সঙ্কটজাত গুমরে ওঠা কোন গণবক্তব্য তাঁর লেখায় পরিব্যক্ত হত অবশ্যই। অনন্য-অসামান্য-অসাধারণ না হলেই যে কোন মানুষের কৃতি-কীর্তি তুচ্ছ হয়ে যায়, তা নয়। আবুল ফজলের ও তাঁর লেখার মূল্যায়ন করতে হবে মুসলিম সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে এবং দৈশিক তথা রাষ্ট্রিক পরিবেষ্টনীর পটে।

এখানে পূর্বকথা স্মরণ করতে হচ্ছে। গোটা মধ্যযুগ অবধি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ছিল স্ব স্ব সম্প্রদায়ে সীমিত ও স্বতন্ত্র ধারায় চিহ্নিত। কিছু লোকগীতি ব্যতীত কিছুই সাধারণ ও সর্বজনীন ছিল না। উনিশ শতকে প্রতীচ্য প্রভাবে যে সাহিত্য তৈরী হচ্ছিল তাতেও কিছু গান ও গীতিকবিতা ব্যতীত আর সব ধারায় সাহিত্য সাধারণভাবে ছিল, —মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, আখ্যানকাব্য, গল্প-উপন্যাস-নাটকও ছিল—বিষয়ে ও বক্তব্যে সদুদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়গত। উনিশ শতক থেকেই মুসলিমরাও আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকলেও স্বল্প শিক্ষিতের অসামর্থ্যের দরুন তা হিন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি কখনো। সম্ভবত মীর মশাররফ হোসেনই ছিলেন সামান্য ব্যতিক্রম। বিশ শতকের প্রথম তিন দশক অবধি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং কাজী নজরুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম ব্যতীত ক্বচিৎ কেউ হিন্দু পরিচালিত পত্রিকায় লেখা প্রকাশের সুদুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই উনিশ-বিশ শতকেরও মুসলিম লেখকদের লেখার নাম শুনতে পাচ্ছেন কোলকাতা থেকে ঢাকা ভ্রমণে আসা পাঠক-লেখকদের প্রথম বারের মতো, যদিও ১৯৪৭ সন অবধি হিন্দুর মতো মুসলিম পরিচালিত পত্রিকা ও মুসলিমদের সর্বপ্রকার লেখা ও গ্রন্থ কোলকাতা থেকেই হত প্রকাশিত। এ যেন নীলনদের অবিমিশ্র দুই ধারা, —চির প্রবহমান কিন্তু রেল লাইনের মতো চিরবিচ্ছিন্ন ও সমান্তরাল।

কেবল কম্যুনিস্টরাই দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কথা আঁকতে-লিখতে-বলতে থাকেন শিল্পে সাহিত্যে ও আর্থ-সামাজিক এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে। আবুল ফজল এ দলের নন। অতএব বিভাগপূর্ব কালের লেখক হয়েও হিন্দু পাঠক সমাজে ছিলেন অজ্ঞাত এবং স্বরাষ্ট্রে প্রিয় ও প্রখ্যাত হয়েও ইদানীং পূর্বকালে ছিলেন অখ্যাত এবং কেবল বাঙলাদেশের সুখ্যাত উদার প্রগতিশীল লেখক হিসেবে নাম আর পরিচয়ে সুজ্ঞাত। বাঙলাদেশী বদরউদ্দীন উমর কম্যুনিস্ট হিসেবে এবং শামসুর রাহমান কবি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে স্ব স্ব গোষ্ঠীর মধ্যে সুপরিচিত ও বিখ্যাত।

অন্যদের মতো আবুল ফজলেরও সৃষ্টিশীল লেখার বিষয় ও লক্ষ্য মুসলিম সমাজ। আবুল ফজলের জীবিত-কালেই তিনি জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে গণসংবর্ধনা পেয়েছিলেন ১৯৫৯ সনে। তাঁর জীবৎকালেই অধ্যাপক আনোয়ার পাশা (১৯৬৭ সনে) 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' নামে তাঁর জীবনপরিচিতি ও সাহিত্য মূল্যায়নমূলক গ্রন্থ লিখে প্রকাশিত করেছিলেন। আবুল ফজলের মৃত্যুর পরেও আবুল ফজল ও তাঁর রচনা বিষয়ক নানা লেখকের লেখার একাধিক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকায়ও রয়েছে তাঁর সম্বন্ধে অসংকলিত অনেক লেখা। বাঙলা একাডেমী থেকেও সংক্ষিপ্ত জীবনকথা সারোয়ার জাহান রচিত 'আবুল ফজল' প্রকাশিত। আমরা জানি, শোকসভার আর সংবর্ধনা সভার মধ্যে পার্থক্য মাত্র একটি, —স্তুতি প্রশস্তি প্রাপকের অনুপস্থিতি ও উপস্থিতি। কাজেই সে-সব উচ্ছ্বাস-প্রসূত তরল স্তাবকতা, সরল তারিফ ও ঋজু মূল্যায়ন প্রকৃত আবুল ফজলের স্বরূপে পরিচায়ন ও মূল্যায়ন পথে কেবল বিঘ্নই সৃষ্টি করে, সহায়ক হয় না।

আবুল ফজল শিক্ষিত মুসলিমের নৈতিক জীবন উন্নয়ন লক্ষ্যে কোরানের বাণী, হাদিসের বাণী যেমন সংকলন করেছেন, তেমনি তাঁর আদর্শানুগ হওয়ায় অর্থের প্রেরণায় রচনা করেছেন হযরত আলী চরিতও। আমাদের সবার মতোই তিনিও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আশ্বাসে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। তাই উল্লসিত লেখক কৃতজ্ঞ চিত্তে রচনা করেছিলেন 'কায়েদে আযম' (১৯৪৬) নাটক। পরে মুসলিম জাগরণের চারণ কবি 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' (১৯৪৭) গ্রন্থও লিখেছিলেন তিনি। নাট্যরীতির প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাঁর 'একটি সকাল' (চারটি নাটিকার সংকলন ১৯৩৬), আলোকলতা (১৯৩৭ পাঁচটা নাটিকার সংকলন)–এগুলো প্রহসন জাতীয় বা হাস্যরস-প্রধান (১৯৪৮)। এগারোটা নাটিকার কোনটাই কোথাও মঞ্চস্থ হয়েছে বলে শুনিনি, বরং তাঁর দুতিনটে গল্পের নাট্যরূপ রেডিও-টিভি মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। কেবল উদ্দিষ্ট বক্তব্যে ও সংলাপে যে শিল্পোত্তীর্ণ নাটক-নাটিকা হয় না, আবুল ফজলের নাট্যসাহিত্য তার সাক্ষ্যই বহন করে মাত্র। তবু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দৃষ্টান্তযোগে সামাজিক কুরীতি-নীতি ও দুষ্ট-দুর্জনদের চিহ্নিত করা এবং সমাজ স্বাস্থ্য উন্নয়ন। পাঠকচিত্তে এসব রচনার প্রভাব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েনি, তা-ও বলা যাবে না। তাঁর ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থগুলো হচ্ছে মাটির পৃথিবী (১৯৪০) আয়ষা (১৯৫১), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬৪), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮)। আসলে আবুল ফজল গল্প বেশি লেখেননি। মাটির পৃথিবীর মোট সতেরোটি গল্পের নয়টির সঙ্গে চারটি নতুন গল্প যোগ করে প্রকাশিত করেন 'আয়ষা'। আবার উক্ত দুই গল্প গ্রন্থ থেকে একুশটি গল্প নিয়ে এবং নয়টি নতুন গল্প যোগ করে বের করেন শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৭৮)। আবার নির্বাচিত গল্পের মোট ষোলটির মধ্যে পনেরোটি নেয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ গল্প থেকে। এ অনেকটা ব্যবসাবুদ্ধি প্রসূত প্রকাশনা। আবুল ফজল গল্প রচনায় একজন ধীর বুদ্ধির ও স্থির লক্ষ্যের মানুষ। চমক সৃষ্টি কিংবা শৈল্পিক উৎকর্ষই তাঁর লক্ষ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য পাঠক চিত্তে কিছু মানবিক ও সামাজিক হিতচেতনা জাগানো।

মুখ্যত মুসলিমদের দুর্লভ সমাজচিত্র বলেই রবীন্দ্রনাথ থেকে মোহিতলাল প্রমুখ অনেকেই তাঁর রচনার তারিফ করেছেন, শিল্পোত্তীর্ণ রচনা বলে নয়। সাপ্তাহিক 'দেশ' (৬.১.১৩৪৮) মুক্তকণ্ঠে তারিফ করেছেন, "আবুল ফজলের গল্প পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। মুসলমান সমাজের এমন সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য চিত্র বড় চোখে পড়ে না। তিনি সেই চিত্রাঙ্কনকে রসোত্তীর্ণ করেছেন।" আবুল ফজল উপন্যাস লিখেছেন ছয়টি। চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০), সাহসিকা (১৯৪৬), জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮ পূর্বনাম নারী ও পুরুষ), রাঙা প্রভাত (১৯৫৭) হয়ে শেষ পরাবর্তনে (১৯৮০)। আবুল ফজলের উপন্যাসগুলোও কমবেশি লক্ষ্য নির্দিষ্ট। মানতেই হয় যে গল্প-উপন্যাসের ভাষা ও ভঙ্গি আবুল ফজলের তেমন আয়ত্তে ছিল না। তাই তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যে শৈল্পিক উৎকর্ষ ছিল না। তিনি রয়ে গেলেন সমাজমনস্ক সংস্কার-প্রবণ হিতকামী নিতান্ত মাঝারী লেখক ও স্রষ্টা। এর মধ্যে তাঁর আদর্শনিষ্ঠ স্থূল রচনাও রয়েছে, যেমন রাঙা-প্রভাত। হিন্দু নারী ও মুসলিম পুরুষ সম্পৃক্ত। জাতপাতের বাধা ছিল বলে হিন্দু তরুণ মুসলিম নারীর দিকে নজর দিত না। কামে প্রেমে ধর্ষণে হরণে বিবাহে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে যে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ-সংঘাত চিরকাল চলছিল, তার স্বদেশ প্রেমজাত সহাবস্থানের অঙ্গীকার ভিত্তিক ঋজু ও স্থূল সমাধান খুঁজেছেন লেখক নায়ক কামালের সঙ্গে নায়িকা মায়ার বিয়ে দিয়ে। প্রদীপ ও পতঙ্গ পড়ে সুখ পাওয়া যায়। তবে আবুল ফজলের গল্প-উপন্যাস রোম্যান্টিকও।

অতএব আবুল ফজলের কৃতি-কীর্তির গুরুত্বের, অবিস্মরণীয়তার, উপযোগের, তাঁর অবদানের ইতিহাসগত মূল্যের অবলম্বন হচ্ছে তাঁর লিখিত প্রবন্ধরাশি। আর চির অম্লান ও চির প্রয়োজনীয় হয়ে থাকবে কালের সাক্ষ্য হিসেবে তাঁর তিনটি অমূল্য অবদান—রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯), আর দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থগুলোর মধ্যে গুরুত্বে প্রধান হচ্ছে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫) সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮)। আর সমকালীনচিন্তা (১৯৬৮), মানবতন্ত্র (১৯৭৩) এবং নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন (১৯৭৯)—এ তিনটে হচ্ছে আগের সংকলনগুলো থেকে বাছাই-করা প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।

আগেই বলেছি, আবুল ফজলের ও তাঁর সর্বপ্রকার রচনার উচ্ছ্বসিত শংসায় পূর্ণ প্রায় শতেক রচনা মেলে ঢাকায় ও অন্যত্র। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক আবুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসেম ফজলুল হকের অসূয়ামুক্ত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন প্রয়াসের সামান্য নমুনা দিয়ে আমার লেখা শেষ করছি।

"আবুল ফজলের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদারনৈতিক বলে অভিহিত করা যায়। তবে উদীয়মান কালের ইউরোপীয় উদারনৈতিক চিন্তাবিদের প্রায় কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, লেখার মাধ্যমে সমাজের কোন অংশকে প্রকৃতপক্ষে রুষ্ট করতে সাহসী হননি তিনি, অশুভবাদীদের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে চেয়েছেন শুধু। তাঁর লেখায় প্রতিবাদ ও আক্রমণ যেটুকু আছে, তাতে যে-সীমা পার হলে বিরুদ্ধপক্ষের শ্রদ্ধা হারাতে হবে সে পর্যন্ত অগ্রসর হননি তিনি। আবুল ফজলকে বলা চলে তাঁর কালের সাক্ষী... রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ কৌতূহলের সঙ্গে তিনি অবলোকন করেছেন, সাংবাদিক সুলভ অভ্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধ লিখে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন, তাঁর দৃষ্টি সমাজের গভীরে প্রবেশ করেনি কখনও। ... আবুল ফজলের অধিকাংশ প্রবন্ধ সাংবাদিকতা সুলভ রচনার পর্যায়ে পড়ে। তবে সাময়িক ঘটনায় নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে নানাভাবে কালকে প্রভাবিত করেছেন তিনি।

... আবুল ফজলের প্রবন্ধের ভাষা অনলঙ্কৃত, সহজ, সরল, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, বিষয়ানুগ কিন্তু বিশেষত্বহীন। বর্ণনামূলক রচনার জন্যে এই ভাষা উপযোগী।

... সামগ্রিক বিচারে আবুল ফজল, রক্ষণশীলদের কাছে প্রগতিশীল, প্রগতিশীলদের কাছে রক্ষণশীল, নিজের কাছে উদার এবং বাংলাদেশের আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের কাছে "বাঙালীর মনুষ্যত্ব ও বিবেকের অতন্দ্র প্রহরী।" [পটভূমি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৮২ পৃঃ ২৫-৩৩]

অবশ্য আর একটি তথ্য স্বীকার করতেই হবে। মুক্তবুদ্ধি লেখক হিসেবে তাঁর কালের সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীকে প্রথম বলে জানলে, আবুল ফজলকে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার বলে মানতেই হবে। এঁরাই ছিলেন একালে বুদ্ধির মুক্তির প্রচারক।

মাটিলগ্ন মানুষের দরদী কবি : জসীম উদদীন
[১৯০৩–৭৬]

জসীম উদদীন বাঙলা সাহিত্যের এক অনন্য কবি, ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে তাঁকে আপাত দৃষ্টিতে লোকগাথার উত্তর সাধক ও উত্তরসূরি বলে প্রতীয়মান হলেও অঙ্গে ও অন্তরে এর রূপ-রস যে ভিন্ন তা সূক্ষ্ম দৃষ্টির, মার্জিত রুচির এবং প্রচ্ছন্ন রূপের ও রসের সমঝদার নিপুণ পাঠক অনুভব ও উপলব্ধি করেন। এ জন্যেই কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান কিংবা যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায় প্রমুখের কবিস্বভাবের থেকে তাঁর স্বভাবের ও সৃষ্টির পার্থক্যও গুহায়িত থাকে না।

গাঁয়ের সাক্ষর গৃহস্থ ঘরেই জসীম উদদীনের জন্ম। পল্লীর কোটি কোটি মানুষের মতো তিনিও শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে লালন পেয়েছেন পল্লী প্রকৃতির ও সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশের। আমরা শিক্ষিত ও শহুরে হয়ে পল্লীর মানুষকে ও প্রকৃতিকে ভুলে যাই, অবজ্ঞা করি, গেঁয়ো জীবন ও সমাজ এড়িয়ে চলি। সৃষ্টি হয় শ্রেণী-বৈষম্য, দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল ওঠে মন-মননের ব্যবধানের।

কিন্তু জসীম উদদীন শিক্ষিত ও শহুরে হয়েও মাটিলগ্ন, গৃহগত অপরিশীলিত অনক্ষর গেঁয়ো মানুষের-চাষী-মজুরের ও অবজ্ঞেয় তুচ্ছ বৃত্তিজীবী মানুষের সঙ্গে মানসিকভাবে জীবনের অবসান মুহূর্ত অবধি একাত্মতা, জ্ঞাতিত্ব, সহ ও সম অনুভূতি, সহ ও সমমর্মিতা নিষ্ঠার সঙ্গে লালন করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি গদ্য-পদ্য রচনা এ সাক্ষ্যই বহন করছে। এ-ও উল্লেখ্য যে জসীম উদ্দীন ফরিদপুরের, তাঁর জন্মস্থলের পদ্মাপারের আঞ্চলিক জীবনের রূপকার। সে-জীবন অনেকাংশে Pastoral.

পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার, ঝগড়া-বিবাদের, দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, আশা-প্রত্যাশার রূপকার কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার ছিলেন জসীমউদদীন। তিনি পরদুঃখকাতর বেদনায় ব্যথিত কবি। মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা-হতাশার ও বিয়োগ-বিষাদান্ত পরিণতির আলেখ্যই তিনি অঙ্কিত করেছেন সারাজীবন। কোমল-করুণহৃদয় এ কবি তাই তাঁর রচনায় পরের ব্যথায় ব্যথিত, পরের দুঃখে কাতর। রূপ, রস ও ভঙ্গিগত না হলেও কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে জসীম উদদীনের মূলগত একটা সূক্ষ্ম মানস সাদৃশ্য রয়েছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখবাদী কবি বলে সাধারণ্যে পরিচিত, জসীম উদদীনও অবশ্যই শোষিত-বঞ্চিত আশাহত মানুষের দরদী কবি। দুঃখী পল্লী মানুষের চিত্র কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় এবং আরো কেউ কেউ অঙ্কিত করেছেন বটে, কিন্তু জসীম উদ্দীনের কবিতার থেকে ওদের কবিতার ভাব-ভাষা-ভঙ্গিগত পার্থক্য সুপ্রকট। বাংলাদেশে কোন কোন কবি জসীম উদদীনের অনুকরণে ও অনুসরণে অগ্রসর হতে গিয়েও তেমন সফল হননি। এতেও তাঁর অননুকরণীয় অনন্যতাই প্রমাণিত।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখেছেন শিক্ষিত মনের নৈতিক চেতনা ও দরদী হৃদয়াবেগ নিয়ে এবং মননজাত মানবিক দায়িত্ববোধের তাড়নায়, আর যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও কালিদাস রায় কিংবা রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথসহ যে-কোন অকম্যুনিস্ট আধুনিক কবি-কথাশিল্পী গাঁয়ের গণজীবন নিয়ে গদ্যে-পদ্যে লিখেছেন, তাঁরা সচেতনভাবে স্বশ্রেণীতে স্থিত থেকে দুস্থ-দুঃখী মানুষের কথা বলেছেন উদার মানবিক কৃপা-করুণাসজ্ঞাত দায়িত্ববোধে। পরিণামে সব রচনার লক্ষ্য ও আবেদন অভিন্ন প্রতিভাত হলেও এর মধ্যে চেতনাগত সূক্ষ্ম তারতম্য যে রয়েছে, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

জসীম উদদীনের সমগ্র রচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে জসীম উদদীন নিজেই আজীবন একজন গৃহস্থের মাটিলগ্ন গৃহগত গ্রামীণ জীবন মানসিকভাবে অন্তরে লালন করেছেন নিঃস্ব-নিরন্ন, শাসিত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের একজন হয়েই[১]। তাই তার রচনা এমন অকৃত্রিম হৃদয় সঞ্জাত রক্তক্ষরা অশ্রুঝরা। বলতে গেলে এ যেন সহ-সম অনুভবের-উপলব্ধির-একেবারে নির্জলা স্ব-অনুভূত-স্ব-কথার বয়ান। জসীম উদদীনের কাহিনী কাব্যের বাস্তব চিত্রময়তা কালিক ব্যবধান সত্ত্বেও মুকুন্দরামের কালকেতু উপাখ্যান স্মরণ করিয়ে দেয়।

একটি ক্ষেত্রে মনে হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও জসীম উদদীনের সাযুজ্য-সাদৃশ্য রয়েছে। দুজনেরই রয়েছে প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রাণতা। দুজনেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনকে ও প্রকৃতিকে অভিন্ন অবিচ্ছেদ্য করে দেখেছেন। দুজনেই দেখেছেন প্রকৃতির কোলগত মনুষ্যজীবন। তাঁরা জেনেছেন জীবনে প্রকৃতির প্রভাব, প্রকৃতিতে জীবনের প্রতিরূপ। তবে বিভূতিভূষণের প্রকৃতির অনুভব-উপলব্ধি অবশ্যই ছিল গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় জসীম উদ্দীনের চেয়ে বেশি। আরো এক জায়গায় দুজনের মিল ছিল, –দুজনেই ছিলেন রূপকার চিত্রকার-চিত্রী। কেউ মতে-মন্তব্যে ভাষ্যকারের ভূমিকা নেননি; উদ্যোগী হননি জীবন প্রতিবেশ কিংবা শাস্ত্র-সমাজ-শাসন পরিবর্তনে, আগ্রহী হননি দুস্থ মানুষের দুঃখ-বেদনা-দুর্ভাগ্য বিমোচনের উপায় সন্ধানে। তাঁরা কথক বা বয়ানকারী মাত্র। 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং'—এ নীতির ধারকমাত্র। তাঁদের অনুক্ত কথা যেন এই—এমনি হত, আজো এমনি হয়, ঘটে।

আমরা জানি, জসীম উদদীন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনুলাহিড়ী' সহকারী গবেষক রূপে লোকসাহিত্য সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। মনের প্রবণতা ছিল বলেই লোকজীবনের মতো লোকসাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ গভীর ও ব্যাপক হয়। কথক, গায়েন, যাত্রার, গানের, গাথার-পাঁচালীর, কবিয়ালের আসর প্রভৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারকে ও অনুষ্ঠানে তাঁর আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। জসীম উদ্দীন শিক্ষিত ও শহরবাসী হয়েও গ্রাম ও গ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ মৃত্যুকাল অবধি অটুট রেখেছিলেন; তিনি তাঁর অন্তিম শয্যাও কামনা করেছিলেন স্বগ্রামে, গোবিন্দপুরের মাটিতে।

আমরা জানি মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল লোকজ ঐতিহ্য সম্পৃক্ত লোকবোধ্য লোকশ্রুত লোকপাঠ্য সাহিত্য। তাই রচনা পণ্ডিতের হলেও, বৈষ্ণব পদাবলীর মতো সূক্ষ্ম রসের ও উঁচু তত্ত্বের কবিতা বা গান হলেও পদ-পাঁচালী মাত্রই ছিল শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সব মানুষের বোধ্য, শ্রুত, পাঠ্য সর্বজনীন সামাজিক ও লৌকিক সাহিত্য। লিখিত শালীন সাহিত্য ও অলিখিত লোকসাহিত্য— দুটোর প্রতি ছিল দেশের মানুষের সম-অনুরাগ। পার্থক্য ছিল কেবল অলিখিত লোকসাহিত্যে, আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বলে, তা থাকত কেবল অঞ্চলের সীমায় চালু ও নিবদ্ধ।

শহুরে ইংরেজী শিক্ষা প্রতীচ্য বিদ্যার ধারকদের সাহিত্যরুচি আমূল বদলে দিল। এই প্রথম এভাবে ইংরেজী শিক্ষিত লোকের ও দেশীয় ঐতিহ্যিক সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক হাজারে নয়শ নিরেনব্বই জনের মধ্যে চিন্তায়-চেতনায়, ভাবে-ভাষায় ভঙ্গিতে, রুচি-সংস্কৃতিতে জীবন ভাবনায় ও জগৎ চেতনায় স্থায়ী ও অবিমোচ্য-অবিলুপ্ত ব্যবধান সৃষ্টি করল। মন-মনন-রুচি-সংস্কৃতিতে ও জীবনযাত্রার রীতি-পদ্ধতিতে এ দুই ভিন্ন জাতের মানুষের বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন-অসম্পৃক্ত মানসিক জীবনের সহাবস্থান আর কখনো ঘোচেনি। চাষী-মজুর, খনি-কারখানা শ্রমিকের জীবনের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা-দুঃখ নিয়ে লিখেছেন শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, মানিক প্রমুখ অনেকেই। এঁদের সাহিত্যে এমনকি কম্যুনিস্ট সাহিত্যেও সম্ভব হয়নি মানস মিলন। কেননা নাটক ও সঙ্গীত ব্যতীত গণশ্রুত সাহিত্য বলে আগের মতো কিছু নেই। কম্যুনিস্টদের ভাষা-ভঙ্গি-মননও আলাদা, বিদগ্ধ। নিরক্ষর বা সাক্ষর জনগণের মধ্যে এ কৃত্রিম প্রয়াসে রচিত গণসাহিত্য সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পৌঁছে না হৃদয়বেদ্য হয়ে কিংবা মগজগ্রাহ্য হয়ে। তাই বাঞ্ছিত ফলও মেলে না।

উচ্চশিক্ষিত জসীম উদদীনও মনে-মননে অবশ্যই আধুনিক। কিন্তু মাটি ও মানুষ প্রেম তাঁর পল্লীপ্রাণতা অনাবিল-অম্লান রেখেছিল। তাই পল্লীমানুষের জীবনের সঙ্গে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরে ছিলেন অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য[২]। তবে তাঁর সাহিত্যও শিক্ষিত লোকপাঠ্য শহুরে শিক্ষিতের রচনা—এ বৈশিষ্ট্য সমঝদার পাঠকের স্থূল দৃষ্টিও এড়ায় না— পল্লীর লৌকিক উপমা-রূপকের আধিক্য সত্ত্বেও। কাজেই জসীম উদদীন 'পল্লীকবি' নন—যার এক অর্থ লোককবি। তিনি গণমানুষের দরদী কবি। গণমানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-আশা-প্রত্যাশার রূপকার কবি। এ তাৎপর্যে তিনি শহুরে হয়েও গাঁয়ের এবং গাঁয়ের হয়েও শহুরে মানুষের কবি। তিনি প্রতীচ্য শিক্ষা প্রভাবিত বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি—আদি অকৃত্রিম গণমানুষের কবি। জসীম উদদীন গাঁয়ের মানুষের আশা-প্রত্যাশা, লোভ-রিরংসা, ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বিজড়িত হৃদয়ের ও মনের কথার অভিব্যক্তি দিয়েছেন তাঁর রচনায়। তবু তিনি উঁচু মানের, মননের, মাপের, মাত্রার এবং সূক্ষ্ম বিচিত্র ও বিবিধ শিল্পরুচির ও চেতনার স্রষ্টা নন। আপাত দৃষ্টিতে আঙ্গিকে ও বক্তব্যে তিনি সাধারণ, সামান্য এবং চিন্তা-চেতনায় আবর্তনশীল। তাঁর রচনায় ভাব-ভাষা-ভঙ্গির কিংবা চিন্তা-চেতনার বিবর্তন, বিবৃদ্ধি-বৈচিত্র্য প্রায় বিরল। বিষয় গ্রামের, প্রকৃতিও গ্রামের, মানুষের জীবন প্রতিবেশ-ব্যবহারিক ও মানসিক— দুটোই গ্রাম্য; তবু জসীম উদ্দীনের উদ্দিষ্ট পাঠক ইংরেজী শিক্ষিত আধুনিক সাহিত্যের পাঠক, গ্রামের নিরক্ষর শ্রোতা নয়। যদিও এগুলো পড়ে শোনালে ওরাও এর রস প্রায় আক্ষরিক করবে। জসীম উদদীন আধুনিক হয়েও আধুনিক নন, এ অভিধায় যে তিনি বাঙলাদেশের কোন আধুনিক কবিরই—মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল কিংবা সুধীনদত্ত-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কোন পূর্ববর্তী বা সমকালীন কবির প্রভাব বরণ করেননি, এ হিসেবে তিনি স্বতন্ত্র ও স্বস্থ। এ-ও সত্য যে তিনি স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে সীমিত প্রয়োজনে আধুনিক সাহিত্যের অনুশীলন ও চর্চা অবশ্যই করেছিলেন। এ-ও স্বীকার্য যে তিনি পণ্ডিত বলে পরিচিত ছিলেন না। তাঁর মানসপ্রবণতা অনুসারে তিনি লোকসাহিত্যের ও সংস্কৃতির খবর রাখতেন। আর রবীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ থেকে সেকালের কোলকাতার অনেক গুণী-জ্ঞানী শিল্পী-সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি কি আধুনিক সাহিত্যের নিষ্ঠ পাঠক বা রসরসিক ছিলেন? আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গে ও অন্তরে তাঁর এ অপ্রবেশ কি অনীহা না অসামর্থ্য প্রসূত? —এ সূত্রে এ প্রশ্নও এসে যায়। তিনি কি কেবল স্বেচ্ছায় আঙ্গিকে, গল্প-উপন্যাস-নাটকের ধার ঘেঁষে, ছন্দে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত প্রয়োগ করেই আধুনিক, তিনি শিক্ষিত পাঠক লক্ষ্যে লিখেছেন বলেই কি আধুনিক? এসব প্রশ্নের এক কথায় জবাব দেয়া যায়। তিনি চিন্তা-চেতনায় অবশ্যই ছিলেন আধুনিক, গ্রামীণ মানুষের ও প্রকৃতির আলেখ্য শহরের শিক্ষিত জনের গোচরীভূত করাই ছিল তাঁর লেখক জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধিও অসামান্য। গাঁয়ের মানুষের মাটিলগ্ন, গৃহগত জীবনের স্বাভাবিক চিত্র দেখানোর লক্ষ্যে তিনি তাদেরই ভাব-ভাষা-ভঙ্গি ঘেঁষা শৈলীতে, গ্রাম-সীমায় নিবদ্ধ প্রকৃতি ও হাট-বাজার কেন্দ্রী পরিবেশে তাদেরই সাধ আহ্লাদ-আশা-প্রত্যাশা ও কর্মআচরণই করেছেন তাঁর সর্বপ্রকার বর্ণনার ও বয়ানের বিষয়। পদ্মাপারের গাঁয়ের ভাষার কাব্যিক অধুনায়ন জসীম উদ্দীনের এক বিস্ময়কর বিশিষ্ট দান। এমনকি জসীম উদদীনের 'বোবা কাহিনী' নামের উপন্যাসের এবং আত্মচরিত 'জীবনকথার' বা 'স্মৃতির পটে' গ্রন্থের সাধুরীতিও গ্রাম্যতাদুষ্ট ও ত্রুটিবহুল। কিন্তু তবু পল্লী প্রতিবেশে প্রকৃতির ও প্রকৃতির কোলে লালিত নিরক্ষর মানুষের এবং দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীর বয়ানে ওই ত্রুটিবহুল সরল ভাষাই বর্ণনাকে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজ্জ্বল করে তুলেছে। জসীম উদ্দীন বড়ো কবিও নন, মহৎ কবিও নন, কিন্তু সাধারণ হয়েও অনন্য কুশলী কবি। বাংলা সাহিত্য আকাশে নক্ষত্রের মতো স্বতন্ত্র বিভায় উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত।

আগেই বলেছি জসীম উদদীন সূক্ষ্ম জীবন ভাবনার ও জগৎ চেতনার কবি নন, উঁচু মানের ও মননের, সূক্ষ্ম শিল্পের ও পরিমার্জিত সুরুচির আকাশচারিতা প্রসূত সাহিত্য রচনা তাঁর মতো পল্লীর পরিসরে মাটি ও মানুষ, প্রেম ও প্রকৃতি, ফুল ও পাখি প্রিয় কবি-লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক বা সম্ভব ছিল না। অতএব তিনি বিশেষ জীবন প্রতিবেশে লালিত বিশেষ স্থানের, কালের ও সমাজের মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দলগত বা ব্যক্তিগত জীবনের সুন্দর, সুষ্ঠু ও সার্থক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপকার। এ অনন্যতার জন্যেই তিনি পাঠক সমাজে প্রিয় ও প্রখ্যাত। জসীম উদ্দীন ছাত্রাবস্থায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখেছিলেন করুণ রসের আকর শোককাব্য 'কবর'। এ করুণ কবিতা দীনেশচন্দ্র সেনের অশ্রু ঝরিয়েছিল। অভিভূত অধ্যাপক একে প্রবেশিকা সংকলনভুক্ত করে বাংলাভাষী সমাজে জসীম উদদীনকে প্রশংসিত ও প্রখ্যাত করিয়েছিলেন। তাঁর পর পর প্রকাশিত কাব্যগুলো তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তুঙ্গে তুলেছিল। কেননা এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন সমমনা প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বলে জীবৎকালেই তিনি ছিলেন অনিন্দ্য। তাঁর আদর ও কদর ছিল অটুট, অম্লান ও ব্যাপক এবং সর্বজনীন। তিনি কাব্যে ভিন্ন রূপের ও রসের স্বাদ দিয়েছিলেন সবাইকে। গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় কেউ কারো কাছাকাছিও নন, তবু স্বীকার করতেই হয় যে রবীন্দ্র-নজরুল-জসীম উদদীন তিন ভিন্ন ধারার কবি হিসেবেই উল্লেখ্য ও বিশিষ্ট এবং অতুল্যও। কারো ছায়ায় কেউ আচ্ছন্ন নন। চাঁদ-সূর্যের মতোই স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। জসীমউদদীনের কাব্যে আকাশচারিতা নেই, তাঁর কাব্য কুমড়া-ফুটি-তরমুজ লতার মতোই মাটিলগ্ন সহজ, সুন্দর কিন্তু অননুকরণীয়। এ শক্তি আর কারো মধ্যে দেখা গেল না আজ অবধি।

AMARBOI.COM

জসীমউদদীন অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গদ্য-পদ্য রচনার ভাব-ভাষা-ভঙ্গি পরিবর্তন বা উৎকর্ষ বলতে গেলে দুর্লক্ষ্য বরং 'মাটির কান্না'র [১৯৫১] কবিতায় তাঁর আধুনিক জীবন প্রবণতা ভাষায়-ভঙ্গিতে কবিতার অপকর্ষের কারণ হয়েছে। 'রাখালী' [১৯২৭], 'নকশী কাঁথার মাঠ' [১৯২৮], বালুচর [১৯৩০], ধানক্ষেত [১৯৩১], সুজন বাদিয়ার ঘাট [১৯৩৩], মাটির কান্না [১৯৫১], মা যে জননী কান্দে [১৯৬৩], সকিনা, রূপবতী, হলুদবরণী, জলের লেখন প্রভৃতি নাটক, বোবা কাহিনী আর বউ টুবানীর ফল নামের উপন্যাস, 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশী' নামের শিশুপাঠ্য কবিতা, জীবনকথা, স্মৃতির পট, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়, যাঁদের দেখেছি নামের স্মৃতিকথা, 'চলে মুসাফির', 'জার্মানীর শহরে বন্দরে' প্রভৃতি ভ্রমণকথা আর রঙিলা নায়ের মাঝি প্রভৃতি গানের বই তাঁর রচিত। গ্রন্থনামগুলোও পল্লী জীবন-প্রতীক।

বলেছি, জসীমউদদীনের রচনায় উঁচুমার্গের কোন তত্ত্বদর্শন নেই। গাঁয়ের মানুষ ও প্রকৃতিই গদ্যে-পদ্যে তাঁর অনুধ্যেয় ও বর্ণিত বিষয়। তাই তাঁর ভাব-ভাষা-বাকভঙ্গি এবং উপমাদি সর্বপ্রকার অলঙ্কার গেঁয়ে মানুষের ভাব-অনুভব-উপলব্ধির জগৎ থেকে তথা ঘরোয়া-সামাজিক-ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই সংগৃহীত। তাঁর সাহিত্য তাই যথাযথই গাঁ-ঘেঁষা ও গাঁ-কেন্দ্রী বিষয়ে ও ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে। জসীমউদদীনের কাব্যে Pastoral জীবনের ও প্রতিবেশের আলেখ্য অলঙ্কারের প্রয়োগেই হয়েছে উজ্জ্বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল মোরগের পাখার মত [শাড়ির আঁচল] উড়ে তাহার শাড়ি/জালি লাউয়ের ডগার মত [বাহু], গা-খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু। কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া। [শোকে] গাছের পাতারা সে বেদনায় বুনোপথে যেত ঝরে। যন্ত্র্নী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত/চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের [ঝরা] পাতার শোক/ [বলদের] হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি/বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ/সারারাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে/ [খোলা চুলের মধ্যেখানে] সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো/মুখখানি তার কাঁচা/রূপের গাঙে হারিয়ে গেল/নীল-নোয়ানো সবুজ ঘেরা গাঁ/[সাঁঝের আকাশ'] আবীর রঙে রাঙা/কল্মীরাঙা মুখ/কালো কেশের মত রাতের খাঁড়ায় রবিরে বধিয়া নাচে সে ভয়ঙ্করী [ঝড়], জালি কলার পাতার মত গা কাঁপে তার রাগে/গা-ভরা তার সোহাগ দোলে/মেয়েত নয় হল্‌দে পাখির ছা/দূর্বাবনে রাখলে তারে দূর্বাতে যায় মিশে। বড়শীর মত বাঁকা [কথা] ঝড়ের রাতে বিজলী যেমন চোখ দুটিতে আগ উগরায়। মন নহে সে কুমড়ার ফালি যাহারে তাহারে কাটিয়া বিলান যায়।

এমনি আরো অনেক প্রকৃতি থেকে কুড়ানো সরল-সুন্দর অলঙ্কার কবিতার চরণে চরণে, গদ্য রচনার বাক্যে বাক্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পল্লীর প্রকৃতি ও মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে, অসূয়ায়-রিরংসায়, বিশ্বাসে-সংস্কারে, প্রেমে-বিরহে-বিয়োগে কবির রচনায় বাস্তব ও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে আর জীবনকথায়ও পল্লীই—পল্লীর মোল্লা-মৌলবী-সর্দার-মাতব্বর শাসিত সমাজ ও নিপীড়িত মানুষই মূক না থেকে, দুঃখ-যন্ত্রণায়, স্নেহ-মমতায়-ভালবাসায়-দর্পে-দাপটে কথা কয়ে উঠেছে। তবু জসীম উদদীনের গদ্য-পদ্য রচনামাত্রই, কাব্য নাটক-উপন্যাসমাত্রই বিষাদের-বিয়োগের ও বেদনার বৃত্তান্ত। পল্লীর ও পল্লীর মানুষের জীবনের রূপকার হিসেবে তিনি যেমন স্থূল অর্থে 'পল্লী কবি' অভিধায় প্রখ্যাত, তেমনি গূঢ়ার্থেও স্বরূপে তিনি মাটি-মানুষ প্রেমী জনদরদী কবি। মাটিলগ্ন গৃহগত নির্জিত মানুষের জীবনের ভাষ্যকার-রূপকার কবি। পল্লীর দুস্থ মানবতার প্রতি অশেষ সহানুভূতি ও সহমর্মিতাই তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের পুঁজি। আমরা জানি, হৃদয়বেদ্য চিরন্তন সাহিত্যমাত্রই বেদনার, বিষাদের, বিয়োগের ও জীবনের ট্র্যাজেডীর।

১.

আমাদের ব্যথা কেতাবেতে লেখা, পড়িলেই বোঝা যায়
অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুকে
এদেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখর ভাষায় টুকে
সে ব্যথারে আমি কি করে জানাব?

[নক্‌শী কাঁথার মাঠ।]

২.

কাঁদে এই মাটি, আমি শুধু শুনি মাটিতে এ বুক পাতি।
লিখিব আজি তাদের কথা, কথা যারা বলতে নারে
একশ' হাতে মারছে যাদের সমাজনীতি হাজার মারে।

[মাটির কান্না]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহাগ প্রতীক রূপে
পৌত্র 'অভী' কে দিলাম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্রে ও সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্যগৌরব কি?

মানুষের অবচেতন-অস্পষ্ট জীবন-চেতনার মূলে রয়েছে ভয়-বিস্ময়-ভক্তি-ভরসা ও কল্পনা। এতে, বলতে গেলে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির ঠাঁই সংকীর্ণ ও নিতান্ত সামান্য। তা ছাড়া, মানুষ কখনো নিতান্ত জৈবপ্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত [আহার-নিদ্রা-মৈথুন] অন্য কিছুর চিন্তা সাধারণভাবে করে না। শোনা কথার উপর নির্ভর করে একটা ধারণা সারাজীবন পোষণ করে। নিজের চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান প্রয়োগ করার গরজ বোধ করে না। তাই ওই জৈব প্রয়োজন ছাড়া আর সব বিষয়েই মানুষ গড্ডল বা ফেরু স্বভাবেরই পরিচয় দেয়।

যেমন কোন এক সময়ের এক এলাকার এক গোষ্ঠীর গোত্রপতির ধারণায় জীবন-নিয়ন্ত্রক ভয়-ভক্তি-ভরসার অবলম্বন অদৃশ্য শক্তিটি নারী এবং সাকার। হাজার হাজার বছর ধরে সে-ধারণা বুদ্ধির জ্ঞানের অভিজ্ঞতার ক্রম বিকাশে বহু ও বিচিত্র গুণে-মানে-মাত্রায় তাৎপর্যময় হয়ে উঠলেও সেই মূল ধারণার আর কোন পরিবর্তন হয় না, হয়নি, হবে না। কেননা মানুষ শোনে; বোঝে না, বুঝতে চায় না, বিশ্লেষণে জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় যুক্তিতে অনুভব-উপলব্ধি করতে চায় না। এক কথায়, জানতে বুঝতে চায় না, শুনতে এবং সম্ভব হলে কেবল মানতেই হয় আগ্রহী ও অভ্যস্ত। এমনি অবস্থায় পৃথিবীর আর এক এলাকার, আর এক কালের, আর এক গোত্র-গোষ্ঠীর সর্দারের ধারণায় ভয়-ভক্তি-ভরসার জীবন-নিয়ন্ত্রক শক্তি হচ্ছে নিরাকার নিয়তি। তিনি কঠোরে-কোমলে, খেয়ালে-খুশিতে, অতুল্য এবং প্রায় ধারণাতীত। তিনি পশুবলির মাধ্যমে ভক্তের ত্যাগের ও ভক্তির পরীক্ষা করেন।

এভাবে একের অনুভব, উপলব্ধ সত্য, বিশ্বাস-সংস্কারের তথ্য ও তত্ত্ব অপরের বোধ-বুদ্ধি-শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের যোগ্য হবার মতো কোন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির ভিত্তি খুঁজে পায় না। ফলে একের শাস্ত্র অপরের অবজ্ঞার, অবিশ্বাসের, নিন্দার ও উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ধর্মদ্বেষণার এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয় এভাবেই। এবং তা চিরকাল অবিলুপ্ত থাকে।

এমনি অবস্থায় হিন্দুর বা খ্রীস্টানের ঈশ্বর মুসলমানের মঙ্গল করতে রাজি থাকার কথা নয়, তেমনি মুসলমানের আল্লাহই বা হিন্দু-বৌদ্ধের কল্যাণ করবেন কেন? এ ভাবে ভাবতে ও বিশ্লেষণ করতে গেলে তত্ত্বের, মননের, দর্শনের কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, যাবে না, যায়নি।

পৃথিবীর মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক অনেক এগিয়েছে। কিন্তু কেউ নির্মোহ নাস্তিক্যভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না বলে, ভয়-ভক্তি-ভরসা জড়িত ইহ-পরলোকে প্রসৃত অমর আত্মা সম্পৃক্ত পাপ-পুণ্যের ভয়-ভরসা জড়িত বলে এ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে গোটা দুনিয়ার অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণী-কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক-বিজ্ঞানী সমভাবেই ভীরু ও আস্তিক। ভূতে-ভগবানে এখানে তাঁদের সমান আস্থা, ভয় ও ভক্তি। তাই শাস্ত্রের, তত্ত্বের, মননশীলতার বা দর্শনের ক্ষেত্রে মানুষ মোটেও অগ্রসর হয়নি। এ সব কাল্পনিক বানানো তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, বিশ্বাস ও সংস্কারকে তারা শাস্ত্র, দর্শন এবং জগৎ ও জীবনতত্ত্ব, তথ্য ও সত্য বলে অবিচলচিত্তে নিঃসংশয়ে মানে। এর নামও জ্ঞান অর্থাৎ এদের কাছে বিস্ময়, কল্পনা এবং ভয়-ভক্তি-ভরসার আশা-প্রত্যাশাও জ্ঞান-- যা মূলত ও কার্যত একেবারেই বানানো, মনগড়া বা মননশীলতার ফসলমাত্র।

অথচ এমুহূর্তেও মানুষ একেই নৈতিক, অলৌকিক, আধ্যাত্মিক অদৃশ্য জগতের অধিকর্তার বাণী বলেই জানে এবং মানে। এ যেন তাঁরই অভিপ্রায় জীবনে রূপায়িত করার প্রয়াস। বিভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বীর কথা বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অসহিষ্ণুতার, অনাপসের, মতের, আচার-আচরণের এবং পালা-পার্বণের ক্ষেত্রে অবজ্ঞা-বিদ্বেষের কারণও এ-ই। মানুষ নাস্তিক না হলে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি যোগে তাদের মোহমুক্তি ঘটবে না আর মারামারি হানাহানিও চলতে থাকবে। নিরুপদ্রব নিরাপদ সহাবস্থানও তাই কখনো সম্ভব হবে না। কারণ এর মধ্যে শ্রেণী স্বার্থেরও প্রয়োজন এবং উস্কানি থাকবে।

প্রবৃত্তি পরবশ মানুষ যে শাস্ত্র মানে, তা নয়। প্রলোভন প্রবল হলেই ঈশ্বর বা স্রষ্টা সব দেখেন শোনেন বোঝেন জানেন অনুভব করেও হেন পাপ নেই যা করে না। অর্থাৎ অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি বশে হেন অশাস্ত্রীয় কাজ নেই যা করে না। পাপের ভয়াবহতা জেনেও পাপ করে। শুধু লোকনিন্দা ও সরকারী শাস্তির ভয়েই মানুষ অপকর্ম থেকে, অপরাধ থেকে বিরত থাকে। অতএব ধর্মকে তারা মহামূল্য সম্পদ বলে মানে না। জাতীয় অভিমানের, গৌরবের, গর্বের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের ও ঐশ্বর্যের অভিমানবশেই গৌরব-গর্বের অবলম্বন করে। তার জন্যে পাপ-পুণ্যের, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার না করেই জান কবুল করেই বিধর্মী, বিজাতি, বিগোত্র, বিভাষী, বিদেশী ও বিদলের লোককে চরম উত্তেজনায় ও পরম উৎসাহে হত্যা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রাজনীতিক স্বার্থপরবশ মানুষ আর একটি বিষয়েও অপ্রয়োজনীয় অসার্থক অনগ্রসরণমূলক স্বাতন্ত্র্যে উৎসাহ দিয়ে থাকে। সেটি হচ্ছে দৈশিক, জাতিক, গৌত্রিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় উৎসাহ দান। মূলত এটি যে অনগ্রসরতা, অপ্রগতিশীলতা, শ্রেয়োকে বরণের, গ্রহণের, অনুসরণের, অনুকরণের পথ বন্ধ করে দেয়া তা তারা বুঝেও রাজনীতিক স্বার্থে কখনো স্বীকার করে না। এদের কথায় মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে সম্পদ দৈশিক, জাতিক, গৌত্রিক জীবনে আর কিছুই হতে পারে না, থাকতে পারে না। অথচ আমরা জানি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে রয়েছে মানব-উত্তরাধিকার। মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি এগিয়েছে এভাবেই। যারা নির্বিচারে শ্রেয়োকে, উৎকর্ষকে জীবনের প্রয়োজনীয় সম্পদকে গ্রহণ-বরণ করেছে, তাদেরই কেবল সভ্যতা এগিয়েছে। এ জেনে বুঝেও আমাদের শহুরে শিক্ষিত লোকেরা আরণ্যচারীদের ও উপজাতিদের আচারিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় জান কবুল। কার্যত এদের সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ রুদ্ধ করে চিরকাল এদের অনগ্রসর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিযোগী রাখাই এদের মূল উদ্দেশ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুবা এরা তাদের বোঝাত যে প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, পালা-পার্বণ, চেতনা-চিন্তা আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের অসামর্থ্যজাত মাত্র। কেননা সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব কেবল নতুন চেতনার, চিন্তার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, হাতিয়ারের উৎকর্ষের, জীবনের সুখ-সুবিধা উন্নয়নের অনবরত প্রয়াসেরই ফল। সংস্কৃতি হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে বৃক্ষের কিশলয়ের মত। সদা বিকাশশীল ও সদা উন্নয়নশীল যে দেশের, জাতির বা গোত্রের মানুষের জীবনে নতুন চিন্তার, চেতনার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, জীবনের প্রয়োজনের সামগ্রী নির্মাণের ও বিকাশের কোন প্রয়াস নেই, সে সমাজ বন্ধ্যা। ওতে আবর্তন আছে, বিবর্তন নেই। যা কেজো নয়, যুগোপযোগী নয়, জীবনের নব নব প্রয়োজন মেটায় না, সেসব বিশ্বাস-সংস্কারের, আচরণের-আচারের, পালা-পার্বণের সার্থকতা কি? গৌরব কি? এবং তা সম্পদরূপে বিবেচিত হবার সার্থকতাই বা কি?

আজ সময় এসেছে স্বধর্ম, বিধর্ম, স্বশাস্ত্র, পরশাস্ত্র, স্ব-সংস্কৃতি, পরসংস্কৃতি প্রভৃতির পার্থক্যচেতনার গৌরব-গর্ব মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির এবং মনুষ্যত্বের বা মানবতার বিকাশের পক্ষে সহায়ক কিংবা কতখানি ক্ষতিকর তা বিবেচনা করে দেখার। এখন আমাদের চিন্তা-চেতনা মানব কল্যাণের দিকে চালিত করা আবশ্যিক ও জরুরী বলে মনে করি।

তা ছাড়া সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য কথাটাই তো ভুল। সংস্কৃতি যদি হয় মানুষের মন, মনন, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা যা জৈব বা ব্যবহারিক প্রয়োজনে হাতিয়ারের, স্বাচ্ছন্দ্যের, ভোগ-উপভোগের, আরাম-আয়াস-অনুভব-উপলব্ধি-আনন্দের উৎকর্ষ ও বিকাশ, সৌকর্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজন হয়, তা হলে সহাবস্থানের নীতি-নিয়ম মানার সর্বোপরি মানবিকগুণের, মানের ও মাত্রার বিচিত্র বিকাশ, তথা মনুষ্যত্বের বা মানবতারই প্রকাশ এবং বিকাশ ঘটানো আবশ্যিক। সংস্কৃতি তো যে-কোন মানুষের ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনা-বুদ্ধি-কৌশল-কৌতূহল-জিজ্ঞাসারই সৃষ্টি, আবিষ্কার বা উদ্ভাবন। এতো সর্বকালিক সর্বদেশিক ও সর্বমানবিক উত্তরাধিকার। এতে স্বাতন্ত্র্যই বা থাকে কি করে? যা ভালো, যা মঙ্গলকর, যা মানবিক ও যা মানুষের মানসিক জীবনে ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে উৎকর্ষ ঘটায় তা-ই তো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি তো এ অর্থে মানবপ্রজাতির মনুষ্যত্বে উত্তরণমাত্র। বৃত্তি-প্রবৃত্তির সংযমনে সংকীর্ণতা পরিহারে, অহিংসায়, সহায়তায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে সৌজন্যে বহুজন সুখ ও হিত চেতনায় সমমর্মিতায় উদারতায় ক্ষমায় উপচিকীর্ষায় ও ভালোবাসায় মাত্র সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশ সম্ভব। তা হলে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরূপ চেতনাটি কি এবং কেন? যে-কোন মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-আবিষ্কার-উদ্ভাবন কল্যাণকর হলেই তা হবে মানবসম্পদ। তাতে থাকবে সর্বকালের সর্বঅঞ্চলের সর্বপ্রকার মানুষের স্বাধিকার। পর উদ্ভাবিত-আবিষ্কৃত জীবনের ভোগ-উপভোগের সামগ্রী থেকে, যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তির প্রয়োগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখার, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-ভাস্কর্য-পোশাক থেকে সৌন্দর্য-সৌকর্য-লাবণ্য-সুখ-আরামের উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যগৌরবের, গর্বের কি আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালীত্ব ও সংস্কৃতি

সভা-সমিতি-মিছিল-বিবৃতি-বক্তৃতায় বা রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনায় আমরা পার্বণিকভাবে আমাদের ধর্মনির্বিশেষে বাঙালী জাতীয়তার, বাঙালীত্বের ও বাঙালী সংস্কৃতির অভিন্নতার, অবিচ্ছেদ্যতার গৌরবপর্ব উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে থাকি বটে, কিন্তু আসলে আজো হিন্দুর ঘরোয়া জীবনে 'বাঙালী' মানে হিন্দু আর দেশজ বৌদ্ধ-হিন্দুজ গেঁয়ো অজ্ঞ-অনক্ষর কুলি-মজুর-চাষীও কেবল মুসলমান, বাঙালী নয়। অধিকাংশ দেশজ মুসলমানও প্রথম পরিচয়ে মুসলমান এবং পরে বাঙালী অর্থাৎ তারা মুসলমান বাঙালী কিংবা বাঙালী মুসলমান। মুখ্যত বাঙালী নয়। এসব স্বীকার করলে অনেক কাপট্য, আত্মপ্রতারণা ও পরপ্রবঞ্চনা এড়িয়ে বিবেক ও চরিত্র অম্লান-অক্ষত রাখা যায়।

মনস্বী-মনীষীরাও যে নিজেদের অজ্ঞাতেই অবচেতনভাবে এ ক্ষতিকর বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে চলেন, তার একটা সামান্য প্রমাণ ১৯৯০ সনের সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর সাহিত্য সংখ্যা— এসংখ্যায় রয়েছে সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ, প্রচার ও ভূমিকা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনির্ভর ঐতিহাসিক আলোচনা। কিন্তু সবটাই হিন্দুর পত্রিকা ও হিন্দু সম্বন্ধে, যেন বাঙলায় সে-কালের কোলকাতায় সে-সময়ে মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-আর্থিক-শৈক্ষিক বিষয়ে কোন সাময়িকপত্র মুসলিম পরিচালিত ছিল না, তাদের কোন ভূমিকা ছিল না। বাঙলার, বাঙালীর, বাঙালীত্বের এবং সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্মের ইতিহাস যেন কেবল হিন্দুরই।

আমরা যখন ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী হতে চাই, যখন কেবল বাঙালী সংস্কৃতির অভিন্নতা প্রমাণে প্রয়াসী, তখনো যদি মনোলোকে কেবল হিন্দু কিংবা কেবল মুসলিম থাকি, তবে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আমরা বাঙলার, বাঙালীর, বাঙালীত্বের ইতিবৃত্ত কিভাবে রচনা করব? ভৌগোলিক, ভাষিক, বার্ণিক, গৌত্রিক, দ্রাবিড়-অস্ট্রিক ঐতিহ্য পরম্পরার স্মৃতি, গৌরব, গর্ব অথবা আত্মপরিচিতি কিভাবে ধরে রাখব!

সংস্কৃতির নাকি একশ ষাটটি সংজ্ঞা প্রতীচ্যদেশে চালু রয়েছে। মানবপ্রজাতির অর্জিত ব্যবহার বা অভ্যাস বা অনুশীলনজাত উৎকর্ষ তথা প্রকৃতিকে দাস-বশ বা আপসে অনুকূল করে কৃত্রিম ও স্বাধীন মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনাচার সৃষ্টিই যদি সংস্কৃতি হয়, তাহলে মানবপ্রজাতির স্থানিক, কালিক, গৌত্রিক, গোষ্ঠিক, প্রাতিবেশিক, পারিবেশিক সংস্কৃতি তথা আচার আচরণ অবশ্যই রয়েছে। এ তাৎপর্যে সব মানুষেরই 'সংস্কৃতি' আছে। এজন্যেই উন্নত গুণের মানের মাপের ও মাত্রার মানসিক-ব্যবহারিক জীবনাচারকেই আমরা 'সংস্কৃতি' নামে আখ্যাত করি। অন্যসব মনুষ্যাচার হচ্ছে লৌকিক অলৌকিক এবং অলীক পার্থিব ও আসমানী বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রসূত দেশাচার ও লোকাচার। তার নাম একালে 'ফোকলোর' লোকসংস্কৃতি বা লোকাচার। যদিও শাস্ত্রও মূলে এ বিভাগে পড়ে, তবু তা অপার্থিব, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, পারত্রিক বলে তাকে আমরা অপৌরষেয় কিছু বলে জানি ও মানি।

যা দেখতে, শুনতে, বলতে, করতে কুৎসিত, ক্ষতিকর অরুচিকর ও অবাঞ্ছিত তা-ই অসংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি, যা এর বিপরীত, যা শ্রেয়ো, যা হিতকর, যা সুন্দর, যা অনুভবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলব্ধিতে আনন্দ ও সুখ দেয়, যা অপরকে আকৃষ্ট আসক্ত অনুরাগী করে তা-ই সংস্কৃতি। এজন্যেই সংস্কৃতির প্রথম ও শেষ সংজ্ঞা হচ্ছে প্রীতিকর আচার-আচরণ-সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য।

কিন্তু রুচিভেদে তথা শৈশবের-বাল্যের-কৈশোরের-যৌবনের পরিবেশ-প্রতিবেশ মানুষকে নানাভাবে বদলায়। পোশাকের দৃষ্টান্তেও এটি বোঝানো সম্ভব। কেউ শার্ট-কোর্ট-ধুতি পরে, কারো ব্যক্তিজীবনের নানা চিন্তায়-চেতনায়-মননে-অনুভবে-উপলব্ধিতেও এমনি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে। তাছাড়া একই দেশের, ভাষার, গোত্রের মানুষের মধ্যে বিশিষ্টতা সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষণ দৃশ্যমান। তাতেও একালে দৈশিক, ভাষিক, রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গড়ে উঠে, গড়া আবশ্যিক ও জরুরী হয়। একালে গণতন্ত্র অঙ্গীকারের প্রথম শর্ত হচ্ছে দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তা অঙ্গীকার করা। এবং এর ভিত্তি হচ্ছে কেবল ইহজাগতিক জীবন-চেতনা। কেননা মানুষ বিশ্বাস-সংস্কারচালিত বলে লৌকিক-অলৌকিক-অলীক-আসমানী ও পার্থিব নানা বিষয়ে মানুষে মানুষে ভিন্নতা ও ব্যবধান চিরদুর্লঙ্ঘ্য। সে পথে কোন দুটো মানুষের মনের, মতের ও আচার-আচরণের মিল হয় না, হবে না। তাই আমরা মানুষের বিশ্বাস সংস্কারজাত আচার-আচরণ, মত-পথ প্রভৃতিকে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণ হিসেবেই গ্রহণ-বরণ করব। যেমন মানুষ নিয়তি মানে, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য মানে। এগুলো আসলে কারণ আবিষ্কারের বা জানার বা ভাবার অক্ষমতা জাত বিশ্বাস বা সংস্কার। কারণ জানা অসম্ভব হলে আমরা অদৃষ্ট নিয়তি-ঈশ্বর প্রভৃতির লীলাই জীবনে অনুভব করি ও তাতে আস্থা রাখি।

কাজেই আমরা যেহেতু বাস্তবে জাগ্রত মুহূর্তে ইহজাগতিক জীবনই যাপন করি, একটা দেশের সব মানুষেরই জীবনে যেমন আকাশের রৌদ্র-বৃষ্টি, মাটির উর্বরতা ও আর্দ্রতা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, খরা-বন্যা-মহামারী, লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্যপুঁজি, শিল্পপুঁজি, অশন-বসন, নিবাস-নিদান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রশাসন সবকিছুতেই একই অবস্থার, অবস্থানের প্রতিবেশের শিকার, আমাদেরই সবারই হাট-বাট-মাঠ-ঘাট, নদী-নালা-খাল-বিল অভিন্ন। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একই পরিবেশ প্রতিবেশ আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। রোগে-শোকে-সুখে-আনন্দে-আরামেও কোন পার্থক্য নেই, যেহেতু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক পেশাগত আর্থিক এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাগত জীবনে কোন মানসিক মন-মতের পার্থক্য নেই, সেহেতু দেশের সব মানুষই দৈনন্দিন জীবনে, বৈষয়িক চিন্তা-চেতনায় নিতান্ত মাটিলগ্ন ও গৃহগত। এই ইহজাগতিকতাই আমাদের অভিন্ন দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তার বন্ধনে অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধে। আবার আর্থ-সামাজিক শ্রেণীচেতনা আমাদের মধ্যে সাময়িকভাবে অথবা চেতন-অবচেতনভাবে কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি ঘটায় এবং জিইয়ে রাখে বটে, কিন্তু তাতে ইহজাগতিক জাতীয়তাবোধে সহজে ফাটল ধরাতে পারে না।

কাজেই আমরা যখনই বাঙালীর গৌষ্ঠীক গৌত্রিক ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অভিন্নতার ও অবিচ্ছেদ্যতার কথা বলব, তখন কেবল ঐ ইহজাগতিক চেতনা এবং সংজ্ঞায় গুরুত্ব দেব। অতএব আমাদের বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব ইহজাগতিক চেতনাভিত্তিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই বাঙলাদেশের আস্তিক-নাস্তিক-সংশয়বাদী-নিরীশ্বর-উদার মনীষী, মানবপ্রেমী ও দেশহিতকামী মাত্রের কাছেই আমাদের আবেদন, তাঁরা যখনই বাঙলার, বাঙালীর ও বাঙালীত্বের কথা বলবেন, তাঁরা যেন সুপ্রাচীন কাল থেকেই আজকের এ মুহূর্ত অবধি বাঙালীর যে-কোন বিষয়ে আলোচনায় সব বাঙালীর কথাই যেমন বৌদ্ধ হিন্দু খ্রীস্টান মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীর অবস্থা, অবস্থান কিংবা ভালো-মন্দ যে-কোন বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে তথ্য প্রমাণ যোগে আলোচনা করেন। তাতেই কেবল বাঙালীর ভাষিক জাতীয়তা অকৃত্রিম ও দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠবে, যা একান্তভাবে গড়ে ওঠা আবশ্যিক ও জরুরী আমাদের মননের ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের প্রয়োজনেই। মনুষ্যত্বের বিকাশ-বিস্তারমুখী ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ মাত্রই মানবসংস্কৃতি এবং ব্যবহারিক জীবনের সৌকর্য ও উৎকর্ষ সাধক যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তিবিজ্ঞানও সংস্কৃতি বিকাশক।

মানুষের নিয়ন্তা কে : রাশি না ঈশ্বর?

আস্তিক মানুষও যে, না জেনে, না বুঝে কারণ-কার্য না শুনে, প্রয়োজন বা প্রয়োগ না জেনে কেবল অন্যমানুষের আচার-আচরণের অনুকরণে-অনুসরণে কর্মে আচারে-আচরণে অভ্যস্ত হয়, তার প্রমাণ ব্যক্তিমানুষের কোন দুটো ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সঙ্গতি সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া হয় না। যেমন ঈশ্বর যদি স্রষ্টা হন, শাস্ত্র যদি ঈশ্বরপ্রোক্ত হয়, মানুষের জন্ম-মৃত্যু-জীবনের নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক যদি ঈশ্বর হন, অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, নিয়তি, কর্মফল প্রভৃতি যদি জন্মক্ষণ থেকেই ঈশ্বরনির্ধারিত ও ঈশ্বর-নির্দিষ্ট হয়, তাহলে ঈশ্বর-জেহোভা-ভগবান-গড-আল্লাহ-স্রষ্টাই জগতের ও জীবনের সর্বময় নিয়ামক নিয়ন্তা-কর্তা-প্রভু বা মালিক।

বারো মাসে বারো রাশি যদি ব্যক্তিমানুষের জীবনের লাভ-ক্ষতির, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের, সাফল্য-অসাফল্যের, রোগ-শোকের, জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা হয়, তাহলে ঈশ্বরের কাজ কি, শক্তি কি, ক্ষমতা কি, দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? তাহলে তো ঈশ্বর ক্ষমতাহীন এক অস্তিত্বমাত্র।

গ্রহ-নক্ষত্র-দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্ন যদি জীবন-নিয়ন্তা হয় এবং বিভিন্ন মানুষ যদি বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে, বারো রাশির বারো প্রকারের ও শক্তির নিত্য নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে দুনিয়ার সাড়ে পাঁচশ কোটি মানুষ বারো রাশির বারো ভাগে থেকে কলুর বলদের মতো আবর্তিত জীবনযাপন করে। কিন্তু দেখা যায় বিমানে-জাহাজে-বাসে-রেলে-ভূকম্পে-আগুনে একই স্থানে ও কালে একই ভাগ্য বা পরিণাম বরণ করে, এ কি করে হতে পারে? সেখানেও কি রাজনীতিক ব্যবসায়িক প্রথা-পদ্ধতিতে সংহতি, ফ্রন্ট-সিন্ডিকেট রয়েছে— তাছাড়া পূর্বজন্মের কর্মফল যদি পরজন্মে ভোগ্য হয়, তাহলেই বা অভিন্ন পরিণামের বা ভোগ-উপভোগের অংশভাক হয় কি করে একত্রে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানীরা বলেন এখনো সৌরমণ্ডল ছাড়াও অন্য অনেক নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডল রয়েছে। ফার্মামেন্টের তথা আকাশের পরিসর বাড়ছে, নতুন নক্ষত্রও দৃশ্য হচ্ছে, 'ব্যাঙ' নামের এক উৎস কেন্দ্র রয়েছে বিশ্বমণ্ডলের, তা আজো সৃষ্টিশীল। এ অবস্থায় বারো রাশি কি করে হয় বিশ্বনিয়ন্তা, মানুষের জন্ম-জীবন-মৃত্যু নিয়ামক? আরো আশ্চর্য কথা জ্যোতিষীরা আশ্চর্য গণনাশক্তি যোগে নক্ষত্রমণ্ডলের রাশিগুলোর মন-মত-মতলব, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ আগে ভাগেই দেখতে, জানতে ও বুঝতে পারে। ওই রাশিগুলো নিজেদের মতলব, কর্ম ও আচরণ গোপন রাখতে অসমর্থ। এমন কি ঈশ্বরও তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কাজ-কর্ম গোপন রাখতে পারেন না। কোন্ মহারাজা, কোন্ রাষ্ট্রপতি, কোন্ নেতা, কোন্ মনীষী, কোন্ বছরের, কোন্ মাসের, কোন্ দিন নিহত হবেন, মরবেন কিংবা পদচ্যুত হবেন তা-ও তারা আগাম বলে দিতে পারে। শুধু তা-ই নয়। এরা তুক-তাক, বাণ-উচ্চাটন, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী-সূতা-তাগা, অষ্টধাতু, পাথর, আংটি প্রভৃতিযোগে ঈশ্বরের, ভূত-প্রেতের, দেও-দানুর, রাশিচক্রের ইচ্ছা ও কর্ম ব্যর্থ করে দিতেও পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার, কাজের, অভিপ্রায়ের রাশিগুলোর মতলব ও প্রভাব বলতে পারে যারা, তারা কিন্তু নিজেরা আমাদের মতোই নিজেদের ভবিষ্যৎ জানে না, অর্থবিত্তও পারেনা ইচ্ছে মতো সংগ্রহ-সঞ্চয় করতে, মরেও আমাদের মতো রোগে কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায়। আস্তিক মানুষ যে যুক্তি-বুদ্ধি কাজে লাগায় না, কেবল বিশ্বাসে-সংস্কারে তাৎপর্যশূন্য অনুকরণে অনুসরণে প্রয়োজন ও প্রয়োগ চেতনাশূন্য ভাবে কলুর বলদের মতোই চালিত হয়ে জীবন কাটায়, এ তারই সাক্ষ্য প্রমাণ। মানুষ র‍্যাশানাল বা যুক্তিবাদী-যুক্তিবুদ্ধি চালিত না হলে সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্বের-মানবিকগুণের বিস্তার ও উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব হবে না।

AMARBOI.COM

সমাজে শাস্ত্রের প্রভাবের স্বরূপ

ধর্মনামের শাস্ত্রকে অজ্ঞ-অনক্ষর, শিক্ষিত সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাসচালিত মানুষ সত্য বলেই মানে, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিচালিত লোকেরা একে অলীক অলৌকিক বানানো তত্ত্ব বলেই জানে, শাহ-সামন্তরা একে লোকপ্রশাসনে কেজো বলেই অনুভব-উপলব্ধি করে। কৌটিল্য থেকে ম্যাকিয়াভেলি অবধি কোন দার্শনিক মনীষীই এর উপযোগ অস্বীকার করেননি। কেননা শাসনে-প্রশাসনে, শোষণে-পীড়নে, প্রতারণায়-প্রবঞ্চনায় আসমানী শক্তির দোহাই আর ঐক্য, সংহতি এবং সঙ্ঘশক্তি বিনাশী ভেদনীতির মতো প্রয়োগসফল প্রয়োজনীয় হাতিয়ার শাসক-শোষকের আর দ্বিতীয়টি নেই। আজ অবধি এর বিকল্প মেলেনি। এ মুহূর্তেও স্বৈরাচারী বুর্জোয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক-প্রশাসকরা, শোষক-পীড়ক-প্রতারক-প্রবঞ্চকরা ধর্মমতের ও শাস্ত্রের পার্থক্য ও ভিন্নতা জাত স্বাতন্ত্র্যের অভিমান-গর্ব-গৌরববোধে গুরুত্ব দিয়ে, উৎসাহ-উত্তেজনা-প্ররোচনা যুগিয়ে অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে জনগণমনে বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বিদেশী-বিশ্রেণী দ্বেষণা তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তোলে স্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও স্বশ্রেণীর স্বার্থে। প্রয়োজনে কালিক প্রয়োগে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত রক্তক্ষরা ও প্রাণহরা করে তোলে স্থানে স্থানে বা রাষ্ট্রে।

বানানো অলীকের, রটানো অলৌকিকের আসমানী যাদুশক্তির বুজুরুকি প্রভৃতিতে জ্ঞানী বুদ্ধিবাদী সক্রেটিসের আস্থা ছিল না। এগুলো যে অজ্ঞ-অনক্ষর অবুঝ ও অসহায় মানুষকে ভয়-ভক্তি ভরসার ধোঁকায় দাস-বশ রাখার প্রবল বুদ্ধিমান-সৃষ্ট সহজ সুনিপুণ কূট-কপট কৌশল মাত্র, তা তিনি জানতেন। তাঁর অর‍্যাকলে [oracle] বিশ্বাস ছিল না, মানতেন না তিনি চালু বিশ্বাস-সংস্কার-আচার। তাইতো তিনি দ্রোহী, সমকালীন স্বদেশের ও স্বজাতির নীতি নিয়ম আচার লঙ্ঘনে যুবসমাজকে প্রেরণা-প্রবর্তনা দানের অপরাধে পেলেন মৃত্যুদণ্ড, হারালেন প্রাণ, হারালেন বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার। আমরা সক্রেটিসকে জ্ঞানী বলে জানি। কিন্তু তাঁর মুখে উচ্চারিত বলে চালু এবং তাঁর আচারে আচরণে পরিব্যক্ত বলে প্রচারিত কোন কিছুই আমরা আড়াই হাজার বছর পরেও শ্রেয়োবোধে বরণ করিনি। তাঁর বাণী কেবল পার্বণিক উচ্চারণে সম্মানিত, জীবনে রূপায়িত নয় কারো। তা হলে বোঝা গেল, মানুষ মহৎ ও সত্যবাণী কপচায়, কিন্তু প্রেয় নয় বলে, শ্রেয়োচেতনা বশে বাস্তবে প্রয়োগ করে না।

আরো একটা কথা, অজ্ঞ-অনক্ষর সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাসচালিত সাধারণ মানুষ নয় কেবল, তথাকথিত লেখাপড়া জানা শিক্ষিত এবং উচ্চ ডিগ্রিধারী বিদ্বান ব্যক্তিরাও জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির গুরুত্ব ও কার্যকরতা সচেতনভাবে অনুভব করে না বলে, কেবল আশৈশব শোনা-দেখা আচার-আচরণ-সংস্কার-বিশ্বাসনিষ্ঠ বলে, তাদের ভূতে ভগবানে, অপ-উপশক্তি অবিশেষে অদৃশ্য শক্তিতে ও নিয়তিতে, ভাগ্যে ও কর্মফলে আস্থা গাঢ় ও গভীর। কাজেই প্রতিটি মানুষের শাস্ত্রানুগত্যের মূলে থাকে জৈব ও পার্থিব জীবনের আপদ-বিপদ, ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, চাওয়া-পাওয়া সম্পৃক্ত স্বার্থ। এককথায় সর্বপ্রকারে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারই প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের চেতন-অবচেতন, ব্যক্ত-গুপ্ত ও সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার উৎস, সাধারণ মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ অভিন্ন-মূল রসুনের মতোই বিশ্বাস-সংস্কারকে পুঁজি-পাথেয় করেই হয় অভিব্যক্ত। ধর্মশাস্ত্রে যে একটা মানবজীবনের তাৎপর্য ও লক্ষ্য, তার সামাজিক সহযোগিতায় সহাবস্থানের একটা তত্ত্বদর্শন ইহপরলোকে প্রসৃত মহাশক্তি স্রষ্টা-নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত একটা নীতি-নিয়ম-আদর্শ-উদ্দেশ্যের বন্ধনসূত্র থাকে, তার সঙ্গে এসব সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাসচালিত এবং জৈব-পার্থিব জীবনের প্রাত্যহিক স্বার্থচেতনা বিজড়িত মনের মননের মানুষের সাধারণভাবে কোন যোগ থাকে না।

এদের কাছে ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র হচ্ছে ঝাড় ফুঁক তুক তাক দারু টোনা বাণ উচ্চাটন তাবিজ কবচ-মন্ত্র মাদুলী মন্ত্রপূত পানি কিংবা মন্ত্রশক্তিধর সূত্র প্রভৃতিকে সারাজীবন বিপদে-সম্পদে, সুখে দুঃখে, লাভে-ক্ষতিতে দৃঢ় অবলম্বনে মানসিকভাবে এবং প্রতীকী বাস্তবে আশ্রিত থাকা।

প্রথম শতকের রোমান দার্শনিক সেনেকা বলেছিলেন ধর্মশাস্ত্রকে বিশ্বাসচালিত অজ্ঞ জনগণ সত্য বলে মানে, জ্ঞানীরা জানে মিথ্যে বলে, আর শাসকরা জানে প্রজাশাসনে কেজো বলে।

[Religion is regarded by the Common people as true, by the wise as false and by the rulers as useful; senecca]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনেকা Common people অর্থে এসব সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাসচালিত জৈব-পার্থিবের প্রয়োজন সচেতন স্বার্থপর অজ্ঞ অনক্ষর বা তথাকথিত জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগের গুরুত্ব চেতনারিক্ত মানুষকেই নির্দেশ করেছেন। এরা আজকের পৃথিবীতেও হাজারে নয়শ-নিরানব্বই জন। ধর্মের, শাস্ত্রের, নিয়তির অলীক অলৌকিক আসমানীশক্তির অভিপ্রায়ের দোহাই দিয়ে এদেরই শাহ-সামন্ত শাসক শোষক, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-অর্থ-বিত্তলিপ্সু রাজনীতিক, সওদাগর, কারখানাদার প্রভৃতি আত্মপ্রসারকামী শ্রেণীগুলো ভয়-ভক্তি-ভরসায় কাবু রেখে দাস-বশ করে জনগণকে শাসন-শোষণ করে।

মানস ও ব্যবহারিক সংস্কৃতি হচ্ছে মনীষার প্রসূন। ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা-রুচি-বুদ্ধি প্রয়োগে আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত ফসল। একের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন স্বদেশের স্বকালের স্বসমাজের নয় কেবল, সর্বকালের ও সর্বদেশের, বিশ্বমানবের সম্পদ। এভাবে একের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার অনুকারী অনুসারীদের আচারে-সংস্কারে প্রয়োগে আচরণে রূপায়িত ও প্রচল থাকে। অতএব একের সৃষ্টিই অপরের আচার। এ সৃষ্টিশক্তিই, এ সৃষ্টিশীলতাই হচ্ছে সংস্কৃতি। তরুণ ফুল-ফলের মতোই সংস্কৃতির প্রাণ ও প্রসূন হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। ব্যক্তিই—সমাজ নয়, সৃষ্টিশীল। কাজেই ব্যক্তির সংস্কৃতিই দৈশিক সামাজিক সাম্প্রদায়িক বা বৈশ্বিক আচার-আচরণ নীতি-নিয়ম, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, ব্যবহার্য গার্হস্থ্য সামগ্রীরূপে স্থিতি পেয়ে মানস ও বস্তুগত সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরী করে। বস্তুর শোভা লাবণ্য সৌকর্যই সংস্কৃতির লক্ষণ, মানস সুরুচি ও সৌজন্যই জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিসম্মত ন্যায়বোধ ও কর্ম-আচরণই সংস্কৃতি।

অতএব আবিষ্কার উদ্ভাবনরূপ সৃষ্টিশীলতাই— রুচির সূক্ষ্মতাই, ন্যায়বোধের, দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার চেতনার প্রসার ও উৎকর্ষই সাংস্কৃতিক প্রয়াস-প্রযত্নের প্রমাণ। বলেছি, মূলত ও মুখ্যত এ ব্যক্তিবিশেষের অবদান, তবু একেই আমরা শাস্ত্রিক, দৈশিক, স্থানিক, গৌত্রিক, জাতিক, ভাষিক ও রাষ্ট্রিক সংস্কৃতি নামে অভিহিত করে অনুভব-উপলব্ধিলভ্য এ দৃশ্য-অদৃশ্য ব্যক্তিক ও সামাজিক অভিব্যক্তিকে চিহ্নিত করি। কোন বিষয়েই যাদের মনে ফরক করে দেখা-জানা-বোঝার কোন কৌতূহল নেই, যাদের মনে কোন শোনা বিষয়ের সভ্যতা অকৃত্রিমতা যাচাই-বাছাই করার আগ্রহ থাকে না, যাদের সংস্কার-বিশ্বাসের ন্যায্যতা ও ফল সম্বন্ধে কখনো কোন সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা জাগে না, তারা কেবলই অনুকরণে ও অনুসরণে, জৈব-পার্থিব প্রয়োজনে গ্রহণে বর্জনে তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে। আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কিংবা কেজো অকেজো যাচাইয়ের শক্তি বা আগ্রহ তাদের থাকে না। তাই তাদের মনন চিন্তন নেই, তাদের চেতনা নির্লক্ষ্য ও বন্ধ্যা। তারা মানব প্রজাতিরূপে মুখ্যত বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত প্রাণীর জীবনই যাপন করে, এদের মধ্যে প্রথা-পদ্ধতিনিষ্ঠাই দৃশ্যমান, অনুশীলনজাত মানবিকতা বা মনুষ্যত্ব দুর্লক্ষ্য। এমন মানুষই শাস্ত্রমানার নামে অলীক-অলৌকিক-আসমানী যাদুশক্তি মানে, অথচ সিনাগগ-গির্জা-মঠ-মসজিদ-মন্দির ভেঙে, কারো শাস্ত্রগ্রন্থ পুড়িয়ে, বিধর্মী হত্যা করে আজো কেউ আসমানী শাস্তি পেয়েছে বলে প্রমাণ নেই।

এ প্রথাবদ্ধ জীবনে যে-সব নীতি-নিয়ম অনুসৃত হয়, তা সংস্কৃতির প্রসূন নয়, আচারের আবর্তিত রূপমাত্র। একেই লোকসংস্কৃতি নামে স্বীকার করা হয় বটে, কিন্তু এ হচ্ছে স্বরূপে বিশ্বাস-সংস্কারের, প্রথা-পদ্ধতির, লোকাচার-দেশাচারের যান্ত্রিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাজন্মক্রমিক আবর্তিত বা অনুসৃত রূপ। তাই সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী যখন বলেন, 'ধর্ম অশিক্ষিত লোকের সংস্কৃতি আর সংস্কৃতি শিক্ষিত লোকের ধর্ম।' তখন এ তত্ত্ব আমাদের উদ্দিষ্ট তাৎপর্যে মানা যায় না। কেননা ধর্ম বা শাস্ত্র জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিরিক্ত মনে কোন যৌক্তিক বৌদ্ধিক চিন্তা-চেতনার, কর্ম-আচরণের উন্মেষ ঘটায় না, বিশ্বাস-সংস্কারচালিত জীবনে সংস্কৃতি থাকে না, থাকে নিয়মানুবর্তিতা বা প্রথানুগত্য ও আচারনিষ্ঠা। একে গভীর তাৎপর্যে সংস্কৃতি বলে স্বীকার করা যায় না।

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে সাক্ষর শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনার অনুগত জীবনযাপন করে না। বিদ্বান ব্যক্তিদেরও দেখেছি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষের মতোই অলীক অলৌকিক আসমানী যাদুশক্তিতে গভীর আস্থা রাখে, আশৈশবের বিশ্বাস-সংস্কারই তাদের মন-মনন নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের ভয়-ভক্তি-ভরসা আচ্ছন্ন চিত্তলোকে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির প্রবেশাধিকারই নেই। এমনি মানুষকে শিক্ষিত বলা এবং তার প্রাত্যহিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণকে সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলে যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে স্বীকার করা কঠিন। কেন না এ মানুষই ব্যক্তিক, গোষ্ঠিক বা তথাকথিত জাতিক স্বার্থে রাজনীতির নামে হরণে হননে, শোষণে-পীড়নে, প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় প্ররোচিত করে বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত রোবোট সদৃশ মানুষদের। এ কারণেই তো গান্ধী-রবীন্দ্র-নেহেরু নিবাসেও তাঁদের জ্ঞাতিরা নরহত্যায় পুণ্যার্জনের উল্লাসে মাতে। আস্তিক মানুষেরা কোন অপকর্মে-অপরাধে বিরত থাকে না, ঈশ্বর সব দেখছেন শুনছেন-জেনে বুঝেও। তাদের রয়েছে কম-বেশি লোকনিন্দার ও শাস্তির ভয়, তাই তারা মানুষকে লুকিয়ে-গোপনে-নির্জনে অপ্রকাশ্যে অপকর্ম-অপরাধ করে। কেবল জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিচালিত সৎমানুষের প্রাত্যহিক জীবনাচারে পরিব্যক্ত সংস্কৃতিই তার ধর্ম বলে সাধারণভাবে বলা চলে। কিন্তু তেমন মানুষ যেন আজো 'লাখেও না মিলে এক'।

আমাদের নৈতিক সামাজিক জীবনের ট্রাজেডিই হল এই যে আমরা শাস্ত্র মানি, ন্যায়-অন্যায় বুঝি, ভালো-মন্দের পার্থক্যও অজানা নয় আমাদের, যে-কোন গুণে আমরা আকৃষ্ট হই, গুণবানকে করি শ্রদ্ধা। ফকির-দরবেশ-সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-শ্রমণ সবাইকে আমরা ভক্তি করি, তাঁদের অর্জিত অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বকার্য উদ্ধারের আশা-প্রত্যাশায় তাঁদের কৃপা-করুণাও প্রার্থনা করি, এক কথায় আমরা সমাজে অন্যমানুষের মহৎ গুণ ক্ষমা কৃপা করুণা দয়া-দাক্ষিণ্য পরার্থপরতা স্নেহ-মায়া-মমতা-ভক্তি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ন্যায়বিচার-সেবা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানবিক গুণ প্রত্যাশা করি, কিন্তু সচেতনভাবে ক্বচিৎ কেউ নিজের মধ্যে কোন গুণের অনুশীলন করি। তাই সৎ ও মহৎ মানুষের জীবনাচার আমাদের প্রভাবিত করে না, তাঁদের কৃতিকীর্তি-বাণী আমরা স্মরণ করি, উচ্চারণ করি পালা-পার্বণে-বিবৃতি-বক্তৃতায়। কিন্তু স্মরণ করি না স্ব স্ব বাস্তবজীবনে। এ জন্যেই মানুষের নৈতিক-সামাজিক জীবন লাটিমের মতো আবর্তিত হয়, ক্বচিৎ অদৃশ্য মন্থর গতিতে নানা প্রাকৃতিক প্রাতিবেশিক কারণে সামান্য মাত্রায় পরিবর্তন দেখা যায় মাত্র। কাজেই ব্যক্তিজীবনে বা সমাজে ধর্মের তথা শাস্ত্রের প্রভাব কি এবং কতটুকু আর লাভের অংশই বা কি এবং ক্ষতির মাত্রাই বা কত, একালে তা খতিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁটিয়ে দেখা মানবমুক্তির প্রয়োজনে মানবহিতৈষী শ্রেয়োবাদী মানববাদীরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য। নইলে সমাজ পরিবর্তন সহজ বা সম্ভব হবে না।

আস্তিকতার বা দৈব-দারু-যাদু বিশ্বাসের জন্ম মানুষের ভীরুতায়-দুর্বলতায়, অজ্ঞতায় অসহায়তায় কার্যজ্ঞানহীনতায়। সেজন্যে সাধারণ মানুষ বাঁচে কাজের বা কিছুর উপর বিশ্বাস রেখে, ভরসা রেখে এবং কোন একটিকে একান্ত অনুরাগে অবলম্বন করে। অতএব মানুষ বাঁচে বিশ্বাসে-ভরসায় ও ভালোবাসায়। এ কারণে সাধারণ মানুষ আস্তিক। একালের মতো আগের কালের অনেক অনেক জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী মানুষও নানা যুক্তি তর্কযোগে নাস্তিক্য প্রচার করলেও অজ্ঞ-অসহায়-যুক্তি-বুদ্ধি-মনন শূন্য মানুষ ভূতে ভগবানে, দারু-টোনায় সমান আস্থা রেখে প্রয়োজনে দুটোই সমান ভরসায় ও গুরুত্বে প্রয়োগ করেছে, করে ও করবে। কাজেই বিশ্বাস-সংস্কারচালিত মানুষের এ আস্তিক্যে কোন দর্শন নেই-নেই ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনের সুসঙ্গত ও সুষম দর্শন বা তত্ত্বচিন্তা। তাছাড়া একজন লোক অন্যের শাস্ত্রের ও বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা বা ভিত্তিহীনতা সহজে বোঝে, কিন্তু নিজের শাস্ত্র ও বিশ্বাসকে মানে ধ্রুবসত্য বলে। কিন্তু আমাদের ধারণায় মানুষকে অলীক-অলৌকিক-চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস সংস্কারমুক্ত করে মাটিলগ্ন বাস্তবজীবনে সম ও সহ স্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে প্রেরণা প্রবর্তনা দেয়া সম্ভব না হলে— এককথায় সমাজের অধিকাংশ মানুষ আত্মোপলব্ধ যুক্তিবাদে প্রবুদ্ধ না হলে বাঞ্ছিত মাত্রার নিরুপদ্রব নিরাপদ সমাজ ও রাষ্ট্র কখনোই গড়ে উঠবে না।

আসমানী শক্তিতে বিশ্বাস রেখে নয়, মর্তের প্রয়োজনে গুরুত্ব দিয়ে ন্যায়বুদ্ধি যোগে বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে সহাবস্থানের অঙ্গীকার করেই মানুষ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সংঘাত-প্রতারণা-প্রবঞ্চনামুক্ত সমাজ বানাতে পারে বলেই আমাদের যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক অনুমান।

জনগণের চিৎপ্রকর্ষের মুখ্য অন্তরায়

মানব প্রয়াস-প্রযত্নজাত চৌষট্টিকলা হচ্ছে মূলত হৃদয়বিদ্যা, আর জৈবজীবনে ব্যবহারিক, আচারিক, বৈষয়িক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠিক, দালিক বা সামাজিক প্রয়োজনে যা কিছু নির্মিত, উৎপাদিত, উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত এবং সৌকর্য ও উৎকর্ষসাধিত, সেগুলোর নাম দেয়া যায় সমাজবিদ্যা। আর প্রাকৃতশক্তির নীতি-নিয়মের জ্ঞান অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ-নিবারণ শক্তি হচ্ছে বুদ্ধিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা নামে বিস্ময়-ভয়-ভক্তি ভরসাভিত্তিক অদৃশ্য কাল্পনিক অলীক-অলৌকিক আর যা থাকল, তা বিশ্বাস-সংস্কারের বিষয়, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার আওতাভুক্ত নয়। তাই এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক নিরর্থক। এক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষই শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে যে পারিবারিক, প্রাতিবেশিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ-প্রতিবেশ পেয়ে থাকে, সেভাবেই মন-মত, তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, শ্রেয়, প্রেয়রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল্পনিক ধারণায় দৃঢ় আস্থা রাখে সারা জীবনের পুঁজি পাথেয়রূপে। ব্যক্তিজীবনের আদর্শ-উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যও অযৌক্তিক অসমন্বিত অসমঞ্জস ও অসঙ্গতভাবে উক্তসব বিশ্বাস-সংস্কারজাত মীমাংসা, ধারণা ও সিদ্ধান্ত সঞ্জাত।

গত পাঁচ-ছয় হাজার বছরের ইতিবৃত্তের ছায়া-কায়া-কঙ্কালের আভাসে প্রমাণে অনুমানে দেখা যাচ্ছে কলা বিষয়ক হৃদয়বিদ্যার বিবর্তন হয়েছে, বিচিত্র বিবর্তন হয়েছে সমাজবিদ্যারও, আর অধ্যাত্মবিদ্যার উন্মেষ-বিকাশ-বিনাশ এবং পুনরুদ্ভব বারবার হয়েছে অঞ্চলে-অঞ্চলে, দেশে-দেশে, গোত্রে-গোত্রে, কালে-কালে, এখনও হয়, হচ্ছে, হয়তো ভবিষ্যতেও হবে। ব্যক্তি-মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা আবিষ্কার-উদ্ভাবন, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল উৎসাহ আগ্রহই এক্ষেত্রে এ বিবর্তন-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-উৎকর্ষ ঘটায়। সভ্যতা-সংস্কৃতি-সুরুচির বিকাশ-বিস্তার ঘটছে এভাবেই।

আবার ব্যক্তির ব্যবহারিক-বৈষয়িক-সামাজিক-বাণিজ্যিক-শৈল্পিক-শৈক্ষিক-নৈতিক-আচারিক পালাপার্বণ ক্ষেত্রে বিশ্বাস-সংস্কারজাত একপ্রকার আবর্তন বা গতানুগতিকতাও দেখা যায়। যদিও দেশ-কাল-সমাজ ভেদে তা অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক, অসঙ্গত, অসমঞ্জস ও অযৌক্তিক। এর কারণ দুটো। এক, মানুষের চিন্তা-চেতনাও যেন ডিগদড়ির পরিধি-পরিসর মানে। যেমন আমরা সরল, বাঁকা ও গোল রেখাই আঁকতে পারি, সামান্য বৈচিত্র্য সাধন সম্ভব হলেও তাকে অসংখ্য প্রকার করা চলে না। মানুষের পোশাকের ও অলঙ্কারের আকার-প্রকার ক্ষেত্রেও আমরা এমনি সীমিত ভিন্নতার ও বিচিত্রতার প্রমাণ পাই মাত্র।

মানুষ তার নিত্যপ্রয়োজনের, পেশার ও নেশার ক্ষেত্রে ব্যতীত সাধারণভাবে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাশক্তি প্রয়োগ করে না। জীবনের অন্যান্য ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে তারা সাধারণভাবে জিজ্ঞাসারিক্ত, প্রশ্নহীন অনুকারক-অনুসারক-গড্ডল বা ফেরু স্বভাবেরই হয়ে থাকে। তাই জীবনে অন্যকোন ক্ষেত্রেই তারা জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-শ্রেয়োবোধ চালিত হয় না। একারণেই বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসাপ্রসূত আদি অজ্ঞ সমাজনেতাদের, গোত্রপতিদের আদেশে-নির্দেশে-উপদেশে আজো তাদের ভয়-ভক্তি-ভরসা-অনুরাগ-আসক্তি কমেনি, রয়ে গেছে। এগুলোই আজো শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক, ঐহিক, পারত্রিক, জৈবিক, বৈষয়িক, ব্যবহারিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের, কল্যাণচেতনার আকর ও উৎস। মানুষে-মানুষে বিভেদের, ব্যবধানের, স্বাতন্ত্র্যের, অবজ্ঞার, দ্বেষের ও দ্বন্দ্বের কারণ। এসব বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধ মানুষ এখনও স্বশাস্ত্র, স্বধর্মকেই তথ্য, সত্য, সঙ্গত ও যুক্তি ভিত্তিক বলে জানে ও মানে, কিন্তু অপরের শাস্ত্রে ও ধর্মমতে অজ্ঞতা, মূর্খতা, অযৌক্তিকতা, অসঙ্গতি অতি সহজেই আবিষ্কার করে একজন অনক্ষর, অজ্ঞ লোকও।

তাই হাতিয়ারে, ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে, বিজ্ঞানে, যন্ত্রে, প্রকৌশলে, প্রযুক্তিতে মানুষের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এবং সে-হওয়া আজকের এ মুহূর্তে আমরা কল্পনাও করতে পারি না বটে, কিন্তু পৃথিবী নয়, কেবল সৌরমণ্ডল নয়, বিচিত্র নক্ষত্রলোকেও মানুষ অসাধ্য সাধন করছে এবং করবে। কিন্তু ঐ বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির প্রয়োগরিক্ত মানুষ চিরকালই দৃশ্য-অদৃশ্য দৈব ও যাদু শক্তি আর কাল্পনিক নিয়তিনির্ভর থেকে মানুষের মানসিক সভ্যতাকে, মনোলোককে, চিন্তাজগৎকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুতেই এগুতে দিচ্ছে না। তাই আজো মন-মানসের দিক দিয়ে মানুষ হাজার হাজার বছরে পিছিয়ে রয়েছে। কিছুতেই এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তির সমতালে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির প্রয়োগে জীবন চালিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে না। তাই বস্তুতপক্ষে বাস্তবে দুনিয়ার প্রায় অধিকাংশ মানুষই প্রাণী-প্রজাতির জীবনই যাপন করে। যেমন একজন ইহুদী সাড়ে তিন হাজার বছর আগের জগতে, একজন হিন্দু তিন হাজার বছর আগের জগতে, একজন বৌদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগের জগতে, একজন মুসলমান দেড় হাজার বছর আগের জগতে তার বিশ্বাস-সংস্কারজাত তত্ত্ব-তথ্য-সত্য নিয়ে মানস বিহার করে। স্কুলে কলেজে পড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান তখন তার কোন কাজে লাগে না। মানুষের এ সংস্কারমুক্তি না ঘটলে, মানুষ যুক্তিবাদী না হলে তারা কখনো সমকালীন জীবনযাপন করতে পারে না। আদি ভূত-ভগবানের জগতে, যাদুবিশ্বাসের জগতে, বিস্ময়ের কল্পনার ও নিয়তির জগতে অলীক ও অলৌকিক জীবনে বিচরণ করবে তারা।

ব্যক্তি মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অসঙ্গতির কারণ

AMARBOI.COM

জীবজগতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে বৃত্তি-প্রবৃত্তির আবর্তনই দেখা যায়, বৈচিত্র্য দুর্লক্ষ্য। অবশ্য প্রশিক্ষণ পেলে যে-কোন প্রাণী স্বভাব ও অভ্যাস বদলায়, সহজেই যেন পাল্টাতে পারে। এতে বোঝা যায় প্রশিক্ষণে এদেরও মানুষের মতো কৌশল-প্রকৌশল প্রয়োগ, শ্রমশক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্ভব হয় এবং ব্যাপকভাবে প্রজাতিগত প্রশিক্ষণ দান মানুষের পক্ষে সম্ভব হলে ওদেরও প্রাকৃত তথা প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত জীবনের অবসান ঘটত। তারাও মানুষের মতোই কৃত্রিম জীবনযাপনে আগ্রহী হত। অবশ্য মানুষের মতো তাদের আঙ্গিক তথা আবয়বিক কাঠামো নেই বলে অর্থাৎ হাতের ব্যবহার নেই বলে তারা জীবনযাপনে একটা সীমিত সুবিধে-সুযোগ ভোগ করে মাত্র।

সেই বেকনিক 'মৌমাছি' তত্ত্বে পুরো অমোঘ সত্য বলে আস্থা রাখার কারণ একালে ক্রমে কমে আসছে, যখন ডলফিনকেও প্রশিক্ষণে স্বভাবে-অভ্যাসে বদলানো সম্ভব, কাক-ইঁদুর দিয়েও যখন সিনেমা করা, বাঘ-সিংহ-ছাগল দিয়েও সার্কাসে-বিচিত্র প্রশিক্ষণে অনুগত করা ও ইঙ্গিতে পরিচালনা করা সম্ভব।

মানুষ তার আবয়বিক সৌকর্যের কারণে তথা দুটো হাতের বদৌলত মন-মস্তিষ্ক খাটিয়ে হয়েছে মানসিক, ব্যবহারিক, বৈষয়িক, জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-যুক্তি-ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ বিবিধ ও বিচিত্রভাবে কাজে লাগিয়ে আজ আসমুদ্র আকাশ আয়ত্তে আনার প্রয়াসী ও প্রত্যাশী।

অন্য প্রাণীদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ধরন অনুমান করা যায়, কিন্তু মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে, মনে-মতে-মননে-রুচিতে কোন সঙ্গতি বা পরম্পরাগত পদ্ধতি দুর্লক্ষ্য। এজন্যেই মানুষ চেনা অসম্ভব। এককালের বিশ্বস্ত মানুষ, এককালের দুশমন, এককালের প্রাণপ্রিয় মানুষ সময়ান্তরে দাগাবাজ, মিত্রও হয় শত্রু এবং ভাইও বিরাগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠকাঠকিই যেন মনুষ্য জীবনের সাধারণ নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ, কারো সম্বন্ধেই যেন কেউ ধারণা স্থির রাখতে পারে না। মানুষের ছল-চাতুরীর, মত-মতলবের, খেয়াল-খুশির কোন সীমা শেষ নেই যেন। মানুষ যে মনে-মতে-মতলবে, লাভে-লোভে, হিংসায়-ঈর্ষায়-ঘৃণায়-স্নেহে-প্রেমে-মমতায়-করুণায় বদলায়, তা পরিবর্তনের পূর্বমুহূর্তেও বোঝা যায় না। কেননা, সুপরিকল্পিত জীবনচেতনা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ আবেগ-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ক্রোধ-ক্ষোভ-লোভ-ভয়-ভরসা প্রভৃতি নানা আপাত কারণেই জীবনে অনেক অকর্ম-কুকর্ম ও সৎকর্ম করে থাকে। যে একজনকে হত্যা করে সে-ই আবার অন্য একজনকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণপাতও করে। এ জন্যেই তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সঙ্গতি নেই। আর সে-কারণেই মানুষের সর্বজনগ্রাহ্য একটা সংজ্ঞা দেয়া অসম্ভব। মানুষ আসলে ভলোও নয়, মন্দও নয়, প্রাণী প্রজাতির মধ্যে স্বচেষ্টায় সবচেয়ে বিকশিত প্রজাতি মানুষ কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারো কাছে ভালো, কারো কাছে মন্দ, কারো প্রতি ভালো, কারো প্রতি মন্দ, কারো জন্য ভালো, কারো জন্যে মন্দ। ডাকাত নরহত্যা করেই তার প্রিয়জন মা-বাবা-স্ত্রী-সন্তান পোষে। সে ভালো কি মন্দ সে-বিচার কি অতো সহজ! এ-তো সমাজবিজ্ঞান কিংবা অপরাধবিজ্ঞান কিংবা মনোবিজ্ঞান দিয়ে নির্ভুল বিচার সম্ভব নয়। এতে হৃদয় ও মস্তিষ্ক জড়িত।

এ একাধারে ও যুগপৎ হৃদয়বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান। দেশ-কাল-সমাজের-মানসিক, ব্যবহারিক, বৈষয়িক, আর্থিক, শৈক্ষিক, নৈতিক উন্নয়নের স্তর ভেদ তথা অবস্থা ও অবস্থান ভেদ স্মরণে রেখে এর তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্থূলভাবে হয়তো সম্ভব। কেননা অনুশীলন ও উন্নয়নভেদে অর্থাৎ জীবনযাপন প্রণালী, প্রথা-পদ্ধতি, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, শিক্ষা, শাস্ত্র ও সংস্কৃতিভেদে মানুষের সামাজিক আচার-আচরণে কোন এক স্তরের একটা দৃশ্যত আপাত সংযম ও নিয়মনিষ্ঠা বা অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যচেতনা লক্ষ্য করা যায়। এশিয়া-য়ূরোপ-আফ্রিকা-আমেরিকার নানা অঞ্চলের বা রাষ্ট্রের মানুষের আচার-আচরণের, নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের সাদৃশ্য ও বৈপরীত্যই এর প্রমাণ। বিশ্বাস-সংস্কার নীতি-নিয়মের ক্ষেত্রে ও শাস্ত্রানুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা-কর্ম-বিশ্বাসের অসঙ্গতি প্রকট। যেমন— জন্ম নিয়ন্ত্রণ শাস্ত্রসম্মত নয় জেনেও সরকার আর জনগণ জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

জীবনতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের 'পতঙ্গ'-এ পরিব্যক্ত তত্ত্বই হচ্ছে প্রাণিজগতের ও মনুষ্যসহ প্রাণী জীবনের প্রথম ও শেষ দর্শন, প্রথম ও শেষ প্রয়াস, প্রথম ও শেষ লক্ষ্য, প্রথম ও শেষ আসক্তি। মানুষ কিছু না কিছুর প্রতি আসক্তি, কিছু না কিছুর প্রতি আকর্ষণ, কারো না কারো প্রতি অনুরাগ, কিছু না কিছুর প্রাপ্তি লোভ, কিছু না কিছুর প্রতি অপ্রতিরোধ্য মোহ নিয়েই বাঁচে। মানে এ-ই তার জীবনপ্রীতির, বুদ্ধিচর্চার, সাহস সঞ্চয়ের, শক্তি প্রয়োগের অঙ্গীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণের, উদ্যম প্রাপ্তির ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রত্যক্ষ কারণ। পর্বত বা সমুদ্র বিশাল বলে নয়, নদী প্রবহমান বলে নয়, প্রান্তর সবুজ বলে নয়, আকাশ নীল বলে নয় কিংবা নবঘন শ্যাম বলে নয়, মাটি নব দূর্বাদল শ্যাম বলে নয়, অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র অনন্য বলে নয়— পৃথিবী ব্যক্তির কাছে সুন্দর, সুখকর, আকর্ষণীয়, মৃত্যু ভীতিকর, সে কেবল বিশ্বাস করবার, ভরসা করবার, নির্ভর করবার, সর্বোপরি ভালোবাসার জন্যে প্রিয় আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন পায় বলেই। পৃথিবী সুন্দর ও সুখের, প্রিয় ও প্রয়োজনের এবং বাঁচার আগ্রহ তীব্রতম হয়েছে এখানে তার ভালোবাসার, তার আকর্ষণের, তার আসক্তির, তার অনুরাগের, তার মোহের তার কাঙ্ক্ষিত ভোগ-উপভোগের বস্তু রয়েছে বলেই। প্রাণী তো-মানুষও নিজেকেই তো ভালোবাসে, সে ভালোবাসা কিংবা সুখ বা আনন্দ-অনুভব-উপলব্ধি করে অন্য বস্তুকে, ব্যক্তিকে, কর্ম-আচরণকে অবলম্বন করেই। কিন্তু চাওয়া ও পাওয়া নির্বিঘ্ন নয়। চাইলেই পাওয়া যায় না। প্রায়ই জীবনে বাঞ্ছিত বস্তু, মনোমত মানুষ, প্রয়োজনীয় সামগ্রী, প্রিয়জনকে কাছে পাওয়া যায় না। চিন্তা, বেদনা, দুঃখ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, শঙ্কা, সংশয়, আশা, প্রত্যাশা, হতাশা, নৈরাশ্য, বিরাগ, বিভক্তি, ক্ষোভ-ক্রোধ প্রভৃতি তাই মানুষের ব্যক্তিমন-মনন তিক্ত-বিষাক্ত করে তোলে, মেজাজ করে দেয় খিটখিটে, নষ্ট করে ধীর বুদ্ধি ও স্থিরবিশ্বাস। তাই জীবন কখনো একটানা বা লাগাতার সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়। সুখের সময়ে অবশ্য আমরা সুখ-সচেতন থাকি না, যেন এ আমার প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সম্পদ ও অধিকার। এ মুহূর্তে যে আমরা দেহে মনে-চিন্তায়-চেতনায় সুখী তা কখনো ভেবে আনন্দিত বা পুলকিত হইনে, অনুভব উপলব্ধিই করিনে। কিন্তু মাথায় পেটে কিংবা আঙুলে সামান্য ব্যথা অনুভূত হলেই সুখ যেন বহুশ্রুত একটা স্বপ্নের ও সাধের বিষয় মাত্র-অনুভূত কোন অবস্থা বা অবস্থান নয়। এজন্যে জীবনে সুখ বেশি, না দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা বেশি, তা আমরা সত্য ও তথ্য হিসেবে নিঃসংশয়ে বলতে পারিনে। কেননা এখানে শাস্ত্র আছে, শাসন আছে, বিদ্যা-বিত্ত-অর্থ-সম্পদ প্রভৃতি জীবনযাত্রার নানা উপকরণের অভাব আছে, পাপ-শাস্তি-নিন্দার আশঙ্কা আছে। যা আছে তা দিয়ে কুলোয় না শাহ-সামন্ত ধনী-মানী কারোর, আরো চাই, আরো পাই, এ-ই কাঙ্ক্ষা। তাই স্বস্তি-শান্তি-তুষ্টি-তৃপ্তি নেই কারো। তাছাড়া ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপটেও থাকে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই সুখ ও আনন্দ জগতে নির্ভেজাল নিখাদ-নিখুঁত নয়, দুঃখ-বেদনা-দুশ্চিন্তা-পরাজয়-গ্লানি-ক্ষোভ-ক্রোধ যুক্ত। তবু বিশ্বাস করবার, ভরসা করবার, নির্ভর করবার ও ভালোবাসবার মতো মনোমত মানুষ থাকে বলেই বাঁচার এমন আগ্রহ। কিন্তু হঠাৎ কোন হতাশায়, নৈরাশ্যে, পরাজয়ে, প্রিয়জনের বিশ্বাসভঙ্গে পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠে। তখন মানুষ আত্মহত্যা করে জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি খোঁজে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলস মুহূর্তের তত্ত্বচিন্তা

অন্য প্রাণীরা মুখে আহার করে বলে কেউ কারো উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ পরস্পর নির্ভরতায় যৌথ জীবনযাপন করে। ফলে সম ও সহ-স্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে নিরুপদ্রব নির্বিঘ্ন নিরাপদ জীবন ভোগ-উপভোগ সম্ভব করার জন্যেই নীতি-নিয়মের সমষ্টি শাস্ত্র-লোকাচার-দেশাচার নামে— মানুষই, মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাই স্ব-স্ব গোত্রে গোত্রে স্থানে স্থানে কালে কালে তৈরি, প্রচার ও প্রয়োগ করেছে। বিশ্বাস-সংস্কারের অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিক বন্ধনই ভয়ভক্তি-ভরসাজড়িত দুর্বল মনকে এগুলোর প্রতি অনুগত করেছে ও রেখেছে। এর থেকেই জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনাহীন ব্যক্তি মানুষের নীতিভঙ্গের, আচার লঙ্ঘনের পাপবোধ জেগেছে। আজো তাই সব মানুষের শাস্ত্র ও নীতি-নিয়ম এবং পাপ পুণ্য কর্ম ও চেতনা অভিন্ন নয়। একের যা পাপ, অন্যের তা পুণ্য।

দু'দুটো প্রেম ভেঙে গেলে তৃতীয় প্রেমে দাম্পত্য শুরু হলে তাকে কি পাপাচার বলে? প্রেম-প্রণয়কে কেউ পাপ বলে না, প্রথম প্রেমই দাম্পত্যে পরিণতি পাবে তার কোন নিশ্চয়তাও থাকে না, সামাজিক মানুষকে ভীত-সংযত রাখার জন্যেই তো ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনের মিথ্যা ধারণা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। তাতেও কোন দুটো কালে, স্থানে ও শাস্ত্রে কোন যৌক্তিক বৌদ্ধিক একক ধারণা মেলে না। কেননা সবটাই গৌত্রিক, কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে সীমিত জ্ঞানের, যুক্তির, প্রজ্ঞার, বুদ্ধির ও রুচির মানুষের তৈরী। তাই এ বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য। স্ব-স্ব যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞানচালিত মানুষ হচ্ছে কষিত কাঞ্চন। কোন পাপ গ্লানি তাকে চিরকালের জন্যে আচ্ছন্ন করতে পারে না, পারে না মানুষের মন-বুদ্ধি-মনন-হৃদয়-বিবেককে নষ্ট করতে। জৈব আবেগে কেবল তার কখনো বিচলন ঘটায় মাত্র। এ-ই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিকতায় সাড়া দেয়াই জৈব ধর্ম, তাই সবাই ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্রীয় বিধান লঙ্ঘন করে। কেবল সমাজের নিন্দার ও সরকারী শাস্তির ভয়েই সংযত থাকার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য নিরুপদ্রব সহাবস্থানের প্রয়োজনচেতনা প্রসূত হচ্ছে এসব বিধি নিষেধ।

রাজা অন্যের দেশ কাড়ে, সৈন্যরূপী অসংখ্য নরহত্যা করে। কিন্তু বেদ-বাইবেল-কোরআন-পুরাণ-নীতিশাস্ত্র-আইন প্রভৃতি কোথাও একে পাপ অন্যায় বলে আখ্যাত করে না। অথচ পদে পদে ব্যক্তি লাভ-লোভ-অনধিকার চর্চায় সীমা অতিক্রমের ও অসংযমের জন্যে পাপের শিকার সর্বপ্রকারে সর্বত্র সর্বকালে ও সর্বসমাজে। এতেই বোঝা যায় প্রয়োজনে সবটাই প্রবলের সৃষ্টি এবং শ্রেণীস্বার্থে প্রযুক্ত। কাজেই আশৈশব সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাসচালিত মানুষের পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ চেতনা অনেকটা স্ব-স্ব শাস্ত্র, সমাজ ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। সব মানুষের নৈতিক ও পাপ-পুণ্য চেতনা কৃচিৎ কোন ক্ষেত্রেই কেবল অভিন্ন। তাই মসজিদ ভেঙে যেমন, তেমনি মন্দির ভেঙে পুণ্য মেলে।

আশৈশবের সংস্কার দৃঢ়মূল বিশ্বাসে উন্নীত হয়ে মানুষের সারাজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে শিক্ষিত মানুষও জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকের অনুগত হয় না, থাকে বিশ্বাসচালিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আজ অবধি শাহ-সামন্ত প্রভৃতি প্রবলব্যক্তি বা শ্রেণী নিজেদের স্বার্থেই ঈশ্বরের, শাস্ত্রের, নীতি-নিয়মের, নৈতিকতার, লোকাচারে, দেশাচারের, ঐতিহ্যের, পরম্পরার আনুগত্যের দোহাই দিয়ে আবেগ সঞ্চার করে, অজ্ঞ-অনক্ষর বা সাক্ষর-শিক্ষিত এমনকি তথাকথিত বিদ্বান মানুষকেও বশে রাখে, স্ব-কাজে স্বার্থে ব্যবহার করে। আড়াই হাজার বছর আগের যুক্তিবাদী জ্ঞানী সক্রেটিস অর‍্যাকলে [Oracle] বিশ্বাস করতেন না। দু'হাজার বছর আগের রোমান দার্শনিক সেনেকা বলেছেন, ধর্ম বিশ্বাস-নির্ভর সাধারণ মানুষের কাছে সত্য, জ্ঞানী মানুষের কাছে বানানো এবং শাহ-সামন্তদের কাছে লোকপ্রশাসনে কেজো বা প্রয়োজনীয়। [Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false and by the rulers as useful—Senecca]

আজো পৃথিবীব্যাপী তা-ই চলছে। কেননা, অর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে আজো স্বস্থ, সুস্থ ও স্ব-জ্ঞান বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে স্ব-সাহসে ও স্ব-উদ্যমে ও স্ব-উদ্যোগে কাজ করার মতো নাস্তিক বা সংস্কার-বিশ্বাসমুক্ত মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। মানুষ শুনে শুনে শ্রুতিধর হয়েই জানতে বা জ্ঞানী হতে চায়, অনুশীলন-অনুভব-উপলব্ধির মাধ্যমে মানস ও মনন জীবনের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করে না। শোনা কথার সত্যতা যাচাই করতে, সন্দেহ করতে, প্রশ্ন করতে আগ্রহ থাকে না, তাই স্বশিক্ষিত বুদ্ধিমানেরা তাদের উপর অভিভাবকত্ব করে, প্রভুত্ব করে এবং তাদের আনুগত্যের ও সমর্থনের ফায়দা লোটে।

AMARBOI.COM

সমাজে যুক্তিবাদী বিবেকবান মানুষের কিংবা নাস্তিকের সংখ্যা অন্তত অর্ধেক না হলে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, নির্মাণ-উৎপাদনের কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের আর্থিক জীবনে প্রবঞ্চনা-প্রতারণার, ঠকাঠকির, শোষণ-বঞ্চনার অবসান বা হ্রাস বাঞ্ছিত মাত্রায় হবে না। ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে অবজ্ঞা-ঈর্ষামুক্ত সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কারমুক্তি, স্বাতন্ত্র্যচেতনালুপ্তি ও বৈশ্বিক শ্রেয়োবোধের উন্মেষজাত গ্রহণশীলতা, আর্থিক জীবনে কেবল যোগ্যতানুগত সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিজাত শ্রেয়োচেতনা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবুদ্ধি ও অধিকার সচেতনতা প্রভৃতিই এ যুগে কাম্য নয় কেবল জাগ্রত গণমানবের কাঙ্ক্ষা ও ন্যায় বুদ্ধিপ্রসূত দাবি পূরণের জন্যে আবশ্যিকও বটে।

আপেক্ষিক ও প্রাতিভাসিক সত্যচালিত জীবন

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল। তবে তা জিজ্ঞাসাও নয়, কৌতূহলও নয় তা হচ্ছে কান পাতার প্রবৃত্তি বা শোনার আগ্রহ। তাই নিরক্ষর মানুষ জীবনে যা কিছু শেখে শুনেই শেখে। একে কি 'শ্রুতসৃক্ষা' বলা যাবে! তাই শিক্ষিতদের মধ্যেও পাঠস্পৃহা দুর্লভ। গ্রন্থ পড়ুয়ালোক সারা দুনিয়াতেই কম। বইয়ের কলেবর বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈহিক স্থূলতা দেখলে বইয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা, পড়বার মতো আবেগের মাত্রা হারায়। অবশ্য পঞ্চাশ থেকে দুশো পৃষ্ঠার বই পড়ার লোক অনেক। সেজন্যেই আজো স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বই বাজারে কেনাবেচা হয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

তাছাড়া বই পড়ে কোন বিষয়ে নিখাদ-নিখুঁত-বিশুদ্ধ-সম্পূর্ণ বা প্রায়পূর্ণ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব, এমন কি একমাত্র উপায় বটে, কিন্তু সাধারণের আগ্রহ, ধৈর্য, অধ্যবসায়, সময়, সুযোগ, আর্থিক সামর্থ্য প্রভৃতি নানা কারণে সম্ভব বা সহজ, স্বাভাবিক বা অভ্যাসগত হয় না, হতে পারে না।

কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ইস্তাহার, বুলেটিন, হ্যান্ডবিল, লিফলেট, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পাঠক স্ব-স্ব মানসপ্রবণতা অনুসারে, বিভিন্ন বিষয়ে অনিচ্ছায় ও চোখে পড়ে বলে নানা বিষয়ে লঘু-গুরু-মাঝারি, ক্ষুদ্র-খণ্ড, ভালো-মন্দ-মাঝারি-স্থূল-সূক্ষ্ম জ্ঞান অনায়াসে, অবহেলে, সময়-শ্রম-মনোযোগ না দিয়েও শিখে নিতে পারে। এতেই সাক্ষর-অসাক্ষর সমাজে মুখোমুখি সংলাপে, কথোপকথনে, আড্ডায়, পথচলতি কানে-আসা ধ্বনি যোগে জ্ঞানের দ্রুত ও প্রায় সার্বক্ষণিক ও সার্বজনিক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

এভাবেই এ-যাবৎ অর্জিত ও চিন্তিত, আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত লৌকিক, অলৌকিক, অলীক-কাল্পনিক-ঐহিক-পারত্রিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, আত্মিক ও আসমানী জ্ঞান গণমানবের আয়ত্তে এসেছে, আসছে ও আসবে। আশ্চর্য এতেই এরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী বলে জানে ও মানে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞতার ও অপূর্ণতার বিষয় ভাবে না, এমন কি অজ্ঞতা, অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতনও নয়।

'নিজের বুঝ পাগলেও বোঝে' এবং 'জাতে মাতাল তালে ঠিক' প্রভৃতি তত্ত্বকথার, প্রবচনের ও প্রবাদের উদ্ভবও সম্ভবত ঘটেছে এভাবেই।

মানুষ শোনামাত্র অন্য মানুষের বাক, ভঙ্গি ও বক্তব্য অবিকল মুখস্থ' করে পুনরাবৃত্তি করতে পারে না। তাই লোকপরম্পরায় মুখে মুখে, কানে কানে বাক্, ভঙ্গি ও বক্তব্য বিকৃত হতে থাকে; বর্ণে, শব্দে, উচ্চারণে, প্রতিশব্দে, পরিভাষায় বিকৃতি লাভ করে। এ কারণেই একই আদি মূলভাষা যেমন পরস্পর দুর্বোধ্য, হরফে, উচ্চারণে, অর্থে, ব্যঞ্জনায় অসংখ্যপ্রকার বিকৃতি লাভ করে তেমনি সত্যও অতিরঞ্জিত, অতি বিকৃত হয়ে হয়ে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তাই বলে মিথ্যা বিকৃত হয়ে হয়ে কখনো সত্য হয়ে ওঠে না। আমাদের আশৈশব শ্রুত ও অর্জিত বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানও তেমনি অবিকৃত ভাষায়, ভঙ্গিতে, বক্তব্যে কখনো আমাদের আয়ত্তে আসে না, খণ্ড হয়ে, ক্ষুদ্র হয়ে, অপূর্ণ হয়ে, বিকৃত হয়ে অস্পষ্ট ও অযৌক্তিক হয়ে আমাদের কানে, মনে, ধ্যানে ও ধারণায় ধরা দেয়। এজন্যেই পৃথিবীর মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, চিন্তা, চেতনা, আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, স্থানে-স্থানে, কালে-কালে, গোত্রে-গোত্রে, বিকৃত ও বিচিত্র হয়ে পড়ে, এমন কি অনেক সময়ে তাৎপর্য, সঙ্গতি, উপযোগ ও সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। এগুলোও মানুষে মানুষে, শাস্ত্রে, আচারে-আচরণে, চিন্তায়-চেতনায়, আদর্শে, উদ্দেশ্যে, লক্ষ্যে, প্রথা-পদ্ধতিতে শুধু ভেদ-বিভেদ-ব্যবধান নয়, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দুনিয়া জুড়ে মিল-মিলন দুর্লক্ষ্য, বিভেদ-বিচ্ছেদ, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি আর স্বাতন্ত্র্যগর্বই বেশি, তীব্র ও প্রবল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ জন্যেই সত্য, তত্ত্ব, তথ্যমাত্রই আপেক্ষিক। এবং মানুষের অনুভূত ও উপলব্ধ সত্য তথ্য, দর্শন মাত্রই প্রাতিভাসিক। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি আজো অপূর্ণ হলেও অবশ্যই এর আওতামুক্ত।

অমৃত নেই

নতুন শিশুর কাছে এ পৃথিবী এক বিস্ময়কর বিচিত্র বিবিধ রূপে-রসে, আকারে প্রকারে অশেষ সৌন্দর্যের আশ্চর্য কৌশল-প্রকৌশলের, বিভিন্ন গুণ-মান-মাপ-মাত্রার এক অবর্ণনীয় রূপ-লাবণ্যের আধার। ইন্দ্রিয় দিয়ে দিয়ে প্রতিক্ষণে অনুভব-উপলব্ধি করেও অবচেতন সুখ ও আনন্দ পেয়েও কখনো ক্লান্ত হয় না ইন্দ্রিয়। বরং 'জনম ভরিয়া রূপ নেহারিলুঁ তবু নয়ন না তিরপিত ভেল'।

শুধু তা-ই নয় 'রূপের পাথারে আঁখি' ডুবিয়া রহিল/যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। তারপরেও-রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'।

তা-ই প্রতি নতুন মানুষের কাছে তো বটেই, প্রতি নতুন সূর্যের উদয়েও পৃথিবী নতুন রূপে-রসে-বর্ণে-বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যদি মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বস্থ থাকে, তাহলে পৃথিবী তার কাছে অশেষ, এ আসক্তি অসীম। তাই জীবনের প্রতি অনুরাগও অপরিমেয়।

AMARBOI.COM

শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে-যৌবনে এ রূপ দেখে দেখেও তৃপ্তি, তুষ্টি মেলে না, তৃষ্ণা প্রায় সার্বক্ষণিক। তৃষ্ণা, অতৃপ্তি, অতুষ্টি, কাঙ্ক্ষা-কামনা থেকেই যায়। যৌবনাবধি তাই ইন্দ্রিয় থাকে সজীব, সতর্ক, সচেতন, দেখায়-শোনায়-জানায়-সম্ভোগে-উপভোগে-আগ্রহী এবং সে রূপানুভবে এবং সে-রস উপলব্ধিতে প্রতি অনুভবপ্রবণ-সংবেদনশীল, মননপ্রবণ মানুষই তিলে তিলে নতুন হয়ে অনুভব-উপলব্ধির, জানা-বোঝার জগৎ বিস্তৃত করে।

সব কিছুরই থাকে জোয়ারের উদ্ভব-উন্মেষ-বিকাশ-বিস্তার-উৎকর্ষ, আবার ভাটার মতো জরা, জড়তা ও জীর্ণতাও ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়কে দুর্বল, নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় করে তোলে। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এবং বার্ধক্যে এ আশ্চর্য পৃথিবী যেন সবাইকে আর সবসময়ে আকৃষ্ট করে না, জাগায় না তার রূপ-সৌন্দর্যে মানসিক রোমাঞ্চ, হৃদয়-মন-মস্তিষ্ক হয় না আন্দোলিত–সবটা যে পুরোনো গতানুগতিক, আবর্তিত। আকাশের নব ঘনশ্যাম যেমন জাগায় না বিরহবোধ কিংবা মিলনাকাঙ্ক্ষা, নবদূর্বাদল শ্যাম প্রান্তরও করে না পুলকিত।

আবর্তিত-অনুবর্তিত ইহজাগতিক জীবনের কলুর ঘানির আবর্তন তুল্য এক অবস্থা ও অবস্থান কখন যে সেই ইন্দ্রিয় প্রভাবিত রোমাঞ্চিত-শিহরিত-পুলকিত মন মেরে যায়, তা সহজে টেরও পাওয়া যায় না। তখন আনন্দের দিনেও আনন্দ মেলে না, উৎসবের মধ্যে উৎসব অনুভূত হয় না, হাসিও যেন কৃত্রিম সৌজন্যসূচক দন্তবিকাশমাত্র। এমনি বেদনাকরুণ বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'সে প্রফুল্লতা সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জন এবং ক্ষতি উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জন অধিক ইহাও নিয়ম। তবে বয়সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ফূর্তি কমে কেন?' মা-বাবা মরে, কিন্তু সন্তানের ঘর ভরে, ভাইবোন ঠাঁই ঠাঁই চলে যায়। কিন্তু প্রিয়া পাশে থেকে প্রীতির প্রবাহে দেহ-মন-মেজাজ স্নিগ্ধ ও স্বস্থ রাখে। তবু কেন নিরানন্দ? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ যৌবন অপগত বলে। [যৌবনের] 'কেবল রঙ্গিন কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিন কাচ।' 'তাঁর মতে যৌবনে আশাই মানুষকে উজ্জীবিত, উদ্দীপিত, আশ্বস্ত, উদ্যোগী ও উদ্যমশীল শক্তিমান সাহসী রাখে। যৌবনান্তে ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্ন-ব্যর্থতা-বিফলতা-বঞ্চনা-হতাশা-নৈরাশ্য ক্রমে মানুষের দেহ-প্রাণ-মন-মনন-আশা-প্রত্যাশা দুর্বল করে, সাফল্যে, সিদ্ধিতে আস্থা রাখাও সহজে সম্ভব হয় না। প্রৌঢ় বয়সে তাই তিনিও উপলব্ধি করেছেন যে, [এ সংসার রূপ] অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই।... কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে,... ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই।' প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে এমনি সব অভিজ্ঞতা, ব্যর্থতা, হতাশা নৈরাশ্য তো থাকেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতার, সূক্ষ্মতার, তীব্রতার এবং মন-মননে কৌতূহলের ও জিজ্ঞাসার কালক্রমিক হ্রাস, নিস্তেজ-নিষ্ক্রিয়তা, উদ্যম-উদ্যোগ রিক্ততা, রুচির, আগ্রহের-উৎসাহের অভাব প্রভৃতি বার্ধক্যে মানুষকে নিরানন্দ ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে। বার্ধক্যে এ কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, উদ্যমশীলতা, কাঙ্ক্ষা, সাফল্যবাঞ্ছা, অর্জনস্পৃহা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পড়ে। তার দেহ পায় জীর্ণতা, হয় জরাগ্রস্ত, মন-মননও হয় জড়তার শিকার। পৃথিবী তখন তার কাছে শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবনের আশ্চর্য জগৎ নয়। এর রূপবৈচিত্র্য ও বর্ণবিলাস তখন বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়ায়। আস্তে আস্তে তার আগ্রহের, উৎসাহের, জিজ্ঞাসার, প্রাপ্তির, ভোগ-উপভোগের মাত্রা কমতে থাকে, রুচি যায় হারিয়ে। তখন ঘরের কক্ষের ক্ষুদ্র পরিসরে তার জীবন নয় শুধু মন-মননও হতে থাকে আবর্তিত। পূর্বের রোমান্সের-রোমাঞ্চের-জাগরণের-শিহরণের স্মৃতিও তাকে তেমন পুলকিত করে না। শয্যালগ্ন, গৃহবদ্ধ সেবা-শুশ্রূষানির্ভর জীবনে মৃত্যুর আহ্বান ভয়াল ঠেকে না কোন নিরীশ্বর নাস্তিকের কাছে। তখন জগতে থাকে না তার কিছু চাওয়ার ও ভরসা করার, মৃত্যুর সঙ্গেই চৈতন্যের অবসান বলে এবং অন্যজীব-উদ্ভিদের মতো সেখানেই জীবনের সমাপ্তি বলে তার পারত্রিক ভয়েরও কিছু থাকে না। তাই নিরীশ্বর নাস্তিকে মৃত্যুভয় থাকে না। কারণ তাদের আত্মায় আস্থা নেই। তারা কেবল চতুর্ভৌতিক চৈতন্যই মানে যার অবসানের নাম মৃত্যু। নিরীশ্বরদের বাঁচার আনন্দ আছে, কিন্তু মৃত্যুর ভয় নেই।

আস্তিকদেরও পার্থিব জীবনে কোন চাওয়া-পাওয়া থাকে না। কিন্তু তারা স্রষ্টার সৃষ্টিতে, শাস্ত্রে, আত্মায়, পাপে পুণ্যে এবং আত্মার পারত্রিক শাস্তি-শান্তিতে, তিরস্কার-পুরস্কারে বিচারের কর্মফলে, ক্ষমায়, মুক্তি-মোক্ষ নির্বাণ-সুখ-আনন্দ-আরামে আস্থা রাখে বলে জ্ঞাত-অজ্ঞাত পাপের ভারবাহী আস্তিক ঈশ্বরানুগত মানুষ মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পায়। কিন্তু নিরীশ্বরদের জানাই: মাভৈঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার

এ জনগণতান্ত্রিক যুগে সরকার হচ্ছে সমবায় প্রতিষ্ঠান। সরকারের দায়িত্বে থাকেন যাঁরা, তাঁদের ছোট-বড়-মাঝারি নির্বিশেষে যে-কারো অসততা, ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা, দীর্ঘসূত্রতা, অবিবেচনা গোটা জাতিরই ক্ষতি করে লঘু-গুরুভাবে। যেমন পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে তার তরঙ্গ বা আলোড়ন তট পর্যন্ত না পৌঁছে থামে না, তেমনি সরকারী ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-মত-পথ দেশের প্রত্যেকটা মানুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃশ্য-অদৃশ্যে লঘু-গুরুভাবে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংলগ্ন বা জড়িত থাকে। কাজেই রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সরকারের কাজ কর্ম-নীতিনিয়ম, প্রথা-পদ্ধতি, আয়-ব্যয়, লগ্নি-পুঁজি; বাণিজ্যপুঁজি, শিল্পপুঁজি, আমদানী-রফতানী নীতি প্রভৃতি সব কিছুর সঙ্গেই রাষ্ট্রের সব নাগরিকেরই স্বার্থ দৃশ্যে অদৃশ্যে, প্রত্যক্ষে পরোক্ষে লঘু-গুরুভাবে সম্পৃক্ত। তাই নাগরিক মাত্রেই দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সচেতন-সতর্কভাবে রাজনীতি, সরকারপরিচালিত নীতি, শাসন-প্রশাসন প্রভৃতি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সর্বপ্রকার বৈষয়িক ব্যবহারিক শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা। আধুনিক রাষ্ট্রের গাঁ-গঞ্জের, নগর-বন্দরের সাক্ষর নিরক্ষর শিক্ষিত নারী, পুরুষ, কিশোর, তরুণ সবারই রাজনীতি সচেতন হওয়া ও থাকা আবশ্যিক ও জরুরী দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রের কোন মানুষেরই বলার অধিকার নেই যে তিনি রাজনীতি বোঝেন না, করেন না, রাজনীতিতে তাঁর কোন প্রয়োজন বা আগ্রহও নেই। এটি তাঁর অজ্ঞতার, দায়িত্বহীনতার, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা শক্তির রিক্ততারই সাক্ষ্য, সুরুচি-সংস্কৃতিমানের, নিরীহতার প্রমাণ নয়। অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশ এমনি অবিকশিত মন-মননের মানুষের সংখ্যাই শ'য়ে নিরানব্বই জন বলেই আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার মানুষের জীবনে অজ্ঞতার, অনক্ষরতার, অভাবের, নিঃস্বতার, নিরন্নতার, নিঃসহায়তার, নির্যাতনের, পীড়নের কবলমুক্তি ঘটেনি, ঘটেছে না আজো।

শাসক-শোষক-পেষক-পীড়ক শ্রেণীই তাই এ মুহূর্তেও তাদের প্রভু-পালক-পোষক অভিভাবক এবং আপদে বিপদে সহায়। তাদের দয়া দাক্ষিণ্য আর কৃপা করুণাই এসব দুস্থ মানবতার অবলম্বন। ছদ্মবেশী প্রতারক-প্রবঞ্চকরাই তাদের বন্ধু, হিতৈষী, নেতা ও পরিচালক-প্রতিপালক। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! ১৯৯১ সনের এ জানুয়ারিতেও এর কোন হেরফের হয়নি কোথাও।

টমাস মুরই বলতে গেলে প্রথম (১৫১৫ সনে) উটোপিয়ান, যদিও প্লেটোও একজন মানবহিতৈষী। আঠারো-উনিশ শতকের মানবতাবাদী হৃদয়বান উটোপিয়ান বা মানবহিতৈষীরা সাম্যেই পীড়ন-শোষণ মুক্তি সম্ভব বলে বুঝতেন, জানতেন এবং মানতেন। সম্পদের ও মানব শ্রমের, নির্মাণের ও উৎপাদনের কি রূপ ব্যবস্থায় তা সম্ভব, তা ভাবা, বোঝা, জানা ও মানা সম্ভব বা সহজ ছিল না বলে, এর রূপায়ণ বা বাস্তবায়ন— বুনো-বর্বর-আরণ্য ও প্যাস্টোবেল সমাজ উত্তরণের ও অতিক্রমণের পরে-- কারো পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ শতকের আগে সম্ভব হয়নি। উনিশ শতকে কার্ল মার্কস্‌ই কেবল বাস্তবে প্রায়-প্রয়োগ যোগ্য একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করাতে সমর্থ হন। একালের মানবত্রাতা তাই মনীষী কার্ল মার্কস্‌। পরিচালক-প্রযোজক প্রশাসকের বুদ্ধি-স্বভাব-সততার দোষে আজ তা পরিত্যক্ত হতে চলেছে পৃথিবীর সর্বত্র। মানুষকে ভালোবাসার, নির্বিশেষ মানবাধিকার স্বীকার করার-বেঁচে থাকার, জীবনের ভোগ-উপভোগে জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আজ অবজ্ঞেয় অপরাধের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা, বড় দুর্বুদ্ধি মানব সমাজে আর কে কবে দেখেছে! দুষ্ট দুর্জনের জ্ঞান-শিক্ষা-বুদ্ধির অপপ্রয়োগ যে মানুষকেও অমানুষ করে এ-ই তার এক প্রমাণ।

আমরা এবারও একটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করলাম। লোকে বলে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করতে চলেছি। এখনও চিন্তার-চেতনার বিচিত্র ও বিভিন্ন মতের ও পথের হৈ-চৈ-এর, তর্জন-গর্জনের রেশ কাটেনি। এ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে অসংখ্য দল তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ও মতলব অনুসারে নানা মত-পথ-আদর্শ-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছে। এতে শুধু শহরে বন্দরে নয়, গাঁয়ে-গঞ্জেও বিভ্রান্তি, ভুল বোঝাবুঝি, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব বাড়ছে। এর ফলে নির্বাচন কিংবা নির্বাচনোত্তর কালে বাঞ্ছিতমানের একটা গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি ও সমাজ প্রতিবেশ গড়ে উঠবে কি-না বলা শক্ত। তাছাড়া গণতন্ত্র একটি হাওয়াই কথা। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্যপুঁজি, শিল্পপুঁজি প্রভৃতির সুব্যবস্থা, সুপরিকল্পনা এবং সুপরিচালনা। দেশ, রাষ্ট্র, সরকার, মানুষ এবং গণতন্ত্র সবকিছুর সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করছে সম্পদের উপর। আজকালকার দিনে সে সম্পদ হচ্ছে অর্থপ্রতীক। এ অর্থের উপরই সব নির্মাণ-উৎপাদন, আমদানী-রফতানী, আয়-ব্যয়ের হ্রাস বৃদ্ধি, এককথায় সভ্যতা-সংস্কৃতি, সুখ-শান্তি, মনন-চিন্তন, উদারতা প্রভৃতি সবকিছু নির্ভর করে। কাজেই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সার্বক্ষণিক সতর্ক-সযত্ন প্রয়াস এবং চিন্তা-ভাবনা আবশ্যিক ও জরুরী। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা-অভিজ্ঞতা-সততা-সদিচ্ছা-কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান না থাকলে কোন গণতন্ত্রই এ যুগে দেশের প্রত্যাশিত উন্নতি সাধন করে না। শাসন-শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-বিশৃঙ্খলা-বিড়ম্বনা থেকেই যায়। আমাদের আজকের সংগ্রামী রাজনীতিকদের এ কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে। এ কথা ভুললে চলবে না যে গণতন্ত্র হচ্ছে স্বসত্তাচেতনার, আত্মস্বাতন্ত্র্য উপলব্ধির, আত্মমর্যাদাবোধের, স্বাধিকারের, সহ ও সম স্বার্থবোধের দলবদ্ধ বা যৌথ সামাজিক জীবনে সমমর্যাদায় ও অধিকারে স্বাধীনসত্তায় বাঁচার আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত মানবসংস্কৃতির প্রসূন। এ তাৎপর্যে গণতন্ত্রচেতনা হচ্ছে মানবমনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল, য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের পরিণাম ও নির্যাস। স্মর্তব্য যে বুনো-বর্বর-আরণ্য সমাজের গৌত্রিক বা গোষ্ঠীক সর্দারতন্ত্র বা পঞ্চায়েত প্রশাসন আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সদৃশ বা অভিন্ন নীতি-নিয়ম-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যজাত নয়। গণতন্ত্র আধুনিক, প্রাগতিক এবং বিকাশশীল সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক ব্যক্তিক, পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মনন-চিন্তনশীল সচল জীবনব্যবস্থা (এ বন্ধ্যা নয়, স্থির নয়--সদাসৃষ্টিশীল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঙ্গা-হাঙ্গামার গোড়ার কথা

১

আদিকাল থেকেই অজ্ঞ অসহায় মানুষের বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রসূত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণকে আমরা মানুষের অনুভূত-উপলব্ধ অভিজ্ঞতা ও যুক্তিপ্রসূত চিন্তাজাত জ্ঞান বলে মানি। অথচ ব্যক্তির বা দলের অভিজ্ঞতা লব্ধ তথা পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অংশটুকু ছাড়া বাদ-বাকি সবটাই বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসার আবেগ প্রসূত। যেমন সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবিশ্বাস, ট্যাবু-টোটেমে আস্থা এবং এ যাবৎ অনুশীলিত অধিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, মরমীতত্ত্ব, সাধারণভাবে দার্শনিক চিন্তা-চেতনা প্রভৃতির গোড়ায় কোন অভিজ্ঞতার তথা জ্ঞানের সঞ্চয় ছিল না। ছিল বিস্ময়ের, কল্পনার, আবেগের এবং কারণ-কার্য জিজ্ঞাসার প্রেরণা। তাই পরীক্ষিত বা অভিজ্ঞতালব্ধ সর্বজনগ্রাহ্য তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক ক্রমপ্রসারমাণ জ্ঞান হচ্ছে চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। আর সব বিস্ময়-কল্পনা-জিজ্ঞাসা-ভয়-ভক্তি-ভরসাজাত তথাকথিত জ্ঞান এবং স্থানিক, কালিক ও গৌত্রিক ভাবে স্বীকৃত জ্ঞান হচ্ছে ভিত্তিহীন পরম্পরাগত বিশ্বাস ও দৃঢ়মূল সংস্কারমাত্র। কিন্তু প্রচল জ্ঞানের এ পার্থক্য-চেতনা কোটিতে গুটিক মনেও জাগে না।

অজ্ঞ অসহায় মানুষের আদি কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা-- জগৎ কি, জীবন কেন? স্রষ্টা কে, সৃষ্টি কেন? এভাবে যে কে, কি, কবে, কেন, কোথায়, কেমন প্রশ্ন মনে জেগেছে, অসহায় মানুষের মধ্যে যে বা যারা কিছুটা যুক্তি-বুদ্ধি-চিন্তা প্রয়োগে সমর্থ, সে বা তারাই সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবাদ, ট্যাবু-টোটেমবাদ, স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সৃষ্টিপত্তনতত্ত্ব অনুমান করেছে যথেচ্ছভাবে। ফলে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে স্থানিক-কালিক ও গৌত্রিকভাবে ভূত-প্রেত-দেও-দানু, যক্ষ-রক্ষ, দেবতা, অপদেবতা উপদেবতা, জীন-পরী, ড্রাগন প্রভৃতি অনেক অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ শক্তি প্রতীক অদৃশ্য লোকের ও সচল প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনায় আবিষ্কার করেছি এবং নিঃসংশয়ে তাদের শক্তি-সামর্থ্যে ভয়-ভক্তি-ভরসাভিত্তিক আস্থা রেখেছি। এক্ষেত্রে আজ অবধি সাধারণ মানুষ কখনো যাচাই-বাছাইয়ের গরজ অনুভবই করে না। প্রাজন্মক্রমিক পবিত্র ও অবশ্যমান্য বিশ্বাস-সংস্কার এবং অবশ্যপাল্য শাস্ত্র-আচার-পালা-পার্বণ রূপেই এসব বিশ্বাস-সংস্কারের স্থিতি ব্যক্তিমনে এবং সামাজিক আচারে ও আচরণে। মানুষের এ বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধতার সুযোগ নিয়েই জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি ঋদ্ধ দুষ্ট মানুষ এদের শাস্ত্রিক সামাজিক বৈষয়িক নৈতিক জীবনের পরিচালক নেতারূপে এদের স্ব ও স্বশ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করে।

২

ধর্ম রিলিজিয়নের প্রতিশব্দ বা পরিভাষা নয়। ধর্ম হচ্ছে স্বভাব বা গুণ। প্রাণীর ও উদ্ভিদের আলো, বাতাস, মাটি, পানি প্রভৃতি অন্তর্নিহিত শক্তি, গুণ, স্বভাব বা অব্যয় প্রবণতা। মূল, ভিত্তি, অবলম্বন অর্থে যা ধারণ করে প্রাণী বা পদার্থ টিকে থাকে, তা-ই ধর্ম। রিলিজিয়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ তাৎপর্যে কখনো ধর্ম নয়। দলচর যূথবদ্ধ মানুষের পারিবারিক, গৌত্রিক, দৈশিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় নির্বিবাদে নিরাপত্তায় সহাবস্থানের ব্যবস্থা লক্ষ্যে পারস্পরিক ব্যবহার, লেন-দেন, দায়িত্ব-কর্তব্য, অধিকার সম্বন্ধে স্রষ্টার বা ঈশ্বরের নামে উচ্চারিত নির্দিষ্ট নীতি-নিয়ম অবশ্য মান্য ও পাল্য করে, যা গৌত্রিক, স্থানিক, কালিক প্রয়োজনে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা ঋদ্ধ সমকালীন গণহিতৈষী মান্য ব্যক্তিত্ব মুখে উচ্চারিত ও প্রচারিত, তা-ই রিলিজিয়ন। আত্মা অবিনাশী বলে ইহ-পরকালে প্রসৃত জীবনে ন্যায়পন্থীর জন্যে অনন্ত সুখের এবং অন্যায়কারীর জন্যে চিরযন্ত্রণার যথাক্রমে আশ্বাস এবং হুমকি রয়েছে বলেই লোকে শাস্ত্র নামের এ নীতি-নিয়ম ও আদেশ-উপদেশ সমষ্টিকে আবাল্য ভয়-ভক্তি-ভরসার অবলম্বন বলে দ্বিধাহীনচিত্তে বিশ্বাস করে বটে, এবং বাহ্যত আচারিকভাবে পূজা-উপাসনা-পালা-পার্বণ-ব্রতও আপাত নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য কর্তব্যের ও কর্মের অঙ্গ করে নেয় বটে, কিন্তু মানুষের জীবন চালিত হয় বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রবর্তনায়। ঈশ্বর সব দেখেন, জানেন, সব সৎ-অসৎ কাজের সব ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব রাখেন, যথাসময়ে তার জন্যে পুরস্কার-তিরস্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে জেনেও প্রবৃত্তি বা প্রলোভন প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য হলে অদৃশ্য ঈশ্বরকে উপেক্ষা করে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে সর্বপ্রকার অপকর্ম অপরাধ করে। মানুষ প্রবৃত্তি-প্রলোভন সংযত করে কেবল লোকনিন্দার আশঙ্কায় কিংবা সরকারী শাস্তির ভয়ে। কাজেই আস্তিক্য বা শাস্ত্র তথা অদৃশ্য স্রষ্টা ও শাসক ঈশ্বর কার্যত মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবহারিক, বৈষয়িক, আর্থিক ও নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন না। এ তাৎপর্যে রিলিজিয়নের বা শাস্ত্রের কোন কেজো উপযোগ নেই মানুষের নিত্যকার নৈতিক-আর্থিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনাচারে। তা ছাড়া, বিশ্বাস-সংস্কার চালিত মানুষের মনে-মননে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির কোন ঠাঁইও হয় না। ফলে মানুষ ঈশ্বর ও শাস্ত্র মানে রোবোটের মতোই। তাই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উত্তেজিত উন্মত্ত মানুষ সোল্লাসে একের অপরাধে অন্য মানুষ হত্যা করে, অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকারে হয় আগ্রহী, এক রাজ্যের বা অঞ্চলের মানুষের অপরাধের প্রতিশোধ নেয় ভিন্ন রাষ্ট্রের নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে। নরহত্যায় পুণ্যার্জনের তৃপ্তি ও উপাস্য ঈশ্বরের আনুগত্য সুখ লাভ করে।

AMARBOI.COM

৩

সমাজে স্বল্পসংখ্যক লোকই জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি প্রয়োগে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবননিষ্ঠ হয়। অন্যরা মেষ-শেয়ালের মতো দলে পালে বিশ্বাস-সংস্কার আশ্রিত নিয়ন্ত্রিত গড্ডল-ফেরু জীবনে হয় অভ্যস্ত।

সাধারণভাবে, মানুষ মাত্রেরই কৌতূহল সীমিত। নিজের আহার নিদ্রা মৈথুন সম্পৃক্ত অর্থাৎ জৈব-প্রয়োজন সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে মানুষ সাধারণভাবে উদাসীন, কদাচিৎ কখনো কারো কোন এক বা একাধিক বিষয় গভীর ও ব্যাপকভাবে জানবার বুঝবার জন্যে দৃঢ় গভীর আগ্রহ জাগে মাত্র। এ জন্যেই আজ অবধি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই বিভিন্ন বিষয়ে স্ব স্ব মনীষার ফসল রেখে গেছেন আবিষ্কারে উদ্ভাবনে। অন্যরা নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত ফলভোগী-উপভোগীমাত্র। তাই মনুষ্য মনন-চিন্তন-আবিষ্কার-উদ্ভাবন এগিয়েছে নিতান্ত মন্থর গতিতে। ইদানীং বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তির বহুল প্রয়োগে মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারিক জীবনের সৌকর্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বটে, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ছাড়া সাধারণ মানুষের মানসোৎকর্ষ প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় যেন পৃথিবীর কোথাও ঘটছে না। তাই দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই প্রাত্যহিক জীবনে দৃশ্যে অদৃশ্যে অবাঞ্ছিত ও অমানবিকভাবে আদিম প্রাণীসুলভ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত।

মানুষের কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা সীমিত ও কেবল প্রয়োজনমুখী বলেই মানুষ পথ-চলতি শুনে জানতে যত আগ্রহী, পড়ে জানতে, সাগ্রহ জিজ্ঞাসায় জানতে সে পরিমাণেই উদাসীন। ফলে আশৈশব-আবাল্য-আকৈশোর পরিবারে ও পাড়ার সামাজিক প্রতিবেশে যতটুকু শুনে শেখে, জানে ও বোঝে ততটুকুই থাকে দৃঢ়মূল বিশ্বাস-সংস্কাররূপে সারাজীবন জগৎচেতনার ও জীবনভাবনার নিয়ামক নিয়ন্ত্রক পুঁজি। এর মধ্যে জ্ঞান প্রজ্ঞা যুক্তি বুদ্ধি বিবেক বিবেচনার কোন ঠাঁই থাকে না। এখানে বিশ্বাসই দিশারী, সংস্কারই চালিকাশক্তি। বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ন্ত্রিত নিয়তিনির্ভর নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত জীবনে সাধারণ মানুষ আস্থাবান থেকেই স্বস্থ থাকে। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা জাত প্রশ্নের, দ্বিধার, দ্বন্দ্বের উন্মেষই ঘটে না তাদের মাথায় মনে বা হৃদয়ে। এ মানুষ নিয়েই শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র চলে। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনন-মনীষা-বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন মনস্বী মানুষ আজো লাখে একজনও দুর্লভ বলেই ন্যায়-নীতি-নিয়মমানা ও সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি, দল ও সমাজ আজো দুর্লভ পৃথিবীর সভ্যতম অংশেও।

এর ফলেই সাধারণ ব্যক্তি মানুষ, সাধারণ মানুষের সমাজ ও সাধারণ মানুষ শাসিত রাষ্ট্র কখনো নিবর্ণ নির্বিশেষ গুণের মানুষ হওয়ার কাঙ্ক্ষী হয় না। তারা কেবল শাস্ত্র-জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষায় গুরুত্ব দেয়, আর সে-খানে ভিন্ন শাস্ত্র-জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস ও শ্রেণী দ্বেষণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে।

AMARBOI.COM

৪

তবু অন্যান্য প্রাণীর মতোই মানুষ প্রজাতিও মনের, মতের, লোভের, লাভের, ভাষার, বর্ণের, গোত্রের, স্বার্থের ও প্রয়োজনের পার্থক্য নিয়েও দলে পালে যৌথ জীবনযাপন করেছে চিরকাল, তার জন্যে সম ও সহ স্বার্থেই সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় দেয়া-নেয়ায় সহাবস্থান করেছে, করে এবং কখনো কখনো অসংযত লাভ-লোভের বশে প্রতারণা-বঞ্চনার ফলে আকস্মিক সংঘাত-সংঘর্ষও ঘটে। আজো দুনিয়াব্যাপী গাঁয়ে-গঞ্জে সে অবস্থাই বিরাজমান। এখন অবশ্য শিক্ষিতের ও রাজনীতিক টাউটের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং রেডিও টিভির প্রভাবে গাঁয়ে-গঞ্জেও লুট দাঙ্গা সম্ভব। কিন্তু শহরে-বন্দরে তথাকথিত শিক্ষিত লোকের সরকার; রাজনীতিক দল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও নির্মাণ-উৎপাদন মালিক অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রক শ্রেণীর মানুষেরা ব্রিটিশ আমল থেকেই নানা ছলছুতোয় শহরে-বন্দরে স্ব স্ব আর্থিক রাজনীতিক স্বার্থে জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষার ভিন্নতার সুযোগ নিয়ে প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে লুটে-দাঙ্গায়-হত্যায় কাবু রাখায় ও বিতাড়নে প্রয়াসী হয়। এর এখনকার সাধারণ নাম সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, আসলে এ হচ্ছে লুটে-দাঙ্গায়-হত্যায় প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী অপসারণ প্রক্রিয়া। এ যুগে এটি সংক্রামক হয়ে স্থানান্তরে-দেশান্তরে রাষ্ট্রান্তরেও দুর্বল উনজন হত্যার উৎসবরূপে ছড়িয়ে পড়ে। নির্দোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগীর স্বধর্মী, স্বভাষী, স্বদেশী, স্বজাতি বলেই আক্রান্ত ও নিহত হয়। এ ক্ষেত্রে আধুনিকতম জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস আইন মানবতা-নীতি-নিয়ম-বিবেক-বিচার-বিবেচনা, লাভ-ক্ষতির হিসেব মানবিক বোধবৃদ্ধি আজো অপ্রযুক্ত। কারণ এখন জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র অর্থে সম্পদে রাজনীতিক স্বার্থে বৈশ্বিক নীতি-নিয়ম ও বাজার সম্পৃক্ত। তাই এখন কোন রাষ্ট্রে ক্বচিৎ কিছু স্থানিক ও স্বতন্ত্রভাবে ঘটে, বিদেশী-বিধর্মী-বিভাষী-বিজাতি-বিশ্রেণীর ও বিমতের লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে থাকে দেশী-বিদেশী স্বার্থবাজ মতলববাজদের ষড়যন্ত্র ও উসকানি। আমরা জানি এ শহর-বন্দরের তথাকথিত শিক্ষিত স্বার্থবাজ রাজনীতিক দল, সরকার কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্মাণ-উৎপাদক মালিক অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রক শ্রেণীই, শ্রেণীর নেতারাই শ্রেণীর বা দলের স্বার্থে যুক্তি-বুদ্ধিরিক্ত লোকদের শাস্ত্রিক, দৈশিক, ভাষিক, জাতিক বার্ণিক শ্রেণীক ভিন্নতায় গুরুত্ব দিয়ে সংখ্যাগুরু বা অধিজনদের উৎসাহ-উদ্দীপনা-উত্তেজনা-প্ররোচনা দিয়ে একটা উত্তপ্ত সমর্থকদল তৈরি করে এবং এদেরই থেকে প্রলুব্ধ গুণ্ডা-মস্তান লুটে হত্যায় সাগ্রহে এগিয়ে আসে। আশ্রয় ও প্রশ্রয় পায় বলেই ওরা বেপরোয়া। নইলে কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্ভয়ে সোল্লাসে লুট করবে, নরহত্যা করবে আর ঘর জ্বালাবে? দাঙ্গাবাজকে ধরেও না, শাস্তিও দেয় না সরকার। লুটে, রক্তে, আগুনে, হিংসায় বীভৎস প্রাণহরা পরিবেশ সৃষ্ট হয়। এ সব বর্বর অমানবিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সঞ্জাত আরণ্য পরিবেশে কাদের স্বার্থসিদ্ধ হয়, কারা উপকৃত হয় বা সুবিধে পায়, তা বোঝা সম্ভব হলেই কারণ ও কারক অজ্ঞাত থাকে না। ইরাকে মার্কিন বর্বরতা, অমানবিক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডও রাষ্ট্রিক পর্যায়ের মার্কিন স্বার্থসম্পৃক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামাই।

AMARBOI.COM

৫

মনে অসহ্য বেদনা জাগে যখন দেখি ১৯৯০ সনের প্রান্তপর্বেও রাজনীতিক দল কিংবা সরকার লুট-হত্যা-জ্বালানো-পোড়ানোর জন্যে অজ্ঞ-দরিদ্র-স্থূলবুদ্ধি প্রলুব্ধ গুণ্ডা-মস্তানদের অদৃশ্যে লেলিয়ে দেয়। তারাই আবার সুনিপুণ কাপট্যে প্রমূর্ত মানবতা হয়ে উচ্চারণ করে, উচ্চকণ্ঠে দাবি করে, 'লুট-হত্যা-আগুন বন্ধ করে, দুস্কৃতীদের শাস্তি চাই, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ চাই।' সরকার ও রাজনীতিক দলগুলো বিবৃতি ছাড়ে, মেঠো বক্তৃতায় মুখর হয়, মিছিলও করে। কিন্তু কারো না কারো স্বার্থে ও ষড়যন্ত্রে বাঞ্ছিত কর্ম শেষ হলেই কেবল লুট-হত্যা-থামে, আগুন নেভে।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা-লুট-হত্যা-ভাঙচুর-জ্বালানো-পোড়ানোর সময়ে সরকারী ঔদাসীন্য, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এমনকি লুটে পাটে হত্যায় সক্রিয় সহযোগিতা দেখা যায় কোথাও না কোথাও। আবার লোকমনে বিভ্রান্তিকর ধারণা সৃষ্টির জন্যে পুলিশ দিয়ে নিজেদের লেলানো গুণ্ডাকে গুলি করায়।

আর প্রত্যাশিত এবং সম্ভব হলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দুষ্কৃতী ধরার রেওয়াজ নেই, নেই ধর-পাকড় করে বিচারের ব্যবস্থা করার। এ একপ্রকার প্রাবচনিক 'হাটুরে মার'।

হতাশ হই, যখন দেখি, মানব প্রজাতির প্রাণিসুলভ আদিম বৃত্তি-প্রবৃত্তি আজো কেবল ব্যক্তি মানুষকেই লাভে-লোভে, স্বার্থে-ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত করে না। প্রলোভন প্রবল হলে শিক্ষিত শহুরে শাসক-প্রশাসক-রাজনীতিকদেরও পাশবিক নিষ্ঠুরতায়-বর্বরতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমানবিকতায় অবাধ প্রেরণা-প্রবর্তনা দেয়। এতে বোঝা যায়, এতো জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনন-চিন্তন-অনুভব-উপলব্ধির উৎকর্ষ ও প্রসার সত্ত্বেও মানব প্রজাতি সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে আজো প্রবৃত্তি পরবশ প্রাণী প্রজাতি মাত্র। প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছিত মানবিক গুণের অনুশীলন, অর্জন, বিকাশ, বিস্তার কেবল ব্যক্তিক প্রয়াসে প্রযত্নে সম্ভব। তাই এ পুরোনো পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন বাঞ্ছিত মানবতাপ্রতীক প্রত্যাশিত মনুষ্যত্বপ্রতিম মানুষ আজো অসংখ্য নয়--করগণ্য। ক্বচিৎ কোথাও, কোনকালে দু'একজন দেখা যায়। এতেই বোঝা যায়, শিক্ষা নৈপুণ্য বাড়ায়, বিদ্যা জ্ঞান দেয়, জ্ঞানও শক্তি মাত্র, চরিত্র গড়ে না। চরিত্র লক্ষ্যনির্দিষ্ট নীতিনিষ্ঠ আত্মসচেতন মানুষেরই পুঁজি। যেসব গুণ সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের গুরুত্বচেতনা অমোঘ করে তোলে, সেসব গুণের অনুশীলন ও অর্জন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মানুষের অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব না হলে, প্রাণিপ্রজাতি মানুষ প্রত্যাশিত মানবতার, মনুষ্যত্বের প্রসাদে বঞ্চিত থাকবে। থাকবে প্রবৃত্তি পরবশ প্রাণিমাত্র। সমাজে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিচালিত ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই কাম্য।

AMARBOI.COM

সারমেয় স্বভাব

কুকুরের মতো ভক্ত, অনুগত, বিশ্বস্ত, প্রভুর জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেও অকুণ্ঠ এমন প্রাণী পৃথিবীতে নেই। কুকুরে অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, কর্তব্যে ঔদাসীন্য প্রভৃতি অজ্ঞাত, তাই অপ্রাপ্য। প্রভুভক্ত কুকুরও তাই প্রভু খুঁজে বেড়ায়, এমন স্বতোপ্রবৃত্ত সেবাদাস জগতে অন্যপ্রাণীতে দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য, কেবল কিছু মনুষ্যেই অবশ্য লভ্য বটে। লাথি মার আর লাঠি মার, কুকুর ফিরে ফিরে প্রভুর কাছে আসবেই--ছাড়বে না। আবার পরম ভক্তিতে অনুরাগে আসক্তিতে এসে পদ লেহন করবেই।

উল্লেখ্য যে ঘোড়া ও কুকুর দৌড়প্রবণ—হেঁটে চলা তাদের স্বভাব নয়। সেদিন আমার এক বিদ্বান বন্ধু আমার মুখে কুকুরের কৃতজ্ঞতার, বিশ্বস্ততার ও আনুগত্যের তারিফ শুনে বললেন যে কুকুর আসলে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম, অলস, সুবিধেবাদী, সুযোগ-সন্ধানী, নিশ্চিন্ত জীবনবিলাসী, অন্নের নিশ্চিত প্রত্যাশী প্রাণী। এমন হীনচরিত্রের ইতর জীব জগতে হয়তো আর নেই-ই এবং কুকুরের এ স্বভাব গড়ে উঠেছে মনুষ্য সান্নিধ্যে। সব প্রাণীরই একটা বিশেষ বা মুখ্য খাদ্য রয়েছে। কুকুরের তা নেই, কুকুর মনুষ্য-প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট খেয়েই বাঁচে। কাজেই কুকুর মনুষ্যসঙ্গ ছাড়তে পারে না, পথের বুনো কুকুরও তাই কোন লোক দেখলে কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্য-আদর-সোহাগ লোভে তার সঙ্গ নেয়--কুকুরছানার মধ্যে এ স্বভাব-প্রয়াস-প্রযত্ন সব সময়েই দেখা যায়। অতএব কুকুর হচ্ছে সুখপ্রিয়, কর্মবিমুখ, প্রয়াসভীরু, খাদ্যকামী প্রাণী। এ খাদ্যের জন্যেই কুকুরের এ অন্ন দাসত্ব, এ আত্মসমর্পণ। এ আত্মসত্তার মর্যাদাশূন্যতা ও গুরুত্বহীনতা, এ আত্মত্যাগ, এ অন্ন দাসত্ব খাদ্য সন্ধানে অনিচ্ছুক প্রায় সর্বভুক কুকুরেই কেবল লভ্য। উচ্ছিষ্টভোগী বলেই কুকুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন মুখ্য খাদ্য নেই, মানুষের প্রায় সবখাদ্যই কুকুরে খায়। কাজেই কুকুরের ভক্তি, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, প্রভুর জন্যে ত্যাগ প্রবণতা কুকুরের জঘন্যহীন সুবিধে সুযোগ সন্ধান, কর্মকুণ্ঠা, শ্রমবিমুখতা, আলস্য, নিশ্চিন্ত অন্নপ্রাপ্তি লিপ্সা স্বভাবজাত চরিত্র লক্ষণ।

কুকুরের এ স্বভাবের একাংশ মানুষও অনুকরণ, অনুসরণ, গ্রহণ ও বরণ করেছে। মানুষের মধ্যে যারা স্তাবক চাটুকার, পদলেহী-তোষামুদে তারা কুকুর থেকেই এ শিক্ষা ও আদর্শ পায়। তারাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহজেই সাফল্য অর্জন করে। তাদের অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থিত ও বাঞ্ছিতপদ, কাম্য সম্মান, প্রত্যাশিত ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট এমনি করেই লভ্য ও লব্ধ। বিশেষ করে শহর-বন্দরের রাজনীতিক, সদাগর, কারখানাদার, ভেজালদার, চোরাবাজারী, দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতি কথায়-কাজে-অর্থে আচরণে এ স্তাবকতা, চাটুকারিতা, পদলেহিতা, তোয়াজ-তোষামোদ পুঁজি-পাথেয় করেই জীবনে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়। অভীষ্ট সিদ্ধ করে। তারাই উচ্চারণ করে সেই শোনা আপ্তবাক্য কাজে কারবারে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই, নেই চিরশত্রু বা চিরমিত্র বলে কেউ। যখন যেমন প্রয়োজন, তখন তেমন মন-মত-মতলব পাল্টানো হয় ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে। বিশ্বস্ততা বা কৃতজ্ঞতা বা আত্মসত্তার মর্যাদাবোধ বা শ্রেয়োচেতনা বলে কিছু থাকতে নেই-- উঠতে বা বড় হতে হলে অর্থে বিত্তে মানে খ্যাতিতে ও ক্ষমতায়। তাই বেহায়া বেশরম-বেলেহাজ লোকেরাই অর্থ-সমাজ-রাষ্ট্র নিয়ামক।

AMARBOI.COM

অনুমান বনাম বিজ্ঞান

পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণজাত জ্ঞান প্রায় নিখাদ-নিখুঁত সত্য ও তথ্য বলে বরণ করা সম্ভব। যদিও মানবিক অসতর্কতা ও মনীষার অভাবে কিছু ভুল-ত্রুটি অদৃশ্যে অজ্ঞাতে থেকে যেতেও পারে। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ স্থানিক, কালিক, গৌত্রিক অভিজ্ঞতা চরম ও পরম সত্য ও তথ্য বলে জানে এবং মানে। যদিও এগুলো অনেকক্ষেত্রে আকস্মিক, খণ্ডদৃষ্টির ও ভুল চিন্তা-চেতনার ফলও বটে। যাচাই-বাছাই করার প্রবৃত্তি প্রবণতা নেই বলে প্রজন্মক্রমে এগুলো বিশ্বাস-সংস্কারভুক্ত চিরন্তন সত্য তথ্য ও অমোঘ তত্ত্বরূপে পরিগৃহীত হয়ে থাকে চিরকালের জন্যেই।

মানুষের এমনি সব অনুভব-উপলব্ধি-চিন্তা-চেতনা-মনন-যুক্তি-বুদ্ধিজাত জ্ঞানমাত্রই মূলত অনুমানজাত, সাক্ষ্য-প্রমাণ-পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণজাত নয়। তাছাড়া মানুষের স্ব স্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনা-মননশক্তি, বিশ্বাস-সংস্কার, রুচি, ভয়, শক্তি, সাহস, অঙ্গীকার, মানসপ্রবণতা, পছন্দ-অপছন্দ। শৈশবের-বাল্যের-কৈশোরের প্রতিবেশ-পরিবেশ প্রসূত এবং মন-মানসের গঠন প্রভৃতিও মানুষের মন-বুদ্ধি-রুচি-মত-পথ-সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করে।

এর ফলেই ইতিহাসও হচ্ছে স্থানিক, কালিক, গৌত্রিক, প্রাতিবেশিক, প্রায়োজনিক মানসপ্রবণতা, স্বার্থবুদ্ধি, ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য, মননের দৈন্য বা তীক্ষ্ণতা, কার্য-কারণ নিরূপণের সামর্থ্য বা অক্ষমতা প্রভৃতি নানা কারণে ও নানা শক্তি-

অশক্তির প্রভাবে ব্যক্তির রচনায় রূপায়িত হয়, স্থিরীকৃত সত্য, তথ্য, তত্ত্ব, মত মন্তব্য এবং লেখার পথ-পদ্ধতিও গড়ে ওঠে এভাবেই।

দর্শনও তো এমনি জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-মনন প্রসূন। এবং বলতে গেলে একান্তই ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনার জগৎদৃষ্টির ও জীবন-ভাবনার ফসল। উত্থাপিত যুক্তি-তর্ক-সাক্ষ্য-প্রমাণ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাদৃশ্যজাত যুক্তি, পরোক্ষ প্রমাণ, অনুভূত ও উপলব্ধ তথ্য বিস্ময়-ভয় কল্পনা-ভক্তি-ভরসা এবং আস্তিক্য-নাস্তিক্য-সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদও দার্শনিক চিন্তা-চেতনা-মনন-মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে।

শাস্ত্রও তো সেই বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা-অনুভব, উপলব্ধি ও অনুমানলব্ধ। সাক্ষ্য প্রমাণ মেলেনি, মেলে না, খণ্ড ক্ষুদ্র অনুভূতি, দৃষ্টির বিভ্রম, বুদ্ধির স্বল্পতা, চিন্তার ক্ষীণতা, চেতনার স্থূলতা, কাকতালীয় যুক্তি, অন্ধ-হস্তীন্যায় প্রভৃতিই এ প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাস-সংস্কারের জনক। তাই স্থানিক, কালিক, আঞ্চলিক, গৌত্রিক, গোষ্ঠিক লিখিত-অলিখিত, লালিত-পোষিত বিশ্বাস-সংস্কার, পূজা-পার্বণ, প্রথা-পদ্ধতি, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ, সত্য, তথ্য, তত্ত্ব, দর্শন বদলায়। শাস্ত্রের উন্মেষ-বিকাশ-বিনাশ তাই যুগে যুগে বহুবিচিত্র ও বিবিধভাবে ঘটেছে, এখনও ঘটে এবং তা প্রায়ই প্রাণহরা, রক্তক্ষরা ও অশ্রুঝরা। প্রাণী প্রজাতি হিসেবে মানুষ যে স্বাজাত্যবোধে আজো সৌভ্রাত্রের অনুশীলনে ও প্রয়াসে সফল-সার্থক হতে পারল না, তা তো ঐ শাস্ত্রভেদের জন্যেই। আবার শাস্ত্রমাত্রই দৃশ্য-অদৃশ্য, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ইহ-পারলৌকিক অমর আত্মা সম্পৃক্ত পাপপুণ্য জড়িত তিরস্কার-পুরস্কারের ভীতি।

অতএব মানুষের মানস জীবনটাই হচ্ছে প্রায় সর্বক্ষেত্রে অনুমাননির্ভর। তাদের বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধ চেতনায় তা-ই সত্য, তথ্য এবং তত্ত্ব। এ অনুমানই তাদের জ্ঞান, ধ্যান, আরাধ্য জীবনের আনন্দ, সুখ, প্রাপ্তি, সাধ, সাধ্য ও সিদ্ধি।

কেবল ব্যবহারিক জীবনটাই বিজ্ঞান, যন্ত্র, কৌশল, প্রকৌশল-প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যা নির্ভর হচ্ছে প্রতিদিন।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মানুষের সাধারণত মতভেদ থাকে না তবে তার দোষ-গুণের, উপকারের, ক্রিয়ার-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাভেদে কিংবা পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের অসম্পূর্ণতার দরুন মতভেদ ঘটতে পারে। তাছাড়া প্রকৃতিও স্থানে কালে বিবিধ ও বিভিন্ন। আবহাওয়াও তাই। সেজন্যেই ভিন্ন পরিবেশে প্রতিবেশে ও গড়ে ওঠা মানুষের দেহ-মনের উপরে তার প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন ও বিচিত্র হয়। তা কখনো ক্ষতির কখনো বা লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেও বিভিন্ন দেশে কালে মানুষের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এমন কি শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের চিকিৎসা-ঔষধ তৈরীর উপকরণের-উপাদানের পার্থক্যের প্রয়োজন হয়। একারণেই স্থান ও আবহাওয়া ভেদে একই রোগে ভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। এতে বোঝা যায়, একই জ্ঞান ও এবং অভিজ্ঞতাও সর্বত্র এবং সর্বদা সমভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না। এজন্যেই কোন একক কারণে যে সহজে কিছু ঘটে না, সব ঘটনার, অবস্থার ও অবস্থানের পেছনে একাধিক বা বিবিধ কারণ থাকে, এসত্যকে বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবেই গ্রহণ করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরুরী ভাবনার কথা : জাতীয়তা

উনিশ দশকের ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের মনে 'জাতীয়তা' সম্বন্ধে একটা চেতনার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু বিরাট বিস্তৃত ভূভাগ রূপ ব্রিটিশভারতে অধিবাসীর রক্তের, গোত্রের, ভাষার, ধর্মের, ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্নতার এবং বৃত্তি ও বর্ণগত বৈষম্যের আর সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের দরুন এক ধর্মাবলম্বী কিন্তু বিভিন্ন ভাষী য়ুরোপের মতো জাতিক, দৈশিক, ভাষিক ও রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীনভাবে চিহ্নিত হতে পারেনি। উনিশ শতকে ব্রিটিশভারতে জাতিচেতনা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে উন্মেষিত হয় ধর্মমত ভিত্তি করেই। কংগ্রেসের কৃত্রিম প্রয়াস সত্ত্বেও ব্রিটিশভারতে দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা গড়ে ওঠেনি। ভারত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিক জাতি ও জাতীয়তা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত বটে, কিন্তু ধর্মমতবাদীরা তা আজো অন্তরে অঙ্গীকার বা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে বিরোধ-দাঙ্গা আর বিচ্ছিন্নতা-স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতাচেতনাজাত আন্দোলন ভারতরাষ্ট্রে আজো রয়েই গেছে। পাকিস্তানে তা অভিন্ন জাতিচেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ওই কৃত্রিম সাময়িক চেতনা উবে গেল অল্পকালের মধ্যেই। রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত হল, লোকে বলে পরিণামে বাকি অংশও চার খণ্ডে স্থিতি পাবে।

আমাদের জাতিপরিচয় সমস্যার মতো এমন অদ্ভুত দুঃসমাধ্য সমস্যা পৃথিবীর আর কোন দেশের বা ভাষার মানুষের আছে কি-না জানি না। যে-চেতনা থেকে মানুষ প্রাণরস আহরণ করে, সত্তার স্বরূপ অনুভব-উপলব্ধি করে, সে-চেতনাটাই আমাদের এখনো অস্পষ্ট ও অপূর্ণ। এখনো অনির্ণীত ছায়া, নিরবয়ব অনুভূতিমাত্র। ব্যক্তিমানুষেরও আশৈশব সুনির্দিষ্ট তিনটে পরিচিতি থাকে-

এগুলো তিনটে প্রশ্নের আবশ্যিক ও জরুরী উত্তর। কি নাম, কোথায় নিবাস এবং কি বৃত্তি-- এ তিনটের উত্তরই ব্যক্তিমানুষের পরিচিতির আবশ্যিক ভিত্তি। এবং আত্মপরিচয়ের এ তিনটে ভিত্তি সবারই দৃঢ়। ব্যতিক্রম বিপর্যয়জাত মাত্র।

দৈশিক-ভাষিক-জাতিক-রাষ্ট্রিক জীবনেও তেমনি একটা অভিন্ন সত্তাচেতনায় ঐক্য ও একত্ব অনুভব না করলে একটা দৈশিক-ভাষিক-রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জাতিচেতনা দানা বাঁধতে পারে না। এ অভিন্ন সত্তাচেতনা বা জাতিচেতনা থেকেই অভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং সিদ্ধি-সাফল্য লক্ষ্যে রাষ্ট্রিক জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিরূপিত, নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, একটা জাতি গড়ে ওঠে। আমাদের বেলায় তা আজো হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেবল মুসলিমের নিশ্চিন্ত-নিশ্চিত নিবাস হিসেবে। কাজেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে নিয়ে 'জাতি' গঠন ছিল সংজ্ঞা ও সূত্রানুসারে অসম্ভব। একারণেই বাঙালী মুসলিমরা যখন স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অঙ্গীকার ও ভিত্তি করে মুক্তিসংগ্রাম শুরু করে তখন দেশের অমুসলিমদের সহানুভূতি ও সমর্থন থাকলেও তারা অধিজন মুসলিমদের মতো যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতায় তেমন আগ্রহী হতে পারেনি। কেননা, তাদের মনে সঙ্গতভাবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন জাগে-- মুসলিমদের মধ্যেকার যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী মুসলিমরা কোন্ তাৎপর্যে তাদের আপনজন? যুদ্ধকালে এরা বাঙালীত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেও, সংবিধান সেক্যুলার হলেও, অমুসলিমদের আস্থা অর্জনের জন্যে, তাদের বল-ভরসা দানের জন্যে সরকার বা অধিজনদের পক্ষ থেকে তেমন কিছু করাই হয়নি। তাছাড়া একত্ববোধ জাগানোর জন্যেও কোন প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রিক আদর্শের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়নি। 'জনাব' এর ও 'শ্রী'র, ধুতির ও লুঙ্গির পার্থক্য জীবনভাবনার ও জীবনাচারের সর্বক্ষেত্রে পার্থক্য-প্রতীক হয়েই টিকে থাকল। কাজেই বহুত্বে-বৈচিত্র্যে ঐক্যের বা একত্বে মানসিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস প্রযত্নও থেকেছে বিরলতায় দুর্লক্ষ্য।

চল্লিশ বছর প্রত্যাশায়, প্রতীক্ষায় ও অপেক্ষায় থেকে নিরাশ উনজনেরা অবশেষে আত্মরক্ষার, আত্মোন্নয়নের ও স্বনির্ভরতার আর স্বপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ও প্রয়াসে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান পরিষদ' গঠন করেছে।

দেশের বা রাষ্ট্রের অধিজনেরা আজো কেবল মুসলমান, না বাঙালী মুসলমান বা মুসলিম বাঙালী, অথবা বাঙালী কিংবা বাঙলাদেশী-- তা নিঃসংশয়ে নির্ণয়-নিরূপণ করতে পারল না। দশজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করুন-- পাঁচ প্রকার উত্তর পাবেন। এ অদ্ভুত চিন্তা-চেতনা, মত-পথ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাতিসত্তার ও জাতিপরিচয়ের ক্ষেত্রে দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আমাদের রাষ্ট্রে এ মুহূর্তে শতাধিক জাতীয় পর্যায়ের তথা রাষ্ট্রিক-চেতনাঋদ্ধ রাজনীতিক দল রয়েছে-- ভাঙছে, গড়ছে ও লুপ্ত হচ্ছে। কিন্তু নদীর উৎসমুখে যেমন নদীর লাক্ষণিক অবয়ব মেলে না, তেমনি এসব রাজনীতিক দলের যৌথচেতনায়, চিন্তায়-কর্মে-আচরণে কোন সুষ্ঠু স্পষ্ট জাতিচেতনা স্বরূপে প্রায় অনুপস্থিত বা অনস্তিত্বে শূন্য। আওয়ামী লীগ কেবল বাঙালীসত্তায় ও জাতীয়তায় আস্থাবান, কিন্তু প্রান্তিক আদিবাসীরা তো বাঙালী বা বাঙলাভাষী নয়-- রাষ্ট্রে তাদের স্থান কি, পরিচয় কি? তা উল্লেখ করে না। অর্থাৎ ওরাও কি বাঙালী, কিংবা রাষ্ট্রিক নামে কেবল বাঙলাদেশী আর স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ নাগরিক? কম্যুনিস্টরা একসময়ে আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনায় ঋদ্ধ ছিল, নাস্তিক্যে এবং শোষণমুক্ত সমাজে আস্থাবান ছিল বলে তাদের কাছে জাতি বা জাতিসত্তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বিপ্লব-মাধ্যমে অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে মানবসাম্য ও মানস-সংস্কৃতি রূপায়ণ সম্ভব বলেই ছিল তাদের ধারণা। কাজেই জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের এবং জাতীয়তার গুরুত্ব তাদের তেমন বিবেচ্য ছিল না। নানা নামের কম্যুনিস্ট-সমাজবাদী দলগুলো দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তায় আস্থাবান বলে মানা চলে। মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, ডেমোক্রেটিক মুসলিম লীগ, জামায়াত-ই-ইসলামি, খেলাফতে রব্বানি, ইসলামি মজলিস প্রভৃতি যে কেবল দেশ-কালহীন বৈশ্বিক মুসলিম কওমচেতনাজাত স্থানিক রাজনীতিক দল, তা বুঝতে বিদ্যা-বুদ্ধি লাগে না। এসব দল বিধর্মী-বিভাষী ও উপজাতিদের জিম্মি ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না-- ইমানের ও আদর্শের বাধা রয়েছে বলেই।

বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগের 'বাঙালী' জাতীয়তার অভিসন্ধিমূলক প্রতিবাদে 'বাঙলাদেশী' জাতীয়তাবাদ প্রচার করে এবং রাজাকার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামপন্থীদের নিয়ে সেনানীশাসক জিয়াউর রহমান সেক্যুলার রাষ্ট্রকে ইসলামি ও মুসলিম আবরণে সজ্জিত করে বাঙালী সত্তার ও মুক্তিযুদ্ধের অবমাননা করে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেন। কিন্তু অন্য এক তাৎপর্যে 'বাঙলাদেশী' জাতীয়তা জনগ্রাহ্য হবার দাবি রাখে। কারণ এ রাষ্ট্রিক জাতীয়তায় প্রান্তিক আদিবাসীরাও ধর্ম-গোত্র-ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সমমর্যাদায় ও সমাধিকারে স্বীকৃতি পায়-- জিম্মি থাকে না। কিন্তু প্রতারণা ও বিভ্রান্তিমূলক অসঙ্গতি রয়েছে বলেই এ অঙ্গীকার বা স্বীকৃতি প্রতারণারই নামান্তর বলেই মানতে হবে-- কেননা 'বিসমিল্লাহ' যুক্ত সংবিধানে অমুসলিমরা পূর্ণ নাগরিক রূপে রাষ্ট্রিক চিন্তা-চেতনায় মানসিক অধিকার ও মানসিক স্বাধীনতা সমানভাবে পায় না। কাজেই পুঁজিবাদী বিএনপি তাদের 'বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ' পূর্ণ সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা না করলে ফাঁকির ফাঁক-গোঁজামিল থেকেই যাবে। আর সেনানীনায়ক এরশাদের জাতীয় দল তো ইসলামকেই রাষ্ট্রধর্ম করে সদম্ভে-সগর্বে-সগৌরবে উচ্চকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে জানিয়েই দিয়েছে, প্রতিমুহূর্তে দিচ্ছে যে তাদের দেহ-প্রাণ-মন-আত্মা ইসলামের রক্ষায় ও লালনে এবং মুসলিমদের পোষণে-পালনে উৎসর্গিত। তাদের জান-মাল-গর্দানও বিশ্বমুসলিম উম্মাহ'র সেবায় সমর্পিত। কাজেই এরশাদের জাতীয়দলের জাতি যে কেবল মুসলিমরাই এবং ভিন্নধর্মীরা যে দলের ও সরকারের পবিত্র জিম্মি তা বোঝার জন্যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। আওয়ামী লীগের সরকার ও শাসন শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রিক জাতীয়তা ও গণতন্ত্র অঙ্গীকার করে। 'বাকশাল' করে তারা সে-অঙ্গীকার আংশিকভাবে ভঙ্গ করে। এখন আওয়ামী লীগ কেবল বাঙালী জাতীয়তায় আস্থা রাখে, সমাজতন্ত্রে নয়।

এখন আর রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাজ্য নেই। এখন সরকার হচ্ছে সমবায় সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ। রাষ্ট্র হচ্ছে একটা খামার, কারখানা রাষ্ট্রান্তর্গত সব মানুষেরই খোর-পোষের উৎস বা আকর। একটি পরিবারের সদস্য-পরিজনের মতোই রাষ্ট্রবাসী মাত্রেরই রাষ্ট্রের হিতকামী হতে হয়, অভিন্ন স্বার্থে, লক্ষ্যে ও অভিন্ন সিদ্ধি বাঞ্ছায়। এ বিজ্ঞান-যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশল নির্ভর যুগে ও জীবনে রাষ্ট্রের কল্যাণে ও উন্নয়নে জনগণের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সহমর্মিতা, সংহতি সহযোগিতা আবশ্যিক। মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমতায়, সমস্বার্থে রাষ্ট্রিক শাসনে-প্রশাসনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, খামারে-কারখানায় অভিন্ন চেতনায় ও লক্ষ্যে অংশগ্রহণের জন্যেই জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণীভেদ ভুলে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেই একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গড়ে তোলা আবশ্যিক এবং অত্যন্ত জরুরী।

দেশের মানুষকে-প্রতিবেশীকে অকারণে পর করে রাখা, তারই স্বঘরে, স্বদেশে ও দৈশিক বা ভাষিক সমাজে কেবল কথায় ও আচরণে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাকে বাড়ি-ঘরের কাজের লোকের মতো অনধিকারী ও পর করে রাখা, জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে তাকে তার অসম অবস্থার ও অবস্থানের কথা সর্বক্ষণ কথায়, কাজে ও আচরণে স্মরণ করিয়ে দেয়ার ফল ও পরিণাম অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার অকৃত্রিম সাহায্য-সহায়তা-মনন-চিন্তন-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-অর্থ-সম্পদ এবং সাধারণ সেবা-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও থাকা রাষ্ট্রের পক্ষেই চির ক্ষতিকর। মানসিকভাবে অনিশ্চিয়তায় ও অসহায়তায়-অনাত্মীয়তায় ভোগে বলেই সে স্বদেশে প্রবাসীর মতো থেকে যায়, মাটির সঙ্গে মমতার শেকড় ছড়ায় না, তার অর্থও বিদেশে পাচার করায় আগ্রহী হয়। কম্যুনিজমের প্রতি সাধারণ মানুষের রয়েছে বিরাগ। কাজেই তাদের পক্ষে এ রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, হবে না। নাস্তিক্যও অচল। তাই রাষ্ট্রিক জাতি গঠনের ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ জাগানোর একমাত্র উপায় ঐহিক-- ইহজাগতিক এবং রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ও বিষয়ে সর্বপ্রকারে ও সর্বদা-সর্বত্র সেক্যুলার নীতি-নিয়ম, রীতি-পদ্ধতি সচেতনভাবে, সরকারীভাবে আন্তরিকভাবে প্রয়োগের প্রয়াস-প্রযত্ন করা, যাতে উনজনেরা বিশ্বাস-ভরসা-আস্থা-আশ্বাস ফিরে পায়, এ মাটিকে মৌরসী অধিকারে ও মমতায় আঁকড়ে থাকে এবং এরাষ্ট্রকেই তারও দেহ-প্রাণ-মন-আত্মার লালন ও বিকাশ ক্ষেত্র বলে সে জানে এবং মানে, যাতে সে অধিজনদের কথায়-কাজে ও আচরণে বোঝে যে এদেশ বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে অধিবাসী মাত্রেরই মাতৃভূমি, অভয় আশ্রয়, নিশ্চিত নিবাস।

এ দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতিগঠন লক্ষ্যে আওয়ামী সরকার তার সেক্যুলার সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক দল গঠন অবৈধ করে দিয়েছিল, সেনানী শাসক জিয়া-এরশাদ জনপ্রিয়তালাভ লক্ষ্যে আবার ইসলাম ও মুসলিম তোষণ শুরু করেন। এখন আবার সেক্যুলার রাজনীতিক দল ও সেক্যুলার সরকার গঠনের আন্দোলন আবশ্যিক ও জরুরী।

AMARBOI.COM

লোভ না জিগীষা

আমরা নিজেদের মধ্যে সর্বক্ষণ অনুভব করি এবং অন্যদের কর্ম-আচরণেও লক্ষ্য করি যে, যে-কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার, লাভবান হওয়ার, দ্রুততর হওয়ার, ক্ষতি এড়ানোর বিপন্ন না হওয়ার একটা অবচেতন বা সচেতন, প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় উৎসাহ-আগ্রহ বা নিতান্ত সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশ পায়। যেমন রিক্সায় চড়লাম, দ্রুত পৌছার কোন গরজই নেই। তবু আমার রিক্সা অন্য রিক্সাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চললে ভালো লাগে। এমনকি এক পদাতিকও অন্য পদযাত্রীকে দ্রুতপদে অতিক্রম করে নিজের শক্তিমত্তায় মনে মনে আনন্দিত হয়। এমনি করে দেখা যায়, মানুষ যাবতীয় নিত্যকর্মে একটা জিগীষার ভাব নিয়ে চলে। অন্যের চেয়ে বড় চাকুরী পেয়ে, বেশি বেতন পেয়ে, বেশি অর্জন করে, বেশি পরিচিত হয়ে, বেশি সম্মানিত হয়ে, এমন কি বেশি খেয়ে, ভালো বিছানা পেয়ে মনে মনে বিজয়ের আনন্দ, গৌরব ও গর্ব অনুভব করে।

এসব দেখে মানুষের এই বাঞ্ছা লোভজাত না জিগীষাপ্রসূত তা স্বরূপে জানার আর বোঝার আগ্রহ জাগে। আমরা কি বুঝব যে জীবনমাত্রই প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক? অথবা মানুষ মাত্রেই কি হিংসুক, ঈর্ষী ও পরশ্রীকাতর অথবা এটি নিতান্ত প্রাণীসুলভ আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিস্তারের বৃত্তি-প্রবৃত্তিজাত! আমরা জীবে-উদ্ভিদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগতিক সর্বব্যাপারে একটা দৃশ্য-অদৃশ্য, অনুভূত-অননুভূত, উপলব্ধ-অনুপলব্ধ সর্বক্ষেত্রে সমশ্রেণী প্রজাতির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জিগীষা রয়েছে বলে মনে করি। আমাদের সাধারণ অনুভবের এই তথ্য ও তত্ত্ব কি আপেক্ষিক বা প্রাতিভাসিক সত্যমাত্র। অথবা এর মধ্যে একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতিও রয়েছে? এর স্বরূপ জানার প্রয়াস বাঞ্ছা আমাদের আর্থ-সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবনেও হয়তো কাজে লাগতে পারে।

জ্ঞান

জানলেই হয় জ্ঞানী, বিদ্যা আয়ত্ত করলেই হয় বিদ্বান। এবং স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এমন লোক অনুন্নতদেশেও আজকাল লক্ষ লক্ষ। কিন্তু যথার্থ অর্থে জ্ঞানী বা বিদ্বান লাখেও একজন মেলে না। এর একটি প্রধান কারণ স্মরণশক্তির, ধীশক্তির বা সাধারণ অর্থে মেধার অভাব। পড়লাম, মনে রাখতে পারিনে, কাজেই প্রয়োজনমতো স্মরণও করতে পারিনে, কাজেও লাগাতে পারিনে, অজ্ঞে-অনক্ষরে আর আমাতে পার্থক্য রইল না কিছুই। এ স্মৃতিশক্তি, মেধা বা ধীশক্তিহীন মানুষের সংখ্যাই শতে নিরেনব্বই। ফলে আমরা লেখাপড়া শিখি, পরীক্ষা পাস করি, চাকরি করি, সংসারে অর্থে বিত্তে-মানে যশে-খ্যাতিতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হই। কিন্তু জ্ঞানী হইনে, পণ্ডিত বলে পরিচিতি লাভ করিনে। শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা যায় অধীত বিষয় আত্মস্থ বা স্বীকৃত হয়নি পড়ে পড়ে, সূত্রাবলী সযত্নে করগণ্য করে অধ্যাপন কার্য চালিয়ে নেন প্রায় সারাটা জীবন। পাঠ্যবই পাশে না থাকলে তাঁরাও যেন যষ্টিহীন অন্ধ। তাই জ্ঞান গ্রন্থবদ্ধ হয়ে গ্রন্থাগারে জ্ঞানের অশেষ আকর হয়ে থাকলেও আমরা জ্ঞানী হইনে। স্মৃতিধরেরাই জ্ঞানী ও পণ্ডিত হন।

আর এ কালে জ্ঞানের গণপ্রসারে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, জ্ঞানকে রূপে-রসে আকারে-প্রকারে শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করে বর্গীভুক্ত করে বিতরণ করা হয়। ফলে কোন এক বিষয়ে একজন মহাজ্ঞানী হলেও, অন্য বিষয়ে শোচনীয়ভাবে অজ্ঞ থেকে যান। আজকের দিনে জীববিজ্ঞানে, মানববিদ্যায়, সমাজবিজ্ঞানে কিংবা বাণিজ্য, বিদ্যায় কোন যোগ নেই। একে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের যুগ নামে অভিহিত করি সগর্বে। ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে নাকি এটিই মনুষ্য বুদ্ধির ও বিজ্ঞতার একটা প্রশংসনীয় উৎকর্ষ।

অবশ্য বিদ্যার একটা পরিপ্রেক্ষিত বা পটভূমি তৈরির লক্ষ্যে কতগুলো আবশ্যিক ও জরুরী বিষয়ে প্রাথমিক বা মৌলিক জ্ঞান দানেরও ব্যবস্থা থাকে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু সেগুলোর গুরুত্বচেতনা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত বা প্রত্যাশিত মানে দেখা যায় না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও Subsidiary নামে উপপাঠ্য বিষয়গুলোতে ভালো ছাত্ররাও ক্বচিৎ মনোযোগী হয়, দু'তিন বার ফেল করে, অথচ অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। অবশ্য প্রাথমিক বা ব্যাসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্ববিদ্যাবিশারদ নয়, তবে জ্যাক হতেই হবে। ফল এখন এ দাঁড়িয়েছে যে পদার্থবিজ্ঞানের, রসায়নের, জীব-উদ্ভিদবিজ্ঞানের কিংবা প্রাণরসায়নের, মৃত্তিকাবিজ্ঞানের, গণিতের একজন বিদ্বান জীবনে একটিও গল্প, উপন্যাস, কাব্য কিংবা ইতিহাস বা দর্শনের বই পড়েননি। সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা বাণিজ্যবিজ্ঞানে চিকিৎসা-প্রকৌশল বিদ্যায় প্রখ্যাত বিদ্বান বা বিশেষজ্ঞও বিজ্ঞানের কোন শাখারই দু'একটি মৌলিক তত্ত্ব বা তথ্য সম্বন্ধে সারাজীবনে কৌতূহলীও হননি, তার মনে কখনো কোন প্রশ্নও জাগেনি যে না-জানাটা জীবনের, অনুভবের, উপলব্ধির একটা লজ্জাকর বা ক্ষতিকর অপহ্নৃতিমাত্র। তার আফসোস হয় না যে অজ্ঞতার মধ্যেই এ বিচিত্র বৃহৎ বিস্ময়কর পৃথিবীর জীবন তার বৃথা অপচিত হল। অথচ আমরা জানি, মানি এবং কথায় কথায় উচ্চারণও করি যে, জ্ঞানই শক্তি। মানুষ সাধারণভাবে জ্ঞানবিমুখ, অবহেলে শোনা কথাই তার জ্ঞান। তার বিজ্ঞতার পুঁজি, তার নেতৃত্বের, সর্দারির ও মাতব্বরির পাথেয়।

এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে, আসমানে জমিনে প্রসৃত বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত জীবনে চিকিৎসা, প্রকৌশল-প্রযুক্তি যখন মানুষের ভূত-ভগবান দেও-দানব, প্রেত-পিশাচ-কর্মফল-নিয়তি-কপাল-অদৃষ্ট, রাশি দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্ন নির্ভরতাকে মিথ্যা ও বৃথা প্রমাণিত করে দিয়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন মানুষের কাছে, তখন পার্থিব ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনে নানা বিষয়ক বিজ্ঞান অনুগ যুক্তিসঙ্গত স্বল্প সামান্য জ্ঞানের পুঁজি-পাথেয়ও প্রাত্যহিক গৃহগত জীবনে আবশ্যিক ও জরুরী।

আমাদের কেউ কেউ বাস্তবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সযত্ন-প্রয়াসে অনেক কিছু জেনে বুঝেও নিয়েছেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। একালে যন্ত্র, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক চিকিৎসা, সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক বা Basic জ্ঞান বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তর থেকে শেখানো পড়ানো জানানো আবশ্যিক ও জরুরী। এ যুগ বিজ্ঞের, অজ্ঞের নয়। বাঁচার জন্যেই বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা, সতর্কতা, সচেতন সযত্ন প্রয়াসশীলতার প্রয়োজন।

ঋণ

ধার, উধার, কর্জ, খাতকতা প্রভৃতিকে সাধারণভাবে বলে ঋণ। আসন্ন-আপন্ন বিপদে আকস্মিক প্রয়োজনে অন্যের থেকে সাহায্য-সহায়তা গ্রহণের নামই ঋণ। ঋণ যে দেয় সে মানবিক-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। ঋণ যে গ্রহণ করে সে আসন্ন-আপন্ন বিপদ থেকে মুক্ত হয়, আবশ্যিক প্রয়োজন বা চাহিদা মেটায়। কাজেই ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ হচ্ছে উপকারী ও উপকৃতের। কুশীদজীবী তথা মহাজন এখানে অবশ্যই আলোচ্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল কৃতজ্ঞ থাকাতেই ঋণ শোধ হয় না, কেননা গভীর ও বাস্তব তাৎপর্যে ঋণে-এর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যেমন কোন ছাত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি স্বরূপ ত্রিশটি টাকা ধার দিল এক সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী, ও এ টাকাটা যথাসময়ে না দিলে বা ছাত্রটি এ টাকা যথাসময়ে ধার বা দান না পেলে তার জীবনের ধারাই যেত বদলে। মনে করা যাক, সে-ছাত্র এখন জজ, ব্যারিস্টার, এ সম্ভব হয়েছে যথাপ্রয়োজনে প্রতিবেশী থেকে ত্রিশ টাকা ঋণ বা দান পাওয়ার ফলেই। এ তো ত্রিশের বদলে তিনশ' কি তিন হাজার টাকা পরিশোধ করলেও ওই ত্রিশ টাকার গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। কাজেই সাহায্য, সহায়তা, ঋণ, কৃপা-করুণা দয়া-দাক্ষিণ্য কখনো এ তাৎপর্যে পরিশোধ্য নয়।

কিন্তু মানুষ মাত্রই যেহেতু স্বসত্তা সচেতন, সে-কেবল আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার প্রয়াসী, সেহেতু সে কুকুরের মতো ওই ঋণ স্বীকারে ওই কৃতজ্ঞতায় আত্মসমর্পণ করে চিরকৃতজ্ঞ, চিরঅনুগত, চিরবিনম্র থাকতে পারে না। তাই মানুষ ঋণ সর্বদা স্মরণও করে না, স্বীকারও করে না, কৃতজ্ঞও থাকে না, উপকারীকে এড়িয়ে চলে বরং স্বস্তি পায়, এমন কি ব্যবহারিক-বৈষয়িক প্রয়োজনে কৃতঘ্নও হয়।

সংকীর্ণচিত্ত সামাজিক মানুষেরও আবার স্বভাব এই যে সে সারাজীবন তার উপকার করার গর্ব করে, আর উপকৃতের নাম সময়ে-সুযোগে ঘোষণা করে বেড়ায়। আজো তাই উপকারী-উপকৃত, ঋণদাতা ও ঋণী, সাহায্যদাতা-সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পর্ক সমাজে ক্বচিৎ কখনো হার্দ্যিক হয়।

আমাদের এক সহকর্মী একবার সগর্বে আমাদের আড্ডায় শোনাচ্ছিলেন তাঁর অভিজাত পরিবারের কৃতিত্ব। এক গরীব গেরস্থঘরের সন্তান তাঁদের বাড়িতে জায়গীর [থাকার ও ভাতের বিনিময়ে বাড়ির শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কাজ] থাকতেন। এবং তিনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। তিনি বেসরকারী কলেজ থেকে এনে তাদের দুভাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকও নিযুক্ত করেন ওই অন্নঋণ পরিশোধকল্পে বা কৃতজ্ঞতা বশে কিংবা ছাত্র বলে করুণা করে। তবু উক্ত সহকর্মী সগর্বে জানাচ্ছিলেন যে তাঁদের ঘরের ভাতে লালিত হয়েই তো এতো বড়টি হলেন। আমি সহ্য করতে না পেরে তাঁর মুখের উপর জবাব দিলাম-- আপনাদের ভাতের যদি এতোই গুণ, তা হলে আপনারা বিদ্বান হলেন না কেন? তিনি তো আপনাদের পড়িয়ে শ্রমের ও যোগ্যতার বিনিময়েই আপনাদের গৃহে বাস ও অন্ন গ্রহণ করেছিলেন।

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ স্বল্পবুদ্ধির, স্থূলবুদ্ধির কিংবা সৌজন্য, সংস্কৃতি ও পরিমিতিবোধরিক্ত। এ সূত্রে চিকিৎসকের কথাও বলা চলে। জীবন-মরণের লড়াইয়ের নাম হচ্ছে রোগ। ডাক্তারও পেশাজীবী বলে অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করেন বটে, কিন্তু যিনি রোগ নিরূপণ করে ঔষধ প্রয়োগ করে রোগের নিরাময় ঘটান, আসন্ন ও আপন্ন মৃত্যু থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন, টাকা দিয়ে কি সে-ঋণ শোধ করা চলে? চিকিৎসকের ঋণ পরিশোধ্য নয়, কেন না তা প্রাণের ঋণ। এমনি করে ভাবলে গণিতে, রসায়নে, পদার্থবিজ্ঞানে, প্রকৌশলে, প্রযুক্তিতে, যন্ত্রে, রোগ প্রতিষেধক ঔষধে, রোগের লক্ষণ বা নিদান নিরূপণে যাঁরা নতুন নতুন আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে নির্মাণে উৎপাদনে মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের এ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, তাঁদের ঋণ কি আমরা স্মরণ করি, তাঁদের নাম জানার আগ্রহ কি আমাদের থাকে? আমরা ঋণী ও কৃতার্থ কিন্তু ক্বচিৎ কেউ কৃতজ্ঞ। ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্মরণে রাখলে মানবতার, মনুষ্যত্বের, সংস্কৃতির ও সৌজন্যের বিকাশ-বিস্তার সহজ হত, দ্রুত হত, সমাজও হত উন্নততর।

মনের খোরাকের মূল্য

ছোটকাল থেকে শুনে আসছি বাড়ির বাইরে না গেলে বড় হয় না কেউ। আর ঘর না ছাড়লে জোটে না ভাত। অর্থাৎ আত্মবিস্তারের জন্যে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে স্থানান্তরে বা দেশান্তরে যেতে হয়। খোঁজখবর নিয়ে, জেনে শুনে বুঝে অর্থোপার্জনের উপায়, সুযোগ ও সুবিধে খুঁজে বের করতে হয়। এর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বিদ্যায়-বিত্তে-মানে-যশে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায়-কৌশলে-প্রকৌশলে-বিজ্ঞতায়-অভিজ্ঞতায় পাকাপোক্ত হতে হলে অন্যদের চেয়ে উঁচুস্থানে ও উঁচুমানে উঠতে হলে ঘর ছাড়তেই হয়। হতে হয় উচ্চাভিলাষী, জীবনের একটা উঁচু আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্টভাবে হলেও থাকতে হয়। থাকতে হয় সার্বক্ষণিক প্রয়াস-প্রযত্ন। গৃহগত জীবনে আবর্তন আছে, বিবর্তন-পরিবর্তন নেই। তাই সেখানে আত্মরক্ষা কারো কারো পক্ষে কঠিন না হলেও আত্মবিস্তার প্রায় দুঃসাধ্য। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গুণে উপচিকীর্ষায়, হৃদয়বানতায় ও সততায় কেউ কেউ স্থানীয়ভাবে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত হয় বটে, তেমন জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই হয় স্থানীয় নেতা, মাতব্বর, সর্দার।

সাধারণ অর্থে জীবনে বড় হওয়া মানে বিদ্যায় বিত্তে, উঁচু সরকারী পদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পরে ধনী-মানী হওয়া, এবং ধনে বিদ্যায় কিংবা জ্ঞানে, বুদ্ধিতে নেতৃত্বে সততায় কিংবা প্রবলতায় অনন্য হওয়া, কোটিকে গুটিক হওয়া, পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হওয়া। বরণীয় না হলেও অন্তত বহু বহু কাল স্মরণীয় বা নিত্য উচ্চারিত পার্বণিক স্মরণীয় হয়ে থাকা। এ স্তরে যে বা যারা ওঠে, তারাই সফল ও সার্থক জীবন যাপন করে, এ-ই হচ্ছে লোকপ্রচলিত ধারণা। এজন্যেই আজ বাঙলাদেশীরা বিভিন্ন মহাদেশে অর্থোপার্জন উপলক্ষে বসবাস করছে। এ-ও অবশ্য ঠিক যে লোক উপকার হেতু কোন স্থায়ী কৃতী ও কীর্তি রেখে না গেলে কেউ অমরত্ব তথা চিরস্মরণে থাকার দাবিদার হয় না। কাল সব বিনাশ-বিস্মরণ ঘটায়। স্মরণীয় থাকারও উপায় দুটো : সুকৃতি ও দুস্কৃতি, নরদেবতা ও নরদানব তাই লোকস্মৃতিতে চিরঅমর হয়ে থাকে। ইতিহাসে, উপকথায়, ইতিবৃত্তে, লোকগাথায় ও গীতিকায় এসব দেব-দানব কখনো অঞ্চলের সীমায়, কখনো দেশব্যাপী, কখনো বা দুনিয়াময় স্মরণীয় হয়ে থাকে।

এ পুরোনো পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ নিতান্ত ভাতে কাপড়ে বেঁচে থাকাটাও শ্রম-সময় ও সংগ্রামভিত্তিক বলে অন্য প্রাণীদের মতোই জন্মে, আহার্য সংগ্রহ করে, কিছুকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাসহা মনসহা জীবন কাটিয়ে চিরকালের মতো বিস্মৃত বিলীন হয়ে যায়-- বংশধরেরাও তাদের নাম মনে রাখে না।

ক্বচিৎ কেউ জীবনযাত্রার কোন না কোন ক্ষেত্রে কৃতী ও কীর্তিমান হয়। আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, নির্মাণে-উৎপাদনে, ক্ষমতায়-খ্যাতিতে, লোকহিতৈষণায় সে-মানুষ আজো করগণ্য হলেও আজকের মানুষের উন্নতি তথা সভ্যতায় সংস্কৃতিতে চিন্তায় চেতনায়, কৌশলে, প্রকৌশলে, হাতিয়ারে যন্ত্রে বিজ্ঞানে, দর্শনে, ইতিহাসে, শাস্ত্রে, শস্ত্রে রোগ নিরূপণে, প্রতিষেধক আবিষ্কারে, চিকিৎসায়, প্রকৃতির অনভিপ্রেত উপদ্রব প্রতিরোধে ও নিবারণে, মানসজীবনের উৎকর্ষ সাধনে, যন্ত্রনির্ভর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে এদের দান অতুল্য, অসামান্য এবং বিস্ময়কর। আমাদের প্রায় প্রতিক্ষণের জীবন এদের অবদাননির্ভর ও সুখ-সুবিধে ঋদ্ধ হলেও অকৃতজ্ঞ মানুষ এদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, এদের নামও স্মরণে রাখে না, গুরুত্বও দেয় না এদের অসামান্য অতুল্য মননশীলতায় ও সাধনায়। পৃথিবী অনেক বড়। কালও নিরবধি। এ পৃথিবীর প্রায় সাড়ে পাঁচশ কোটি মানুষ আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-উৎপাদক-নির্মাতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দানে প্রাত্যহিক জীবনে উপকৃত। কেউ খবরও রাখে তার এ সৌভাগ্য, এ সৌকর্য, এ সুবিধে কার বা কাদের দান। অথচ যারা অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে-স্বাস্থ্যে-শিক্ষায় কোন কাজেই লাগে না, জীবন সংগ্রামেরও প্রত্যক্ষ সহায় নয়, সেসব কবি-নাট্যকার-গাল্পিক-ঔপন্যাসিক-গান-গাথা-গীতিকারদের নাম তাদের মুখে মুখে। দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানীদের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষিত লোকেরা স্মরণ করে। অজ্ঞ-অনক্ষর লোকেরা রেডিয়ো টিভি সিনেমা ক্যাসেট যোগে তাদের ভক্ত অনুরাগী হয়ে ওঠে। এর যুক্তি ও কারণ একটিই, অন্যরা ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনে সৌকর্য দান করে। আর শেষোক্ত জনেরা মনের খোরাক যোগায়। দেহের চেয়ে প্রাণ বড়, তার চেয়েও বড় মন।

কেননা, জীবন হচ্ছে অনুভবের সমষ্টি। সে-অনুভবে রয়েছে কখনো আনন্দ কখনো বেদনা, কখনো সুখ কখনো দুঃখ, কখনো রাগ কখনো রাগ-বিরাগ, কখনো কাম কখনো প্রেম, কখনো ক্রোধ কখনো ক্ষমা, কখনো সুখ কখনো দুঃখ, কখনো আশা কখনো হতাশা, নিরাশা-সুখের কাঙ্খা-প্রত্যাশা নিয়েই প্রেম-স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা-অনুরাগ বশেই মানুষ বাঁচতে চায়। জীবনকে, জগৎকে সে ভালোবাসে। প্রাণ এজন্যেই তার কাছে প্রিয়। কাজেই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কাম-প্রেম, ক্ষোভ-ক্রোধ, আশা-প্রত্যাশা প্রভৃতির কথা থাকে বলেই মানুষ গান-গাথা-গীতিকা-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন-সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতিকে জীবনে প্রবোধের প্রণোদনার প্রেরণার প্রবর্তনার অবলম্বন করে। অনুভবের জীবনে আবশ্যিক ও জরুরী বলেই, যারা এ অনুভব-উপলব্ধির, সুখের, সুন্দরের কিংবা দুঃখের বীভৎসতার, বেদনার, গ্লানির, কৃপাকরুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা বলে যা নিষ্ঠুরতা-নিপীড়ন-নির্যাতনের বয়ান করে, তাদের প্রিয়পরিজন বলেই মানে, তাই স্মরণ করে, সম্মান করে এবং অজ্ঞ-অনক্ষর নির্বিশেষে প্রবাদে-প্রবচনে আপ্তবাক্যে শ্লোকে-ছড়ায় তাদের আশ্রিত হয়ে মনকে প্রবোধ দেয়, জীবনযন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি ও সাহস পায়। সুখের দিনেও উৎসবে-পার্বণে আনন্দের গুণ-মান-মাপ-মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন

দেহ যদি হয় গাড়ি, প্রাণ হয় যদি এঞ্জিন আর মন হয় যদি স্টিয়ারিং হুইল, তা হলে জীবন বিকাশের জন্যেও চাই অনুকূল প্রতিবেশ। রাস্তা ভাঙা-বন্ধুর হলে গাড়ি চলে না। তেমনি আর্থিক, নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ-প্রতিবেশ প্রতিকূল হলে দেহরূপ গাড়ি ঠেকে যায়, প্রাণরূপ এঞ্জিন ধাক্কা খায়, স্টিয়ারিং হুইলও হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়।

আমরা জানি, অনুভূতি-উপলব্ধির ভাব-চিন্তা-চেতনার সমষ্টিই অনুভূত-উপলব্ধ চৈতন্যগত জীবন। আর এ অনুভব-উপলব্ধি-ভাব-চিন্তা-চেতনা-সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, কাম-প্রেম, স্নেহ-মমতা, প্রীতি-ভালোবাসা, লোভ-ক্ষোভ-ক্রোধ, ইচ্ছা-অভিলাষ, হিংসা-ঘৃণা-অসূয়া-রিরংসা প্রভৃতি সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ অনুভবের গ্রাহক, সঞ্চয়ক, নিয়ামক নিয়ন্ত্রক হচ্ছে মন। মন মাত্রই মূলে স্বাধীন বটে, বিশ্ব তার বিচরণ ক্ষেত্র। মনোবিমানের গতি-প্রকৃতিও অতুল্য, অসামান্য। শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব সবার মনই সমান স্বাধীন। তাই তার কোথাও হারিয়ে যেতে, ঘুরে বেড়াতে নেই মানা। মন চায় সুখ, আনন্দ, বিজয়, অবাধ স্বাধীনতা, স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার কর্তৃক, প্রভুত্ব, ভোগ, সম্ভোগ, উপভোগ, নেতৃত্ব, নায়কত্ব, ঈশ্বরত্ব।

তবু দলীয় তথা যৌথজীবনে অর্থাৎ সামাজিক জীবনে মানুষের মনই যথার্থ অর্থে সর্বক্ষণ কারারুদ্ধ। খাঁচার পাখির মতো সে সর্বক্ষণ ছটফট করে, এমনকি স্বপ্নেও, অবসর সময়েও, নিঃসঙ্গ নিরালায়ও। তার কারণ সে যা চায় তা পায় না। বাধা অর্থের, বাধা বিত্তের, বাধা মানের, বাধা শাস্ত্রের, বাধা পরিবারের, বাধা সমাজের, বাধা সংস্কৃতির, বাধা নীতিনিয়মের, বাধা রীতি-রেওয়াজের, বাধা প্রথা-পদ্ধতির, বাধা ভাষার, বাধা লোকাচারের ও দেশাচারের। এর কোনটিই মন প্রকাশ্যে, বাস্তবে অতিক্রম করতে পারে না। কাজেই মনের সহজাত স্বাধীনতাই-স্বাধীন সত্তাই মনের বৈরী, মনের জ্বালা-যন্ত্রণার, বিষাদ-বিষণ্ণতার কারণ।

মন চায় ভালো খেতে, ভালো থাকতে, আরামে-আয়াসে দিন কাটাতে কিন্তু অর্থাভাবে বা বিত্তশূন্যতার দরুন, তা পারে না। মন চায় সব অপছন্দের লোকদের বিতাড়িত করতে, শক্তি, সামর্থ্য বা অপরের সমর্থনের অভাবে তা পারে না, মন চায় প্রেম করতে, কিন্তু প্রেমের যোগ্য যে তার সাড়া মেলে না, মন চায় বাসনা পূর্তি, সাহস ও সাধ্য থাকে না তার। মন চায় বিদ্যায় বিত্তে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে, কিন্তু চেষ্টায়ও বিদ্যা আসে না আয়ত্তে, আর বিত্ত মেলে না প্রয়াসেও। মন চায় তারিফ, তার বদলে প্রায়ই মেলে অন্যের তাচ্ছিল্য, গণ্যমান্য হতে চায় কিন্তু থেকে যায় নগণ্য-অবজ্ঞেয়। ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সব মানুষেরই কাম্য-বাসনার কিন্তু মেলে লাখে কোটিতে একজনের বা এক কুড়ির। তাই আর সবারই জীবন হচ্ছে অবদমিত বাসনায় বিকৃত সংকুচিত অস্ফুট, বাড়-বিকাশহীন কীটদ্রষ্ট ফুল ও পাতার মতো বিক্ষত। ফলে নিঃস্ব নিরন্ন দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর অস্পৃশ্য বুনো বর্বর মানুষের মন শৈশব-বাল্য-কৈশোর অতিক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার আগেই প্রতিবেশের প্রতিকূলতার বাস্তব বাধায় সংকুচিত, নিরাকাঙ্ক্ষ্য, নিরানন্দ, অনীহ হয়ে যায়। এক কথায় অসম্ভব চেতনাটি প্রাচীন চীনা মেয়েদের পায়ের মতো মনের বাড় রুদ্ধ রাখে, বিশেষ পদ্ধতিতে যেমন ভিখারী তৈরি করার জন্যে শিশুর দেহ বিকলাঙ্গ করা হয়, তেমনি মনকেও বিরুদ্ধ আর্থিক, নৈতিক শৈক্ষিক, শাস্ত্রিক, বার্ণিক, জাতিক, দৈশিক, সামাজিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক প্রতিবেশে বিকৃত, আধিগ্রস্ত সংকীর্ণ বেপরওয়া বিদ্রোহী কিংবা বেয়াড়া, বেহায়া, বেশরম, বেলেহাজ নীতি-নিয়ম রীতি-রেওয়াজ নামানা অদম্য বুনো বর্বর অভব্য অসভ্য অরুচিমান করে তোলে। মানবপ্রজাতিতে প্রত্যাশিত মানের মন তাই অনেকের মধ্যে মেলে না। মানুষ এ জন্যেই অনেক সময়ে বাঘ-ভালুক-সিংহ-সর্পের মতো হিংস্র আচরণ করে। মনও অভ্যাসের দাস। মন একবার বিকৃত, অসুস্থ, শ্রেয়চেতনাশূন্য হলে পুনরায় স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ধীরবুদ্ধি ও স্থিরবিশ্বাস নিয়ে স্বস্থ ও সুস্থ হতে পারে না সহজে। তেমন পরিবর্তনের জন্যে নতুন অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কঠোর সংযমের বা বিবেকবানতার সাধনা করতে হয়। তেমন মানুষ অবশ্যই কোটিতে গুটিক। যদিও বার্ধক্যে মৃত্যুভয় এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাত পাপের পারত্রিক শাস্তিভীতি মানুষকে আত্মশোধনে অনুশোচনায় সাধারণভাবে অনুপ্রাণিত করে। তখন অবশ্য সে-বয়সের মানুষের দেহ পায় জরায় জীর্ণতা, মনও পায় জড়তা, সে-মনের কোন কর্মক্ষমতা সাধারণত থাকে না বলেই এতে সমাজের লাভ-ক্ষতি কিছুই হয় না। তাই মনের বা মনোজীবনের অতৃপ্তি, অতুষ্টি, আকাঙ্ক্ষা কখনো ঘোচে না। মনোজীবন হচ্ছে সাধারণভাবে বিড়ম্বিত জীবন: 'যা চাই তা ভুল করে চাই'। 'যা পাই তা চাই না'। না পাওয়ার স্মৃতির ও বেদনার সঞ্চয়ই হচ্ছে বার্ধক্যে মনুষ্যজীবনে রোমন্থনের বিষয়।

AMARBOI.COM

দাসত্ব ও আনুগত্য

আগে মানুষ ঈশ্বরের নামে দাসত্ব ও আনুগত্য নির্বিবাধে মেনে নিয়েছিল বলে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ একে সগর্বে ও সগৌরবে বলেছে বৈচিত্র্যে ও ভিন্নতায় শাস্ত্রিক, সামাজিক ও আচারিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বা শান্তিতে সহযোগিতায় সহাবস্থান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শুরু হয়েছিল য়ুরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে নতুন উপনিবেশ বানানোর, অন্যের উপনিবেশ কেড়ে নেয়ার এবং নিজের উপনিবেশ বাড়ানোর লক্ষ্যে। কিন্তু পরিণামে উপনিবেশবাদই হল অন্যায় বলে ঘৃণ্য ও পরিহার্য। আর উপনিবেশগুলোর দেশজ লোকদের মধ্যেও জাগল স্বসত্তার মূল্য, মর্যাদা ও স্বাধীনতা বোধ। স্বদেশে স্বাধীনভাবে স্বসত্তার স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হয়ে উঠল যুদ্ধবিধ্বস্ত ও ক্লান্ত য়ুরোপীয় প্রভুগোষ্ঠীর ধনে-মনে-দুর্বলতার দরুন। কাজেই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হল পৃথিবীতে উপনিবেশ বিলোপের মহাকাল। আপাতদৃষ্টে বাহ্যত অন্তত প্রভুত্ব ও দাসত্ব প্রথা-পদ্ধতি যেন চিরকালের জন্যে ঘুচল। যদিও লগ্নিপুঁজির, বাণিজ্যপুঁজির ও শিল্পপুঁজির প্রয়োগ-প্রভাব আগের মনিব-বান্দা সম্পর্কের শোষণ পীড়ন লুণ্ঠন প্রভৃতির চেয়ে উন্নত নয় কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকারেই। ঋণ-দান-ত্রাণও সেই কৃপা করুণা দয়া দাক্ষিণ্য মহাজনীর মতোই মানুষকে ধনে মনে কাঙাল করে রাখে, রাখে অনুগত করে, বানায় হুকুম-বরদার, বানায় স্তাবক-চাটুকার।

তবু আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় এবং অরণ্যে-পর্বতেও গোত্র-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জেগেছে আত্মসম্মান বোধ, জেগেছে স্বাধিকার চেতনা, সতর্কতা এসেছে শোষণ-পীড়ন-লুণ্ঠন-প্রতারণা-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে। এখন সর্বত্র গৌত্রিক, গৌষ্ঠিক সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, বার্ণিক, জাতিক বৃত্তিক, ঐতিহ্যিক নৃতাত্ত্বিক, আবয়রিক ও রক্তগত স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত একটা স্থূল-সূক্ষ্ম তীব্র তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা জেগেছে স্বদেশে স্বগোত্রের, স্বগোষ্ঠীর, স্বসম্প্রদায়ের স্বাবার্ণিক, স্বাজাতিক, স্বাবৃত্তিক, স্বআচারের, নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যসচেতন হয়ে স্বাধিকারে সহ ও সমস্বার্থে অন্যদের সঙ্গে দেশে রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহাবস্থান করার। সব খবর আমরা পাই না, রাখিও না বটে, কিন্তু অনুপুঙ্খ বিচারে বিশ্লেষণে লঘু-গুরুভাবে এ স্বাতন্ত্র্য গৌরব-গর্বী মানুষেরা পৃথিবীর সবদেশেই দাবি-দ্রোহ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে মনুষ্যচরিত্রের ও নীতি-আদর্শের এক অসঙ্গতি আমাদের অবাক করে। তা হচ্ছে, যারা নিজেদের দাসত্ব মুক্তির জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে, আনুগত্য পরিহারে ছিল সদাসচেষ্ট, দাসত্ব ও আনুগত্য দুটোই যাদের কাছে মনুষ্যত্বহীনতা-মানবতার অবমাননামাত্র, তারাই আবার স্বাধীন হয়ে ক্ষমতার আসনে বসে অন্যদের অধীনে, দাস ও অনুগত রাখার চেষ্টায় রক্তঝরায়, প্রাণে মারে দ্রোহীদের। যেমন রাশিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ইসরাইলে বিজাতি, বিদেশী বিভাষী বিধর্মীদের, ভারত কাশ্মীরে, মিজোরামে, নাগাল্যান্ডে, আসামে, চীন তিব্বতে, বাঙলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে, ইরাক-ইরান-তুর্কী-রুশ কুর্দীস্থানের মানুষকে ইংল্যান্ড আইরিশদের অধীন ও অনুগত রাখায় সদাসচেষ্ট। এমনি আরো অনেক রাষ্ট্রে এসব মানবিক সমস্যা অসমাধ্য হয়েই রয়েছে। এ মুহূর্তেও আমরা ঘরে বাইরে সর্বদাই দুই কিসিমের মানুষ দেখতে পাই। এক প্রকারের মানুষ আছে যারা স্বাধীনচেতা-দাসত্বকে ও আনুগত্যকে ঘৃণা ও পরিহার করে চলে, আর এক প্রকারের স্বার্থবাজ লিপ্সু লোক আছে, যারা স্বেচ্ছায় দাস হয়ে 'বশ' থেকে চাটুকারিতায় স্তাবকতায় দাসত্বে আনুগত্যের অর্থে-বিত্তে আত্মোন্নয়ন ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী হয়। আরো এক প্রকারের মানুষ আছে, যারা মানুষকে দাস ও অনুগত রেখে স্ববুদ্ধির, স্বশক্তির, স্বসাহসের, স্বক্ষমতার ভোগ-উপভোগে ও গর্বিত প্রয়োগে বর্বরোচিত আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লিপ্সা

মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লিপ্সা অসীম, অশেষ, অপরিমেয় নয়। এগুলো কেবল ঘন ঘন আবর্তিত বা পুনর্জাগ্রত হয় মাত্র। যেমন মানবকাম্য সব স্বাদের, রসের, ভোগের সামগ্রী পরিবেশন করার পর ক্ষুধা মিটলেই তৃপ্ত ও তুষ্ট ব্যক্তি আহার্য গ্রহণে নিবৃত্ত হবে। কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধাসাধিতে এমন কি প্রভু-মনিব মালিকের হুকুমে-হুমকিতেও আরো খাদ্য গ্রহণে সম্মত হবে না, বরং প্রাণ দেবে, তবু আদেশ নির্দেশ মানবে না। কারণ তার পক্ষে তা কায়িকভাবেই অসম্ভব। তখন তার যথার্থই হবে অমৃতেও অরুচি।

জীবনের আর আর চাহিদার ক্ষেত্রেও তাই। সুন্দরী যৌবনবতী নারী কাম্য বটে, কিন্তু কয়জন এবং কতক্ষণের জন্যে! নতুন রাগ-অনুরাগের জন্যে, নতুন কাম-প্রেমের জাগরণের জন্যে, ইচ্ছার মাত্রা তীব্র তীক্ষ্ণ করার জন্যে এ ক্ষেত্রেও চাই বিরতি বিরাম বিরাগ। জীবনের সঙ্গী, সহচর, অনুচর, বন্ধু, সখা চাই, কিন্তু কয়জন? গণ্ডায় গণ্ডায় সঙ্গী-বন্ধু-সখা-সহচর জুটলে তা প্রাণের আরাম, মনের স্বস্তি, চিদানন্দ নষ্টই করবে। আড্ডা সেও কতক্ষণ-- কয়ঘণ্টা একনাগাড়ে-লাগাতার একটানা দেয়া চলে? একসময় তা একঘেয়ে ও অসহ্য হয়ে উঠবেই।

প্রণয়তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে মনোমত একজন নারীই প্রয়োজন। একাধিকে প্রণয় চলে না, চলে প্রতারণা, কেবল কামচর্চার জন্যেও কি বহু নারী আনন্দবর্ধক? এ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সুখ কি কামুকে সম্ভব? কেননা কামুকের রূপে যৌবনে শরীরে যত আকর্ষণ, মননশীল রুচি-সংস্কৃতিমান নয় বলে বৈচিত্র্য-সুখ তার অনুভব-উপলব্ধি গম্য নয়, সে স্থূল সম্ভোগে তুষ্ট ও তৃপ্ত, সূক্ষ্ম রসানুভাব তার সাধ্যাতীত। এজন্যে দেখা যায় মানুষ প্রেম জানে না, বোঝেও না, বয়োধর্মে শারীর-প্রয়োজনে নারীর প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আসক্তি বা অনুরাগ তথা মোহ তাকেই সে ভাবে প্রেম, সমাজে প্রেম তাই, স্থূল ও বিকৃত সংজ্ঞায় স্বীকৃত। কোন পুরুষের বা নারীর জীবনে যদি কোন একক নারী বা একক পুরুষ অপরিহার্য, অবিকল্প, অনন্য, অতুল্য ও অসামান্য হয়ে স্বদেহের রক্ত-মাংসের মতো অবিচ্ছেদ্য-অবিচ্ছিন্ন সত্তায় প্রাণ-মন জুড়ে ও জড়িয়ে স্থায়ী আসন গাড়ে, তাকেই কেবল প্রেম নামে চিহ্নিত ও অভিহিত করা চলে। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ প্রভৃতি এ লক্ষণেই আদর্শ-প্রেম-প্রণয়কিস্সা। ধন-লিপ্সা, মান-লোভ প্রভৃতিও মূলত অসীম, অশেষ অপরিমেয় নয়। ধন অর্জনে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-কাড়াকাড়ি, জ্ঞান-বুদ্ধি সুযোগ-সুবিধা, স্থান-কাল, ধূর্ততা-ছলনা-চাতুর্য, পুঁজি-পাথেয়, শক্তি, সাহস, উদ্যম-উদ্যোগ আবশ্যিক ও জরুরী বলে, তা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। একবার হারলে আর একবার মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়ানো কঠিন, একবার সুযোগ হাতছাড়া হলে, পুনরায় নতুন সুযোগ জীবনে নাও পাওয়া যেতে পারে। যশ-মান, ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত অর্জনের জগৎ হচ্ছে সংকীর্ণ পরিসর দীর্ঘ সিঁড়ির মতো। লোকের ভীড় ঠেলে-দলে-পিষে-চেপে গায়ের জোরে, মনের জোরে, বুদ্ধি বলে, কৌশল প্রয়োগে, সাহসে শক্তিতে জান-মাল-গর্দানের ঝুঁকি নিয়ে প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় ধূর্ততায় ছলনায় অন্যদের ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ফাঁকে ফুকরে ঘা খেয়ে খেয়ে, ঘা দিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এগুতে ও উঠতে হয় বলে মানুষের ধনলিপ্সা, খ্যাতি-ক্ষমতা লোভ অসীম অশেষ ও অপরিমেয় বলে আপাতদৃষ্টে মনে হলেও, ওই তীব্র তীক্ষ্ণ বিপদ-উপদ্রব সঙ্কুল প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে ধনে আর মানে, বিত্তে আর বেসাতেও মানুষের ওই খাদ্যের মতোই একসময়ে অরুচি ও বিরাগ আসতই। এ জন্যেই বিত্তবান পরিবারে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রজন্মে অর্জনে, রক্ষণে, সঞ্চয়ে অনীহা, ব্যয়বিলাসে, ভোগে সাধ্যাতীত অসংযত আগ্রহই তার প্রমাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, লিপ্সায়, ভোগে উপভোগে আগ্রহে, ইচ্ছায় পুনপৌনিকতা থাকে, আবর্তন থাকে। কিন্তু অসীমতা, অশেষতা অপরিমেয়তা থাকে না। মানুষের জীবনে সবক্ষেত্রেই আসলে চাহিদা স্বল্প ও সামান্য। এ স্বল্প ও সামান্য চাহিদা মেটানো, চাওয়াকে সহজে পাওয়াতে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না বলেই অতৃপ্ত, ক্ষুধার্ত-লিপ্সু মানুষ সর্বক্ষণ ছুটোছুটি করে কাম্য বস্তু খুঁজে সারাটা জীবন এবং ট্রাজেডি এই যে কৃচিৎ কেউ যা চায় তা পায়, অন্যরা জীবনব্যাপী সচেতন সতর্ক-প্রয়াস-প্রযত্ন করেও ব্যর্থ হয় কিংবা সামান্য সাফল্য লাভ করে। তাই তৃপ্তি তুষ্টি মানুষে দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য।

দেহ-প্রাণ-মনের মুক্তি

প্রবলের দৌরাত্ম্য-পীড়ন-শোষণ-দলন-বঞ্চনা-কাড়া-মারা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব-সহজ ছিল না দৈহিক বৌদ্ধিক শক্তিতে দুর্বল কারো পক্ষে কখনো। আজো নেই। ঘরে সংসারে বয়সে ও মানে জ্যেষ্ঠ হলেই যে-কেউ হুকুম চালায় কনিষ্ঠের উপর। তার কারণ, মানুষ আরামপ্রিয়। শারীরিক শ্রমে রয়েছে তার ভীতি-বিরাগ। হাতের কাছে বলে, ধনে, মানে হীন-ক্ষীণ লোক পেলেই তাকে প্রয়োজনে খাটানো মানুষের স্বভাব। আদিকাল থেকেই যে এ স্বভাব মানুষের ছিল তা-ও অনুমান করা সহজ। যেমন বলবান ব্যক্তিটি তার ক্ষীণকায় সহচরকে নিশ্চয়ই হুকুম দিত গাছে চড়ে পাকা আম বা জাম পেড়ে আনতে। আজো আমাদের দেশে গৃহভৃত্য-ভৃত্যারা সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি একটানা, লাগাতার বা একনাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা কাজ করে। এমনকি শ্রমিকনেতার বা কম্যুনিস্টের ঘরেও।

আমরা জানি দেহের মুক্তি না থাকলে অর্থাৎ লোকটা যদি কারো হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার পাত্র হয়, তা হলে তার মন-বুদ্ধিও হয় বিকৃত ও বিলুপ্ত টবের গাছের মতো বৃদ্ধিরিক্ত। আর বাড়-বাড়ন্তহীন মনের ও ধনের মানুষের জীবনমাত্রই অন্যপ্রজাতির প্রাণীর মতোই আহার-নিদ্রা-মৈথুনে থাকে আবর্তিত। আত্মসত্তার বিকাশের স্বপ্ন-সাধহীন-স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ার কাঙ্ক্ষাহীন জীবনের সাধ-আহ্লাদ আনন্দ আরাম কি! একে মনুষ্য জীবন বলা চলে না। কেননা মানবিকতা, মানবতা বা মনুষ্যত্বরূপ গুণের উন্মেষ-বিকাশ-প্রকাশ এ মানুষের জীবনে সাধারণত সম্ভব হয় না। তাই সভ্যতা-সংস্কৃতির সৌন্দর্যের লাবণ্যের স্থাপত্যের ভাস্কর্যের বিজ্ঞানের যন্ত্রের প্রকৌশলের প্রযুক্তির ধারক, বাহক, নির্মাতা, উন্মেষক, উদ্ভাবক-আবিষ্কারক-চিন্তকমাত্রই প্রভু-মনিব-মালিক শ্রেণীর সুযোগপ্রাপ্ত সুবিধেভোগী ব্যক্তি।

পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে থেকেই মানবসভ্যতার উন্মেষ-বিকাশ হয়েছে বলেই প্রমাণে-অনুমানে বিদ্বানদের ধারণা। তার আগেও কিন্তু কৌম, গোত্র, গোষ্ঠীজীবনে প্রয়োজনে প্রবলের তথা জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি-যুক্তি-সম্পন্ন শক্তিমান-সাহসীর সর্দারীতে বা নেতৃত্বে-মাতব্বরিতে কৌম, গোত্র, গোষ্ঠী দল অবশ্যই চালিত হত। এখনো আরণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে ও আমাদের বেদেগোষ্ঠীতে তা চালু রয়েছে। গাঁয়ে-গঞ্জে গোষ্ঠীপতির, সমাজপতির এখনকার পঞ্চায়েত তুল্য শালিসকর্তা ব্যক্তিবর্গ থাকত এ শতকের প্রথমার্ধেও।

কাজেই গোড়া থেকেই ক্ষীণকায়, স্থূলবুদ্ধি, ভীরু, ধনবল-জনবলহীন মানুষ মাত্রই আত্মবিকাশের, আত্মপ্রকাশের, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত রয়েইছে। আদি দাস ভূমিদাস প্রথার কাল থেকে শাহ-সামন্ত যুগের অবসান কাল অবধি মানুষ স্বসত্তার স্বাধীনতা কখনো অনুভব করেনি। দমনে-দলনে-সংযমে অবদমিত, বিকৃত ও বিলুপ্ত বা সুপ্ত কিংবা জড় হয়ে পড়েছিল জীবনের স্বপ্ন-সাধ-সাধ্য।

এমনকি ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আমাদের দেশের লোক দাসে-ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল, তার দেহ, আর ঘরবাড়ি, তার চলন-বলন, তার সামাজিকজীবনের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হত স্বৈরাচারী জমিদার নায়েব-গোমস্তা-দেওয়ানের খেয়াল-খুশি অনুসারে। মুঘল আমলে জমির খাজনা ছিল সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বিদেশী শাসক শোষকের আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে, ইঙ্গিতে, স্বার্থে ও সমর্থনে রাজস্ব বিচিত্র ও বিবিধভাবে বাড়তে থাকে জমিদারের। জমিদারের বিয়ের, সন্তানের অন্নপ্রাশসনের, মা-বাবার শ্রাদ্ধের, গাঁয়ে জমিদারের উপস্থিতির নজরানা কন্যার কর্ণভেদ, খৎনা থেকে জমিদার বাড়ির সব উৎসব পালা-পার্বণের খরচ যোগাতে হত প্রজাদের। এমনকি শেষাবধি দাড়ি রাখার জন্যেও দিতে হত কর। তীতুমীদের দ্রোহের অন্যতম কারণও ছিল দাড়িকর। ১৮৫৮ সনে ১৮৮৫ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন কোন শর্ত পরিবর্তিত হলেও প্রজার কোন উপকার হয়নি, ঘোচেনি তাদের দাসত্ব ও পীড়ন-শোষণ। ১৯২৮ সনের প্রজাস্বত্ব এবং ১৯৩৭ সনের ঋণ শালিসী আইনই এদের মনে ভাবী মুক্তির আশ্বাস জাগায়। অবশেষে ১৯৫২ সনের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদেই ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিসত্তার দেহ-মন-মননের দাসত্ব ঘোচে, স্বপ্ন-সাধ-স্বাধিকার চেতনা জাগে। এখন এ বুর্জোয়া সমাজে আঁধা-কানা-খোঁড়া নিঃস্ব নিরন্ন ভিখিরীও দেহে মনে স্বাধীন। আড়তদার, দোকানদার, ব্যবসাদার, কারখানাদার, সচিব-মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি-শাসক-প্রশাসক-আমলা কিংবা ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা সম্পন্ন কাউকেই তার চাকুরে না হলে, উমেদারির জন্যে তার কাছে যেতে না হলে ধমক শোনার দুর্ভাগ্য হয় না। এ তাৎপর্যে এখন সব ব্যক্তিমানুষের সত্তা স্বাধীন। সব মানুষ সাহসে শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। মানুষ এ অর্থে মনে-মননে-স্বপ্নে-সাধে স্বাধীন। গণতন্ত্র এর নিদর্শন জনগণতন্ত্র হবে এর পরিণাম।

সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতা

খাদ্যের সুলভতার এবং আত্মরক্ষার সহজতার দরুন একসময়ে অন্যপ্রজাতির প্রাণীর মতো মানুষও অরণ্যের আড়ালে এবং পার্বত্য বন্ধুরতায় আশ্রিত থাকত। তা ছাড়া সমতলে বৃষ্টি-বন্যা-রোদ এবং আড়ালহীনতা ছিল আত্মরক্ষার প্রতিকূল। তাই মানবপ্রজাতিও অন্য অনেক জীবজন্তুর মতো পরিবার, কৌম, গোষ্ঠী, গোত্র, দল নিয়ে অরণ্যে পর্বতে বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত। জনসংখ্যা কম ছিল বলে, যাতায়াতপন্থা দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য দুর্গম-দুর্লঙ্ঘ্য ছিল বলে তখন কৌম, গোষ্ঠী, গোত্র, দলগুলো ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অজ্ঞাত, অপরিচিত। তাই প্রাণী হিসেবে বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত হলেও কায়িক গঠনের বৈশিষ্ট্যে দু'টো হাতের ব্যবহার সৌকর্যে মানুষ অন্যপ্রাণীদের মতো প্রকৃতি-নির্ভর ও প্রবৃত্তিচালিত ছিল না। গোড়া থেকেই সে অর্জিত আবরণ ও সৃষ্ট হাতিয়ার নির্মিত সামগ্রী ব্যবহারে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সৌকর্য, উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন করতে থাকে। কিন্তু বিশাল পৃথিবীর অরণ্যে পর্বতে, কন্দরে আশ্রিত মানুষ স্বতন্ত্রভাবে আত্মোৎকর্ষে সমভাবে সফল হয়নি। আজো তাই হাজার হাজার বছরে পিছিয়ে পড়া আরণ্য মানব যেমন মেলে, তেমনি মেলে সুদূর গ্রহগামী যন্ত্রনির্ভর আকাশচারী যন্ত্রকুশল বিজ্ঞানী অনন্য-অতুল্য মানুষ।

উনিশ শতকের আগে গোটা পৃথিবীর অন্ধি-সন্ধি-তথা সামগ্রিক, সামূহিক ও সামাজিক রূপ কারো জানা ছিল না। বলতে গেলে মানুষপ্রজাতির আজকের অবস্থায় ও অবস্থানে মানসিক ও ব্যবহারিকভাবে পৌঁছুতে লক্ষ বছর লেগেছে। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের এ মুহূর্ত অবধি মানুষের বিশ্ববিজ্ঞাসা, বিশ্ব-জিগীষা, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, প্রকৌশল আয়ত্তবাঞ্ছা, প্রযুক্তি প্রয়োগ প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় অসংখ্য জিজ্ঞাসার, অপরিমেয় কৌতূহলের, অপরিমিত প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ক্রমাগত ধৈর্য-অধ্যবসায়-উদ্যম-উদ্যোগ নিয়ে কেবল উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করে চলেছে। স্বমননে, স্বজীবনে স্বজগতে আজ মানুষই তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ চাহিদার স্রষ্টা, নিয়ামক, নিয়ন্ত্রক ও ঈশ্বর।

বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানের ও বিদ্যার দ্রুত ও বিস্ময়কর সব অসামান্য আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র আজ গাঁ-গঞ্জ অবধি মানুষের জীবন হয়েছে যন্ত্রনির্ভর। তার ফলে শুধু যে ঘরোয়াজীবনের তৈজসে আসবাবে রান্নায় জীবনাচারে পোশাকে যানবাহনে পৃথিবীব্যাপী মানুষের জীবনপদ্ধতিতে ঐক্য, সাদৃশ্য এমনকি অবিচ্ছেদ্য অভিন্নতা এসেছে, তা নয়, রাস্তাঘাটে হাটে বাজারে দালানে যাদুঘরে চিড়িয়াখানায় খেলাধুলায়, মাঠে, স্টেডিয়ামে টেনিসকোর্টে, সুইমিংপুলে, অস্ত্রে, যুদ্ধকৌশলেও এসেছে অভিন্নতা। এখন নাম না জানলে বা না জানালে আমরা কে কোনো শহরের পাঁচতারা হোটেলে রয়েছি, কোন্ খাদ্য খাচ্ছি তা পর্যন্ত পরখ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এখন সভ্যজগতের কোথাও কোথাও গায়ের রং ও চেহারা ব্যতীত আর কিছুতেই কোন বৈচিত্র্য ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য নেই। এক্ষেত্রে এরা মানব উত্তরাধিকারে আস্থাবান, সাগ্রহে গ্রহণ বরণ অনুকরণ অনুসরণশীল। এতে লজ্জা-সংকোচ-শরম নেই পরের বলে। কিন্তু তবু মানুষ গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, দৈশিক, জাতিক, ভাষিক, শাস্ত্রিক মননে-চিন্তনে এবং পার্বণিক আচরণে বিভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যকামী এবং ভালো-মন্দ-মাঝারি নির্বিশেষে গুণে মানে মাপে মাত্রায় অপহ্নূতি বা অপকর্ষ থাকলেও তা ধরে রাখা স্বাগৌত্রিক সত্তার যেন পরম্পরা বা ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য গর্ব গৌরব ও অভিমান রূপ পুঁজি-পাথেয়-সম্পদ-সঞ্চয় বলেই জানে। তাই তথাকথিত স্বসংস্কৃতির, আচারের, সংস্কারের, পার্বণের, বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে এরা অসহিষ্ণু লড়াকু।

সারা পৃথিবীব্যাপী জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে অনীহ, অস্বীকৃত, উদাসীন আবাল্যের আচার-বিশ্বাস-সংস্কারচালিত মানুষ তাই মনের-মননের মনীষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে মিলতে পারছে না। স্বস্বাতন্ত্র্য, স্বসংস্কৃতি, স্বজাতি প্রভৃতির নামে দ্বন্দ্ব কোন্দলে সদা উত্তেজিত, উদ্দীপিত, প্রণোদিত, অনুপ্রাণিত থাকে আজো সভ্য নামের মানুষগুলো। এর জন্যে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে সতর্ক, সযত্ন অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরী। তাহলেই কেবল পৃথিবীর গোত্র, গোষ্ঠী, শাস্ত্রিক-ভাষিক-আচারিক সম্প্রদায়গুলো সংযমে সহনশীলতায় মানবিক ঐক্যে ও সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারবদ্ধ হবে। পৃথিবীতে কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি কমবে। নিরুপদ্রব ও নিরাপদ জীবন যাপন সহজে সম্ভব হবে।

সঙ্কট-সমস্যা সঙ্কুল জীবন

নিত্য সঙ্কট-সমস্যা-সংগ্রাম-প্রতিরোধেরই অন্য নাম জীবন। প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ে নতুন করে জীবনও হয় শুরু। যেহেতু জীবন গতিশীল চলমান এবং দেহের চোখ ও পা কেবল সম্মুখগতিরই সহায়, সেহেতু গতিশীল চলমান জীবনে পথ আর পাথেয়ও নতুন। পথে থাকে নব নব বাঁক, নতুন নতুন বিঘ্ন, বন্ধুরতার চড়াই উৎরাইয়ের বাধা। তাই জীবন মাত্রই, তা ব্যক্তির পরিবারের সমাজের রাষ্ট্রের বা মনুষ্যজাতিরই হোক, সংগ্রাম struggle জীবনমাত্রই Resistance, জীবনমাত্রেরই পুঁজি-পাথেয় হচ্ছে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-শক্তি-সাহস-অঙ্গীকার-উদ্যম-উদ্যোগ। অর্থাৎ বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, যুক্তির সঙ্গে বিবেকের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যমের, উদ্যোগের সঙ্গে ধৈর্যের, সংকল্পের সঙ্গে অধ্যবসায়ের যোগ না হলে জীবনে সিদ্ধি-সাফল্য তথা কাঙ্ক্ষাপূর্তি বা ঈপ্সিত ভোগ-উপভোগ সম্ভব হয় না। জীবনটা হচ্ছে তরঙ্গতাড়িত, উপলাহত। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করেই এগুতে হয় জীবনপথে। এ কেবল ব্যক্তির বেলায় নয় মনুষ্যপ্রজাতির ক্ষেত্রেও অমোঘসত্য।

গোড়া— থেকেই লক্ষ বছর থেকেই মানবপ্রজাতির প্রাণীরা জ্ঞান অভিজ্ঞতা বুদ্ধি প্রয়োগে, স্বকৃত কৃত্রিম হাতিয়ারে, স্বসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যবহারে, অর্জিত আচরণে, নির্মিত সামগ্রীতে জীবনোউপভোগ করতে প্রয়াসী হয়ে হয়ে আজকের অবস্থায় ও অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। এখন নানা রাসায়নিক উপাদান-উপকরণের বিভিন্নমাত্রার মিশ্রণে পণ্য উৎপাদনে বৃদ্ধি, উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য এসেছে। সর্বপ্রকারে প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে নির্মাণে রূপগত, পদ্ধতিগত এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনগত নানা বিস্ময়কর কলাকৌশল হয়েছে যুক্ত। উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য আজকাল সর্বক্ষেত্রে পরিদৃশ্যমান। কিন্তু সে-সঙ্গে এসব ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে নানা ক্ষেত্রে। কিন্তু ওই Struggle ওই Resistance কিন্তু কোন রকমেই শেষ হচ্ছে না বরং যতই জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, প্রয়াস-প্রযত্ন, আবিষ্কার-উদ্ভাবন বাড়ছে, জীবন-জীবিকা হচ্ছে জটিলতর কঠিনতর। যেমন রোগের প্রতিষেধক যতই আবিস্কৃত হচ্ছে, রোগের বৈচিত্র্য এবং সংখ্যাও তেমনি বেড়ে চলেছে। এক রোগ প্রতিরোধ করার ঔষধ অন্যরোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এক রোগ নির্মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে তো অন্যরোগ উৎপত্তির কারণ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আগে অকালে সামান্য রোগেও মানুষ অপমৃত্যুর শিকার হত। এখন শিশুমৃত্যু, প্রসূতিমৃত্যু, যক্ষ্মায় সন্নিপাতে দেহমধ্যস্থ নানা ঘ-পিণ্ড-টিউমান ঔষধে অস্ত্রোপচারে নিরাময় করা সহজে সম্ভব ১৯৫০ উত্তর কাল থেকে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, রোগের চিকিৎসারও বিস্ময়কর সব ঔষধ, কৌশল যন্ত্র মানুষের আয়ত্তে এসেছে। রোগ যদি হয় জীবন-মৃত্যুর লড়াই, তা হলে সেই লড়াইয়ে চিকিৎসকরা অজর অজীর্ণ অবৃদ্ধের মৃত্যুকে পরাভূত করতে পারেন এবং করেন সহজেই। তবু রোগও বিবিধ ও বিচিত্র, কঠিন ও জটিল হয়ে হয়ে বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানীদের নব নব রাসায়নিক পদার্থের ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক নানা পদ্ধতির উৎকর্ষ ও প্রয়োগ, বিভিন্ন ধাতবপদার্থের বিচিত্র ব্যবহার, মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গ মারার ঔষধ, সিনথেটিক সামগ্রীর, এমন কি পলিথিনের নিত্য ব্যবহার এবং বিজ্ঞানী আবিস্কৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য তৈজস আসবাব খাদ্যবস্তু পর্যন্ত সবকিছুই ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধি নাকি বিভিন্নভাবে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে চলেছে।

পৃথিবী নাকি কলকারখানার ধূঁয়ায়, দাহ্য পদার্থ নিঃসৃত রসে গন্ধে তাপে সৌরালোক আচ্ছন্ন উত্তপ্ত ও বিষাক্ত করে তুলছে। ওজোন বৃদ্ধির ফলে নাকি উত্তাপে মেরু ও পার্বত্য অঞ্চলের বরফ গলছে, সমুদ্রের পানির স্তর উঁচু হচ্ছে, উপকূলবর্তী নানা দেশের কোন কোন অংশ সমুদ্রের সীমা বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠবে। একে বিজ্ঞানীরা বলছেন Ecological Imbalance বা প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা জাত বিপর্যয়। মানুষের মনীষা, উদ্ভাবন, আবিষ্কার, কৌশল, প্রকৌশল, হাতিয়ার, যন্ত্র, প্রযুক্তি, গ্রহজগতের জ্ঞান, গ্রহজগৎ বিজয়ের শক্তি ও সাহস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতই বাড়ছে, জীবনের সমস্যা-সঙ্কটও তেমনি গভীর ব্যাপক আর বিবিধ ও বিচিত্র হয়ে উঠছে। জীবনে ভোগ-উপভোগ আপাত সহজ হলেও অদৃশ্যে পরোক্ষে জীবনে জীবিকায় আসন্ন ও আপন্ন বিপদের ঝুঁকিও বাড়ছে। তা হলে মানুষের গতিশীল জীবনে চলার পথে বিপদ-বাধা-সঙ্কট-সমস্যা কখনো কমবে না, কেবল ধরন ধারণ বদলাবে। জীবন Struggle-এর ও resistance-এর নামান্তরমাত্র থেকে যাবে। তবু এভাবেই চলবে মানবপ্রগতি, মনের, মননের, ভোগ-উপভোগের উৎকর্ষ, সভ্যতা-সংস্কৃতির, মানুষের অতুল্য, অসামান্য বিস্ময়কর শক্তির বিকাশ বিস্তার উৎকর্ষ।

অন্যদিকে মানুষের পারিবারিক সামাজিক গৌত্রিক, গৌষ্ঠিক সাম্প্রদায়িক দৈশিক রাষ্ট্রিক ভাষিক আর্থিক নৈতিক শৈক্ষিক জীবনেও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত দেখা দিচ্ছে নয় কেবল, বিচিত্রভাবে বেড়ে চলেছে। দাস যুগের শাহ-সামন্ত যুগের অবসান-উত্তর সাক্ষরতার বিস্তারে এ বুর্জোয়াশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত সমাজেও নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব ও বিস্তার ঘটছে। রেডিও-টিভি-ক্যাসেট-সিনেমা পত্রপত্রিকা-চিত্রযোগে গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষও আজকাল জেনে বুঝে গেছে যে পৃথিবী অনেক বড় ও বিচিত্র। এখানে প্রবলের শাসন-শোষণ-পেষণ-পীড়ন-প্রতারণা প্রবঞ্চনা বড়শিবিদ্ধ বা জালবদ্ধ মাছের মতো মানুষকে পীড়ণে পেষণে শোষণে-নির্যাতনে দলনে-দমনে কাবু করে রেখেছে। এদের মধ্যে স্বসত্তার মূল্য, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা ক্রমে সূক্ষ্ম, তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। তাই তারা গোটা পৃথিবী ব্যাপী সর্বত্র, 'আপনপ্রাপ্য অধিকার চায়'। এবং 'তার লাগি দেবে লাল রুধির' এমনি এক সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে দেশে দেশে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংগ্রাম শুরু করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে। জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-পেশাগত এবং আর্থিক-শৈক্ষিক শ্রেণীগত অবস্থা ও অবস্থানগত দুর্ভোগ, গ্লানি, অসম্মান, অনধিকার প্রভৃতির বিরুদ্ধে ওরা প্রাণপণ সংগ্রামে নেমেছে। এ সংগ্রাম রক্তক্ষরা প্রাণহরা। স্বাধিকার স্বাতন্ত্র্য, এবং আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে সম্মান স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিত তাদের কাম্য ও প্রাপ্য। তাই কেবল স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিতে এরা তুষ্ট নয়, স্বাধীনতারও দাবিদার এরা। এরা এখন দ্রোহী। শাসক-প্রশাসক সামন্ত বুর্জোয়া সুযোগ ও সুবিধেভোগী শ্রেণী এদের বলে বিচ্ছিন্নতাবাদী, দ্রোহী, জাতিক সংস্কৃতি ভঙ্গকারী। বৈচিত্র্যে ঐক্য দর্শনে তথা মহিমায় তত্ত্বে আস্থাবান নির্বিঘ্ন শাসনে শোষণে পেষণে পীড়নে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা প্রমত্ত প্রভুশ্রেণীর লোকেরা এখন তাই বিচলিত। এরা জাতিক ও রাষ্ট্রিক সংহতি শৃঙ্খলা শ্রেয়োচেতনা বিরোধী বলে এদের উপর এখন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকা, যুগশ্লাভিয়া, রাশিয়া ও ভারত এ মুহূর্তে এ সমস্যার আবর্তে পড়ে দিশেহারা। কিন্তু তবু শাসকশ্রেণী স্বার্থান্ধ বলেই নাছোড়বান্দা, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক বিবেচনাহীন।

শ্রী ও ছাঁদ

AMARBOI.COM

বিশ্বটা হচ্ছে একপ্রকারের নিয়মের রাজত্ব। এখানে একটা সঙ্গতি, সামঞ্জস্য Symmetry রয়েছে। এ পরম্পরাগত। এমনকি সঙ্গতি, সামঞ্জস্য প্রাতিযোগিক, প্রাতিদ্বন্দ্বিক তথা দ্বান্দ্বিক অবস্থানের মধ্যেও রয়েছে। এটি জনবহুলতার জন্যে গণভোগবাঞ্ছার ও চাহিদার বিস্তৃতির দরুন এখন ভারসাম্য হারাচ্ছে বলে দুনিয়াব্যাপী Ecological Balance রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা-আলোচনা-প্রতিকার হচ্ছে ব্যবস্থা সর্বত্র।

কাজেই শ্রী ও ছাঁদ তথা লাবণ্য ও ছন্দ, রূপ ও সুর মানুষেরও ভাব চিন্তা-কর্ম-আচরণের তথা মনের ও মননের, আশার ও কামনার, কাঙ্ক্ষার ও প্রত্যাশার মধ্যে থাকা আবশ্যিক। এ বোধ আপাতদৃষ্টে সব মানুষেই লঘু-গুরুভাবে থাকে। এমনকি মানুষের চলনে বলনেও একটা সুর-তাল-লয় থাকে। থাকে শ্রী ও ছাঁদ, সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। কিন্তু লিপ্সার আধিক্যে, আবেগের প্রাবল্যে, অপ্রতিরোধ্য ক্ষোভ-ক্রোধবলে কিংবা কাম-প্রেম-আসক্তি-অনুরাগের অসংযত উচ্ছ্বাসে মানুষ স্থান-কাল-পাত্র বিরোধী অশোভন কর্ম-আচরণ করে থাকে। তখনই মানুষ হদুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী-বেআক্কেল-বেল্লিক-বেতমিজ-বেআদব-বেসামাল-বেহায়া-বেশরম-বেলেহাজ এবং ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, শালীন-শোভন-ভব্য-ভদ্র আচরণ বিস্মৃত ও বর্জিত।

যার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে একটা বাঞ্ছিত সঙ্গত শ্রী ও ছাঁদ আছে, অশোভন অশালীন অবাঞ্ছিত, অন্যায় কোন কিছু তার কর্মে, আচরণে, বিচারে, বিবেচনায় প্রকাশ পায় না, সেই হচ্ছে সৎচরিত্র ব্যক্তিত্ব। তাকেই করি আমরা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বালক-কিশোর-তরুণ-পৌঢ়-বৃদ্ধ দায়িত্বে ও কর্তব্যে উদাসীন নয়, কাজে কথায় আচরণে অনধিকারচর্চা করে না, তাকে আমরা ভালো বলেই জানি। আমাদের অজ্ঞাতেই আমরা তার অনুরাগী হই। সে হয় আমাদের প্রিয় ও সংশার পাত্র। যে-বধূ পরিবারের সবার সঙ্গেই প্রত্যাশিত মাত্রার-মানের ও মাপের আচরণ করে তাকে পরিবারে সবাই গুণবতী বলে মানে, আদর-সমাদর-সম্মান-মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালোবাসা তার প্রাপ্য হয়ে ওঠে পরিবারে। ব্যক্তিত্ব বলি, মনস্বিতা বলি, শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান বলি-- সবটাই ওই ব্যক্তিক শ্রী ও ছাঁদ জাত।

স্ত্রীর লাবণ্যের সুরূপের সৌন্দর্যের উৎসই হচ্ছে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও রূপের, মাপের, মাত্রার পরিমিতি। এ পরিমিতিই শ্রী। সঙ্গত পরিমিতিই শ্রী, লাবণ্য, সুরূপ, সৌন্দর্য, মাধুর্য, তেমনি পরিমিত ধ্বনির পৌনঃপুনিকতাই ধ্বনির সঙ্গতি, আবর্তনই ছন্দ, রূপের ও আকারের আবর্তন তথা গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় সঙ্গত ও বাঞ্ছিত পৌনপুনিকতাই হচ্ছে ছন্দ। কাজেই মানুষের জীবনের পুঁজি-পাথেয় হচ্ছে শ্রী ও ছাঁদ। কিন্তু শ্রী ও ছাঁদ সুষ্ঠু সূক্ষ্ম ও সুন্দর নিখাদ নিখুঁতভাবে জীবনে রূপায়িত করার জন্যে চাই মানসিক যোগ্যতা, ইন্দ্রিয়সংযম, প্রবৃত্তিপ্রশমন। এর জন্যে দরকার মনের মননের রুচির ও চিন্তার সংযম ভোগে উপভোগে সুরুচি, দায়িত্ব ও কর্তব্যচেতনা, স্বাধিকারের, সামর্থ্যের, সাধ্যের পরিমিতি বোধ, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি, শক্তি-সাহস আদর্শ-উদ্দেশ্য লক্ষ্য-অঙ্গীকার উদ্যম-উদ্যোগ প্রভৃতির সুসংহত, সুসঙ্গত সুসমঞ্জস এক সুসমন্বিত সুস্পষ্ট ধারণা। এমনি মানুষকেই আমরা বলি মনীষী, মনস্বী, মহৎ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, চিন্তানায়ক, যুগপুরুষ, যুগন্ধর, যুগস্রষ্টা। অর্থবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, কৌশল, প্রকৌশল-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ লোকহিতকামী কর্মী, সাধক, গবেষকরূপে পরিকীর্তিত সম্মানিত ও স্মরেণ্য বরেণ্য এবং প্রেরণা-প্রণোদনার-প্রবর্তনার চিরউৎস ও অবলম্বন হয়ে থাকেন।

সব মানুষই স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে নিজেকে দৈহিক অবয়বে পোশাকী চেহারায় সবিনয় কণ্ঠস্বরে কথায়-আচরণে-আদবে নিজের ভালোত্বের সৌন্দর্যের গুণের ও মানের সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে প্রায় অবচেতনমনেই সদাব্যস্ত। তবু প্রশিক্ষিত নয় বলে, অর্থাৎ অনুশীলনের সতর্ক, সযত্ন, সচেতন প্রয়াস-প্রযত্ন থাকে না বলে তারা পরিচিত জনের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, আস্থা, আসক্তি, অনুরাগ পায় না। তাদের দোষগুলোও প্রায় সহজেই প্রকটিত হয়ে পড়ে। কথার দোষ, আচরণের দোষ, কর্মের দোষ, মন-মত-মতলবের দোষ তারা ঢাকতে পারে না, তাই তারা লোকের তাচ্ছিল্য পায়-তাদের ব্যক্তিত্ব কেউ সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করে না। বরং দুষ্ট-দুর্জন, দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী বলে গুণ্ডা-মস্তান-খুনী বলে মানীর মান নষ্টকারী বলে ভীতিকর অমানুষরূপেই পায় গুরুত্ব। শ্রী ও ছাঁদ এদেরও কাম্য বটে। কিন্তু উক্ত কারণে প্রাপ্য হয় না তাদের সারাজীবনে।

আমরা দেখি, শুনি, জানি এবং মানি দুনিয়ার তাবৎ জীব-উদ্ভিদের নয় কেবল, ঘরবাড়ি দালান-কোঠা-রান্না-বান্না কাটাকুটি, ছেঁড়া-ফাড়া, কারু-দারু-চারু স্থাপত্য ভাস্কর্য আঁকা লেখা-জোকা সবকিছুরই রয়েছে স্ব স্ব শ্রী ও ছাঁদ। উট থেকে শূকর, কেঁচো থেকে কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সবকিছুরই একটি আবয়বিক শ্রী ও ছাঁদ, একটা আঙ্গিক সঙ্গতি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামঞ্জস্য রয়েছে। কাটা-মরা ডাল বিহীন বৃক্ষে, দুমড়ানো দলিত ফুলগাছে, আঁধা-কানা-খোঁড়া মানুষের, শিংভাঙা পা-ভাঙা, কানকাটা পশুতে, পা বা পাখাভাঙা পাখিতে শ্রী-ছাঁদ থাকে না। তেমনি অস্পষ্ট বিকৃত চিন্তনে, কথনে, হিংসায়-ঘৃণায়, অবজ্ঞায় মিথ্যায় ঈর্ষায়, নিন্দায় সংকীর্ণতায় শ্রী ও ছাঁদ থাকে না।

নিখুঁত নিখাদ পূর্ণাঙ্গ মননে-চিন্তনে কথনে আচরণে, অর্থাৎ গুছানো ভাষায়, ভঙ্গিতে কথায়, কাজে, একটা শ্রী ও ছাঁদ অবশ্যই আকর্ষণীয় রূপ নেয়। এ শক্তি যাদের থাকে, তারাই হয় আকর্ষণীয় মাননীয় ব্যক্তিত্ব। অনুকরণীয়ও অনুসরণীয় ব্যক্তি, চরিত্র, কর্ম ও আচরণই মানুষের প্রত্যাশিত।

দেয়াল ভাঙা শাস্ত্র-সমাজ দুর্গ

শাস্ত্রের সমাজের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি আইন-কানুন হচ্ছে নির্বোধ দুর্বল রিক্তের নিরুপদ্রব-নিরাপদ জীবনযাপনের একটা সুপরিকল্পিত সুরক্ষিত সহাবস্থানের ব্যবস্থা নামের দুর্গবিশেষ। এতে ক্ষীণকায়, হীনবল, স্বল্পবুদ্ধি, ধনরিক্ত, জনবলশূন্য মানুষের বাঁচার অধিকার অনেকাংশে নিরাপদ হয়। যেমন একজন নিঃস্ব নিরন্ন কুৎসিত দুর্বল পুরুষও সামাজিক নিয়ম-নীতির সমর্থনে সহযোগিতায় প্রস্তাবে একটা মেয়েকে ঘরে তুলতে পারে বউরূপে। প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে কখনো এ ক্ষেত্রে জয়ী হতেই পারত না। কিন্তু কোন প্রবল ব্যক্তি অন্য কোন দুর্বল জনকে ক্ষতিজাত ক্ষোভ-ক্রোধবশে হত্যা করেও, সমাজে অপরাধ করেও প্রাণে বাঁচার একটা উপায় খুঁজে পায় বটে। তবু শাস্ত্র, সমাজ, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন হচ্ছে যৌথজীবনে ব্যক্তিমানুষের, আত্মরক্ষার দুর্গ বিশেষ। এ দুর্গ দুর্বলকে রক্ষা করে, প্রবলকে রাখে সংযত।

কিন্তু সব প্রবল সংযত থাকে না। তাই সেকালে একালেও কোন কোন অসংযত সাহসী দুর্ধর্ষ প্রবল যাকে রূপের নেশায় কামের তীব্রতায় উন্মত্ত করে তোলে, সে কোন রূপসী তরুণীকে দেখে বলতে পারে 'আমার পরাণ যারে চায় তুমি তাই গো'। এবং জোর করে বহন করে ঘরে বধূ করে তুলতে পারে। জীবনে যৌবন হচ্ছে উত্তাল তরঙ্গ তাড়িত উচ্ছ্বসিত জোয়ার স্বরূপ। যখন রূপের পাথারে আঁখি ডুবে থাকে, দিশেহারা যৌবনের অন্ধকার অরণ্যে মনও দিকবিদিকজ্ঞান হারায়, যখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় মানুষ এ যৌবনে বেপরোয়া হয়ে জ্ঞান বুদ্ধির, সাহস-শক্তির সীমা অতিক্রম করে পতঙ্গবৎ ভোগ-উপভোগের, লিপ্সার, কাঙ্ক্ষাপূর্তির জন্যে মোহচালিত হয়ে সর্বনাশের পথে এমনকি মৃত্যুর দিকে সহজে এগিয়ে যায়-- কোন আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ-অনুরোধ-পরামর্শ-ধমক-ধমকি হুকুম-হুমকি-শোনে না। প্রবল কাঙ্ক্ষী মাত্রই এক একটি পতঙ্গ। ভীরু, নিরীহ, দুর্বলই কেবল প্রাণ নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাটাকেই মনে করে জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোগবাদী অসংযত লিপ্সু উদ্যমশীল উদ্যোগী প্রবল মানুষমাত্রই এক একটি পতঙ্গ। এরা পরিণাম ভীরু নয়, নয় সংশয়ের দ্বিধার শিকার "মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে-সকলেই সে-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে।... কেহ মরে কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি, রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, ইন্দ্রিয়বহ্নি সংসার বহ্নিময়।". গণতন্ত্রে নির্বাচনকামী মানবহ্নির আকর্ষণে। অর্থ-সম্পদ ছড়ায় ছিটায়। সরকারে মন্ত্রী হওয়ার জন্যে যে তোয়াজ-তোষামোদ-স্তাবকতা-চাটুকারিতা পদলেহিতা প্রয়োজন তা কেবল ক্ষমতাবহ্নির আসক্তির কারণ। এসব বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন না কারণ প্রায় একশ' বছর আগে ১৮৯৪ সনের ১৪ই এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। এর মধ্যে যে সাহিত্যবহ্নি, ভেজালবহ্নি, চোরাচালানবহ্নি, কালোবাজার বহ্নি, ঘুষ, লুট, বখশিস, দালালি, কমিশন, উপঢৌকন, পাওন, ছিনতাই-কাড়া-মারা হনন-বহ্নি CIA KGB Raw বহ্নি ও সূক্ষ্মতায়, মানে, মাত্রায়, বৈচিত্র্যে শতগুণ বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ পেয়েছে, তাই এসবের বঙ্কিমী চন্দ্রের লেখায় উল্লেখ নেই। কাজেই তাঁর সময়েও শাস্ত্রের সমাজের নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথাপদ্ধতির দুর্গে নিঃস্ব নিরন্ন নিরীহ নির্বোধ নিঃসহায় মানুষ সামান্য পরিমাণে হলেও আশ্রিত ছিল, সে-দুর্গের দেয়াল এখন নানা দিকেই ভাঙা। দীন দুর্বল মানুষ এখন দুষ্ট দুর্জন-দুর্বৃত্ত, দুস্কৃতী, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, কারখানাদার, শাসক-প্রশাসক, সর্দার, মাতব্বর, পরিষদ সদস্য, চেয়ারম্যান, সাংসদ, মন্ত্রীর শাসন, শোষণ হুকুম-হুমকির সদাশঙ্কিত সন্ত্রস্ত শাসনপাত্র মাত্র। এখন প্রবল বুদ্ধিমান মাত্রই বহ্নি আসক্ত।

AMARBOI.COM

প্রতিক্রিয়াশীলতার শৃঙ্খলে বদ্ধ শিক্ষা

হরফ আবিষ্কারের পূর্বেও প্রাণীপ্রজাতি হিসেবে দলীয়, গোত্রীয় বা গোষ্ঠী জীবনে মানুষও আত্মরক্ষার ও আত্মবিস্তারের প্রয়োজনে নানা অনুকূল-প্রতিকূল-পারিবেশিক-প্রাতিবেশিক সংবৎসরের আর্তব অভিজ্ঞতা থেকে আত্মরক্ষার, আত্মপ্রসারের ও আত্মোৎকর্ষের নানা কলা-কৌশল, প্রতিকার-প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রভৃতি জানতে ও বুঝতে শিখেছে এবং প্রয়োগ করেছে। জীবন রক্ষণ, নিরুপদ্রব ও নিরাপদ করণ প্রভৃতির প্রয়োজনে মানুষ মুখে মুখে শুনে শুনে ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানরূপে তথা শ্রুতি-স্মৃতিরূপে ধরে রাখত, এখনো রাখে। মৌখিক ও শ্রুত কথা বাকে, বাক্যে ও বক্তব্যে স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতার বা ঔদাসীন্যের ফলে মুখে মুখে বিকৃত হয়ে কানে কানে পৌঁছে। সত্যও রঞ্জিত হয়ে বিকৃত ও মিথ্যা হয়ে যায়। কাজেই একের দেখা, জানা, বোঝা ও শেখা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দূরের মানুষের জন্যে, অচেনা লোকের জন্যে, ভিন্ন কোন গোত্র, দল গোষ্ঠীর জন্যে, ভাবীকালের মানুষের জন্যে ধরে রাখার লক্ষ্যে অর্থাৎ লব্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বর্তমানের-ভবিষ্যতের ও চিরকালের মানুষের কাছে তাদের হিতার্থে পৌঁছে দেয়ার জন্যে মানুষ হরফ আবিষ্কার করেছে। আমরা ইতিবৃত্ত রচনায় বসিনি। কাজেই তা এখানে আলোচ্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠীর মানুষের মানসোৎকর্ষের ফলে উন্নততর সমাজে হরফ হয়েছে উদ্ভাবিত, আবিস্কৃত হয়েছে, হচ্ছে নানা নিরুপদ্রব, নিরাপদ জীবন যাপনের জন্যে হাতিয়ার, প্রতিষেধক ঔষধ, প্রতিকার-প্রতিরোধের বিচিত্র ও বিবিধ উপায়।

হরফ আবিস্কৃত হলেও জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হলেও সবাই কিন্তু জানা-বোঝা-শেখায় আগ্রহী হয়নি, হয়না, কখনো হয়তো হবেও না। তা ছাড়া মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-অর্থ-বিত্ত আয়ত্তে রাখার জন্যে জ্ঞান-অভিজ্ঞতাও সবাইকে বিতরণ-বিলানোর নিয়ম চালু ছিল না সর্বত্র, ঘরানা জ্ঞান পেশা হিসেবেও থেকেছিল কোথাও কোথাও।

বলতে গেলে আঠারো শতকের আগে পৃথিবীর অনেক সভ্য জাতির, রাজ্যের মধ্যেও লেখা-পড়া লাখে একজনের মধ্যেও চালু ছিল না। আর শিক্ষার প্রয়োজনও তেমন অনুভূত হত না, কারণ লেখা-পড়া রুজি-রোজগারের মোক্ষম উপায় হয়ে ওঠে গত দুশ আড়াইশ বছর ধরে মাত্র। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য-বিজ্ঞানবদৌলত যন্ত্র-প্রকৌশল প্রযুক্তি কাজ-কর্মের যান্ত্রিক সৌকর্যের দরুন এবং জীবনোপকরণের আকস্মিক, বিচিত্র বিবিধ দ্রুত প্রসারের ও প্রয়োজন চেতনার বৃদ্ধির ফলে।

কাজেই দুনিয়ার কোথাও পুরুষের মধ্যেও শিক্ষা প্রসার-প্রচার-প্রয়োজন ছিল না। ফলে গণশিক্ষা-গণসাক্ষরতা প্রভৃতি উনিশ শতকের য়ুরোপেও ছিল অজ্ঞান-অভাবিত। য়ুরোপে নারীশিক্ষার গুরুত্বও উনিশ শতকের শেষপাদের আগে অনুভূত হয়নি তেমন।

আমাদের দেশেও কিছু ব্রাহ্মণের, কিছু চিকিৎসক বৌদ্ধের এবং কিছু করণিক কায়স্থের মধ্যে আর মৌলবী-মোল্লা-খোন্দকার-মুন্সী-উকিল-দস্তিদার, খাস্তগির, পাটওয়ারী, মজুমদার বেণে-ফড়ে প্রভৃতি শাসন প্রশাসন সম্পৃক্ত চাকুরেরা প্রয়োজনীয় স্বল্পশিক্ষা গ্রহণ করত, স্বল্প কাজ চালানোর প্রয়োজনে। এ জন্যেই ব্রিটিশ আমলে তথা উনিশ শতকের তৃতীয়পাদ অবধি সংস্কৃত শিক্ষিতরা পণ্ডিত, আরবী শিক্ষিতরা মৌলবী, ফারসী শিক্ষিতরা মুন্সী এবং ইংরেজী শিক্ষিতরাই কেবল এডুকেটেড [educated] বা শিক্ষিত সম্মানিত ব্যক্তিরূপে হত পরিচিত। আমাদের আজকের উদ্দিষ্ট বক্তব্যের সঙ্গে এসব কথার প্রাসঙ্গিকতা কম কিংবা নেই-ই। তবু একালে গণশিক্ষা-গণসাক্ষরতা যে আবশ্যিক ও জরুরী তা এ যন্ত্রজগতে ও যন্ত্রনির্ভর জীবনে গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেননা দাস, ভূমিদাস, শাস্ত্রশাসন, আসমানী ভয়-ভরসা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান অভিজ্ঞতাপ্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। জীবনে নিয়তির, অদৃষ্টের, কর্মফলের, কপালের উপর আস্থা কমেছে, তাই জীবন হয়েছে ইহজাগতিকতায় বা ঐহিকতায় সীমিত। শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া-বর্বর যুগের অবসানে মানুষ অর্জন ও উপলব্ধি করেছে জন্মসূত্রে বা জন্মগত স্বাধীন সত্তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনা, স্বাধিকার বোধ, স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে-এদের বুকে। মন-মননের বিকাশে জাগছে শ্রেণীচেতনা, ব্যাপকভাবে চিহ্নিত হচ্ছে শত্রু-মিত্র, পোষক-প্রতারক, শোষক-শোষিত।

গণতন্ত্র মানে আঁধা-কানা-খোঁড়া-ধনী-নির্ধন, অজ্ঞ-বিজ্ঞ, সাক্ষর-নিরক্ষর, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের দেশে বা রাষ্ট্রে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার রয়েছে, রয়েছে সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার। এ চেতনা শিক্ষালব্ধ শিক্ষা লভ্য। তাই শিক্ষা দানের ও গ্রহণের আবশ্যকতা আজ দুনিয়ার সর্বত্র স্বীকৃত ও জরুরী বলে বিবেচিত। আমাদের দেশেও বাধ্যতামূলক গণশিক্ষার ব্যবস্থা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। কিন্তু মার্কিন অর্থ, পরামর্শ ও মদদপুষ্ট মুৎসুদ্দী সরকার মার্কিন স্বার্থেই মার্কিন ইঙ্গিতে বা হুমকিতেই নানা অজুহাতে প্রাথমিক শিক্ষায় ও শিক্ষার প্রসারে নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল বাধা সুকৌশলে সৃষ্টি করে জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে।

ইংরেজ সরকার শিক্ষার প্রসার কামনা করেনি, রোধ করবার চেষ্টা করেছে সঙ্গত সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। পাকিস্তান-সরকার নিয়োজিত কমিশনের সুপারিশ ছিল কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই শিক্ষাকে সীমিত রাখার জন্যে। এক্ষেত্রে শরীফ কমিশন, হামাদুর রহমান কমিশন, কুদরতে-ই-খুদা কমিশন প্রভৃতির আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল প্রায় অভিন্ন। মন্ত্রী মজিদ খানও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার নামে আরবী-ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য করে প্রকৃত পক্ষে ইয়াঙ্কি ইঙ্গিতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সুকৌশলে রুদ্ধই করে দিয়েছিলেন ১৯৮৩ সনে। মুৎসুদ্দী সরকার এ-ই করে থাকে।

আবার বাঙালী চেতনা বশে রাজনীতিক, অধ্যাপক, উকিল-ডাক্তার-সাংবাদিক প্রভৃতি শিক্ষিত মাত্রই বিদ্বান-বুদ্ধিমান হয়েও আবেগ বশে বাঙলাকে দিলেন ইংরেজীর উপর স্থান। এমনকি কেউ কেউ ইংরেজী শিক্ষা তুলে দেয়ারও পক্ষে ছিলেন।

এতে দেশের স্বার্থ, জ্ঞানের গুরুত্ব, রাষ্ট্রের প্রয়োজনচেতনা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ফলে বর্ণে-বানানে-বাকে-বাক্যে-শৈলীতে বিশুদ্ধ বাঙলা শেখা-শেখানোর চেষ্টাও ছিল না-কোলকাতার হিন্দুবিদ্বেষ প্রসূত আধির প্রভাবে। কাজেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বানানে-বাক্যে এবং চলতি-সাধুর মিশ্রণে-সর্বপ্রকারের বিকৃত বাঙলার প্রসার ও প্রচার ঘটাচ্ছেন সারা দেশব্যাপী।

আর ইংরেজীও আগের মতো নিষ্ঠার ও গুরুত্বের সঙ্গে শেখানো হয় না। আগে যে ইংরেজী ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ানো হত, তা এখন প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়ানো হয়। ব্যাকরণ মাধ্যমেই বিদেশী ভাষা শেখা সহজ। তাও এখন গুরুত্ব পায় না। কাজেই এখন বিশুদ্ধ বাঙলা জানা লোক যেমন হাজারে এক, তেমনি বিশুদ্ধ ও সুন্দর ইংরেজী জানা লোক প্রায় দশ হাজারে একজন মেলে। বিদ্বান মানুষ দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। অথচ একালের সর্বপ্রকার বিদ্যার উৎস-আকর-গোলা-আড়ত হচ্ছে আমাদের জন্যে ইংরেজীই। এ সর্বনাশা নীতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। সবার জন্যে ইংরেজী বা বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই, এ-ই হচ্ছে এদের যুক্তি। এর উপর উপসর্গ হচ্ছে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু নিয়মনীতির পরিবর্তন। একটি হল বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যার উপস্থিতি না থাকলেও উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করানো । এর ফলে একেবারে অশিক্ষিত শিক্ষার্থীও প্রবেশিকা, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দেয়ার অধিকার পায়। এবং যেহেতু লেখাপড়া জানে না, সেহেতু সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর শিখে কিংবা নকল করে, না জেনে, না বুঝে, না শিখে পরীক্ষা পাশ করে। এরা কার্যত আদি অকৃত্রিম অশিক্ষিত। নিরক্ষরের ও এদের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। এতে কোচিং ও কোচের এক পেশা বিস্তর প্রসার লাভ করে।

এর মধ্যে পাকিস্তান সরকার স্কুলে-কলেজে উন্নয়ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে থাকে। দালান তুলবে, শিক্ষক সংখ্যা বাড়াবে, বেতনও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এর সঙ্গে একটা মারাত্মক শর্ত আরোপ করে, তা হচ্ছে পরীক্ষার ফল ভালো করাতে হবে। স্কুল-কলেজে শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালক মিলে তখন নকল করিয়ে পাশের হার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িয়ে সরকারী অর্থ মঞ্জুর করানোর কাজে দেহ-মন-আত্মা নিয়োগ করলেন। সেই থেকেকেই নকলের বিচিত্র, বিবিধ ও বিশিষ্ট প্রসার ও বিস্তার। দরিদ্র লোকের ও সাধারণের এ সর্বনাশ করে ধনী লোকেরা নিজেদের সন্তানদের নানাভাবে দেশে ও বিদেশে ইংরেজী মাধ্যমে উচ্চ ও উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করে-করছে। আবার অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্পৃহা বশে শিক্ষার্থীদের কিছুসংখ্যক কিশোর-তরুণ রাজনীতি করত একটা আদর্শিক প্রেরণায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে যখন স্বদেশী-স্বধর্মী-স্বজাতির সমান্ত-বুর্জোয়া মুৎসুদ্দী শাসন প্রবর্তিত হল, তখন অধিকাংশ শিক্ষার্থীর রাজনীতিক চেতনা উন্মেষের কারণই রইল না। যারা জানে যে স্বদেশী-স্বজাতি স্বধর্মীর শাসনে গণমানুষ, শোষিত পীড়িত মানুষ স্বাধীন হয় না। শোষণ-পীড়ন মুক্তি এবং স্বাধিকারে স্বও সুপ্রতিষ্ঠাকেই কেবল প্রকৃত স্বাধীনতা বলে জানে, বোঝে এবং মানে, কেবল সেসব বামপন্থী ছাত্ররাই রাজনীতি করেছে, করে। অন্যরা এসব জানেও না বোঝেও না, বুঝবার চেষ্টাও করে না। এসব শিক্ষার্থীই এখন আমাদের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল মার্কিন মুৎসুদ্দী শাসিত রাষ্ট্রে, মুৎসুদ্দী রাজনীতিক, বিরোধী দল বা সরকারী দলের হয়ে সভা-মিছিল করে, শ্লোগান দেয়, ভোট যোগাড় করে, গুণ্ডা-মস্তান-খুনী হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কোন দলকে ক্ষমতায় বসায়, কোন সরকারকে, দলকে তাড়ায়। আর কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি করে রাজনীতিক দলের বা সরকারের আদেশে, নির্দেশে হুকুমে-চাকরি বা অর্থ বা ব্যবসা প্রাপ্তি লোভে। এরা মস্তান, খুনী, গুণ্ডা। বামপন্থী না হলে, মানববাদী না হলে, মানুষের সমাজকে মনুষ্যত্ব রূপ গুণের প্রসারে-প্রচারে উন্নত করার অভিলাষী না হলে, উদ্ভাবনে-আবিষ্কারে, লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্যপুঁজি, শিল্পপুঁজি খাটিয়ে কৃষির উৎপাদন শক্তি বাড়িয়ে দেশকে অর্থে-বিত্তে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, দর্শনে-সমাজতত্ত্বে জ্ঞানের বিচিত্র বিস্তারে আগ্রহী না হলে শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া-বর্বর শাসনে বা রাজনীতিতে কেবল ক্ষমতা কাড়াকাড়ির রাজনীতিই তথা মারামারি বা হানামানি ষড়যন্ত্র চলে। আমাদের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত প্রশ্নোত্তরে পাশ, নকলে পাশ তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে বা গাঁ-গঞ্জের শিক্ষিত অর্থ-বিত্ত-মান-যশ-খ্যাতি ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজ-সংস্কৃতি শ্রেয়-প্রেয় সর্বক্ষেত্রেই নৈরাজ্য বা আরণ্য জীবনপ্রতিবেশ সৃষ্টি করেছে। এখানকার জগৎ হচ্ছে কালোজগৎ-কালো বাজার এবং কালো নীতি-আপোসে ফেল কড়ি মাখ তেল। এও এক দৃশ্য-অদৃশ্য নিয়মের জগৎ, নিয়ম-নীতির, রীতি-রেওয়াজের শাসন-প্রশাসন লেন-দেন।

আত্মকথা ও স্মৃতিকথা

পাঠক অপরের জীবনচরিত, আত্মকথা ও স্মৃতিকথা পড়ে আনন্দ পায়। এ ধরনের বইতে একটা বিশেষ স্থানের, কালের, পরিবারের, প্রতিবেশের [গাঁয়ের বা শহরের] অতীত আলেখ্য পায়। এর সঙ্গে কল্পনার, স্বপ্নের সাধের ও সাধ্যের স্বাদ যুক্ত হয়ে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দসুন্দর কিংবা বেদনামধুর অনুভূতি, উপলব্ধি, সুখ, আনন্দ বা দুঃখ-বেদনাবোধ জাগে। ভাষা-ভঙ্গি-বক্তব্য আকর্ষণীয় হলে তো কথাই নেই। উপন্যাস-গল্প-কবিতা-নাটকের স্বাদ মেলে।

সাধারণত জগদ্বিখ্যাত মনীষী রাজনীতিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক প্রমুখেরা আত্মকথায় অসংকোচে-সগৌরবে-সগর্বে শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি বিরোধী কুকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে নিজের মহত্ত্ব, শক্তি, সাহস, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক বিবেচনা স্নেহ-মায়া-মমতা-সহানুভূতি কিংবা হিংসা-ঈর্ষা-ঘৃণা-অবজ্ঞার কথা-তথা হৃদয়ের ঐশ্বর্যের কিংবা নিষ্ঠুরতার ক্রুরতার কথা পাঠককে জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁদের জনপ্রিয়তার, মহত্ত্বের, অমরত্বের পরিসর-পরিধি দীর্ঘতর করেন।

আর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির ও লোকসমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকার জন্যেও কেউ কেউ আত্মকথা বা স্মৃতিকথা লেখেন। নিজের জীবনের বিচিত্র ও বিবিধ অভিজ্ঞতা, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ আর পরিচিতি মানুষ, স্থান ও ঘটনার বয়ান লিখতে আগ্রহী হন। এঁরা নিজেদের কোন শাস্ত্র-সমাজ সংস্কৃতি বিরুদ্ধ কোন অপরাধ-অপকর্মের কথা সাধারণত বলেন না। কারণ তাঁরা নিন্দাভীরু এবং তাঁরা ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করতে পারেননি বলে এসব কথা এড়িয়ে যান। কেউ কেউ পরিচিতজনদের মধ্যে যাদের অপছন্দ করেন, তাদের কুকথা, কুকৃতি প্রচারে উৎসাহী হন এক অবচেতন প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ লিপ্সাবশে। আবার তারিফও করেন শ্রদ্ধেয়জনের স্তাবক-চাটুকারের মতোই।

আত্মকথা-স্মৃতিকথার তবু অতীতের ইতিবৃত্ত হিসেবে মূল্য অপরিমেয়। এগুলো অতীতের তথ্যের, ঘটনার ও তত্ত্বের আকররূপে, ইতিহাসের উপকরণরূপে, শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার-দেশাচার, পালা-পার্বণ, লোকজীবনযাত্রার আর্থিক-সামাজিক-নৈতিক-শৈক্ষিক জীবনে নানা শ্রেণীর অবস্থার, অবস্থানের, বিশ্বাস-সংস্কারের, চিকিৎসাশাস্ত্রের, লৌকিক-অলৌকিক-অলীক-নিয়তির, ভূত-প্রেতে আস্থাজাত জীবনযাপন পদ্ধতির, অজ্ঞাত কারণে ঘটা দৃশ্য-অদৃশ্য নানা আধিদৈবিক, আধিভৌতিক-আধ্যাত্মিক তথাকথিত অদৃষ্ট-কর্মফল-কপাল-নিয়তির খবরও মেলে এসব বইতে। ফলে কেবল ইহজাগতিক বাস্তব জীবনের ও জীবন প্রতিবেশের নয়, মানসজগতের শাস্ত্র ও বিশ্বাস-সংস্কার অনুগ একটা অকৃত্রিম আলেখ্যও পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে এগুলো একাধারে ও যুগপৎ তত্ত্বের, তথ্যের, সত্যের, ঘটনার, আচার-আচরণের, মাঠ-বাট-হাট-ঘাট-স্থান-কাল পরিবেশের বাস্তব বর্ণনা এবং দৃশ্য-অদৃশ্য অলীক-অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার সম্পৃক্ত মন-মত-মন্তব্য-শাস্ত্র-পুরাণ-ভূত-জীন প্রভৃতি সব লঘুগুরুভাবে অল্প-বিস্তর মেলে।

আত্মকথা বা স্মৃতিকথা লেখা হয়। [যাঁরা ডায়েরী রাখেন তাঁরাও] জীবনের প্রান্তপর্বে। এর মধ্যে মন-মত-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা বিবর্তিত, বিস্তৃত ও উৎকর্ষ লাভ করে। কাজেই শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন-পৌঢ়ত্বের স্মৃতি মন্থন ও স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কারণ-কার্য চেতনা এবং সে-সম্পৃক্ত টীকাভাষ্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কলমের ডগায় এসে যায়, যে সময়ের স্মৃতি বা ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, সে-সময়ের স্মৃতি বা ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে সে-সময়ে লেখকমনে সে-চেতনা ছিল কি? সে-জ্ঞান, সে-বুদ্ধি সে-যুক্তি, সে-বিবেচনা ছিল কি? থাকা সম্ভব কি? এটিই আমাদের জিজ্ঞাস্য এবং এ জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানসম্মত তথ্য ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। এর যথার্থ উত্তরের উপর নির্ভর করছে আত্মকথায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিকথায় পরিব্যক্ত মন-মত-মন্তব্যের গুরুত্ব, বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রাহ্যতা এবং উপযোগ। তাছাড়া একজন ব্যক্তির গুণের সংখ্যা, মান, মাত্রা বহু ও বিবিধ হলেও, তার দোষও যে অনেক থাকে, অথবা দোষের সংখ্যা ও মাত্রা বহু বিচিত্র হলেও একেবারে গুণরিক্ত নয়, সে-কথা আত্মকথায় বা স্মৃতিকথায় সহজে মেলে না। ব্যতিক্রম অবশ্য আলোচ্য নয়।

ভাষাগোষ্ঠী চেতনা

সেকালে গাঁয়ে গাঁয়ে অজ্ঞতা ছিল সর্বাত্মক এবং অনক্ষরতা ছিল সর্বব্যাপী– কাজেই মানুষ আশৈশব-আবাল্য-আকৈশোর পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ প্রতিবেশ সূত্রে শাস্ত্রিক, নৈতিক, আচারিক, পার্বণিক যা কিছু দেখত, শুনত ও জানত, তা-ই পুরোপুরি বিশ্বাস করত। ভূতে-ভগবানে, প্রেতে-পিশাচে, জীনে-পরীতে, দেও-দানুতে তাদের আস্থা ভয়-বিস্ময় ছিল নিখাদ। এদের অস্তিত্বে বিশ্বাসও ছিল নিখুঁত।

কাজেই প্রতিটি মানুষই বিশ্বাস-সংস্কার, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ভিত্তিক ও নিশ্চিন্ত নির্ভর জীবন যাপন করত বলে বঙ্কিমচন্দ্র নন কেবল-তারা সবাই স্বধর্ম, স্বশাস্ত্র স্ববিশ্বাস, স্বসংস্কার প্রভৃতিকে নির্বিচারে, নিঃসন্দেহে, নিঃসংশয়ে, নির্ভেজাল সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলেই জানত ও মানত, আজো জানে ও মানে। কিন্তু ভিন্নধর্মের ও শাস্ত্রের অনেক কিছুকেই অসম্ভব, অবাস্তব, ভুল, মিথ্যা, অযৌক্তিক বলে তারাই আবার শোনা ও জানা মাত্রই অবিশ্বাস করে, অনাবিল উপহাসে-পরিহাসে-অবজ্ঞায়-নিন্দায় আনন্দ পেত এবং এখনো পায়। যেমন অগস্ত্যের বিন্ধপর্বতকে নতশির করা গণ্ডুষে সাগর শোষণ করা, যিশুর ঈশ্বরপুত্র হওয়া, কঙ্কালকে জীবন্ত মানুষ করা, মূসার জেহোভার সঙ্গে আড্ডা দেয়া বা লোহিতসাগর জলশূন্য করে পায়ে চলা পথ করে নেয়া, মুহম্মদের অঙ্গুলি সংকেতে চাঁদ দু'ভাগ করা বা আকাশে আল্লাহর কাছে আলাপ করতে যাওয়া প্রভৃতি ভিন্নধর্মীর কাছে অযৌক্তিক-অসম্ভব-অবাস্তব গাল-গল্প বা বুজরগী মাত্র। এর মধ্যে কিন্তু পারস্পরিক কোন ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ছিল না। কেবল অবিশ্বাসপ্রসূত অনাবিল, নিরুদিষ্ট উপহাস-পরিহাস রস উপভোগ বাঞ্ছাই এসব ক্ষণ উক্ত ও আলোচ্য বিষয় ছিল মাত্র। বটতলায়, গাছতলায় বা নৌকায়, হাটবাজারের পথে কিংবা আড্ডায়। এ কারণেই এর জন্যে কখনো দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়নি এবং এখনো হয় না।

গ্রামে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কাকা-মামা-চাচা-জেঠা-ভাই-বোন-দাদা-দাদি, ভাই-বুবু সম্বোধনের সৌজন্য, সুরুচি ও শালীনতা চিরকালই ছিল, আজো রয়েছে। এর মধ্যে ইতর-ভদ্রের, চাষী-মজুর-ধনী-নির্ধন-হাড়ি-ডোম-নাপিত-ধোপার কোন ভেদবিচার ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠ হলেই আত্মীয় জ্ঞাপক-সম্বন্ধ-সম্বোধন সর্বত্র চালু ছিল, এখনো রয়েছে।

অজ্ঞতা-অশিক্ষা সর্বত্র সর্ব সমাজে গভীর ও ব্যাপক ছিল বলে রক্ষণশীলতাও ছিল ভুবনজুড়ে। হিন্দুর মধ্যেতো বর্ণভেদ জাত স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ছিলই, ওরা দেশজ দীক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিমদেরও অস্পৃশ্য বলে জানত এবং সতর্ক প্রয়াসে-প্রযত্নে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলত, ঘরে উঠতে বসতে দিত না, বিশেষ দাওয়ায় কৃচিৎ কখনো বসানো যেত। কাজেই চাচা-মামা-মেসো-ভাগ্নে প্রভৃতি আত্মীয়বাচক সম্বন্ধসূচক সুবাদজাত সম্বোধন কেবল কণ্ঠোচ্চারিত ঠোঁট, নিঃসৃতই ছিল, অন্তরে-চিত্তে-হৃদয়ে-বুকে ছিল না এর ঠাঁই, এখনো নেই। অবশ্য কামে-প্রেমে, লোভে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বন্ধুত্বে সখ্যে অকৃত্রিম, আন্তরিক হার্দ্যিক সম্পর্ক অবশ্যই কারো কারো মধ্যে গড়ে উঠত, এখনো ওঠে।

যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতা ব্রিটিশভারতে চালু ছিল, রাজনীতিক স্বার্থে-আন্দোলনে-হুজুগে হিন্দু-মুসলিমকে পরস্পরের জানিদুশমন করে দিয়েছিল, স্বাধীনতা-উত্তরকালে দাঙ্গা-হত্যা প্রবণতা দ্বেষ-দ্বন্দ্ব বিরল ও দুর্লক্ষ্য হলে কিংবা লোপ পেলে দেখা গেল হিন্দু-মুসলিমে জাত-পাতের ভেদও গেল ঘুচে। কোলকাতার হিন্দু-বাঙলাদেশে যেন পরমাত্মীয়-অতিথি-কুটুম্ব। তেমনি কোনকাতায় বাঙলাদেশের মানুষও পায় আত্মীয়-বন্ধুর সমাদর। এর কিছুটা বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতার ফল, কিছুটা যন্ত্রযুগের ও, যন্ত্রজগতের দ্রুত প্রসারের প্রভাব-প্রসূন। মানুষের মন-মত-মেজাজ-যন্ত্রনির্ভর প্রাত্যহিক জীবনে পাল্টাতে হচ্ছেই বাঁচার তাগিদে, যুগের চাহিদার স্বীকৃতিতে। ঐহিক বা ইহজাগতিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে-পোষাকে-আচারে-রুচিতে সংস্কারমুক্তি ঘটেছে। এমনি মানসমুক্তি মন-মত-মেজাজ-উদারতা থাকলে প্রাত্যহিক জীবনাচারে ও আচরণে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে একটা ঐহিক ইহজাগতিক নির্বিশেষ অভিন্ন অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য অবিচ্ছিন্ন 'বাঙালী সংস্কৃতি' গড়ে উঠতে পারত। তাকেই ভিত্তি পুঁজি ও পাথেয় করে বাঙলাভাষী মাত্রই একটা অকৃত্রিম অভঙ্গুর দৈশিক-রাষ্ট্রিক-ভাষিক জাতীয়তা সচেতন একক জাতি হয়ে উঠতে পারত। তখন শাস্ত্রিক মত-পথ-আচার-আচরণ-হত একান্ত ব্যক্তিগত।

একালে অজ্ঞ-অনক্ষর লোককেও রেডিয়ো-টিভি-ক্যাসেট-নাটক-যাত্রা-সংবাদপত্র ও রাজনীতিক প্রচারপত্র, ইস্তিহার, বিজ্ঞাপন, সভা-সমিতি-বক্তৃতা সচেতন স্বশিক্ষিত করে তুলছে মতলববাজ রাজনীতিক বুর্জোয়াদল ও সরকারগুলো। তাই হিন্দু মুসলিমরা যুগ প্রভাবে রক্ষণশীলতা বর্জন করছে বটে, তাদের গ্রহণশীলতা দ্রুত বাড়ছে বটে, কিন্তু মনে-মননে সেক্যুলার হতে পারছে না, কেবল আচারভ্রষ্টতাই উদারতা ও আধুনিকতা বলে বাস্তবে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে। সেক্যুলার হচ্ছে না কেউ। বিদ্বান-পণ্ডিত-গবেষক-ঐতিহাসিক-নাস্তিক উদার-কম্যুনিস্ট-লেখকদের চিন্তায়-চেতনায় জাত-বর্ণ-ধর্ম-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার নির্বিশেষে বাঙালী তথা বাঙলাভাষী মাত্রেরই ঠাঁই হয় না। তাই নীরদ চৌধুরীর আত্মঘাতী বাঙালী মানে বাঙলাভাষী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ। এমনি প্রায় সব মনস্বী-মনীষীর লেখায় কেবল স্বশ্রেণী ও স্বধর্মীই আলোচ্য। বাঙলাভাষী মাত্রকেই তাঁরা আলোচ্য করেন না। এদের সাদৃশ্য, বৈপরীত্য, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাংস্কৃতিক পার্থক্য, সাদৃশ্য, রুচির পার্থক্য, চিন্তা-চেতনার-মন-মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্তের পার্থক্য বৈপরীত্য-বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য, গুণ-মান-মাপ-মাত্রার বৈষম্য গুরুত্ব-লঘুত্ব সবকিছুই বিবেচ্য হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী। তা হলেই কেবল এ যুগে জরুরী দৈশিক, ভাষিক রাষ্ট্রিক সাংস্কৃতিক ইহজাগতিক প্রয়োজনে জাতীয়তা গড়ে উঠবে। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই এ ভাষিক গোষ্ঠীবোধের বা অভিন্ন জাতিচেতনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনীয়তা অনুভব উপলব্ধি করে বলেই আমার ধারণা। এমনকি দেশের উপজাতিগুলোও আমাদের অবশ্য আলোচ্য দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা অকৃত্রিম করার ও রাখার জন্যে।

দরিদ্র রাষ্ট্রে ধনীর স্বর্গ

আমাদের দেশ বা রাষ্ট্র নাকি পৃথিবীর দরিদ্রতম এবং জনবহুল রাষ্ট্র। এখানে নিঃস্ব-নিরন্ন-বেকার মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে, অপুষ্টিজনিত নানা উপসর্গে, রোগে ভুগে ভুগে অকালে অসময়ে অল্পবয়সে জরার-জীর্ণতার শিকার হয়ে ঔষধ-পথ্যের অভাবে, বিনা চিকিৎসায় মরে। এ নিত্যদিনের নয়, প্রতিক্ষণের ঘটনা ও সামাজিক-পারিবারিক রূপ। এখানে মানুষ-মশা-মাছি-পথের কুকুর-বিড়াল প্রভৃতির চেয়ে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ-মাঝারি অবস্থার ও অবস্থানের নয়। মানুষ আর গৃহগত প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য অদৃশ্য ও সামান্য। আমরা এর মধ্যেই জন্ম-মৃত্যুর পরিসরের দীর্ঘ জীবনযাপন করি বলে আমাদের এ দৃশ্যে, এ অবস্থায়, এ অবস্থানে, এ সমস্যায়, এ সঙ্কটে, এ মানবিকতায় আমরা অভ্যস্ত। এ আমাদের চোখসহা-মনসহা-শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি-মানবতা-হৃদয়-মস্তিষ্কসহা বিষয় হয়ে গেছে। এ-ই যেন স্বাভাবিক। এ অবস্থা আজকেরও নয় অবশ্য, হাজার হাজার বছরের। ঝড়-ঝঞ্ঝা, খরা-বন্যা-মহামারী কবলিত দাসপ্রথা নিয়ন্ত্রিত সমাজে চিরকাল ছিল।

হৃদয়বান ধনী ব্যক্তি করুণা-কৃপা-দান-দাক্ষিণ্যযোগে মনুষ্যসমস্যার সমাধানে চিরকালই এগিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু এতো সমুদ্রে ঢিল ছুঁড়ে ডাঙা জাগানোর মতোই বৃথা প্রয়াস।

কিন্তু দরিদ্র রাষ্ট্রই শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া-বর্বর মনের মানুষের স্বপ্নের, সাধের, সাধ্যের চিরকাম্য স্বর্গলোক-বেহেস্ত। কেননা এখানেই আগে মানুষ বেচা-কেনা হত গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর মতো। এখন এখানেই মানুষ কুলি-মজুর-মিন্‌তি [মেহনতী] সূতার-রাজ-কর্মী-কর্মচারী চাকুরে-দালাল হিসেবে অতি সস্তায় ভাড়া করা চলে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে জীবনে, পরিবারে প্রয়োজন মতো সর্বপ্রকার কাজের লোক মেলে। শুধু তা-ই নয়, ওরা গোলামের মতোই হীনাবস্থার বলে কথায় কথায় হুকুম-হুঙ্কার-হামলা চালানো সম্ভব এবং ধমক-ধমকি নয় কেবল, দৈহিক নির্যাতনেও থাকে মনিবের অধিকার। বিদ্যা-বিত্ত-অর্থ-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্প-দাপট-খ্যাতি-ক্ষমতা যাদের রয়েছে এবং ধনী-মানীদের আত্মীয়-কুটুম্ব-ইয়ার-দোস্ত যারা, তারা যেভাবে ইহজাগতিক জীবনেই প্রাত্যহিক জীবনে ভোগে-উপভোগে, বিলাসে-ব্যসনে, ক্ষমতার অপব্যবহারের বেপরয়া পীড়নের, কাড়ার, মারার, হননের অধিকার পায়, তা স্বর্গলোকেও যে সম্ভব নয়, তা হলফ করে নিঃসংশয়ে বলা যায়। কাজেই দেশের বা রাষ্ট্রের এ দারিদ্র্য ঘোচানোর চেষ্টা করা গাঁ-গঞ্জ-নগর-বন্দরে কোন শিক্ষিত, সচ্ছল ধনী-মানী-খ্যাতি-ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষেরই শাস্ত্রিক, নৈতিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হতেই পারে না। কথায় বলে 'নিজের ভালো পাগলেও বোঝে।' কাজেই বিদ্যা-বিত্ত-শিক্ষা-স্বাস্থ্য অশন-বসন-নিবাস-সুখ-আনন্দ-আরাম আর ভোগ-উপভোগের সামগ্রী যাদের আছে, প্রতারণার-প্রবঞ্চনার কৌশল যাদের আয়ত্তে, আড়তদার, দোকানদার, কারখানাদার, ব্যাংকার যারা এবং যারা লুটে, ঘুষে, কমিশনে, দালালিতে, বকশিসে, নজরে, উপঢৌকনে, চোরাচালানে, ভেজালে-নকলে যারা পটু, তারা কেন দেশের গণমানুষের দারিদ্র্য ঘোচানোর প্রয়াসে নিজ স্বার্থের সর্বনাশ করবে? কোন্ স্থিরবিশ্বাসের ও ধীরবুদ্ধির মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ খোয়াবে? কাজেই বাঙলাদেশে শিক্ষিত সমাজে ধনীশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যাশিত বা বাঞ্ছিত সংখ্যায় কেজো তথা মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষ বৃদ্ধি না পেলে আমাদের গণমানব মানবেতর অপজীবনের শিকার হয়েই থাকবে আর অকালে অপুষ্টিতে জরা-জীর্ণতা কবলিত হয়ে মরতে থাকবে লাখে লাখে।

বাবু ও ভদ্রলোক

AMARBOI.COM

মুঘল আমলে য়ুরোপীয় বেণেরা রাজধানী বা প্রশাসন কেন্দ্রের সুদূরে উপকূলের নিকটস্থ নদীতীরে ব্যবসা-বাণিজ্য-কেন্দ্র-কুঠি স্থাপন করত, যাতে সরকারী লোকদের উপদ্রব থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয়, সে লক্ষ্যে।

কোলকাতাও ছিল তেমন একটি অজ পাড়াগাঁর মতো স্থান। কোলকাতা, গোবিন্দপুর, সূতানুটি ছিল একান্তভাবে হিন্দু নিবসিত স্থান। ফলে জোব চার্ণকের আমলের আগে থেকেই বেণে-ফড়ে দালাল-গোমস্তা-করণিক-দেওয়ান এমনকি সেবন্দী অবধি সবাই ছিল হিন্দু। মুসলিম ছিলই না, কিংবা ছিল বিরলতায় দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য। পরিবহন নৌকোর মাঝি মাল্লা অবশ্য ছিল মুসলমান।

না বললেও চলে যে দেশজ বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে নিম্নবর্ণের নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্তের নিঃস্ব নিরন্ন যারা ইসলাম গ্রহণ-বরণ করেছিল, তারা সাধারণভাবে ছিল অজ্ঞ অনক্ষর ক্ষেতমজুর, মাঝি-মাল্লা, মিনতি। এ মানুষের ইংরেজ কোম্পানীর কাজে-কারবারে প্রবেশাধিকার ছিল না। এ সময়ে বলতে গেলে য়ুরোপীয় কোম্পানীর চাকুরে, সহায় সহযোগী, খরিদ্দার, আড়তদার, বেণে-ফড়ে-দালাল-দেওয়ান ছিল কেবল হিন্দুই। ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে গুরুত্বহীন বলে আলোচ্য নয়।

কাজেই কোলকাতায়, চুঁচুড়ায়, চন্দন নগরে, হুগলী-হাওড়ায় তখন হিন্দু সাক্ষর সচ্ছল সাফ-কাপুড়ে [White collar] হোয়াইট কলার ব্যক্তি মাত্রই কোম্পানীর লোকদের কাছে পরিচিত ছিল বাবু [মানী বা মান্য লোক] ও ভদ্দরলোক বা ভদ্রলোক নামে। মানে এরা অনক্ষর কুলি-মজুর-শ্রমিক সেবন্দী নয়। ষোল শতক থেকেই বাবু ও ভদ্দরলোক যোগরূঢ় হয়ে কেবল হিন্দুর নামান্তর হয়ে দাঁড়াল। আজো তাই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত তথা সাফ-কাপুড়ে হিন্দু মাত্রেই ভদ্রলোক। আর শিক্ষিত ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর পরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান মাত্রই কেবল মুসলিম ভদ্রলোক নয়। [নাম শুনে] ও আপনি মুসলমান, আমি কিন্তু এতোক্ষণ আপনাকে ভদ্রলোক বলেই মনে করেছিলাম, মানে হিন্দু বলেই ভেবেছিলাম। এতে দোষ-ত্রুটি-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা-হিংসা নেই। এ হচ্ছে লোক বা স্থানিক পরম্পরাগত নির্দোষ অসচেতন বা অবচেতন সংস্কার মাত্র। আজো তাই পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী মানে হিন্দু; যেন দেশজ প্রতিবেশী মুসলমান বাঙালী নয়। এর রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষতি কিন্তু লঘু নয়, গুরু এবং এটি একটি আধি যার পরোক্ষ প্রভাব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এবং অভিন্ন ও অবিভাজ্য দৈশিক, রাষ্ট্রিক, ঐহিক বা ইহজাগতিক জাতীয়তা গড়ে ওঠার পক্ষে একটা অবিলুপ্ত বা অবিমোচ্য বাধা। কোলকাতার মনস্বী-মনীষী, আস্তিক-নিরীশ্বর দেশপ্রেমী লোকসেবী লেখক-সংস্কৃতিকর্মী রাজনীতিককেও দেখি তাদের অসতর্ক অবচেতন মনে, প্রাত্যহিক চিন্তা-চেতনায় প্রতিবেশী মুসলিমদের অস্তিত্ব প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। অথচ একটা দেশের রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, চাষবাস, মেঘ-রোদ-বৃষ্টি-খরা-বন্যা-ঝড়-ঝঞ্ঝা-মহামারী কিংবা চৌষট্টিকলা আর আর্থিক-ব্যবসায়িক-বাণিজ্যিক, শৈক্ষিক নৈতিক সব কিছুই প্রভাব ফেলে উভয় সম্প্রদায়ের উপরই অল্পাধিক। কাজেই যে কোন আলোচনা, ইতিবৃত্ত, আলেখ্য জাত বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিক হওয়া আবশ্যিক। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এমন কি কম্যুনিস্ট লেখকরা, জনসেবীরা-সংস্কৃতিকর্মীরাও ভুলে যায়।

বাঙালী হিন্দুরা 'বাবু থেকেই গেল চিরকালের জন্যে, যদিও 'বাবা'র মতোই 'বাবু'ও ফারসী শব্দ। দাদা, দাদী দিদিও কিন্তু [হিন্দীও] ফারসীজাত। বরং মুসলিম উচ্চারিত বাপই [বপ্র] এবং বাপু হচ্ছে সংকৃতজ। কৌতুকের বিষয় এই 'পানি' ও 'জল' এর মতোই হিন্দুর ঐতিহ্য মুসলিমে আর মুসলিমের ঐতিহ্য হিন্দুতে গৃহীত ও রক্ষিত হয়েছে সগর্বে ও সগৌরবে সংস্কৃতির নিদর্শনরূপে। 'ভদ্রক' থেকেই 'ভদ্র' সংস্কৃতজ। এ ভদ্রকই বাঙলায় 'ভালো' হয়েছে। [ভদ্রক> ভড্ডক>ভল্ল>ভাল] এখন অবশ্য ভালোমানুষ ও ভদ্রলোক ভিন্নার্থক।

বাঙলাদেশে অফিসে, সেরেস্তায়, গদীতে, বাবু, বড় বাবু, ছোট বাবু চলেনি মুসলিমদের ক্ষেত্রে। কিন্তু সাফ-কাপুড়ে সাক্ষর ব্যক্তিমাত্রই 'ভদ্রলোক' হয়েছে। এ পরিভাষা হিন্দুর জন্যে যোগরূঢ় বা সংরক্ষিত থাকেনি। এখন বাঙলাদেশে সাফ-কাপুড়ে মাত্রই জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভদ্রলোক। অবশ্য এ কেবল নামে, স্বভাবে, কর্মে-আচরণে এদের অধিকাংশই লুট-ঘুষ-দালালী, কমিশন-বখশিস, উপঢৌকন, নজর, সম্মানী-পাওন প্রবণ, আর চোরাচালানে, ভেজালে, ঠকাঠকিতে, ঠোকাঠুকিতে, প্রতারণায়,-প্রবঞ্চনায়-খুন-খারাবিতে, গুণ্ডামিতে, মস্তানিতে, মিথ্যাভাষণে, অপকর্মে-অপরাধে ভদ্রলোকের জুড়ি নেই। অথচ ভদ্রলোক-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Gentleman. আবার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে Gentleman-এর আদি অভিধা হচ্ছে অভিজাত অস্ত্রধারী, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষক সম্মানিত ব্যক্তি।

সুতরাং প্রকৃত তাৎপর্যে 'ভদ্রলোক' মাত্রই সংস্কৃতিমান, আস্থাভাজন, বিনয়ী, নির্ভরযোগ্য, সৎ, উদার, সুজন বা প্রমূর্ত সৌজন্য হওয়াই ছিল প্রত্যাশিত।

অতএব বাবু মাত্রই ভদ্রলোক এবং ভদ্রলোক মাত্রই ছিলেন উনিশ শতকের কোলকাতায় বা বাঙলায় বাবু। এবং এদের একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্থান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল-ভেদ সত্ত্বেও সে সংজ্ঞা তাৎপর্যে ও স্বভাব নিরূপণে আজো অভিন্ন ও সুপ্রযোজ্য। 'যাহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে—নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু। ঢাকায় আপনারা বাবু দেখেন না বটে, কিন্তু ভদ্রলোক তো দেখেন, চেনেন ও জানেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিশ্বের এক অনন্য, অসামান্য এবং বিস্ময়কর শক্তিধর পুরুষ। আঠারো-উনিশ শতকের য়ুরোপে গ্যাটে, টলস্টয় প্রমুখ কয়েকজন অতুল্য শক্তির বিশিষ্ট কবি-মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। এঁরা সাহিত্যের স্ব স্ব সেব্য শাখায় নতুন ভাব-চিন্তা নয় শুধু, অঙ্গে ও অন্তরেও নতুন কিছু যোগ করে স্ব বৈশিষ্ট্যে ও স্ব শক্তির স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ফলে য়ুরোপীয় সাহিত্য উনিশ শতকে অঙ্গে-অন্তরে, ভাষায়-ভঙ্গিতে, মননে-চিন্তনে, জগৎচেতনায় ও জীবনদৃষ্টিতে নতুন মত, পথ ও সিদ্ধান্ত সংযোজন করেছেন। মানুষের মন-বুদ্ধি-জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার-মনস্বিতার, পরিসর পেয়েছে বিস্তৃতি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অঙ্গে ও অন্তরে নতুন কিছু যোগ করেননি, তিনি সুনিপুণভাবে য়ুরোপীয় শিল্পতত্ত্ব, শৈলী সৌন্দর্য, মনন, চিন্তন, আত্মীকৃত করে অসামান্য শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এখানেই শেষ নয়। য়ুরোপীয় অতুল্য মনীষার লেখকগণ সাহিত্যের এক বা একাধিক শাখায় তাঁদের কৃতি-কীর্তি সীমিত রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সর্বশাখা তাঁর অতুল্য অবদানে ঋদ্ধ করে গেছেন। কাব্যে-নাটকে-গল্পে-উপন্যাসে-রম্যরচনায়-পত্রসাহিত্যে, ছড়ায়-চিত্রে সর্বত্র গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় অসামান্য-অতুল্য অবদান রেখেছেন। অঙ্গে-অন্তরে মৌলিক নয়, অথচ মৌলিক, নতুন ও বিস্ময়কর অনুভব- উপলব্ধির-মনীষার প্রভায় পাঠককে রাখে অভিভূত। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন জগৎ ও জীবন, দেশ ও কাল, সমাজ ও রাষ্ট্র, সমস্যা ও সঙ্কট সম্বন্ধেও ছিলেন সচেতন। তাঁর সমকালীন মানুষের আর্থিক, শৈক্ষিক এবং রাজনীতিক সমস্যা-সঙ্কট সম্বন্ধেও তাঁর নিজের বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র মত-পথ ও সিদ্ধান্ত ছিল। বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-কোন লেখা সুখপাঠ্য। কারণ তাতে রবীন্দ্র রচনার বহুল উদ্ধৃতি থাকে। ঐ উদ্ধৃতিই পাঠককে আকৃষ্ট রাখে'। ভাষার ধ্বনিমাধুর্য, ভঙ্গির লাবণ্য, মননের অনন্যতা, সূক্ষ্ম অনুভবের, গভীর উপলব্ধির চমক এবং উপমাদির সৌন্দর্য রবীন্দ্র রচনার মুখ্য আকর্ষণ।

বালক বয়সে শুনেছিলাম গাছের মধ্যে নারকেল গাছ হচ্ছে অতুল্য। এর উপযোগও অনন্য। এর পাতা, ফল, ছোবড়া, মালা, গুঁড়ি ও শেকড় সব কিছুই মানুষের কাজে লাগে। কিছুই ফেলবার থাকে না। রবীন্দ্রসাহিত্যও আমাদের সেই নারকেল গাছ। চির-প্রয়োগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও চির প্রয়োজনের সাহিত্য-মনের অফুরন্ত খোরাক। কেবল রবীন্দ্র রচনা উল্টে-পাল্টে পড়েও সানন্দ জীবন যাপন সম্ভব। প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব সমস্যা-সঙ্কট-অভাব-শোক-যন্ত্রণা ভুলে থাকা কঠিন হয় না। রবীন্দ্রসাহিত্য ব্যক্তি মানুষের নিরানন্দ, নিরাশ, নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় জীবনের-প্রাণের-মনের আবশ্যিক অবলম্বন।

কিন্তু আজকের পৃথিবীর আর্থিক, শৈক্ষিক, নৈতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক জীবনে রবীন্দ্র সাহিত্যের মানসপ্রভাব আমাদের কল্যাণকর না হওয়ারই কথা। কেননা দাসত্বের ও আনুগত্যের যুগ, শাহ-সামন্ত বুর্জোয়ার প্রভাব আর শাস্ত্রমানা মানুষের লৌকিক-অলৌকিক ও অলীক জীবন-চেতনা আজকের বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, গ্রহলোকজ্ঞানী ও বিহারী চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্রমুখ কারণ-কার্য সচেতন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যা-সঙ্কট-সন্ত্রাস মোচনে সমর্থন নয়। কেননা ভাববাদের যুগ অবসিত। এখন জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য ন্যায় বা আইনকানুন প্রয়োগেই ব্যক্তি মানুষের সত্তার মূল্য, মর্যাদা, স্বাধীনতা, স্বাধিকার রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য কেবল সরকারের নয়, শিক্ষিত, স্বশিক্ষিত, সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিমান, বিবেকবান মানুষ ও সমাজ মাত্রেরই। আবেগের কাল অপগত। আমাদের যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনই কাম্য। Rationalism-ই যুগধর্ম। উপযোগই আমাদের বিবেচ্য। সাহিত্যে, দর্শনে, সমাজে, বিজ্ঞানে আমরা তাই কেবল নারকেল গাছ চাই।

AMARBOI.COM

অনক্ষরতাদুষ্ট দেশে গণতন্ত্র

হোলি রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় যুগে রাজারা গির্জার আনুগত্য লঙ্ঘনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার বাসনায় উদ্দীপ্ত হতে থাকে। আমরা জানি কোন ঈহা বা কাঙ্ক্ষা যেমন দৃশ্য নয়, তেমনি সমস্যা-সঙ্কটের উদ্ভবও দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, হয় অনুভূত ও অস্পষ্টভাবে উপলব্ধ। গির্জা বনাম শাহ-সামন্ত, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশ প্রকাশ্য ও রাজাদের গির্জার প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারের পর্যায়ে নেমে এল। পনেরো শতকের দিকে আবার য়ূরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজাত দারিদ্র্য ও বেকারত্বও প্রায় অসমাধ্য হয়ে উঠতে থাকে। আবার এ পনেরো শতকের শেষ দশকের গোড়ার দিকে স্পেন, পোর্তুগাল, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমদের বিতাড়িত করে স্বাধীন হয়ে গেল এবং স্পেনরাজের উদ্যোগেই কলম্বাস ভারতের জলপথ আবিষ্কারে করলেন যাত্রা। জনবহুল দরিদ্র য়ূরোপে জাগল অর্থ-সম্পদে ঋদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন ও সাধ।

'ঘর না ছাড়লে ভাগ্য ফেরে না'-- এ তত্ত্ব ও আপ্তবাক্য অঙ্গীকার করেই তারা অকূল সমুদ্রের দিকে দিকে পাড়ি দিল, অবশেষে পরম সাফল্যে বিশ্বের সর্বত্র পাড়ি জমাল তারা। জানাঅজানা গোটা দুনিয়া থেকে তারা বাণিজ্যের নামে অর্থ-সম্পদ, মাল-মাত্তা, ফল-মূল-ফসল নিয়ে এল য়ূরোপে, গির্জা-শাহ-সামন্ত শাসিত-শোষিত-হুমকি-হামলা জর্জরিত য়ূরোপীয় সমাজে প্রায় সর্বত্র গড়ে উঠল বিদ্যায় বিত্তে একটা ধনী-মানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং খ্যাতি-ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকামী উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ। ওরা গির্জা-শাহ-সামন্তদের দাসত্বে ও আনুগত্যে অনীহ। কেননা তারা স্বসত্তার মূল্য ও মর্যাদা সচেতন, সত্তার সমাজে স্বাধীনতা, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। এখানে নতুনে ও পুরাতনে, খানদানে ও ভুঁইফোঁড়ে, সম্রাটে ও শ্রেষ্ঠীত্বে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল প্রায় দ্রোহের আকারে। ফলে লগ্নিপুঁজি ও বাণিজ্যপুঁজিপতিদের 'গিল্ড' হল তৈরী, স্বীকৃত ও শক্তিশালী। এরাও শাসনে-প্রশাসনে, নেতৃত্বে, খ্যাতিতে ক্ষমতায় মানে-যশে শাহ-সামন্ত-পাদরীদের স্বৈরশক্তির অংশভাক হবার দাবিদার হল। এবং তারাও তাদের বখরা ক্রমশ আদায় করে ছাড়ল। এর নামই হল সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, সংসদ ও সংসদনিয়ন্ত্রিত রাজার রাজত্ব। আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তি-উত্তরকালে এবং য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লবের পরোক্ষ পরিণামে রাজাবিহীন 'গণতন্ত্র'ও চালু হতে থাকল। বিশ শতকে হল যার ক্রমিক কিন্তু দ্রুত পূর্ণ বিকাশ। এই মহাযুদ্ধ অবশ্য এ দ্রুততার ও সাফল্যের প্রায় প্রত্যক্ষ কারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধেছিল মুসোলিনীর-হিটলারের কলোনী বানানোর, কাড়ারও বাড়ানোর লক্ষ্যে। হৃতবল য়ুরোপীয় শক্তিগুলো যুদ্ধে জয়ী হয়েও স্বাধীনতাকামী মানুষের দাবি-দ্রোহ ঠেকাতে অসমর্থ হয়ে রাজনীতিক স্বাধীনতা দিয়ে লগ্নিপুঁজির, বাণিজ্যপুঁজির ও শিল্পপুঁজির নিয়োগরূপ আর্থিক-বাণিজ্যক সাম্রাজ্য রক্ষায় হল কুশলী ও মনোযোগী। রইল সতর্ক সযত্ন প্রয়াসী লুণ্ঠের ও শোষণের নতুন পদ্ধতি-ঋণ-দান-ত্রাণ বা শিল্প পুঁজি বিনিয়োগে। এর নাম অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক শিল্পপুঁজির সাম্রাজ্যবাদ।

কলোনীতে সার্বভৌম রাজা ছিলেন না। কাজেই উপনিবেশ স্বাধীন হয়েই স্বদেশে, য়ুরোপীয় আদলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী হল। যদিও এক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ছিল না, কেননা তাদের শতে, হাজারে, দু'চারজন মাত্র ছিল ঠিক শিক্ষিত নয় সাক্ষর মাত্র অর্থাৎ লেখাপড়া জানা যে স্বল্পসংখ্যক লোক ছিল তারাও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন লোক ছিল না। ক্বচিৎ দৃষ্ট ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। তবে সাধারণভাবে অন্য অজ্ঞ অনক্ষর সাক্ষর শিক্ষিতরা ছিল বিশ্বাস-সংস্কারচালিত, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে ছিল অনভ্যস্ত-অসমর্থ।

বাঙলাদেশে বিশেষ করে কেবল অজ্ঞ অনক্ষর নয়, সাধারণভাবে প্রায় সবাই ছিল নিঃস্ব, নিরন্ন কুলি-মজুর, মাঝি-মাল্লা-শ্রমিক-মিনতি এবং ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবী। সচ্ছল চাষীর সংখ্যাও ছিল নগণ্য। জোতদার জমিদার-হাওলাদার ছিল করগণ্য। কাজেই স্বাধীনতা উত্তরকালে নতুন শূন্যতার সুযোগে লুটে-ভেজালে-আড়তদারিতে-চোরাকারবারে, উৎপাদনে, নির্মাণে, ঠিকেদারীতে, ব্রিফকেস ব্যবসায়ে, ঠকাঠকির কারবারে স্ফীত হয়ে ওঠে একটা শ্রেণী গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে। তারাই অর্থ-সম্পদে ঋদ্ধ হয়ে রাজার মতো মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতালিপ্সু হয়ে রাজনীতিতে নামে। এর মধ্যে কোন রাজনীতিক সংস্কৃতিচর্চা, আদর্শবাদ, জনহিতৈষণা, ব্যক্তিসত্তার বা আত্মার, বিবেকের সম্মানবোধ ছিল না কারো মধ্যে। ব্যতিক্রম ছিলই তবে তা আলোচ্য নয় এ কারণে যে তাদের সমাজ-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না। বেহায়া-বেশরম-বেলেহাজ হয়ে এরা কেবল ঠেলাঠেলি, মারামারি, কাড়াকাড়ি, হানাহানি, কিংবা তোয়াজে-তোষামোদে স্তাবকতায় চাটুকারিতায়, পদলেহিতায়, আত্মোন্নয়নে প্রয়াসী হয়। কাজেই এমনি মানুষের গণতন্ত্র বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতান্ত্রিক প্রশাসন সুষ্ঠু ও সৎপথে চলতেই পারে না। লোকে হৈ চৈ করে অসন্তোষ প্রকাশ করে, সভা-মিছিল করে। মেঠো বক্তৃতা, কাগুজে বিবৃতি ছাড়ে, মিছিলও করে, করে হরতাল। সুযোগ ঘনঘন গ্রহণ করে সেনানী নায়ক। সেনানী শাসক দুর্নীতি-দুঃশাসন সঙ্কুল এবং দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতিবহুল। কিন্তু ভীতজনগণ মুখ খুলতে সাহস পায় না। সেনানীরা দেশের অর্থসম্পদ নানা পথে ও পদ্ধতিতে আত্মসাৎ করে। মেঘ-ভাঙা রোদের মতো আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্র মাঝে মধ্যে কয়েক মাস চলে, আবার সেনানী শাসকের কবলিত হয়। কেননা দেশকে দুঃশাসনমুক্ত করা, বিপন্ন স্বাধীনতা রক্ষা করা তাদেরই একচেটে দায়িত্ব। যদিও তারাও পুলিশের বা অন্য আমলার মতোই বেতনভুক সরকারী হুকুমমানা চাকুরেমাত্র। 'বন্দুকের নল হল ক্ষমতার উৎস' ওরা বন্দুকধারী, কাজেই জবাবদিহির দায়িত্ব থাকেনা ওদের। জিজ্ঞাসার সাহসও থাকে না জনগণের। ১৯৯১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমাদের দেশে নির্বাচনযোগে নতুন গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। কিন্তু গণপ্রতিনিধিত্ব করবেন যাঁরা তাঁদের কয়জন রাজনীতিক, সংস্কৃতিমান লোকহিতৈষণাব্রতী মানবিকতার ও মানবতার অনুরাগী, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিবাদী-বিবেকবান, দেশপ্রেমী ও লোকসেবী পরার্থপর? এরাও তো এক প্রজন্মের শিক্ষিত, ধনী, মানী, খ্যাতি ও ক্ষমতাবান। অপরের স্বাধিকারে স্বাধীনতায় আস্থাবান, সহিষ্ণুতায়, সংযমে সৌজন্যে সংস্কৃতিমান, আত্মার ও সত্তার মর্যাদা সচেতন না হলে কেউ ভালো সাংসদ বা জনপ্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য হয় না। আমরা এমনি মানুষ পাব কি? পাওয়ার শৈক্ষিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরী হয়েছে কি?

AMARBOI.COM

সহস্র ফুল ফুটুক

উদ্যানে বা প্রান্তরে যদি একটি মাত্র সপুষ্পতরু বা লতা থাকে, তা যতই অনন্য রূপের হোক না কেন, তাকে কখনো বাগান বলা যাবে না। আর কোন তরুলতা বহুল উদ্যানে যদি কোন মৌসুমে বা কারণে একটি ফোটাফুলও না থাকে, তা হলেও তাকে বলব বাগান। কাজেই কোন একক ব্যক্তিত্বে একক বৃক্ষে, একক কবিতে বা কাব্যে, একক দালানে, একক দোকানে, সমাজ, উদ্যান, সাহিত্য, শহর কিংবা বাজার গড়ে ওঠে না। তেমনি রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি, নাট্যকার, গাল্পিক, ঔপন্যাসিক, ছড়াকার, প্রবন্ধকার, চিন্তক, দার্শনিক হোন না কেন, কেবল তাঁকে দিয়ে বাঙলাভাষা-রূপ প্রান্তরে বিচিত্র, বিবিধ ও বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ উদ্যান, ভাণ্ডার বা জগৎ গড়ে উঠত না। রবীন্দ্র ভাববিম্ব অনুভবের প্রসারে, উপলব্ধিতে ব্যাপ্তিতে বিরাট বেলুনের কিংবা প্যারাসুটের গভীরতা, বিস্তার পেলেও একক ব্যক্তির লেখায় জীবনানুভূতির, উপলব্ধির ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য মেলে না। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গান এতো গভীর-মধুর ও ব্যাপক ভাবোদ্দীপক যে, সে-ভাবের রেশ, লেশ বা অনুকরণ তিলে তিলে নতুন চেতনার, অনুভবের ও উপলব্ধির উন্মেষ ঘটায়। তবু রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে না তেমন লোক দেশে দুর্লভ নয়। ভালো-মন্দ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝারি এমন কি রাবিশ রচনাও ভাষা-সাহিত্যের পরিসর পরিধি বিস্তৃত করে। সুরুচির সংস্কৃতির শ্রেয়োবাদী লোকের ক্ষোভ-ক্রোধ-উত্তেজনা, হিংসা-ঘৃণাও অনেক সময়ে রাবিশ-বিরোধী বা প্রতিবাদী প্রতিরোধী ভালো সাহিত্য সৃষ্টির কারণ হয়। তাছাড়া ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ তো রয়েইছে। একযুগের শ্রেষ্ঠ গান-সুর-তাল-লয়-অন্যযুগে আকর্ষণ হারায়। আর মহৎ ভাবের ও চিন্তার তত্ত্বের ও তথ্যের সত্য, প্রবাদ, প্রবচন বা আপ্তবাক্য কেবল আড্ডায়, মজলিশে, সভায়, বক্তৃতায় কিংবা লেখায় ও পাঠ্যবইয়ে উচ্চারিত, আলোচিত, লিপিবদ্ধ হয়ে চিরনন্তনতা ও সর্বজনীন স্বীকৃতি পায় বটে, কিন্তু বাস্তবে কারো ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে কৃচিৎ কোথাও কোন কালে কোন ব্যক্তিবিশেষে কিংবা বিবাগী-বিরাগী-সাধু-সন্ত-শ্রমণ-শ্রাবক-ফকির-দরবেশে মেলে বটে, সামাজিক রাষ্ট্রিক-আর্থিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাত্যহিকায় তার রূপায়ণ দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য, বিরলতায় অলক্ষ্য বা অদৃশ্য। যত মন তত মত তত পথ, তত দৃষ্টি, তত অনুভব-উপলব্ধিও। প্রমাণ 'তাজমহল' বিষয়ক বিভিন্ন ভাষায় লিখিত নানা কবির বিচিত্র ও বিবিধ ভাব-চিন্তা-দৃষ্টির-অভিব্যক্তি। মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে চিন্তায়-চেতনায়, লাভে-লোভে, স্পৃহায়, লিপ্সায় নিতান্ত বাস্তবজীবনের চাহিদাপ্রবণ এবং তাই স্থূল ও স্বার্থসচেতন। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক নিয়ন্ত্রিত নয়, বৃত্তি-প্রবৃত্তি বিশ্বাস-সংস্কার-আবেগ-উদ্বেগ উৎকণ্ঠা-আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশাচালিত। কাজেই সূক্ষ্মতার চেয়ে স্থূলতায় বা বাস্তবতায়, প্রত্যক্ষতায় ও দৃশ্যতায় তার আগ্রহ। তার অনুভূতি স্থূল, উপলব্ধিও সূক্ষ্ম নয়, বুদ্ধিও মোটা, রুচিও অপরিমার্জিত। তাই মানুষ যে-কোন ভালো-মন্দ মাঝারিতেও পায় মনের খোরাক, আনন্দ, সুখ, মাধুর্য মনে প্রাণে আরাম। যেমন রবীন্দ্রনাথের অমন উঁচু সূক্ষ্ম অনুভব-উপলব্ধির অবাধ উদার আকাশচারী বা অরূপ জগৎবিহারী গান যেমন ভালো লাগে, তেমনি ভালো লাগে নজরুল ইসলামের ফুটি-কুমড়ো-তরমুজ লতার মতো মাটিমগ্ন শারীর রূপ-রস-প্রেমের গান, আবার দ্বিজেন্দ্রগীতি, রজনীকান্তের গান, বা অতুল প্রসাদের গানেরও রয়েছে অনেক সমঝদার, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তগীতি, বাউলগানও দেখেছি অনেককে মাতিয়ে তোলে, যেমন হামদ-নাত-কাওয়ালী কিংবা মার্গসঙ্গীত রসিকও মানুষকে আনন্দে অভিভূত রাখে। রবীন্দ্রনাথের, সুকুমার রায়ের বা অন্নদাশঙ্করের ছড়ার ভাব-ভাষা-সুর-রস যেমন গুণে মানে মাপে মাত্রায় ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র শেষবয়সে একবার বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন— মুদ্রণযন্ত্রের বদৌলতে গ্রন্থের নামে যত সব অপাঠ্য বই বের হচ্ছে। আমরা কিন্তু সবার সব রচনার প্রকাশের পক্ষে। কারণ আমরা জানি তরু-লতার পুরোনো পাতা পাকে, শুকায়, ঝরে এবং বর্ষাকালে পচেও। এবং তা পরিণামে 'সার' হয়ে জমি করে উর্বর আর তরুলতা করে স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে আকর্ষণীয়, ফুল-ফল-ফসলও করে পুষ্ট ও বহু।

কাজেই কবি-অকবির, লেখক-বাজে লেখকের সংখ্যা বাড়ুক এতেও আমাদের মানস ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে-পরিবেশে স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকটিত হবে। কেননা, যতই অক্ষম-অবিদ্বান হোক না কেন একজন কবি-লেখক সাধ্যমতো আত্মশক্তি বৃদ্ধির, চিন্তার, চেতনার এবং নিজের লেখার রূপ, রস, ভঙ্গি-ভাষা, বক্তব্য ও বিষয় পরিশীলিত ও উন্নত করার চেষ্টা করেই। তাতে বহু রাবিশের মধ্যে— কয়লাখনির মধ্যে যেমন হীরের টুকরো মেলে-আকস্মিক ভাবে একটা ভালো লেখা-কেজোকথা, সূক্ষ্ম ও প্রয়োজনীয় চিন্তা অভিব্যক্তি পেতে পারে। সাহিত্য জগতের পরিসর-পরিধি উদ্যানের মতো, বিচিত্র ও বিবিধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুলতা বহুল অরণ্যের মতো, সবটারই উপযোগ থাকে কারো না কারো কাছে, লাগে কারো না কারো প্রয়োজনে ভেষজের মতোই। কাজেই ক্ষুদ্র, বৃহৎ সুন্দর, কুৎসিত সুগন্ধ, দুর্গন্ধ কুসুম, কিংবা পাতাবাহার অথবা ফণীমনসাই হোক, আম-জাম-বট-মাকাল যে গাছই হোক, থাকা চাই, কারণ ভিন্নতায়, বহুলতায় ও বিচিত্রতায় রয়েছে শোভা সৌন্দর্য ও সম্পদের বাহুল্য। এর মধ্যেই মানুষের মনের, মতের, মন্তব্যের, সিদ্ধান্তের, জগৎ-চেতনার, জীবনভাবনার অশেষ অপরিমেয়, ও বিচিত্র প্রকাশ-বিকাশ ঘটছে অহরহ, ঘটবে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, মনন-ভাব-অনুভব-উপলব্ধি কালে কালে দেশে দেশে এভাবেই এগুচ্ছে। মানুষ বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য স্তর ক্রমে অতিক্রম করে মানবিক শক্তির ও মানবতার বিস্ময়কর ক্রমবিকাশ, বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে, ঘটাবে।

ভদ্রলোক ও ভালোমানুষ

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ভদ্রক বা ভদ্র ও ভালো একার্থক। কিন্তু এখন তা অভিন্নার্থক, এমনকি সমার্থকও নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। এ যুগে সাক্ষরতার প্রসারে পৃথিবীর সব মানুষই দ্রুত ভদ্রলোক হয়ে উঠবে। মুচি-মেথর-জেলে-হাড়ি-ডোম-বাগদী-চাঁড়াল সবাই হবে সাফ-কাপুড়ে, সাক্ষর ও ভদ্রলোক। এ পেশাগুলো তাই বলে দুনিয়া থেকে উঠে যাবে না, কিন্তু বৃত্তিগুলোর মূল্য ও মর্যাদা বাড়বে, প্রযুক্ত হবে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র। 'তুই' 'তুমি' প্রভৃতি সম্বোধন লোপ পাবে। আপনিই থাকবে চালু। বিনয় ও সৌজন্য আচরণে প্রকট হয়ে উঠবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন ঋদ্ধ এ যন্ত্র-প্রকৌশলী-প্রযুক্তির বিকাশ-বিস্তার যুগে একে মানবিকতার ও মানবতার প্রসার ও উৎকর্ষ বলেও অভিহিত করা চলে।

কিন্তু ভদ্রলোক মাত্রই ভালোমানুষ ছিল না কখনো, হয়নি এবং হবেও না কখনো। কেননা বৃত্তি-প্রবৃত্তি প্রশমনের প্রয়াস-প্রযত্ন কখনো সবাই করবে না। দুষ্ট, দুর্জন-দুর্বৃত্ত, দুষ্কৃতী-লিপ্সু অসংযত, অনধিকার চর্চাকারী মানুষ থাকবেই। কাজেই কপটতা, প্রতারণা প্রবঞ্চনা, শোষণ, লুণ্ঠনলিপ্সা, চোরা-গোপ্তা পথে আত্মোন্নয়নের স্পৃহা মানুষের মধ্যে থাকবেই। ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বও থাকবে। কাজেই ভদ্রলোক শব্দটা যোগরূঢ় হয়ে কেবল 'স্বসত্তার প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যসচেতন, দাসত্ব ও আনুগত্য দ্রোহী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষণে সযত্নপ্রয়াসী' অর্থ নির্দেশক হয়েই ব্যবহৃত হবে। ভদ্রলোকের মধ্যে যে প্রত্যাশিত মানের, মাপের ও মাত্রার মানবিকগুণ থাকবে বা থাকতেই হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

আদি কালে ভালোমানুষ ছিলেন বর্ধমানমহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ, যাঁরা মশা মাছি-কীট-পতঙ্গ, ছারপোকা-তেলাপোকা থেকে হাতী-তিমি অবধি সব প্রাণীর পৃথিবীতে বেঁচে বর্তে থাকার, স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার অধিকার স্বীকার করেছেন। সর্বজীবের প্রতি কৃপা-করুণা এবং সর্বমানবে মৈত্র কামী ছিলেন এঁরা। যিশুখ্রীস্টও ছিলেন হিংসা ও হননবিরোধী। আমরা আজকাল ভালোমানুষ বলতে নির্বোধ, স্বল্পবুদ্ধি, সরল ভীরু-নিরীহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং লাঞ্ছনা সহ্য করার অপরিসীম সামর্থ্য সম্পন্ন মানুষই মনে করি। এ হচ্ছে একপ্রকার অনুকম্পা কিংবা অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্য জ্ঞাপক সংজ্ঞা।

আবার সততায়, আদর্শবানতায়, ন্যায়পরায়ণতায় স্বাধিকারে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের আনুগত্যে, সৌজন্যসীমায় সংযত ও নিরীহ, নির্লোভ এবং সাধ্যমতো কৃপা-করুণা প্রবণ পরার্থপর মানুষকে আমরা ভালোমানুষ বলিনে, বলি বিশিষ্ট চরিত্রের, আচারের ও আচরণের শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। যা মূলত কেবল সমাজসদস্যের বাঞ্ছিতমানের, প্রত্যাশিত মানের, মাপের, মাত্রার গুণমাত্র। এরই অন্য নাম সংস্কৃতি। সংস্কৃতির অভিব্যক্তি ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের প্রায়োগিক ন্যায্যতায়, সুরুচিতে, সংযমে ও সৌজন্যে। আমাদের দুর্ভাগ্য ধড়িবাজ ভদ্রলোকের, নির্বোধ ভীরু ভালোমানুষের সংখ্যাই কেবল বাড়ছে। বাঞ্ছিত ভদ্রলোক ও প্রত্যাশিত ভালো মানুষ দুর্লভ হয়ে উঠছে দারিদ্র্যদুষ্ট বাঙলাদেশে।

কলঙ্ক

AMARBOI.COM

'চাঁদেও কলঙ্ক আছে' লোকে পরম ঔদার্যে ক্ষমাসুন্দর মন নিয়ে একথা উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু আসলে মানুষ কৃতী ও কীর্তিমান প্রসিদ্ধ-প্রখ্যাত মানুষের সামান্যতম এবং একক কলঙ্কও প্রজন্মক্রমে স্মরণে রাখে, নিন্দায় ও অশ্রদ্ধা প্রকাশে মুখর হয়। ফলে ওই কলঙ্কিত জনের বংশধরেরা প্রজন্মপরম্পরায় লজ্জিত ও নতশির থাকে।

কোনপ্রকারের ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রতিপত্তিহীন মানুষ শত অপকর্ম অপরাধ করলেও তার সন্তানদের-বংশধরদের লজ্জিত হতে হয় না। কেননা পিতা এমন সামান্য ও সাধারণ যে লোকে তাকে হিসেবে ধরে না। এমন নগণ্য মানুষের নাম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাম থেকে এমনকি পরিবার থেকে মুছে যায়। তার উল্লেখ্য কোন-কৃতী বা কথা থাকে না বলে তার মৃত্যুর পরে তার নিজের ঘরেও সে আলোচ্য হয় না। কাজেই অপরাধ-অপকর্মের জন্যে তার কোন নিন্দা-কলঙ্ক রটে না। তাই ঘুষখোর সামান্য বা বড় কৃতীহীন চাকুরের সন্তানদেরও লজ্জা দেয়ার লোক মেলে না সমাজে। বড় পদে বড় চাকুরে থেকে অসদুপায়ে অর্থ-সম্পদ অর্জন করলেও স্বল্পলোকের কাছে পরিচিত এ লোক সামাজিকভাবে আলোচিত বা নিন্দিত বা প্রশংসিত হয় না স্বকালের বৃহত্তর সমাজে পরিচিত নয় বা অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তি বলেই। কাজেই বেণে-ফড়ে-দালাল-গোমস্তা-দেওয়ান-দারোগা-করনিক-জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা দুর্নীতিবাজ হয়েও স্বল্প পরিচিত অপরিচিত ও পরে কিছু কালের মধ্যেই এমনকি দীর্ঘজীবী হলে জীবিতাবস্থায়ও বিস্মৃতির অনস্তিত্বে বিলীন হয়ে যায়। তাদেরও নিন্দা-কলঙ্ক রটে না, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা শঠতা কটতা মিথ্যাভাষণ জালিয়াতি প্রভৃতি নানা অপরাধ-অপকর্ম করেছে। এমনকি আমাদের রাষ্ট্রে যে-সব চাকুরে, মন্ত্রী বা উপদেষ্টা রূপে ভিন্ন ভিন্ন নীতির, মতের ও পথের স্বৈরশাসকের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনানীনায়কের পায়রবি করেছেন বারবার, তাদেরও কেউ কোন হিসেবে ধরে না, তাই নিন্দা-কলঙ্ক উচ্চারণ করার গাল-মন্দ বলার লোক মেলে না সমাজে, নাম শোনা থাকলেও তারা অশ্রদ্ধেয় অবজ্ঞেয় তা তাচ্ছিল্যের পাত্ররূপেই সমাজে বাস করে। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ সরকারের স্তাবক-সমর্থক খান ও রায় সাহেব বা বাহাদুর, স্যার প্রভৃতির নির্লজ্জ বংশধরেরা আজো সগৌরবের ও সগর্বে ওই সরকারের পদসেবী পূর্বপুরুষের পরিচয় দিয়ে নিজেদের খানদানী ও ধন্য মনে করে। গোলামী, গণবিচ্ছিন্নতা আর দেশদ্রোহিতাও এভাবে গৌরবের হয়, হত, ভবিষ্যতেও হবে। আজো স্বৈর ও সেনানী সরকার ঘেঁষা ও সরকার সেবক-সমর্থকরা সমাজে উচ্চ মানের ও মাপের মানুষ! গণঘৃণাকে তারা গুরুত্ব দেয় না।

কিন্তু সমাজে যে-সব ব্যক্তি জীবনের ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে গুণী জ্ঞানী মনীষী, মনস্বী, কবি লেখক, দানে দাক্ষিণ্যে, শিক্ষা বিস্তারে, জনসেবায়, লোকপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ এবং দার্শনিক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিকনেতা, সমাজপতি, বিদ্বান শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, নীতিশাস্ত্রী, কৃতী ও বিশ্রুত কীর্তিমান মানুষ, তাঁদের কাছে লোকে তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের, আদর্শের নীতির, নিয়মের জীবনব্যাপী সঙ্গতি-সামঞ্জস্য প্রত্যাশা করে। তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে নিষ্ঠার ও সঙ্গতির অভাব দেখলে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়, নিন্দা অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা প্রকাশেও হয় মুখর। তাঁদের কর্মে ও আচরণে সুবিধেবাদ ও সুযোগ সন্ধান অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, ঘৃণ্য অপকর্ম-অপরাধ বলে মনে করি। এক ফোঁটা চোনা যেমন এককলস দুধ নষ্ট করে, তেমনি তাঁদেরও একটা স্বার্থসম্পৃক্ত দুর্বলতা বা কর্ম তাঁদের সারাজীবনের নীতি-আদর্শনিষ্ঠার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞা জাগায়। এ জন্যে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগ লিপ্সামুক্ত হয়ে সবকর্মের সঙ্গে যে-কোন ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, শাস্ত্রিক, নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক বিষয়ে কথায় ও কাজে ধীরবুদ্ধিতে-স্থিরবিশ্বাসে সতর্ক-সযত্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সমাজে সর্বজনমান্য ও স্বীকৃত মহৎ ও গুণী ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব হওয়া তাই সহজ নয়।

এমনকি, পরিবারে শাস্ত্রে সমাজে রাষ্ট্রে এমন কিছু কাজ ও আচরণ আছে, যা সর্বজন স্বীকৃত ও মান্য পবিত্র বা বাঞ্ছিত কাজ ও আচরণ বলে পরিচিত। এ কাজে ও আচরণে অবহেলা কেউ ক্ষমা করে না, সহানুভূতিও পায় না কারো। যদিও এমনি আচরণ ও কাজ নিতান্ত প্রাণীপ্রজাতি রক্ত-মাংসের মানুষের সর্বদা ও সর্বত্র দৃশ্যমান। শাস্ত্রকে ও সমাজকে যদি আমরা ছাদ মনে করি, তাহলে কয়েকটি বিশেষ পবিত্র কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আমরা মনে করি সুদৃঢ় অভঙ্গুর পাথুরে স্তম্ভ। যেমন মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে বা সিনেমা হলে যদি কেউ দেখে তাহলে সে-মুহূর্তেই সে-লোক ওই কাজে অযোগ্য চরম-ঘৃণ্য ব্যক্তি হয়ে যাবে। মন্দিরের পুরুত-পূজারী যদি পড়ে লাম্পট্যে ধরা—তারও যাবে চাকরি ব্রতভ্রষ্ট পামর বলে, পীর-ফকির-দরবেশ-সাধু-সন্ত-শ্রবণ-শ্রাবক রাব্বী পাদরীরাও ক্ষণিকের মানবিক দুর্বলতার দরুন সামান্য স্খলনে চিরঘৃণ্য হয়ে কলঙ্কিত জীবনে লাঞ্ছিত জীবন যাপন করে। এমনি জ্ঞানী-গুণী-কবি-লেখক-রাজনীতিক নেতা, সমাজ সংস্কারক বা শাস্ত্রী ইতিহাসধৃত কলঙ্ক মোচনে নিরুপায় হয়ে কলঙ্ক বহন করেন চিরকাল। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি উমাপতিধর নতুন রাজার কৃপা-দাক্ষিণ্যলাভে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর প্রশস্তি রচনা করে কেবল-আত্ম অবমাননা নয়, বাঙালী জাতির সম্মান বিনষ্ট করে কলঙ্কিত হয়েছেন। আলিবর্দী-মীরজাফর-মীর কাসিমের প্রভুরও আত্মীয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হওয়া উচিত হয়নি। তেমনি উচিত হয়নি জার্মানবিজয়ী নেপোলিয়নের সঙ্গে গ্যায়টের জুটে যাওয়া। তেমনি নিন্দনীয় কবি গালেবের ইংরেজের কলেজে চাকুরে হতে যাওয়া। তেমনি ঘৃণ্য ভূমিকা ছিল মুঘল দরবারের নুন-নিমক খাওয়াবংশের সন্তান স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সিপাহী বিপ্লবের সময়ে ব্রিটিশ পক্ষে থাকা। এমনি লজ্জাকর ছিল রাজা রামমোহন রায়ের মা-বাবা-ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য পালনে অনীহা। অবজ্ঞেয় ছিল কেশবসেনের নীতিনিষ্ঠা বিসর্জন দিয়ে নাবালিকা কন্যাকে রাজঘরে বিয়ে দেয়া। স্বদেশীয় 'অবমাননায় ব্যথিত ক্ষুব্ধ প্রেমের অভিষেক' কবিতার কবি রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি গ্রহণ এবং মৃত্যুর কিছু আগে 'মাধ্যমিক শিক্ষাবিল প্রতিরোধ পত্রে' স্বাক্ষর দান উচিত ছিল না। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রও ১৮৯০ সনে বয়স বারো বছর পূর্তির পূর্বে স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ করার আবেদন পত্রে সই না দেয়ার ভীরুতা। এমনি শত উদাহরণ, উদ্ধার করা সম্ভব। তবে লিপ্সু লোকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তাই আজো স্বৈরসরকার ঘেঁষা, স্বেচ্ছাসেবী স্তাবক, চাটুকার, পদলেহী গুণী-জ্ঞানী-কবি-লেখক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিক সংখ্যায় অধিক।

AMARBOI.COM

জন্মদিনে স্মৃতি বুদ্বুদ

গত বছর আমার সত্তরতম জন্মদিনের উষাকালে মনে এক তথ্যের উদয় হয়েছিল এবং তা আমাকে প্রায় দু'দিন অভিভূত রেখেছিল। এ ছিল আনন্দানুভূতি। হঠাৎ মনে হয়েছিল বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। জীবনে কখনো অন্নাভাব হয়নি। করতে হয়নি কোন প্রকার কায়িকশ্রম, আমাদের দেশে যখন তিনভাগেরও বেশি লোক ভাত-কাপড়ের অনিশ্চিত জীবন-যাপন করে, তখন আমার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এ সুখ-সুবিধে-নিশ্চয়তা-আরাম-আনন্দের, স্বস্তি-সুখের গুরুত্ব অনুভব-উপলব্ধি করে, বিপন্মুক্তির স্বস্তি ও উল্লাস, আনন্দ ও আরাম গভীরভাবে উপভোগ করেছিলাম।

আগামীকাল আমার একাত্তরতম জন্মদিন। আজ মনে পড়ছে বাল্যের, কৈশোরের, যৌবনের, প্রৌঢ়ত্বের এবং অদূর অতীতের নানা কথা, কাজ ঘটনা, আচরণ প্রভৃতির টুকরো স্মৃতি। বাল্যে ঔচিত্যবোধে কোন কথা বলে অন্যের চোখ রাঙানির কবলে পড়েছি, ধমক খেয়েছি, তিরস্কৃতও হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে মারামারি করে অন্যের হাতে মার খেয়েছি, মেরেওছি মানে জয়ীও হয়েছি কখনো কখনো। খেলায় ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে গালাগাল খেয়েছি। প্রতিবাদ করা প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হয়নি সব সময়ে। আবেগচালিত হয়ে কোন কোন কথা বলে বা কাজ করে জীবনে কয়েকবার জব্দও হয়েছি। সহপাঠী দু'একজনের সঙ্গে আসক্তি, অনুরাগ জন্মেছিল, কিন্তু সাড়া মেলেনি। তবু কাউকে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে বন্ধু, সাথী, সহচর রূপে পেয়েছি। অন্তরঙ্গতা কিন্তু বেশিদিন বা দু'তিন বছরের বেশি টেকেনি। বাহ্যত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী থেকেছে, অন্তরে কবে যে পর হয়ে গেছে বোঝাও যায়নি। পরিবারে নতুন প্রজন্মের প্রথম সন্তান হলে রীতি-রেওয়াজ মতো কিংবা স্বাভাবিকভাবেই আদর-সোহাগ পায় আত্মীয়-স্বজন-পরিজন-পরিচিত জনের। আমাদের সে-সৌভাগ্য হয়নি। তবু আমি আমার অপুত্রক চাচার ও অপুত্রক ফুফুর আদরে সোহাগে-অন্নে-পোষণে-পালনে-লালনে আমাদের সহোদর ও চাচাতো এগারো ভাইদের মধ্যে অনন্য ও অতুল্য সুযোগ-সুবিধে পেয়েছি। ভালো খাদ্যে, পোশাকে, মৌসুমী ফল-মূল-পিঠে প্রভৃতির সংখ্যায় ও মাত্রায় অধিক ভোগে-উপভোগে।

তবু জীবনের চাওয়ায় ও পাওয়ায় ছিল ব্যবধানের অলঙ্ঘ্য-দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল। সব চাওয়া পাওয়াতে বাস্তবায়িত হয়নি। এখন মনে হয় যদি জীবন নতুন করে শুরু করা যেত, নিখাদ নিখুঁত করে সতর্ক সযত্ন প্রয়াসে প্রয়োগে বুঝে সুঝে কথা ও কাজ করা যেত! কেবল জয়, সাফল্য, সুখ, আনন্দ, আরাম, বিদ্যা-বিত্ত-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-শ্রদ্ধা অনুরাগ প্রভৃতি মানবকাম্য সবকিছু অবিচ্ছেদ্য অবিচ্ছিন্ন ও নির্বিঘ্নভাবে পাওয়া যেত! এ আফসোসই মানব জীবনের স্বপ্নের, সাধের ট্র্যাজেডি। ছাত্র হিসেবে ছিলাম মাঝারি, মেধা ছিল কি-না বুঝিনি, আজো জানা-বোঝা হয়নি। পরীক্ষার ফল ক্বচিৎ ভালো হয়েছে, সব সময়েই মাঝারি। কাজেই নিন্দা-অবজ্ঞা না পেলেও, তারিফ জোটেনি জীবনে, কাজেই সগর্বে ফল-মেড্যাল-বৃত্তির কাগজ দেখিয়ে গৌরব করতে পারিনি কখনো। তাই বলে, এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা বা স্পৃহা ছিল না বলেই হয়তো কখনো হীনমন্যতায় ভুগিনি। বাল্যকাল থেকেই কেন জানিনে তিনটে কাজ কখনো করিনি, এক, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-সাহায্য-সহায়তার জন্য কাউকে নিজ প্রয়োজনে নিজমুখে অনুরোধ করিনি-- শরম-সঙ্কোচ বশেই। প্রয়োজনে তথা ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হলেই যে-কারো সঙ্গেই প্রায়ই উদ্ধত ব্যবহার করেছি, ভয়ে-বিনয়ে-শ্রদ্ধায় চুপ করে থাকিনি। আর সবসময়ে আজো স্পষ্টভাবে প্রয়োজনে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করছি। যাকে স্বার্থবাজ, মিথ্যাবাদী, সংকীর্ণচিত্ত কপট বলে জানি, তার সম্বন্ধে অন্যের কাছে অসংকোচে গাল-মন্দ-নিন্দা উচ্চারণ করে মনের ক্ষোভ-ক্রোধ লাঘব করেছি। এখনো তা-ই করি। আমার সমকক্ষ বা আমার থেকে বড় বলে যাকে মনে করিনে তার সঙ্গে আমি দ্বেষ-দ্বন্দ্বে নামিনে। দয়া করে ক্ষমা করে, তাচ্ছিল্য করে ছেড়ে দিই। প্রতিশোধ নেয়ার বা ক্ষতি করার চেষ্টা করিনি কখনো তেমন লোকের। আমার আবাল্য একটা উপলব্ধি ছিল এই যে উপকার করার সামর্থ্য যখন আমার নেই, তখন কারো ক্ষতি করার অধিকারও আমার নেই। যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি, তখন থেকে আমি প্রাণী হত্যায় বিরত হই। কিছুদিন আত্মীয় বাড়িও যাইনি, পাছে ওরা আমার জন্যেই মোরগ কিংবা মাছ মারে এ আশঙ্কায়। আজো গায়ে বসলেই অর্থাৎ আমাকে আক্রমণ করলে মশা-মাছি-বিছা প্রভৃতি মারি অবশ্য। আমার আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে বলেই। তাই এতে অন্যায় দেখিনে। আর অন্যের নিহত করা প্রাণীর মাছ-মাংস খেতে গৌতমবুদ্ধের মতোই আমার আপত্তি ছিল না কখনো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পিতামহ দীর্ঘজীবী ছিলেন। নাম ছিল আইনউদ্দিন মুনশী (১৮৪০-১৯৩৭)। চট্টগ্রাম জেলার ধন-মান-বিদ্যা-বিত্ত-আভিজাত্য-সম্পন্নদের সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল অশেষ। তিনি সারাজেলার লোকের খবর রাখার চেষ্টা করতেন। কাদের খানদান আছে, কাদের নেই, কারা ভুঁইফোঁড় তা তিনি জানতেন। একটা প্রাচীন ছড়াও বলতেন। চট্টগ্রামের ১৮-১৯ শতকে মুসলিম সমাজে তখন 'সাতঘর কাজি, তেরোঘর ভূঁইয়াই ছিল খানদানী। আর সব টেঁইয়া আর টুঁইয়া।' মানে পরম্পরারিক্ত ভূঁইফোঁড় বা নবউত্থিত। তিনি এসব গল্প আমরা পড়তে বসলে আমাদের বলতেন। আমার দাদা ১৮৫৭ সন থেকে দেওয়ানী আদালতে নকলনবিশের কাজ করতেন। বিভিন্ন মুনসেফ আদালতে ও জজ আদালতে কাজ করেছেন বলে শিক্ষিত বিরল সেকালের সবলোকের পরিচয় জানতেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দুই বিলাসী ধনী লোক ছিলেন উনিশ শতকের চট্টগ্রামে; বাবুর মধ্যে বাবু হরচন্দ্র, আর মিয়ার মধ্যে ছিলেন মিয়া আনোয়ার। হরচন্দ্র ছিলেন নয়াপাড়ার, আর আনোয়ার ছিলেন হাওলা খরনদ্বীপের। দাদা আমাদের বিরাট অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরই উচ্চারণে ও আচরণে শুনেছি দেখেছি যে পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করতে হয়, প্রতিশোধে লাঞ্ছিত ক্ষতিগ্রস্ত করতে নেই। তাতে কেবল আত্মার ও বিবেকের অবমাননা হয়। আমি সারা জীবন মেনে চলেছি এ নীতি। চাকুরে জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব শিক্ষক প্রত্যাশিত মানের বিদ্বান ছিলেন না, ক্লাসও ফাঁকি দিতেন তাঁদের প্রতি ছিল আমার অবজ্ঞা। আমি ছাত্রাবস্থায় স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে একধরনের নেতা ছিলাম। তার কারণ অন্যদের কাছে আমার এক অপরিহার্য উপযোগ ছিল-- তা আমার হঠকারিতা, অবিমৃষ্যকারিতা, স্পষ্টবাদিতা ও অপরিণামদর্শিতাও নির্ভীকতা এবং সর্বোপরি ক্ষতি স্বীকারের শক্তি। কোন না-পাওয়ার বা ক্ষতির ক্ষোভ করিনি আমি জীবনে। সারা জীবনে আমি কখনো এ দোষমুক্ত হতে পারিনি। এ অভীকতার ও স্পষ্টবাদিতার দরুনই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল শিক্ষকের নেতা ছিলাম। যদিও কেউ কখনো বলতে পারবে না যে আমি কাউকে আমার দলে টানার চেষ্টা করেছি কিংবা উপাচার্যপদেরও যখন প্রার্থী হয়েছি তখনো কারো কাছে স্বকণ্ঠে ভোট ভিক্ষা করেছি। দল অবশ্য আমার জন্যে ভোট চেয়েছে সদস্যদের কাছে। আমার বলবার করবার সাহসই আমাকে নেতৃত্বে বসিয়েছিল। স্তাবকতা, চাটুকারিতা, সত্য উচ্চারণে ঔদাসীন্য আমার কখনো ছিল না, তাই সারাজীবন আমি স্কুলে কলেজে এবং চাকরী জীবনে প্রতিকার চেয়ে উপাচার্যের ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে মুখর থেকেছি। মেঠো বক্তৃতায়, কাগুজে বিবৃতিতে কিংবা লেখায় আমি কখনো ভীরুতার স্বাক্ষর রাখিনি, কারণ আমি হঠকারী, অপরিণামদর্শী অবিমৃষ্যকারী। ফলে আমার জীবনে যখন যা আমার পাওয়া ও প্রাপ্য ছিল, তা তখন পাইনি, পরে পেয়েছি। উপাচার্য প্যানেলে নাম উঠার জন্যে ভোট, প্রযোজনীয় ভোট ৪/৫ টা কম পেয়েছি দু'দুবার। সিণ্ডিকেটের নির্বাচনে একবার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হারতে হয়েছে। এছাড়া জীবনে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পরাজয় বরণ করতে হয়নি আর কোথাও।

কিছু মতলববাজলোকের মিথ্যা অপবাদ প্রচারণায় একবার আমাদের হাতে গড়া এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাঙলাদেশ-এর নির্বাচনে এ.বি.এম হাবিবুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনামুল হক, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, কমরউদ্দীন আহমদ, ডক্টর তরফদার, ডক্টর আবদুল মোমিন চৌধুরী এবং আমি সপ্যানেল পরাজিত হয়ে, ওদের আচরণে ইতরতায় ক্ষুব্ধ হয়ে চরম ঘৃণায় সোসাইটিতে এর পরে আমরা আর যাইনি, ওঁরা অনেকে দৈহিকভাবে অনস্তিত্বে বিলীন। আমি আজো যাই নে। জেদ ও নাস্তিক্য আমার সর্বশক্তির, ধৈর্যের, ক্ষতিস্বীকারের সামর্থ্যেরই উৎস।

বহুলোকের আদর-কদর-শ্রদ্ধা পেয়েছি। আর পষ্টকথার জন্যে, জেদ বা গোঁয়ার্তুমির জন্যে এবং নাস্তিক্যের জন্যে এর হাজার গুণ বেশি পরিচিত জনের ঘৃণা-অবজ্ঞা-হিংসা ও শত্রুতা কুড়িয়েছি। আমার মিত্র সংখ্যা হাতে গোনা যায়, কিন্তু শত্রু তথা আমাকে সহ্য করে না তেমন লোক ঢাকায় পরিচিত মহলে অসংখ্যা। এসব আমাকে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত করে না। যা যায় তা আর ফিরে আসে না। অর্থ-সম্পদের কোন না-পাওয়ার ক্ষতিই আমাকে বিচলিত করে না। আমার প্রবোধের উৎস 'ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনে কো কুড়োতে।'

বালক কিশোর হিসেবেও খেলেছি বটে, কিন্তু কোন খেলায় আসক্ত থাকিনি। মনের মতো লোক বা বন্ধু বা সাথী সহচর পেলে আড্ডা দিয়ে, কথা বলে সুখ পেয়েছি। শিক্ষক রূপেও ক্লাসে পড়িয়ে কথা বলে আনন্দ পেয়েছি। জীবনে পারত পক্ষে ক্লাস কামাই করিনি, ঘণ্টার পরে বিলম্বে ক্লাসেও যাইনি। আড্ডার লোক বেশি পাইনি, আড্ডার কোন স্থানও ছিল না, তাই লিখেছি আর পড়েছি কিন্তু স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল না বলে বিদ্যা ধরে রাখতে পারিনি। শ্রম ও সময়-হরা মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পাদনাদি গবেষণার কাজ করেছি। এর জন্যে ধৈর্য-অধ্যবসায় প্রয়োজন ছিল, আমার উৎসাহ-উদ্যম-উদ্যোগ সে-ধৈর্য-অধ্যবসায় যুগিয়েছিল। জীবনে দেশের বাইরে যাইনি কোথাও তাতে কি ক্ষতি হয়েছে জানিনা, তবে জ্ঞাতব্য দেশ ও মানুষ সম্বন্ধে বইয়ের মাধ্যমে অন্তরঙ্গ ভাবে জেনেছি। পাইনি ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা। বড় পদে আসীন হওয়া সম্ভব হয়নি। সরকার বিরোধী বলে বাঙলা একাডেমীতে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে, পাবলিক সার্বিস কমিশনে ডাইরেকটর, চেয়ারম্যান, সদস্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদও মেলেনি। যদিও আমার যোগ্যতা অস্বীকার করা সহজে সম্ভব ছিল না কারো পক্ষে। পাইনি পদ, পদমর্যাদা ও সম্মান, তেমনি, অর্থ-সম্পদও। ডক্টর আনিসুজ্জামান স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কবি কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক পাইয়ে দিয়েছিলেন দু'বছরের জন্যে। অবসরোত্তর কালে এটিই আমার প্রথম ও শেষ চাকরী। অন্য অনেকের মতো তদবীর করে জীবনে কখনো তকদীর বদলানোর চেষ্টা করিনি। শির উঁচুরাখা ঔদ্ধত্য, জেদ, অপরের কৃপা-করুণার প্রতি ঘৃণা, ক্ষতি স্বীকারের শক্তি, তীব্র-তীক্ষ্ণ আত্মসত্তার মর্যাদা চেতনা আমাকে স্পষ্টভাষী, সত্যসন্ধ ও সত্যবাদী, দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠ, কথা দিয়ে কথা রাখার চেতনা ও সামর্থ্য দান করেছে। জীবনে শটতা কপটতা বা কথার খেলাফ করিনি। স্তাবকতা, চাটুকারিতা তোয়াজ তোষামোদ থেকে আমাকে দূরে রেখেছে আমার জেদ-বুদ্ধি-যুক্তি-আত্মসম্মানবোধ ও বিবেক। স্বপ্ন-সাধ ছিল অনেক। পেয়েছি তার সামান্যই। তবু আমার ক্ষতিস্বীকারের শক্তি, শির উচুঁরাখার সঙ্কল্প, অন্যায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অশ্রদ্ধেয় লোকের সঙ্গে আপোস না করার অঙ্গীকার, আমার নাস্তিক্য আমাকে আমার বিবেকের কাছে গ্লানিমুক্ত রেখেছে। গ্লানিমুক্ত অনুভবের আত্মসত্তার মূল্য–মর্যাদা উপলব্ধির সুখে ও আনন্দে আমি স্বস্থ, সুস্থ, সুখী ও আনন্দিত। 'আকাশেতে রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস তবু উড়েছিনু এ-ই মোর উল্লাস।' কি পাইনি তার হিসেব মিলাইনি, যা পেয়েছি, তা উপভোগ করেছি। দূরত্বে অদৃশ্য রয়েছি বলেই হয়তো কোলকাতার কৌতূহলী বেশ কিছু বিদ্বান আমার খোঁজ রাখেন, ঢাকায় যা দুর্লক্ষ্য।

সময় ও জীবন
[জন্মদিনের সকালে]

নিরবধিকাল প্রবাহকে মানুষ সৌরমণ্ডলের আর্তব আবর্তনকে অবলম্বন ও ভিত্তি করে এক ঋতুকে লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে চিহ্নিত করে সময়কে খণ্ড ও ক্ষুদ্র করে অন্তরে অনুভব করেছে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে লাগিয়েছে। অনন্তকে ধারণ করেছে অঙ্গে ও অন্তরে। অসীমকে করে সীমিত, অশেষকে খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র এবং শেষে সমাপ্ত। এভাবেই মানুষ তার জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেকার সময় পরিসরকে অনুভব-উপলব্ধির অন্তর্ভুক্ত করে ভোগ-উপভোগের আয়ত্তে এনে সময়-নিয়ন্ত্রিত জীবনকে স্বচালিত স্বপ্রয়োজনে স্ব-উপভোগ্য করে তুলেছে।

ফলে কাল আর নিরবধি থাকে নি। মানুষের কায়িক, মানসিক, সামাজিক জীবনে মননে-চিন্তনে-দর্শনে-বিজ্ঞানে-ইতিহাসে কাল পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো হয়ে মনুষ্যস্মৃতিতে ও ধারণায় প্রাকৃতিক প্রাবৃত্তিক ও কাল্পনিক জীবনের অবলম্বন হয়ে ইহ-পরলোকে প্রসৃত আসমানে জমিনে পরিব্যাপ্ত বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসার এক অদৃশ্য অলীক-অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের ভাব-চিন্তার কল্পজগৎ সৃষ্টি করেছে। যা তাদের মনে-মগজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এ বাস্তব পৃথিবী কিংবা গ্রহজগৎ থেকেও বেশি বাস্তব, সত্য এবং অদৃশ্য অলীক হলেও মানসচক্ষে দৃশ্যমান, তথ্যবহুল, মননঋদ্ধ বিবিধ ও বিচিত্র তত্ত্বের আকর।

যদিও জন্ম হয় মৃত্যুর পরওয়ানা সঙ্গে নিয়েই, কিন্তু কখন তা কার্যকর হবে, তা জানা থাকে না বলে মানুষ নিজের আয়ু প্রায় অশেষ ভাবে পৌঢ়বয়স অবধি। তাই তার মৃত্যুচেতনা থাকেই না। থাকে ঐহিক জীবনে বিদ্যা-বিত্ত-ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি স্নেহ-মমতা-প্রেম হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রাপ্তিলিপ্সা, সুখ-আনন্দ-আরাম, কাম-প্রেম-পরিণয়, কাড়া-মারা-হানা প্রভৃতি বিচিত্র অনুভবের উপলব্ধির, ভোগ-উপভোগের সুখ-আনন্দ প্রাপ্তিবাঞ্ছা। যেন মরণ নেই, এমনি অনুভূতি উৎসাহ উদ্যম উদ্যোগ নিয়েই অজরামর ভাব নিয়ে মানুষ প্রাত্যহিক জীবন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়াসে থাকে নিয়োজিত। কেবল জরা-জীর্ণতা-জড়তা যখন বার্ধক্যে দেহ-প্রাণ-মন ঘিরে ধরে তখনই কেবল 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধমং আচরেৎ',-এ আপ্তবাক্যের অনুগত হয় কেই কেউ বাহ্য আচরণে, অন্তরে কিন্তু তাদের তখনো স্বার্থচিন্তা, ভোগলিপ্সা, খ্যাতি-ক্ষমতা-মানলিপ্সা জাগরূক থাকে। এ ক্ষেত্রে সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-শ্রমন-শ্রাবক-ফকির-দরবেশ-বৈরাগী-বিবাগীর কথা আলোচ্য নয়। কেননা, তারা বিকৃতি বুদ্ধির বা আধির শিকার অস্বাভাবিক অমানবিক অপ্রাণীসুলভ জীবনাসক্ত। পৃথিবী-প্রকৃতি-প্রবৃত্তি তাদের আসক্ত করে না, হাওয়াই এক চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস-সংস্কার অলীক-অলৌকিক এক জগৎ ও জীবনস্বপ্ন তাদের আচ্ছন্ন ও মুগ্ধ করে রাখে।

সচল সুস্থ দেহ-প্রাণ-মনই জীবন। আর্তব আবর্তন সে-জীবনকে করে আকৃষ্ট, চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এর আকর্ষণ এবং গুরুত্ব সময়-পরিসরে সীমিত জীবনে এত বেশি যে এর জন্যেই মানুষকে পরিবার, শাস্ত্র, সমাজ, দর্শন, রাষ্ট্র, ন্যায়-নীতি-নিয়ম-রীতি-রেওয়াজ-প্রথা-পদ্ধতি, আচার-আচরণ, শৈক্ষিক, আর্থিক প্রাশাসনিক নানা বিধি-ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এর মধ্যে মরণ চেতনা নেই, রয়েছে কেবল অনন্ত জীবনজিজ্ঞাসা, জীবন যে অশেষ! অভাববোধ, প্রাপ্তিলিপ্সা, ভোগাকাঙ্ক্ষা, ভোগ-সম্ভোগ-উপভোগ বাঞ্ছা প্রভৃতিই অপ্রতিরোধ্য ও অসংযত জীবন প্রেরণা, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি, শক্তি-আগ্রহ-সাহস, অঙ্গীকার, উদ্যম, উদ্যোগ প্রভৃতিই প্রেরণা পূর্তির ও রূপায়ণের উপায়। বস্তুত বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, উপায়ের সঙ্গে যুক্তির, সাহসের সঙ্গে শক্তির, আগ্রহের সঙ্গে অঙ্গীকারের, উদ্যামের সঙ্গে উদ্যোগের প্রয়োজনীয় আনুপাতিক যোগ ঘটলে সিদ্ধিও হয় প্রায় সুনিশ্চিত। তাই বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। বস্তুত জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা-উপায়-চেতনা-শক্তি-সাহস-সংকল্প-উদ্যম-উদ্যোগ ব্যতীত কোন কাজেই সিদ্ধি নেই, কোন বাঞ্ছাই পূর্ণ হবার নয়।

সময়কে এমন সৌরমণ্ডলের আর্তব আবর্তনে সীমিত, বৈশিষ্ট্যে উপযোগ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে বলেই মানুষ এমন অজরামরবৎ জীবনকে ভালোবাসে, কাজে লাগায়, উপভোগ করে। জীবনের লক্ষ্যে উত্তরণই মানুষের কাম্য, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকা নয়। মৃত্যু মুহূর্ত সম্বন্ধে অজ্ঞতাই জীবনীশক্তির উৎস। যদি কেউ জানে বা বোঝে যে তিন বছর তিন মাস তেরোদিন পরেই তার মৃত্যু অবধারিত, তা হলে ফাঁসীর হুকুমপ্রাপ্ত আসামীর মতো, এখনকার ক্যানসার রোগীর মতো তার ইন্দ্রিয় হয়ে পড়বে অবশ, পৃথিবী হয়ে পড়বে ম্লান। পৃথিবীর ভোগ্য উপভোগ্য বস্তুর স্বাদ যাবে কমে,৩ ানিমা-হতাশা তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকবে।

মৃত্যুক্ষণ অজ্ঞাত বলেই মানুষ এমন শক্তিমান, এমন সাহসী, এমন উদ্যোগী, এমন উচ্চাভিলাষী, এমন কাঙ্ক্ষাচালিত। পৃথিবী এমন প্রিয়, মর্ত্য-সৌন্দর্যে এমন আসক্তি, জীবনের প্রতি এমন অনুরাগ। এ কারণেই নিরবধি কাল পরিসরে বিন্দুবৎ স্বল্পকালের এ জীবন মশা-মাছি থেকে মানুষ-হাতী সবার কাছে যেন এতো প্রিয়। মৃত্যুকে ভুলে থাকি বলেই জীবন ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় মৃত্যুবিহীন ও অন্তহীন। অথবা অবচেতন মনে সবাই মৃত্যু আছে জেনেই, এবং তার আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধে সচেতন বলেই জীবন মানুষের এতো প্রিয়। দেহ-প্রাণ-মনের স্বাস্থ্য এতো আবশ্যিক। জীবন তবু 'ফুল ফোটা, ফুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝরা'-তত্ত্বের, তথ্যের ও আপ্তবাক্যের বাইরে নয়। এ জন্যেই 'নগদ যা পাও হাতে পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক'। এবং যেহেতু 'যে ফুল নিশীথে পড়িবে ঝরিয়া সেই নাহি কখনো ফুটিবে আরা'। অথবা Eat, drink and be merry for Tomorrow We may die' এ তত্ত্বে শঙ্কিত বলেই জীবন এতো প্রিয়, ভোগ-উপভোগে এতো আগ্রহ আসক্তি। এ জন্যেই হয়তো বাঁচার আগ্রহে 'তুচ্ছ বলে যা চাইনি, তা-ই মোরে দাও।' বলে আকুল প্রার্থনা। সময় পরিসর সংকীর্ণ বলেই কি মানুষ মরিয়া হয়ে 'পাই পাই' খাই খাই করে, ছুটোছুটি করে, দিশা খুঁজে খুঁজে বেড়ায়? আকুল-ব্যাকুল হয়ে অর্থ-বিত্ত-বিদ্যা-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়? সময় অনিশ্চিত বলেই কি ভোগ-উপভোগের জন্যে এতো ব্যস্ততা, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি, এটাই জৈব ধর্ম। তবু মানুষ এ স্থূল জীবনকে সূক্ষ্ম অনুভব-উপলব্ধি যোগে অলীক তত্ত্বে তথ্যে ও সত্যে, অলৌকিক অদৃশ্য জীবনতত্ত্বেও আস্থা ও ভয়-ভরসা রেখে জীবনকে আত্মারূপ চেতনাকে চির অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত রেখে মহিমান্বিত করে নিশ্চিন্ত সুখ, স্বস্তি ও আনন্দ পেতে চায়।

সময়ের পরিসরে স্থিত দেহ-প্রাণ-মনের অস্তিত্বকে কল্পনায় চিরন্তন অস্তিত্ব দিয়ে মানুষ অমরত্বে আশ্বস্ত হতে চায়। সময়ের নিয়ন্ত্রণ এভাবে মানুষ অস্বীকার করে অলীক অলৌকিক আত্মপ্রবোধ পায়।

AMARBOI.COM

বাঙলাদেশে গণতন্ত্র ও ভোট

গোড়া থেকেই লোক গোত্রপতি বা গোষ্ঠীসর্দারের অভিভাবকত্বে, শাসনে পোষণে ও পরামর্শে জীবন যাপন করত। রাজার উদ্ভব হল যখন তখনো কেবল রাজাই সর্বময় ক্ষমতার, হুকুম-হুমকির ছিলেন মালিক। দেশের মানুষ থাকত দাসের মতোই তার অনুগত। মানুষের জন্মগত দাসত্ব ও আনুগত্য ঘুচেছে শাহ-সামন্ত যুগের অবসানে। বিত্তে ও বিদ্যায়, সঞ্চয়ে ও সম্পদে, বহির্বাণিজ্যে ও যন্ত্রযোগে উৎপাদনে তাদের অর্থ-সম্পদ রাজকোষকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, ফলে রাজারা হচ্ছিল শঙ্কিত ও রুষ্ট, আর বাণিজ্যসম্পদে স্ফীত সওদাগরেরা হচ্ছিল ধনবলে উদ্ধত, উচ্চাভিলাষী, স্বসত্তার মূল্য, মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্যকামী ও স্বাধীনতার স্বাপ্নিক। ফলে ধনী বেণে বহুল য়ুরোপীয় সমাজে গির্জা-রাজার ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফাঁকে ফুকুরে এক প্রকার বিপর্যয় বিচলন-বিপ্লব ঘটে গেল যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই। অনেক রাজ্যেই রাজার ক্ষমতা খর্ব হল নীতি-নিয়মবদ্ধ সংবিধান যোগে, লুপ্ত হল পাদরীর দাপট। মূল কথা এ দাঁড়াল, এখন থেকে রাজার ক্ষমতা হীরের টুকরোর মতো খণ্ড ক্ষুদ্র করে জনগণের নামে বিত্তবান বিদ্বানরা ভাগ করে ভোগ-উপভোগ ও প্রয়োগ করতে থাকে। এরাই জনগণের ভোটে বা সম্মতি-সমর্থনে এক এক অঞ্চল থেকে সংসদে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রয়োজনে জনগণের পক্ষে তাদের স্বার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংরক্ষণে বাদ-প্রতিবাদ করতে ও ক্ষমতা উপভোগ করতে থাকে । এরই নাম গণতন্ত্র। য়ুরোপের হাজার বছরের ঘটনাবহুল বন্ধুর জটিল ইতিবৃত্ত কয়েক বাক্যে বয়ান করলাম এ কারণে যে এগুলো আমাদের আলোচ্য নয়। আবার য়ুরোপ মানেও ঠিক ভৌগোলিক য়ুরোপ নয়, কোন কোন অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায়-চিন্তায়-চেতনায় অগ্রসর রাজ্য-রাষ্ট্রগুলোই নির্দেশ করলাম মাত্র বোঝার ভিত হিসেবে।

আমাদের দেশেও সে-গণতন্ত্র অনুকৃত ও অনুসৃত হচ্ছে। দেশবাসী অজ্ঞ অনক্ষর নিরীহ উদাসীন অবুঝ হলেও আমাদের বিদ্যায়-বিত্তে প্রবল লোকেরা ওই রাজক্ষমতা এখানেও ভাগ করে ভোগ-উপভোগ করতে চায়। তাই গণতন্ত্র এখানেও কাম্য ও প্রযোজ্য, যদিও শৈক্ষিক-নৈতিক প্রায়োগিক মানসিক প্রতিবেশ আজো প্রতিকূল। যে রাজনীতিক চেতনা, প্রশিক্ষা, প্রয়োজনচেতনা, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা, স্বার্থচেতনা গণতন্ত্রের জন্যে প্রয়োজন তা আমাদের দেশের গাঁ-গঞ্জের অশিক্ষিত লোকেরা তো প্রায় ধারণাতীতই, শহর-বন্দরের শিক্ষিতদেরও সে-চেতনার অভাব লজ্জাকরভাবে প্রকট। রাজনীতিক সংস্কৃতি বলেও একটা সংস্কৃতির আবশ্যিক অনুশীলন প্রয়োজন ও জরুরী হয় গণতন্ত্র চালু করার, চালিয়ে নেয়ার ও প্রচল রাখার জন্যে। আমাদের তথা আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার জনগণের মধ্যে তা আজো অনুপস্থিত-অনুন্মোচিত। আমাদের দেশে গণতন্ত্র চালু করার জন্যে যে জন-প্রতিনিধি ভোটের বা ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করার কথা, তা আপাতদৃষ্টে প্রয়োগ প্রয়াসে থাকে বটে, কিন্তু চেতনায় রাজনীতিক সংস্কৃতি ও সৌজন্য না থাকায় আচরণে নীতি-নিয়ম ও সীমা লঙ্ঘন করা হয়। ফলে এ যেন লাটির ডগায় নুতন-জাগা চর দখলের নতুন প্রথা-পদ্ধতি রূপে গৃহীত ও প্রযুক্ত। তাই কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি এর আবশ্যিক, জরুরী ও অপরিহার্য অংশ। এখন এ দেশে নব্বইটি রাজনৈতিক দল। ১২ টা দল প্রার্থী যোগাড়ে হয়েছে ব্যর্থ, অন্যরা মারামারি হানাহানি করেই চলেছে। অস্ত্রে অস্ত্রে ভোট লড়াই চলছে। প্রার্থীদের অধিকাংশ বিদ্যায় কাঁচা, সংস্কৃতিতে স্থূল, মননে ক্ষীণ, ধূর্ততায় পাকা, বিত্তে স্থানীয়ভাবে অতুল্য বা একে অপরের সমকক্ষ। এদের প্রায় সবার অর্জিত সম্পদ বিপুল হয়েছে তথাকথিত ঠিকেদারিতে, মৌজুতদারিতে, ভেজালদারিতে, চোরাচালানে, লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্যপুঁজি ও শিল্পপুঁজি হিসেবে দেশের ব্যাঙ্ক থেকে নেয়া অপরিশোধ্য ঋণ থেকে, আর ব্যবসা-ঘুষ-লুট-কমিশন ইত্যাদি থেকে।

যাদের বিদ্যায় চরিত্রে-বুদ্ধিতে লোকহিতৈষণায় লোকের আস্থা রয়েছে, যারা লোকসেবা করে, দেশকে ভালোও বাসে, অর্থ-সম্পদ নেই বলে যে-সব বাঞ্ছিত শ্রদ্ধেয় জন প্রার্থী হওয়ার স্বপ্নও দেখে না। কাজেই এ গণতন্ত্র হবে স্বৈরতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার, অন্যায়-অবিচার-অপকর্ম-অপরাধের নামান্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার্ধক্যে অবসর জীবনে

কোন কোন চাকুরে আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন, কেউ কেউ রোজগারের নেশায় নানা কাজে নিয়োজিত হয়, নতুন চাকরি নেয়, দায়িত্ব ও কর্তব্যচ্যুত কর্মরিক্ত জীবন কাটানো অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কেউ কেউ কর্মহীন নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হারায়। তাদের আয়ু কমে।

অন্যরা সাধারণ সকালে বাজার করে, দুপুরে ঘুমিয়ে বেড়িয়ে দিন কাটায়, নিরীহ কেউ কেউ আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি বাড়ি ঘুরে খোঁজ-খবর নিয়ে সময় অপচয় করে। কেউ বা নাতি কোলে-পিঠে করে, সোহাগে স্নেহে আদরে আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি খোঁজে। আবার কেউ কেউ সকালে বাজার করে, বিকেলে বাগানের পরিচর্যা করে সানন্দে সময় উপভোগ করে। কেউ কেউ মামলা করেও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব অনুভবে-উপভোগে অবসর কাল কাটিয়ে দেয়।

এখানকার কোন কোন শহুরে দম্পতি মার্কিন দেশে-ক্যানাডায়-লণ্ডনে-জার্মানী-দুবাইবাসী সন্তানদের চিঠি লিখে ও চিঠি পেয়ে, ফোন করে ও ফোন পেয়ে খবর ও কথোপকথন রোমন্থন করে অর্থাৎ প্রায় সর্বক্ষণ স্মরণ করে, অন্যদের সেসব খবর পরিবেশন করে গৌরব-গর্ব, সুখ ও আনন্দ উপভোগ করে।

আর সাধারণ সচ্ছল মানুষ আবেগ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, রোগমুক্ত এবং সচল থেকে খেয়ে পরে পড়শীর ও দেশের রাষ্ট্রের খবর শুনেজেনে দিন কাটিয়ে দেয়। আর রেডিয়ো-টিভি-ক্যাসেট দেখেশুনে সানন্দে সময় উপভোগ করে।

আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো যায়। দোকানে-ক্লাবে-রোয়াকে-বৈঠকখানায় আড্ডা দিয়ে মানস-খোরাক সংগ্রহ করার প্রথা-পদ্ধতি সুপ্রাচীন। এমন কি দাবা-লুডু-বাঘবন্দী থেকে স্বল্প-টাকার তাসের জুয়ায় বিকেল ব্যয় করাও আজকাল ক্লাব সদস্যদের মুখ্য আনন্দান্বেষণের বিষয় হয়েছে। কোন কোন সপত্নীক বিপত্নীক নতুন বিয়ে করেও নতুন করে সুখের সাগরে তরী ভাসায়। আবার অনেকে সভা-সমিতি-ক্লাব নানা সেবাসঙ্ঘ প্রভৃতির সদস্য হয়ে একাধারে মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-স্থানিক পরিচিতি অর্জনে হয় আগ্রহী।

এদের মধ্যে এমন লোক অনেক, যারা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সংসদ অবধি শৈক্ষিক-আর্থিক যোগ্যতা অনুসারে সদস্য হবার প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। এরা মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতার সঙ্গে নতুন করে অর্থ-বিত্ত অর্জন করে রাষ্ট্রে বা অঞ্চলে দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লিপ্সু। অনুন্নত দেশে এমনি মানুষের সংখ্যাই বেশী।

আবার কেউ কেউ পর্যটনে-দেশ দর্শনে, কেউ কেউ পারত্রিক মুক্তি লক্ষ্যে ঐহিক পাপ স্খালনে সদা শাস্ত্র চর্চায় ও পূজা-উপাসনায় বিরাগী-বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য গৃহে থেকেও এরা উদাসীন-জলে বাস করেও যেন নীর ছোঁয় না।

মানুষ আরো কতভাবে যে বার্ধক্যের অবসর জীবন যাপন করে, তা বলে শেষ করা যায় না। বই পড়েও কেউ কেউ সময় কাটায়। পত্রিকা তো পড়ে বা শোনে। এমনকি হোমিও বায়োকেমি চিকিৎসাও শেখে, বিনা মূল্যে চিকিৎসাও করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈশবে বাল্যে কৈশোরে মানুষ ভাবী জীবনে কি হবে, কি করবে, কি চাইবে, কি গড়বে তার স্বপ্ন দেখে। মনে মনে নানা সাধ লালন করে। কিন্তু দেশের, কালের ও বাস্তব প্রতিবেশের চাপে ও প্রয়োজনে মানুষ যৌবনে সেসব স্বপ্ন ও সাধ পরিহার করে যোগ্যতা ও পরিবেশ-প্রতিবেশ অনুসারে বাস্তব জীবনের খণ্ড ও ক্ষুদ্র পরিসরে জীবনযাত্রা শুরু করে। বার্ধক্যে বেকার মানুষের কোন ভবিষ্যৎ থাকে না, থাকে অতীতের কৃতী, কীর্তি, শ্রুতি ও স্মৃতিমাত্র। তাই বৃদ্ধরা কেবল অতীতাশ্রয়ী ও অতীত ঘটনার ও কাজের রোমন্থনকারী।

কিসে সুখ, কোথায় সুখ, সুখ কি, সুখ কেমন তা আজো নির্দিষ্ট করে জানে না কেউ। তবে মানুষ-প্রাণীমাত্রই-সুখ চায়, এজন্যেই কেড়ে সুখ, মেরে সুখ, হেনে সুখ, ত্যাগে সুখ, আত্মবঞ্চনায় সুখ, পরবঞ্চনায় সুখ. মিথ্যা বলে সুখ, লাভে সুখ, লোভে সুখ, পরোপকারে সুখ, পর অপকারে সুখ, প্রিয়জনকে সর্বস্ব দিয়ে সুখ, তার জন্যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, অর্থ-বিত্ত বিলিয়ে এমনকি প্রাণ দিয়েও সুখ। মানুষ জীবন ব্যাপী হিংসায়-ঈর্ষায়-অসূয়ায়-রিরংসায়, মায়া-মমতায়-স্নেহে-শ্রদ্ধায় ভালবাসায় এক কথায় সর্বক্ষণ সর্বক্ষেত্রে সর্বকাজে সর্বচিন্তায় সুখ খোঁজে। সুখ কিন্তু স্থায়ী নয়। দুঃখ এসে সুখ-তৃষ্ণা বাড়ায় এবং তাই মানুষের সুখ সন্ধানের উদ্যম-উদ্যোগ-প্রয়াস-প্রযত্ন বেড়েই চলে। এভাবেই ঘটে একদিন জীবনের অবসান।

AMARBOI.COM

বার্ধক্যে দাম্পত্য আত্মীয়তা

খেঁদি, পাঁচী, ফুলজান, লালজান, মেহেরজান নামের যে-কোন মেয়ের সঙ্গে ছকড়ি, নকড়ি, সাঁচি, বগামিয়া, সোনামিয়া, কালাচাঁদের শৈশবে বাল্যে বিয়ে স্থির হয়ে থাকত বা বিয়ে হয়েই যেত। এমনকি সাত-আট-দশ বছরের বালিকাসহবাসও ছিল চালু। এসব বর্বর প্রথাপদ্ধতি, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজও ছিল শাস্ত্রানুমোদিত বাঙলাদেশে-ভারতবর্ষে। এ ছাড়াও আজ অবধি বিশাল ভারতবর্ষ নামের মহাদেশের অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র অঞ্চলে, ঝোপে ঝাপে, আরো অনেক অনেক বুনো বর্বর অসভ্য অমানবিক রীতি-নীতি-নিয়ম-রেওয়াজ প্রজন্মক্রমে চালু রয়েছে। কেউ খোঁজও রাখে না, এতে দোষ-ক্ষতিও কেউ দেখে না।

১৯১৭ সনে মাত্র বাল্যবিবাহ এবং বালিকা সহবাস আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। এর পরেও বহু বহু কাল অপ্রকাশ্যে এসব অপকর্ম এখানে ওখানে চলেছে। কাজেই এক হিসেবে আমরা সেদিন মাত্র এ বর্বরতা মুক্ত হয়েছি। উল্লেখ্য যে হিন্দুসমাজের এ প্রভাব ও প্রথা দেশজ তথা বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে দীক্ষিত মুসলিম সমাজেও ছিল চালু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী পুরুষের সম্পর্কটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত। তাই শৈশবে-বাল্যে নয়, বার্ধক্যেও নয়, কেবল যৌবন উন্মেষ কাল থেকে নারীর সৃষ্টিশীল উর্বরতার কাল অবধিই হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের কাল। এ কালেই কেবল নারী-পুরুষে একটা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মেই থাকে দৈহিক প্রয়োজনেই পারস্পরিক অমোঘ আকর্ষণ, যার নাম কাম-প্রেম, অনুরাগ-আসক্তি-প্রণয় বা যৌনাকর্ষণ দেয়া চলে।

বিবাহ প্রথা চালু করেই মানুষ কেবল যে যৌনজীবনে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি, ঠেকিয়েছে তা নয়, শক্তিতে, সাহসে, বীর্যে অবয়বে ক্ষীণ ও হীনদেরও যৌন সম্ভোগে, আনন্দ উপভোগে অধিকার দিয়েছে। ফলে নারীতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একটা আত্মীয় সমাজ গড়ে উঠেছে। এ বিয়ের সূত্রেই বাবামা, চাচা-মামা, খালু-ফুফা, ভাইবোন, ভাইপো, ভাগনে নামে নানা সম্পর্কের ও সম্বন্ধের আত্মীয় সমাজ গড়ে উঠেছে। নৈতিক সামাজিক নীতি-নিয়ম রীতি-রেওয়াজ টোটেম-ট্যাবু, আচার-আচরণ অধিকার দায়িত্ব কর্তব্য অনধিকার অন্যায়, পাপ, পবিত্রতা, সততা, সতীত্ব প্রভৃতি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষক জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা সিদ্ধ মন-মত-কর্ম-আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি মানুষের কৌম, গোত্র, গোষ্ঠী, দল যূথবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করেছে নিরুপদ্রব ও নিরাপদ। শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবন করেছে সর্বজন গ্রাহ্য ও মান্য।

দাম্পত্য হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রসম্মত ও বিধিবদ্ধ নিয়মে যৌনজীবন যাপন পদ্ধতি। আমাদের সর্বজনীন ও সর্বস্বীকৃত নীতি-নিয়ম রীতি-রেওয়াজ সম্মত বলেই সুরুচি, সৌজন্য, শোভনতা ও শাস্ত্রিক তথা লৌকিক-আলৌকিক অলীক আস্তিক্য বুদ্ধিতে ও ঐশ- অনুমোদনে আস্থা রেখে দাম্পত্যের শুরু। তাই বলে দাম্পত্যমাত্র সুখের শান্তির আনন্দের মাধুর্যের আসক্তির অনুরাগের প্রীতি-প্রেম ভালোবাসার নয়। রূপে গুণে আকর্ষণীয় না হলে স্বভাবে কথায় কাজে মেজাজে, আচরণে বাঞ্ছিত বা প্রত্যাশিত সন্তোষ না মিললে দাম্পত্যজীবনে খিটিমিটি লেগেই থাকে। তবু জীবনের প্রান্তপর্বে স্ত্রীই থাকে মায়ের পরেই নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ভরসার প্রিয়জন। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত অবধি এতে যৌনক্ষুধা চরিতার্থতার ক্বচিৎ-কদাচিত লঘু বাঞ্ছা থাকলেও তখন ভিন্ন ঘরের, অঞ্চলের দম্পতি নামের দুই নারী-পুরুষ সন্তানের জনক-জননীত্বের বন্ধন না থাকলেও অর্থাৎ বন্ধ্যা হলেও অভিন্ন স্বার্থে বহুকালের একত্র বাসের ফলে এমন এক অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য আবশ্যিক আত্মীয়তা-আত্মিকবন্ধন ও নির্ভরতা অজ্ঞাতেই গড়ে ওঠে যে কেউ কারো বিচ্ছেদ-বিরহ কল্পনা করতেও বিপন্ন বোধ করে। নিঃসঙ্গ নিঃসহায় জীবন অবশ্যই বেদনার ও ভয়ের। দাম্পত্য তখন যৌনতারিক্ত এক অতি আবশ্যিক আত্মিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ। দাম্পত্য এখন এখানে কেবল বন্ধুত্বের, সহচরতার, সঙ্গসুখের, অন্ধের নড়ির মতো সার্বক্ষণিক নির্ভরতার, নিশ্চয়তার ও নিশ্চিন্ততার প্রতীক ও প্রতিম। বার্ধক্যে দাম্পত্য স্থিতির সুখ-স্বস্তি অশেষ। তখন স্বামী-স্ত্রী সবচেয়ে নিকট আত্মীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাসাগরজীবনের পুঁজি ও পাথেয় ঃ জেদ ও নাস্তিক্য

মধ্যযুগে বর্ণে বিন্যস্ত, উপাস্যের বিভিন্নতায় বিভক্ত, প্রাজন্মক্রমিক ঘরানা পেশায় স্বতন্ত্র ও বিযুক্ত, কেবল শ্রম ও পণ্য বিনিময়ে বাজারি হাটুরে ও মেঠো সম্পর্কে সংযুক্ত জনগণের সমাজে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-গোত্র-সম্প্রদায় চেতনা কখনো কোথাও দৈশিক রাজ্যিক স্তরে উন্নীত হয়ে একালের মতো সাধারণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগণ শ্রেণী হয়ে উঠতে পারেনি।

তাই মধ্যযুগে বর্ণ, বৃত্তি ও শাস্ত্রীয় মতানুসারে ছিল বার্ণিক বৃত্তিক ও মতবাদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়। পরার্থে মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও শাস্ত্রিক কাজ-কর্ম, দান-দাক্ষিণ্য, কৃপা-করুণা ও মঠ-মন্দির-গির্জা-মসজিদ নির্মাণও ছিল গোষ্ঠী এ সম্প্রদায় হিতৈষণায়। নির্বিশেষ মানবচেতনা ছিল দুর্লভ দুর্লক্ষ্য। মধ্যযুগে বেচা-কেনার হাট-বাজারই ছিল কেবল সর্বজনীন, লেন-দেনের মিলনময়দান। কিন্তু বিভিন্ন বার্ণিক বৃত্তিক ও শাস্ত্রিক মানুষের মধ্যে মায়া-মমতা-প্রীতি-প্রণয়ের সম্পর্ক অবৈধ-অবিধেয় বলেই মনের মতের বিনিময় হতে পারত না; মন মননের আদান-প্রদান হত না। ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নয়। জাত-পাতের বাধা মানুষকে কূর্মস্বভাবে অভ্যস্ত করেছিল।

সেকালে দেশ ছিল রাজার রাজ্য, রাজা ছিলেন প্রজার জান-মালের মালিক, প্রভু। প্রজার মন ভোলাবার জন্যে পিতা বলে পরিচয় দিতেন রাজা। জমা-জমি-ভিটে-বাড়ির প্রতি ব্যক্তির অধিকারগত দাবি ও মমতা থাকলেও শাহ্-সামন্তের রাজ্যে জনগণের অধিকার ছিল না বলে, তাদের কোন রাজ্যিক বা দৈশিক অধিকারচেতনাও ছিল না। তারা ছিল একালের ভাড়াটের মতো উদাসীন। কাজেই রাজ্য কাড়াকাড়ির ক্ষেত্রে প্রজার মনে দেশী-বিদেশী স্ব-জাতি-বিজাতি চেতনা কোন প্রেরণা-প্ররোচনার বিকার সৃষ্টি করত না।

ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপীয় গৌত্রিক-দৈশিক-ভাষিক-আঞ্চলিক জাতিসত্তা ও জাতিচেতনা ঈষৎ বিকৃতভাবে আমাদের উপমহাদেশে দ্রুত উন্মেষিত হল। বহু বর্ণের, বৃত্তির, ভাষার ও শাস্ত্রের মানুষ অধ্যুষিত ভারতে ধর্মীয় তথা শাস্ত্রিক জাতীয়তাবোধ জেগে উঠল উচ্চবর্ণের, বিদ্যার, বিত্তের ও বৃত্তির ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে। ফলে হিন্দু শিক্ষিত হয়ে হল সর্ব ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তায় আস্থাবান কেবল হিন্দু, এবং মুসলিমও হল বিশ্বমুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী কেবল মুসলিম। দৈশিক পরিচয়ে বাঙালী বা ভারতীয় (হিন্দুস্তানী) থাকাটা ছিল আদর্শ বা হৃদয়াবেগ নিরপেক্ষ গুরুত্বশূন্য একটা স্থানিক ঠিকানা মাত্র।

ভারতবর্ষে ইংরেজের, ইংরেজী শিক্ষার এবং প্রতীচ্য প্রভাবের প্রথম ও প্রধান অবদান হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র ভিত্তিক জাতীয়তার উন্মেষ, বিকাশ এবং স্থায়িত্ব সাধন। তাই নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪৭ সন অবধি দৈশিক জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে হয়েছিল ব্যর্থ, স্বাধীন ভারত সেক্যুলার' ভারত হতে হয়েছিল অসমর্থ। মধ্যযুগ অবধি ভারতে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-লিঙ্গায়েত-সৌর-জৈন-বৌদ্ধ ছিল; ছিল হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-কামার-কুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি পেশাজীবী; ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণের মানুষ; কিংবা আইবক, বরবক, ঘোরী, খলজি, তুঘলক, লোদী, আফগান, পাঠান, মক্কী, মদনী, ইরানী, ইরাকী, বাগদাদী, সমরখন্দী, বোখারী, খোরাসানী, হিন্দু-তুর্কী, ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, তামিল, তেলেগু, মারহাট্টা, রাজপুত, হিন্দু, হিন্দবি, হিন্দুস্তানী- এমনি মত, পেশা, বর্ণ, গোত্র ও দেশ ছিল বিভিন্ন দলের মানুষের পরিচিতির ভিত্তি।

ইংরেজ এসেই গোটা ভারতের মানুষকে হিন্দু ও মুসলিম নামে দ্বিধা বিভক্ত ও চিহ্নিত করে। স্থায়ী দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের বীজ হল এ ভাবেই উপ্ত। ব্রিটিশ ভেদনীতি বিষে বিকৃতমন হিন্দুরা দেশজ মুসলিম ও তুর্কী-মুঘল শাসক গোষ্ঠীর মুসলিম যে দেশজ খ্রীস্টান ও ইংরেজের মতো আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবেই পৃথক, স্বার্থে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ছিল, তা আজো ভারতে পারে না। তাই অতীতের শাসক তুর্কী-মুঘলের প্রতি হিন্দুর ক্ষোভ-ক্রোধ-বিদ্বেষের শিকার হয় দেশজ মুসলিম বংশধরেরা। তাদের আজো বোঝানো যায় না যে বৌদ্ধ ও হিন্দু অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবীরা হয়েছিল ক্রমে ক্রমে গাঁয়ে গাঁয়ে পীর-ফকির দরবেশ নামে পরিচিত খ্রীস্টান মিশনারীর মতোই কৃপা-করুণা-সেবাপরায়ণ ইসলাম প্রচারকদের কাছে দীক্ষা নিয়েই। ব্রাহ্মণ্য সমাজের শাসন-শোষণ-পীড়ন-অবজ্ঞা মুক্তি আর আর্থিক সামাজিক ক্ষেত্রে আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যে সেকালের বর্ণে বর্গে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত সমাজে সম্ভব হত না পেশান্তর, সব বৃত্তি-বেসাতই ছিল গৌত্রিক ও ঘরানা-- প্রজন্মিক ও পরম্পরা ক্রমিক। ফলে দেশজ দীক্ষিত মুসলিমরা ১৯৪৭ সন অবধি গাঁয়ে গাঁয়ে ছিল উচ্চ বর্ণের, উচ্চ বর্গের, উচ্চবৃত্তির ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের শাসনের-শোষণের-এমনকি পোষণের পালণের পাত্র। অশিক্ষাদুষ্ট এ অজ্ঞ সমাজে তেরো নদীর ওপারের কোরানিক ইসলামের প্রভাব ছিল নামসার, আর হিন্দু-বৌদ্ধ বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণ ছিল তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবলম্বন, মন-মননের সম্বল। ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনই তাদের কোরান-হাদিস সম্মত ইসলামমুখী করে তোলে উনিশ শতকে। উনিশ শতকের শেষপাদে স্বল্প শিক্ষিত কিছু দেশজ মুসলিম কোলকাতায় পত্র-পত্রিকা চালান বটে, কিন্তু ব্রিটিশ আমলের গোড়া থেকেই ১৯৪৭ সন অবধি তাদের হয়ে স্বেচ্ছা নিয়োজিত কিংবা সরকার স্বীকৃত নেতা হয়ে কথা বলার, তাদের প্রতিনিধিত্ব করার প্রায় জন্মগত অধিকার পান কোলকাতা-মুর্শিদাবাদবাসী ধনী-মানী-শিক্ষিত উর্দুভাষী মুসলিমরা এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর উর্দুভাষী জমিদার-উকিলেরা। বিদেশাগতের বংশদর বলেই এরা মনের দিক দিয়ে ছিল প্রবাসী, তাই এরা আত্মপরিচয় দিত কেবল মুসলিম বলে-নিবাসের নামে বাঙালী-বিহারী-উড়ে ছিল না। এদের প্রভাবেই সম্ভবত দেশজ মুসলিমদের হিন্দুরা বাঙালী-বিহারী-উড়ে বলে স্বীকার করে না। তাই এ মুহূর্তেও হিন্দুর কাছে মুসলমানরা কেবল মুসলমান, বাঙালী নয় এবং বাঙালী বলতে হিন্দুরাই কেবল বাঙালী। এদিকে আবার উর্দুভাষীরা নিজেদের ভাবত অভিজাত তথা রইস আর দেশজ বাঙলাভাষী মুসলমানদের জানত ছোটলোক বলে। উনিশ শতকের মধ্যভাগের প্রবল মুসলিম নেতা স্বয়ং নওয়াব আবদুল লতিফই বলেছিলেন বাঙালী [তথা বাঙালা দেশস্থ] মুসলিমের মাতৃভাষা উর্দু, কেবল ছোটলোক মুসলিমের মুখের ভাষা বাঙলা এবং ওদেরকেও ক্রমে উর্দুভাষী করে তুলতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি নানা মানসিক, আর্থিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক এবং রাজনীতিক কারণে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখের দায়িত্ব-কর্তব্য কিংবা অধিকারই ছিলনা চিন্তা-চেতনায় ঠাঁই দেয়ার কিংবা কৃপা-করুণায় দানে-দাক্ষিণ্যে-সেবা-সহায়তায় মুসলিম সমাজের হিতৈষণা প্রকাশে। উনিশ শতকে এমনকি কম্যুনিস্ট প্রভাব পূর্ব বিশ শতকেও হিন্দু ও মুসলিম চিন্তায়-চেতনায় মনে-মননে সাহিত্যে-দর্শনে নয় কেবল, ইহজাগতিক বৈষয়িক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ও নিত্যকর্মে আচরণে সাধারণভাবে স্বাতন্ত্র্যে স্বাজাত্যে প্রায় অটল অবিমিশ্র ছিল, নীল নদের জল ধারার মতোই। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখিয়ে আত্মপ্রবোধ দেয়া উচিত হবে না। কেননা তাতে ইতিহাসই বিকৃত হবে মাত্র। গোত্র ও দেশ অঞ্চল ছিল বিভিন্ন দলের মানুষের পরিচিতির ভিত্তি। ইংরেজ এসেই গোটা ভারতের মানুষকে হিন্দু ও মুসলিম নামে দ্বিধা বিভক্ত ও চিহ্নিত করে। স্থায়ী দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের বীজ হল এ ভাবেই উপ্ত। ব্রিটিশ ভেদনীতি, বিষ বিকৃত মন হিন্দুরা দেশজ মুসলিমে ও তুর্কী মুঘল শ্যাসক-গোষ্ঠীর মুসলিমের যে দেশজ খ্রীস্টানের ও ইংরেজের মতো পার্থক্য রয়েছে তা উপলব্ধি করেনি। উনিশ শতকের বাঙালী মনীষীরা সবাই হিন্দু কেন? তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ প্রায় সমসংখ্যক মুসলিমকে বাদ দিয়ে কেবল হিন্দু-চেতনায় ও হিন্দু হিতৈষণায় আবর্তিত কেন, এ সব প্রশ্নের সদুত্তরের জন্যে উপর্যুক্ত ভূমিকা আবশ্যিক ছিল।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রতীচ্য প্রভাবে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটল শিক্ষিত বাঙালীচিত্তে, যাকে বাঙলার জাগরণ, হিন্দুর পুনরুজ্জীবন, বাঙলার রেনেসাঁস প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হয়, তাতে বাঙালী মুসলিম ছিল অনুপস্থিত। অর্থ-বিত্ত-শিক্ষার অভাবে কোলকাতা শহরের প্রসাদ-বঞ্চিত ছিল তারা। তাই রাজা রামমোহনের চিন্তা-চেতনা-কর্ম আবর্তিত হয়েছে বর্ণ হিন্দুর আধুনিকায়নে, বিদ্যাসাগর আত্মনিয়োগ করেছিলেন বর্ণ হিন্দু ঘরের নারীর বধূ-বিধবার মুক্তি সাধনে আর জ্ঞান চক্ষুরূপ শিক্ষাদানে অজ্ঞতা ঘোচানোর কাজে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ–তিনজই মুগ্ধ চিত্তে আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রাচীন আর্যের তথা হিন্দু ভারতের মহত্ত্ব-মহিমা অনুধাবনে ও প্রচারে।

ঈশ্বরচন্দ্র আবাল্য গোঁয়ার ও জেদী ছিলেন, পিতার আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ লঙ্ঘনেই ছিল তাঁর আনন্দ ও সুখ। এতে বোঝা যায় গুরুজন মানার শাস্ত্রীয় যে নির্দেশ রয়েছে— ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের সন্তান তা আবাল্য অমান্য করেছে। নিজের ইচ্ছামতো স্বাধীন জীবন যাপনে ছিল তাঁর আগ্রহ, জেদ বা স্বমতে সুস্থির থাকার গোঁয়ার্তুমি ছিল তাঁর মন-মননের নিত্যসঙ্গী। সংস্কৃত কলেজে দেড়-দুহাজার বছরের প্রাচীন বিদ্যার জগতে বিচরণ করেও শাস্ত্রের, ন্যায়ের, দর্শনের ও সাহিত্যের সে-জগতের ও সে-জীবনের প্রভাব কচু-পদ্ম পাতার মতোই এড়িয়ে চলেছিলেন। বরং ইংরেজী না জেনেও এবং হিন্দু কলেজে না পড়েও তিনি ডিরোজিওর যে-কোন বিশ্বাস-সংস্কারমুক্ত ছাত্রের চেয়েও ছিলেন বর্জনে গ্রহণে প্রাগ্রসর। তিনি আস্থা হারিয়ে ছিলেন শাস্ত্রে, বেদান্তে, সংখ্যা দর্শনে, অলীকে, অলৌকিকে আর যাদুশক্তিতে। তাঁর মন মনন কর্ম আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি ও বিবেক। তাঁর বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে আত্মশক্তির, সঙ্কল্পের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্যমের ও উদ্যোগের এক প্রকার সাযুজ্য ছিল। আত্মভিমান কিংবা আত্মমর্যাদাবোধ তীক্ষ্ণ ছিল বলে তিনি সৎকাজেও সমকালের সমমতের ইয়ংবেঙ্গল বা ব্রাহ্মদের সাহায্য-সহযোগিতা যাচঞা করেন নি কখনো, ওই জেদ বা গোঁয়ার্তুমি আর আত্মসম্মান চেতনা তাঁকে বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনে অবিমৃষ্যকারী করে রেখেছিল। দরিদ্র সন্তান ভরযৌবনে অর্থ-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতার উৎস অতোবড়ো চাকরী অধ্যক্ষপদ হেলায় ত্যাগ করে অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে ছিলেন নিশ্চিন্তে, তবু ওই তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ; ওই জেদ তাঁকে চিরকাল অবিচল আত্মপ্রত্যয়ী এবং নির্ভীক নিঃসঙ্গ অসম সাহসী রেখেছিল আমৃত্যু। অবশ্য কিছু বন্ধু ও সহযোগীর সততায়, আন্তরিকতায়, সরলতায় ও সহযোগিতায় আস্থা হারিয়ে শেষ বয়সে তিনি সামান্য নৈরাশ্যে ভুগেছিলেন, অসুস্থ শরীরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সাঁওতাল এলাকায় কার্মাটারে। তাঁর বাড়ির নাম ছিল নন্দন কানন।

ভূতে-ভগবানে বিশ্বাস এবং ভয়-ভক্তি-ভরসা এবং শাস্ত্রিক নীতি নিয়ম আচার আচরণ পালাপার্বণ লঙ্ঘনে পাপ ভয়ও জাগে শৈশব-বাল্যেই। তাছাড়া সংস্কারদুষ্ট বিশ্বাসপুষ্ট আস্তিক দেশাচার-লোকাচার লঙ্ঘনেও ক্ষতির, নিন্দার ও পাপের ভয় পায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্রে আমরা আবাল্যই গুরুজনের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা, দেব-দ্বিজে ঔদাসীন্য দেখেছি। শিক্ষার্থী রূপেও শাস্ত্রে দর্শনে ন্যায়ে-স্মৃতি-পুরাণে তাঁর শ্রদ্ধার কোন প্রমাণ মেলে না। শিক্ষক হয়েই তিনি বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন ভুল বলেই পাঠ্যসূচী থেকে বর্জনের সুপারিশ করেছিলেন। এ ইয়ংবেঙ্গলের ছদ্ম প্রাগতিকতায় উচ্চারিত স্বদেশী শাস্ত্র-সমাজ নিন্দা ছিল না, তার প্রমাণ তিনি বার্কলের ইনকোয়ারিতে ও রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বেও ভুল দেখে ছিলেন। অধ্যক্ষ হয়েই দেশাচার লোকাচার ও শাস্ত্রের অপৌরুষেয় পবিত্রতা অস্বীকার করে তিনি বৈদ্য-কায়স্থেরও সংস্কৃত কলেজে পড়ার অধিকার দেন, যদিও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আশঙ্কায় অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার দিতে সাহস পাননি। উল্লেখ্য যে, তাঁর মেট্রোপলিটন স্কুলেও সম্ভবত একই আশঙ্কায় মুসলিম শিক্ষার্থীর ভর্তি নিষিদ্ধ ছিল। কাশীর পণ্ডিতদের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর চরম তাচ্ছিল্যে বলেছিলেন যে পিতা মাতা ছাড়া তিনি কোন দেবতা-ঈশ্বর মানেন না। অনভ্যাসে বিদ্যাসাগর গায়ত্রী মন্ত্রও বিস্মৃত হয়ে ছিরেন। বিদ্যাসাগর জীবনে কখনো নিয়তি মানেননি। পুরুষার্থই ছিল তাঁর পুঁজি-পাথেয়। বিদ্যাসাগরের দান দাক্ষিণ্যের লক্ষ্যও ছিল না পুণ্যর্জন। তাঁর উইলে কোন ইষ্ট দেবতার বা মন্দিরের সেবা-সংরক্ষণের উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় প্রমাণ তিনি শাস্ত্রমানা ব্রাহ্মণ হলে বিধবা বিয়ের কথা মুখেও আনতেন না। দেশাচার লোকাচার মানতেন, পরাশর-পাঁতি খুঁজতেন না। বিদ্যাসাগরকে তাঁর কর্মজীবনে কেউ পূজা-অর্চনা করতে দেখেনি। কোন গুরুর কাছেও নেননি দীক্ষা।

আবাল্য ভূতে-ভগবানে সর্বপ্রকারের বিশ্বাস-সংস্কারমুক্ত না থাকলে এমন আত্মশক্তি-সাহস নিয়ে নিঃশঙ্ক নিঃসঙ্কোচ চিত্তে কেবল জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি চালিত হয়ে শাস্ত্র-দেশাচার-লোকাচার বিরোধী ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সারা জীবন স্থির থাকতে পারতেন না। এমন কি, গ্রন্থ-অনুবাদ কর্মেও তাঁর নাস্তিক্য-রুচির স্বাক্ষর রয়েছে বর্জনের ক্ষেত্রে। বিদ্যাসাগরের চরিত্র-লক্ষণ হচ্ছে কিছু পছন্দ না হলে তা না-মানা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও একলা চলা। বিদ্যাসাগরের এ নির্ভীক-নিঃশঙ্ক-নিঃসঙ্কোচ শক্তি-সাহসের উৎস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে তাঁর নাস্তিকতা। বাল্যে যা তাঁর নীতি-নিয়ম আচার-লঙ্ঘনের জেদে ঔদ্ধত্যে গোঁয়ার্তুমিতে তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর মনোভূমে উদ্ভূত। বাল্যে কৈশোরে-যৌবনে হিন্দু শাস্ত্র মন্থনেও তাঁর মধ্যে ফিরে আসেনি শাস্ত্রে আস্থা বা আস্তিক্য। রামমোহনও যুক্তিবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো এমন সর্ব সংস্কারমুক্ত হতে পারেননি তিনি মনে-মননে কিংবা আচার-আচরণে। উনিশ-বিশ শতকের আর আর কবি-দার্শনিক জ্ঞানী গুণীজনেরাও যখন ভূতে-প্রেতে-মন্ত্রে-মাদুলীতে-কবচে-সূতোয় নক্ষত্রে-রাশিতে-তিথিতে-স্বপ্নে-প্লেনশেটে আস্থাবান, তখন অক্ষয় কুমার দত্তের, বিদ্যাসাগরের মতো নাস্তিকদের কিংবা প্রত্যক্ষবাদীদের উঁচুমানের ও মাত্রার মননের এবং মনস্বিতার প্রশংসা করতেই হয়। য়ুরোপীয় Rationalism প্রভাবিত প্রথম প্রখ্যাত Rational ব্যক্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যথার্থ যুক্তিবাদী সাহসী মানুষ মাত্রই প্রতিবেশ থেকে প্রাপ্ত সর্বপ্রকার লৌকিক, অলৌকিক, ও অলীক বিশ্বাস সংস্কারমুক্ত হয়। তখন আসমানে জমিনে যা প্রত্যক্ষ বা যুক্তিগ্রাহ্য নয় তার কাল্পনিক আনুমানিক অস্তিত্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিচালিত মানুষ স্বীকার করে না।

বিদ্যাসাগরও স্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি শাস্ত্র-সংস্কারক ছিলেন না, ছিলেন নারী ও শিক্ষা বিষয়ে সমাজ-সংস্কারক। তাই আস্তিক্য, নাস্তিক্য কিংবা শাস্ত্রের অসত্যতা-অন্যায্যতা, অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্ক বা আলোচনা-প্রচারণা করেন নি। সে-বিষয়ে ছিলেন নীরব এবং বৃথা জেনেই আস্তিক হিন্দু সমাজে গ্রাহ্য করার জন্য তিনি জ্ঞান-যুক্তি-ন্যায় প্রয়োগ করেন নি পাঁতি খুঁজে ছিলেন শাস্ত্রে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে। হিন্দুগ্রাহ্য পাঁতি পেয়েছিলেন পরাশর সংহিতায়। মুক্তিপ্রবণ যুক্তিবাদী নির্ভীক ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রোক্ত ও অনুমানে অনুভূত উপলব্ধ এবং দেশাচার লোকাচার ভূত ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা রাখতে পারেন নি। তাঁর চেতনায়-এ শূন্যতার যৌক্তিক, বৌদ্ধিক নাম নাস্তিকতা নিরীশ্বরতা।

যে-কোন মানুষের পরিচিতি বা জীবনকথা লেখেন সাধারণভাবে শ্রদ্ধাবান ভক্তিমান বা অনুরাগী ব্যক্তিরাই। এঁরা 'দোষ হয় গুণধর' নীতিই সাধারণভাবে গ্রহণ করে থাকেন, ফলে বর্ণিত ব্যক্তির চরিত্রের ও কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি অপ্রকাশিতই থেকে যায়। এমন কি জ্ঞাত অপকর্মও অপব্যাখ্যায় খোঁড়া যুক্তিতে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা হয়। এ এক প্রকার সৌজন্য। ক্বচিৎ কোন শত্রুতেও প্রতিহিংসা বশে অপরের জীবনী লিখে থাকেন। তাতে কেবল নিন্দা-কুৎসা থাকে, থাকে কুকৃতি-কুমতলবের বয়ান। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা গ্রন্থ যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও কৃতিমুগ্ধ অনুরাগী বা শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে বিদ্যাসাগরের কৃতির লিখিত মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপতাই ছিল উল্লেখ্য। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে ১৯৭০ সন অবধি বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন ছিল ভক্তি ও অনুরাগ প্রসূত স্তাবকতা মিশ্রিত। ১৯৭০ সনে বিদ্যাসাগরের সার্ধশত জন্ম বর্ষপূর্তি উৎসবকালীন কোন কোন বিদ্বানের লেখা, খুঁটিয়ে খতিয়ে তাঁকে দেখা-দেখানোর, বোঝা-বোঝানোর এবং তাঁর সর্বপ্রকার কৃতির সামাজিক, শৈক্ষিক ও সাহিত্যিক অবদানের মূল্যায়নের প্রয়াস-প্রযত্ন ছিল। তারপরেও তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও বই লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কেননা তিনি ছিলেন উনিশ শতকের একজন যুগপুরুষ। অন্যতম চিন্তা-নায়ক ও সংস্কারক। উনিশ শতকের চার চিন্তানায়ক রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেকানন্দের মধ্যে সব দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থান বিদ্যাসাগরেরই। উনিশ শতকের বাঙলার অনন্য সৃষ্টিশীল লেখক রবীন্দ্রনাথের ওঁদের মতো কোন ভূমিকা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের চিন্তানায়ক।

১। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আজ অবধি অনেক বিদ্যাসাগর-ভক্ত আস্তিক এবং হিন্দু তাঁকে জেনে বুঝেও সরাসরি নাস্তিক বলে অভিহিত করেন না, কারণ নাস্তিক্য আজ অবধি সমাজে নিন্দনীয়। চণ্ডীচরণ বলছেন, 'অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন প্রকার ধর্ম বিশ্বাস ছিল না।' --অনেকের এ ধারণা কেন হল, এ ধারণা অসঙ্গত কেন, তা বয়ান না করেই নিজের ধারণা ও সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন-- 'তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী লোক ছিলেন।'[১]

২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্তের ও বিদ্যাসাগরের তত্ত্ববোধিনী সূত্রে ধর্মে ও শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা টের পেয়েছিলেন।[২]

৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দূর থেকে বিদ্যাসাগরকে Agnostic বলেই মনে করতেন। 'বিদ্যাসাগর ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী– এই অজ্ঞেয়বাদীকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনা।[৩]

৪। কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য-বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক এবং স্বসৃষ্ট ভাষাশৈলীর জন্যে গর্বিত বলেই জানতেন।[৪]

৫। বিনয়ঘোষের মতে বিদ্যাসাগরকে 'নাস্তিক বলা যায় না। তাঁর ধর্ম তাঁর ঈশ্বর তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। বিদ্যাসাগর একেশ্বরবাদী।'[৫] (পৃ: ৪৪৪)

৬। বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যপুস্তক বোধোদয়-এর প্রথম মুদ্রণে স্রষ্টা বা ঈশ্বর বিষয়ক কোন রচনা ছিল না, পরে পণ্ডিত বিজয় গোস্বামী [১৮৫১] আস্তিক হিন্দু সন্তানের স্বার্থে তাঁকে এ ত্রুটির কথা জানালে তিনি 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ' বলেই ঈশ্বর পরিচিতি বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে সর্বজনীন দার্শনিক চেতনার প্রয়াস রয়েছে বটে, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাসের স্বাক্ষর নেই।[৬]

৭। ধর্ম সম্বন্ধে যে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তার প্রমাণ উনিশ শতকী কোলকাতার খ্রীস্টান ব্রাহ্মণ কিংবা সনাতন ধর্মের পক্ষে-বিপক্ষে তর্কে বিতর্কে তিনি কখনো যোগ দেননি, আগ্রহও দেখাননি, রামকৃষ্ণ পাননি তাঁর সমাদর। বরং তিনি নাকি কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, 'ধর্ম যে কি তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত, এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।'[৭]

৮। অন্য এক প্রসঙ্গে নাকি তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের বিষয়ে আমি নিজে কিছুই জানিনা।'--উল্লেখ্য যে এ উক্তি সংস্কৃত কলেজের একজন প্রাক্তন শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ছাত্রের। এর চেয়ে ঈশ্বরে ঔদাসীন্যের ও অনাস্থার আর কি প্রমাণ দরকার![৮]

আমাদের নিশ্চিত ধারণা যে বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর আস্থা আবাল্য কখনো গড়ে ওঠেনি। সংস্কৃত কলেজে শাস্ত্র ও আনুষঙ্গিক দর্শন ও সাহিত্য গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করেও তিনি জীবনে কখনো আস্তিক্য ফিরে পাননি, বিশ্বাস-সংস্কারও আবাল্য তাঁর মনোলোকে ঠাঁই পায়নি। তাই আবাল্য তিনি পারিবারিক আদব-কায়দা, সামাজিক আচারিক নীতি-নিয়ম, শাস্ত্রিক আচার জেদের ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেপরওয়াভাবে লঙ্ঘন করেছেন। নিত্য উচ্চারিতব্য গায়ত্রী-মন্ত্রও এ দ্রোহী ব্রাহ্মণ সন্তান অভ্যাস বশেও উচ্চারণ করেন নি, এ মন্ত্র নাকি ভুলেই গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি কর্মজীবনে কখনো পূজা-অর্চণা করেন নি, প্রথার আনুগত্য বশেও হননি কোন গুরুর কাছে দীক্ষিত। যখন মৃত্যুচিন্তা এল তখনো কোন বিশ্বাস সংস্কারগত দুর্বলতা বশে দেবতার সেবা বা মন্দির-সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখেননি তাঁর উইলে। যে-বেদান্ত দর্শনে হিন্দু তত্ত্বচিন্তার চরম ও পরম প্রকাশ তাকেই তিনি ভুল বা মিথ্যা বলে জানতেন। উঁচুমানের দর্শন সংখ্যও ছিল তাঁর কাছে ভুল। তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দু শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির কোন প্রভাব দুর্লক্ষ্য। এ দিক দিয়ে তিনি সংস্কারমুক্ত স্বশিক্ষিত প্রতীচ্য মনন ও সংস্কৃতি প্রভাবিত শ্রেয় ও প্রেম চেতনা পুষ্ট আধুনিক মানুষ। এমন মানুষ উনিশ শতকের কোলকাতায় দুর্লভ ছিল।

বিদ্যাসাগর চিঠিপত্রের শীর্ষে শ্রীহরি/শ্রী দুর্গা লিখতেন, দেহে ধারণ করতেন উপবীত, আর পিতা- মাতার ও পিতামহীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শ্রাদ্ধাদি করিয়েছিলেন। এ গুলো সামাজিক প্রথার আনুগত্য আর আস্তিক আত্মীয়ের হয়ে তাঁদের বিশ্বাসানুগ প্রথায় তাঁদের কল্যাণে পারিবারিক-সামাজিক দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য করণ মাত্র, আস্থার বা আস্তিক্যের সাক্ষ্য নয়। কেননা নাস্তিক কম্যুনিস্টরা আজো সমাজ মেনে শাস্ত্রিক অনুষ্ঠানে বিয়ে করে, পিতা-মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি তাঁদের কল্যাণে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করে। একে আস্থার প্রমাণ বলা চলে না। নাস্তিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এক কালে এক পত্নীত্ব প্রথা না মেনে পারেন নি।

আমাদের ধারণা বিদ্যাসাগরের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে বুদ্ধির সঙ্গে যুক্তির, শক্তির সঙ্গে সাহসের, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যমের ও উদ্যোগের সমন্বয় ঘটেছিল। এসব ছিল বলে তিনি কেবল এগিয়ে ছিলেন, পিছু হটেন নি, আপোস করেননি। তাঁর জেদ ও নাস্তিক্যই তাঁর সর্বপ্রকার শক্তি-সাহসের, নির্মোহ শ্রেয়ো চেতনাই তাঁর কর্ম-আচরণের নিয়ন্ত্রক। তাই গোটা উনিশ শতকের কোলকাতার লক্ষ লক্ষ ধন-মান-খ্যাতি-ক্ষমতার মানুষের মধ্যে বিদ্যাসাগর আজো নির্বিশেষ বাঙালীর কাছে চেতনায়, কৃতিত্বে ও চরিত্রে প্রেরণার ও প্রবর্তনার আলম্বন হয়ে রয়েছেন, রয়েছেন সুউচ্চ মিনারের মতো, নাবিক-দিশারী বাতি-ঘরের মতো, কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো, বিকন আলোর মতো অনন্য ও অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রমূর্ত মনুষ্যত্ব রূপে। বিদ্যাসাগর জীবনের পুঁজি-পাথেয় ছিল সেই জেদ, গোঁ ও নাস্তিক্য।

বিদ্যাসাগরেরা, আঠারো-উনিশ শতকের হিন্দুরা, বিদেশী-বিধর্মী-বিভাষী ইংরেজের আর্থিক অনুগ্রহ ধন্য ছিল, কোলকাতায় তখন মুসলিম অনুপস্থিত ও অন্যত্র চাকরী ও ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত। প্রতিবেশী নয় বলে শাস্ত্র-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী বা দ্বেষণার প্রতিপক্ষ নয় তাদের ব্রিটিশ। তাই হিন্দু-ব্রিটিশ পরস্পরের গুণমুগ্ধ বান্দা-প্রভু। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, প্রাশাসনিক ভাষা ইংরেজী, নতুন নতুন প্রাশাসনিক আইন, সব বর্ণ হিন্দুর ও কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূলে ছিল। এ জন্যেই সিপাহীদ্রোহে, ওয়াহাবীর স্বাধীনতা-আন্দোলনে, কৃষকদ্রোহে, নানা স্থানিক নিপীড়ন-নিবর্তক আইনের বিরুদ্ধে, দেশী ক্ষুদ্র পেশাজীবীর পরোক্ষে পুঁজি-পাথেয় হরণে, তাঁত শিল্প উচ্ছেদে ইংরেজ বর্বরতা বর্ণ হিন্দুর সাহায্য সমর্থনই পেয়েছিল। রামমোহন দ্বারকানাথরা সমর্থন করেছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলচাষীর দৌরাত্ম্য। এ কারণেই বিদ্যাসাগরে ইংরেজ শাসন-শোষণের প্রতিবাদ প্রতিরোধ নেই। যেন সেই চেতনারই উন্মেষ হয়নি ব্রিটিশ-কৃপাপুষ্ট হৃষ্ট, পুষ্ট, তৃপ্ত, বর্ণ হিন্দু সমাজে। এ দেশ-কালের প্রভাব, তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা নয়।

তথ্য-সংকেত

১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৬, পৃঃ ৪৬৫।
২. তত্ত্ববোধিনী পরিচালনা প্রসঙ্গে উক্ত।
৩. পুরাতন প্রসঙ্গ ঃ বিপিন বিহারী গুপ্ত।
৪. তদেব
৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃঃ ৩৮১, ৪৪৪; বিনয়ঘোষ।
৬. বিদ্যাসাগর চরিত্রে, চিন্তায়, কৃতিতে ঃ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র গ্রন্থ। –আহ্মদ শরীফ।
৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ–বদর উদ্দীন উমর, পৃঃ ৪৭।
৮. Vidyasagar : A Re-assessment, New Delhi, ১৯৭২, পৃ ৯১. Gopal Haldar. প্রসেনজিৎ চৌধুরীর অসমীয়া প্রবন্ধে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ–দেবরঞ্জন ধর–'মানব মন' পত্রিকা বিশেষ অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৯০ সন, পৃঃ ২০৩।

AMARBOI.COM

শ্রমজীবী মানুষ

প্রাণিজগতে পিঁপড়ে-উই-মৌমাছি প্রভৃতি জীব যৌথভাবে ভোগের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করে। অন্য প্রাণীরা একক ভাবে স্ব-স্ব খাদ্য সংগ্রহ করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে বলে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আহার্য সন্ধানেই ঘুরে বেড়ায় আর এভাবেই জীবন কাটায়। খাদ্য যোগাড়ও হয়, তারা বেঁচে বর্তেও থাকে। আশ্চর্য সর্বপ্রকার সুবিধে, বুদ্ধি এবং কায়িক তথা আবয়বিক সুযোগ-সুবিধে সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও এবং পৃথিবী অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও মানুষই সবচেয়ে বেশি মরে খাদ্যাভাবে। হাজার হাজার বছর ধরে নিঃস্ব ব্যক্তিমানুষ ও পরিবার দৈনিক খাদ্য যোগাড়ে অনিশ্চিত জীবন যাপনে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আফ্রিকা-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি মানুষ বানেভাসা প্রাণীর মতো ক্ষুধার কাছে, খাদ্যে অনিশ্চিয়তার কাছে আত্মসমর্পণ করেই নিশ্চিন্ত। যা অসাধ্য তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না মোটেও। পায় তো খায়, না পায় তো উপোস করে, জোটে তো ভালো, না জোটেতো শূন্য পেটেই শুইয়ে পড়ে। বরং দাসযুগে প্রভু প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার গরজে গৃহপোষ্য প্রাণীর মতো এদেরও নিকৃষ্টমানের ও নিম্নতম হারের পানাহারের ব্যবস্থা রাখত। কেবল খরা-বন্যার সময়ে কোন কোন মনিব এদের পানাহার বন্ধ করে প্রাণে মরার ব্যবস্থা করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা, সুদিন ফিরে এলে খরা-বন্যা-মহামারীর মৌসুম অবসানে সস্তায় মিলত নতুন দাস। দাস পালন তো সম্পদঋদ্ধ নিশ্চিত বিলাসী জীবন যাপনের জন্যেই। সে-যুগে দাস ছিল লগ্নিপুঁজি। উৎপাদন-নির্মাণের শ্রম-যন্ত্র।

সেযুগের অবসানে শ্রম ও পণ্য বিনিময় প্রতীক ধাতবমুদ্রা কিংবা পণ্যই বা শস্যই যখন বিনিময়-প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হতে লাগল, তখন থেকেই অর্থাৎ শাহ-সামন্ত যুগে মানুষ যখন প্রজারূপে শ্রমের বিনিময়ে আহার্য সংগ্রহ করা শুরু করল, তখনই সমাজে নতুন বিপর্যয় শুরু হল। ধূর্ত-প্রবল-প্রতারক-লিপ্সু ছলে বলে কৌশলে ভূমি দখল করে করে অন্যদের মজুরে পরিণত করতে থাকে। এদের থেকেও ধূর্তও বাকপটু কুশল যারা, তারা পুরোত হয়ে পুজিত, সেবিত, সম্মানিত পরান্নজীবী হয়ে রইল।

আশ্চর্য যে যদিও আমরা স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রসঙ্গে প্রায় সর্বক্ষণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানব-মানবতা, শাস্ত্র, সমাজ, ন্যায়-নীতি, নিয়ম-কানুন, কৃপা-করুণা-দয়া দাক্ষিণ্য, সেবা, সহানুভূতি, মানবিক-দায়িত্ব কর্তব্য, অধিকার, জীবনের তাৎপর্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য লক্ষ্য, পাপ-পুণ্য, ইহ-পরলোক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক জীবন সম্বন্ধে নানা অলীক অলৌকিক কাল্পনিক কিন্তু মানসিক অর্থাৎ বিশ্বাস-সংস্কারের সত্য এক জগতে এবং জীবনে আস্থা রাখি, শুধু তা-ই নয়, পার্থিব সবকিছুই যেন অভিন্ন মূল রত্তনের মতো ওই অলীক বিশ্বাসের অলৌকিক কাল্পনিক সত্তাই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের আবাল্যের সর্বপ্রকার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের, নীতি-নিয়মের, বিশ্বাস-সংস্কারের, রীতি-রেওয়াজের প্রথা-পদ্ধতির পাপ-পুণ্যচেতনার, আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ধারণের মূলে রয়েছে সে-অনড় আস্থা। যুগ যুগ ধরে জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত অর্হৎ সাধু-সন্ত-শ্রমণ-শ্রাবক-নবী-অবতার এদের খেয়ে বাঁচার সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের কথা কখনো ভাবেননি উটোপিয়ান মানববাদী ও মার্কস-এঙ্গেলসের আগে। কেবল কৃপা-করুণা দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন বটে, কিন্তু তা লোকসমাজে [ব্যক্তিক ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল] কখনোই অনুসৃত বা রূপায়িত হয়নি, কিছু পার্বণিক প্রথা চালু ছিল বটে। আজো আমাদের প্রায় পাঁচ কোটি নিঃস্ব নিরন্ন শ্রমজীবী মানুষ অনিশ্চিত প্রাত্যহিক জীবনকে নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে নিয়েছে, কাজ পেলে খায়, না পেলে উপোস করে। এরা সচ্ছল ধনী ভদ্রলোকদের মতো ভবিষ্যৎ বলে কিছু জানে না, মানে না, বোঝে না। এরা দেহ-প্রাণ-মনের সংরক্ষণ সম্ভব নয় বলেই শৈশবে বাল্যেই বেপরওয়া হয়ে যায়, নিঃস্ব, নির্ধন বলে এরা বিনা রোগে মরে, অনাহারে মরে, অপুষ্টিতে মরে, কাজেই এরা মানসিকভাবে শৈশব থেকেই অভীক। বেনো জলের মতোই, কিংবা জাহাজ-ভাঙা সমুদ্রজলের মতোই আকূল মনে করে এ পৃথিবীটাকে। যতক্ষণ দেহে-প্রাণে মনে বাঁচা যায় তো বাঁচবে, যেকোন সময়ে নিরুপায় বলেই এরা মরতে যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত। এদের অতীত হচ্ছে মৃত্যুকে এড়িয়ে আসার স্বস্তি সুখ, বর্তমান হচ্ছে বাঁচার প্রয়াস আর ভবিষ্যৎ হচ্ছে কেবল স্বপ্ন ও সাধ। এদের জন্যে কাল মার্কস ছিলেন, আজ তাঁকেও বুর্জোয়ারা নির্বাসন দিচ্ছে। শ্রমজীবী নিঃস্ব নিরন্ন নিরুপায় মানুষের এ নিশ্চিন্ততা অসমাধ্য অনিশ্চয়তারই এক অভ্যস্ত রূপ। আমাদের জীবনে এমনি আর্থিক অনিশ্চয়তা যে দুঃখ-দুশ্চিন্তা-যন্ত্রণা-জাগায়, এ অসহায় মানুষ তার থেকে মুক্ত। এরাও সে-অর্থে মনুষ্য সমাজভুক্ত হলেও যথার্থই অন্য প্রজাতির মতো প্রাণীই। কতকাল এরা কেবল প্রাণী থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্লানির স্মৃতি

জীবনে সুখ ও আনন্দ অনুভবের তীব্রতা বা উপলব্ধির তীক্ষ্ণতা ফুরায়, তেমনি দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশ-ক্ষোভ-ক্রোধ-লিপ্সারও এক সময়ে আপাত বিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু দুটোরই স্মৃতি সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে, একেবারে বিমোচন-বিলুপ্তি ঘটে না, তাই অন্যকোন সদৃশ বা বিপরীত অনুষঙ্গে কিংবা প্রসঙ্গে সে-সুখ-আনন্দ-অনুভব-উপলব্ধি দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশা-ক্ষোভ-ক্রোধ-হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষা ও লিপ্সা জেগে ওঠে মনের গভীরে, নিভৃত নিলয়ে, নির্জন-নিরালায় মনের আপাত অবসরে বর্তমানের ক্ষণিক বিস্মরণে।

এ গুলোও এক অর্থে জীবনের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত। কারণ এর মধ্যে জয়ের, জিগীষার ও জিঘাংসার অনুভূতি যেমন থাকে, যেমন থাকে কাঙ্ক্ষার স্বপ্নের সাধের লোভের রিরংসার স্মৃতি, তেমনি থাকে তিরস্কারের লাঞ্ছনার বঞ্চনার পরাজয়ের অসাফল্যের গ্লানি ও জ্বালা, কোন কোন স্মৃতি যখনই জাগে তখনই নিজের চিত্তলোকে রাত দুপুরেও যেন সদ্যঘটা বা সদ্যপাওয়া শরম-সংকোচ-লজ্জা-গ্লানি জাগায়। তাই তেমনি স্মৃতি যেন বর্তমান হয়ে অবিনাশী অদূর অতীতের হয়ে মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। এ অবস্থাটা গৌরবের গর্বের আনন্দের, সুখের, সাফল্যের স্মৃতিজাত নয়, এটা সাধারণত আকস্মিকভাবে অপদস্থ হওয়ার, তিরস্কৃত হওয়ার, থাপ্পর খাওয়ার, জনসমক্ষে লজ্জা বা শাস্তি পাওয়ার অপ্রতিরোধ্য গাল-মন্দ-নিন্দা শুনতে বাধ্য হওয়ার স্মৃতি। এসব স্মৃতির স্থান-কাল-পাত্র ভেদ নেই, আত্মীয়-স্বজন-পরিবার-পরিজন থেকে কিংবা পর-পড়শী-পরিচিত-অপরিচিত থেকে পাওয়ার মধ্যে মান-মাপ-মাত্রাগত পার্থক্য নেই কিছু।

জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে নানা স্থূল সূক্ষ্ম জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা, লাভ-ক্ষতি, সংকোচ-শরম, লজ্জা-গ্লানি প্রভৃতির আরো নানা বিষয় থাকে নিত্যকার সুদীর্ঘজীবনে, কর্মে-আচরণে, সেগুলোর স্মৃতি কিন্তু এমন পীড়া দেয় না, যেমন কথা দিয়ে কথা না রাখা, প্রয়োজনে মিথ্যে আশ্বাস দেয়া, স্বার্থে সক্রিয় থাকা, স্বলাভের প্রত্যাশায় অপরকে প্ররোচিত করে তার ক্ষতির সম্ভাবনা বুঝেও কোন কাজে জড়িয়ে দেয়া, ঘুষ, উপঢৌকন, কমিশন, দালালি, পাওনা বখশিস প্রভৃতি নিত্য অর্জনে আসক্তি-- এ সব অর্থনৈতিক কর্মে-আচরণে মানুষ কিন্তু কোন গ্লানি-লাঞ্ছনা-পাপ বোধে বিবেকের দংশন অনুভব করে না, যেন সংসারে বাঁচতে হলে, কাজে-কর্মে-অর্জনে এসব যেন ন্যায্য অভ্যাস ও নীতি-নিয়ম-রীতি-রেওয়াজ আবশ্যিক। এ ন্যায্যতা ও অপরিহার্যতা চেতনাই আমলা-মন্ত্রী প্রভৃতি ক্ষমতাবানদের দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতিপরায়ণ সম্পদশালী ও সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি করে তোলে। দোকানদার, মৌজুতদার, আড়তদার, সওদাগর, কারখানাদার, ঠিকেদার ভেজালদার আর ফড়ে-দালালরা কমিশনভোগী অবিবেক-অবিবেচক অমানুষে পরিণত হয়। এ কারণেই তারা শাস্ত্র, সমাজ, সভা, ক্লাব-আড্ডা-প্রভৃতি সর্বত্র সাধারণভাবে কারো বিশ্বস্ত মুৎসুদ্দী, কারো নির্ভরযোগ্য সহকারী, কারো বন্ধু, কারো আস্থার পাত্র এক বিভ্রান্তিকর স্বজন, সুজন, বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন, সজ্জন, শ্রদ্ধেয় বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতাবান ভরসা করবার মতো সামাজিক ব্যক্তিত্ব। মন্দির-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসজিদ-গির্জার চাঁদা কমিটির সদস্য-সভাপতি-কোষাধ্যক্ষ, ক্লাবের নির্বাচিত সৎ সদস্য, ন্যায়পরায়ণ শালিস, সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। মানুষ ফেরেস্তা নয়, নিষ্কাম সন্ত সন্ন্যাসীও নয়, কাজেই দোষে-গুণে মানুষ। দোষ-গুণ সবটা যখন অজ্ঞাত, তখন 'দোষ হর গুণ ধর', নীতিই কেজো বলেই উত্তম। আর যারা সত্যি সত্যি সৎ, তারা হয় ভীরু ও স্বল্পবুদ্ধি নয়তো নরকযন্ত্রণার বিভীষিকাকাতর। এমন কি স্বসত্তার মূল্য মর্যাদা, অভিমান বা ন্যায়-নীতি-আদর্শ ও আত্মসম্মানবোধে যারা সৎ, তাদেরও প্রতি লোকে তেমন আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাবান নয়, প্রমাণ তাদের কর্ম-আচরণকে তারা আদর্শরূপে গ্রহণ করে না।

কেবল তাদের কথা উঠলে তারিফ করে মাত্র। অনুকরণ-অনুসরণ করার কথা ভাবে না। লোকে জানে সৎলোক প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়, অন্যে ক্ষতিবিমুখ, তাই তাদের কেউ ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভরসা করে না। কিন্তু জীবিত বা মৃত সাধু-ফকির-সন্ত-দরবেশ তুষ্ট হয়ে লাভ এবং রুষ্ট হয়ে ক্ষতি করে—এ শোনা বিশ্বাসে এরা দরগাহ-দেউর-দেহারা পুজো করে।

প্যারীচাঁদ মিত্র ঠক চাচার মুখে একটি চিরন্তন সত্য পুরে দিয়েছেন, 'দুনিয়া দারি করতে হলে ভালো বুড়া দুই-চাই। দুনিয়া ভালো নয়, মুই একা ভালো হয়ে কি করব।'

AMARBOI.COM

উপদ্রব

প্রাণীর যদি ক্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকত, না থাকত ইন্দ্রিয়জ কোন চাহিদা, না থাকত কাম-প্রেম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কোন অভাববোধ, ভোগ-উপভোগ সম্ভোগের বাসনা সেই নিরাকাঙ্ক্ষ্য নিষ্ক্রিয়-নিরীহ-নিশ্চিন্ত এবং অনুভব-উপলব্ধি-পুলক শিহরণবিহীন নিস্পৃহ জীবন তারা কি কাজে লাগত, উপভোগ-অনুভবই বা করত কিভাবে?

হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষা-রিরংসা, স্নেহ-মমতা-প্রেম-প্রীতি-সহানুভূতি, লোভ-লালসা, লাভ-ক্ষতি কিছুই না থাকলে জীবন হত নিষ্প্রাণ নিরর্থক কিছু। অভাববোধ এবং প্রাপ্তিবাঞ্ছাই জীবন। এর থেকেই আসে উদ্যম, উদ্যোগ-প্রয়াস-প্রযত্ন। আরো প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী-অংশভাক আছে বলেই, আছে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব। কাজেই প্রাণী জীবনে ভোগ্য-উপভোগ্য-সম্ভোগ্য হয় ইন্দ্রিয়জ তথাকথিত রিপু এবং আপেক্ষিক আকর্ষণ-আসক্তি অনুরাগ প্রভৃতি রয়েছে বলেই, রয়েছে দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণাতে প্রাণের আহার্য।

আবার এ প্রাণজ হচ্ছে মন, যা ভোগ-উপভোগ সুখ আনন্দ আরাম চায়—যা অনুভব-উপলব্ধি করেই সে এর বিপরীত দুঃখ-বেদনা-অভাব-যন্ত্রণা এড়ায়। দুঃখ বা বেদনার অবাঞ্ছিত অনুভূতি বা অবস্থা বা অবস্থান এড়ানোর জন্যেই তার সুখের প্রয়োজন, তেমনি যন্ত্রণা মুক্তির জন্যেই তার আনন্দের আয়োজন আর পানে আহারে কামে-প্রেমে এবং সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ চাহিদা পূরণের প্রয়োজন সবারই রয়েছে বলে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা-ঈর্ষা-ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতও হয়েছে অনিবার্য। কাড়াকাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারামারি হানাহানি তাই এড়ানো সম্ভব হয়নি কখনো।

তবু মানুষ সম ও সহ স্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থান করার জন্যে সার্বজনিক ও স্থানিক কালিক গৌত্রিক গৌষ্ঠীক স্বার্থে নানা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি, টোটেম-ট্যাবু যাদু, ঝাড়ফুঁক, দারু-টোনা, বাণ-উচ্চাটন, মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-কবচ প্রভৃতি দৃশ্য-অদৃশ্য দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র রাশিচক্র আর আসমানে জমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভূত-ভক্তি-ভরসা জাগিয়ে মানুষকে লৌকিক-অলৌকিক-অলীক বিশ্বাস সংস্কারে ভীত, সংযত, সহিষ্ণু ও দায়বদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছে, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, সামাজিক যৌথ জীবনে স্বস্তি, শান্তি, শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের নিরুপদ্রব নিরাপদ-নির্বিঘ্ন-নির্বিবাদ জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধে দেয়ার জন্যে। কিন্তু মানুষ তাতে সফল হয়নি বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত মাত্রায়। কেননা প্রতি মানুষেরই ইন্দ্রিয়জ বোধ-বুদ্ধি-লোভ-লিপ্সা-কাম-প্রেম, হিংসা-ঘৃণা, স্নেহ-মমতা-প্রীতি, অনুভব-উপলব্ধি, যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা মানে-মাপে-মাত্রায় বিভিন্ন। তাই মন-মত-পথ, সংযম-সহিষ্ণুতা, কর্ম-আচরণ-সিদ্ধান্তও বিভিন্ন।

প্রাণীর তথা মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তিই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, প্রবৃত্তিচালিত জীবন বিভিন্ন মানুষে স্থান-কাল প্রয়োজন-পাত্রভেদে বিচিত্র রূপে ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচরণে অভিব্যক্তি পায়। এর নামই জীবনপদ্ধতি। কাজেই মানুষকে কখনো সুশান্ত ছাগলে-ভেড়ায় তথা গড্ডলে-ফেরুতে পরিণত করা যাবে না। তা ছাড়া জীব-উদ্ভিদ জগতে সর্বত্র রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। অরি কখনো হবে না মিত্র। তবে কারো অরি কারো মিত্র তেমন সম্পর্ক-সম্বন্ধও থাকবে। এ কারণেই আরণ্য জীবনেও নানা প্রাণীশত্রু ভয়ে যেমন ত্রস্ত থাকে, তেমনি মিত্রের সহায়তায় ও সহাবস্থানে ভরসাও রাখে।

উপদ্রব যে কেবল এক প্রাণীর উপর অন্য প্রাণী থেকে ঘটে তা নয়, ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-শৈত্য-তুষার-লাভা-অনল-ভূকম্প মারীরূপে প্রকৃতিও তরু-লতার, পশু-পাখির, কীট-পতঙ্গের প্রাণ বিনাশী হয়ে ওঠে, মানুষ বরং প্রকৃতির পীড়নে কখনো সে তুলনায় ও মাপে-মাত্রায় প্রকৃতির হাতে পর্যুদস্ত হয় না।

এই মর্ত্যে প্রাণিজগতে নিরুদ্রব-নিরাপদ নির্বিঘ্ন নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত জীবন জীব-উদ্ভিদ কারো পক্ষেই কখনো সম্ভব হয়নি, হয় না, হবে না। তুচ্ছ কথা দিয়েও এসমস্যা-সঙ্কট-উপদ্রব-উপসর্গ জানা-জানানো বোঝা-বোঝানো সহজ। যেমন শয্যায় মশারি খাটিয়ে ভেতরে কেবল একটা তুচ্ছ মশা ছেড়ে দিলেই যে-কোন স্পর্শকাতর মানুষ মশার গানে বিরক্ত, কামড়ে বিচলিত এবং মশার কামড়-প্রসূত বিষের ভয়ে ভীত হবেই। মশা আমার রক্ত খায়, আর ধ্বনিযোগে ঘুম ভাঙে আবার আমার দেহে প্রাণঘাতী বিষ ঢালে। অথচ কত তুচ্ছ প্রাণী বা পাখি নিতান্ত কয়েক দিনের জীবন তার। তেমনি দিন-দুপুরে আপনার বিশ্রামকালে শয্যায় একটা মাছি যদি আপনার খালি গায়ে এখানে সেখানে ঘন ঘন বসতে থাকে, তা হলে আপনাকে ওই মাছি বিরক্ত বিচলিতও শয্যাচ্যুত করতে সমর্থ হয়।

অতএব, জীবনে জন্ম-মৃত্যুর পরিসরে নানা আকারের ও প্রকারের নানা উপদ্রব-উপসর্গ আপনাকে উৎকণ্ঠ, উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত, বিপর্যস্ত করবে, পর্যুদস্ত করবেই। এর থেকে নিষ্কৃতি কিংবা অব্যাহতি নেই কারো। অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায় বুদ্ধিতে সব প্রাকৃতিক, সামাজিক, জাগতিক উপদ্রব আছেই তা রোগ শোক— মামলা ভয় ঝড় খরা বন্যা অনল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূচাল শৈত্য তুষার মারী মানুষের দুশমন রূপে কিংবা পশু-পাখি কীট পতঙ্গের উপদ্রব প্রভৃতি যেকোন আকারে-প্রকারে আপনাকে আপনার জীবিতকালে জন্ম-মৃত্যুর পরিসরে আক্রমণ করবেই। সব সুখ-আনন্দ-যন্ত্রণার ঝুঁকি নিয়েই জীবন। এর নামই জীবন। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে, সে-যে 'মাতৃভূমি'। এ নিষ্ক্রিয়, অবিচ্ছিন্ন সুখালয় নয়। এ জীবন হাসি-কান্নায় আবর্তিত।

'শোভা'

চিত্তের শোভা প্রীতি, অন্দরের শোভা নারী, ঘরের শোভা পরিচ্ছন্নতা, পরিবারের শোভা আর্থিক সাচ্ছল্য, বাড়ির শোভা তরুলতা, উদ্যানের শোভা পুষ্প, পথের শোভা ছায়াবীথি, বনের শোভা মহীরুহ, অরণ্যশোভা শ্যামলিমা, নদীর শোভা প্রবাহ, দীঘির শোভা স্ফটিকস্বচ্ছ জল, দেহের শোভা মানানসই পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ, যৌবনের শোভা স্বাস্থ্য, অবয়বের শোভা দৈর্ঘ্য, মাথার শোভা কুঞ্চিত কেশ, চোখের শোভা ডাগর কোমল আঁখি বা পটলচেরা বা পদ্মলোচন। নাকের শোভা বাজপাখির বক্রঠোঁটের মতো বক্রচিকন নাসা, আত্মপরিচয়ের শোভা বিনয়, ব্যবহারের বা আচরণের শোভা সৌজন্য।

শিশুর শোভা স্বাস্থ্য ও দুরন্তপনা, জমির শোভা সুপুষ্ট বাড়ান্ত চারা, লেখার শোভা স্পষ্টতা বা প্রাঞ্জলতা, রঙের শোভা ঔজ্জ্বল্য, মাঠের শোভা উর্বরতা জাত চিক্কণ ঘাস।

তেমনি ব্যক্তি মানুষের শোভা সততা, বিদ্যা, বিনয় ও সৌজন্য। ব্যক্তিত্বের শোভা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা-শক্তি-সাহস। শাস্ত্রের শোভা পালা-পার্বণে, সমাজের শোভা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি নিষ্ঠায়। রাষ্ট্রের শোভা জনগণতান্ত্রিক নীতিনিষ্ঠ আইনের অনুগত সরকার।

হৃদয়ের শোভা কবিতা, মননের শোভা দার্শনিকতা, কামের শোভা প্রেম, দাম্পত্য শোভা পারস্পরিক আসক্তি। পারিবারিক শোভা পারস্পরিক অনুরাগ।

কাজের শোভা ঘরে বাইরে সমাজে-রাষ্ট্রে সুকৃতি, জীবনের শোভা কীর্তি। আমরা সবাই শোভার অনুরাগী। শোভা আমাদের কাম্য, প্রাণের আরাম। পরিচিত প্রত্যেক মানুষেরই একটা আত্মীয়-স্বজনসমাজ রয়েছে, রয়েছে প্রতিবেশী। প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে মা বাবা ভাই-বোন, চাচা মামা আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী। পারিজন পরিচিতের প্রতি লঘু-গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সে-কারণে অধিকারও। কোন সম্পর্ক-সম্বন্ধের লোকের জন্যে কতটুকু আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষতি স্বীকার করবে তারও একটা অকথিত, অলিখিত অসংজ্ঞাবদ্ধ অথচ লোকপ্রচলিত ও প্রত্যাশিত মান-মাপ-মাত্রা রয়েছে। মা-বাবার জন্যে যা করতে হয়, চাচা-মামা-ফুফু-খালার জন্যে তা করা হয় না, বিশেষ ঋণের বা কৃতজ্ঞ থাকার কারণ না থাকলে, সেজন্যে কেউ কাউকে দায়ী বা নিন্দা করে না, ভাইবোনের প্রতি দায়বদ্ধতা কেউ অস্বীকার করলে লোকে অবশ্য তার নিন্দা করে। মানুষ কেবল নিজের জন্যে বাঁচে না, স্বতন্ত্রভাবে স্বনির্ভর হয়েও বাঁচতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না। অন্যের সাহায্য-সহায়তা দরকার। তাই মানুষকে অবশ্যই লঘু-গুরু ভাবে পরার্থেও কাজ করতে হয়, প্রয়োজনে অন্যের সহায়তা পাবার প্রত্যাশায়। এ এক প্রকার পুঁজি বিনিয়োগ স্বার্থেই, কেবল নিঃস্বার্থ পরার্থেও নয়।

শাস্ত্র, সমাজ, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য মাত্রই হচ্ছে মানুষকে সংযত, সহিষ্ণু, সহযোগী-সুজন করা যৌথ জীবনে নিরুপদ্রব-নিরাপদ শান্তি-স্বস্তি ভোগ-উপভোগ করার জন্যেই।

সংস্কৃতি, আমরা কথায় কথায় উচ্চারণ করি বটে, সংস্কৃতি যে কি তা বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর। তবু বলি, এ লক্ষ্যেই মানুষ সংস্কৃতি চর্চা করে। যা করতে, বলতে, শুনতে, দেখতে কুৎসিত ও কারো পক্ষে ক্ষতিকর, তা-ই সংস্কৃতিহীনতা। সুরুচির সৌজন্যের ন্যায্যতার অনুশীলনই সংস্কৃতিচর্চা। যার মৃত্যুসংবাদে পরিচিত জনেরা আন্তরিকভাবে আবেগভরে বলে, 'আহা লোকটা ভালোই ছিল। তা হলেই মানতে হবে সদ্য মৃত লোকটা সমাজে প্রত্যাশিত চরিত্রের সুজন ছিল।

রক্তেই যদি ফুটে জীবনের ফুল, ফুটুক না

AMARBOI.COM

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের মধ্যে তমগুণই হচ্ছে আদি অকৃত্রিম প্রাণী প্রবৃত্তি বা স্বভাব। কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি এ তমগুণের প্রভাবে ও আধিক্যেই সম্ভব। মানুষ গোড়া থেকেই এ লোভ-লিপ্সা, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব এড়ানোর-কমানোর বিরলতায় দুর্লক্ষ্য করার সাধনা করেছে, করছে ব্যক্তিক, পারিবারিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠিক, সামাজিক জীবন নিরুপদ্রব-নিরাপদ-নির্বিঘ্ন-নিশ্চিন্ত-নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। আজো কোন সমাজ তাতে সফল হয়নি বটে, তবে কোথাও কোথাও অনেক প্রাণঘাতী দ্বেষ-দ্বন্দ্ব কমানো, বিরল করা সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে, এড়ানো অবশ্য সম্ভব হয়নি কোথাও।

প্রবল মাত্রই দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করতে চায়, এ প্রবলের স্বভাব। দুর্বল প্রবলের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার শিকার হয়েই থাকে। এ ঘরে-সংসারে যেমন, সমাজে-রাষ্ট্রেও তেমনি। তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বৃথা ব্যর্থ জেনেও দুর্বলকে প্রতিবাদে হতে হয় মুখর, রুখে দাঁড়াতে হয় প্রতিরোধ ব্যর্থ হবে জেনেও। নইলে প্রবলের ঔদ্ধত্য, স্বেচ্ছাচার, পীড়ন-শোষণ-পেষণ বাঞ্ছা প্রশ্রয় পায়। অবাধ অপ্রতিরোধ্য ও অশেষ হয় তার দৌরাত্ম্য। এ জন্যেই বৃথা ও ব্যর্থ হবে জেনেও মার-খাওয়া সুনিশ্চিত জেনেও প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হয় ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও। সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনাও দুর্বলকে এ ক্ষতিবরণের ও নির্যাতিত হওয়ার প্রণোদনা যোগায়। এমনি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ পরিণামে ব্যর্থ হয় বটে, তবে প্রবলও যে পীড়ন-শোষণ-পেষণ-দলন শুরু করার পূর্বে এ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা অন্তত দু'বার ভাবে, নির্ভাবনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে না। কিছুটা সংযত ও সহিষ্ণু তারও হতে হয় স্থানের ও কালের প্রতিবেশ বিবেচনায় ও পাত্রের চরিত্রশক্তির মান-মাপ-মাত্রা অনুমানে। এ জন্যেই কোন অবস্থাতেই কোন অবস্থানেই নিঃস্ব, নিরন্ন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বল, নিঃসঙ্গ হলেও প্রতিবাদে মুখর হওয়া যে-কোন মানুষের পক্ষে আবশ্যিক ও জরুরী। কারণ এরও একটা সুদূর প্রসারী রীতি-রেওয়াজ সম্মত সামুহিক, সামগ্রিক, সামষ্টিক অদৃশ্য প্রভাব সমাজ-বিবেকের উপর পড়েই। বাঁচার জন্যে লড়তে হয়, লড়তে গেলে মরতে হয় বটে। তবে তার মৃত্যু তার সন্তানদের ভাইদের জ্ঞাতিদের বাঁচার নিশ্চয়তা দান করে। এ জন্যেই প্রয়োজন মতো মরতে প্রস্তুত থাকাই বাঁচার-বাঁচানোর প্রকৃষ্ট উপায়।

পেলেস্টাইনে, নামিবিয়ায়, লেবাননে, গোলান হাইটে, গাজায়, সিনাইয়ে, জর্দান নদীর তীরে তিব্বতে, সিকিমে, পূর্ব পাকিস্তানে, শ্রীলঙ্কায় যখন পরাক্রান্তশক্তি হামলা করে, দখল করে, তখন মার্কিন সরকার বিচলিত হয় না। কিন্তু কুয়েত দখল মার্কিন সরকারকে রণসজ্জা গ্রহণে প্ররোচিত করে। কেন? উত্তর-পৃথিবীর নাভিমূলে স্থিত অঞ্চলের তেল নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীতে নতুন এক তেল-সাম্রাজ্য সৃষ্টি করা। আর দুনিয়ার সব রাষ্ট্রগুলোকে তাঁবেদার করা, মাথা তুলতে না দেয়া, পরাশক্তি হতে বাধা দেয়া। সাদ্দাম কুয়েত দখল না করলেও মার্কিন সরকার কুয়েত-সৌদী-কাতার-বাহরাইন-সংযুক্ত আমিরাত সুকৌশলে পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতই-সামরিক ঘাঁটি করে। নইলে ন্যাটো-ফেরত পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ঘরোয়া সমস্যা-সঙ্কট-বিপর্যয়ের মুখোমুখি হত। ১৭৫৬ সনে প্রাশাসনিক বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির জন্যে তুর্কী সম্রাট কুয়েতে এক আমীর প্রশাসক বসান, যদিও কুয়েতের কোন গৌত্রিক, ভাষিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য কখনো ছিল না, নেইও। তারপর ১৯১৮ সনে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিলুপ্তিকালে গোটা অঞ্চল ইংরেজ-ফরাসীর ম্যাণ্ডেটারী শাসনে থাকে। তেলের আভাস পেয়েই কুয়েতকে ১৯২২ সনে এক আমীরের তথা তাঁবেদার সর্দারের স্বায়ত্তশাসনে বিচ্ছিন্ন করে রাখে ইরাক-আরব থেকে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা দানের নীতিগ্রহণে যুদ্ধবিধ্বস্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-ফরাসীরা পশ্চিম এশিয়ায় কায়েমী স্বার্থ রক্ষার কুমতলবে তেল সমৃদ্ধ কুয়েতকে ১৯৬২ সনে, ওমান, কাতার, বাহরাইন প্রভৃতির মতো স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাজ্য করে দেয়। অথচ ভাষায়, গোত্রে, ভৌগোলিক অবস্থানে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির ও জাতিসত্তার দেশগুলোকে রাশিয়া জোর করে ধরে রাখছে, এ ব্যাপারে পৃথিবী কেবল কৌতূহলী দর্শক মাত্র। 'কুয়েত ছাড়' সবাই বলে। জর্জিয়া, আমানিয়া, আজারবাইজান, কাজাগ ছাড় বলে না কেউ।

সাদ্দাম (লড়াকু) জেনে বুঝেও নিশ্চিত পরাজয়ের ঝুঁকি নিয়েও মার্কিন ষড়যন্ত্রের ও হামলার প্রতিবাদে প্রতিরোধে দাঁড়ালেন। তাঁর এ আপাত পরাজয়ও কিন্তু পরোক্ষে দুর্বলদের বাঁচার প্রণোদনা দেবে, টিকে থাকার শক্তি যোগাবে। তাই এ যুদ্ধ বৃথা রক্তঝরা প্রাণহরা বুঝেও সমর্থন করছি আর উদ্ধৃত করছি প্রখ্যাত গানের সাহসযোগানো বাণী 'রক্তেই যকি ফুটে জীবনের ফুল, ফুটুক না', লড়াকুবীর যোদ্ধা অকুতোভয় সাদ্দাম বহুমানবের মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও লড়ুক। যদিও যুদ্ধমাত্রই আমাদের অনভিপ্রেত ও ঘৃণা। আমরা জানি এ কালে সরকার ও সৈন্যরা ব্যতীত পৃথিবীর সব মানুষ যুদ্ধ বিরোধী। যুদ্ধবাজ হিটলার-মুসোলিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়ে যুদ্ধ বা অন্তত মানুষের হানাহানি বিরোধী এ মানোভাব জাগিয়ে মানুষ্যত্বের বিকাশ এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। তবু যুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেমে নেই। কোথাও না কোথাও যুদ্ধ রোজ চলছেই। কেননা যুদ্ধ বাধানোর আজো অধিকার রয়েছে কেবল সরকারের ও সৈন্যের।

পশ্চিম এশিয়ার সরকারগুলো হচ্ছে মার্কিন পদলেহী চাটুকার স্তাবক সরকার। আর জনসাধারণ হচ্ছে ইহুদী ও ইহুদীবাদ বিরোধী হওয়ার দরুন মার্কিনশত্রু। এ জন্যে মুৎসুদ্দী সরকারও মুখে ইজরাইল বিরোধী কিন্তু অন্তরে উদাসীন। তাই কুয়েত দখলের অপরাধের সঙ্গে পেলেস্টাইন, লেবানন, গোলান পর্বত, গাজা-সানাই-জর্দান দখলের অপরাধ মিলাতে মিশর সিরিয়া মরক্কো কাতার-বাহরাইন সংযুক্ত আমিরাত সৌদী আরব রাজি নয়। সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক মীমাংসাও তাই তাদের কাম্য নয়। শোষণ লুণ্ঠনবাদী প্রতীচ্যশক্তিগুলোর মতো চীন তিব্বতীদের, ভারত নাগা-মিজুদের, ব্রিটিশ আইরিশদের ইরান-ইরাক-তুর্কীরা কুর্দীদের যে স্বাধীনতা দেয় না, আবার রাশিয়া যে জবরদখল করে রেখেছে-- নানা জাতির দেশগুলো তার উদ্ধারেও এগিয়ে আসে না মার্কিন ও প্রতীচ্য রাষ্ট্রগুলো। জোর জার মুলুক তার। কাজেই ন্যায়-অন্যায় উচ্চারণের লোক মেলে না দুনিয়ায়। ফলে যুদ্ধ চলছে, মানুষ মরছে। মনুষ্যত্ব বিকৃত হচ্ছে। আমরা ফেরুপালের মতো কেবল নিষ্ক্রিয় ধ্বনি তুলি মাত্র। অথচ সারা পৃথিবীর মানুষের আর মানুষ্যত্বের শত্রু-মানবতার শত্রু-বুশের ও মার্কিন তেলসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর ও রক্তঝরা প্রাণহরা প্রতিরোধে স্বেচ্ছা সৈনিক হিসেবে সক্রিয় হওয়া ছিল জরুরী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

AMARBOI.COM

যন্ত্র নির্ভরতায় অভিন্ন বৈশ্বিক জীবনাচার

রুচিমান, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, উদ্যমশীল ধৈর্যবান অধ্যবসায়ী উদ্যোগী মানুষ কোন বিষয়ে মনোযোগ দিলে, নতুন কোন অঙ্গ, অবয়ব সৃষ্টি করতে চাইলে, নতুন রূপ বা রস উদ্ভাবন করতে প্রয়াসী হলে, নতুন কিছু আবিষ্কারে সৃষ্টিতে প্রযত্ন করলে সফল হয়। সভ্য জগতে বিচিত্র ও বিবিধ বিষয়ে আবিষ্কার উদ্ভাবন সৃজন নব নব অঙ্গ অবয়ব স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে সৃষ্টি-ঘরে-সংসারে-আসবাবে-বাটিবাসনে-হাঁড়ি-সরায়, বিচিত্র দ্রব্য-সামগ্রীতে প্রকৃতিকে ও পৃথিবীকে রূপময়, রসময়, বর্ণময় আকর্ষণ-আসক্তির বিষয় করে তুলেছে। কাজেই বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-চিন্তা চেতনা-রূপ রসবোধ-সৌন্দর্য-চেতনা-উপযোগজ্ঞান, মানস-চাহিদা-চিন্তা কোন কালে কোন দেশে কোন কালেই কোন মানুষের একক সামর্থ্যগত ছিল না। সময়-সুযোগ-অর্থ-সম্পদ পেলে, শাহ-সামন্ত ও বিদ্যা-বিত্তশালী রুচিমান সংস্কৃতিমান বিলাসী মানুষের আগ্রহ-উৎসাহ-অর্থ-সম্পদই চৌষট্টিকলার সাধক-স্রষ্টাদের-রূপ-রস-অঙ্গ-অবয়ববৈচিত্র্যে মানুষের গৃহগত, সমাজগত জীবনে এবং সামগ্রিক সামূহিক সামষ্টিকভাবে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের ও উৎকর্ষ সাধনের সাধনা করে এসেছেন। মানুষের মন ও হাত লাগলেই প্রকৃতি ও পৃথিবী রূপময় ও ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে জীবনে প্রিয় ও প্রয়োজনীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এটা ঠিক যে সবাই সব কাজ পারে না, সবাই ভালো-ভাব-বাণী-সুরের গান, মহৎ নতুন ভাবের ধ্বনিমধুর কবিতা, চিন্তাবহুল প্রবন্ধ, বাস্তবজীবন ঘেঁষা গল্প-উপন্যাস, মনোহর ভাস্কর্য, চমকপ্রদ স্থাপত্য, সৌন্দর্য স্বরূপচিত্র, লোকপ্রিয় দ্রব্য-সামগ্রী, রোগের প্রতিষেধক, প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে নতুন যান্ত্রিক সৌকর্য রচনায়-নির্মাণে-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে সমর্থ হয় না। তবু বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির প্রাণের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর পেটের কথা জেনে যাচ্ছে, চিকিৎসকরা-ভেষজরা রোগের নিদান টের পেয়ে যাচ্ছে, ওষুধও আবিষ্কার করছে।

মানুষের দেহ-প্রাণ-মন-মননের শক্তি অশেষ, তার অঙ্গীকার-উদ্যম-উদ্যোগ-জিজ্ঞাসা-কৌতূহল, ধৈর্য-অধ্যবসায় অপরিসীম। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' কোন কোন মানবচরিত্রে আক্ষরিকভাবে সত্য।

এখন ব্যাঙ, গ্রীন হাউজ, ওজোন, আকাশের পরিসর বিস্তৃত, ইলেকট্রনে, প্রোটনে, নিউট্রিনে, নতুন রহস্যের, নতুন শক্তির ও বৈচিত্র্যের ও উপরিভাগেরও উপাদান-উপকরণের আভাস মিলছে। কাজেই প্রকৃতি ও পৃথিবী মানুষের আরো আয়ত্তে ও কাজে-আসবে, আসবে প্রয়োজনেও নিয়ন্ত্রণে। যন্ত্রনির্ভর মানুষ একই খোলা আকাশের নীচে বাস করে বলে, কারো পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় Privacy, স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলা সম্ভবই হবে না।

পৃথিবীর আকাশ খোলা, সে-খোলা আকাশ হয়ে পৃথিবীর সর্বাঞ্চলের সব কথা, ধ্বনি, রূপ, জীব-উদ্ভিদ যন্ত্র-দ্রব্যসামগ্রী সবকিছুই মানুষের বদ্ধ ঘরের ছাদ ও দরজা-জানালা ভেদ করে যন্ত্র মাধ্যমে চোখে ও কানে ধরা দেয়। কাজেই প্রকৃতিতে ও পৃথিবীতে আজ কারো স্বতন্ত্র অজ্ঞাত থাকার, আত্মগোপনের, আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য রাখার উপায় নেই। অতএব, আজ পৃথিবীতে কোন দূরত্ব নেই। আসনে বসে শয্যায় শুথে সারা পৃথিবীকে চোখ-কান-হাতের কাছে পাওয়া যায়। তাই আশা করা যায়, মানুষ শিগগির, খাদ্যে, পোশাকে, প্রাত্যহিক জীবনাচারে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, রুচি-রস-রূপ চর্চায় প্রায় অভিন্ন হয়ে উঠবে-ঐক্যে বৈচিত্র্যে ঐক্য বা ঐক্যে বৈচিত্র্যও বলা যাবে। ঘুচে যাবে শাস্ত্রের গোত্রের, ভাষার, অঞ্চলের ভেদবুদ্ধি। এক বৈশ্বিক চেতনায় মানুষ বিশ্বাস-সংস্কারবদ্ধতা মুক্ত হয়ে আরো উদার ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী মানুষেরা। আমরা সে সুদিনের সুসংস্কৃতির সহিষ্ণুতার সহাবস্থানের প্রত্যাশায় থাকব।

AMARBOI.COM

ইতিহাস কি?

লোকে জানে, বোঝে এবং মানে যে যত মন তত মত এবং তত পথ এবং দেহ-প্রাণ-মন-মস্তিষ্ক আর শাস্ত্রিক, নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, আচারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ও পরিবেশজাত অবস্থা ও অবস্থান ভেদে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিচার-বিবেচনা শক্তিও মানে মাপে-মাত্রায় হয় বিভিন্ন ও বিচিত্র। এ জন্যে দেখা যায় ন্যায়বুদ্ধি বা ন্যায্যতা চেতনাও সব শাস্ত্রে অভিন্ন হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি অবস্থায় ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, ইতিবৃত্তান্ত প্রভৃতির ঘটনার বয়ান, কারণ-কার্য নিরূপণ, পরিণাম বিশ্লেষণ, ব্যক্তিক ভূমিকার মূল্যায়ন কখনো অভিন্ন হয় না। মতে, মন্তব্যে, সিদ্ধান্তে টীকা-ভাষ্যে বিচিত্র ও বিবিধ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে জৈন দর্শনের 'অনেকান্ত'বাদ প্রায় অমোঘভাবে কার্যকর থাকে। একারণে হয়তো বিজ্ঞরা বলে যে History us a legend agreed upon : তাছাড়া ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, ইতিকাহিনী হচ্ছে অতীতের ঘটনা, আর যারা তার বয়ান, আলোচনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, রূপ-স্বরূপ নিয়ে চুলচেরা গবেষণা করে মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত জানায়, তারা হাজার হাজার, শতশত বছর কিংবা যুগযুগ পরের মানুষ। ততদিনে জ্ঞান বুদ্ধি বিজ্ঞান যুক্তিন্যায়চেতনা বিবেক বিচারশক্তি ও পদ্ধতি ক্রমবিবর্তনে পালটে যায়। কাজেই বিষয় পুরোনো বলেই বিষয়ের বা ঘটনার সমকালীন দেশ-কাল মানুষ, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ সম্বন্ধে কালান্তরেও দেশান্তরে নতুন মানুষের পক্ষে সম্যক ধারণা করা সম্ভবই হয় না। কল্পনাকেও সব সময় প্রমাণ-অনুমানের অভাবে এবং অজ্ঞতার প্রভাবে দূর বিস্তৃত করা চলে না। ফলে ইতিহাস রচনায় ও আলোচনায় লেখকের সমকালীনতা, তার বিদ্যা, বুদ্ধি, ন্যায়চেতনা এবং পরিবেশ প্রভাবিত করে। এবং সে-প্রভাবও বহু এবং বিচিত্র। একজন নাস্তিক কোন ঘটনায় ও পরিণামে যেসব কারণ ও ফল খুঁজে পায়, একজন আস্তিক তা কখনো পাবে না, তেমনি একজন হিন্দুর ও একজন মুসলিমের চোখে ভারতবর্ষের নতুন পুরোনো কোন বিষয়ই অভিন্ন রূপে ধরা দেয় না। তেমনি দেয় না কোন দেশী বা বিদেশীর চোখে কোন ঘটনা স্বরূপে ধরা। যদিও আমরা বলে থাকি History repeats itself আসলে তা কখনো ঘটে না, ঘটে মাত্র মন-মত-মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি। কেননা, মানুষের আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার, গোত্র-গোষ্ঠী-জাতি-ধর্মপ্রীতি আস্তিক মানুষকে কখনো নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা শক্তি প্রয়োগে সহায়তা করে না, তার অজ্ঞাতেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং যদিও আদর্শগত ভাবে History is study of man in action. [Harold Wheeler]. তবু সে study নিখুঁত নিখাদ-নিরপেক্ষ হয় না মানুষের অন্তর্নিহিত দলচেতনা বা পক্ষপাতিত্বের দরুন। তা ছাড়া ইতিহাস লেখার জন্যে যে-কালের ও যে-দেশের যে-বিশ্বাসের ও আচার-সংস্কারের মানুষের কথা বয়ান করা হচ্ছে বা হবে তার দেশাচার লোকাচার শাস্ত্র-সংস্কৃতি আসমানে-জমিনে-পাতালে প্রসৃত তার জীবনভাবনার ও জগৎচেতনার পরিধি অনুধাবন করা আবশ্যিক। কেননা মানুষ যন্ত্র নয়, সে বিশ্বাস-সংস্কার আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্যমানা আশা-আকাঙ্ক্ষা-চালিত জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস অঙ্গীকার-উদ্যোগে প্রণোদিত দৈহিক ও মানসিকভাবে গতিশীল সচল প্রাণী। এত কিছু জানা বোঝা একক কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যেই ইতিহাস লেখা কখনো শেষ হয় না, হবে না, একই বিষয় জনে জনে, স্থানে স্থানে, কালে কালে নব নব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নব নব রূপে প্রকটিত হবে ও হয়। তাতেও থাকে সেই সমস্যা। নাস্তিকের লেখায়, আস্তিকের লেখায়, হিন্দুর লেখায়, বৌদ্ধের লেখায়, খ্রীস্টানের লেখায়, ইহুদীর লেখায়, মুসলমানের লেখায় এবং বিভিন্ন মত-সম্প্রদায়ের ব্যক্তির লেখায়। দেশী লোকের লেখায়, বিদেশী লোকের তথাকথিত সশ্রদ্ধ বা অশ্রদ্ধ কিংবা নিরপেক্ষ লেখায় পার্থক্য থেকেই যায় মতে, মন্তব্যে ও সিদ্ধান্তে। আর কালান্তরের ও মতান্তরের প্রভাব তো এড়ানো যায়-ই না। অতএব লিখিত ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্রই কালিক এবং স্বল্পজীবী। ইতিহাস গ্রন্থ তাই সাহিত্যের মতো ক্লাসিক হতে পারে না। চিরন্তনতা তার নেই, তবু সৌজন্যবশে আমরা কোন ঐতিহাসিকের তারিফ করি বটে। এবং নির্ভরও করি তাঁর সংগৃহীত পরিবেশিত তথ্য-প্রমাণ অনুমানের উপরও। তাই এক অর্থে ব্যক্তিলিখিত ইতিহাস হচ্ছে পরিণামে absolute mind-এর অভিব্যক্তি। এবং অতীত মানুষের জীবনাচারে জিজ্ঞাসা, তার বিবর্তন ধারার কৌতূহলই ইতিহাস চর্চার মূল প্রেরণা, সে অর্থে The sphere of history is as wide as the sphere of human interest itself [Calling wood] কাজেই all history is the history of personal thought of the writer— ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা-জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিফলন মাত্র। এ তাৎপর্যেই All history is contemporary history; ইতিহাসের কথা অতীতের, চেতনা বর্তমানের আর উপযোগরিক্ত মৃত লাশ ভবিষ্যতের।

ইতিহাস কথা কয় বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মুখে বিভিন্ন কালে বিচিত্র ও বিবিধ কথা বলে। এক কথা কয় না, এক রকম কথাও কয় না। তবু ইতিহাস কথা বলে, লোকে নিজ নিজ সুবিধে মত কাজেও লাগায়। ইতিহাসের ঘটনার ব্যাখ্যা পালটায়, ইতিহাস প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি হয়, তার বিস্তৃতি ঘটে, অন্তকাল ধরে ইতিহাসের কলেবরও বৃদ্ধি হতে থাকবে।

AMARBOI.COM

শ্রম ও স্বেদ

প্রকৃতির জগতে কোনকিছুই মানবকাম্যরূপে বিন্যস্ত নয়। প্রকৃতি অরণ্য সৃষ্টি করে, মানুষ তৈরি করে সুবিন্যস্ত সারিবদ্ধ উদ্যান, বীথি। মানুষই পারে কেটে ছেটে সুষম অবয়ব, সুসঙ্গত-সুমঞ্জস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করতে। সব কিছুই নির্মাণ-নিয়ন্ত্রণই মানুষের কাজ।

মানুষ তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, শোভা-সৌন্দর্যতৃষ্ণার প্রেরণায় কল্পনা-চিন্তা-বুদ্ধি-যুক্তি-অভিজ্ঞতা সামঞ্জস্য বোধ নিয়ে সৌন্দর্যবুদ্ধি-রূপ চেতনা প্রভৃতির রূপায়ণ, বাস্তবায়ন, প্রয়োজনপূরণ লক্ষ্যেই কল্পনা মনন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা-প্রয়োজন প্রয়োগে সুপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ কিংবা বিন্যস্ত করে প্রকৃতি থেকে উপাদান-উপকরণ রূপে প্রাপ্ত সামগ্রী। কাজেই ভাব-চিন্তা চেতনা-বুদ্ধি-জ্ঞান-যুক্তি, অভিজ্ঞতা, অনুভব উপলব্ধি ভোগ-উপভোগ সম্ভোগ-বিলাস বাঞ্ছাই-- আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যমশীল কাঙ্ক্ষীকে বাঞ্ছাপূর্তি লক্ষ্যে উদ্যোগী করে কাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের, চাহিদা পূরণের, অভাব মেটানোর প্রয়াসে। এমানুষ বুদ্ধিতে জ্ঞানে-শক্তিতে সাহসে-সঙ্কল্পে, উদ্যমে-উদ্যোগে অন্যদের চেয়ে মানে-মাপে-মাত্রায় প্রবল বলেই, দুর্বলকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেয়। তাই পৃথিবীব্যাপী মানুষনির্মিত সব কাজই শ্রম ও স্বেদজাত, সবটাই শ্রমের ফল, প্রকৃতি পতিত জমিতে ঘাস জন্মায়, মানুষ স্বশ্রমে তাতে ফলায় ফসল। তাহলে সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৌশল-প্রকৌশল-হাতিয়ারের উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য, সর্বপ্রকার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, মনন-চিন্তন মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কেরই অবদান। সবকিছুই মানব চাহিদার, মনীষার, সংকল্পের, উদ্যমের উদ্যোগের ফল ও ফসল বটে, কিন্তু সব মানুষ মস্তিষ্ক খাটায় না। অল্পকিছু লোকেই কেবল জিজ্ঞাসা-কৌতূহল-প্রয়োজনবোধ নিয়ে ধৈর্য অধ্যবসায় নিয়ে আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, দ্রব্যগুণ, ভেষজ, কাজে সৌকর্যের জন্যে যন্ত্র বা হাতিয়ার। অবশ্য কিছু কিছু আকস্মিক-অভিজ্ঞতাপ্রসূত আবিষ্কার-উদ্ভাবনও রয়েছে। এগুলোর সংখ্যাও আদি মানবসমাজে কম ছিল না। রোগের প্রতিষেধকের ক্ষেত্রে এমনি আবিষ্কার ও প্রয়োগ হয়তো বেশিই ছিল, যেমন ছিল খাদ্যবস্তু আবিষ্কার। এর সঙ্গে অবশ্যই ছিল স্থূল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ। অতএব, মস্তিষ্কের অনুশীলনকারীর ভোগ-উপভোগ, সম্ভোগ-বিলাস, কাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, চাহিদা পূরণের জন্যেই দীন-দুর্বল মানুষেরা শ্রম ও স্বেদ দিয়ে কাজ করে আসছে চিরকাল, নৈপুণ্য, কৌশল প্রকৌশলও সেই কর্মী শ্রমিকদের। কাজ করার, নির্মাণের দায়িত্ব এমনকি উৎকৃষ্ট অমৃতবৎ খাদ্যবস্তু তৈরির ও রান্নার দায়িত্বও তাদের, কিন্তু সে-সবের ভোগে-উপভোগে তাদের অধিকার কোন কালে ছিল না, আজো নেই। উদ্যান নির্মাণ করে ওরা, বেড়ায় ধনী-মানীরা, বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করে ওরা, গানও গাইত ওরাই, বাজাতও ওরাই, উপভোগ করতে শাহ-সামন্ত বেণে বিদ্যা-বিত্তবানেরা। গাড়ী বানায় যারা, আর গাড়ী চড়ে যারা তারা একশ্রেণীর নয়। এ স্বেদ-ঝরা শ্রমজীবীদের আজো প্রয়োজনীয় পরিমাণের ভাত-কাপড়ে অধিকার মেলেনি। মনুষ্যসৃষ্ট পৃথিবীর যাবতীয় কাজই ওদের শ্রম ও স্বেদ জাত, কিন্তু ভোগ করে অন্যরা। যারা ভোগ করে ও করত তেমন শাহ-সামন্ত বেণে বিদ্বান, বিত্তবান মানুষ আজো তুলনায় নগণ্য সংখ্যক। যারা বঞ্চিত তারা সংখ্যায় শত শত কোটি। আশ্চর্য নিঃস্ব নিরন্ন দুর্বল মানুষ একে ভাগ্য বলে নিয়তি বলে, কর্মফল বলে, মেনে নিয়েছে।

AMARBOI.COM

অনুকৃত জীবনের গ্লানি ও ক্ষতি

টবের গাছের জীবন থাকে, বৃদ্ধি থাকে না। কেননা এর দেহ-প্রাণের পরিচর্যা হয় কৃত্রিমভাবেই। তরুলতার পরিবেষ্টনী কৃত্রিমভাবে উপভোগ করার জন্যেই টবে গাছ লালন করা হয়। স্বাভাবিক প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক পরিবেশে উপভোগের এ ব্যবস্থা শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এবং মৃদু-অনুভূত আনন্দও দেয় দর্শককে। কিন্তু কৃত্রিম কখনো বাস্তবের বা স্বভাবের অভাব পূরণ করতে পারে না।

এ কথাগুলো ভিন্ন এক প্রসঙ্গে ভূমিকারূপেই বলা হল। য়ুরোপ হচ্ছে সর্বপ্রকার নতুন-চিন্তা-চেতনা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-যন্ত্র-রোগের নিদান ও ঔষধ প্রভৃতি আজকের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বা বিলাস সামগ্রীর উদ্ভাবক-আবিষ্কারক ও নির্মাতা। ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনে তো বটেই, এমনকি আমাদের উদার মননশীল মনীষীরাও মানসিক জীবনেও য়ুরোপের অনুকরণে অনুসরণেই কেবল তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো প্রতীচ্যই সর্বক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির উৎস। অঙ্গে ও অন্তরে যা কিছু চমকপ্রদ মনোহারী ও বৌদ্ধিক এবং যৌক্তিক, সবটাই য়ূরোপ থেকেই পাচ্ছি। কোন মৌলিক চিন্তা-চেতনা, নতুন কোন রূপচেতনা, অবয়ব ধারণা, সৌকর্যবোধ আমাদের মনে জাগেই না। আমরা নিষ্ক্রিয় অনুকারক অনুসারকরূপে য়ূরোপ নির্ভর এবং চিন্তা-চেতনা জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, পোশাক আচার সামগ্রীর আঙ্গিক সৌন্দর্য সৌকর্যের জন্যে আমরা প্রতীচ্য নির্ভর। আমাদের নরুনের কোন পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু নখ-কাটার প্রতীচ্য যন্ত্রের কেজো আবয়বিক উৎকর্য হয়েছে বিচিত্রভাবে। অনুকৃত জীবনে গ্লানি যেমন রয়েছে, ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক তথা আর্থিক জীবনে ক্ষতিও রয়েছে অপরিমেয়।

আমাদের দেশের লোক আজো অশিক্ষিত, লেখাপড়াজানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদেরও ক্বচিৎ কেউ জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিচালিত। অন্যরা সাধারণভাবে আশৈশবের লালিত বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ন্ত্রিত জীবনাচারে থাকে চিরঅভ্যস্ত। তাই প্রতীচ্য থেকে প্রাপ্ত স্বাধীনতার, স্বাধিকারের স্পৃহা, দেশ-জাত-সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান, নাগরিক রুচি-সংস্কৃতি প্রভৃতি এখনো টবের গাছের মতোই আমরা কৃত্রিমভাবে মনের মধ্যে জিইয়ে রেখেছি বটে, কিন্তু আমাদের মর্ম মূলে শেকড় ছড়িয়ে তা থেকে প্রাণরস আহরণ করতে শিখিনি। তাই আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে কৃত্রিমতা, বিকৃতি, বর্বরতা, হিংস্রতা, দুর্নীতি-দুর্বৃদ্ধিই প্রবল ও প্রকট। আমাদের গণতান্ত্রিকতা অনেক সময়েই শাহ-সামন্ত-বেণের-স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচারের চরমমাত্রাকেও ছাড়িয়ে যায়। আর কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানিই প্রায় প্রকাশ্যে প্রাধান্য। মস্তানী-গুণ্ডামী-খুন-খারাবী আমাদের রাজনীতির আবশ্যিক ও জরুরী অঙ্গ। দেশবাসীকে সাক্ষর-শিক্ষিত ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর সচ্ছল না করলে এ সমস্যা সঙ্কট থেকে মুক্তি মিলবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ইতিহাস-সমাজ বিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞান-সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও আমরা কোন নতুন মনন-চিন্তনের, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের স্বাক্ষর রাখতে পারি না স্বদেশে ও স্বভাষায়। আমরা মৌলিক চিন্তা-চেতনার-জগৎচেতনার ও জীবনভাবনার অভিব্যক্তি দিতে না পারলে জাতি হিসেবে বা রাষ্ট্র হিসেবে আমরা কখনো মানসোকর্ষে কিংবা ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনাচারের উন্নয়নে স্বনির্ভর, স্বয়ম্ভর, স্বাধীন ও মৌলিক হতে পারব না। আমরা কেবল লাটিমের মতো ঘূর্ণায়মান থাকব দৃশ্যত, আপাত সচল থাকব, কিন্তু গতিশীল হব না কখনো। সবকিছু স্বকৃত ও স্বাঙ্গীকৃত আত্মীকৃত ও সাধ্যমতো উদ্ভাবিত-আবিষ্কৃত হওয়া চাই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের শাস্ত্রিক, নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাশাসনিক, বাণিজ্যিক, রাষ্ট্রিক সর্বক্ষেত্রেই মৌলিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করতে হবে-- এমন কি নানা যন্ত্র ও অস্ত্র নির্মাণেও। সৃষ্টিশীলতা ব্যতীত কোন জাতি বা রাষ্ট্র বড় হতে পারে না, মননক্ষেত্রেও নয়, ব্যবহারিক জীবনেও নয়। অনুকৃত ও অনুসৃত জীবন লজ্জার ও অগৌরবের। আত্মোন্নয়নে সৃজনশীলতা আবশ্যিক ও জরুরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দাসত্ব'-এর শেকড় সন্ধানে

আজো প্রবলের কাছে আত্মসমর্পণের আঙ্গিকরূপ হচ্ছে Hands up করা। আদি কালেও নাকি আত্মসমর্পণের যে-সব পদ্ধতি চালু ছিল, তার মধ্যে দুহাত মাথাতে চেপে ধরা, বুকে বা পেটে পাঞ্জা বা এক হাতের তালু দিয়ে অন্যহাতের তালু চেপে রাখা, হাত জোড় করে রাখা। [নমস্কার স্মর্তব্য] দণ্ডবত বা লাঠির মতো হয়ে মাটিতে বুক, পা, মাথা পেতে রাখা, সাষ্টাঙ্গে পদপ্রান্তে পড়ে থাকা পায়ে মাথা ঠেকানো বা সেজদা করা, পাপে মাথা বা হাত রাখা, দু'কান ধরে থাকা, জিহ্বা দাঁতে চাপা, গলবস্ত্র হওয়া চরণেষু পুজ্যপাদ পাককদমেষু প্রভৃতিই ছিল দাসত্ব বরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের লক্ষণ। এগুলো একালে সামাজিক-শাস্ত্রিক শিষ্টাচারের আবশ্যিক অঙ্গ। আজো খাদেম, খাকসার, সেবক, দাস, চরণাশ্রিত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় বিনয়ে।

প্রমাণ তো নেই, তবে অনুমান দুঃসাধ্য নয়। যেমন মনে করা যাক দুজন লোক একসঙ্গে হাঁটছে, পথে একটি উঁচু আমগাছে পাকা আম দেখল যখন, তখন বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে প্রবলজন ক্ষীণকায় দুর্বলতর ব্যক্তিকেই হুকুম দিল গাছে উঠে আম পাড়ার জন্যে। এমনি অবস্থায় হুকুম তামিল না করে উপায় থাকে না দুর্বলের। কেননা অবাধ্যতার দরুন তার মার খেতেই হবে। আজো ঘরে-সংসারে প্রবল, বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা সামাজিক সম্বন্ধে মান্যজনমাত্রই কনিষ্ঠজনকে বা দুর্বল কিংবা তুলনায় অযোগ্য বা অমানী ব্যক্তিকেই তার চাহিদা মেটানোর জন্যে আহ্বান করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, দেহে-প্রাণে সম্পদে নিরুপদ্রব ও নিরাপদ থাকার জন্যেই গোড়ায় শক্তিতে ও সাহসে দুর্বল ব্যক্তি সবল শক্তিমান সাহসী বুদ্ধিমানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয়। এভাবেই শুরু হয় কৌমে গোত্রে গোষ্ঠীতে সর্দার প্রথার এবং যন্ত্রতত্র দাসপ্রথার। এ কবে কিভাবে কোথায় শুরু হয়, তা সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগে বলা যাবে না বটে। তবে প্রাণীপ্রজাতি মানুষের মধ্যে প্রবলের ভোগ-উপভোগের, আরামের ও আয়াসের লোভ লিপ্সাই যে দেহে-প্রাণে-শক্তিতে-সাহসে-বুদ্ধিতে-উদ্যমে-উদ্যোগে ক্ষীণ ও হীন মানুষকে তাঁবেদার, হুকুমবরদার অনুগত ও দাস, বশ করতে প্রবলকে প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত করতে থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আজো বুনো-বর্বর, সভ্য-অসভ্য ব্যক্তিমাত্রই মান ও ক্ষমতালিপ্সু, গোষ্ঠী-গোত্র, শাস্ত্রিক, ভাষিক, দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতি বা সাংস্কৃতিক কিংবা মতবাদী সম্প্রদায় যে এভাবেই দুর্বলদলকে শাসনে-শোষণে-দমনে-দলনে অনুগত ও অধীন রাখার জন্যে সদা-প্রয়াস প্রযত্ন করে-- যার নাম ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ তা দুনিয়ার সর্বত্র প্রকট। এ প্রবৃত্তি মূলত ব্যক্তিক ও গৌষ্ঠীক। তাই তা, দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে দৈশিক রাষ্ট্রিক শাস্ত্রিক ভাষিক বাণিজ্যিক আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ নিয়ে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক প্রভাব-প্রতিপত্তির আকারে যেমন বিকাশ বিস্তার কাম্য হয়ে ওঠে, তেমনি চেতনা-অবচেতনভাবে ব্যক্তিমানুষও গুণে-মানে-অর্থে বিদ্যায়-বিত্তে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায়-আত্মোন্নয়ন ও আত্মপ্রসার কামনা করে। কেউ জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস-সঙ্কল্প-উদ্যম-উদ্যোগ প্রয়োগে জীবনে স্বপ্ন ও সাধ বাস্তবায়িত করে, অন্যরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনার রোমন্থনেই স্বপ্ন ও সাধ মেটায়। আগের কালে মানে গত শতকেও দাস প্রথা চালু ছিল, এখনো রয়েছে সৌদী আরবে, হয়তো অন্যত্রও। আমাদের দেশে জমিদারীপ্রথা চালু থাকাকালে দাসত্ব ও আনুগত্য কবলিত ছিল রায়তমাত্রই। আজ বেণে-বুর্জোয়াযুগে মজুর রয়েছে বটে, তবে সত্তার গভীরে কোন দাসত্ব নেই, নেই অবিমোচ্য আনুগত্য। অবশ্য অনুগ্রহলিপ্সু স্তাবক-চাটুকার পদলেহী সারমেয় স্বভাবের ব্যক্তির কথা আলাদা। ওরা স্বেচ্ছাদাসত্বে তুষ্ট, তৃপ্ত ও অভ্যস্ত।

চাল-চুলো

চাল-চুলো না থাকা মানে বাস্তুভিটে না থাকা, ভিটেতে বাসগৃহ না থাকা, আর নিত্যদিন রান্নার তথা খাদ্যবস্তু চাল ডাল সংগ্রহের অসামর্থ্য। অর্থাৎ নিঃস্বতা-নিরন্নতার রূপক বা আলঙ্কারিক অভিব্যক্তি হচ্ছে চাল-চুলো না থাকা। আজকালকার আন্তর্জাতিক পরিভাষায় যাকে বলে সাবহিউম্যান বা মানবেতর হীনাবস্থায় দুঃসহ প্রাণীর জীবনযাপন করা। এদের সংখ্যা কত? দাস আমলে ছিল শতে আটানব্বইজন, ভূমিদাস আমলে ছিল শতে পঁচাশিজন এখনকার যন্ত্রযুগে এবং যন্ত্রজগতেও বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় বিশ্বে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় এখনো শতে পঞ্চাশ জন সেই চাল-চুলোহীন মানুষ রয়ে গেছে। আমার এ কথাগুলো অবশ্য ঠিক পরিসংখ্যান সম্মত নয়, তবে এ অনুমান আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে সাক্ষ্য প্রমাণের দলিল ঘেঁষা হবে। এ উপমহাদেশেই দেখি বোম্বাই থেকে ঢাকা অবধি শহরে-বন্দরে, নালা-নর্দমা ঘেঁষা ঝুপড়ি বস্তি, যার বাসিন্দা প্রায় মোট শহরবাসীর এক-তৃতীয়াংশ আর এক-দশমাংশ বাস করে দোকানের রোয়াকে, দাওয়ায়-বারান্দায় এবং পাঁচটা ঋতুতে খোলা ফুটপাতে।

নিঃস্ব নিরন্ন মানুষ চিরকাল ছিল। কেননা, ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-ভূচাল-মারী প্রতিবছরই আবর্তিত হত। গরীব মানুষ দুর্ঘটনায় ও খাদ্যাভাবে আর মহামারীতে উচ্ছন্নে যেত। তাই লোকসংখ্যা সেকালে সহজে বৃদ্ধি পেত না, কখনো কখনো ওলা-বসন্তে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত, কালাজ্বর-ম্যালেরিয়া-প্লীহা প্রভৃতির দরুন অপুষ্টি-অচিকিৎসায় মরত অনেক। শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুও ছিল উচ্চহারের। বছরে প্রসূতি সূতিকায় তথা রক্তহীনতায় ভুগে ভুগে মরত অকালে। আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ হত দু'তিন বছরে একবার। খরা-বন্যার দরুন মরত অনেক শিশু-বৃদ্ধ-নারী। এভাবে জনসংখ্যার হ্রাস সম্ভব হত বলে ১৯৪০-৫০ সনের আগে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কখনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। এ সময়ে প্রায় সর্বপ্রকার রোগের প্রতিষেধক বের হওয়ায় মৃত্যুর দ্বার যেন রুদ্ধই হয়ে গেল। মানুষের গড়পড়তা আয়ু দ্বিগুণ তিন গুণ হয়ে গেল। এ মুহূর্তে ঢাকা শহরেই আশির উর্ধ্ব বয়সের চার-পাঁচ হাজার লোক মিলবে। অথচ ১৯৪০ সনের আগে সারা দেশেও এ সংখ্যার দীর্ঘজীবী লোক মেলা প্রায়-অসম্ভব ছিল। এখন যেন লোক মরে না, কেবল বাড়ে। বিশেষ করে এ উপমহাদেশে। চীনে আইন করে বৃদ্ধি রোধ করার চেষ্টা বা ব্যবস্থা হয়েছে, তবু বাড়ে। স্থির থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে মাটির পরিধি বাড়ে না, কমে না সামুদ্রিক জলের পরিমাণ, অথচ জনসংখ্যা বাড়ছে কোথাও কোথাও দ্রুত ও আশঙ্কাজনকভাবে। সমস্যা খাদ্যের, বলতে গেলে বাসস্থানেরও। পুরোনো ভিটেতে ঠাঁই হয় না, ফসলের জমিতে ঘর করতে হয়।

তৃতীয়বিশ্বের দরিদ্রদেশে এ সমস্যার সমাধান বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও প্রাশাসনিক ব্যবস্থায় মিলবে না। সহ ও সমস্বার্থে উৎপাদনে নির্মাণে এবং প্রয়োজনানুপাতিক হারে বণ্টনে ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে হবে। এ জন্যে জীবনযাত্রার জীবনাচারের সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। একে আপাতত সমাজবাদ বা মানববাদ বলা যাক, কম্যুনিজম নির্বোধ ও কায়েমী স্বার্থবাজ বুর্জোয়ার বুককাঁপা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই ওই নাম বাদ দিলাম। কিন্তু এরশাদ সরকার রেডিয়ো টিভি-পত্রিকায় বক্তৃতায় ঢাকঢোল পিটিয়ে অজ্ঞ-অনক্ষর, নিরন্ন জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করার জন্যে যে গুচ্ছগ্রাম তৈরীর কিংবা খাসজমি বিলির, পথকলি নামের সাক্ষরতার ব্যবস্থা করেছিল, তা সমস্যা-সঙ্কটের সমাধান প্রয়াস ছিল না, ভোট যোগাড়ের ফাঁদ ছিল মাত্র। মার্কিন অর্থে চালিত কোন মুৎসুদ্দী সরকারই কখনো বাধ্যতামূলক গণসাক্ষরতা বা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না মার্কিন সরকার চায় না বলেই।

AMARBOI.COM

গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র

যদি বলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রে ও স্বৈরতন্ত্রে তফাৎ কি এবং কতটুকু তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল অথচ অজ্ঞ-অনক্ষর দরিদ্রলোক আকীর্ণ রাষ্ট্রে বা রাজ্যে? তাহলে অনেকেই বিরক্ত হবেন, মন্তব্যও করবেন আমাকে অজ্ঞ-নির্বোধ বলে। মানুষকে আঁধা-কানা-খোঁড়া কিংবা জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-বিদ্যা-বিত্ত নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালো না বাসলে তথা মানুষের প্রতি দরদ দায়িত্ব ও কর্তব্যচেতনা না থাকলে, কোন ব্যক্তিই নিঃস্বার্থে কারো উপকারে, দুঃখমোচনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে না।

কাজেই 'গণতন্ত্র' যেখানে দেশ শাসনের ক্ষমতার অংশীদার হওয়ামাত্র, এবং সে-সূত্রে ও সে-সুযোগে প্রভাব-প্রতাপ-প্রতিপত্তি খাটিয়ে নিজের আখের গোছানো এবং বখরা প্রাপ্তিই লক্ষ্য হয়, তাহলে গণতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সংসদতন্ত্রে-মন্ত্রীতন্ত্রে বা রাষ্ট্রপতিরূপ নায়কতন্ত্রে পরিণতি পাবেই অপ্রতিরোধ্যভাবে। 'গণতন্ত্র' অবিকৃত, অকৃত্রিম এবং গণহিতৈষণা বগণহিত অন্বেষামূলক হতে হলে রাষ্ট্রবাসীর নিম্নতম সাক্ষরতা, স্বাধিকার সম্বন্ধে সামান্য সচেতনতা শাষণ-পোষণের ও শোষণ-পেষণের পার্থক্যবুদ্ধি থাকা আবশ্যিক। শুধু তাই নয়, প্রতিবাদ করার মতো সাহস এবং প্রতিরোধ করার মতো শক্তি ও প্রয়োগ করার মতো সঙ্কল্প, উদ্যম ও উদ্যোগ থাকা জরুরী।

আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার অজ্ঞ দীন-দুর্বল বিদ্যা-বিত্তহীন জনগণের এ বুদ্ধি সাহস ও শক্তি নেই বলেই তথাকথিত গণপ্রতিনিধিরা নামে গণসেবী বা খাদেমে কওম হলেও কাজে কেবল যে গণশাসক শোষক প্রভু ও মালিক তা নয়, এক একজন অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাপ্রিয় অর্থবিত্ত লিপ্সু প্রতারক-প্রবঞ্চক হয়, ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকে এবং নগণ্য বলে তা আলোচ্য নয়। এরাও আবার দুই শ্রেণীর সাহসী ও আত্মসত্তার মর্যাদাভিমানী এবং ভীরু ও নির্ঝঞ্ঝাট স্বার্থপর। তবু গড়ে সবাই হচ্ছে আঞ্চলিকভাবে খুদে রাজা। কাজেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অর্থাৎ লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্যপুঁজি ও শিল্পপুঁজি নিয়োগ যেখানে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাপেক্ষ, উন্নতি যেখানে ধূর্ততা ও গুপ্তপথপুঁজি নির্ভর, কালোজগতে ও কালোবাজারে যে ব্যবসা-বাণিজ্যে-ভেজাল মেশালেই যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য লাভের অর্ধেক স্ফীতি, সেখানে গণপ্রতিনিধি কখনো গণস্বার্থে কাজ করতেই পারে না। নিতান্ত লোক-দেখানো চোখ ঠকানো রাস্তা-ঘাট স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতল প্রভৃতি লুটের পরে তথা বখরা নেয়ার পরেও উদ্বৃত্ত অর্থে তৈরি বা মেরামত হয় বটে। এমনি গণতন্ত্রে আইনের শাসনে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, সততার সুলভতা থাকতেই পারে না এখানেও জোর যার মুলুক তার। সে-জোর মামার, বাবার, চাচার, সে-জোর টাকার, গুণ্ডা যোগাড়ের, শক্তির, সে-জোর কাড়ার-মারার-হননের সাহসের, তাই জিয়া-এরশাদের মতো কোন চিহ্নিত স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছারীর পতনে অপসারণে কিংবা কোন দুর্নীর্তিবাজ আমলা-চাকুরের পদচ্যুতিতে স্বৈরতন্ত্র অবস্তি হতেই পারে না। সমাজবাদেই কেবল সযত্ন প্রয়াসে সর্তকদৃন্টিতে সচেতন ব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্র-স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার রোধ করা সম্ভব।

AMARBOI.COM

বুদ্ধির মুক্তি

'বুদ্ধির মুক্তি' তাৎপর্যে নয় কেবল, আক্ষরিক অর্থেও কোন্ শাস্ত্রে নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে, টোটেমে, ট্যাবুতে, যাদুবিশ্বাসে ও সর্বপ্রাণবাদে কিংবা স্রষ্টায় বা ঈশ্বরতত্ত্বে নির্বিচারে নিঃসন্দেহে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নহীন বিশ্বাস না রাখা, মেনে না চলা, এসবের অস্তিত্ব ও উপযোগ অস্বীকার করা-কোন পূর্বলব্ধ ধারণায় বিশ্বাসে সংস্কারে, কোন শোনা কথায় প্রভাবিত না হওয়া। ভাব-চিন্তা-কর্ম-আবরণে কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি এবং প্রয়োজন ও উপযোগচেতনা দিয়েই চালিত হওয়া। কাজেই অনাচ্ছন্ন ও অপ্রভাবিত মন-বুদ্ধি-যুক্তি পরিচালিত এবং জ্ঞান-অভিজ্ঞতা আর প্রয়োজন ও উপযোগচেতনা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করাই হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি মানুষের লক্ষণ। অতএব বুদ্ধির মুক্তির সহজ মানে দাঁড়ায় আশৈশব লালিত পরিবারের, পরিবেশের, শাস্ত্রের, সমাজের, দেশের ও কালের লোকপ্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ যেগুলো নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, শাস্ত্র-আচার-পালা-পার্বণ প্রভৃতি সমকালীন জীবনযাত্রায় তথা ইহজাগতিক চিন্তা-চেতনায় কর্মে আচরণে হৃতউপযোগ ও বাধাস্বরূপ সেগুলো সহজে পরিহার করার শক্তি-সাহস ও বিবেচনাশক্তি অর্জন করা। ভাঙা হাঁড়ি ভাঙা বাটি যেমন ফেলে দিতে হয় তেমনি চিন্তার চেতনার সমাজের ও রাষ্ট্রের গতি-প্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য হৃতউপযোগ আচার-আচরণ নীতি-নিয়ম-শাস্ত্র বর্জন করতে হয়। কাজেই বুদ্ধির মুক্তি অনুশীলনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে আবাল্য অর্জিত প্রভাবিত ও লালিত সর্বপ্রকারের বিশ্বাস-সংস্কারের, নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির পালা-পার্বণের বর্জন। অন্তত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে এগুলোর সমকালীন উপযোগ বা প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহ, অবিশ্বাস জাগা, প্রশ্ন তোলা ও জিজ্ঞাসা জাগা, উপযোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে মেনে চলা, সন্দেহ থাকলে উদাসীন থাকা, বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক অবিশ্বাস জাগলে বর্জন করা।

কাজেই যেহেতু বুদ্ধির মুক্তি অনুশীলনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে চিত্তলোকে শূন্যতাসৃষ্টি করা, আশৈশব অর্জিত ও লালিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ বর্জন করা এবং সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজ-সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের চাহিদা সম্মত, অন্বিষ্ট বহুজন হিত লক্ষ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি যোগে উপযোগ ও প্রয়োজন চেতনা নিয়ে বিবেক-বিবেচনাশক্তি প্রয়োগে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিসম্মত জীবনযাপনের যোগ্য হওয়া, সেহেতু বুদ্ধির মুক্তির জন্যে নাস্তিক্য আবশ্যিক। কোন আস্তিকমানুষই কোন ভূতে-ভগবানে-প্রেতে-পিশাচে-নিয়তিতে-কর্মফলে, দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তিতে আস্থাবান মানুষেরই বুদ্ধি মুক্ত নয়, মাকড়সার জালের মতো নানা বিশ্বাস-সংস্কারের, বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভাবনা ভরসার জালে তা আটকা পড়ে ও সেগুলো দিয়ে তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

অতএব স্বস্থ ও সুস্থ থাকা ধীরবুদ্ধির ও স্থিরসিদ্ধান্তের মানুষ হওয়া সম্ভব কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি-যুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা শ্রেয়োবোধ, গণহিতচেতনা সম্পন্ন সৎনাস্তিকের পক্ষেই সম্ভব। এমন মানুষই কেবল নিখাদ, নিখুঁত ও অকৃত্রিম সচেতন বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক জীবন যাপন করতে পারে। দেশের কালের সমাজের ইহজাগতিক চেতনাঋদ্ধ হয়ে মানুষের প্রয়োজনে যথাসময়ে নতুনকে সৃষ্টি করার, পুরোনোকে বর্জন করার নতুনকে গ্রহণ বরণ করার শক্তির নামই যুক্তিবুদ্ধি। নির্দ্বিধায় শ্রেয়োকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করাই বুদ্ধির মুক্তির লক্ষণ। সমাজে আপ্তবাক্য হিসেবেই কিছু ভুল ধারণা বা তত্ত্ব চালু থাকে। যেমন Greatmen think alike আসলে গ্রেটম্যান মাত্রই নতুন ও ভিন্ন চিন্তাই উচ্চারণ করে। সাধারণ মানুষই কেবল গতানুগতিক তথা প্রথাসিদ্ধ চিন্তা-চেতনায় থাকে অভ্যস্ত। তেমনি আস্তিক মানুষের কখনো বুদ্ধির মুক্তি ঘটতেই পারে না। কেননা তার চেতনায় রয়েছে বিশ্বাসের শেকড়। বিশ্বাস-সংস্কার-ভয়-ভক্তি-ভরসাই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই তার বুদ্ধি কখনো মুক্তি পেতেই পারে না।

কঠিন লোহার খাঁচায় বদ্ধ মানব চৈতন্য

প্রাণীজীবনে স্ব-প্রজাতির মধ্যে একটা হয়তো সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে, যাকে আমরা গোষ্ঠীচেতনাও বলতে পারি। উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি, হাতি, ভেড়া, বানর, হরিণ প্রভৃতির মধ্যে তা আমরা লক্ষ্যও করি। আর না বললেও চলে যে মানুষতো দুটো হাতের বদৌলত পারস্পরিক সহযোগিতায় ও নির্ভরশীলতায় খাদ্য সংগ্রহ, সঞ্চয় প্রভৃতি করে আসছে আদিকাল থেকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোড়ার দিককার এ কৌম, গোষ্ঠী ও গোত্রবদ্ধতা প্রয়োজনিক, স্থানিক, কালিক বাণিক ভাষিক এবং খাদ্য সংগ্রহের পারিবেশিক প্রয়োজনে এবং আত্মরক্ষার প্রাতিবেশিক গরজে যে গড়ে উঠেছিল, তা প্রমাণে-অনুমানে সত্য ও তথ্য বলে বিশ্বাস করতে বাধা নেই। কেননা এ গোষ্ঠীচেতনা ও গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং এদের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা আজো পৃথিবীর বুনো-বর্বর আরণ্যগোত্র-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রচল রয়েছে দেখা যায়।

মানবপ্রজাতির কোন কোন গোত্র ও গোষ্ঠী কোন কোন কালে ও কোন কোন স্থানে আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, মননে-চিন্তনে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনুভব-উপলব্ধির সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ বিকাশে, হৃদয়বৃত্তির সংবেদনশীলতার উৎকর্ষে আজ বিস্ময়কর উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করেছে। তবু এতো পরিশীলন-পরিচর্যার পরেও প্রাণীপ্রজাতি হিসেবে মানুষও তার মৌল বৃত্তি-প্রবৃত্তির শেকড় গুহায়িত বা লুকায়িত রাখতে পারেনি। তাই গোত্র-গোষ্ঠী-জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-বিশ্বাস-মত-পথ প্রভৃতির পার্থক্য আজো কাঁটাতারের বেড়ার মতো কঠিন লোহার খাঁচার মতো মানুষে মানুষে অবাধ-নির্বিঘ্ন-সহজ মিলনে বাধা হয়ে রয়েছে। জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসেনর পার্থক্য এক অদৃশ্য কাঁটাতারের শঙ্কা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-ভীতি-বিদ্বেষের ব্যবধান স্থায়ী করে রেখেছে। কিছুতেই মিলতে দিচ্ছে না। কোথাও কোথাও দেশ-কাল-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সেই আদি গোষ্ঠী বা গৌত্র চেতনা নতুন নামে সূক্ষ্ম পরিমার্জনা পেয়ে সুরুচি-সৌজন্য-মনস্বিতার আবরণে দৈশিক রাষ্ট্রিক কিংবা শাস্ত্রিক জাতিচেতনায় সংহত, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 'জাতীয়তা' নাম গ্রহণ করেছে মাত্র। নাম পাল্টেছে বটে, কিন্তু গুণগত পরিবর্তন হয়নি, কেবল যৌক্তিক, বৌদ্ধিক ও প্রায়োগিক উৎকর্ষ লাভ করেছে মাত্র।

তাই দুনিয়াব্যাপী আজো মানুষের মত-পথগত, শাস্ত্র-সমাজচিন্তাগত বর্ণ-ভাষার পার্থক্যগত, বিদ্যা-বিত্তগত নিবাস-দেশগত পার্থক্যের দরুন মানুষ নির্বিশেষকে কেবল 'মানুষ'রূপে ভাবতে, গ্রহণ-বরণ করতে সম্ভব হচ্ছে না কোথাও কারো পক্ষে। আমাদের যে প্রথম পরিচয় আমরা মানুষ, আমাদের যে শেষ পরিচয় আমরা মানুষ, তা আজো এতো ভাব-চিন্তা-চেতনার প্রসারের ফলেও, পরেও আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, আমাদের লক্ষ্য যে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-ইহুদী-মুসলমান থাকা নয়, এমনি নীতি-নিয়মে ভাব-চিন্তা-আচরণে-আদর্শে মানুষ হওয়া, কেবলই মানুষ হওয়া তথা মনুষ্যত্বের তথা মানুষ হিসেবে মানবিকগুণের, শক্তির, জ্ঞানের, বুদ্ধির, যুক্তির বিবেকের বিকাশ সাধন, তা' আমরা আজো অনুভব-উপলব্ধিগত করতে পারিনি। মনুষ্যসাধনার কি ব্যর্থতা!

বিচিত্র প্রাণী প্রজাতির মানুষ

বহু বহু প্রজাতির কীট, পতঙ্গ পশু, পাখি, সামুদ্রিক বিবিধ ও বিচিত্র বড় ছোট-মাঝারি সুন্দর-কুৎসিত, বিকট-ভয়ঙ্কর, ভীরু-ক্ষীণ-হীন-শান্তিপ্রিয় স্বস্তিকামী এবং স্বাধিকারে স্বস্থ, প্রভাব বিস্তারেবিমুখ, ক্ষমতা প্রয়োগে অনীহ, আবার অনধিকারে আত্মবিস্তার লিপ্সু হিংস্র প্রাণীরও অভাব নেই। আমিষ-নিরামিষভোজী, প্রাণী খাদক, রক্ত পিপাসু, রক্ত শোষক, মাংসখাদক হাড়প্রিয় প্রাণীও দেখা যায়। জলে-স্থলে আকাশে বিচিত্র চরিত্রের, স্বভাবের আচরণের শক্তি-সাহসের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ আকৃতি-প্রকৃতি-প্রবৃত্তির প্রাণী রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্রগভীরে সমতল বা পার্বত্য অরণ্যেও বড়-ছোট-মাঝারি যেমন হিংস্র-ভয়ঙ্কর প্রাণী রয়েছে, তেমনি রয়েছে জলে স্থলে প্রাণিখেকো উদ্ভিদ তরু-লতা-ঘাস-বিচালি।

অন্য প্রাণীদের ভাষা আমরা বুঝি না। তাদের সামাজিক প্রাকৃতিক প্রাবৃত্তিক জীবনের অন্ধি-সন্ধিও আমরা সযত্নে জানার প্রয়াসী নই। সবটা জানা হয়তো সম্ভবও হবে না প্রয়াসে প্রযত্নেও। কেননা আমরা আজো মনুষ্যস্বভাব ও আচরণ কোথায় কখন কেন কিভাবে অভিব্যক্তি পায়, প্রকট হয়, তার হদিস পাইনে। বারবার তাই ভুলের শিকার হই, ঠেকে ও ঠকে বুঝি, আবার ভুলে যাই, আবার বিভ্রান্ত হই, মুগ্ধ হই, আস্থা রাখি, আশ্বস্ত হই, পুনঃপুনঃ প্রতারিত প্রবঞ্চিত হই। যেখানে মানুষ হয়েও মানুষ চেনা ভার, সেখানে অন্য প্রাণী চেনা সহজ না হওয়ারই কথা, বুদ্ধিমত্তা, ধূর্ততা, চতুরতা, ছল, কপটতা, সরলতা, সততা প্রভৃতির মধ্যে দৃশ্যত আপাত পার্থক্য জানা-বোঝাই কি সহজ। তাছাড়া হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ, দ্বন্দ্বও থাকে অকারণে ও স্ব-কারণে।

এ মানুষই ক্রোধে বাপ-ভাই-মা-সন্তান হত্যা করে, সম্পদ থেকে ভাইকে বঞ্চিত করে, কামে নারীর ইজ্জত নষ্ট করে, লোভে-লিপ্সায় কিংবা অভাবে নরহত্যা করে ধনরত্ন-অর্থ-লুণ্ঠন-হরণ করে। স্বার্থে লঘু-গুরু মিথ্যা বলে, অপরাধ-অপকর্ম করে, প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে, পরের সম্পদ ও রাজ্য কেড়ে নেয়। মজুরী নিয়ে অর্থাৎ বেতনভোগী হয়ে নরহন্ত্যার তথা সৈনিকের জল্লাদের গুণ্ডার মস্তানের লেঠেলের বরকন্দাজের চাকরি নেয়। দুনিয়ার কোন কেতাবে পরের রাজ্যহরণ পাপ বলে বর্ণিত নয়, সৈনিকের নরহত্যা পেশার শাস্তির বয়ানও নেই কোন কেতাবে, কোন সৈনিকের সেনানীর বিবেকেও নেই সে বিবেচনা বা জিজ্ঞাসা।

এ মানুষ ঈশ্বরবাদী আস্তিক হয়েও, ঈশ্বরের অন্তর্যামীত্বে আস্থা রেখেও ঐহিক পারত্রিক ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কার কথা জেনেও ডাকাতি-চুরি-কাড়া মারা-হানা-লুট-শোষণ-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-ছল-চাতুরী-কাপট্য সর্বক্ষণই করে চলেছে। সরকারী ও সামাজিক শাস্তি-নিন্দার সামান্য ভয়ই কেবল কৃচিৎ কখনো কোথাও কাউকে স্বল্প সময়ের জন্যে সংযত-বিরত রাখে। আজো নরহত্যার জন্যে সৈন্য, গুণ্ডা, মস্তান, জল্লাদ, লেঠেল মেলে, আজো অর্থ-সম্পদ কাড়ার জন্যে নরহত্যায় দ্বিধা নেই দুর্জন-দুর্বৃত্তের। পরের জন্যে প্রাণ দিতে, রক্ত দিতে, কিডনি দিতে, চক্ষু দিতে রাজি আগ্রহী উৎসাহী-উদ্যোগী লোকও যে নেই, তা নয়। স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রেম-ভালোবাসা-পরার্থপরতা সেবা শুশ্রূষা কৃপা করুণা দান দয়া-দাক্ষিণ্যও পাশাপাশি প্রায়সমভাবে কিংবা বেশি পরিমাণে বা মাত্রায় দেখি বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাও একই মানুষেরই আর এক রূপমাত্র। রামকে হত্যা করে শ্যামকে ভালোবাসা, পরের পুত্রের হত্যালব্ধ অর্থে নিজের পিতাকে পোষা। তাই মারণাস্ত্র ও মৃত্যুরোধক ঔষধ মানুষই তৈরি করে। এ জন্যেই বলি, মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারো জন্যে ভালো, কারো জন্যে মন্দ, কারো প্রতি ভালো, কারো প্রতি মন্দ, কারো কাছে ভালো, কারো কাছে মন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~